দুশ বছরের বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা

অলোক রায় ▫ পবিত্র সরকার ▫ অভ্র ঘোষ



সাহিত্য অকাদেমি

সম্পাদনা সহযোগিতা : অজয় গুপ্ত

সাহিত্য অকাদেমি, ২০০২

রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০ ০০১

বিক্রয় বিভাগ : 'স্বাতী', মন্দির মার্গ, নতুন দিল্লি ১১০ ০০১

জীবন তারা, ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৩

১৭২ মুম্বাই মারাঠি গ্রন্থ সংগ্রহালয় মার্গ, দাদার, মুম্বাই ৪০০ ০১৪

মেইন গুণ বিল্ডিং কমপ্লেক্স, ৪৪৩(৩০৪) আন্না সলাই, তেয়নামপেট,
চেন্নাই ৬০০ ০১৮

সেন্ট্রাল কলেজ ক্যাম্পাস, ড. বি. আর. আম্বেদকর ভীথি, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০১

প্রচ্ছদ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

অক্ষর বিন্যাস :
সার্ভিস প্রিন্টার্স, ৫৫/৬৪ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫০

মুদ্রক :
ডি. জি. অফসেট, ৯৬ এম মহারানী ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা ৭০০ ০৬০

সূচিপত্র

ভূমিকা

১

যিনি শুধু প্রবন্ধই লেখেন, গল্প-উপন্যাস-কবিতা বা নাটকের কারবারি নন, তিনি কি সাহিত্যিক পদবাচ্য, তাঁকে কি দ্বিধাহীনভাবে সাহিত্যজগতে ঠাঁই দেওয়া হয়? *দুশ বছরের বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য*-এর প্রথম খণ্ডের সম্পাদকীয় ভূমিকায় এরকম একটা প্রশ্ন উঠে এসেছিল। ওই সমস্যাটি নিয়েই কথা শুরু করা যাক।

সমস্যাটা আসলে সাহিত্যের বিভিন্ন বর্গ ভাগাভাগি নিয়ে আমাদের বহুদিনের সংস্কারের মধ্যে নিহিত। গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ইত্যাদির বর্গীকরণের ক্ষেত্রে কতগুলি সাধারণ ও বাহ্যিক নিয়ম, শর্ত, আঙ্গিক, রূপ, রীতিনীতি ইত্যাদি আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে ঠিক কথা, কিন্তু কোনো কোনো গল্প বা উপন্যাস যদি প্রবন্ধধর্মী হয়ে ওঠে, নিটোল আখ্যানধর্মী না হয়ে যুক্তিশৃঙ্খলের বাঁধনে, মননের দীপ্তিতে, বাচনের পারিপাট্যে, তথ্যের সমাহারে কোনো ঔপন্যাসিকের রচনায় যদি প্রবন্ধের ঋজুভাব তৈরি হয় তাহলে কি বলব এটি সঠিক উপন্যাস হয়ে উঠল না? পাদটীকাকণ্টকিত 'ঢোঁড়াই চরিতমানস'-এর বিচারে কেউ কি একথা বলবেন এটা সঠিক উপন্যাস নয়, প্রবন্ধেরই কাছাকাছি। কিংবা আমাদের একালের কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়ের সাম্প্রতিক গল্প-উপন্যাসের চর্চায় প্রচলিত ফর্ম ভাঙার যে-কারিগরি তাকে কি বলব তিনি আর উপন্যাস লিখছেন না? উলটো আরেক ঘটনাও ঘটতে পারে। সৈয়দ মুজতবা আলির কোনো এক নিবন্ধ পড়ে কেউ অভিযোগ করতে পারেন যুক্তি-শৃঙ্খলা, নৈয়ায়িক ক্রম, ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে এ ঠিক প্রবন্ধ নয়, অন্যকিছু। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায়, আমাদের এই সমস্যাগুলি তৈরি হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো এক বদ্ধমূল সংস্কার থেকে। গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-নাটক বিষয়ে নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট আঁটোসাঁটো সংজ্ঞা জানা আছে বলেই এই সমস্যা। সংজ্ঞার্থগুলি একটু-আধটু শিথিল করে নিলে বোধ হয় সমস্যার ভার কমে। গল্প-উপন্যাস তো নানারকম হতে পারে, বস্তুত হয়েই থাকে। বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি, রুচি, দর্শন, মূল্যবোধ, রাজনীতি ইত্যাদি বৈচিত্র্যের কথা বলছি না; লিখন ভঙ্গি, আঙ্গিক ইত্যাদি বিচারে তো হরেকরকমের উপন্যাস আছে। দ্বিধা কিংবা আপত্তিটা তাহলে ধোপে টেঁকে না। ঠিক একইরকমভাবে একজন বিশুদ্ধ প্রবন্ধকারকে সাহিত্যিক বলা যাবে কি না — এই প্রশ্নটি বোধ হয় বড়ো হয়ে ওঠে এই ধারণা থেকে যে প্রবন্ধ হল এমন এক গদ্যরচনা যাতে থাকবে নির্দিষ্ট এক বিষয়ে অজস্র তথ্যের সমাহার, সমস্যা বিশ্লেষণের জন্য আঁটোসাঁটো যুক্তিশৃঙ্খল, সমস্যার যথাযথ বর্ণনা আর তার নিরসনের জন্য বিশেষ কোনো পথের সন্ধান ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রবন্ধকে হতে হবে মননশীল, বিশ্লেষণমূলক, যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক, নির্ভুল যুক্তির পারম্পর্যে গাঁথা এক বিশেষ সিদ্ধান্তে

পৌঁছুবার প্রয়াস। থাকতে পারে সে-প্রবন্ধে অন্য মতের সন্ধান, তার খুঁটিনাটি বিচার, পাঠককে আলোকিত করার জন্য নানারকম দ্বান্দ্বিক সংলাপ। তবে তাকে হতে হবে শেষপর্যন্ত সমস্যা নিরসনের জন্য নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত অভিমুখী। আব সাধারণভাবে প্রবন্ধ-নিবন্ধের ভাষা হবে মেদহীন, ঝরঝরে, বুদ্ধির প্রখরতায় শানিত, তার্কিক এবং তত্ত্বচিন্তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। ভিন্ন ভিন্ন কালে ও চালে প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ, বুদ্ধদেব বসু বা অম্লান দত্তের রচনা-রীতিতে যে গুণগুলি আমরা দেখে থাকি, তাই আসলে প্রবন্ধসাহিত্যের লক্ষণ। দৃষ্টান্ত চারটি এলো নিতান্তই দৃষ্টান্ত দেখানোর খাতিরে। আরও অজস্র মননশীল বাঙালি প্রাবন্ধিকের নাম এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। বাংলা প্রবন্ধের চর্চা বহুদিনের এবং বহুধাবিস্তৃত। এই মননশীল ঐতিহ্যের অন্তর্গত লেখকদের সংখ্যা মোটেই হাতে-গোণা সংখ্যা হতে পারে না।

কিন্তু এরই পাশাপাশি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা সাধারণ পাঠকেরা প্রবন্ধে পেতে চাই প্রাচীন বা আধুনিক নানান তত্ত্বের খোঁজখবর, সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতি-ধর্ম-সমাজ ইত্যাদি হরেকরকম বিষয়ের খবরাখবর, বিশ্লেষণ, তত্ত্বতালাশ। কখনোবা সমূহ কোনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপদসঙ্কুল সমস্যা থেকে পরিত্রাণের রাস্তাও। প্রবন্ধের প্রচলিত এই ছকের মধ্যে শিল্প-সাহিত্য, কাব্য-কলা, সৃষ্টিধর্মী অনুভব-অনুরণনের ছোঁয়া থাকলে, নৈর্ব্যক্তিকতার তথাকথিত বেড়া ডিঙিয়ে যদি ব্যক্তিগত বা আত্মগত বোধের প্রকাশ দেখি তাহলে কারোর মনে হয় এই প্রবন্ধ শুধুই প্রবন্ধ নয়, তার চেয়ে বেশিকিছু। যেমন ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধ পড়ে বিনয়কুমার সরকারের মনে হয়েছিল — 'রৈবিক প্রবন্ধগুলা এক-একটা সনেট্-গোছের। কোনো দু-একটা চিন্তা প্রচারের জন্য লেখা এইসব প্রবন্ধ। বেশী-কিছু তথ্য জোগানো এই সকল রচনার মতলব নয়। স্বপক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি-তর্কের বিশ্লেষণ এই সবের ভেতরে আসে না। কোনো-কোনো মতের বিরুদ্ধে কিছু বলা হচ্ছে নিশ্চয়। কিন্তু লেখকের মন্তব্যটা, বাণীটা কতকগুলা উপমার মারফৎ প্রকাশ করা হচ্ছে। এই হ'লো রাবীন্দ্রিক প্রবন্ধ-সাহিত্যের লক্ষ্য। এতে পাই শব্দের ফুলঝুরি আর তুলনার হাত-সাফাই। মাঝে মাঝে হাসি-ঠাট্টার ছোঁআচও আছে। মগজের উপর ঘা লাগে মন্দ নয়। তবে হৃদয়ের উপর ঘা লাগে দস্তুরমতন। প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত মোটের উপর সর্বদা এক মন্তরই পাচ্ছি। যুক্তি এগুচ্ছে না, চিন্তা এগুচ্ছে না, এগুচ্ছে শুধু হৃদয়ের স্পন্দন। এই হ'লো রাবীন্দ্রিক প্রবন্ধের সাধারণ কাঠামো।' (*বিনয় সরকারের বৈঠকে*, দ্বিতীয় ভাগ, দে'জ পাবলিশিং সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ৫১৯-২০)।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ঐশ্বর্য মূলত লেখকের 'হৃদয়ের স্পন্দন', ততোটা মস্তিষ্কগ্রাহ্য যুক্তির বিস্তারে নয় — একথায় বোধহয় সকলেই সায় দেবেন না। মস্তিষ্ক আর হৃদয় — এই দুইয়ের প্রসঙ্গ অনিবার্যতই আসবে রাবীন্দ্রিক প্রবন্ধের বিচারে, কিন্তু কোন্ ঝোঁকটি প্রধান আর কোন্‌টি অপ্রধান, তার বিচারে রসজ্ঞ পাঠকমহলে মতপার্থক্যটি খুবই স্পষ্ট। শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ-প্রবন্ধ' রচনায় মন্তব্য করেছেন, '.... সমস্ত বক্তব্য এবং রচনাকৌশল জুড়িয়া যেখানে একটা রস-ব্যঞ্জনাই মুখ্য হইয়া ওঠে, তাহাই খাঁটি সাহিত্য। কোন লেখা কতটুকু সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে না-উঠিয়াছে তাহার বিচার চলিবে সেই

লেখার ভিতরকার রস-ব্যঞ্জনার তারতম্য লইয়া। রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ-প্রবন্ধগুলিকে আমরা খাঁটি সাহিত্য বলিতে পারি না, কারণ সেখানে 'সাধ্য' এবং তথ্য-সহকারিত্বে মননশীলতার 'সাধন' কিছু অপ্রধান হইয়া উঠে নাই; কিন্তু তাহা মিশ্র সাহিত্য বটে; কারণ তাঁহার বুদ্ধির হিরণ্ময় রশ্মিজাল তাহার অভিজাত বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া রস-ব্যঞ্জনাকে কোথাও একেবারে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে নাই।' (*রবীন্দ্র বীক্ষা*, এশিয়া পাবলিশিং সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৫২)।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের চরিত্র বিচার করতে গিয়ে এই পদ্ধতিগত ভিন্নতার প্রসঙ্গ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এই কারণেই যেহেতু আমরা বুঝতে চাইছি প্রবন্ধ কখন সাহিত্য হয়ে ওঠে আর কখন তা নিতান্তই আটপৌরে কেজো এক গদ্যলেখা। কথাটা এইভাবেও বলা যায় যে প্রবন্ধের 'বিষয়বস্তুগৌরব'টি বড়ো নাকি 'রচনারসসম্ভোগ'-এর উপাদানটিই মুখ্য? নাকি দুইই? রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই দুইয়ের আশ্চর্য সম্মেলনই আমরা দেখতে পাই। বাঙালি আরও অনেক প্রাবন্ধিকের ক্ষেত্রেও কথাটা কমবেশি প্রযোজ্য। কিন্তু সব সময়েই কি ঘটে তা? হিসেব-নিকেশ করলে দেখা যাবে যে, যেসব গদ্যরচনাকে আমরা সচরাচর প্রবন্ধ বলে চিহ্নিত করি তাতে সাদামাটা আটপৌরে প্রবন্ধের সংখ্যাই বেশি। আর সেই কারণেই তর্কটা বোধহয় জমে ওঠার সুযোগ পায় যে, প্রবন্ধ আর প্রবন্ধসাহিত্য একজাতের বস্তু নয়। রসজ্ঞ শিল্প-কলাসমৃদ্ধ প্রবন্ধকে যদি প্রবন্ধসাহিত্য বলি, শুকনো গদ্যে তথ্য-তর্কসমেত বিশ্লেষণী রচনাকে বলব প্রবন্ধ। এই দ্বিতীয়োক্তটিতে ভাবসম্পদের ভার কম হবে এমন কথা বলছি না, তবে তা যতোটা বুদ্ধি বা মস্তিষ্কের ওপর আঘাত হানে ততোটা হৃদয়স্পর্শী নাও হতে পারে। অতএব তত্ত্ব, তথ্য, তর্ক-বিতর্ক, নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি প্রবন্ধ রচনার বৈশিষ্ট্য। প্রবন্ধসাহিত্য তার চাইতে কিছু বেশি — রসের সন্ধান, শিল্পের মাধুর্য, হৃদয়ের আর্তি তাতে ফুটে উঠবে।

এই ভাগাভাগিটা যদি মেনে নিই তাহলে কেন সাদামাটা প্রাবন্ধিককে সাহিত্যিক বলে সংবর্ধনা জানানো হয় না, তার একটা ব্যাখ্যা হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। আর প্রবন্ধসাহিত্যের যাঁরা স্রষ্টা তাঁদের তো সাহিত্যিক বলতেই হবে। সে-বিষয়ে মতদ্বৈধতার কোনো অবকাশও থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথ যদি শুধুই প্রবন্ধই লিখতেন তাহলে রসবিচার করে তাঁদের সাহিত্যিক না বলে কারোরই উপায় থাকবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যায়। রসের বিচার করছি কীভাবে, তার কি কোনো স্থির অনন্য মানদণ্ড আছে? রচনার বিষয়বস্তুর ওপরও তো নির্ভর করে তার আঙ্গিক, তার রস। তাছাড়া একেক লেখকের একেক স্বভাব। এমনকি একজন বিশেষ লেখকও তো তাঁর রচনার বিষয়বস্তু নির্বিশেষে একই রকম রীতি-পদ্ধতি ব্যবহার করেন না। রসেরও হেরফের ঘটে।

তর্কটা তাহলে জমে ওঠে অন্য দিক থেকেও। অক্ষয়কুমার দত্ত কিংবা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনাকে কোন্ কোঠায় ফেলব? বা বিদ্যাসাগরকে? পরবর্তী যুগের প্রমথ চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়দের লেখাকে যদি সাহিত্যিক প্রবন্ধ বলি, তাহলে কি বলা যাবে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে সাহিত্যগুণ নেই? জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা রচনা তো অবশ্যই সাহিত্যপদবাচ্য, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ বসুর লেখাগুলোকেও সাহিত্যিক প্রবন্ধ বলব না কেন?

এবকম হাজাবটা প্রশ্ন তোলা আদৌ অবাস্তব নয়। অন্যদিকে পাঠকেব রুচিভেদে সাহিত্যবোধেব নানান মাত্রা থাকতেই পাবে। অতিশয় তার্কিক তথ্যভাবাক্রান্ত বচনাতেও পাঠক সাহিত্যেব গন্ধ পেতে পাবেন। বিবেচনাটা শেষ পর্যন্ত তাঁব। আসলে কোন বচনা প্রবন্ধসাহিত্য হযে উঠতে পাবল আব কোনটি নিতান্ত এক প্রবন্ধ — এ-বিচাব সব দিক থেকেই আপেক্ষিক, কখনো কখনো ব্যক্তিগতও বটে। এমন কথাও শুনতে পাই আকছাব যে ববীন্দ্রনাথেব প্রবন্ধে এতোবেশি ভাবেব সমাগম যে বিষযেব বিশ্লেষণে যুক্তি তর্ক আবছা হযে যায, তাকে আব প্রবন্ধ বলেই মনে হয না। বিনয সবকাবেব পূর্বোদ্ধৃত উক্তিটিতেও তো এব আভাস স্পষ্ট। অতএব সাধাবণভাবে প্রবন্ধ আব প্রবন্ধ-সাহিত্যেব মধ্যে ভাগাভাগিটা পুবোপুবি জল-অচল কবে দেখলে বিপত্তি ঘটাব সম্ভাবনা প্রবল।

এসব কথাবার্তা থেকে একটা ব্যাপাব খুব স্পষ্ট হযে উঠছে যে বাংলা প্রবন্ধেব চবিত্রে ব্যাপক বৈচিত্র্য বযেছে। তথ্যবহুল বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ, তাত্ত্বিকতায সমৃদ্ধ প্রবন্ধ, সাহিত্যবসসমৃদ্ধ প্রবন্ধ, গবেষণামূলক প্রবন্ধ ইত্যাদি। পাশাপাশি লিখন-শৈলী, আঙ্গিক বা অন্যান্য প্রকবণেব তফাতে ব্যক্তিগত গদ্য, বম্যবচনা, জার্নালধর্মী নিবন্ধেবও ছড়াছড়ি। পত্রসাহিত্যকেও তো প্রবন্ধেব গোত্রে ফেলা হয। এই সবগুলিকে প্রবন্ধ বলা যাবে কিনা তা নিযে বিস্তব তর্ক একসমযে ছিল, এখনও আছে নিশ্চযই পণ্ডিতমহলে। তবে প্রবন্ধ বস্তুটিব সংজ্ঞার্থ শিথিল কবে নিলে এগুলিকে প্রবন্ধসাহিত্য বলতে আপত্তি থাকাব তেমন কোনো কাবণ থাকে কি? নানাবকমেব উপন্যাস যেমন, নানা জাতেব প্রবন্ধ হতে বাধা কোথায? পবিমল বাযেব *ইদানীং* বইটিতে ছোটো ছোটো আকাবেব মনোজ্ঞ বচনাগুলি বা কল্যাণী দত্তেব *খাড়া বড়ি থোড়* বা *থোড় বড়ি খাড়া* বইগুলিতে অন্তর্ভুক্ত বচনাগুলিকে যদি প্রবন্ধ-সাহিত্যেব গোত্রভুক্ত কবি তাহলে কি দোষ হবে খুব? অবশ্যই মানব ক্ষিতিমোহন সেনেব *অখণ্ড ভাবতেব সাধনা* বা প্রবোধচন্দ্র সেনেব *আধুনিক বাংলা ছন্দ* জাতীয প্রবন্ধগুলিব সঙ্গে ওসব লেখাব বিস্তব ফাবাক — আঙ্গিকে, বাচনভঙ্গিতে, সর্বোপবি মেজাজেব দিক থেকে। কিন্তু দুইই তো প্রবন্ধ। এই তাবতম্যগুলি আছে বলেই মানতে হবে যে বাংলা সাহিত্যেব ভাণ্ডাবে বকমাবি প্রবন্ধেব অন্ত নেই। এই বকমাবিত্ব বিষযেব ভিন্নতায, বাগ্‌বিস্তাবেব ধবনে, যুক্তিবিন্যাসেব শৈলীতে, মননেব বিভিন্নতায, স্বগত কথনে বা ভিন্নমতেব খণ্ডনে — আবও কতবকম ভাবে যে তাব ইযত্তা নেই।

দুশ বছবেব বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য-এব প্রকল্পে এই দ্বিতীয খণ্ডটি নির্মাণ কবতে গিযে আমবা যথেষ্ট শিথিলভাবেই 'প্রবন্ধসাহিত্য' শব্দবন্ধটি ব্যবহাব কবেছি। সাহিত্য শব্দটিব বিচাব এখানে নিতান্ত সংকীর্ণ নয়, তথাকথিত বসেব বিচাবে যাকে আমবা সাহিত্য অভিধা দিযে থাকি, সেই মানদণ্ডে প্রবন্ধবিচাব কবিনি আমবা। আমাদেব লক্ষ্য ববং সামাজিক সমস্যা, অর্থনীতি বা বাজনীতিব সমস্যা, ধর্ম বা জাতপাতের বিষয় এবং অবশ্যই শিল্প-সাহিত্য-সংগীত নিযে বাঙালি ভাবুকদেব যে ঐশ্বর্যময় সাহিত্য তৈবি হযেছে বিশ শতকে তার বৈচিত্র্যটাকে তুলে ধবা। বলা বাহুল্য, এই বিচিত্রতাব অন্বেষণ যিনিই কবেছেন তিনি জানেন যে একটি-দুটি খণ্ডে তাব পুবো চেহাবাটা ধবাব চেষ্টা কতোটা দুঃসাধ্য। আসলে এই জাতীয প্রচেষ্টাগুলি শেষ পর্যন্ত এক খণ্ডছবিবই বৃত্তান্ত।

সাহিত্য অকাদেমি প্রস্তাবিত এই প্রকল্পটি নিয়ে কাজ শুরু হওয়ার সূচনাপর্বে সিদ্ধান্ত ছিল যে উনিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ নিয়ে তৈরি হবে একটি খণ্ড, আর বিশ শতক নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ড। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের পরিকল্পনা করতে গিয়ে দেখা গেল যে বিভিন্ন বিষয়ে বাঙালি প্রাবন্ধিকদের লেখার যদি একটা মোটামুটি স্তরের প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা-সংকলন তৈরি করতে হয় তাহলে পাঁচশ-সাড়ে পাঁচশ পৃষ্ঠার একটি বইয়েও তা কুলিয়ে ওঠা দুঃসাধ্য। অকাদেমি কর্তৃপক্ষের কাছে সম্পাদকদের তরফ থেকে তাই আর্জি পেশ করা হল যে বিশ শতক নিয়ে অন্তত দু-খণ্ড গ্রন্থের পরিকল্পনা নেওয়া হোক। কর্তৃপক্ষ সানন্দে সম্পাদকদের এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন। সেটা বিশেষ আনন্দেরই কথা।

বিশ শতকের প্রবন্ধের যে-ভাগাভাগিটা আমরা এই দুই খণ্ডে বিন্যাস করব, সেই বিভাজনের পিছনে যে গূঢ় কোনো দর্শন কাজ করছে, তা কিন্তু নয়। বিশ শতকের প্রবন্ধরাজিকে আমরা এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ হিসেবেই দেখতে চেয়েছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সেই হিসেবে এক নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রবাহ। দ্বিতীয় খণ্ডের সর্বশেষ রচনাটির লেখক চিন্মোহন সেহানবীশ, যাঁর জন্মসাল ১৯১৩ আর হতেই পারে তৃতীয় খণ্ড শুরু হবে তার পর থেকে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত বা শম্ভু মিত্রের মতো কোনো লেখকের রচনা দিয়ে (এটা কিন্তু এখনও স্থির হয়নি, নিছক দৃষ্টান্ত দেবার জন্যই উল্লেখ করলাম এই দুই নাম)। বোঝাই যাচ্ছে এই ভাগের পিছনে বিশেষ কোনো সামাজিক বা সাহিত্যিক উদ্দেশ্য নেই, যেটা আছে তা হল নিতান্ত এক অঙ্কের হিসেব। আকারে ও প্রকারে ষাট-বাষট্টিটি প্রবন্ধের এক বই যথেষ্টই ভারি, তাকে আরও বেশি স্থূলকায় করার যুক্তি নেই কোনো। সেই বোধ থেকেই এই খণ্ড-বিভাজন।

প্রবন্ধগুলি নির্বাচনের সময় আমরা বিষয়গত বৈচিত্র্যকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছি। সামাজিক-রাজনৈতিক-আর্থিক সমস্যা বিষয়ে প্রবন্ধ যেমন আছে তেমনই সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি-গান নিয়ে বিস্তর বাংলা প্রবন্ধের আংশিক প্রতিনিধিত্ব এতে রয়েছে। আছে ভাষা ও ছন্দ বা বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ। বিষয়গত বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতার এই চরিত্রটি বোধহয় খানিকটা আন্দাজ করা যাবে যদি ভাগগুলি আরেকটু খুলে বলি। হিসেবটা এরকম : সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে চব্বিশটি প্রবন্ধ, সমাজ-ইতিহাস-রাজনীতি প্রসঙ্গে আটটি রচনা, জাতি-ধর্মসম্প্রদায়-সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে ছয়টি নিবন্ধ, মার্কসবাদ সংক্রান্ত চিন্তা বিষয়ে তিনটি, নারী-সমস্যা বা নারী-মুক্তি নিয়ে চিন্তা চারটি, ভাষা প্রসঙ্গে তিনটি (অবশ্য সুকুমার রায়ের 'ভাষার অত্যাচার' নামে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধে দার্শনিকতার যে প্রাবল্য, তার মধ্যে যে সাহিত্যচ্ছটা, সেটি এক স্বতন্ত্র বর্গে চিহ্নিত করাই বোধহয় ঠিক।), শিল্প ও গান প্রসঙ্গে পাঁচটি, বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে চারটি এবং অর্থনীতি বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ।

যে-কোনো ব্যাপারেই বর্গীকরণের ক্ষেত্রে এক সাধারণ সমস্যা আছে। পরস্পর-সংলগ্ন বিষয়গুলির সঠিক বর্গ চিহ্নিত করা কঠিন অথবা যে নিয়মে বর্গীকরণ হল তাতে দুই বা ততোধিক বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক বা সংলগ্নতার চরিত্র ঢাকা পড়ে যায়। এ-ক্ষেত্রেও সেই সমস্যা থেকে গেল নিশ্চয়ই। সাহিত্য বর্গভুক্ত কোনো এক বিশেষ প্রবন্ধে সমাজ-রাজনীতির

তীব্র প্রকোপ ঘটতে পারে, প্রবন্ধের বিবেচ্য বিষয় নাই হতে পারে একান্তভাবে সাহিত্যধর্মী। অথবা ভাষাসমস্যার আলোচনায় অনিবার্যতই আসে রাজনীতি-প্রসঙ্গ বা সাম্প্রদায়িকতার ভেদ-নীতি। প্রশ্ন তুলতেই পারেন কেউ কেন একে রাজনীতি বা সাম্প্রদায়িকতার বর্গভুক্ত করব না। এই কূট প্রশ্নগুলি আদৌ অবান্তর নয়, তা সত্ত্বেও ব্যবহারিক কাজ চালাবার জন্য আমাদের ভাবতে হয় বিভক্তিকরণ বা বর্গীকরণের কথা, তা যতই আপাত-সত্য হোক না কেন। সংকলনভুক্ত প্রবন্ধগুলিকে এই নানা বর্গে বিভক্ত করার ফলে একটি জিনিস কিন্তু স্পষ্টতা পায় যে, সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধের তুলনায় সাহিত্যেতর বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। বস্তুত উনিশ শতক নিয়ে গড়ে ওঠা প্রথম খণ্ডটিতেও এই একই ছবি। এটা ঘটেছে সম্পাদকীয় পক্ষপাতিত্বের কারণেই, বিষয়গত বৈচিত্র্য দুশ বছর ধরে বাংলা প্রবন্ধকে কতোখানি সমৃদ্ধ করেছে সেটি ব্যক্ত করার প্রয়াসই রয়েছে আমাদের এই প্রবন্ধ-নির্বাচনে।

বাংলা প্রবন্ধে বিষয়-বিচিত্রতার প্রকাশ ঘটেছিল উনিশ শতকেই, বিশ শতকে এসে তার ব্যাপ্তি বহুগুণে বেড়েছে। ধর্ম-সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি এবং সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে উনিশ শতকের বাঙালি প্রাবন্ধিকেরা যে-ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন তার এক সার্থক বিস্তার বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধে। ঐতিহ্যের এই ক্রমিক বিস্তারের পাশাপাশি যুগ-পরিবর্তনের ফলে সঞ্জাত নব্য-আধুনিকতার প্রকাশও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, রীতি-প্রকরণ, আঙ্গিক কিংবা দর্শনের যেমন প্রতিষ্ঠা ঘটেছে, এসেছে নতুন নতুন বিষয়। যেমন, বিশ শতকে প্রবন্ধচর্চার এক বিশেষ বিষয় মার্কসবাদ। ১৯৩০-এর যুগ থেকে বহু প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে এলো মার্কসবাদ, বিষয়বস্তুও হল মার্কসবাদী সাহিত্য ও দর্শন। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এই মার্কসবাদী আলোড়ন এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। বাংলা প্রবন্ধ-নিবন্ধে তার বর্ণাঢ্য প্রতিফলন। এরই পাশাপাশি, কিছু আগে থেকে, ১৯২০-এর যুগে আমাদের প্রবন্ধসাহিত্যে তর্ক জমে উঠেছিল শিল্প সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্ন অথবা সাহিত্যে বাস্তবতা বা বস্তুতান্ত্রিকতা নিয়ে তোলপাড় বিতর্ক। বিপিনচন্দ্র পাল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারী প্রাবন্ধিকদের বিতর্কের কথা নিশ্চয়ই মনে পড়বে পাঠকের। আর রবীন্দ্রোত্তর নব্য আধুনিকদের মহলে যে দার্শনিক প্রতর্ক স্থান করে নিল অচিরেই তা হল ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদ। গল্প-উপন্যাস-কবিতায় তো বটেই বাংলা প্রবন্ধের সিংহভাগ জুড়ে তা পরিব্যাপ্ত হল। বিশ শতকের প্রথম অর্ধাংশে এইসব আলোচনা-প্রত্যালোচনা যে কতোটাই বর্ণময় হয়ে উঠেছিল প্রাবন্ধিকমহলে তার কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যাবে এই সংকলনে।

কেবল আধুনিকতা নয়, বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি সমাজে এক বড়ো প্রশ্ন ছিল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলা। বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রগতিবাদীরা গড়ে তুলেছিলেন বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলন। কাজি আবদুল ওদুদ, আবুল ফজল, রেজাউল করিমের মত মানুষেরা ছিলেন তার প্রবক্তা। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন গুরুত্বময় প্রবন্ধ। এই জটিল সাম্প্রদায়িকতার আবর্তেই জাতিগঠনের চিন্তা, ভাষা সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলির জোরদার প্রতাপ ছিল। এই ধারার নিবৃত্তি ঘটে গেছে এখন তা অবশ্যই বলা যাবে না, বরং সমস্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে গোটা বিশ শতক জুড়েই এইসব লেখাপত্রের

নানান মাত্রা দিন দিন তৈরি হয়েছে। নতুন নতুন ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। ইতিহাসগত বিচারে সাম্প্রদায়িকতা, জাতি গঠনের সমস্যা, ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি-চেতনা সবকিছুই তৈরি হয়েছিল উনিশ শতকের শেষে, কিন্তু গত শতকে এগুলির রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক গুরুত্ব এতোটাই বৃদ্ধি পেল যে বাঙালি ভাবুকেরা নানাদিক থেকে তার চর্চার প্রয়োজন অনুভব করেছেন এবং আমাদের প্রবন্ধসম্ভারে তার বিচিত্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। মননে ও দর্শনেও ছিল বিচিত্রতা — একদিকে উদার জাতীয়তাবাদী চিন্তার যেমন প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি এক বড়ো অংশে ছিল মার্কসপন্থী দর্শনের তাৎপর্যময় প্রাবল্য।

বিশ শতকের প্রাবন্ধিকদের একাংশে নারীমুক্তির ভাবনাও প্রবল হয়ে উঠতে চেয়েছে। শতকের শুরুতে ছিল তা একরকম, দিন যত এগিয়েছে নারীমুক্তির চিন্তা-চেতনা ক্রমে এক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। মেয়েদের সমস্যা নিয়ে ভাবিত ছিলেন উনিশ শতকের মনীষীরাও। বস্তুত নারীসমস্যাই ছিল উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় বিষয়। এই প্রশ্নকে ঘিরে প্রবন্ধ-নিবন্ধ চর্চার শুরু রামমোহনের কাল থেকেই — বস্তুত সেই চর্চাই ছিল আন্দোলনের এক মস্ত হাতিয়ার। একালের প্রবন্ধচর্চাতেও সেই ঐতিহ্যের অপার বিস্তার। মধ্য-উনিশ শতকে পশ্চিমি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটেছিল বাঙালি চিন্তকমহলে তাৎপর্যপূর্ণভাবে। বিজ্ঞানচর্চার চেতনা, বস্তুবাদী দার্শনিকতা, নৈর্ব্যক্তিক যুক্তিবাদের সমৃদ্ধ চেতনা দেখা গিয়েছিল উনিশ শতকের অনেক মনীষীর মধ্যেই। বিশেষত বিজ্ঞানচর্চায় মেতে উঠেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, তাঁর দার্শনিকতায় দেখা গেল বস্তুবাদী ঝোঁক প্রবলভাবে, পরবর্তীকালে এই বিজ্ঞানচর্চার ধারায় যুক্ত হলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মত মানুষেরা। জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা একটা বিশেষ ঘটনাই হয়ে উঠেছিল। বিশ শতকে সে আন্দোলনে গতি নিয়ে এলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা ছিল সত্যেন্দ্রনাথের এক সাংস্কৃতিক অভিযান। এই সংকলনের সীমিত পরিসরে সরাসরি তিনটি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়া আমরা পাশাপাশি রেখেছি পাভলত অনুপ্রাণিত মার্কসবাদী মনোবিদ্ ড. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এলিয়েনেশন সংক্রান্ত এক গুরুত্বময় প্রবন্ধ।

বাংলায় অর্থনীতি চর্চার চল বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যাপকতা পেয়েছে, বিশেষত স্বাধীনতার পরবর্তীকালে। এর আগে বিনয়কুমার সরকারদের প্রচেষ্টায় অর্থনীতিচর্চা কিছু কিছু ছিল বটে তবে তার ব্যাপকতা ছিল না তেমন। তারও আগে রমেশচন্দ্র দত্ত বা সখারাম গণেশ দেউস্করদের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল। ছিল সমবায় নীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবত স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক রচনাসমূহ। যে-কালসীমার মধ্যে আমাদের এই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবন্ধাবলি নির্বাচিত হয়েছে, সেই পর্বের এক বিশেষ নাম অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত। অর্থনীতির মত এক আধুনিক সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে চর্চা করতে গিয়ে পরিভাষা-কণ্টকিত না করে স্বাদু প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি যে দৃষ্টান্তগুলি স্থাপন করেছেন, তা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। আর সারা জীবন ধরে বাংলা ভাষায় অর্থনীতি চর্চা করেছেন অতুল সুর। তথ্যভারাক্রান্ত হলেও তাঁর মুন্সিয়ানা কম নয়।

শিল্প-গান-ছবি নিয়ে প্রবন্ধচর্চা উনিশ শতকের বৈশিষ্ট্য তেমন নয়, এর সূত্রপাত ও বিস্তার

ঘটেছে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিশ শতকে। নানা দিক থেকে এসব বিষয়ে আলো এসে পড়েছে। আমাদের এই সংকলনে শিল্প ও গান নিয়ে আছে গোটা চার-পাঁচ প্রবন্ধ, তবে ছবি (Painting) নিয়ে নেই একটিও, নেই নাটক চলচ্চিত্র বিষয়ে কোনো প্রবন্ধ। তৃতীয় খণ্ডে সেসব বিষয় এসে যাবে অবধারিতভাবে। কারণ ছবি-নাটক-যাত্রা-চলচ্চিত্র নিয়ে বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে আজ পর্যন্ত যে অগণ্য লেখালিখির চর্চা প্রাবন্ধিক-মহলে তাও এক বিশেষ যুগের সমাগমকে চিহ্নিত করে। তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই পরবর্তী খণ্ডে।

এইসব নাগরিক শিল্প-সাহিত্যের পাশাপাশি আমাদের প্রবন্ধ-সাহিত্যের ইতিহাসে তৈরি হয়েছে লোকসাহিত্য ও লোকশিল্প-লোকগান নিয়ে বিপুল চেতনা। বিশ শতকের প্রবন্ধ নিয়ে তৃতীয় খণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই সেসব লেখাও।

এই প্রকল্পের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লেখা হয়েছিল, 'যে-কোনো সংকলন সীমাবদ্ধ পরিসরে সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাথমিক নির্বাচন হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া গতি নেই। যে প্রবন্ধগুলি গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলি বর্জন করে আর এক প্রস্থ প্রবন্ধ নির্বাচন করা সম্ভব। অন্যদিকে উনিশ শতকে যাঁরা প্রবন্ধ লিখেছেন, তাঁদের সকলের লেখা সংকলনে স্থান পায়নি। তবে যাঁদের প্রবন্ধ গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁরা কোনো-না-কোনো দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় স্থানের অধিকারী।'

উনিশের জায়গায় বিশ এইটুকুই পরিবর্তন করব, আর কোনো কথার হেরফের ঘটেনি।

অভ্র ঘোষ

হিন্দু-মুসলমান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল সমাজের ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত এক মহাজাতিকে জাগিয়ে তুলে তার একচ্ছত্র আসন রচনা করব বলে দেশনেতারা পণ করেছেন।

ঐ আসন জিনিসটা, অর্থাৎ যাকে বলে কন্‌স্‌টিট্যুশ্যন, ওটা বাইরের, রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থায় আমাদের পরস্পরের অধিকারনির্ণয় দিয়ে সেটা গড়েপিটে তুলতে হবে। তার নানা রকমের নমুনা নানা দেশের ইতিহাসে দেখেছি, তারই থেকে যাচাই বাছাই করে প্ল্যান ঠিক করা চলছে। এই ধারণা ছিল, ওটাকে পাকা করে খাড়া করবার বাধা বাইরে, অর্থাৎ বর্তমান কর্তৃপক্ষদের ইচ্ছার মধ্যে। তারই সঙ্গে রফা করবার, তকরার করবার কাজে কিছুকাল থেকে আমরা উঠে পড়ে লেগেছি।

যখন মনে হল কাজ এগিয়েছে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে দেখি, মস্ত বাধা নিজেদের মধ্যেই। গাড়িটাকে তীর্থে পৌঁছে দেবার প্রস্তাবে সারথি যদি বা আধ-রাজি হল ওটাকে আস্তাবল থেকে ঠেলে বের করবার সময় হুঁশ হল — এক্কা গাড়িটার দুই চাকায় বিপরীত রকমের অমিল, চালাতে গেলেই উলটে পড়বার জো হয়।

যে বিরুদ্ধ মানুষটার সঙ্গে আমাদের বাইরের সম্বন্ধ, বিবাদ করে এক দিন তাকে হটিয়ে বাহির করে দেওয়া দুঃসাধ্য হলেও নিতান্ত অসাধ্য নয়, সেখানে আমাদের হার জিতের মামলা। কিন্তু ভিতরের লোকের বিবাদে কোনো এক পক্ষ জিতলেও মোটের উপর সেটা হার, আর হারলেও শান্তি নেই। কোনো পক্ষকে বাদ দেবারও জো নেই, আবার দাবিয়ে রাখতে গেলেও উৎপাতকে চিরকাল উত্তেজিত করে রাখাই হবে। ডান পাশের দাঁত বাঁ পাশের দাঁতকে নড়িয়ে দিয়ে যদি বড়াই করতে চায় তবে অবশেষে নিজে অনড় থাকবে না।

এতদিন রাষ্ট্রসভায় বরসজ্জাটার পরেই একান্ত মন দিয়েছিলুম, আসনটা কেমন হবে এই কথা ভেবেই মুগ্ধ। ওটা মহামূল্য ও লোভনীয়। প্রতিবেশীরা যারা কিংখাবের আসন বানিয়েছে তাদের আসরের ঘটা দেখে ঈর্ষা হয়। কিন্তু হায় রে, স্বয়ং বরকে বরণ করবার আন্তরিক আয়োজন বহুকাল থেকে ভুলেই আছি। আজ তাই পণ নিয়ে বরযাত্রীদের লড়াই বাধে। শুভকর্মে অশুভগ্রহের শান্তির কথাটায় প্রথম থেকেই মন দিই নি, কেবল আসনটার মালমসলার ফর্দ নিয়ে বেলা বইয়ে দিয়েছি।

রাষ্ট্রিক মহাসন নির্মাণের চেয়ে রাষ্ট্রিক মহাজাতি-সৃষ্টির প্রয়োজন আমাদের দেশে অনেক বড়ো এ কথা বলা বাহুল্য। সমাজে ধর্মে ভাষায় আচারে আমাদের বিভাগের অন্ত নেই। এই বিদীর্ণতা আমাদের রাষ্ট্রিক সম্পূর্ণতার বিরোধী; কিন্তু তার চেয়ে অশুভের কারণ

এই যে, এই বিচ্ছেদে আমাদের মনুষ্যত্বসাধনার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। মানুষে মানুষে কাছাকাছি বাস করে তবু কিছুতে মনের মিল হয় না, কাজের যোগ থাকে না, প্রত্যেক পদে মারামারি কাটাকাটি বেধে যায় — এটা বর্বরতার লক্ষণ। অথচ আমরা যে আত্মশাসনের দাবি করছি সেটা তো বর্বরের প্রাপ্য নয়। যাদের ধর্মে সমাজে প্রথায়, যাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে, এমন একটা মজ্জাগত জোড়ভাঙানো দুর্যোগ আছে যে তারা কথায় কথায় একখানাকে সাতখানা করে ফেলে, সেই ছত্রভঙ্গের দল ঐকরাষ্ট্রিক সত্তাকে উদ্ভাবিত করবে কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে?

যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে?

ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেছে, যখন কোনো মহাজাতি নবজীবনের প্রেরণায় রাষ্ট্রবিপ্লব প্রবর্তন করেছে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার ধর্মবিদ্বেষ। দেড় শত বৎসর পূর্বকার ফরাসি বিপ্লবে তার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সোভিয়েট রাশিয়া প্রচলিত ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর। সম্প্রতি স্পেনেও এই ধর্মহননের আগুন উদ্দীপ্ত। মেক্সিকোয় বিদ্রোহ বারে বারে রোমক চার্চকে আঘাত করতে উদ্যত।

নব্য তুর্কী যদিও প্রচলিত ধর্মকে উন্মূলিত করে নি কিন্তু বলপূর্বক তার শক্তি হ্রাস করেছে। এর ভিতরকার কথাটা এই যে, বিশেষ ধর্মের আদিপ্রবর্তকগণ দেবতার নামে মানুষকে মেলাবার জন্যে, তাকে লোভ দ্বেষ অহংকার থেকে মুক্তি দেবার জন্যে, উপদেশ দিয়েছিলেন। তার পরে সম্প্রদায়ের লোক মহাপুরুষদের বাণীকে সংঘবদ্ধ করে বিকৃত করেছে সংকীর্ণ করেছে; সেই ধর্ম দিয়ে মানুষকে তারা যেমন ভীষণ মার মেরেছে এমন বিষয়বুদ্ধি দিয়েও নয়: মেরেছে প্রাণে মানে বুদ্ধিতে শক্তিতে, মানুষের মহোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যকে ছারখার করেছে। ধর্মের নামে পুরাতন মেক্সিকোর স্পেনীয় খ্রিস্টানদের অকথ্য নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই। পৃথিবীতে অপ্রতিহত প্রভুত্ব নিয়ে রাজা যেমন কতবার দুর্দান্ত অরাজকতায় মত্ত হয়েছে, প্রজার রক্ষাকর্তা নাম নিয়ে প্রজার সর্বনাশ করতে কুণ্ঠিত হয় নি, এবং অবশেষে সেই কারণেই আজকের ইতিহাসে রাজ্য থেকে রাজার কেবলই বিলুপ্তি ঘটছে, ধর্ম সম্বন্ধেও অনেক স্থলে সেই একই কারণে ধর্মতন্ত্রের নিদারুণ অধার্মিকতা দমন করবার জন্যে, মানুষকে ধর্মপীড়া থেকে বাঁচাবার জন্যে, অনেক বার চেষ্টা দেখা গেল। আজ সেই সেই দেশেই প্রজা যথার্থ স্বাধীনতা পেয়েছে যে দেশে ধর্মমোহ মানুষের চিত্তকে অভিভূত করে এক-দেশবাসীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঔদাসীন্য বা বিরোধকে নানা আকারে ব্যাপ্ত করে না রেখেছে।

হিন্দুসমাজে আচার নিয়েছে ধর্মের নাম। এই কারণে আচারের পার্থক্যে পরস্পরের মধ্যে কঠিন বিচ্ছেদ ঘটায়। মৎস্যাশী বাঙালিকে নিরামিষ প্রদেশের প্রতিবেশী আপন বলে মনে করতে কঠিন বাধা পায়। সাধারণত বাঙালি অন্য প্রদেশে গিয়ে অভ্যস্ত আচারের ব্যতিক্রম উপলক্ষে অবজ্ঞা মনের মধ্যে পোষণ করে। যে চিত্তবৃত্তি বাহ্য আচারকে অত্যন্ত

বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে তার মমত্ববোধ সংকীর্ণ হতে বাধ্য। রাষ্ট্রসম্মিলনীতেও এই অভাব কথায় কথায় ধরা পড়ে এবং দেখা যায় — আমরা যে অলক্ষ্য ব্যবধান সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াই তা সংস্কারগত, অতি সূক্ষ্ম এবং সেইজন্য অতি দুর্লঙ্ঘ্য। আমরা যখন মুখে তাকে অস্বীকার করি তখনো নিজের অগোচরেও সেটা অন্তঃকরণের মধ্যে থেকে যায়। ধর্ম আমাদের মেলাতে পারে নি, বরঞ্চ হাজারখানা বেড়া গড়ে তুলে সেই বাধাগুলোকে ইতিহাসের অতীত শাশ্বত বলে পাকা করে দিয়েছে। ইংরেজ নিজের জাতকে ইংরেজ বলেই পরিচয় দেয়। যদি বলত খ্রিস্টান তা হলে যে ইংরেজ বৌদ্ধ বা মুসলমান বা নাস্তিক তাকে নিয়ে রাষ্ট্রগঠনে মাথা-ঠোকাঠুকি বেধে যেত। আমাদের প্রধান পরিচয় হিন্দু বা মুসলমান। এক দলকে বিশেষ পরিচয়কালে বলি বটে হিন্দুস্থানি কিন্তু তাদের হিন্দুস্থান বাংলার বাইরে।

কয়েক বছর পূর্বে আমার ইংরেজ বন্ধু এন্‌ড্রুজকে নিয়ে মালাবারে ভ্রমণ করছিলুম। ব্রাহ্মণপল্লির সীমানায় পা বাড়াতেই টিয়া-সমাজ-ভুক্ত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে দৌড় দিলেন। এন্‌ড্রুজ বিস্মিত হয়ে তাঁকে গিয়ে ধরলেন, এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে জানলেন, এ পাড়ায় তাঁদের জাতের প্রবেশ নিষেধ। বলা বাহুল্য, হিন্দুসমাজবিধি অনুসারে এন্‌ড্রুজের আচারবিচার টিয়া-ভদ্রলোকের চেয়ে অনেক গুণে অশাস্ত্রীয়। শাসনকর্তার জাত বলে তাঁর জোর আছে, কিন্তু হিন্দু বলে হিন্দুর কাছে আত্মীয়তার জোর নেই। তার সম্বন্ধে হিন্দুর দেবতা পর্যন্ত জাত বাঁচিয়ে চলেন, স্বয়ং জগন্নাথ পর্যন্ত প্রত্যক্ষদর্শনীয় নন। বৈমাত্র সন্তানও মাতার কোলের অংশ দাবি করতে পারে — ভারতে বিশ্বমাতার কোলে এত ভাগ কেন? অনাত্মীয়তাকে অস্থিমজ্জায় আমরা সংস্কারগত করে রেখেছি, অথচ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তাদের আত্মীয়তা না পেলে আমরা বিস্মিত হই। শোনা গিয়েছে, এবার পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও হিন্দুর প্রতি উৎপাতে নমঃশূদ্ররা নির্দয়ভাবে মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ভাবতে হবে না কি, ওদের দরদ হল না কেন, আত্মীয়তার দায়িত্বে বাধা পড়ল কোথায়?

এই অনাত্মীয়তার অসংখ্য অন্তরাল বহু যুগ ধরে প্রকাশ্যে আমাদের রাষ্ট্রভাগ্যকে ব্যর্থ করেছে এবং আজও ভিতরে ভিতরে আমাদের দুঃখ ঘটাচ্ছে। জোর গলায় যেখানে বলছি, আমরা এক, সূক্ষ্ম সুরে সেখানে অন্তর্যামী আমাদের মর্মস্থানে বসে বলছেন, 'ধর্মে-কর্মে আচারে-বিচারে এক হবার মতো ঔদার্য তোমাদের নেই।' এর ফল ফলছে; আর রাগ করছি ফলের উপরে, বীজবপনের উপরে নয়।

যখন বঙ্গবিভাগের সাংঘাতিক প্রস্তাব নিয়ে বাঙালির চিত্ত বিক্ষুব্ধ তখন বাঙালি অগত্যা বয়কট-নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছিল। বাংলার সেই দুর্দিনের সুযোগে বোম্বাই মিলওয়ালা নির্মমভাবে তাঁদের মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে তুলে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টাকে প্রতিহত করতে কুণ্ঠিত হন নি। সেই সঙ্গে দেখা গেল, বাঙালি মুসলমান সে দিন আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। সেই যুগেই বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমানে লজ্জাজনক কুৎসিত কাণ্ডের সূত্রপাত হল। অপরাধটা প্রধানত কোন্ পক্ষের এবং এই উপদ্রব অকস্মাৎ কোথা থেকে উৎসাহ পেলে, সে তর্কে প্রয়োজন নেই। আমাদের চিন্তা করবার বিষয়টা হচ্ছে এই

যে, বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলে বাঙালিজাতের মধ্যে যে পঙ্গুতার সৃষ্টি হত সেটা বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের এবং বস্তুত সমস্ত ভারতবর্ষেরই পক্ষে অকল্যাণকর, এটা যথার্থ দরদ দিয়ে বোঝবার মতো একাত্মকতা আমাদের নেই বলে সেদিন বাঙালি হিন্দুর বিরুদ্ধে অনাত্মীয় অসহযোগিতা সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্র প্রতিমার কাঠামো গড়বার সময় এ কথাটা মনে রাখা দরকার। নিজেকে ভোলানোর ছলে বিধাতাকে ভোলাতে পারব না।

এই ব্যাপারে সেদিন অনেকেই রাগারাগি করেছিলেন। কিন্তু ফুটো কলসিতে জল তুলতে গেলে জল যে পড়ে যায়, তা নিয়ে জলের উপরে বা কলসির উপরে চোখ রাঙিয়ে লাভ কী? গরজ আমাদের যতই থাক্, ছিদ্রটা স্বভাবত ছিদ্রের মতোই ব্যবহার করবে। কলঙ্ক আমাদেরই আর সে কলঙ্ক যথাসময়ে ধরা পড়বেই, দৈবের কৃপায় লজ্জানিবারণ হবে না।

কথা হয়েছে, ভারতবর্ষে একরাষ্ট্রশাসন না হয়ে যুক্তরাষ্ট্রশাসননীতির প্রবর্তন হওয়া চাই। অর্থাৎ একেবারে জোড়ের চিহ্ন থাকবে না এতটা দূর মিলে যাবার মতো ঐক্য আমাদের দেশে নেই, এ কথাটা মেনে নিতে হয়েছে। আমাদের রাষ্ট্র-সমস্যার এ একটা কেজো রকমের নিষ্পত্তি বলে ধরে নেওয়া যাক। কিন্তু তবু একটা কঠিন গ্রন্থি রয়ে গেল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ ও বিরোধ। এই বিচ্ছেদটা নানা কারণে আন্তরিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে রাষ্ট্রনৈতিক প্রলেপ দিয়ে এর ফাটল নিবারণ করা চলবে না; কোনো কারণে একটু তাপ বেড়ে উঠলেই আবার ফাটল ধরবে।

যেখানে নিজেদের মধ্যে সত্যকার ভেদ সেখানেই রাষ্ট্রিক ক্ষমতার হিস্যা নিয়ে স্বতন্ত্র কোঠায় স্বতন্ত্র হিসাব চলতে থাকে। সেখানে রাষ্ট্রিক সম্পদে সকলেরই অখণ্ড স্বার্থের কথাটা স্বভাবতই মনে থাকে না। এমন দুর্গ্রহে একই গাড়িকে দুটো ঘোড়া দু দিকে টানবার মুশকিল বাধায়। এখন থেকেই অধিকারের ভাগ-বখরা নিয়ে হট্টগোল জেগেছে। রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়বুদ্ধির যোগে গোল-টেবিল পেরিয়েও এই গোল উত্তরোত্তর বাড়বে বৈ কমবে এমন আশা আছে কি? বিষয়-বুদ্ধির আমলে সহোদর ভাইদের মধ্যেও বচসা বেধে যায়। শেষকালে গুণ্ডাদের হাতেই লাঠিসড়কির যোগে যমের দ্বারে চরম নিষ্পত্তির ভার পড়ে।

এক দল মুসলমান সম্মিলিত নির্বাচনের বিরুদ্ধে, তাঁরা স্বতন্ত্র নির্বাচনরীতি দাবি করেন এবং তাঁদের পক্ষের ওজন ভারী করবার জন্যে নানা বিশেষ সুযোগের বাটখারা বাড়িয়ে নিতে চান। যদি মুসলমানদের সবাই বা অধিকাংশ একমত হয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচনরীতির দাবি করেন, এবং নিজেদের পক্ষের ওজন বাড়িয়ে নিতে চান, তা হলে এমনতরো দাবি মেনে নিয়েও আপস করতে মহাত্মাজি রাজি আছেন বলে বোধ হল। তা যদি হয়, তাঁর প্রস্তাব মাথা পেতে নেওয়াই ভালো। কেননা, ভারতবর্ষের তরফে রাষ্ট্রিক যে অধিকার আমাদের জয় করে নিতে হবে তার সুস্পষ্ট মূর্তি এবং সাধনার প্রণালী সমগ্রভাবে তাঁরই মনে আছে। এ পর্যন্ত একমাত্র তিনিই সমস্ত ব্যাপারটাকে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে প্রবল বাধার বিরুদ্ধে অগ্রসর করে এনেছেন। কাজ-উদ্ধারের দিকে দৃষ্টি রাখলে শেষ পর্যন্ত তাঁরই হাতে সারথ্যভার দেওয়া সংগত। তবু, এক জনের বা এক দলের ব্যক্তিগত সহিষ্ণুতার প্রতি নির্ভর করে এ কথা ভুললে চলবে না যে, অধিকার পরিবেশণে কোনো এক পক্ষের প্রতি যদি পক্ষপাত করা হয় তবে সাধারণ মানবপ্রকৃতিতে সেই অবিচার সইবে না, এই নিয়ে একটা অশান্তি নিয়তই

মারমুখো হয়ে থেকে যাবে। বস্তুত এটা পরস্পরের বিবাদ মেটাবার পন্থা নয়। সকলেই যদি একজোট হয়ে প্রসন্নমনে একঝোঁকা আপস করতে রাজি হয় তা হলে ভাবনা নেই। কিন্তু মানুষের মন! তার কোনো একটা তারে যদি অত্যন্ত বেশি টান পড়ে তবে সুর যায় বিগড়ে, তখন সংগীতের দোহাই পাড়লেও সংগত মাটি হয়। ঠিক জানি না, কী ভাবে মহাত্মাজি এ সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। হয়তো গোলটেবিল বৈঠকে আমাদের সম্মিলিত দাবির জোর অক্ষুণ্ণ রাখাই আপাতত সব চেয়ে গুরুতর প্রয়োজন বলে তাঁর মনে হতে পারে। দুই পক্ষই আপন আপন জিদে সমান অটল হয়ে বসলে কাজ এগোবে না, এ কথা সত্য। এ ক্ষেত্রে এক পক্ষে ত্যাগ স্বীকার করে মিটমাট হয়ে গেলে উপস্থিত রক্ষা হয়। একেই বলে ডিপ্লোম্যাসি। পলিটিক্‌সে প্রথম থেকেই ষোলো-আনা প্রাপ্যের উপর চেপে বসলে ষোলো আনাই খোওয়াতে হয়। যারা অদূরদর্শী কৃপণের মতো অত্যন্ত বেশি টানাটানি না করে আপস করতে জানে তারাই জেতে। ইংরেজের এই গুণ আছে, নৌকাডুবি বাঁচাতে গিয়ে অনেকটা মাল ইংরেজ জলে ফেলে দিতে পারে। আমার নিজের বিশ্বাস, বর্তমান আপসের প্রস্তাবে ইংরেজের কাছে আমরা যে প্রকাণ্ড ক্ষতিস্বীকার দাবি করছি সেটা য়ুরোপের আর-কোনো জাতির কাছে একেবারেই খাটত না, তারা আগাগোড়াই ঘুষি উঁচিয়ে কথাটা সম্পূর্ণ চাপা দেবার চেষ্টা করত। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে ইংরেজের সুবুদ্ধি বিখ্যাত; ইংরেজ সবখানির দিকে তাকিয়ে অনেকখানি সহ্য করতে পারে। এই বুদ্ধির প্রয়োজন যে আমাদের নেই, এ কথা গোঁয়ারের কথা; আখেরে গোঁয়ারের হার হয়ে থাকে। রাষ্ট্রিক অধিকার সম্বন্ধে একগুঁয়েভাবে দর-কষাকষি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে মন-কষাকষিকে অত্যন্ত বেশি দূর এগোতে দেওয়া শত্রুপক্ষের আনন্দবর্ধনের প্রধান উপায়।

আমার বক্তব্য এই যে, উপস্থিত কাজ উদ্ধারের খাতিরে আপাতত নিজের দাবি খাটো করেও একটা মিটমাট করা সম্ভব হয় তো হোক, কিন্তু তবু আসল কথাটাই বাকি রইল। পলিটিক্‌সের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যেটুকু তালি দেওয়া মিল হতে পারে সে মিলে আমাদের চিরকালের প্রয়োজন টিকবে না। এমন-কি পলিটিক্‌সেও এ তালিটুকু বরাবর অটুট থাকবে এমন আশা নেই, ঐ ফাঁকির জোড়টার কাছে বারে বারেই টান পড়বে। যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব। আমাদের মিলতে হবে সেই গোড়ায়, নইলে কিছুতে কল্যাণ নেই

এতদিন সেই গোড়ার দিকে এক রকমের মিল ছিল। পরস্পরের তফাত মেনেও আমরা পরস্পর কাছাকাছি ছিলুম সম্প্রদায়ের গণ্ডির উপর ঠোকর খেয়ে পড়তে হত না, সেটা পেরিয়েও মানুষে মানুষে মিলের যথেষ্ট জায়গা ছিল। হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল, দুই পক্ষই আপন ধর্মের অভিমানকে উঁচিয়ে তুলতে লেগেছে। যত দিন আমাদের মধ্যে ধর্মবোধ সহজ ছিল তত দিন গোঁড়ামি থাকা সত্ত্বেও কোনো হাঙ্গামা বাধে নি। কিন্তু এক সময়ে যে কারণেই হোক ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করলে। আমরাও মসজিদের সামনে দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময় কিছু অতিরিক্ত জিদের সঙ্গে ঢাকে কাঠি দিলুম, অপর পক্ষেও কোরবানির উৎসাহ পূর্বের চেয়ে কোমর বেঁধে বাড়িয়ে তুললে, সেটা আপন আপন ধর্মের দাবি

মেটাবার খাতির নিয়ে নয়, পরস্পরের ধর্মের অভিমানকে আঘাত দেবার স্পর্ধা নিয়ে। এই সমস্ত উৎপাতের শুরু হয়েছে শহরে, যেখানে মানুষে মানুষে প্রকৃত মেলামেশা নেই বলেই পরস্পরের প্রতি দরদ থাকে না।

ধর্মমত ও সমাজরীতির সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে, এ কথা মানতেই হবে। অতএব আমাদের সাধনার বিষয় হচ্ছে তৎসত্ত্বেও ভালো রকম করে মেলা চাই। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ আমাদের না হলে নয়। কিন্তু এর একান্ত আবশ্যকতার কথা আমাদের সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে আজও ভাবতে আরম্ভ করি নি। একদা খিলাফতের সমর্থন করে মহাত্মাজি মিলনের সেতু নির্মাণ করতে পারবেন মনে করেছিলেন। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। এটা গোড়াকার কথা নয়, এই খিলাফত সম্বন্ধে মতভেদ থাকা অন্যায় মনে করি নে, এমন-কি, মুসলমানদের মধ্যেই যে থাকতে পারে তার প্রমাণ হয়েছে।

নানা উপলক্ষে এবং বিনা উপলক্ষে সর্বদা আমাদের পরস্পরের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ আলাপ চাই। যদি আমরা পাশাপাশি চলি, কাছাকাছি আসি, তা হলেই দেখতে পাব, মানুষ বলেই মানুষকে আপন বলে মনে করা সহজ। যাদের সঙ্গে মেলামেশা নেই তাদের সম্বন্ধেই মত প্রভৃতির অনৈক্য অত্যন্ত কড়া হয়ে ওঠে, বড়ো হয়ে দেখা দেয়। যখনই পরস্পর কাছাকাছি আনাগোনার চর্চা হতে থাকে তখনই মত পিছিয়ে পড়ে, মানুষ সামনে এগিয়ে আসে। শান্তিনিকেতনে মাঝে মাঝে মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষক এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো প্রভেদ অনুভব করি নি, এবং সখ্য ও স্নেহসম্বন্ধ স্থাপনে লেশমাত্র বাধা ঘটে নি। যে-সকল গ্রামের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধ তার মধ্যে মুসলমান গ্রাম আছে। যখন কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা দূতসহযোগে কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে চলেছে, তখন বোলপুর অঞ্চলে মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র করা হয়েছিল যে, হিন্দুরা মসজিদ ভেঙে দেবার সংকল্প করছে। এই সঙ্গে কলকাতা থেকে গুণ্ডার আমদানিও হয়েছিল। কিন্তু, স্থানীয় মুসলমানদের শান্ত রাখতে আমাদের কোনো কষ্ট পেতে হয় নি, কেননা তারা নিশ্চিত জানত আমরা তাদের অকৃত্রিম বন্ধু।

আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোর্‌বানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সংগত বলে মনে করি নি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে, তারা তখন তা মেনে নিলে। আমাদের সেখানে এ পর্যন্ত কোনো উপদ্রব ঘটে নি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে আমার মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন।

এ কথা আশা করাই চলে না যে, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে ধর্মকর্মের মতবিশ্বাসের ভেদ একেবারেই ঘুচতে পারে। তবুও মনুষ্যত্বের খাতিরে আশা করতেই হবে, আমাদের মধ্যে মিল হবে। পরস্পরকে দূরে না রাখলেই সে মিল আপনিই সহজ হতে পারবে। সঙ্গের দিক থেকে আজকাল হিন্দু-মুসলমান পৃথক হয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যকে বাড়িয়ে তুলেছে, মনুষ্যত্বের মিলটাকে দিয়েছে চাপা। আমি হিন্দুর তরফ থেকেই

বলছি, মুসলমানের ত্রুটিবিচারটা থাক্, — আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্যে যেন লজ্জা স্বীকার করি। অল্প বয়সে যখন প্রথম জমিদারি সেরেস্তা দেখতে গিয়েছিলুম তখন দেখলুম, আমাদের ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে তক্তপোশে গদিতে বসে দরবার করেন সেখানে এক ধারে জাজিম তোলা, সেই জায়গাটা মুসলমান প্রজাদের বসবার জন্যে; আর জাজিমের উপর বসে হিন্দু প্রজারা। এইটে দেখে আমার ধিক্কার জন্মেছিল। অথচ এই ম্যানেজার আধুনিক দেশাত্মবোধী দলের। ইংরেজরাজের দরবারে ভারতীয়দের অসম্মান নিয়ে কটুভাষা ব্যবহার তিনি উপভোগ করে থাকেন, তবু স্বদেশীয়কে ভদ্রোচিত সম্মান দেবার বেলা এত কৃপণ। এই কৃপণতা সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে অনেক দূর পর্যন্ত প্রবেশ করেছে। অবশেষে এমন হয়েছে যেখানে হিন্দু সেখানে মুসলমানের দ্বার সংকীর্ণ, যেখানে মুসলমান সেখানে হিন্দুর বাধা বিস্তর। এই আন্তরিক বিচ্ছেদ যত দিন থাকবে তত দিন স্বার্থের ভেদ ঘুচবে না এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক পক্ষের কল্যাণভার অপর পক্ষের হাতে দিতে সংকোচ অনিবার্য হয়ে উঠবে। আজ সম্মিলিত নির্বাচন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব বেধে গেছে তার মূল তো এইখানেই। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে যখন আমরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠি তখন এর স্বাভাবিক কারণটার কথা ভেবে দেখি না কেন?

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অকথ্য বর্বরতা বারে বারে আমাদের সহ্য করতে হয়েছে। জার শাসনের আমলে এই রকম অত্যাচার রাশিয়ায় প্রায় ঘটত। বর্তমান বিপ্লবপ্রবণ পোলিটিক্যাল যুগের পূর্বে আমাদের দেশে এরকম দানবিক কাণ্ড কখনো শোনা যায় নি। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে বহু গৌরবের law and order পদার্থটা বড়ো বড়ো শহরে পুলিস-পাহারার জাগ্রত দৃষ্টির সামনে স্পর্ধাসহকারে উপরি উপরি অবমানিত হতে লাগল, ঠিক এই বিশেষ সময়টাতেই। মারের দুঃখ কেবল আমাদের পিঠের উপর দিয়েই গেল না, ওটা প্রবেশ করেছে বুকের ভিতরে। এটা এমন সময়ে ঘটল ঠিক যখন হিন্দু-মুসলমানে কণ্ঠ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারলে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হত, বিশ্বসভার কাছে আমাদের মাথা হেঁট হত না। এই রকমের অমানুষিক ঘটনায় লোকস্মৃতিকে চিরদিনের মতো বিষাক্ত করে তোলে, দেশের ডান হাতে বাঁ হাতে মিল করিয়ে ইতিহাস গড়ে তোলা দুঃসাধ্য হয়। কিন্তু, তাই বলেই তো হাল ছেড়ে দেওয়া চলে না; গ্রন্থি জটিল হয়ে পাকিয়ে উঠেছে বলে ক্রোধের বেগে সেটাকে টানাটানি করে আরো আঁট করে তোলা মূঢ়তা। বর্তমানের খাঁজে ভবিষ্যতের বীজটাকে পর্যন্ত অফলা করে ফেলা স্বাজাতিক আত্মহত্যার প্রণালী। নানা আশু ও সুদূর কারণে, অনেক দিনের পুঞ্জিত অপরাধে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনসমস্যা কঠিন হয়েছে; সেইজন্যেই অবিলম্বে এবং দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তার সমাধানে প্রবৃত্ত হতে হবে। অপ্রসন্ন ভাগ্যের উপর রাগ করে তাকে দ্বিগুণ হন্যে করে তোলা চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো।

বর্তমান রাষ্ট্রিক উদ্‌যোগে বোম্বাই প্রদেশে আন্দোলনের কাজটা সব চেয়ে সবেগে চলতে পেরেছিল তার অন্যতম কারণ, সেখানে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ বাধিয়ে দেবার উপকরণ যথেষ্ট ছিল না। পার্সিতে হিন্দুতে দুই পক্ষ খাড়া করে তোলা সহজ হয় নি। কারণ, পার্সি সমাজ সাধারণত শিক্ষিত সমাজ, স্বদেশের কল্যাণ সম্বন্ধে পার্সিরা বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা করতে

জানে, তা ছাড়া তাদেব মধ্যে ধর্মোন্মত্ততা নেই। বাংলাদেশে আমরা আছি জতুগৃহে, আগুন লাগাতে বেশিক্ষণ লাগে না। বাংলাদেশে পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যখনই নামি ঠিক সেই সময়টাতেই নিজের ঘর সাম্‌লানো অসাধ্য হয়ে ওঠে। এই দুর্যোগেব কারণটা আমাদের এখানে গভীর কবে শিকড় গেড়েছে, এ কথাটা মেনে নিতেই হবে। এ অবস্থায় শান্তমনে বুদ্ধিপূর্বক পরস্পবের মধ্যে সন্ধি-স্থাপনের উপায়-উদ্‌ভাবনে যদি আমরা অক্ষম হই, বাঙালি-প্রকৃতি-সুলভ হৃদয়াবেগের ঝোঁকে যদি কেবলই জেদ জাগিয়ে স্পর্ধা পাকিয়ে তুলি, তা হলে আমাদের দুঃখেব অন্ত থাকবে না এবং স্বাজাতিক কল্যাণের পথ একান্ত দুর্গম হয়ে উঠবে।

আমাদেব মধ্যে কেউ কেউ চোখ বুজে বলেন, সবই সহজ হযে যাবে যখন দেশটাকে নিজের হাতে পাব। অর্থাৎ নিজের বোঝাকে অবস্থা পবিবর্তনের কাঁধে চাপাতে পারব এই ভরসায় নিশ্চেষ্ট থাকবার এই ছুতো। কথাটা একটু বিচার করে দেখা যাক।

ধরে নেওয়া গেল গোল বৈঠকের পরে দেশের শাসনভার আমরাই পাব। কিন্তু দেশটাকে হাত-ফেরাফেরি কববার মাঝখানে একটা সুদীর্ঘ সন্ধিক্ষণ আছে। সিভিল-সার্ভিসেব মেয়াদ কিছুকাল টিকে থাকতে বাধ্য। কিন্তু, সেইদিনকার সিভিল-সার্ভিস হবে ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো। মন তার গরম হয়ে থাকবাব কথা। সেই সময়টুকুর মধ্যে দেশের লোক এবং বিদেশের লোকের কাছে কথাটা দেগে দেগে দেওয়া তার পক্ষে দরকার হবে যে, ব্রিটিশরাজের পাহারা আলগা হবামাত্রই অরাজকতার কালসাপ নানা গর্ত থেকে বেরিয়ে চারিদিকেই ফণা তুলে আছে, তাই আমরা স্বদেশের দায়িত্বভার নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমাদের আপন লোকদেরকে দিয়েও এ কথা কবুল করিয়ে নেবার ইচ্ছা তার স্বভাবতই হবে যে, আগেকার আমলে অবস্থা ছিল ভালো। সেই যুগান্তরের সময়ে যে যে গুহায় আমাদের আত্মীয় বিদ্বেষের মারগুলো লুকিয়ে আছে সেই সেইখানে খুব করেই খোঁচা খাবে। সেইটি আমাদের বিষম পরীক্ষার সময়। সে পরীক্ষা সমস্ত পৃথিবীর কাছে। এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।

□ *রচনাবলি*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬১

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ

দীনেশচন্দ্র সেন

যাঁহারা টেন, ডাউডন পড়িয়া বঙ্গভাষার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা একটি বিষয় মনে রাখিবেন; বিলাতি লিলি আর দেশি পদ্মে, জেসমাইন আর জুঁইএ একটা প্রভেদ আছে; ইংরেজি ও বাঙালি চরিত্রে সেইরূপ একটা প্রভেদ আছে, জাতীয় সাহিত্যেও সেই প্রভেদের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

ইংরেজ কবি চসার যে গীতি গাহিয়াছেন, স্পেন্‌সার তাহা স্পর্শ করেন নাই; আবার ক্যান্টারবারি টেল্‌স্ কি ফেয়ারি কুইনের সৌন্দর্যের ছায়াপাত প্যারাডাইস্ লস্টে লক্ষিত হয় না। এইরূপে জন ওয়েবস্টার, ফোর্ড, বেন জনসন, চ্যাটারটন্, স্কট, শেলি প্রভৃতি কবিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শে কাব্য রচনা করিয়াছেন; একজনের রাগিণীর সঙ্গে অন্যের রাগিণী জড়িত হইয়া যায় নাই। উদীয়মান স্বাধীন জাতির ব্যক্তিগত স্বাবলম্বন একটি বিশেষ লক্ষণ।

কিন্তু বাঙালি কবিগণ পূর্ববর্তী কোনো কবির পথ না দেখিয়া প্রায়ই অগ্রসর হন নাই। অনুবাদ গ্রন্থের আদি লেখক কৃত্তিবাস, সঞ্জয় কি মালাধর বসু হইতে পারেন, কিন্তু মৌলিক গ্রন্থগুলির তাবৎই পূর্ববর্তী কবির চেষ্টার পরে পুনশ্চ সেই চেষ্টার বিকাশ। আদি-কবি বলিয়া কাহাকেও নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করা যায় না; এক কবির পূর্বে আর এক কবি, তৎপূর্বে অন্য এক জন, এই ভাবে একই কাব্যের রচনায় যুগ-ব্যাপী চেষ্টার বিকাশ দেখা যায়। আদি-কবি একজন মানিয়া লইলেও তিনি কল্পনাবলে গল্পের উৎপত্তি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, সম্ভবত তিনি লোকপরম্পরা-শ্রুত আখ্যানটি গীতে পরিণত করিয়াছেন। চণ্ডীকাব্যের আদি লেখক কে, আমরা জানি না। চৈতন্যভাগবতকার মঙ্গলচণ্ডীর গীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন; আমরা দ্বিজ জনার্দন নামক কবির অতি প্রাচীন এবং সংক্ষিপ্ত চণ্ডীর উপাখ্যান পাইয়াছি। বোধ হয়, এইরূপ কোন মাল-মসলা লইয়া মাধবাচার্য কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, মাধবাচার্যের উদ্যম মুকুন্দরাম পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ববর্তী কবিগণের তপস্যার বলে নিজে অমর বর লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের যশঃ হরণ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের পর লালা জয়নারায়ণ আবার সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। আমরা কানা হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া শতাধিক মনসাদেবীর গীতি-লেখক পাইয়াছি। সর্বপ্রথম বিদ্যাসুন্দর বাঙ্গালায় রচনা করেন কবি কঙ্ক, তিনি চৈতন্যপ্রভুর সমকালবর্তী। তৎপর কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, পরে রামপ্রসাদ এবং তাঁহার পরে ভারতচন্দ্র সেই উপাখ্যানটি উৎকৃষ্ট কাব্যে পরিণত করেন। ভারতচন্দ্রের পর প্রাণরাম নামক এক কবি তাঁহার দৃঢ় যশের দুর্গ বিজয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিমা গড়িতে পারেন নাই, ভেক গড়িয়াছিলেন।

দক্ষিণরায়ের উপাখ্যানের প্রথম কবি মাধবাচার্য, দ্বিতীয় কবি নিমতানিবাসী কৃষ্ণরাম। মৃগলুব্ধ রতিদেব দ্বারা বিরচিত হওয়ার পর, পুনশ্চ রঘুরাম রায় কবি সেই প্রসঙ্গে কাব্য রচনা করেন। ধর্ম্মমঙ্গলের কবি অনেক পাওয়া যাইতেছে, যথা, — ময়ূর ভট্ট, মাণিক গাঙ্গুলি, সহদেব চক্রবর্ত্তী, খেলারাম, রূপরাম, ঘনরাম, শ্যামপণ্ডিত প্রভৃতি। অনুবাদ গ্রন্থগুলিতেও এইরূপ বিবিধ হস্তের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। সঞ্জয়ের পর কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরণনন্দী, নিত্যানন্দ ঘোষ, ও পরে কাশীদাস প্রভৃতি আরও বিবিধ কবি মহাভারতের অনুবাদ প্রণয়ন করেন। রামায়ণের কবি অসংখ্য, কিন্তু কৃত্তিবাসের আদিগৌরব কেহই বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। গুণরাজ খাঁর পথ অনুসরণ করিয়া মাধবাচার্য ও লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস প্রভৃতি অনেক কবিই ভাগবতের অনুবাদ রচনা করেন। এইরূপ সমস্ত কবির নাম উল্লেখ করিতে গেলে বঙ্গীয় প্রায় সমুদায় প্রাচীন কবির কথাই বলিতে হয়। পরবর্ত্তী কবি প্রায় সব স্থলেই পূর্ব্ববর্ত্তী কবির রচনার খুঁৎ বাহির করিয়া কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। আমরা 'ভেলুয়া সুন্দরী' কাব্য ও কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গলে'র ভূমিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া উদাহরণ দেখাইতেছি, —

পুস্তকের কথা এই কর অবগতি।
যেরূপে রচিল এই ভেলুয়ার পুঁথি॥
ভগ্নীসুত নাম এক তজম্মুল আলি।
আছিল আমার যেন সবাকারে বলি॥
অল্পবুদ্ধি শিশু-মতি ছিল শিশুজ্ঞান।
না ছিল পণ্ডিত গুণী না ছিল বিদ্বান্॥
লোকমুখে ভেলুয়ার গীত কথা শুনি।
রচিল পুস্তক প্রায় সেই সে কাহিনী॥
আপনার শিশুবুদ্ধি শক্তি যত ছিল।
অল্পমাত্র সেইরূপে পুস্তক রচিল॥
না ছিল পুস্তকে সেই পদের মিলন।
ভাটের কাহিনীরূপে আছিল গাঁথন॥

একদিন আছি আমি বসি নিজ স্থান।
হেনকালে বন্ধুগণ আসি বিদ্যমান॥
কহিল আমাকে সবে করিয়া মান্যতা।
ভেলুয়ার খণ্ডকাব্য রচিবার কথা॥
আদি অন্ত ভেলুয়ার যতেক কাহিনী।
বিরচিয়া কহ মিত্র আমি সব শুনি॥
গীতরূপে গায় সবে শুনিতে দুষ্কর।
না হয় সংযুক্ত কথা না মিলে অক্ষর॥
আর যে রচিল খণ্ড অল্প বাক্য তার।
স্পষ্টরূপে নাই তাতে সমস্ত প্রচার॥

অলঙ্ঘ্য তা সব বাক্য ধরি আমি শিরে।
'ভেলুয়া' নামেতে এই রচিল পুস্তক।"...

হামিদুল্লা প্রণীত "ভেলুয়া সুন্দরী।"

"শুনহ সকল লোক অপূর্ব কথন।
যেমতে হইল এই কবিতা রচন॥
খাসপুর পরগণা নাম মনোহর।
বড়িস্যা তথায় একতল্লা বিশ্বাম্বর॥
তথায় গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে।
নিশিতে শুইলাম গোয়ালের গোলাঘরে॥
রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘ পীঠে আরোহণ এক মহাজন॥
করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিল মোরে দক্ষিণের রায়॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠার ভাটীর মধ্যে হইবে প্রচার॥
পূর্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য।
না লাগে আমার মনে, তাহে নাহি কার্য।
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা।
সমান নাহিক তাহে, সাধু খেলে পাশা॥

—কৃষ্ণরাম-প্রণীত "রায়মঙ্গল"

মনসামঙ্গল-লেখক বিজয়গুপ্তও উক্ত মঙ্গল-লেখকগণের অগ্রবর্তী কাণা হরিদত্তের গানের অনেক দোষের উল্লেখ করিয়া স্বীয় কাব্যরচনার সমর্থন করিয়াছেন।

এই পুচ্ছগ্রাহিতা বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের সূত্র। নূতন পথে লেখনী প্রবর্তিত করিবার অধিকার আছে, প্রাচীন কবিগণ, বোধ হয়, একথা স্বীকার করিতেন না। তাই তাঁহারা কল্পনার পুষ্পকরথারোহী হইয়া মেঘ হইতে নূতন নূতন হ্যাইডি কি ডোনা জুলিয়া সংগ্রহ করিয়া বেড়ান নাই। ধর্মের বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধগতি কল্পনা অন্য জগতের পুষ্পপল্লব লক্ষ্যে ধাবিত হইতে পারে নাই। একথা প্রশংসনীয় হউক, কিন্তু যখন বিদ্যাসুন্দরের মতো কাব্যকেও বিল্বপত্র ও তুলসীদল দ্বারা শোধন করিয়া লওয়ার চেষ্টা দেখিতে পাই, তখন ধর্মের গণ্ডী অনেকদূর প্রসারিত হইয়াছিল, একথা অবশ্যই মানিতে হইবে।

বাঙ্গালা প্রাচীন কাব্যের এখনও ভালরূপ খোঁজ হয় নাই। আমরা যাঁহাদিগকে আদিকবির যশোমাল্য দিতেছি, তাঁহারাই আদি কি না, ঠিক বলা যায় না, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা এই প্রাচীন ক্ষেত্র আবাদ হইলে তাঁহাদের চেষ্টা ও গবেষণার হলাগ্রভাগে নূতন কবির কঙ্কাল প্রকাশ পাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র হইবে না।

বড় নদীতে যে নিয়ম, ক্ষুদ্র জল-রেখায়ও তাহাই; সৌরজগতে যে নিয়ম, গৃহশীর্ষস্থ অলাবুলতার চক্রেও সেই নিয়ম দৃষ্ট হয়; কেবল বড় বড় কাব্যগুলিতে নহে, কাব্যের অংশগুলিতেও সেই অনুকরণবৃত্তির পরিচয় লক্ষিত হয়। একটি উৎকৃষ্ট ভাব পাইয়া কবিকে প্রশংসা করার পথ নাই; কোন্ কবি সেই ভাবের আদিপ্রণেতা, সে প্রশ্ন সহজে মীমাংসিত হইবার নহে। আমরা প্রতি চণ্ডীকাব্যে ফুল্লরা ও খুল্লনার 'বারমাস্যা' পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত

বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে' পদ্মাবতীব 'বারমাস্যা', 'পদকল্পতরু'তে বিষ্ণুপ্রিয়ার 'বারমাস্যা' (১৭৮৩ পদ) বিদ্যাসুন্দরগুলিতে বিদ্যার 'বারমাস্যা', সৈয়দ আলাওল কবির পদ্মাবতীতে নাগমতীর 'বারমাস্যা' 'মুরারি ওঝার নাতি' শ্রীধর-প্রণীত রাধার 'বারমাস্যা', সেখ কমরালী বিরচিত রাধার 'বারমাস্যা', সেক জালাল প্রণীত সখীর 'বারামাস্যা'[১], এইরূপ রাশি রাশি 'বারমাস্যার' সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পথে ঘাটে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। যেখানে একটি সুন্দর ভাব পাওয়া গিয়াছে, তৎপরেই উহা উপর্যুপরি কবিগণের চেষ্টায় তন্তুসার হইয়াছে। কবিবল্লভের *"না পুড়িও মোর অঙ্গ না ভাসাও জলে। মরিলে রাখিও বাঁধি তমালের ডালে॥ কবহুঁ সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে। পরাণ পারব হাম পিয়া দরশনে॥ *এই কবিতার ভাবটি রাধামোহন ঠাকুর, — *"এ সখি কর তহু পর উপকার। ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব, মৃত তনু রখেবি হামার॥ কবহুঁ শ্যাম তনু পরিমল পাওব, তবহুঁ মনোরথ পুর।" (পদকল্পতরু, ৪৬ পদ); *যদুনন্দন দাস, — *"উত্তর কালে এক করিহ সহায়। এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়। তমালের কাঁধে মোর ভুজলতা দিয়া। নিশ্চয় করিয়া তুমি রাখিও বাঁধিয়া॥ কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পূরিবেক আশ।" (পদকল্পতরু, ১৮৬ পদ); *নরহরি — *"করিহ উত্তরকালে ক্রিয়া। রাখিহ তমালে তনু যতনে বাঁধিয়া॥ লেহ এ ললিতা মণিহার। অনুখন গলায় পরিহ আপনার। রপিনু মল্লিকা নিজ করে। গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইহ তারে॥ তোমরা কুশলে সব রৈয়ো। এই বনে বারেক আসিতে তারে কৈয়ো॥ নরহরি কৈরো এই কাম। সে সময় কাণে শুনাইও তাঁর নাম।" (সাহিত্যপত্রিকা, ৩য় ভাগ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১২৯৯); *কৃষ্ণকমল, — *"দেহ দাহন ক'র না দহন দাহে। ভাসা'ওনা তাহা যমুনা প্রবাহে। আমার শ্যামবিরহে পোড়া তনু, আমার শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসের দেহ — সব সহচরী, দুটি বাহু ধরি, বাঁধিও তমালের ডালে। যদি এই বৃন্দাবন স্মরণ করি, আসে গো আমার প্রাণের হরি, বঁধুর শ্রীঅঙ্গসমীব পরশে শরীর জুড়াইব সেই কালে।"; *কবিশেখর, — *"কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে, একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে। নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার, পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥" (প. ক. ত, ১৬৭৯ পদ, সতীশবাবুর সংস্করণ, ১২১৪ পৃষ্ঠা); *অজ্ঞাত আর একজন কবি, — *"সখি প্রাণ যদি দেহ ছাড়ে, না দহ বহ্নিতে মোরে, ভাসায়ো না যমুনা সলিলে। তুলসীদল বিছাইয়ে, চন্দন তাহে লেপিয়ে, লিখিয়ো তাহার হরির নাম; বাঁধিয়া রেখো সখি তমালের ডালে" (সাহিত্য, মাঘ, ১৩০২, ৬০৬ পৃষ্ঠা) *এবং ত্রিপুরার প্রাচীন এক কবি, *"আমি ম'লে এই করিও, না পোড়ায়ো না ভাসায়ো" *ইত্যাদি পদে নকল করিয়াছেন। জয়দেবের, — *"হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভূজঙ্গম-নায়কঃ।" *ইত্যাদি শ্লোক হইতে বিদ্যাপতি, — *"হাম নহ শঙ্কর হু বরনারী", * ও রামবসু * "হর নই হে আমি যুবতী। কেনে জ্বালাতে এলে রতিপতি॥ করো না আমার দুর্গতি। বিচ্ছেদে লাবণ্য হয়েছে বিবর্ণ, ধরেছি শঙ্করের আকৃতি॥ ক্ষীণ দেখে অঙ্গ আজ্ঞ অনঙ্গ, একি রঙ্গ হে তোমার। হর ভ্রমে শরাঘাত, কেন করিতেছ বার বার॥ ছিন্ন ভিন্ন কেশ, দেখে কও মহেশ, চেননা পুরুষ প্রকৃতি। কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পরেছি নীলরতন। অরুণ লোচন,

১. শেষোক্ত তিনটি "বারমাস্যা" বঙ্গসাহিত্যে প্রথিতনামা শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহেবের নিকট সংগৃহীত আছে।

ক'রে পতি বিরহে রোদন। এ অঙ্গ আমার, ধূলায় ধূসর, মাখি নাই বিভূতি।" (বিদ্যাপতি "জগবন্ধু ভদ্রের সংস্করণ, ১৫৫-১৫৬ পৃ.) * গানের ভাব অনুকরণ করিয়াছেন। অপর একটি সংস্কৃত শ্লোক হইতে কবিশেখর, — * "নিজ কর পল্লব দেহ না পরশই শঙ্কিত পঙ্কজ ভানে। মুকুরতলে নিজ মুখ হেরি সুন্দরী শশী বলি হেরই গগনে॥" (পদকল্পতরু, ১৮৭১ পদ) * চুরি করিয়াছেন; চোরের উপর বাটপাড় কৃষ্ণকমল উহা হইতে * "প্যারি হেরি নিজ ঝরে, নখল নিকরে, ভেবে শশী করে আবরণ করে" (দিব্যোন্মাদ) * ইত্যাদি গানটি প্রস্তুত করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের — * "এখন কোকিল আসিয়া করুক গান, ভ্রমর ধরুক তাহার তান, মলয় পবন বহুক মন্দ, গগনে উদয় হউক চন্দ।" (রমণীমোহন মল্লিকের সংস্করণ, ২২২ পৃষ্ঠা), * পরে বিদ্যাপতির * "সোহি কোকিল অব লাখ ডাকউ লাখ উদয় করু চন্দা। পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ, মলয় পবন বহু মন্দা॥" * এবং পরে মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে — * "আজি মোর মন্দিরে আওবে কালা, কি করিবে চাঁদ পবন অলি কোকিলা। (মা. চ., ২৪৬ পৃ.) * প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। ইহা ইংরেজির parallel passage অর্থাৎ অনুরূপ রচনা নহে, ইহা সাহিত্যের ঘরে দিন-দুপুরে ডাকাতি।

আমরা এই প্রবন্ধাংশে দেখাইতে চেষ্টা করিযাছি, কতকগুলি ধর্মপ্রসঙ্গের সীমাবন্ধনীতে বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল। যে পর্যন্ত কোনো একখানি কাব্যের সম্পূর্ণ বিকাশ না হইয়াছে, সে পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণ ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করিয়া তাহা প্রস্ফুট করিয়াছেন। সম্পূর্ণ কাব্য এবং কাব্যান্তর্গত বিচ্ছিন্ন ভাবরাশি উভয়ই এইরূপ ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইয়াছে। কিন্তু বিকাশই সর্বত্র প্রকৃতির নিয়ম নহে। উদ্যানের কতকগুলি ফুল ফোটে, আবার কোনো কোনোটি কোরকেই শুষ্ক হয়। সেইরূপ কবিকঙ্কণের চণ্ডী, কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান, ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল প্রভৃতি সম্পূর্ণ কাব্যগুলির পার্শ্বে সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী, ধান্য পূর্ণিমা, ব্রতগীতি প্রভৃতি অসংখ্য খণ্ডকাব্য দৃষ্ট হয়; সেগুলিতে উদগম আছে, বিকাশ নাই। আকরে খাঁটি স্বর্ণের পার্শ্বে; ঈষৎ স্বর্ণে পরিণত ধাতুখণ্ড যেরূপ দেখায়, চণ্ডীকাব্য, পদ্মাপুরাণ প্রভৃতির পার্শ্বে এইগুলি সেইরূপ দেখায়।

কাব্যগুলির সম্পর্কে এই অনুকরণবৃত্তি নিন্দনীয় কি প্রশংসনীয় ঠিক বলিতে পারি না। তবে বোধ হয় ক্রমে ক্রমে গঠিত প্রাচীন বঙ্গীয় প্রত্যেক কার্য্যেই নিপুণতা ও অভিনিবেশযুক্ত সৌন্দর্য অধিক লক্ষিত হয়। দোষ এই, এই সকল কাব্যে স্বাধীনতার বায়ু বহে নাই, কল্পনার উন্মাদকর স্বপ্ন কিংবা উদ্দাম ও সহজ স্ফূর্তিময়ী চিন্তার আবেশ নাই। কাব্যগুলির প্রায় সমস্ত পুরুষচরিত্রই সমাজের কঠিন নিয়মের বশবর্তী, বিপদের সময় স্বীয় চেষ্টা ব্যবহারে অনিচ্ছুক — অলৌকিক দৈবশক্তির উপর অনুচিত বিশ্বাসপরায়ণ। যে জাতির শাসনে দাসত্ব, চিন্তায় দাসত্ব, সমাজে দাসত্ব, তাহাদের সাহিত্যে অন্যরূপ হইবে কেন? আমরা যাহা, তাহা ভুলিব কিরূপে? স্বপ্রকৃতি হইতে তাহা মুছিয়া ফেলিব কি রূপে?

কিন্তু সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত-পুষ্পবাসের ন্যায় বৈষ্ণব-গীতি-রাশি, একটি স্বাধীন মুগ্ধকর ভাবজাত। সেই ভাবের নাম প্রেম। 'লম্বোদর', 'নাভি সুগভীর', ও 'আজানুলম্বিত বাহু'র ন্যায় রাশি রাশি সংস্কৃতের আবর্জনা বঙ্গসাহিত্য কলুষিত করিয়াছিল। সদ্যোজাত এই ভাবটি

অপ্রকৃত উপমা রাশির স্থলে * "শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরিষীর বা, বরষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না॥" (বিদ্যাপতি) * প্রভৃতি পরিচিত তুলনামূলক কথা জাগাইয়া দিল। জয়দেব শ্রীহরিকে দিয়া যে দিন * "দেহি পদপল্লবমুদারং" * গাওয়াইয়াছিলেন, সেদিন সমাজ-সংস্কারে প্রাণ-হারা যন্ত্রপ্রায় মানুষ দাঁতে জিভ কাটিয়া একটি দৈবঘটনা দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিল; কিন্তু বলরাম দাস যে দিন * "নিদঁ যায় চাঁদবদন শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা।" (পদকল্পতরু, ১১০০ পদ) * ও কৃষ্ণকমল * "অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি, আল্‌তা পরাত বঁধু কতই বাখানি" (দিব্যোন্মাদ) * রচনা করিয়াছিলেন, সেদিন আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। জাতীয় জীবনে প্রেম ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, এই অধীনত্ব-গন্ধী প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব-পদে স্বাধীনতার বায়ু খেলা করিতেছে।

সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের পল্লিগাথা প্রকাশের পর আমাদের এই অধ্যায়-লিখিত ধারণার অনেকটা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পুনরভ্যুত্থানে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেই ঐ মন্তব্য প্রযোজ্য। মঙ্গলগানগুলি পূজামণ্ডপের জন্যই রচিত হইত। চণ্ডীদেবী, মনসাদেবী, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবতাদিগের উৎসব উপলক্ষে এই সকল মঙ্গলগান-রচনার প্রয়োজন হইত, সুতরাং কবিগণ উপর্যুপরি একই বিষয় লইয়া কাব্য প্রণয়ন করিতেন। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পূর্ববর্তী সমস্ত কাব্যের বিষয়ই ভিন্ন ভিন্ন। আমরা একটি মাত্র মহুয়া, একটি মাত্র মলুয়া, একটি মাত্র চন্দ্রাবতী পাইতেছি এবং প্রত্যেকটি পালা গান এক একটি পৃথক বিষয় লইয়া লিখিত, দেখিতেছি। একথা নিশ্চয় যে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বঙ্গসাহিত্যের গণ্ডী কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। পূর্ববর্তী সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হয়।

পল্লি-গীতিকাগুলির মধ্যে 'শ্যামরায়', 'আঁধাবঁধু' ও 'ধোপার পাট' ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। কাজলরেখা, কাঞ্চনমালা ও মালঞ্চমালা তাহারও অনেক পূর্বের রচনা। এই সকল সুপ্রাচীন পল্লিগাথায় গুপ্তযুগের আদর্শ পাওয়া যায়। নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ, তাঁহাদের স্বর্গীয় ত্যাগ স্বীকার, সমাজের স্বাধীনতা ও উদার-বৃত্তি এবং নায়কদের দেশ বিদেশে পর্যটন, অদম্য সাহস ও বিপদ্‌কে অবাধে বরণ করিয়া লওয়া — বাণিজ্যের জন্য সমুদ্র-পথে নিঃশঙ্কভাবে যাতায়াত ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠান — এ সমস্তই গুপ্তযুগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব ও জাতিভেদের কড়াকড়ি নিয়ম আদৌ নাই, আছে — আত্মনির্ভরতা ও কর্মশীলতা;অনেকটা বৌদ্ধ-ভাব এই সাহিত্যে দৃষ্ট হয়। পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবান্বিত সাহিত্যের মূলনীতি হইল — আচার ও ব্রাহ্মণ্যজয় ঘোষণা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারতকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লওয়া হইল, — কালিদাসের কবিত্ব আড়ালে পড়িল এবং মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যকে নূতন টীকার সাহায্যে দাঁড় করাইয়া সমাজ সংগঠন করিতে কুল্লুকভট্ট ও রঘুনন্দন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। সুতরাং এ যুগের সাহিত্য ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনে কতকটা কবিত্বসম্পদ্‌ হারাইয়া ফেলিল। এই শাসনের অতল জল হইতে মনুষ্যত্বের প্রকৃত দাবি উদ্ধার করিবার জন্য বৈষ্ণবেরা যে "বেদবিধি-বহির্ভূত" ধর্মপ্রচার করিলেন — তাহা লুপ্ত গৌরব যুগটিকে পুনরায় উজ্জ্বল করিয়া দেখাইল।

□ *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থের একটি অংশ, ১৮৯৬

বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌

প্রমথ চৌধুরী

জনৈক বন্ধুকে লিখিত

আজ বিজয়া। এই শুভদিনের শুভকামনা জানিয়ে এই পত্র আরম্ভ করছি। আজকের দিনে আত্মীয়স্বজনের বন্ধুবান্ধবের শুভকামনা করাটা আমাদের মধ্যে অবশ্য একটা সামাজিক প্রথা হয়ে দাঁড়িযেছে। যেমন ইংলন্ডে নূতন বৎসরের প্রথম দিনে পাঁচজনকে অন্তরের শুভকামনা জানানোটা হচ্ছে সে দেশের ভদ্রসমাজের একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, তেমনি এ দেশেও পাঁচজনকে বিজয়ার হয় প্রণাম নয় আশীর্বাদ জানানো সর্বসাধারণের মধ্যে একটা অলঙ্ঘনীয় নিযম।

তবে এ উভয় প্রথা মামুলি হলেও এ দুয়ের ভিতর একটু প্রভেদ আছে। বিজয়ার সঙ্গে আমাদের ধর্মের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, পয়লা জানুয়ারির সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের কোনোরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধ আছে বলে তো জানি নে; যদি থাকে তো সে এত দূরসম্পর্ক যে, তা না থাকারই শামিল। ফলে এই বিজয়ার দিনে আমরা পরস্পরের যে শুভকামনা করি তার ভিতর শুধু ভদ্রতা নয়, আন্তরিকতাও থাকে।

আমি এ কথা স্বীকার করতে মোটেই কুণ্ঠিত নই যে, আমার পক্ষে এ দিন তিনশো পঁয়ষট্টির ভিতর একটা দিন নয়, কিন্তু তিনশো চৌষট্টি ছাড়া আর একটা দিন; অর্থাৎ এ দিনে অকারণে মনের ভিতর আশা ও আনন্দ যেমন সজাগ হয়ে ওঠে, বৎসরের অপর কোনো দিনে সকারণেও ঠিক তেমনটি হয় না। এই একটি মাত্র দিনেই আমরা বাঙালিরা বিশেষ করে নিজের অন্তরে একটা জাতীয় আনন্দের আস্বাদ পাই।

এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ভুলে যেয়ো না যে আমি একে বাঙালি, তার উপর আবার শাক্ত ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। বালককাল হতে সাবালক হওয়া পর্যন্ত বছরের পর বছর দুর্গোৎসবই ছিল আমার কাছে বৎসরের সব চাইতে বড়ো উৎসব। ধূপ দীপ শঙ্খ ঘণ্টা পুষ্প চন্দন অর্ঘ্য নৈবেদ্য এই সকলের বর্ণ গন্ধ ও শব্দের সংস্রবে শৈশবে বাল্যে ও কৈশোরে আমার সকল ইন্দ্রিয় যুগপৎ তুষ্ট ও পুষ্ট হয়েছে। এর থেকে মনে ভেবো না যে দুর্গোৎসবের সঙ্গে আমার শুধু ইন্দ্রিয়েরই সম্পর্ক ছিল, মনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। প্রথমত, ইন্দ্রিয়ের রাজ্য কোথায় শেষ হয় আর মনের রাজ্য কোথায় আরম্ভ হয় তার পাকা সীমানা আজও কেউ নির্ধারণ করে দিতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত, ভক্তি জিনিসটে হচ্ছে সংক্রামক, বিশেষত অর্বাচীনের মনের পক্ষে। সুতরাং তুমি ধরে নিতে পার যে, দুর্গাপ্রতিমার প্রতি আমার মনেরও ভক্তি ছিল। ভক্তি যে ছিল তার প্রমাণ আমি আরতির সময় মাটির

প্রতিমার মুখে হাসি দেখেছি। হাসি কথাটা বোধ হয় ঠিক হল না, সেকালের প্রতিমার মুখের যে ভাব আমাদের চোখে পড়ত সে ভাব হচ্ছে প্রসন্ন-করুণ।

দেবগণ কর্তৃক দেবীর স্তবের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দিচ্ছি —

কেনোপমা ভবতি তেঽস্য পরাক্রমস্য,
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥

আমরা দেবীর দৃষ্টিতে যার সাক্ষাৎপরিচয় পেয়েছি সে 'সমরনিষ্ঠুরতা'র নয়, চিত্তকৃপার।

আমার এ কথা শুনে তুমি যা উত্তর দেবে তা জানি। তুমি বলবে, ও-সব হচ্ছে illusion আর delusion। অবশ্য তাই। কিন্তু এ সত্যটিও মনে রেখো যে illusion আর delusion থেকে আমরা কেউ মুক্ত নই। সারা জীবন এই দুটিকে নিয়েই আমরা ঘর করি, একরকম delusion-এর হাত থেকে মুক্তিলাভ করে আর একরকম delusion-এর বশীভূত হই। এক ঠাকুরকে বিসর্জন দিয়ে আর এক ঠাকুরের পুজো করতে শুরু করি। তা ছাড়া যে সকল ভুলবিশ্বাস আমাদের মন থেকে চলে যায়, মনের উপর সে সকল তাদের ছায়া আলো দুই রেখে যায়, স্মৃতি আজীবন তার জের টেনে চলে। আমরা যাকে মন বলি তার ভিতর কাটা-ছাঁটা হীরকখণ্ডের মতো নিরেট কঠিন জ্বলজ্বলে সত্য খুব অল্পই আছে, তার বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে বসে আছে যত অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট ভাব। আর আমাদের মতামত কার্যকলাপের উপর এই সকল অস্পষ্ট মনোভাবের প্রভাব বড়ো কম নয় এবং সে প্রভাবকে দূর করা কঠিন, কারণ তা অলক্ষিত। আমার এ-সব কথা শুনে ভয় পেয়ো না যে আমি আবার কেঁচে পৌত্তলিক হতে যাচ্ছি। আমার চিরজীবনের শিক্ষা সে ফেরবার পথে কাঁটা দিয়েছে। ইতিমধ্যে আমার মন তিন বিদেশের — ইংলন্ড ফ্রান্স ও ইতালির — বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের হাতে ধোলাই হয়েছে। তা ছাড়া আমাদের মনের পক্ষে কালাপানি পার হবারও কোনোই দরকার নেই, স্বদেশের মনোজগতে কিঞ্চিৎ পিছু হটলেই এমন জায়গায় পৌঁছানো যায়, যেখানে যাবামাত্র আমাদের প্রতিমাভক্তি উড়ে যায়। 'ন প্রতিকে ন হিংস' এ সূত্র তো বেদান্তেই আছে। আর বলা বাহুল্য যে, এ যুগে আমরা সবাই বৈদান্তিক, অর্থাৎ আমরা ধর্ম মানি, কিন্তু কোনো ধর্মই মানি নে।

আমার মনের কথা তোমাকে এতটা খুলে বলবার উদ্দেশ্য এই সত্যটা স্পষ্ট করা যে, আমার পুঁথিপড়া মন সংস্কৃত-বিলেতি হলেও তার নীচে যে মন আছে তা মূলত বাঙালি। বাঙালি হিন্দুর মনের ধর্মের পরিচয় নিতে হলে বাঙালির চিরাগত ধর্মের পরিচয় নিতে হয়। তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, বাংলা ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথাও দুর্গোৎসব জাতীয় উৎসব নয়। এ বিষয়ে আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের পারিবারিক ও সেইসঙ্গে আমাদের সামাজিক ধর্ম আমাদের মনের ঘরে যে রূপ রস গন্ধ ও তেজ সঞ্চিত রেখে গিয়েছে তার জন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। ষোড়শোপচারে এই মূর্তিপূজার প্রসাদেই বাঙালিজাতির মনের poetic এবং aesthetic অংশ গড়ে উঠেছে। কোনো ধর্মবিশ্বাস মানুষের মন থেকে চলে গেলেও তার রূপটুকু তার সৌরভটুকু সেখানে রেখে যায়। এটা

কখনো লক্ষ্য করেছ যে, দর্শন-বিজ্ঞানের আক্রমণে ধর্ম কখনো মারা যায় না, হয় শুধু রূপান্তরিত? কোনো বিশেষ ধর্মমতকে যখন আর সত্য বলে বিশ্বাস করা চলে না, তখন বৈষয়িক লোকের কাছে তা শিব বলে গ্রাহ্য হয়, আর অবৈষয়িক লোকের কাছে সুন্দর বলে। রবীন্দ্রনাথ পৌত্তলিক ধর্মের আবহাওয়ায় মানুষ হন নি, অথচ তাঁব কবিতা আদ্যোপান্ত ধূপবাসিত, দীপালোকিত, পুষ্পচন্দনে সুরভিত, শঙ্খঘণ্টায় মুখরিত। এই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, যার পারিবারিক ধর্ম যাই হোক-না কেন, বাঙালির জাতীয়-পূজার প্রভাব বাঙালির সৌন্দর্যজ্ঞানকে পরিচ্ছিন্ন করেছে, বাঙালির হৃদয়বৃত্তিকে পরিপুষ্ট করেছে।

তুমি মনে ভাবতে পাব যে, আমি এ উৎসবেব একটি কলঙ্কের কথা, বলিদানের কথা চেপে গিয়েছি। ধর্মের নামে পশুহত্যা আমরা ছাড়া ভারতবর্ষের অপর কোনো সভাজাতি করে না। আর এ হত্যা যে যেমন অনর্থক তেমনি বর্বর, আজকের দিনে কোনো শিক্ষিত বাঙালি তা স্বীকার করতে তিলমাত্র দ্বিধা করবেন না। নিরীহ ছাগশিশুকে হাড়কাঠে ফেলে বলি দিয়ে যাঁরা মনে করেন যে তাঁরা 'সমরনিষ্ঠুরতা'র অভিনয় করছেন, তাঁদের পৌরুষের বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে যায়। তাঁদের বীরত্ব প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে পলিটিক্সের বাক্‌যুদ্ধ। হত্যাকে ধর্ম বলতে আমরা অবশ্য কেউ প্রস্তুত নই। তবে সত্যের খাতিরে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, যারা বৈদিক তান্ত্রিক সমাজে মানুষ হয়েছে সে-সকল বাঙালির পক্ষে জবাফুল চক্ষুশূল নয়, আর বক্তচন্দনের ফোঁটায় তাদের কপালও চড়চড় করে না। এ জ্ঞান তাদের আছে যে, মানুষের জীবনরাগিণীতে কড়ি ও কোমল দুইরকম সুরই সমান লাগে। এই রাজসিক পূজা আমাদের মনকে সকলপ্রকার রাজসিক ধর্মের প্রতি অনুকূল করেছে। তা সে ধর্ম সাহিত্যেরই হোক, আর সমাজেরই হোক। এই লম্বা বক্তৃতার উদ্দেশ্য তোমাকে বোঝানো যে, আমার ঐ বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ শূন্যগর্ভ নয়; অস্পষ্ট আশার স্পর্শে তা মুকুলিত, অহৈতুকী আনন্দের বর্ণে তা রঞ্জিত।

২

এই সূত্রে এই সুযোগে আমি তোমার কাছে আমার সাহিত্যিক ঋণ পরিশোধ করতে চাই। তোমার কাছে আমার বকেয়া কৈফিয়তটি আজ সুদসুদ্ধ শুধে দেবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছি। অমৃতশহর কংগ্রেসের পিঠ-পিঠ তুমি আমাকে যে চিঠি লেখ, তার উত্তর আমি দিই নি; কেননা উত্তর যে কী দেব তা তখন ভেবে পাই নি। তুমি আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আন যে, আমার অন্তরে যা আছে সে হচ্ছে বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌। এ অভিযোগে আমি কবুল জবাব দিতে বাধ্য। বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌কে মনে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়াটা বাঙালির পক্ষে যদি দোষের হয় তাহলে সে দোষে আমি চিরদিনই দোষী আছি। আমার গত আট বৎসরের লেখার ভিতর এ অপরাধের এত প্রমাণ আছে যে, সে-সকল একত্র সংগ্রহ করলে একখানি নাতিহ্রস্ব পুস্তিকা হয়ে ওঠে।

তবে জিজ্ঞাসা করি, একজন বাংলা-লেখকের কাছ থেকে তুমি আর কোন্‌ পেট্রিয়টিজ্‌মের প্রত্যাশা কর। আমি যে ইংরেজি লিখি নে তার থেকেই বোঝা উচিত যে অ-বঙ্গ পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ আমার মনের উপর একাধিপত্য করে না। যে ভাষা ভারতবর্ষের কোনো

দেশেরই ভাষা নয়, সেই ভাষাকে সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষা গণ্য করে সেই ভাষাতে পেট্রিয়টিক বক্তৃতা করতে হলে আমি সেই পেট্রিয়টিজ্‌মের বাহানা করতে বাধ্য হতুম যে, দেশপ্রীতি ভারতবর্ষের কোনো দেশের প্রতি ভালোবাসা নয়, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি। মুখস্থ ভাষায় শুধু মুখস্থ ভাবই প্রকাশ করা যায়। তার প্রমাণ আমাদের কনফারেন্স কংগ্রেসে নিত্যই পাওয়া যায়, দেশের যত মুখস্থবাগীশ ও-সকল সভার তাঁরাই হচ্ছেন যুগপৎ নায়ক ও গায়ক। সে যাই হোক, কোনোরূপ ভালোবাসার কৈফিয়ত চাওয়াও যেমন অন্যায় দেওয়াও তেমনি শক্ত, তা সে অনুরাগের পাত্র ব্যক্তিবিশেষই হোক, জাতিবিশেষই হোক। এ ক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে, আমরা যাকে স্বদেশপ্রীতি বলি আসলে তা স্বজাতিপ্রীতি। দেশকে ভালোবাসার অর্থ দেশবাসীকে ভালোবাসা — কেননা মানুষে শুধু মানুষকেই ভালোবাসে। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি মানুষকে নয় মাটিকে ভালোবাসেন, তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি মানুষ নন — জড়পদার্থ; কেননা জড়ের প্রতি জড়ের যে একটা নৈসর্গিক ও অন্ধ আকর্ষণ আছে, এ সত্য বিজ্ঞানে আবিষ্কার করেছে।

যাক ও-সব অবান্তর কথা। আসল কথা এই যে, স্বজাতিপ্রীতির কৈফিয়ত কারো কাছে চাওয়া অন্যায়, কারণ ও হচ্ছে মনের একটা দুর্বলতা। স্বজনবাৎসল্যরূপ ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য যখন অর্জুনেরও ছিল, তখন আমাদের মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তিদেরও যে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি। আর বাঙালি বাঙালি-মাত্রেরই স্বজন, তার কারণ ভাষার যোগ হচ্ছে মানস-কায়ে রক্তের যোগ। সুতরাং বাঙালিদের পরস্পরের প্রতি নাড়ির টান থাকাই স্বাভাবিক, না থাকাটাই অদ্ভুত।

তার পর এই প্রীতির পুরো কৈফিয়ত দেওয়া শক্ত, কেননা তার মূল আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ নয়। ছেলেবেলায় গুরুমহাশয়েরা আমাদের একটা ভারি শক্ত অঙ্ক কষতে দিতেন, যা আমরা সকলে কষে উঠতে পারতুম না। সে অঙ্ক হচ্ছে এই—

আছিল দেউল এক পর্বতপ্রমাণ
তেহাই সলিলে তার ...

তার পর কি আছে ঠিক মনে পড়ছে না। কবিতা আমার কণ্ঠস্থ থাকে না। তবে এটুকু মনে আছে যে, সে মন্দিরের মাটির ভিতর কতটা পোঁতা আছে আঁক কষে তাই আমাদের বার করতে হত। এখন আমার কথা এই যে, মানুষের মন পর্বতপ্রমাণই হোক, আর বল্মীকপ্রমাণই হোক, তার সমস্তটা জেগে নেই। তার অনেকটা স্বজাতির মনের জমির নীচে পোঁতা আছে, আর অনেকটা নিজের অন্তরে তরল ভাবে ডুবে আছে; যেটুকু জেগে আছে সেইটুকু আমরা নিজে দেখতে পাই, অপরকেও দেখাতে পারি; কিন্তু সেই আংশিক মন দিয়ে আমাদের সমগ্র মনের পুরো পরিচয় আমরা দিতে পারি নে। সুতরাং আমাদের রাগদ্বেষের সঠিক কারণ আমরা সব সময়ে নিজেও জানি নে, অতএব পরকেও জানাতে পারি নে। এ ক্ষেত্রে নিজের কোট বজায় রাখবার জন্য মানুষে যে-সব তর্কযুক্তি দেখায় সে-সব ষোলো-আনা গ্রাহ্য নয়। কেননা যুক্তিতর্কের দোষ এই যে, তার দ্বারা আমরা অপরকে প্রবঞ্চিত করতে না চাইলেও অনেক সময় নিজেকে প্রবঞ্চিত করি। কে না জানে যে পৃথিবীতে যে-সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বড়ো বড়ো কথার সৃষ্টি হয়েছে সে-সকল অধিকাংশ লোকের

শুধু আত্মপ্রবঞ্চনার কাজেই লাগে। আমি একজন মহাধার্মিক, উপরন্তু মহাপেট্রিয়ট, এ কথা মনে করে কে না আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

এতক্ষণে বুঝতে পারছ যে, আমি আমার বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্ সমর্থন করে তোমার কাছে কোনো লিখিত জবাব কেন দাখিল করি নি। তা করলে নিজের না হোক, নিজের জাতের জাঁক আমাকে নিশ্চয়ই করতে হত।

কিন্তু সেদিন তোমার মুখে যা শুনলুম তাতে করে আমার এই মৌনতার জন্য অনুতাপ করছি। সবুজ পত্রে তোমার অনুরোধ মতো আমার কৈফিয়ত-সহ তোমার পত্র প্রকাশ না কবার দরুন সে পত্র তুমি হিন্দিতে অনুবাদ করে মহাত্মা গান্ধীর কাগজে প্রকাশ করেছ। যদি জানতুম, 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে' সেই ভাবে আমার কৈফিয়ত তোমার পত্রের অনুচর হয়ে মহাত্মা গান্ধীর কাগজে প্রবেশলাভ করবে, তা হলে আমার মরচে-পড়া ওকালতি বুদ্ধি মেজে-ঘষে তার সাহায্যে এমন-একটি বর্ণনাপত্র তৈরি করে দিতুম যাতে সত্যমিথ্যা একাকার হয়ে যেত, আর যা পড়ে পলিটিকাল-হাকিমের দল আমার বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি দিতে পারতেন না।

৩

সংস্কৃতে বলে গতস্য শোচনা নাস্তি, কিন্তু ইংরেজিতে বলে it is never too late to mend। আমি ইংরেজি-শিক্ষিত, অতএব ঐ ইংরেজি বচন শিরোধার্য করে এ কৈফিয়ত লিখতে বসেছি, এই আশায় যে, সেটি হিন্দিতে, অর্থাৎ আগামী স্বরাজের *lingua franca*-য়, প্রমোশন পাবে।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, বাংলাদেশে বাঙালির ঘরে জন্মালেও আমি খাঁটি বাঙালি নই। একছত্র একদণ্ড ইংরেজ-শাসনের অধীনে বাস করে, আর পাঁচ থেকে পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্যন্ত ইংরেজি-শাসিত স্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে আমি হয়ে উঠেছি একজন নিয়ো-ইন্ডিয়ান ওরফে নন্-ইন্ডিয়ান, অর্থাৎ কংগ্রেসওয়ালারা যে জাত আমিও সেই জাত। পলিটিক্সের সুরা আমিও যথেষ্ট পান করেছি এবং তার নেশা আজও ছাড়াতে পারি নি, আর ভারতবর্ষের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান অদ্যাবধি আমি সেই নেশার ঝোঁকে না হোক সেই নেশার চোখেই দেখি। সুতরাং প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের সপক্ষে ভারতবর্ষীয় পলিটিক্সের দিক থেকে যদি কিছু বলবার থাকে তো তাই বলব। বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌মের মূলে আছে বাঙালি জাতির স্বীয় স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান। Self-determination of small nationsএর মতানুসারে বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌মের বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রথমত আমরা একটি বিশেষ জাতি, তার পর আমরা একটি ক্ষুদ্র জাতি; সুতরাং আমাদের সেলফ্-ডিটারমিনেশন-বিরোধী হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্। আর গতযুদ্ধে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্ সর্বনেশে জিনিস, তা সে স্বদেশিই হোক আর বিদেশিই হোক। ইংরেজের সাম্রাজ্যের ভিতর বিদেশ আছে, জর্মানির ছিল শুধু স্বদেশ। আর জর্মানির এই স্বদেশি ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্ জর্মান জাতির নৈতিক আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অধঃপাতের যে একমাত্র কারণ, তার খোলা-দলিল তো আজকের দিনে সকলের চোখের সমুখেই পড়ে

রয়েছে। বহুকে এক করবার চেষ্টা ভালো, কিন্তু একাকার করবার চেষ্টা মারাত্মক, কেননা তার উপায় হচ্ছে জবরদস্তি। যদি বল যে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না, তার উত্তর আমাদের সম্বন্ধে সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশন যদি না খাটে তো ইউরোপে মোটেই খাটে না। ইউরোপে কোনো জাতির সঙ্গে অপর কোনো জাতির সে প্রভেদ নেই, আমাদের এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির যে প্রভেদ আছে। বাংলার সঙ্গে মাদ্রাজের যে প্রভেদ ইংলন্ডের সঙ্গে হল্যান্ডের সে প্রভেদ নেই, এমন-কি, ফ্রান্সের সঙ্গে জর্মানিরও সে প্রভেদ নেই। তবে যে প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের নাম শুনলে এক দলের পলিটিশিয়ান্‌রা আঁত্‌কে ওঠেন, তার কারণ তাঁদের বিশ্বাস ও-মনোভাব জাতীয় সংকীর্ণ স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়। নিজের সন্তানকে স্তন দিলে কোনো মায়ের উপর যদি এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে মাতা অতি স্বার্থপর, যেহেতু তিনি পাড়াপড়শির ছেলেদের নিজের স্তন্যক্ষীরে বঞ্চিত করছেন, তা হলে সে অভিযোগের কি কোনো প্রতিবাদ করা আবশ্যক? মানুষের পক্ষে যা অস্বাভাবিক তাই করার ভিতর যে আসল মনুষ্যত্ব নিহিত, এ কথা বলে অতিমানুষে আর শোনে অমানুষে। ধরো, যদি কোনো জননী নিজেকে জগজ্জননী-জ্ঞানে পাড়াসুদ্ধ ছেলেমেয়েদের নিজের স্তনের দুধ জোগাতে ব্রতী হন, তা হলে কাউকে বঞ্চিত না করে সবাইকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিতে হলেও সে দুধে এত জল মেশাতে হবে যে তা পান করে কারো পেট ভরবে না, সকলের পেট ভরবে শুধু যকৃতে। আমার বিশ্বাস, আমাদের পলিটিশিয়ান্‌রা অদ্যাবধি পেট্রিয়টিজ্‌মের উক্তরূপ জলো-দুধের কারবার করছেন, এবং আর সকলকেও তাই করতে পরামর্শ দিচ্ছেন।

৪

যদি জিজ্ঞাসা কর যে, এই সহজ সত্যটা লোকের চোখে পড়ে না কেন। — তার উত্তর, আমাদের অবস্থার গুণে। সমগ্র ভারতবর্ষ আজ বিদেশি রাজার অধীনে, সুতরাং ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশেরই আজ রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নেই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে আজ প্রধান বন্ধন হচ্ছে পরাধীনতার বন্ধন, এবং এ অধীনতার পাশ হতে কোনো প্রদেশবিশেষ নিজ চেষ্টায় নিজ কর্মগুণে মুক্ত হতে পারবে না। এ অবস্থায় আমাদের সবারই পলিটিক্যাল-সমস্যা একই সমস্যা। সে সমস্যা হচ্ছে এই যে, অধীনতা কী করে স্বাধীনতায় পরিণত করা যায়। সুতরাং আজকের দিনে ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে 'সংগচ্ছদ্ধং সংবদদ্ধং' এই উপদেশ কিংবা আদেশ দিতে আমরা বাধ্য। আমাদের সকলেরই তাই একই বাদ, সে হচ্ছে অধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আর আমাদের সকলেরই গম্যস্থান একই — স্বরাজ্যে।

প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের মূল্য যে কি, তা দেশের লোক স্বরাজ্যে পৌঁছবামাত্র টের পাবে। অধীনতার যোগসূত্র স্বাধীনতার স্পর্শে ছিঁড়ে যাবে। প্রভুত্বের চাপে দাসের দল একাকার হয়ে যেতে পারে, কিন্তু স্বাধীন মানব তার স্বধর্মের চর্চা করে তার স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলবে। তখন ভারতবর্ষের নানা জাতি একাকার হবার চেষ্টা করবে না, পরস্পরের ভিতর ঐক্যস্থাপন করবার চেষ্টা করবে। আজকের দিনের কংগ্রেসি ঐক্যের সঙ্গে সে ঐক্যের আকাশপাতাল প্রভেদ হবে। বাইরের চাপে মিলিত হওয়া আর প্রীতির প্রভাবে মিলিত হওয়া একবস্তু নয়। এক জেলে পাঁচজন কয়েদির মিলন আর এক সমাজের পাঁচজন স্বাধীন

লোকের মিলনের ভিতর যে প্রভেদ আছে, আজকের ভারতের নানা জাতির কংগ্রেসি মিলনের সঙ্গে কালকের স্বরাজ্যবাসী জাতিদের মিলনের সেই প্রভেদ থাকবে। তখন প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের ভিত্তির উপরেই বাক্যগত নয়, বস্তুগত ভারতবর্ষীয় পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ গড়ে উঠবে।

ছেলেবেলায় হিতোপদেশে পড়েছি—

অস্তি গোদাবরীতীরে বিশাল-শাল্মলীতরুঃ। তত্র নানাদিগ্‌দেশাৎ আগত্য রাত্রৌ পক্ষিণো নিবসন্তি স্ম।

রাত্রিকালে নানা দিগ্‌দেশ হতে পাখিরা এসে গোদাবরীতীরে সেই শিমূল গাছে জড়ো হত কেন? — কিছুক্ষণ কচায়ন করে তার পর আরামে নিদ্রা দেবার জন্য। এ বিষয়ে সকল পক্ষীর স্বার্থ একই। কচায়ন শব্দের মানে বোধ হয় জান না। পক্ষীর ভাষায় ও-শব্দের অর্থ পক্ষীসভার রাজনৈতিক আলোচনা।

আমরাও ভারতবর্ষের এই রাত্রিকালে কংগ্রেসে গিয়ে দিন-তিনেক ধরে কচায়ন করে তার পর নিদ্রা দিই, সেও ঐ একই কারণে। এ কচায়ন করা যে সম্ভব হয়, তার কারণ ইংরেজদত্ত শিক্ষার গুণে আমাদের সকলের মুখেই এক বুলি। এ বুলি যে শুধু আমাদের মুখের কথা, মনের কথা নয়, এ অপবাদ আমি দিচ্ছি নে। আমি শুধু এই সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কংগ্রেসি পেট্রিয়টিজ্‌মের পিছনে যে মন আছে, সে হচ্ছে আমাদের সকল জাতের বিলেতি পুথিপড়া মন। সে মন আমাদের সবারই এক। কিন্তু তার নীচে যে মন আছে সে মন প্রতি জাতির নিজস্ব এবং পরস্পর পৃথক্‌। আর, আমাদের ভবিষ্যৎ সভ্যতা গড়ে উঠবে আমাদের মনের এই গভীর অন্তস্তল হতে। বিদেশি শিক্ষার ফলে এই সত্যটা ভুলে যাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে বলে আজকের দিনে ভারতবর্ষের প্রতি জাতিকে বলা আবশ্যক Know thyself, এবং প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের সার্থকতাই এইখানে। স্বজাতীয় স্বার্থসাধনের জন্য আমাদের সকলেরই আজ প্রস্তুত হতে হবে।

৫

আর বেশি এগোবার আগে একটা কথার অর্থ পরিষ্কার করা দরকার, সে কথাটি হচ্ছে স্বার্থ। ও-কথাটা উচ্চারণ করবামাত্র আমাদের চোখের সমুখে ধনধান্যের সোনার ছবি এসে দাঁড়ায়। এ তো হবারই কথা। আমরা যখন প্রাণী, ও প্রাণের সর্বপ্রধান চেষ্টা যখন আত্মরক্ষা করা, তখন অন্ন আমাদের চাইই চাই।

আর পলিটিক্সের যত বড়ো বড়ো কথা আছে তার আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক খোলস ছাড়িয়ে নিলে কি দেখা যায় না যে, তার ভিতরকার মোটা কথা হচ্ছে অন্ন? আজকের দিনে পৃথিবীতে পলিটিক্সের দুটি বড়ো কথা হচ্ছে ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ এবং বল্‌শেভিজ্‌ম, বাদবাকি আর যতরকম ism আছে সে সবই হয় ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ নয় বলশেভিজ্‌ম্‌ এর কোঠায় পড়ে। হাল পলিটিক্সের এই দুই ধর্ম এতই পরস্পরবিরোধী যে, উভয়ের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে আজ জীবনমরণের যুদ্ধ চলছে। অথচ এই উভয় পলিটিক্যাল ধর্মের ভিতর একই জিনিস আছে এবং সে জিনিস হচ্ছে অন্ন। তবে মানবজাতি যে দু ভাগ হয়ে পড়েছে সে ঐ অন্নের ভাগ নিয়ে। ক্যাপিটালিজ্‌মের মূল সূত্র হচ্ছে অল্প লোকের বহু অন্ন, আর বলশেভিজ্‌মের

মূল সূত্র হচ্ছে বহুলোকের যথেষ্ট অন্ন। আমার বিশ্বাস এ দুয়ের কোনোটিই টিকবে না। কেননা, ক্যাপিটালিজ্‌ম্ ভুলে গিয়েছে যে রুটি সকলেরই চাই, আর বলশেভিজ্‌ম্ মনে রাখে নি man does not live by bread alone, অর্থাৎ মানুষের মন বলেও একটা জিনিস আছে, অতএব পেটের খোরাক ছাড়া মানুষের মনের খোরাকও চাই, নচেৎ মানুষ পশুর সঙ্গে নির্বিশেষ হয়ে পড়ে।

এ কথা যদি সত্য হয় তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে, স্বার্থের মোটা অর্থ হচ্ছে পেটের স্বার্থ, আর পলিটিক্স ও ইকনমিক্স প্রভৃতি মুখ্যত এই স্বার্থসিদ্ধির মন্ত্রতন্ত্র। মনের স্বার্থের সঙ্গে এ মন্ত্রতন্ত্রের সম্বন্ধ গৌণ। তবে যে পেটের কথাকে আমরা আত্মার কথা বলে ভুল করি, তাব কারণ অন্নের সঙ্গে প্রাণের, প্রাণের সঙ্গে মনের, সংক্ষেপে উদরের সঙ্গে হৃদয়ের এবং হৃদয়ের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। মানুষের সুখ, মানুষের উন্নতি এই অন্ন ও মনের যোগাযোগেরই উপর নির্ভর করে। একমাত্র ভৌতিক ভাত খেয়ে মানুষ তার সৎ রক্ষা করতে পারলেও তার চিৎ ও আনন্দ রক্ষা করতে পারে না। অপব পক্ষে একমাত্র তড়িতানন্দ সেবন করে মানুষ তার আনন্দ রক্ষা করতে পারলেও তার চিৎ ও সৎ রক্ষা করতে পারে না। আর সচ্চিদানন্দ হওয়াই তো মানবজীবনেব সার্থকতা। অতএব দাঁড়াল এই যে, মানুষের পক্ষে যেমন লাঙল চাই তেমনি লেখনীও চাই, যেমন হাতুড়ি চাই তেমনি তুলিও চাই; জাতীয় জীবনে যেমন পলিটিক্স ও ইকনমিক্স চাই তেমনি বিজ্ঞান ও আর্ট, কাব্য ও দর্শনও চাই।

সুতরাং একজাতের ন্যাশনালিজ্‌মের নাম শোনামাত্র আমরা যখন সেটি অপরের ন্যাশনালিজ্‌মের বিরোধী মনে করে ভীত হয়ে উঠি, তখন বুঝতে হবে যে আমরা ন্যাশনালিজ্‌ম্ শব্দটি তার শুধু ঔদরিক অর্থে বুঝি, কেননা মানুষ মানুষের সঙ্গে শুধু অন্ন নিয়েই মারামারি-কাড়াকাড়ি করে, কিন্তু মানুষের মনোজগতের বস্তু হচ্ছে পরস্পরের আদান-প্রদানের বস্তু, এক কথায় বিশ্বমানবের সম্পত্তি কোনো জাতিবিশেষের স্থাবর সম্পত্তি নয়। যখন কোনো ব্যক্তি অপর জাতের সঙ্গে মনের কারবাব বন্ধ করবার প্রস্তাব করেন, তখন বুঝতে হবে যে তিনি হচ্ছেন ঘোর মেটিরিয়ালিস্ট, কেননা তাঁর বিশ্বাস যে mind-ও matter এর মতো দেশের গণ্ডিতে বদ্ধ। এ কথাটা এখানে উল্লেখ করলুম এইজন্যে যে, এ দেশে নিত্যই দেখা যায় যে, আধ্যাত্মিকতার বেনামিতে জড়বাদ যেমন শতমুখে প্রচার হচ্ছে তেমনি দেশময় নির্বিচারে গ্রাহ্যও হচ্ছে। এইখানে একটা কথা বলে রাখি। ঔদরিক স্বার্থসাধন করবার চেষ্টাটা মোটেই নিন্দনীয় নয়; ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও নয়, জাতিবিশেষের পক্ষেও নয়। সুতরাং পলিটিক্সের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে জাতীয় অন্নসমস্যার সমাধান করা। আর, বলা বাহুল্য, এ সমস্যার মীমাংসা জাতীয় অবস্থার জ্ঞান সাপেক্ষ। কথার রাজ্য থেকে কাজের রাজ্যে নেমে এলেই আমাদের বস্তুজগতের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে অনেকটা আবদ্ধ হয়ে পড়তে হয়। দেশ-শাসনের ভার যখন আমাদের হাতে আসবে তখনই দেখা যাবে যে, প্রতি প্রদেশ তার নিজের সামাজিক ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তখন যা আমাদের বিশেষ কাজে লাগবে সে হচ্ছে প্রাদেশিক-পেট্রিয়টিজ্‌ম্। যে রুসোর পলিটিক্যাল মতামতের ঘষা-পয়সা নিয়ে আমাদের পেট্রিয়টিজ্‌মের আগাগোড়া কারবার তিনিই বলে গেছেন যে, কর্মক্ষেত্রে পেট্রিয়টিজ্‌মকে অনেকটা সংকুচিত করে আনতে হয়।

সে যাই হোক, আমাব বাঙালি-ন্যাশনালিজ্‌ম্ মুখ্যত মানসিক এবং গৌণত রাজনৈতিক। আমাদের মনেব স্বরাজ্য লাভ করা ও রক্ষা কবা এবং তার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করাই হচ্ছে আমার প্রধান ভাবনা। রাজনৈতিক স্ববাজ্য মনে স্বরাট্ হবার একটি উপায় মাত্র, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬

এখন বাঙালির মনের বিশেষত্ব যে কোথায় তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাক। এ পরিচয় দেওযাটা একেবাবে অসম্ভব নয, কেননা বাঙালিব ন্যাশনাল সেলফ্ কন্‌শাসনেস কতকটা প্রবুদ্ধ হয়েছে। এই ন্যাশনাল সেলফ্-কন্‌শাসনেস কথাটা আমাদের স্বদেশি-যুগে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সেকালে অবশ্য দেশের লোক এ কথাটা তার পলিটিকাল অর্থেই বুঝত। তখন আত্মজ্ঞান অর্থে আমবা বুঝতুম আমাদের পরাধীনতা সম্বন্ধে জাতীয় চৈতন্য ও বেদনা। বলা বাহুল্য, এই সংকীর্ণ অর্থে সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মজ্ঞান ও বাংলার আত্মজ্ঞান একই বস্তু। কিন্তু এ বোঝাটা ভুল বোঝা। কেননা, তা হলে স্বাধীন জাতের পক্ষে জাতীয় আত্মজ্ঞান বলে কোনো জিনিসই নেই। কিন্তু তা যে আছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, ঐ সমস্ত পদটি ইউরোপ থেকে এ দেশে আমদানি করা হয়েছে, ও-পদের বিলেতে জন্ম। কথাটা এতই বিলেতি যে, আমাদের কোনো ভাষায় ওটির সঠিক তরজমা করা চলে না।

মানুষ মাত্রেই মুখ্যত এক হলেও সকলের শরীরের চেহারাও যেমন এক নয়, সকলের মনের চেহারাও এক নয়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যেমন প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে, জাতির সঙ্গে জাতিরও তেমনি প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে। আর, ব্যক্তিই বল আর জাতি বল, উভয়েরই উন্নতির মানে হচ্ছে এই স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করে তোলা, কেননা সেই চেষ্টাতেই তার সুখ, সেই চেষ্টাতেই তার মুক্তি। যাতে করে এই স্বাতন্ত্র্য চেপে দেয় তাই হচ্ছে বন্ধন। জীবনের বন্ধনের চাইতে মনের বন্ধন কম মারাত্মক নয়। আর আমাদের মনের যে একটা বিশেষ ধাত আছে সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। একটা জানা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। জাতীয় মনের আসল প্রকাশ সাহিত্যে। বর্তমান ভারতবর্ষে বাংলা সাহিত্যের তুল্য দ্বিতীয় সাহিত্য নেই। ভারতবর্ষের অপব কোনো জাতি দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদান করতে পারে নি। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, মনোজগতে আমরা বাকি ভারতবর্ষের সঙ্গে একলোকে বাস করি নে। আমাদের অন্তরে জ্ঞানের ক্ষুধা আছে, কাব্যরসের পিপাসাও আছে। এব ফলে মনোজগতে আমাদের কাছে বসুধৈব কুটুম্বকম্, এবং সেই কারণে ইউরোপের সাহিত্যবিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা যতটা আত্মসাৎ করেছি, ভারতবর্ষের অপর কোনো জাত তদনুরূপ পারে নি।

ইউরোপীয় শিক্ষা যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের অল্পবিস্তর বদল করেছে এ কথা আমি মানি, কেননা না মেনে উপায় নেই। আমাদের পলিটিকাল মতামত যে ক থেকে ক্ষ পর্যন্ত আগাগোড়া বিলেতি জিনিস, এ তো সবাই জানে। দেশসুদ্ধ লোকের পলিটিকাল আত্মা যে ইউরোপের হাতে গড়ে উঠেছে এ কথা এক পেশাদার ন্যাশনালিস্ট ছাড়া আর কারো অস্বীকার করবার প্রয়োজন নেই।

তবে অপর ভারতবাসীর সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই যে, আমরা ইউরোপের কাছে এক পলিটিক্স ছাড়া আরো কিছু বিদ্যা আদায় করেছি। ইউরোপের কাব্যবিজ্ঞানের প্রভাব আমাদের মনের উপর নিতান্ত কম নয়। ল্যাফ্‌কাডিয়ো হার্ন-এর বইয়ে পড়েছি যে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক জাপানিদের মনের কোনোখানে স্পর্শ করে না। অপর পক্ষে শেক্‌স্‌পীয়রের কাব্য আমাদের মনের সকল তারে ঘা দেয়। সে কাব্য আমাদের মর্ম স্পর্শ করে এবং সে স্পর্শে আমাদের অন্তরাত্মা পুলকিত হয়ে ওঠে।

শুধু কাব্য নয়, ইউরোপের বিজ্ঞানও আমাদের অতি প্রিয় সামগ্রী। এ বিশ্ব আমাদের কাছে শুধু জড়জগৎ নয়, ভাবের জগৎও বটে, ইন্দ্রিয়ের দর্শনের স্পর্শনের, মনের ধ্যানধারণার বস্তু। আমরা জানি রস খালি কথায় নেই, বিশ্বেও আছে; রূপ খালি আর্টে নেই, প্রকৃতিতেও আছে। এ বিশ্বের অসীমতা ও অসীম বৈচিত্র্য; তার অন্তর্নিহিত শক্তির ছন্দোবদ্ধ লীলা আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। এই বিশ্ব নামক মহাকাব্যের রসাস্বাদ করবার কৌতূহল আমাদের অনেকেরই মনে আছে। তাই-না বাঙালি যুবক আইনস্টাইনের নবাবিষ্কৃত আলোকতত্ত্বের পরিচয় নিতে এত ব্যাকুল, যদিচ তারা সবাই জানে এই নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব কর্মে ভাঙিয়ে নেবার আশু সম্ভাবনা নেই। আমাদের জাতীয় মন জ্ঞানমার্গের পথিক বলেই বাংলায় জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায়ের আবির্ভাব হয়েছে। মনোজগতের বস্তুর প্রতি আমাদের এই আন্তরিক অনুরাগ আছে বলেই বিজ্ঞানের মন্ত্রভাগ আয়ত্ত করবার দিকে বাঙালির এতটা ঝোঁক।

এ-সব কথা শুনে অনেকে হয়তো বলবেন যে, বাঙালির জ্ঞান জ্ঞানমাত্রই থেকে যায়, তা কোনো কাজে লাগে না। বিজ্ঞানের যন্ত্রভাগ যে বাঙালি ততটা করায়ত্ত করতে পারে নি, এ কথা সত্য। আমার বিশ্বাস, এ অক্ষমতার জন্য যত না দায়ী আমাদের প্রকৃতি, তার চাইতে ঢের বেশি দায়ী আমাদের অবস্থা। কলকারখানা গড়বার শক্তির অভাব সম্ভবত বাঙালির নেই, অভাব আছে শুধু সুযোগের। সে যাই হোক, যা সত্য ও যা সুন্দর তার প্রতি বাঙালি মনের এই সহজ আনুকূল্যের প্রশ্রয় দিয়েই তার জাতীয়-জীবন সার্থক করে তোলা যেতে পারে। যেমন ব্যক্তি বিশেষের তেমনি জাতিবিশেষের প্রকৃতির উলটো টান টানতে গেলে তার জীবনকে ব্যর্থতার দিকে অগ্রসর করা হয়। আজ ইউরোপীয় শিক্ষা বয়কট করবার যে হুজুক উঠেছে তাতে যে বাঙালি সোৎসাহে যোগদান করতে পারছে না, তার কারণ যে-বাঙালির চিন্তা করবার অভ্যাস আছে সেই জানে যে উচ্চশিক্ষাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় শক্তি উদ্‌বোধিত করবার সর্বপ্রধান উপায়। কোনো জাতির পক্ষে স্বধর্ম হারিয়ে স্বরাট্‌ হবার চেষ্টাটা বাতুলতা মাত্র। ভারতবাসী যখন স্বরাজ্য লাভ করবে তখন ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশই তার শিক্ষাদীক্ষার উপর অপর কোনো প্রদেশকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না। প্রতি স্ববশ সজ্ঞান জাতির একটা-না-একটা বিশেষ জাতীয় আদর্শ থাকে, এবং সেই আদর্শ অনুসারেই সে জাতি তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। যার নিজত্ব বলে কোনো জিনিস নেই, অথবা নিজত্ব যে রক্ষা করতে বিকশিত করতে না চায়, তার পক্ষে স্বাধীনতার কোনো প্রয়োজন নেই; শুধু তাই নয়, তার কাছে উক্ত শব্দের কোনো অর্থও নেই। স্বত্বসাব্যস্ত করবার জন্যই তো স্বাধীনতার আবশ্যক।

আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের পুথিপড়া মনের সঙ্গেও বাকি ভারতবর্ষের পুথিপড়া মনের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। সুতরাং আমাদের পলিটিকাল মনও অন্য প্রদেশের পলিটিকাল মনের ঠিক অনুরূপ নয়। মনে রেখো, মানুষের পলিটিকাল মন তার সমগ্র মনের বহির্ভূতও নয়, তার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতও নয়। অবশ্য একদলের কংগ্রেসওয়ালা আছেন যাঁরা এ কথা মানেন না; যদি মানতেন, তা হলে তাঁদের দলে টিকিওয়ালা-ডিমোক্রাট-রূপ অদ্ভুত জীবের এতটা প্রাধান্য হ'ত না।

ডিমোক্রাটিক স্বরাজ্য লাভ করতে হলে আমাদের মনের যে বদল আবশ্যক, এ জ্ঞান আমাদেব যুবকশ্রেণীর মনে যে প্রবেশ করেছে তার পরিচয় আমি পাঁচজনের সঙ্গে কথায়বার্তায় নিত্যই পাই। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করব না, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে দেশের অধিকাংশ লোককে দাস ও স্ত্রীলোককে দাসী করে রাখব, অথচ পৃথিবীর ডিমোক্রাটিক জাতিদের মতো রাজনৈতিক জগতে স্বরাট্ হব, এরূপ মনোভাব যে যুগপৎ লজ্জাকর ও হাস্যকর এ ধারণা এ যুগের বহু বাঙালির মনে জন্মেছে। তবে এ মনোভাব যে আমাদের দৈনিক সংবাদপত্রে ও বক্তৃতার রঙ্গমঞ্চে গর্জে ওঠে নি, তার কারণ নিজের বিরুদ্ধে হুজুক করা চলে না। যে ভাব মনে পোষণ করবার জন্য, যে কাজ করবার জন্য আমরা মনে মনে লজ্জিত হই, তা নিয়ে প্রকাশ্য ঢাক পেটানো অসম্ভব; আমরা ঢাক পেটাতে পারি শুধু আমাদের কাল্পনিক আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা নিয়ে। কতকটা শিক্ষার বলে, কতকটা পরীক্ষার ফলে, আমরা আমাদের প্রকৃতি ও শক্তি দুয়েরই কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করেছি। নিজের ত্রুটির জ্ঞানও আত্মজ্ঞানেরই একাংশ; এবং আত্মজ্ঞান আমাদের মনে জন্মেছে বলে তারই উপর আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে চাই। আমাদের অন্তরের বল আমরা পুষ্ট-পরিপুষ্ট করতে চাই, তাই আমরা শিক্ষার জাতিবিচার করে তাকে আচরণীয় কিংবা অনাচরণীয়ের কোঠায় ফেলতে চাই নে; আর আমাদের দুর্বলতা আমরা পরিহার করতে চাই বলে আমরা লোকের জাতিবিচার করে তাকে আচরণীয় কিংবা অনাচরণীয় করে রাখা পেট্রিয়টিক কাজ বলে মনে করি নে। কোনো জাতির পক্ষে তার চিরাগত সংস্কাব থেকে মুক্তিলাভ করে নবজীবন ও নবশক্তি লাভ করা সহজসাধ্য নয়; এবং সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করবার সাধনপদ্ধতির নাম রাজনৈতিক হুজুক নয়, কেননা ক্ষণিক উত্তেজনার পিঠ-পিঠ আসে স্থায়ী অবসাদ। জাতীয় ঐশ্বর্য অবশ্য জাতীয় কৃতিত্বের উপর গড়ে ওঠে, এবং সে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় সাহিত্যে ও সমাজে, দর্শনে ও ধনে, বিজ্ঞানে ও আর্টে। মানুষের পক্ষে কিছু ত্যাগ করা, যথা উপাধি কিংবা ওকালতি, শুনতে মহা কঠিন; কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি কঠিন, কিছু করা অর্থাৎ কৃতী হওয়া। জীবনের কাছ থেকে পালানো সহজ, তার সঙ্গে লড়ে জয়ী হওয়াই কঠিন; কেননা এ লড়াই চিরজীবনব্যাপী, এক মুহূর্ত তার বিরাম নেই। দেখতে পাচ্ছ আমি রাজসিক মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছি। একে আমি বৈদিক-তান্ত্রিক-সমাজে জন্মগ্রহণ কবেছি; তার উপর আবার ইউরোপের রাজসিক সভ্যতার আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি; সুতরাং আমার কাছ থেকে তুমি অন্য কোনো মনোভাবের পরিচয় পাবার আশা করতে পার না। রাজসিক মন সাত্ত্বিক মনের চাইতে নিকৃষ্ট কি না বলতে পারি নে, তবে তা যে তামসিক মনের চাইতে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। আব

এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, দেশে আজকাল যে-সকল মনোভাব সাত্ত্বিক বলে চলছে, সে-সব পুরোমাত্রায় তামসিক। সে-সবের মূলে আছে অজ্ঞতা আর ঔদাসীন্য, এক কথায় মনের জড়তা।

আমি বিশ্বাস করতে ভালোবাসি যে, আমার মন এ যুগের বাংলার মন। যদি তাই হয় তো বাঙালির ন্যাশনালিজ্‌মের আদর্শ যে কি, তা অনুমান করা কঠিন নয়। সমগ্র ভারতবাসীকে ডোরকৌপীন পরানো আমাদের আদর্শ হতে পারে না। আজকের দিনে বাঙালির যদি কোনো আন্তরিক প্রার্থনা থাকে তো সে এই —

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

কিন্তু এ প্রার্থনা কোনো বাইরের শক্তির কাছে নয়, নিজের অন্তরনিহিত শক্তির কাছে। কারণ এ সত্য আমরা আবিষ্কার করেছি যে, বিদ্যা যশ লক্ষ্মী রূপ জয় — এ-সকলই আত্মবলে অর্জন করতে হয়, প্রার্থনাবলে নয়। যদি কেউ বলেন যে, এ আইডিয়ালের মধ্যে তো সেল্‌ফ-স্যাক্রিফাইস এর কথা নেই? তার উত্তরে আমি বলি, সেল্‌ফ-স্যাক্রিফাইস কোনো জাতির আদর্শ হতে পারে না, জাতির পক্ষে একমাত্র আদর্শ হচ্ছে সেল্‌ফ-রিয়ালাইজেশন। আর তার একমাত্র উপায় হচ্ছে বহু লোকের পক্ষে সেল্‌ফ-রিয়ালাইজেশনের ব্রত অবলম্বন করা।

আমার শেষ কথা এই যে, যে দেশকে আমি অন্তরের সহিত ভালোবাসি, সে বর্তমান বাংলা নয়, অতীত বাংলাও নয় — ভবিষ্যৎ বাঙলা, অর্থাৎ যে বাংলা আমাদের হাতে ও মনে গড়ে উঠছে। সুতরাং আমার বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্ বর্তমান ভারতবর্ষীয়-পেট্রিয়টিজ্‌মের বিরোধী নয়। আর এক কথা, যে ন্যাশনালিজ্‌ম্ বিদ্বেষবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ন্যাশনালিজ্‌মের ফলে শুধু পরের নয় নিজেরও যে সর্বনাশ হয়, গত ইউরোপীয় যুদ্ধ এই সত্য যার চোখ আছে তারই চোখের সুমুখে ধরে দিয়েছে।

□ *প্রবন্ধসংগ্রহ*, ১৯৬৮

সম্বন্ধ

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী

আমার কোনো এক পূজনীয় আত্মীয় বলিতেন যে, মানুষ বিবাহপূর্বে দ্বিপদ, বিবাহান্তে চতুষ্পদ এবং সন্তানাদি হইলে ষট্‌পদ হইতে ক্রমশ অষ্টপদ হইয়া অবশেষে মাকড়সার জালে জড়াইয়া পড়ে।

এক এক সময়ে আমার মনে হয় এই মাকড়সার সঙ্গে মানুষের অনেক মিল আছে। আমরা সকলে তেমনি 'আপনি রচিত জালে আপনি জড়িত', তেমনি সংসারবৃক্ষে সুখদুঃখের ছায়ালোকে দোদুল্যমান, তেমনি অদ্ভুত অধ্যবসায় ও নিপুণতার সহিত এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনজাল বুনিতে ব্যস্ত। সাদৃশ্য-তালিকা এইখানেই সমাপ্ত করিলাম, এবং আমরা অন্যান্য মানুষ-মাছিকে ঠিক তেমনি করিয়া নিজের জালের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া শুষিয়া খাইতে সর্বদা উৎসুক কি না, সে কথা উহ্য রাখিলাম। অন্তত সকলের সে বদ্‌ অভ্যাসটি নাই, ইহাই মনুষ্যজাতির সৌভাগ্য এবং শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ।

মাকড়সা কী কারণে জাল বিস্তার করে, তাহা পোকাতত্ত্ববিৎরাই বলিতে পারেন। কিন্তু আমার কল্পিত মানুষ-মাকড় অদৃশ্য তন্তুদ্বারা এইরূপে অপরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। সে যেন নিজে একটি কেন্দ্র, এবং নানা লোকের সঙ্গে নানা সূত্রে তাহার যে সম্বন্ধ, তাহাই তাহার জীবনজাল। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সারে আমরা জন্মাবধি এই জাল বুনিতেছি। শিশু ভূমিষ্ঠ না হইতেই তাহার কত সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মৌমাছির চাক অথবা মাকড়সার জাল যেরূপ রেখাগণিতের অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে গঠিত, মানুষের সমগ্র জীবনজাল তত সুনির্দিষ্ট না হইক, অন্তত তাহার গোড়া পূর্ব হইতেই বাঁধা থাকে। যিনি অদৃষ্টবাদী, তিনি বলেন আমরণ সম্পূর্ণ নকশাই জন্মপূর্বে প্রস্তুত থাকে, আমাদের অঙ্গুলিচালনার ক্ষমতা আছে মাত্র। আবার যিনি পুরুষকারে বিশ্বাস করেন, তিনি বলেন ভালোমন্দ বুনানি আমাদের হাতে; উপকরণ পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমরা যন্ত্রী, যন্ত্র নহি। দৈবশক্তি যদি প্রবল হয়, তা হলে মানুষের জীবন য়ুরোপীয় লিখিত সংগীতের ন্যায় আগাগোড়া বিধিবদ্ধ, এবং জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত নির্দিষ্ট পথে চলিতে বাধ্য, মানুষ উপলক্ষ বৈ নয়। আর আত্মশক্তিই যদি প্রবল হয়, তা হলে প্রতি জীবনের রাগিণী ও ঠাট আদ্যাশক্তির হাতে বাঁধা হইলেও, তাহা আমাদের দেশের সংগীতের ন্যায় বহু বৈচিত্র্যের সম্ভাবনাপূর্ণ, গায়কের ক্ষমতা ও ইচ্ছানুসারে বিস্তারিত, এবং পুনঃপুনঃ পুনরারব্ধ।

সে যাহা হউক, আমার মাকড়সা অত তত্ত্বজ্ঞানের ধার ধারে না। তত্ত্বকথায় তাহার চতুর্দিকের বাতাস অনুরণিত বটে, কিন্তু তাহার এক কান সেদিকে থাকিলেও জালবোনা

স্থগিত রাখিয়া সে-সব কথার মীমাংসা করিতে বসা তাহার পক্ষে অসম্ভব। আমরা আজ আছি কাল নাই সত্য, কিন্তু ইতিমধ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা চাই, এবং আশপাশের সঙ্গে দেনাপাওনার সম্বন্ধ স্থাপন করাই তাহার একমাত্র উপায়। পরের দ্রব্য না বলিয়া লওয়াকে সাধারণত বলে চুরি। কিন্তু যাহা কিছু অপরকে দিতে পারিতাম, অথচ দিই নাই — সে-প্রকার চুরির জন্য স্বতন্ত্র ধারা ও কারা আবশ্যক নহে কি?

শৈশবকালে আমাদের দেনা অপেক্ষা পাওনার ভাগই বেশি। তখন আমরা গ্রহণ করিতেই ব্যস্ত, দান করিবার ক্ষমতা তখনও জন্মায় নাই। পিতামাতা আত্মীয়স্বজন আলো-বাতাস খাদ্যপানীয় সবই আমাদের শরীরমন গড়িয়া তুলিবে, তবে তো আমবা কিঞ্চিদপি প্রতিদান দিতে সমর্থ হইব। আগে আহরণ, পরে বিতরণ;আগে সংকোচন, পরে প্রসারণ। জ্ঞানোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই চারি দিক হইতে 'দাও' 'দাও' রব উত্থিত হয়, এবং চিরজীবন সেই প্রার্থনা অল্পবিস্তর পূর্ণ করিতেই কাটিয়া যায়। পিতামাতা বলেন ভক্তি দাও, শিক্ষক বলেন মন দাও, প্রণয়ী বলে প্রেম দাও, বন্ধু বলে প্রীতি দাও, সমাজ বলে সৌজন্য দাও, দেশ বলে কাজ দাও, সুখী বলে হাসি দাও, দীনদুঃখী বলে করুণা দাও, সন্তান বলে স্নেহ দাও, পাওনাদার বলে টাকা দাও — অবশেষে মৃত্যু বলে প্রাণ দাও, না দিলেও প্রাণ কাড়িয়া লইয়া যায়। আর বুঝি বা ভগবান বলেন সব দাও।

মাকড়সা বেচারি কী করে, গোরু যেমন ঘানিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তেল জোগায়, সেও তেমনি অহরহ স্বীয় জীবনচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে মর্মজাল ও কর্মজাল বুনিতে থাকে। মর্মই তো কর্মের প্ররোচক ও নিয়ন্তা, এবং কর্মস্রোত ও চিন্তাস্রোত বরাবর পাশাপাশি বহিয়া পরস্পরকে শোধন করিতেছে বলিয়াই মনুষ্যজীবনে ক্রমোন্নতির আশা করা যায়। কেহ কেহ আজকাল সত্যই বিশ্বাস করেন যে, কোনো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রশ্মিদ্বারা মানুষ পরস্পরের উপর মানসিক প্রভাব বিস্তার করে, এবং কর্মযোগ অপেক্ষা নিগূঢ় যোগে একের চিন্তা অপরকে স্পর্শ করে। সে যোগ, চর্মচক্ষে না হউক, দিব্যচক্ষে দ্রষ্টব্য। অবশ্য এ স্থলে আমরা বহির্মুখী রশ্মির কথাই বলিতেছি, কিন্তু বলা বাহুল্য যে বাহির হইতে অন্তর্মুখী রশ্মিজালও ক্রমাগত আসিতেছে। এই আদানপ্রদান টানাপোড়েনেই তো জীবন-নকশা এত বিচিত্র, এবং কপাল ও হাতযশ অনুসারে এত সুন্দর হয়। নিজের সহিত নিজের পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হইতে দূর দূরতর দূরতম সম্বন্ধ পর্যন্ত গড়াইয়া ছড়াইয়া গাঢ়বর্ণ কেমন অলক্ষিতে ফিকা রঙে মিলাইয়া আসে, তাহা সহজেই পরিকল্পনা করা যায়। আত্মবৎ সম্বন্ধই প্রত্যেকের নিকট বেশি প্রকট, তাহা নিশ্চয়ই হৃদয়ের রক্তরাগে লাল। তার পরে যে যতদূর পৌঁছিতে পারে। গোড়া যেমন অহং-এ স্পষ্ট প্রোথিত, মাঝখান যেমন অসংখ্য চিত্রবিচিত্র নানামুখী সূত্রে গ্রথিত, শেষটা তেমনি কোন্ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত, তাহা অপেক্ষাকৃত অনির্দিষ্ট। প্রকৃতিভেদে সীমা কমবেশি স্পষ্ট। এমন সীমাবদ্ধ স্বার্থপর জীব বোধ হয় কেহ নাই, যাহার মন কোনো-না-কোনো সময়ে নিজের জীবন-কোটর হইতে অজানা অসীমে দূত না পাঠায়। আবার, এমন ক্ষণজন্মা পুরুষও আছেন যাঁহারা অহমিকার লাল হইতে শুরু করিয়া আত্মীয়তা সামাজিকতার গোলাপি আভার মধ্য দিয়া বিশ্বপ্রেমের শেষ শ্বেত আলোক পর্যন্ত অটুটভাবে জীবনজাল বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যেখানে সাধারণ মানুষের মন দূরবিন না কষিয়া কিছু দেখিতেই পায় না, হৃদয়ঙ্গম করা তো দূরের কথা।

কিন্তু তন্তুজাল ও রশ্মিজালে মিলিয়া মিশিয়া উপমা ক্রমে ঘোরালো হইয়া পড়িতেছে, অথচ পূর্বেই বলিয়াছি আমার মাকড়সা সরলপ্রকৃতির সহজ লোক, অসাধারণ বড়োলোক বা ভাবুক নহে। শেষ পরিণাম ভাবিতে সে সময় নষ্ট করে না, কারণ তাহার অবসর কম ও কাজ অনেক। তাহার সাদা চোখের দৃষ্টি যতদূর যায়, সেই গণ্ডির মধ্যে আপনা হইতে যাহারা আসিয়া পড়ে, তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইতে ও রক্ষা করিতে পারিলেই সে যথালাভ মনে করে। সম্বন্ধের সংখ্যা বা দূরত্বের উপর মহত্ত্ব নির্ভর করে হয়তো, কিন্তু সামঞ্জস্যরক্ষার উপর সৌন্দর্য নির্ভর করে, সে কথা অন্তত স্ত্রীমাকড়সার মনে রাখা উচিত। আমাব সময়ে সময়ে মনে হয আমবা পবেব দেখাদেখি এই সম্বন্ধসূত্র অনর্থক বেশি লম্বা ও জটিল করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহাকে একপ্রকার দীর্ঘসূত্রতা বলা যাইতে পারে। শিরা উপশিরা যত দূরে ছড়াইবে ততই হৃৎকেন্দ্র হইতে রক্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া শক্ত হইবে, এবং যেখানে মন দিতে পারিব না সেখানে শুধু শুষ্ক কাজ দিয়া কী ফল? এই হৃৎপদার্থের অভাবেই পৃথিবীর বড়ো বড়ো ধর্ম গোঁড়ামিতে ও বড়ো বড়ো কথা বাঁধিগতে ক্রমশ পরিণত হয়; এবং বারংবার পুনরাবৃত্তিতে জীর্ণ সংস্কারকে এই হৃদামৃতে সরস ও সতেজ করিবার নিমিত্তই যুগে যুগে মহাত্মার সম্ভাবনা আবশ্যক হয়। মৌচাকে যতক্ষণ মধু থাকে ততক্ষণই তাহার সার্থকতা, নহিলে সে রিক্ত পরিত্যক্ত নিরর্থক কোষমাত্র। সেকালে মেয়েদের কাছে অনাত্মীয় যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারাও আত্মীয়ের পাতানো সম্পর্ক ও স্নেহ লাভ করিতেন। এখন কি আমরা সেই ব্যক্তিগত সম্বন্ধের বদলে সভাসমিতির নীরস শাখাপ্রশাখা বিস্তার করা শ্রেয় মনে করিব? চিঠির সঙ্গে টেলিগ্রামের যে তফাত, ব্যক্তিগত ও সমিতিগত সম্বন্ধে সেই তফাত। একটি সরস সজীব ও স্বপ্রকাশ, আর-একটি শুষ্ক কঙ্কালসার ও কাজের নির্বাহক কিন্তু ভাবের হন্তারক। আজকাল হয়তো আমরা পাড়াপ্রতিবেশীর বিপদে-আপদে খোঁজ লই না, অথচ আফ্রিকার দুঃখমোচনে বদ্ধপরিকর হওয়া উন্নতির লক্ষণ মনে করি। মেয়েদের সংকীর্ণ পারিবাবিক গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে হইবে তাহা বলি না, কিন্তু মেয়েপুরুষ উভয়েরই উচিত নিকট হইতে দূরের সব পথটুকু মাড়াইয়া চলা, ডিঙাইয়া যাওয়া নয়। পুত্রকে ত্যাজ্য করিয়া পৌত্রের জন্য প্রাণ দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। কেবলমাত্র একটি ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া থাকিলে বাতাস দূষিত হয় বলিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বেলুনে উড়িবার দরকার দেখি না, জানালা খোলা রাখিলে এবং মধ্যে মধ্যে বায়ুপরিবর্তন করিলেই যথেষ্ট। তেমনি অতিসংকীর্ণতা জীবনমনের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল বলিয়া, অতিপ্রসারতাও কিছু অনুকূল নহে। এই ঘর ও পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা আজকালকার দিনের একটি প্রধান সমস্যা। কেননা, পূর্বাপেক্ষা পরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা অনেক সহজসাধ্য হইয়াছে, অথচ সেই কারণেই মন বিক্ষিপ্ত এবং জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়াছে বলিয়া সাবধান থাকা আবশ্যক। প্রত্যেকের হৃদয়বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মক্ষমতার একটি স্বাভাবিক সীমানা আছে, সেটি লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিলে অনর্থক বলক্ষয় হয়। অবশ্য সেই সীমানা অগ্রসর করিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত, নহিলে জড়তার অন্ধকূপে পড়িবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু হৃদয় যাহাতে পিছাইয়া না পড়ে, হাত বাড়াইবার সময় সেদিকে যেন লক্ষ্য থাকে। জীবনযাত্রাও একটি শোভাযাত্রা হইতে পারে, যদি আমরা তাহার

শিল্পচাতুর্য আয়ত্ত করিতে পারি — এবং এই শিল্পকার্যের মতো মহৎ ও সুন্দর শিল্প আর নাই। বাঙালি পুরুষে যদি সেই মধুচক্র রচনা করিতে পারেন, 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'; এবং বাঙালি স্ত্রীলোকে যদি 'পৌরজন'কে সেই আনন্দ বিতরণ করিতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাদের জীবন যথেষ্ট সার্থক হয়। পুরুষরা অবশ্য সংসারের অনেক নীরস কাজ করিতে বাধ্য, কাহারও না কাহারও তো করিতেই হইবে। কিন্তু তাঁহাদেরও জীবনের সুযাত্রার পক্ষে অবসর আবশ্যক, এবং মেয়েদের পক্ষে তো নিতান্তই আবশ্যক, কারণ অবকাশেই সেই-সকল ফুল ফোটে, যাহাতে সংসার মরুময় না হইয়া কখনও কখনও 'নন্দনগন্ধমোদিত' হয়; অবকাশই সেই রন্ধ্র, যাহার মধ্য দিয়া 'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর'।

মানুষের সহিত মানুষের যেমন দেনাপাওনার সম্বন্ধ, মনুষ্যেতর প্রকৃতির সহিতও কি তাহাই? প্রকৃতির নিকট হইতে আমরা যেন শুধু পাই মনে হয়, প্রতিদানে কিছু দিই না। শিশিরসিক্ত স্নিগ্ধ উষায়, রৌদ্ররঞ্জিত উদাস দিবসে, সূর্যাস্তমণ্ডিত স্বর্ণসন্ধ্যায়, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজতনিশীথে যখন আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য পান করি, তখন কি কিছু দান করি? না, মনের তন্ত্রীরাজির উপর সৌন্দর্যলক্ষ্মীর অবাধ হস্তসঞ্চালন নীরবে অনুভব করি মাত্র! যিনি নীরব থাকিতে না পারেন, তিনি প্রকাশের প্রকার অনুসারে কবি বা শিল্পী হন, কিন্তু তাহাতে প্রকৃতিকে কিছু প্রতিদান করা হয় কি না সন্দেহ, সময়ে সময়ে প্রতিশোধ লওয়া হয় বটে। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ' রীতিমতো বিচার করিতে না বসিয়াও বলা যাইতে পারে যে, বাহিরের সৌন্দর্যের সহিত আমাদের হৃদয়ের যে সম্বন্ধ তাহাই শিল্পকলা, তাহার কার্যকারণ-শৃঙ্খলার সহিত আমাদের বুদ্ধির যে সম্বন্ধ তাহাই জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শন, এবং তাহার দ্বারা উদ্দেশ্যসাধনের সহিত আমাদের দ্বারা নির্ধারিত উপায়ের যে সম্বন্ধ তাহাই আজকালকার বহুমান্য efficiency বা কার্যকুশলতা।

মনুষ্যনির্মিত বস্তুতেও গঠনের সহিত উদ্দেশ্যের একটি সম্বন্ধ আছে, সেটি যথাযথ রক্ষা করিতে না পারিলেই সৌন্দর্যচ্যুতি ঘটে। অবশ্য প্রকৃতি নিজ উদ্দেশ্যসাধনের কৌশলে যত সিদ্ধহস্ত, আমরা তাহার তুলনায় আনাড়ি মাত্র, তবু যে শিল্পী যত গুণী তিনি তত লক্ষ্যভেদে পটু, এবং সত্যের সহিত সুন্দরের মিলনসাধনে সমর্থ। হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে জগতের সৌন্দর্যভাণ্ডারে মানুষ কিছু কম দ্রব্যসম্ভার সরবরাহ করে নাই — যাহা যুগে যুগে প্রকৃতির শ্রীবৃদ্ধি এবং মানবের আনন্দবর্ধন করিয়াছে ও করিতেছে। স্থাপত্যবিদ্যা ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক-একটি পুরাতন শহরের ইতিহাসে কি মাহাত্ম্য কম? আবার এক-একটি বিখ্যাত ইমারতের মর্যাদার তো সীমা-পরিসীমা নাই। তাজমহল না থাকিলে আজ আগ্রাকে কে পুছিত? মানুষ যথার্থই প্রকৃতিকে বলিতে পারে 'আমি আমার মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা — তুমি আমারই।' যমুনাব গৌরবের কতখানি প্রকৃতিরচিত এবং কতখানি কবিপ্রক্ষিপ্ত, তাহা অতিবড়ো রাসায়নিকও আজ নির্ণয় করিতে পারেন কি না সন্দেহ। তবু আমরা প্রকৃতির নিকট চিরঋণী, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ স্থলবিশেষে যেমন তাহাকে সাজাইয়াছি, তেমনি অসংখ্য স্থলে টিনের ছাদ ও কলের ধোঁয়া প্রভৃতিতে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট করিয়াছি। পক্ষান্তরে, তাহার রূপরস যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, পোষণ করে, তাহার বজ্র তাহার সমুদ্র তেমনই আমাদের দগ্ধ করে, শোষণ করে। অতএব শোধবোধ।

স্ত্রীলোক ও পুরুষের দেবদত্ত অনৈক্যের মধ্যে এই একটি প্রধান যে, স্ত্রীলোক নিকটের সঙ্গে এবং পুরুষ দূরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে স্বভাবত পটু। কারণ পুরুষ সৃষ্টিকর্তা, স্ত্রীলোক রক্ষাকর্তা (এবং বালক প্রলয়কর্তা!); যিনি রক্ষক তিনি গচ্ছিত দ্রব্য হইতে বেশি দূরে গেলে চলে না। গৃহ এবং সমাজই নারীর নিকট গচ্ছিত সেই ধন, সুতরাং নারী তাহাই লইয়া পড়িয়া আছে ও পাহারা দিতেছে। তাহার শরীর ও মন, বুদ্ধি ও হৃদয় সবই ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণে সর্বদা নিযুক্ত, সুতরাং বাহিরের প্রতি তাহার লক্ষ করিবার প্রবৃত্তি ও অবসর স্বভাবতই কম। সব কাজ একের দ্বারা হওয়া সম্ভবপর নহে, কার্যবিভক্তিতেই কার্যসিদ্ধি। লক্ষ্য উচ্চ হইলে তাহার সাধনে কোনো খণ্ড কাজই তুচ্ছ নহে। গৃহরচনা ব্যূহরচনা অপেক্ষা কিছুমাত্র সহজসাধ্য নহে, এবং জীবন-সংগ্রামের পক্ষে বোধ হয় বেশি বৈ কম প্রয়োজনীয় নহে। খাদ্য যেমন পুরুষে অর্জন এবং স্ত্রীলোকে বন্টন করে, তেমনি মানসিক খোরাকও পুরুষকেই অধিকাংশ জোগাইতে হয়। সত্যরাজ্যের সীমানা বাড়ানো তাঁহাদের কাজ, কিন্তু যে সত্যরত্ন মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা ও জীবনে প্রকাশ করা স্ত্রীলোকের কাজ। সেইজন্য সব দেশে ও কালে স্ত্রীলোক রক্ষণশীল, পুরুষ গতিশীল। একজনের সংকীর্ণ সামাজিক জীবন, অপরের বিস্তীর্ণ জাতীয় জীবন লইয়া কারবার। প্রাত্যহিক এবং প্রত্যক্ষ উপস্থিত জীবনযাত্রা-নির্বাহের ভার অধিকাংশ নারী অনুগ্রহ করিয়া (অথবা দায়ে পড়িয়া!) লইয়াছে বলিয়াই এতগুলি পুরুষ অপ্রত্যক্ষ এবং অনুপস্থিতের প্রতি এতটা মন দিতে পারে। তাই নারী মুক্তিদায়িনী। সে সর্বদাই দশচক্রে ঘূর্ণমানা ও দশভুজে কর্মনিরতা, তাই নারী শক্তিরূপিনী। সে পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইবার জন্য সততই উন্মুখ ও প্রস্তুত। তাই নারী সন্তাপহারিণী। আর পুরুষ 'ভাঙ খেয়ে বিভোর ভোলানাথ' — অন্নের ভিখারি, প্রেমের ভিখারি, সৌন্দর্যের ভিখারি, জ্ঞানের ভিখারি। আবার যখন ভিখারি নন তখন শিকারি, পশুপতি কি পশুমতি তাহা বলা কঠিন। সেই মৃগয়ামদে এখন য়ুরোপ মত্ত ত্রস্ত বিধ্বস্তপ্রায়। এই খাদ্যখাদক সম্বন্ধের তুলনা দিতে মাকড়সা হার মানে। হয় হিংস্রতর জন্তুর অবতারণা করিতে হয়, না হয় স্বীকার করিতে হয় যে ভগবানের সৃষ্টিতে মানুষ হিংস্র জন্তু হিসাবে অদ্বিতীয়। সৃষ্টির কী উদ্দেশ্য তাহা ভগবানই জানেন, আমরা সে হেঁয়ালির উত্তর দিতে ক্রমাগত চেষ্টা করি, এবং ক্রমাগতই ভুল করি — তাহা সংশোধনপূর্বক পুনরায় চেষ্টা করি, ও পুনরায় ভুল করি। এই চেষ্টা-পরম্পরায় ক্রমোন্নতি বা জীবের অভিব্যক্তি। এই নৃসিংহ-অবতারকে মানুষ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তা হলে কত যুগে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে তাহা এই বিংশ শতাব্দীর হত্যাকাণ্ড দেখিলে মনে হয় অনুমানেরও অগোচর। ইতিমধ্যে এটুকু নিশ্চিত যে, এই খাদ্যখাদক সম্বন্ধকে বাধ্যবাধক সম্বন্ধে পরিণত করিবার যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতা স্ত্রীলোকেরই আছে। সেই দূরাৎসুদূর লক্ষ্যের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আপাতত প্রত্যেকে সযত্নে আপনাপন জীবনজাল বুনিতে থাকি। কাল পূর্ণ হইলে হয়তো এই ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম জালিসমষ্টিই বেড়াজালে পরিণত হইয়া পৃথিবীকে আত্মীয়তার মঙ্গল রাখীবন্ধনে বাঁধিবে। তথাস্তু।

□ *নারীর উক্তি*, ১৩৬৫ (বিশ্বভারতী সংস্করণ)

স্ত্রীজাতির অবনতি

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

পাঠিকাগণ! আপনারা কি কোনো দিন আপনাদের দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে আমরা কি? দাসী। পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? আমরা দাসী কেন? — কারণ আছে।[১]

আদিমকালের ইতিহাস কেহই জানে না বটে;তবু মনে হয় যে পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল না। কোনো অজ্ঞাত কারণবশত মানবজাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানাবিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ উন্নতি করিতে পারিল না বলিয়া পুরুষের সহচরী বা সহধর্মিণী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।

আমাদের এ বিশ্বব্যাপী অধঃপতনের কারণ কেহ বলিতে পারেন কি? সম্ভবত সুযোগের অভাব ইহার প্রধান কারণ। স্ত্রীজাতি সুবিধা না পাইয়া সংসারের সকল প্রকার কার্য হইতে অবসর লইয়াছে। এবং ইহাদিগকে অক্ষম ও অকর্মণ্য দেখিয়া পুরুষজাতি ইহাদের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে পুরুষ-পক্ষ হইতে যতই বেশি সাহায্য পাওয়া যাইতে লাগিল, স্ত্রী-পক্ষ ততই অধিকতর অকর্মণ্য হইতে লাগিল। এদেশের ভিক্ষুদের সহিত আমাদের বেশ তুলনা হইতে পারে। একদিকে ধনাঢ্য দানবীরগণ ধর্মোদ্দেশ্যে যতই দান করিতেছেন, অন্যদিকে ততই অধম ভিক্ষুসংখ্যা বাড়িতেছে। ক্রমে ভিক্ষাবৃত্তি অলসদের একটা উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর তাহারা ভিক্ষা গ্রহণ করাটা লজ্জাজনক বোধ করে না।

ঐরূপ আমাদের আত্মাদর লোপ পাওয়ায় আমরাও অনুগ্রহ গ্রহণে আর সঙ্কোচ বোধ করি না। সুতরাং আমরা আলস্যের, — প্রকারান্তরে পুরুষের — দাসী হইয়াছি। ক্রমশ আমাদের মন পর্যন্ত দাস (cnslaved) হইয়া গিয়াছে। এবং আমরা বহুকাল হইতে দাসীপনা করিতে করিতে দাসত্বে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে আমাদের স্বাবলম্বন, সাহস প্রভৃতি মানসিক উচ্চবৃত্তিগুলি অনুশীলন অভাবে বার বার অঙ্কুরে বিনাশ হওয়ায় এখন আর

১. কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, নারী নরের অধীন থাকিবে, ইহা ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত — তিনি প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তাহার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত নারীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ স্থলে আমরা ধর্মগ্রন্থের কোন মতামত লইয়া আলোচনা করিব না – কেবল সাধারণের সহজ বুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাই বলিব। অর্থাৎ স্বকীয় মত ব্যক্ত করিতেছি মাত্র।

বোধ হয় অঙ্কুরিতও হয় না। কাজেই পুরুষজাতি বলিতে সুবিধা পাইয়াছেন "The five worst maladies that afflict the female mind are : indocility, discontent, slander, jealousy and silliness .... Such is the stupidity of her character, that it is incumbent on her, in every particular, to distrust herself and to obey her husband" (*Japan, the Land of the Rising Sun.*)

(ভাবার্থ — স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণের পাঁচটি দুরারোগ্য ব্যাধি এই — [কোনো বিষয় শিক্ষার] অযোগ্যতা, অসন্তোষ, পরনিন্দা, হিংসা এবং মূর্খতা। .... নির্বোধ স্ত্রীলোকের কর্তব্য যে প্রত্যেক বিষয়ে নিজেকে অবিশ্বাস করিয়া স্বামীর আদেশ পালন করে)।

তারপর কেহ বলেন "অতিরঞ্জন ও মিথ্যা বচন রমণী-জিহ্বার অলঙ্কার।" আমাদিগকে কেহ "নাকেস-উল্-আকেল" এবং কেহ "যুক্তিজ্ঞানহীন" (unreasonable) বলিয়া থাকেন। আমাদের এ সকল দোষ আছে বলিয়া তাঁহারা আমাদিগকে হেয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। একটা উদাহরণ দেখুন। এদেশে জামাতা খুব আদরণীয় এমন কি ডাইনিও জামাই ভালোবাসে। তবু "ঘরজামাইয়ের" সেরূপ আদর হয় না। তাই দেখা যায়, আমাদের যখন স্বাধীনতা ও অধীনতাজ্ঞান বা উন্নতি ও অবনতির যে প্রভেদ তাহা বুঝিবার সামর্থ্যটুকুও থাকিল না, তখন কাজেই তাহারা ভূস্বামী গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে হইতে ক্রমে আমাদের "স্বামী" হইয়া উঠিলেন।[২] আর আমরা ক্রমশ তাঁহাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান্ সম্পত্তি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছি।

সভ্যতা ও সমাজবন্ধনের সৃষ্টি হইলে সামাজিক নিয়মগুলি অবশ্য সমাজপতিদের মনোমত হইল। ইহাও স্বাভাবিক। "জোর যার মুলুক তার" এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের অবনতির জন্য কে দোষী?

২ "Although the Japanese wife is considered only the *first servant her husband*. She is usually addressed in the house as the honorable mistress. Acquaintance with European customs has awakened among the more educated classes in Japan a desire to raise the position of women" (Japan)

ভাবার্থ — (যদিও জাপানে স্ত্রীকে স্বামীর প্রধানা সেবিকা মনে করা হয় কিন্তু সচরাচর তাহাকে গৃহস্থিত অপর সকলে মাননীয়া গৃহিণী বলিয়া ডাকে। যাহা হউক আশা ও সুখের বিষয় এই যে, এখন ইউরোপীয় রীতি-নীতির সহিত পরিচিত শিক্ষিত সমাজে ক্রমশ রমণীর অবস্থা উন্নত করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতেছে।)

"দাসী" শব্দে অনেক শ্রীমতী আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, "স্বামী" শব্দের অর্থ কি? দানকর্তাকে "দাতা" বলিলে যেমন গ্রহণকর্তাকে "গ্রহীতা" বলিতেই হয়, সেইরূপ একজনকে "স্বামী, প্রভু ঈশ্বর" বলিলে অপরকে "দাসী" না বলিয়া আর কি বলিতে পারেন? যদি বলেন স্ত্রী পতি-প্রেম-পাশে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার সেবিকা হইয়াছেন, তবে ওরূপ সেবাব্রত গ্রহণে অবশ্য কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু পুরুষও কি ঐরূপ পারিবারিক প্রেমে সমৃদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রতিপালনরূপ সেবাব্রত গ্রহণ করেন নাই? দরিদ্রতম মজুরটিও সমস্ত দিন অনশনে পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় দুই এক আনা পয়সা পারিশ্রমিক পাইলে বাজারে গিয়া প্রথমে নিজের উদর-সেবার জন্য

আর এই যে আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি — এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ। এখন ইহা সৌন্দর্যবর্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির মতে অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন (originally badges of slavery) ছিল।[৩] তাই দেখা যায় কারাগারে বন্দিগণ পায় লৌহনির্মিত বেড়ি পরে, আমরা (আদরের জিনিস বলিয়া) স্বর্ণ রৌপ্যের বেড়ি অর্থাৎ "মল" পরি। উহাদের হাতকড়ি লৌহ নির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্মিত চুড়ি! বলা বাহুল্য, লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয় না। কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ (dogcollar) দেখি, উহারই অনুকরণে বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে! অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণ-শৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া মনে করি "হার পরিয়াছি"। গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া "নাকাদড়ী" পরায়, এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে "নোলক" পরাইয়াছেন! ঐ নোলক হইতেছে "স্বামী"র অস্তিত্বের (সধবার) নিদর্শন! অতএব দেখিলেন ভগিনী! আপনাদের ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি দাসত্বের নিদর্শন ব্যতীত আর কী হইতে পারে? আবার মজা দেখুন যাঁহার দাসত্বের নিদর্শন যত অধিক, তিনি সমাজে ততোধিক মান্যা গণ্যা!

এই অলঙ্কারের জন্য ললনাকুলের কত আগ্রহ। যেন জীবনের সুখ সমৃদ্ধি উহারই উপর নির্ভর করে! তাই দরিদ্র কামিনীগণ স্বর্ণরৌপ্যের হাতকড়ি না পাইয়া কাচের চুড়ি পরিয়া দাসী-জীবন সার্থক করে। যে (বিধবা) চুড়ি পরিতে অধিকারিণী নহে, তাহার মতো হতভাগিনী যেন এ জগতে আর নাই। অভ্যাসের কি অপার মহিমা। দাসত্বে অভ্যাস

দুই পয়সার মুড়ি মুড়কির শ্রাদ্ধ করে না। বরং তদ্দ্বারা চাউল ডাউল কিনিয়া পত্নীকে আনিয়া দেয়। পত্নীটি রন্ধনের পর "স্বামী"-কে যে একমুঠা, আধপেটা অন্নদান করে, পতি বেচারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়। কি চমৎকার আত্মত্যাগ! সমাজ তবু বিবাহিত পুরুষকে "প্রেম-দাস" না বলিয়া স্বামী বলে কেন? হ্যাঁ, আরও একটা প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়িল; যে সকল দেবী স্ত্রীকে "দাসী" বলায় আপত্তি করেন এবং কথায় কথায় সীতা সাবিত্রীর দোহাই দেন তাঁহারা কি জানেন না যে, হিন্দুসমাজেই এমন এক (বা ততোধিক) শ্রেণীর কুলীন আছেন, যাঁহারা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন। যাহাকে অর্থ দ্বারা "ক্রয়" করা হয়, তাহাকে "ক্রীতদাসী" ভিন্ন আর কি বলিতে পারেন? এস্থলে বরদিগের পাশবিক্রয়ের কথা, কেহ উল্লেখ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সাধারণ "বর বিক্রয় হয়" এরূপ বলে না। বিশেষত বরের পাশই বিক্রয় হয়, স্বয়ং বর বিক্রীত হন না। কিন্তু কন্যা বিক্রয়ের কথায় এ যুক্তি খাটে না; কারণ অষ্টম হইতে দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার এমন বিশেষ কোনো গুণ বা 'পাশ' থাকে না, যাহা বিক্রয় হইতে পারে। সুতরাং বালিকা স্বয়ং বিক্রীতা হয়। একদা কোনো সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণীর সহিত আলাপ প্রসঙ্গে ঐ কথা উঠায়, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "কেন ওঁদের সমকক্ষ কুলীন কি পাওয়া যায় না যে মেয়ে কিনতে হয়?" তদুত্তরে মহিলাটি বলিয়াছিলেন, "পাওয়া যাবে না কেন? ওদের ঐ কেনা-ব্যাচাই নিয়ম। এ যেমন ওর বোন কিনে বিয়ে করলে, আবার এর বোনকে আর একজনে কিনে নিয়ে বিয়ে করবে।"

কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম বা বিশেষ কোনো দোষের উল্লেখ করিবার আমাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কুতার্কিকদিগের কুতর্ক নিবারণের নিমিত্ত এইরূপ ক্রীতদাসী ওরফে দেবীর প্রমাণ দিতে বাধ্য হইলাম। এইজন্য আমরা নিজেই দুঃখিত। কিন্তু কর্তব্য অবশ্যপালনীয়।

৩. পশ্চিমাঞ্চলের জনৈক শমস্-উল-ওলামা (জাকাউল্লা সাহেব) বলেন "নথ নাকেল এর (নাকাদড়ীর) -ই রূপান্তর।"

হইয়াছে বলিয়া দাসত্বসূচক গহনাও ভালো লাগে। অহিফেন তিক্ত হইলেও আফিংচির অতি প্রিয় সামগ্রী। মাদক দ্রব্যে যতই সর্বনাশ হউক না কেন, মাতাল তাহা ছাড়িতে চাহে না। সেইরূপ আমরা অঙ্গে দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিয়াও আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করি — গর্বে স্ফীতা হই।

অলঙ্কার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতে কোনো কোনো ভগ্নী আমাকে পুরুষপক্ষেরই গুপ্তচর মনে করিতে পারেন। অর্থাৎ ভাবিবেন যে, আমি পুরুষদের টাকা স্বর্ণকারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য হয়তো এরূপ কৌশলে ভগ্নীদিগকে অলঙ্কারে বীতশ্রদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তাহা নয়, আমি আপনাদের জন্যই দু'কথা বলিতে চাই। যদি অলঙ্কারের উদ্দেশ্য পুরুষদের টাকার শ্রাদ্ধ করাই হয়, তবে টাকার শ্রাদ্ধ করিবার অনেক উপায় আছে। দুই একটি উপায় বলিয়া দিতেছি।

আপনার ঐ জড়োয়া চিকটা বাড়ির আদুরে কুকুরটির কণ্ঠে পরাইবেন। আপনি যখন শকটারোহণে বেড়াইতে যান, তখন সেই শকটবাহী অশ্বের গলে আপনার বহুমূল্য হার পরাইতে পারেন। বালা ও চুড়িগুলি বসিবার ঘরের পর্দার কড়া (drawing room এর curtain ring) রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবেই "স্বামী" নামধারী নরবরের টাকার বেশ শ্রাদ্ধ হইবে! অলঙ্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য দেখান বইত নয়। ঐরূপে ঐশ্বর্য দেখাইবেন। নিজের শরীরে দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিবেন কেন? উক্ত প্রকারে গহনার সদ্ব্যবহার করিলে প্রথম প্রথম লোকে আপনাকে পাগল বলিবে, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিলেই চলিবে।[৪] এ পোড়া সংসারে কোন্ ভালো কাজটা বিনা ক্লেশে সম্পাদিত হইয়াছে? "পৃথিবীর গতি আছে" এই কথা বলাতে মহাত্মা গ্যালিলিও (Galileo)-কে বাতুলাগারে যাইতে হইয়াছিল। কোন্ সাধুলোকটি অনায়াসে নিজ বক্তব্য বলিতে পারিয়াছেন? তাই বলি, সমাজের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। এ জগতে ভালো কথা বা ভালো কাজের বর্তমানে আদর হয় না।

বাস্তবিক অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি অলঙ্কারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্য বর্ধনের উপায় মনে করা যায়, তাহাই কি কম নিন্দনীয়? সৌন্দর্যবর্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক দুর্বলতা নহে? পুরুষেরা ইহা পরাজয়ের নিদর্শন ভাবেন। তাঁহারা কোনো বিষয়ে তর্ক করিতে গেলে বলেন, "আমার কথা প্রমাণিত করিতে না পারিলে আমি চুড়ি পরিব"। কবিবর সা'দী পুরুষদের উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছেন, " আয় মরদাঁ বকুশিদ্, জামা-এ-জানা ন পুষিদ"। অর্থাৎ 'হে বীরগণ। (জয়ী হইতে) চেষ্টা কর, রমণীর পোশাক পরিও না।' আমাদের পোশাক পরিলে তাহাদের অপমান হয়। দেখা যাউক সে পোশাকটা কি — কাপড় ত তাঁহাদের ও আমাদের প্রায় একই প্রকার। একখণ্ড ধুতি ও একখণ্ড শাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কিছুমাত্র তারতম্য আছে কি? যে দেশে পুরুষ পা-জামা পরে, সে দেশে নারীও পা-জামা পরে। "Ladie's jacket" শুনা যায়, 'Gentle-

৪ অলঙ্কার পরা ও উক্তরূপে টাকার শ্রাদ্ধ করা একই কথা। কিন্তু আশা করা যায় যে উক্ত প্রকারে টাকার শ্রাদ্ধ না করিয়া টাকার সদ্ব্যয় করাই অনেকে ন্যায়সঙ্গত মনে করিবেন।

men's jacket-ও শুনিতে পাই! তবে "জামা-এ-জানা" বলিলে কাপড় না বুঝাইয়া সম্ভবত রমণীসুলভ দুর্বলতা বুঝায়।

পুরুষজাতি বলেন যে, তাঁহারা আমাদিগকে "বুকের ভিতর বুক পাতিয়া বুক দিয়া ঢাকিয়া" রাখিয়াছেন, এবং এরূপ সোহাগ আমরা সংসারে পাইব না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা তাই সোহাগে গলিয়া — ঢলিয়া বহিয়া যাইতেছি! ফলত তাঁহারা যে অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের সর্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে তাঁহারা হৃদয়পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞান সূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিতা রাখিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ক্রমশ মরিতেছি। তাঁহারা আরও বলেন, "তাহাদেব সুখের সামগ্রী আমরা মাথায় বহিয়া আনিয়া দিব — আমরা থাকিতে তাহারা দুঃখ সহ্য করিবে কেন?" আমরা ঐ শ্রেণীর বক্তাকে তাঁহাদের অনুগ্রহপূর্ণ উক্তির জন্য ধন্যবাদ দিই; কিন্তু ভ্রাতঃ! পোড়া সংসারটা কেবল কবির সুখময়ী কল্পনা নহে — ইহা জটিল কুটিল কঠোর সংসার। সত্য বস্তু — কবিতা নহে —

কাব্য উপন্যাস নহে — এ মম জীবন,
নাট্যশালা নহে — ইহা প্রকৃত ভবন —

তাই যা কিছু মুশকিল! নতুবা আপনাদের কৃপায় আমাদের কোনো অভাব হইত না। বঙ্গবালা আপনাদের কল্পিত বর্ণনা অনুসারে "ক্ষীণাঙ্গী, কোমলাঙ্গী, অবলা, ভয় বিহুলা —" ইত্যাদি হইতে হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম শরীর (Aerial body) প্রাপ্ত হইয়া বাষ্পরূপে অনায়াসে আকাশে বিলীন হইতে পারিতেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তদ্রূপ সুখের নহে; তাই এখন মিনতি করিয়া বলিতে চাই —

অনুগ্রহ করে এই কর, অনুগ্রহ কর না মোদের।

বাস্তবিক অত্যধিক যত্নে অনেক বস্তু নষ্ট হয়। যে কাপড় বহু যত্নে বন্ধ করিয়া রাখা যায় তাহা উই-এর ভোগ্য হয়। কবি বেশ বলিয়াছেন —

কেন নিবে গেল বাতি?
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে,
জাগিয়া বাসর রাতি,
তাই নিবে গেল বাতি,....

সুতরাং দেখা যায়, তাঁহাদের অধিক যত্নই আমাদের সর্বনাশের কারণ। বিপদসঙ্কুল সংসার হইতে সর্বদা সুরক্ষিতা আছি বলিয়া আমরা সাহস, ভরসা, বল একেবারে হারাইয়াছি। আত্মনির্ভরতা ছাড়িয়া স্বামীদের নিতান্ত মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। সামান্য হইতে সামান্যতর বিপদে পড়িলে আমরা গৃহকোণে লুকাইয়া গগনভেদী আর্তনাদে রোদন করিয়া থাকি। ভ্রাতৃমহোদয়গণ আবার আমাদের "নাকি কান্নার" কথা তুলিয়া কেমন বিদ্রূপ করেন, তাহা কে না জানে? আর সে বিদ্রূপ আমরা নীরবে সহ্য করি। আমরা কেমন শোচনীয়রূপে ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, তাহা ভাবিলে ঘৃণায় লজ্জায় মৃতপ্রায় হই।[৫]

৫ সেদিন (গত ৯ই এপ্রিলেব) একখানা উর্দু কাগজে দেখিলাম :—
তুবস্কেব স্ত্রীলোকেরা সুলতান-সমীপে আবেদন কবিয়াছেন, যে "চাবি প্রাচীবেব ভিতর থাকা ব্যতীত আমাদেব আব কোনো কাজ নাই। আমাদিগকে অন্তত এ পবিমাণ শিক্ষা দেওয়া হউক, যাহার

ব্যাঘ্র ভল্লুক ত দূরে থাকুক, আরশোলা, জলৌকা প্রভৃতি কীটপতঙ্গ দেখিয়া আমরা ভীতিবিহ্বলা হই। এমন কি অনেকে মূর্ছিতা হন। একটি ৯/১০ বৎসরের বালক বোতলে আবদ্ধ একটি জলৌকা লইয়া বাড়িসুদ্ধ স্ত্রীলোকদের ভীতি উৎপাদন করিয়া আমোদ ভোগ করে। অবলাগণ চিৎকার করিয়া দৌড়িতে থাকেন, আর বালকটি সহাস্যে বোতল হস্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এমন তামাশা আপনারা দেখেন নাই কি? আমি দেখিয়াছি — আর সে কথা ভাবিয়া ঘৃণায় লজ্জায় মরমে মরিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি, সে সময় বরং আমোদ বোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন সে কথা ভাবিলে শোণিত উত্তপ্ত হয়। হায়! আমরা শারীরিক বল, মানসিক সাহস, সব কাহার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি? আর এই দারুণ শোচনীয় অবস্থা চিন্তা করিবার শক্তিও আমাদের নাই।

ভীরুতার চিত্র ত দেখাইলাম, এখন শারীরিক দুর্বলতার চিত্র দেখাইব। আমরা এমন জড় "অচেতন পদার্থ" হইয়া গিয়াছি যে, তাঁহাদের গৃহসজ্জা (drawing room এর ornament) বই আর কিছুই নহি। পাঠিকা। আপনি কখনও বেহারের কোনো ধনী মুসলমান ঘরের বউ-ঝি নামধেয় জড়পদার্থ দেখিয়াছেন কি? একটি বধূবেগম সাহেবার প্রতিকৃতি দেখাই। ইহাকে কোনো প্রসিদ্ধ যাদুঘরে (museum -এ) বসাইয়া রাখিলে

সাহায্যে যুদ্ধেব সময আমরা আপন আপন বাটি এবং নগর পুরুষদের মতো বন্দুক কামান দ্বারা রক্ষা কবিতে পারি। তাঁহারা ঐ আবেদনে নিম্নলিখিত উপকারগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন :

(১) প্রধান উপকার এই যে, নগরাদি রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি সৈন্য নিযুক্ত থাকায় যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সংখ্যা কম হওয়ায় যে ক্ষতি হয, তাহা আব হইবে না। (যেহেতু "অবলা"গণ নগর রক্ষা করিবেন।)

(২) সন্তানসন্ততিবর্গ শৈশব হইতেই যুদ্ধবিদ্যায় অভ্যস্ত হইবে। পিতামাতা উভয়ে সেপাহি হইলে শিশুগণ ভীরু, কাপুরুষ হইবে না।

(৩) তাঁহারা বিশেষ এক নমুনার উর্দি (uniform) প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে চক্ষু ও নাসিকা ব্যতীত মুখের অবশিষ্ট অংশ এবং সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ আবৃত থাকিবে।

(৪) অববোধপ্রথার সম্মান রক্ষার্থে এই স্থির হইয়াছে যে, অন্তত তিন বৎসব পর্যন্ত প্রত্যেক পরিবারেব সৈনিক পুরুষেবা আপন আপন আত্মীয় রমণীদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দিবেন। অতঃপর যুদ্ধশিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাগণ যুদ্ধশিক্ষা দিবাব জন্য ঘরে ঘবে দেখা দিবেন। উক্ত মহিলাগণ ইহাও লিখিয়াছেন যে, "আমরা উর্দির (uniform-এর) খরচের জন্য গবর্নমেন্টকে কষ্ট দিব না। কেবল বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সরকার হইতে পাইতে আশা করি।" দেখা যাউক, সুলতান মহোদয় এ দরখাস্তের কি উত্তর দেন।

উপবোক্ত সংবাদ সত্য কি না, সেজন্য সেই পত্রিকাখানি দায়ী। কিন্তু আমাদেব বিশ্বাস, তুরস্ক-বমণীদের ওরূপ আকাঙ্ক্ষা হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। ইতিহাসে শুনা যায়, পূর্বে তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন। একটা যেমন তেমন 'মুসলমানী পুঁথির" পাতা উল্টাইলেও আমরা দেখিতে পাই (যুদ্ধ করিতে যাইয়া)—

জয়গুন নামে বাদশাহ্জাদী কয়েদ হইল যদি,
আর যত আরব্য সওয়ার" ইত্যাদি।

বলি, এদেশের যে সমাজপতিগণ "লেডীকেরানী" হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে চমকাইয়া উঠেন (shocked-হন) যাঁহারা অবলার হস্তে পুতুল সাজান ও ফুলের মালা গাঁথা ব্যতীত আর কোন শ্রমসাধ্য কার্যেব ভার দেওয়ার কল্পনাই করিতে পারেন না, তাঁহারা ঐ লেডীযোদ্ধা হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে কি করিবেন? মূর্ছা যাইবে না ত?

রমণীজাতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইত। একটা অন্ধকার কক্ষে দুইটি মাত্র দ্বার আছে, তাহার একটি রুদ্ধ এবং একটি মুক্ত থাকে। সুতরাং সেখানে (পর্দার অনুরোধে?) বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্যরশ্মির প্রবেশ নিষেধ। ঐ কুঠরিতে পর্যঙ্কের যে রক্তবর্ণ বানাত মণ্ডিত তক্তপোশ আছে, তাহার উপর বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা, তাম্বুলরাগে রঞ্জিতাধরা, প্রসন্নাননা যে জড় পুত্তলিকা দেখিতেছেন, উহাই দুলহিন্‌বেগম (অর্থাৎ বেগমের পুত্রবধূ)। ইহার সর্বাঙ্গে ১০২৪০ টাকার অলঙ্কার। শরীরের কোন্‌ অংশে কত ভরি সোনা বিরাজমান, তাহা সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

১। মাথায় (সিঁথির অলঙ্কার) অর্ধ সের (৪০ ভরি)।

২। কর্ণে কিঞ্চিৎ অধিক এক পোয়া (২৫ ভরি)।

৩। কণ্ঠে দেড় সের (১২০ তোলা)।

৪। সুকোমল বাহুলতায় প্রায় দুই সের (১৫০ ভরি)।

৫। কটিদেশে প্রায় তিন পোয়া (৬৫ ভরি)।

৬। চরণযুগলে ঠিক তিন সের (২৪০ ভরি) স্বর্ণের বোঝা।

বেগমের নাকে যে নথ দুলিতেছে, উহার ব্যাসার্ধ চারি ইঞ্চি।[৬] পরিহিত পা-জামা বেচারা সাল্‌মা চুম্‌কির কারুকার্য ও বিবিধ প্রকারের (গোটা পাট্টার) ভাবে অবনত। আর পা-জামা ও দোপাট্টার (চাদরের) ভারে বেচারি বধূ ক্লান্ত।

ঐরূপ আট সের স্বর্ণের বোঝা লইয়া নড়াচড়া অসম্ভব, সুতরাং হতভাগী বধূবেগম জড়পদার্থ না হইয়া কি করিবেন? সর্বদাই তাঁহার মাথা ধরে; ইহার কারণ ত্রিবিধ — (১) সুচিক্কণ পাটী বসাইয়া কষিয়া বেশবিন্যাস, (২) বেণী ও সিঁথির উপর অলঙ্কারের বোঝা, (৩) অর্ধেক মাথায় আটা-সংযোগে আফ্‌শাঁ (রৌপ্যচূর্ণ) ও চুম্‌কি বসানো হইয়াছে, ভ্রূযুগল চুম্‌কি দ্বারা আচ্ছাদিত। এবং কপালে রাঙ্গের বিচিত্র বর্ণের চাঁদ ও তারা আটা-সংযোগে বসানো হইয়াছে। শরীর যেমন জড়পিণ্ড, মন ততোধিক জড়।

এই প্রকার জড়পিণ্ড হইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ কোনোরূপ শারীরিক পরিশ্রম না করায় বেগমের স্বাস্থ্য একেবারে মাটি হয়। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে তাঁহার চরণদ্বয় শ্রান্ত ক্লান্ত, ও ব্যথিত হয়। বাহুদ্বয় সম্পূর্ণ অকর্মণ্য। অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ তাঁহার চির সহচর। শরীরে স্ফূর্তি না থাকিলে মনেও স্ফূর্তি থাকে না। সুতরাং ইহাদের মন এবং মস্তিষ্ক উভয়ই চিররোগী। এমন স্বাস্থ্য লইয়া চিররোগী জীবন বহন করা কেমন কষ্টকর তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

ঐ চিত্র দেখিলে কী মনে হয়? আমরা নিজের ও অপরের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া চিন্তা করিলে যে শিক্ষালাভ করি, ইহাই প্রকৃত ধর্মোপদেশ। সময় সময় আমরা পাখি শাখি হইতে যে সদুপদেশ ও জ্ঞানলাভ করি, তাহা পুথিগত বিদ্যার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একটি আতার পতন দর্শনে মহাত্মা নিউটন যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, সে জ্ঞান তৎকালীন কোনো পুস্তকে ছিল না। ঐ বধূবেগমের অবস্থা চিন্তা করিতে গিয়া আমি আমাদের সামাজিক অবস্থার এই চিত্র

৬ কোনো কোনো নথের ব্যাস ছয় ইঞ্চি এবং পরিধি ন্যূনাধিক ১৯ ইঞ্চি হয়। ওজন এক ছটাক।

আঁকিতে সক্ষম হইলাম। যাহা হউক, আমি উক্ত বধূবেগমের জন্য বড় দুঃখিত হইলাম, ভাবিলাম, "অভাগীর ইহলোক-পরলোক — উভয়ই নষ্ট"। যদি ঈশ্বর হিসাব-নিকাশ লয়েন যে, "তোমার মন, মস্তিষ্ক, চক্ষু প্রভৃতির কি সদ্ব্যবহার করিয়াছ?" তাহার উত্তরে বেগম কী বলিবেন? আমি তখন সেই বাড়ির একটি মেয়েকে বলিলাম, "তুমি যে হস্ত পদ দ্বারা কোনো পরিশ্রম কর না, এজন্য খোদার নিকট কী জওবাবদিহি (explanation) দিবে?" সে বলিল, "আপ্‌কা কহ্‌না ঠিক হ্যায়" — এবং সে যে সময় নষ্ট করে না, সতত চলা-ফেরা করে, আমাকে ইহাও জানাইল। আমি পুনরায় বলিলাম, "শুধু ঘুরা-ফেরা করিলেই ব্যায়াম হয় না। তুমি প্রতিদিন অন্তত আধ ঘণ্টা দৌড়াদৌড়ি করিও।" দৌড়াদৌড়ি কথাটার উত্তরে হাসির একটা গর্‌রা উঠিল। আমি কিন্তু ব্যথিত হইলাম, ভাবিলাম, "উল্টা বুঝলি রাম।" কোনো বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার শক্তিটুকুও ইহাদের নাই। আমাদের উন্নতির আশা বহুদূরে — ভরসা কেবল পতিতপাবন।

আমাদের শয়ন-কক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন — কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোনো উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করেন।

সহস্র জনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য নহে। তাই একটু আশার আলোক-দীপ্তি পাইতে-না-পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে, তাঁহারা "স্ত্রীশিক্ষা" শব্দ শুনিলেই "শিক্ষার কুফলের" একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোনো কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারির ঐ "শিক্ষার" ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে "স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার"।

আজিকালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরিলাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকুরি গ্রহণ অসম্ভব, সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

ফাঁকা তর্কের অনুরোধে আবার কোনো নেটিভ খ্রিস্টিয়ান হয় ত মনে করিবেন যে, রমণীর জ্ঞান-পিপাসাই মানবজাতির অধঃপাতের কারণ। যেহেতু শাস্ত্রে (Genesis -এ) দেখা যায়, আদিমাতা হাভা (Eve) জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এবং আদম উভয়েই স্বর্গচ্যুত হইয়াছেন।[৭]

৭. পরন্তু ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের বিশ্বাস যে, Eve অভিশপ্তা হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু যিশুখ্রিস্ট আসিয়া নারীজাতিকে সে অভিশাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "Through woman came curse and sin · and through woman came blessing and salvation also." ভাবার্থ — নারীর দোষে জগতে অভিশাপ ও পাপ আসিয়াছে এবং নারীর কল্যাণেই আশীর্বাদ এবং মুক্তিও আসিয়াছে। পুরুষ খ্রিস্টের পিতা হয় নাই, কিন্তু রমণী যিশু খ্রিস্টের মাতৃপদ প্রাপ্তে গৌরবান্বিতা হইয়াছেন।

যাহা হউক "শিক্ষার" অর্থ কোনো সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের "অন্ধ অনুকরণ" নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (faculty) দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (develop) করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মন এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষুদ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন (বা observe)করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করি, এবং চিন্তা শক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি — তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল "পাশ করা বিদ্যা"-কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না। দর্শনশক্তি বৃদ্ধি বা বিকাশ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিতেছি :

যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু ধূলি, কর্দম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে (বিজ্ঞানের) শিক্ষিত চক্ষু অনেক মনোরম চমৎকার বস্তু দেখিতে পায়। আমাদের পদদলিত যে কাদাকে আমরা কেবল মাটি, বালি, কয়লার কালি ও জলমিশ্রিত পদার্থ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করি, বিজ্ঞানবিদ্ তাহা বিশ্লিষ্ট করিলে নিম্নলিখিত বস্তু চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইবেন। যথা — বালুকা বিশ্লেষণ করিলে সাদা পাথর বিশেষ (opal); কর্দম পৃথক করিলে চিনে বাসন প্রস্তুত করণোপযোগী মৃত্তিকা, অথবা নীলকান্তমণি; পাথর-কয়লার কালি দ্বারা হীরক এবং জল দ্বারা একবিন্দু নীহার! দেখিলেন, ভগিনি! যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দম দেখে, সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হিরা মানিক দেখে! আমরা যে এহেন চক্ষুকে চির অন্ধ করিয়া রাখি, এজন্য খোদার নিকট কি উত্তর দিব?

মনে করুন, আপনার দাসীকে আপনি একটা সম্মার্জনী দিয়া বলিলেন, "যা, আমার অমুক বাড়ি পরিষ্কার রাখিস্।" দাসী সম্মার্জনীটা আপনার দান মনে করিয়া অতি যত্নে জরির ওয়াড়ে ঢাকিয়া উচ্চস্থানে তুলিয়া রাখিল — কোনোকালে ব্যবহার করিল না। এদিকে আপনার বাড়ি ক্রমে আবর্জনাপূর্ণ হইয়া বাসের অযোগ্য হইল। অতঃপর আপনি যখন দাসীর কার্যের হিসাব লইবেন, তখন বাড়ির দুরবস্থা দেখিয়া আপনার মনে কী হইবে? শতমুখী ব্যবহার করিয়া বাড়ি পরিষ্কার রাখিলে আপনি খুশি হইবেন, না তাহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে সন্তুষ্ট হইবেন?

বিবেক আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবনতি দেখাইয়া দিতেছে — এখন উন্নতির চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।

আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি, "ভরসা কেবল পতিতপাবন", কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে ("God helps those that help themselves")। তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোলো আনা উপকার হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে, পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয় স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয় এবং সেইজন্যে তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্রা

স্ত্রীলোকেবা সূচিকর্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া পতি পুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্মণ্য পুরুষেরাই "স্বামী" থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তাধিকারিণীকে বিবাহ করেন। তিনিও ত স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না।[৮] ইহার কারণ এই যে, বহুকাল হইতে নারী-হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায়, নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই "দাসী" হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোনো বস্তু নাই — এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না। তাই বলিতে চাই :

"অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি।"

প্রথমে জাগিযা উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহাগোলযোগ বাধাইবে, জানি, ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য "কৎল"-এর (অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের) বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি।[৯] (এবং ভগ্নীদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই, জানি।) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি ত, কোনো ভালো কাজ অনায়াসে কবা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে ["but nevertheless it (Earth) does move"]! আমাদিগকেও ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে। এস্থলে পার্সী নারীদের একটি উদাহরণ দিতেছি। নিম্নলিখিত কতিপয পংক্তি এক খণ্ড উর্দু সংবাদপত্র হইতে অনূদিত হইল:

> এই পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে পার্সী মহিলাদের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বিলাতি সভ্যতা, যাহা তাঁহারা এখন লাভ করিয়াছেন, পূর্বে ইহার নাম মাত্র জানিতেন না। মুসলমানদের ন্যায় তাঁহারাও পর্দায় (অর্থাৎ অন্তঃপুরে) থাকিতেন। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহারা ছত্র ব্যবহারে অধিকারিণী ছিলেন না। প্রখর রবির উত্তাপ সহিতে না পারিলে জুতাই ছত্ররূপে ব্যবহার করিতেন। গাড়ির ভিতর বসিলেও তাহাতে পর্দা থাকিত। অন্যের সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করিতে পাইতেন না। কিন্তু আজিকালি পার্সী মহিলাগণ পর্দা ছাড়িয়াছেন। খোলা গাড়িতে বেড়াইয়া থাকেন। অন্যান্য পুরুষের সহিত আলাপ করেন। নিজেরা ব্যবসায় (দোকানদারি) করেন। প্রথমে যখন কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাদের স্ত্রীকে (পর্দার) বাহির করিয়াছিলেন, তখন চারিদিকে ভীষণ কলরব উঠিয়াছিল। ধবলকেশ বুদ্ধিমানগণ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর ধ্বংস-কাল উপস্থিত হইল"।

কই পৃথিবী ত ধ্বংস হয় নাই। তাই বলি, একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও, — সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে!

৮. বঙ্গীয় কোনো কোনো সমাজেব স্ত্রীলোক যে স্বাধীনতাব দাবি কবিযা থাকেন, তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে — ফাঁকা আওয়াজ মাত্র।

৯ সমাজেব সমঝদাব (reasonable) পুরুষেবা প্রাণদণ্ডেব বিধান নাও দিতে পাবেন, কিন্তু "unreasonable" অবলাসবলাগণ (যাঁহাবা যুক্তিতর্কেব ধাব ধাবেন না, তাঁহাবা) শতমুখী ও আঁইস বঁটিব ব্যবস্থা নিশ্চয দিবেন, জানি।

এখন প্রশ্ন হইতে পাবে, কী কবিলে লুপ্ত বত্ন উদ্ধার হইবে? কী করিলে আমবা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমত সাংসারিক জীবনেব পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

পুরুষেব সমকক্ষতা[১০] লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা কবিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই কবিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী-কেবানি হইতে আরম্ভ কবিয়া লেডী-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী-ব্যাবিস্টাব, লেডী-জজ — সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসব পবে লেডী Vicerory হইযা এ দেশেব সমস্ত নারীকে "রানী" কবিয়া ফেলিব। উপার্জন কবিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমবা "স্বামী"র গৃহকার্যে ব্যয কবি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?[১১]

আমরা যদি বাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইযাছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রেও ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক। কার্যক্ষেত্রেও পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশি, নারীর কাজ সস্তায় বিক্রয় হয। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যে কাজ কবিলে মাসে ২্ বেতন পায়, ঠিক সেই কাজে স্ত্রীলোকে ১্ পায। চাকবের খোরাকি মাসিক ৩্ আর চাকরাণীর খোরাকী ২্। অবশ্য কখনও কখনও স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিক বেশি পাইতেও দেখা যায়।

১০ আমাদেব উন্নতিব ভাব বুঝাইবাব জন্য পুরুষেব সমকক্ষতা বলিতেছি। নচেৎ কিসেব সহিত এ উন্নতিব তুলনা দিব? পুরুষদেব অবস্থাই আমাদেব উন্নতিব আদর্শ। একটা পবিবাবেব পুত্র ও কন্যায যে প্রকাব সমকক্ষতা থাকা উচিত, আমবা তাহাই চাই। যেহেতু পুরুষ সমাজেব পুত্র আমবা সমাজেব কন্যা। আমবা ইহা বলি না যে, "কুমাবেব মাথায় যেমন উষ্ণীষ দিয়াছেন কুমাবীব মাথায়ও তাহাই দিবেন।" ববং এই বলি, কুমাবেব মস্তক শিবস্ত্রাণে সাজাইতে যতখানি যত্ন ও ব্যয কবা হয়, কুমারীব মাথা ঢাকিবাব ওড়নাখানা প্রস্তুতেব নিমিত্তও ততখানি যত্ন ব্যয কবা হউক।"

১১ কিন্তু আমাদিগকে তাহা কবিতে হইবে কেন? কৃষক-প্রজা থাকিতে জমিদাব কাঁধে লাঙ্গল লইবেন কেন? শুধু বাজাব চাকব ছাড়া আব কিছু উচ্চপদবের কার্য কি আমবা কবিতে পাবি না? কেবানি ইত্যাদিব কথা কেবল উদাহবণ স্বরূপ বলা হইল। যেমন স্বর্গেব বর্ণনায বলিতে হয — সেখানে শীত নাই, — গ্রীষ্ম নাই, কেবল চিববসন্ত বিবাজমান থাকে। স্বর্গোদ্যানে মবকতলতিকায় হীবক-প্রসূন ফোটে। তাই আমাদেব উচ্চ আশা বুঝাইবাব নিমিত্ত লেডী-ভাইসবয় হইবাব কথা না বলিলে কিসেব সহিত আমাদেব সে উচ্চপদবেব কার্যে উপমা দিব?

আবাব ইহাও বলি, লেডী-কেবানি হওযাব কথা কেবল বঙ্গদেশে যেমন shocking বোধ হয়, সেরূপ অন্যত্র বোধ হয না। আমেবিকায লেডী-কেবানি বা লেডী-ব্যাবিস্টার প্রভৃতি বিবল নহে। এবং এমন একদিনও ছিল, যখন অন্যান্য দেশেব মুসলমান সমাজে "স্ত্রী-কবি, স্ত্রী-দার্শনিক স্ত্রী-ঐতিহাসিক, স্ত্রী-বৈজ্ঞানিক, স্ত্রী-বক্তা, স্ত্রী-চিকিৎসক, স্ত্রী-বাজনীতিবিদ্" প্রভৃতি কিছুবই অভাব ছিল না। কেবল বঙ্গীয মোসলেম-সমাজে ওরূপ বমণীবত্ন নাই।

যদি বল, আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহু-লতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কি না।

পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোনো ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে — একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা — উভয়েরই সমান দরকার! কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে — সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের অবশ্যক। প্রথমত উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন — আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন। তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।

ভরসা করি আমাদের সুযোগ্যা ভগ্নীগণ এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন। আন্দোলন না করিলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

□ *রচনাবলি*, ১৯৮৪ (বাংলা একাডেমী, ঢাকা)

অপবিজ্ঞান

রাজশেখর বসু

বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধসংস্কার ক্রমশ দূর হইতেছে। কিন্তু যাহা যাইতেছে তাহার স্থানে নূতন জঞ্জাল কিছু কিছু জমিতেছে। ধর্মের বুলি লইয়া যেমন অপধর্ম সৃষ্ট হয়, তেমনি বিজ্ঞানের বুলি লইয়া অপবিজ্ঞান গডিযা উঠে। সকল দেশেই বিজ্ঞানেব নামে অনেক নূতন ভ্রান্তি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশে যেসব ভ্রান্ত ধারণা এদেশে লোকপ্রিয় হইয়াছে, তাহারই কয়েকটির কথা বলিতেছি।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য — বিদ্যুৎ। তীব্র উপহাসের ফলে এই শব্দটির প্রয়োগে আজকাল কিঞ্চিৎ সংযম আসিয়াছে। টিকিতে বিদ্যুৎ, পইতায় বিদ্যুৎ, গঙ্গাজলে বিদ্যুৎ — এখন বড় একটা শোনা যায় না। গল্প শুনিয়াছি, এক সভায় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি অগস্ত্য মুনির সমুদ্রশোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অগস্ত্যের ক্রুদ্ধ চক্ষু হইতে এমন প্রচণ্ড বিদ্যুৎস্রোত নির্গত হইল যে সমস্ত সমুদ্রের জল এক নিমেষে বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন অক্সিজেন রূপে উবিয়া গেল। সকলে অবাক হইয়া এই ব্যাখ্যা শুনিল, কেবল একজন ধৃষ্ট শ্রোতা বলিল — 'আরে না মশায়, আপনি জানেন না, চোঁ করে মেরে দিয়েছিল'।

বিদ্যুতের মহিমা কমিলেও একেবারে লোপ পায় নাই। কিছুদিন পূর্বে কোনও মাসিক পত্রিকায় এক কবিরাজ মহারাজ লিখিয়াছিলেন — 'সর্বদাই মনে রাখিবেন তুলসীগাছের সর্বত্র নিরন্তর বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত হইতেছে।' এই অপূর্ব তথ্যটি তিনি কোথায় পাইলেন, চরকে কি সুশ্রুতে কিংবা নিজ মনের অন্তস্তলে, তাহা বলেন নাই। বৈদ্যুতিক সালসা বৈদ্যুতিক আংটি বাজারে সুপ্রচলিত। অষ্টধাতুর মাদুলির গুণ এখন আর শাস্ত্র বা প্রবাদের উপর নির্ভর করে না। ব্যাটারিতে দুই রকম ধাতু থাকে বলিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, অতএব অষ্টধাতুর উপযোগিতা আরও বেশি না হইবে কেন। বিলাতি খবরের কাগজেও বৈদ্যুতিক কোমরবন্ধের বিজ্ঞাপন মায় প্রশংসাপত্র বাহির হইতেছে। সাহেবরা ঠকাইবার বা ঠকিবার পাত্র নয়, অতএব তোমায় আমায় অশ্রদ্ধার কোনও হেতু নাই। মোট কথা, সাধারণের বিশ্বাস — মিছরি নিম এবং ভাইটামিনের তুল্য বিদ্যুৎ একটি উৎকৃষ্ট পথ্য, যেমন করিয়া হউক দেহে সঞ্চারিত করিলেই উপকার। বিদ্যুৎ কি করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার প্রকার ও মাত্রা আছে কিনা, কোন রোগে কী রকমে প্রয়োগ করিতে হয়, এত কথা কেহ ভাবে না। আমার পরিচিত এক মালীর হাতে বাত হইয়াছিল। কে তাহাকে বলিয়াছিল বিজলিতে বাত সারে এবং টেলিগ্রাফের তারে বিজলি আছে। মালী এক টুকরা ঐ তার সংগ্রহ করিয়া হাতে তাগা পরিয়াছিল।

উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শুইতে নাই, শাস্ত্রে বারণ আছে। শাস্ত্র কারণ নির্দেশ করে না

সুতরাং বিজ্ঞানকে সাক্ষী মানা হইয়াছে। পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড চুম্বক, মানুষের দেহ নাকি চুম্বকধর্মী — অতএব উত্তরমেরুর দিকে মাথা না রাখাই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু দক্ষিণমেরু নিরাপদ কেন হইল তাহার কারণ কেহ দেন নাই।

জোনাকিপোকা প্রদীপে পুড়িলে যে ধূঁয়া বাহির হয় তাহা অত্যন্ত বিষ এই প্রবাদ বহুপ্রচলিত। অপবিজ্ঞান বলে — জোনাকি হইতে আলোক বাহির হয় অতএব তাহাতে প্রচুর ফসফরস আছে, এবং ফসফরসের ধূঁয়া মারাত্মক বিষ। প্রকৃত কথা — ফসফরস যখন মৌলিক অবস্থায় থাকে তখন বায়ুর স্পর্শে তাহা হইতে আলোক বাহির হয়, এবং ফসফরস বিষও বটে। কিন্তু জোনাকির আলোক ফসফরস-জনিত নয়। প্রাণীদেহ মাত্রেই কিঞ্চিৎ ফসফরস আছে, কিন্তু তাহা যৌগিক অবস্থায় আছে, এবং তাহাতে বিষধর্ম নাই। এক টুকরা মাছে যত ফরফবস আছে, একটি জোনাকিতে তাহার অপেক্ষা অনেক কম আছে। মাছ-পোড়া যেমন নিরাপদ, জোনাকি-পোড়াও তেমন।

কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক নামের একটা মোহিনী শক্তি আছে, লোকে সেই শিখিলে স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করে। 'গাটাপার্চা' এইরকম একটি মুখরোচক শব্দ। ফাউন্টেন পেন চিরুনি চশমার ফ্রেম প্রভৃতি বহু বস্তুর উপাদানকে লোকে নির্বিচারে গাটাপার্চা বলে। গাটাপার্চা রবারের ন্যায় বৃক্ষবিশেষের নিষ্যন্দ। ইহাতে বৈদ্যুতিক তারের আবরণ হয়, জলরোধক বার্নিশ হয়, ডাক্তারি চিকিৎসায় ইহার পাত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণত লোকে যাহাকে গাটাপার্চা বলে তাহা অন্য বস্তু। আজকাল যেসকল শৃঙ্গবৎ কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে তাহার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। —

নাইট্রিক অ্যাসিড তুলা ইত্যাদি হইতে সেলিউলয়েড হয়। ইহা কাচতুলা স্বচ্ছ কিন্তু অন্য উপাদান যোগে রঞ্জিত চিত্রিত বা হাতির দাঁতের ন্যায় সাদা করা যায়। ফোটোগ্রাফের ফিল্ম, মোটর গাড়ির জানালা, হার্মোনিয়মের চাবি, পুতুল, চিরুনি, বোতাম প্রভৃতি অনেক জিনিসের উপাদান সেলিউলয়েড। অনেক চশমার ফ্রেমও এই পদার্থ।

রবারের সহিত গন্ধক মিলাইয়া ইবনাইট বা ভল্‌কানাইট প্রস্তুত হয়। বাংলায় ইহাকে 'কাচকড়া' বলা হয়, যদিও কাচকড়ার মূল অর্থ কাছিমের খোলা। ইবনাইট স্বচ্ছ নয়। ইহা হইতে ফাউন্টেন পেন চিরুনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

আরও নানাজাতীয় স্বচ্ছ বা শৃঙ্গবৎ পদার্থ বিভিন্ন নামে বাজারে চলিতেছে, যথা — সেলোফেন, ভিসকোজ, গ্যালালিথ, ব্যাকেলাইট ইত্যাদি। এগুলির উপাদান ও প্রস্তুতপ্রণালী বিভিন্ন। নকল রেশম, নকল হাতির দাঁত, নানারকম বার্নিশ, বোতাম, চিরুনি প্রভৃতি বহু শৌখিন জিনিস ঐসকল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়।

বঙ্গভঙ্গের সময় যখন মেয়েরা কাচের চুড়ি বর্জন করিলেন তখন একটি অপূর্ব স্বদেশি পণ্য দেখা দিয়েছিল — 'আলুর চুড়ি'। ইহা বিলাতি সেলিউলয়েডের পাতা জুড়িয়ে প্রস্তুত। আলুর সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। বিলাতি সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে অতিরঞ্জিত আজগবি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খবর বাহির হয়। বহুকালপূর্বে কোনও কাগজে পড়িয়া ছিলাম গন্ধকাম্লে আলু ভিজাইয়া কৃত্রিম হস্তিদন্ত প্রস্তুত হইতেছে। বোধ হয় তাহা হইতেই আলুর চুড়ি নামটি রটিয়াছিল।

আর একটি ভ্রান্তিকর নাম সম্প্রতি সৃষ্টি হইয়াছে — 'আলপাকা শাড়ি'। আলপাকা একপ্রকার পশমি কাপড়। কিন্তু আলপাকা শাড়িতে পশমের লেশ নাই, ইহা কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত।

টিন শব্দের অপপ্রয়োগ আমরা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছি। ইহার প্রকৃত অর্থ রাং, ইংরাজিতে তাহাই মুখ্য অর্থ। কিন্তু আর এক অর্থ — রাং-এর লেপ দেওয়া লোহার পাত অথবা তাহা হইতে প্রস্তুত আধার, যথা 'কেরোসিনের টিন'। ঘর ছাহিবার করুগেটেড লোহার দস্তার লেপ থাকে। তাহাও 'টিন' আখ্যা পাইয়াছে, যথা 'টিনের ছাদ'।

আজকাল মনোবিদ্যার উপর শিক্ষিত জনের প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহার ফলে এই বিদ্যার বুলি সর্বত্র শোনা যাইতেছে। Psychological moment কথাটি বহুদিন হইতে সংবাদপত্র ও বক্তৃতার অপরিহার্য বুকনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি আর একটি শব্দ চলিতেছে — complex। অমুক লোক ভীরু বা অন্যের অনুগত, অতএব তাহার inferiority complex আছে। অমুক লোক সাঁতার দিতে ভালোবাসে, অতএব তাহার water complex আছে। বিজ্ঞানীর দুর্ভাগ্য — তিনি মাথা ঘামাইয়া যে পরিভাষা রচনা করেন সাধারণে তাহা কাড়িয়া লইয়া অপপ্রয়োগ করে, এবং অবশেষে একটা বিকৃত কদর্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বিজ্ঞানীকে স্বাধিকারচ্যুত করে।

মানুষের কৌতূহলের সীমা নাই, সব ব্যাপারেরই সে কারণ জানিতে চায়। কিন্তু তাহার আত্মপ্রতারণার প্রবৃত্তিও অসাধারণ, তাই সে প্রমাদকে প্রমাণ মনে করে, বাক্‌ছলকে হেতু মনে করে। বাংলা মাসিকপত্রিকার জিজ্ঞাসাবিভাগের লেখকগণ অনেক সময় হাস্যকর অপবিজ্ঞানের অবতারণা করেন। কেহ প্রশ্ন করেন — বাতাস করিতে গায়ে পাখা ঠেকিলে তাহা মাটিতে ঠুকিতে হয়, ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি। কেহ বা গ্রহণে হাঁড়ি ফেলার বৈজ্ঞানিক কারণ জানিতে চান। উত্তর যাহা আসে তাহাও চমৎকার। কিছুদিন পূর্বে 'প্রবাসী'র জিজ্ঞাসা বিভাগে একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন মাছির মল হইতে পুদিনা গাছ জন্মায়, ইহা সত্য কিনা। একাধিক ব্যক্তি উত্তর দিলেন — আলবৎ জন্মায়, ইহা আমাদের পরীক্ষিত। এই লইয়া কয়েক মাস তুমুল বিতণ্ডা চলিল। অবশেষে মশা মারিবার জন্য কামান দাগিতে হইল, সম্পাদক মহাশয় আচার্য জগদীশচন্দ্রের মত প্রকাশ করিলেন — পুদিনা জন্মায় না।

আর একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন কর্পূর উবিয়া যায় কেন। উত্তর অনেক আসিল, সকলেই বলিলেন কর্পূর উদ্বায়ী পদার্থ তাই উবিয়া যায়। প্রশ্নকর্তা বোধ হয় তৃপ্ত হইয়াছেন, কারণ তিনি আর জেরা করেন নাই। কিন্তু উত্তরটি কৌতুককর। 'উদ্বায়ী'র অর্থ — যাহা উবিয়া যায়। উত্তরটি দাঁড়াইল এই — কর্পূর উবিয়া যায়, কারণ তাহা এমন বস্তু যাহা উবিয়া যায়। প্রশ্নকর্তা যে তিমিরে সেই তিমিরে রহিলেন। একবার এক গ্রাম্য যুবককে প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছিলাম — কুইনিনে জ্বর সারে কেন। একজন মুরব্বি ব্যক্তি বুঝাইয়া দিলেন — কুইনিন জ্বরকে জব্দ করে, আর জ্বর সারে।

কর্পূর উবিয়া যায় কেন, ইহার উত্তরে বিজ্ঞানী বলিবেন — জানি না। হয়তো কালক্রমে নির্ধারিত হইবে যে পদার্থের আণব সংস্থান অমুকপ্রকার হইলে তাহা উদ্বায়ী হয়। তখন বলা চলিবে — কর্পূরের গঠনে অমুক বিশিষ্টতা আছে তাই উবিয়া যায়। কিন্তু ইহাতেই প্রশ্ন

থামিবে না, ঐপ্রকার গঠনের জন্যই বা পদার্থ উদ্বায়ী হয় কেন? বিজ্ঞানী পুনর্বার বলবেন — জানি না।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য — জটিলকে অপেক্ষাকৃত সরল করা, বহু বিসদৃশ ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র বাহির করা। বিজ্ঞান নির্ধারণ করে — অমুক ঘটনার সহিত অমুক ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ইহাতে এই হয়। কেন হয় তাহার চূড়ান্ত জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে না। গাছ হইতে স্খলিত হইলে ফল মাটিতে পড়ে; কারণ বলা হয় — পৃথিবীর আকর্ষণ। কেন আকর্ষণ করে বিজ্ঞান এখনও জানে না। জানিতে পারিলেও আবার নূতন সমস্যা উঠিবে। নিউটন আবিষ্কার করিয়াছেন, জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পর আকর্ষণ করে। জড়ের এই ধর্মের নাম মহাকর্ষ বা gravitation। এই আকর্ষণের রীতি নির্দেশ করিয়া নিউটন যে সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা law of gravitation, মহাকর্ষের নিয়ম। ইহাতে আকর্ষণের হেতুর উল্লেখ নাই। মানুষ মাত্রই মরে ইহা অবধারিত সত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষের এই ধর্মের নাম মরত্ব। কিন্তু মৃত্যুর কারণ মরত্ব নয়।

কারণ নির্দেশের জন্য সাধারণ লোকে অপবিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া থাকে। ফল পড়ে কেন? কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ। এই প্রশ্নোত্তরে এবং কর্পূরের প্রশ্নোত্তরে কোনও প্রভেদ নাই, হেত্বাভাসকে হেতু বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। তবে একটা কথা বলা যাইতে পারে। উত্তরদাতা জানাইতে চান যে তিনি প্রশ্নকর্তা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশি খবর রাখেন। তিনি বলিতে চান — অনেক জিনিসই উবিয়া যায়, কর্পূর তাহাদের মধ্যে একটি;জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পরকে আকর্ষণ করে পৃথিবী কর্তৃক ফল আকর্ষণ তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু কারণ নির্দেশ হইল না।

বিজ্ঞানশাস্ত্র বারংবার সতর্ক করিয়াছে — মানুষ যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ঘটনার লক্ষিত রীতি মাত্র, ঘটনার কারণ নয়, laws are not causes। যাহাকে আমরা কারণ বলি তাহা ব্যাপার পরম্পরা বা ঘটনার সম্বন্ধ মাত্র, তাহার শেষ নাই, ইয়ত্তা নাই। যাহা চরম ও নিরপেক্ষ কারণ তাহা বিজ্ঞানীর অনধিগম্য। দার্শনিক স্মরণাতীত কাল হইতে তাহার সন্ধান করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি অতিপরিচিত বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে — অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদ। ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দান নয়, নিতান্তই ভারতীয় বস্তু। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত ইহার বিবাদ নাই, কিন্তু সাধারণ লোকে যে অদৃষ্টবাদের আশ্রয় লয় তাহা অপবিজ্ঞান মাত্র।

বহু যুগের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের দূরদৃষ্টি জন্মিয়াছে অতীত ও ভবিষ্যৎ অনেক ব্যাপারপরম্পরা সে নির্ণয় করিতে পারে। কিসে কী হয় মানুষ অনেকটা জানে এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে। কতকগুলি জাগতিক ব্যাপার আমাদের বোধ্য বা সাধ্য, কিন্তু অধিকাংশই অবোধ্য বা অসাধ্য। প্রথমোক্ত বিষয়গুলি আমাদের 'দৃষ্ট' অর্থাৎ নির্ণেয়, শেষোক্ত বিষয়গুলি 'অদৃষ্ট' অর্থাৎ অনির্ণেয়। যাহা দৃষ্ট তাহাতে আমাদের কিছু হাত আছে, যাহা অদৃষ্ট তাহাতে মোটেই হাত নাই।

নিয়তিবাদী দার্শনিক বলেন — কিসে কী হইবে তাহা জগতের উৎপত্তির সঙ্গেই

নিয়মিত হইয়া আছে, সমস্ত ব্যাপারই নিয়তি। মানুষের সাধ্য অসাধ্য সমস্তই নিয়তি, আমরা নিয়তি অনুসারেই পুরুষকার প্রয়োগ করি। কাজ সহজে উদ্ধার হইয়া গেলে নিয়তির কথা মনে আসে না। কিন্তু চেষ্টা বিফল হইলেই মনে পড়ে, নিয়তি মানুষের অবাধ্য, যত্ন করিলেও সব কাজ সিদ্ধ হয় না।

বিজ্ঞানও স্বীকার করে — এই জগৎ নিয়তির রাজ্য, সমস্ত ঘটনা কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত অখণ্ডনীয়রূপে নিয়ন্ত্রিত। অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোনও কোনও বিষয়ের ভবিষ্যদুক্তি করিতে পারেন, যথা — অমুক দিন চন্দ্রগ্রহণ হইবে, অমুক লোকের শীঘ্র জেল হইবে। প্রাকৃতিক নিয়ম বা নিয়তির কিযদংশ তাঁহাব জানা আছে বলিয়াই পারেন। বিচক্ষণ দাবা খেলোয়াড় ভবিষ্যতের পাঁচ-ছয় চাল হিসাব করিয়া ঘুঁটি চালিয়া থাকে। কিন্তু যাহা মানুষের প্রতর্ক্য বা অনুমানগম্য তাহা সকল ক্ষেত্রে সাধ্য বা প্রতিকার্য নয়। আমাদের এমন শক্তি নাই যে চন্দ্রের গ্রহণ রোধ করি, কিন্তু এমন শক্তি থাকিতে পারে যাহাতে অমুকের কারাদণ্ড নিবারণ করা যায়। এমন প্রাজ্ঞ যদি কেহ থাকেন যিনি সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম জানেন, তবে তিনি সর্বদ্রষ্টা ত্রিকালজ্ঞ। তাঁহার কাছে নিয়তি 'অদৃষ্ট' নয়, দৃষ্ট ও স্পষ্ট। তিনি মানুষ, তাই সর্বশক্তিমান হইতে পারেন না, কিন্তু অন্য মানুষের তুলনায় তাঁহার সাধ্যের সীমা অতি বৃহৎ। জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে মানবসমাজ এইরূপে উত্তরোত্তর অনাগতবিধাতা হইতেছে।

কূট তার্কিক বলিবেন — প্রকৃতির অখণ্ডনীয় বিধি মানিব কেন? তোমার আমার বুদ্ধিতে ফল মাটিতে পড়ে, যথাকালে চন্দ্রগ্রহণ হয়, দুই আর তিন পাঁচ হয়। কিন্তু এমন ভুবন বা এমন অবস্থা থাকিতে পারে যেখানে বিধির ব্যতিক্রম হয়। বিজ্ঞানী উত্তর দেন — তোমার সংশয় যথার্থ। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এই চিরপরিচিত ভুবন এবং তোমার আমার তুল্য প্রকৃতিস্থ মানুষের দৃষ্টি। যখন অন্য ভুবনে যাইব বা অন্য প্রকার দেখিব তখন অন্য বিজ্ঞান রচনা করিব। বিজ্ঞানী যে সূত্র প্রণয়ন করেন তাহা কখনও কখনও সংশোধন করিতে হয় সত্য; কিন্তু তাহা প্রাকৃতিক বিধির পরিবর্তনের ফলে নয়।

অতএব অদৃষ্টের অর্থ — অনির্ণেয় ও অসাধ্য ঘটনাসমূহ; নিয়তির অর্থ — সমস্ত ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ বা আনুপূর্ব। ঘটনার কারণ অদৃষ্ট বা নিয়তি নয়। কিন্তু সাধারণ লোকে অদৃষ্টকে অনর্থক টানিয়া আনিয়া সুখদুঃখের ব্যাখ্যা করে। জীবনযাত্রা যখন নিরুদ্‌বেগে চলিয়া যায় তখন কারণ জানিবার ঔৎসুক্য থাকে না। কিন্তু যদি একটা বিপদ ঘটে, কিংবা যদি কোনো পরিচিত হঠাৎ বড়লোক হয়, তখনই মনে কষ্টকর প্রশ্ন আসে — কেন এমন হইল? বিজ্ঞলোক ব্যাখ্যা করেন — বাপু, কেন হইল সেটা বুঝিলে না? সমস্তই অদৃষ্ট, কপাল, ভাগ্য, নিয়তি। অমুক লোকটি মরিল কেন, ইহার উত্তরে যদি বলা হয় — কলেরা, সর্পাঘাত, অনেক বয়স — তবে একটা কারণ বুঝা যায়। কিন্তু ইহা বলা বৃথা — মরণের অনির্ণেয়তা বা অনিবার্যতাই মরিবার কারণ। অথচ, 'অদৃষ্ট' বলিলে ইহাই বলা হয়। যাহা অবিসংবাদিত সত্য বা truism তাহা শুনিলে কাহারও কৌতূহলনিবৃত্তি বা সান্ত্বনালাভ হয় না, সুতরাং ইহাও বলা বৃথা — অমুক লোকটি ঘটনাপরম্পরার ফলে মরিয়াছে। অথচ, 'নিয়তি' বলিলে ইহাই বলা হয়। 'অদৃষ্ট' ও 'নিয়তি' শব্দ সাধারণের নিকট প্রকৃত অর্থ হারাইয়াছে এবং বিধাতার আসন পাইয়া সুখদুঃখের নিগূঢ় কারণ রূপে গণ্য হইতেছে।

অধ্যাপক Poyinting-এর উক্তিটি উদ্ধারযোগ্য :

'No long time ago physical laws were quite commonly described as the Fixed Laws of Nature, and were supposed sufficient in themselves to govern the universe .... A law of nature explains nothing – it has no governing power, it is but a descriptive formula which the careless has sometimes personified.'

কিংকর্তব্যম্

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

আজকাল সংবাদপত্রের মাবফত শোনা যাইতেছে যে, বর্তমান বিশ্বব্যাপী মহাসমরের পর ভারতবাসীবা নিজেদের মনঃপূত কনস্টিটিউশন অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার্থ নিয়মাবলি নিজেরাই বচনা করিতে পারিবে। একথা অবশ্য শাসকশ্রেণীর নিকট হইতে বহুদিন যাবৎই শোনা যাইতেছে। কিন্তু তাহাদের মতে যেহেতু ভারতীয়েরা একমত হইতে পারে না, সেই জন্য স্বাধীনতাও তাহাবা অর্জন করিতে পারিতেছে না।

ভারতীয় জীবনে দ্বন্দ্বভাব

আপাতদৃষ্টিতে এই তথ্য বড়ই শ্রুতিমধুর ও বিচারসহ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কাহারা একমত হইতে পাবিতেছে না তদ্বিষয়েও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সাধারণত বলা হইয়া থাকে, হিন্দু ও মুসলমানেরা একমত হইতে পাবে না; হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে প্রাদেশিক, ভাষাগত ও জাতিভেদের প্রাচীর দ্বারা পরস্পর পৃথক ও স্বতন্ত্রাবস্থায় বাস করে। তাহাদের মধ্যে বারোজাতির তেরো হাঁড়ি প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত ভারতে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায়ের লোক আছেন যাঁহাদের সম্প্রদায়গত স্বার্থ পৃথক। এক কথায়, ইঁহারা রিসলি ও গ্রিয়ারসনের অভিমত পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতে চাহেন যে, ভারতীয়দের জীবনে কোথাও এমন স্থান নাই যেখানে তাহারা জাতীয় ঐক্য প্রদর্শন করিতে পারে; ভারত কেবল কতগুলি লোকসমষ্টির জায়গা, তাহাদের "নেশন" (একজাতীয়তা) বিবর্তনের কোনও মালমশলা নাই। Pax Britannica-ই (ব্রিটেন প্রদত্ত শান্তি) একমাত্র স্থান যেখানে তাহারা একত্রিত হইতে পারে।

এগুলি ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের পুরাতন যুক্তি। তৎপর গোদের উপর বিষফোড়ার ন্যায় হঠাৎ দেখা গেল যে 'অ-মুসলমান'দের মধ্যে 'জাতি-হিন্দু' ও 'তফশিলভুক্ত' হিন্দু জাতিগুলিও আছে। আর ইহার যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার জন্য, তদনুকূল নরতাত্ত্বিক প্রমাণও আবিষ্কার করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা Caste-Hindu এবং Suppressed or Depressed-Hindus or Schedule-Hindu Castes হিন্দুদের মধ্যে মূলজাতিগত (racial) বিভেদ দেখা গেল। এক্ষণে আবার শোনা যাইতেছে 'অত্যাচারিত' অর্থাৎ Oppressed Hindu Castes নামে জাতিসমূহ আবিষ্কৃত হইতেছে। তাহারা আবার কোন্ মূলজাতিগত লোক (racial element) তাহারও অনুসন্ধান অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরাই করিবেন, ইহাও সুনিশ্চিত।

এহেন ভারতে একজাতীয়তা ও সেই লোকদের স্বাধীনতা ভোগ কি প্রকারে সম্ভব? পুনঃ

এহেন শতধা-বিচ্ছিন্ন 'জনতা' (Crowd) যাহার উপযুক্ত নাম না থাকায় 'অ-মুসলমান' নামকরণ করা হইয়াছে, তাহার হস্তে, একমাত্র একতাপ্রাপ্ত ও অবিভক্ত সংখ্যালঘু ও ধর্মে মুসলমান ভারতীয় লোক-সমষ্টির ভার কী প্রকারে দেওয়া যায়?

অবশ্য কাগজে এসব যুক্তি পড়িতে নেহাত মন্দ লাগে না এবং বেশ মুখরোচকও বটে। বিশেষত যখন এই সকল কথা লালমুখো লোক দ্বারা সরকারি বা আধাসরকারি কাগজপত্রে বা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন তাহা অভ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়াই গৃহীত হয়। তাহার বিপক্ষে তর্ক করা অশাস্ত্রীয় ও পাপ বলিয়া গণ্য হয়, কারণ আর্ষেয় বাক্যে সন্দেহ করিলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হয় — 'সংশয়াত্মা বিনাশতি' ইহা শাস্ত্রেরই বচন। উপস্থিতক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য, এই বিষয়ে আমাদের মনস্তত্ত্ব কী? এই সকল যুক্তির সত্যতা যাচাই করিয়া দেখা যাউক না কেন? পণ্ডিত ও সত্যকারের বৈজ্ঞানিকেরা এইসব বিষয়ে কী বলেন?

গোলাম মনোবৃত্তি

গোলাম মনোবৃত্তির রহস্য ভেদ করা কঠিন, তাহার যুক্তির কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকে না। এই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিবার নানাদিক হইতেই চেষ্টা হইয়াছে। ফার্সী কবি সেখ সাদী বলেন, "বন্দা খোয়াইস নিস্ত, বন্দা হুকুম খাবিন রস্ত" অর্থাৎ গোলামের স্বকীয় ইচ্ছা বলিয়া কোনও জিনিস নাই, তাহার নিকট মনিবের হুকুমই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত। সাধারণত গোলাম-মনোবৃত্তির ইহা একটি অতি সুন্দর বিশ্লেষণ। কিন্তু ভারতীয় সাধারণের, বিশেষত একশ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুর মনস্তত্ত্বের পক্ষে এই ব্যাখ্যান খাটে না। সুতরাং ইহার ভিত্তি অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

অনেকদিন যাবৎ এই দেশে একটা কথা চলিত আছে, হিন্দুর শত্রু হিন্দু। একথা আজও সত্য। ভারতকে অণুপরমাণুতে বিভক্ত করিয়া ধূলিসাৎ করিবার জন্য যে মস্তিষ্কের প্রয়োজন তাহা হিন্দুই তো যোগাইতেছে, হিন্দুকে বিকৃত ও বীভৎস আকারে চিত্রিত করিবার জন্য যে কলা প্রয়োজন তাহাও হিন্দুই যোগান দিতেছে। ইহার কারণ কি? প্রথম একশ্রেণীর শিক্ষিত লোকের অজ্ঞতা, দ্বিতীয়, অপর একশ্রেণীর লোকের 'অর্থচিন্তা চমৎকারা' প্রভৃতি সঞ্জাত কারণবশত মস্তিষ্ক ভাড়া দেবার প্রবৃত্তি, তৃতীয় একদল লোকের শ্রেণীস্বার্থ।

বাল্যকাল হইতেই সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে শোনা যাইতেছে, হিন্দুসমাজ শতধা-বিচ্ছিন্ন, আর মুসলমান সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ সমাজ ইত্যাদি। এই উক্তির সত্যতা কখনও নিরূপণ করা হয় নাই। ইহার পূর্বে সংস্কারকগণ বলিয়া গিয়াছেন, হিন্দুর জাতিভেদ আছে, সে পুতুল পূজা করে, পাঁঠা বলি দেয়, ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে ভোজন করায় ও তাহার কথায় ওঠে বসে ইত্যাদি; অতএব তাহার উন্নতি কী-প্রকারে সম্ভব? সুতরাং, সেইজন্য হয় ইউরোপীয়দের ধর্ম গ্রহণ কর না হয় তাহাদের সভ্যতা গ্রহণ করিয়া নিজেদের সংস্কার সাধন কর — এছাড়া আর অন্য উপায় নাই, 'নানাপন্থা অয়নায়'।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, এই ইউরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ কি? ইউরোপীয় ধর্মের সহিত ভারতীয় ধর্মের তুলনামূলক অনুসন্ধান প্রভৃতি দ্বারা নিজেদের অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা আদৌ করা হয় নাই। সংস্কারকেরা বাস্তব কর্মের লোক, বলাও যেমন,

কার্য করাও তেমন; তাহারা কেহ কেহ ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করিয়া ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া 'বন্দ্যঘাটি' বংশোদ্ভব ব্যক্তি 'বন্দো' হইলেন (এই প্রকারে লেখক একজনকে 'ব্রাইস' নাম গ্রহণ করিতে শুনিয়াছেন), কেহ বা 'দত্ত' হইতে 'দূত' হইলেন (ইহার মধ্যে কেহ কেহ 'দূতন'ও হইয়াছেন), 'কালী' 'কলি' হইলেন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা হয় একটা নূতন ভারতীয় জাতি সৃষ্টি করিলেন, অথবা বর্ণ-সঙ্কর আধা-ভারতীয় এবং আধা-ইউরোপীয় সমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। আবার কেহ কেহ মাঝামাঝি নূতন ধর্ম ও সমাজ সৃষ্টি করিলেন। শিক্ষিত বাকি সকলে নাম বদলাইলেন, 'বন্দ্য-ঘাটি' বোনার্জি হইলেন, চক্রবর্তী 'চাকেরবটি' মিত্র 'মিটাব' হইলেন, ঘোষ 'গস' হইলেন, বসু 'বোসি' হইলেন, ঠাকুর 'টাগোর' হইলেন ইত্যাদি। ইঁহারা সকলেই ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; আশা সুরাহা যদি সেই দিক হইতেই হয়। কিন্তু যে ইউরোপের দিকে তাঁহারা তাকাইয়া রহিলেন, সেই ইউরোপ .য দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হয়, এবং 'সনাতন ধারা' বলিয়া কিছু নাই তাহা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিলেন না! ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার প্রথম নজির দেখাইলেন রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু তিনি ইউবোপের ফরাসি বিপ্লবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং উহা হইতে শিক্ষালাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পর যেসব নেতৃবৃন্দ ইংলন্ড তথা ইউরোপ গমন করিয়াছেন তাঁহারা বেশির ভাগ ইংরেজ-শাসনসৃষ্ট মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক। কাজেই তাঁহাদেব দৃষ্টি আজ অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না; এইজন্য ইউরোপের গতিশীল (dynamic) শক্তির সহিত পরিচিত হইলেন না। এইযুগে ইংলন্ডের রাজ-কবি গর্বভরে বলিয়াছিলেন, "Better fifty years of Europe than a cycle of Cathay." অর্থাৎ চীনের একটা কল্পপরিমিত কাল সময় অপেক্ষা ইউরোপের পঞ্চাশ বৎসর শ্রেয় এবং উহাতে মানবের উন্নতি সম্ভব, এই তথ্যই তাঁহারা পাঠ করিলেন এবং তাঁহাদের সন্ততিবর্গ অদ্যাপি উহাই পাঠ করিতেছেন, কিন্তু তাহার অর্থ কয়জন উপলব্ধি করিতেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে অনেক ভারতবাসী ইংলন্ডে গিয়াছেন। সেই সময় ম্যাট্‌সিনি, কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেলস লন্ডনে অবস্থান করিতেছিলেন; কিন্তু আশ্চর্যের কথা কোনও ভারতবাসীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায় না। সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ম্যাট্‌সিনির নাম ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন; তাঁহার 'Italia Uni'-র (সংযুক্ত ইটালি) আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সংযুক্ত ভারত সংগঠনকল্পে "ইন্ডিয়া লীগ" স্থাপন করিলেন (তাঁহার আত্মজীবনী দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তিনি ম্যাট্‌সিনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায় না। তৎপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে লন্ডনে ক্রপট্‌কিন্, প্লেখানভ্, লেনিন প্রভৃতিও তথায় বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত কোনও ভারতবাসীর আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল বলিয়া কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। কেবল প্যারিসে বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে ক্রপট্‌কিনের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের আলাপ হইয়াছিল। স্বামীজির পাশ্চাত্য শিষ্যেরাই উক্ত সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই লন্ডনপ্রবাসী জনৈক চীনা বৈপ্লবিক যুবক রাজনীতিক কারণে হঠাৎ খ্যাতনামা হইয়া উঠেন — তিনি সুন-ইয়াৎ-সেন। তাঁহার সহিতও তৎকালে ভারতীয়দের সাক্ষাৎকারের কোনও সংবাদ জানা যায় না। কেবল লেখকের মধ্যম

ভ্রাতার (শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত) সহিত ব্রিটিশ মিউজিয়মে আকস্মিকভাবে তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বহুপরে জাপান ও আমেরিকাপ্রবাসী জাতীয়তাবাদী ভারতীয়গণের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। এই সকল কথা এখানে উল্লেখ করা হইল এই কারণে যে আমাদের দেশের যুবকগণ শিক্ষা লাভার্থে অনেকদিন হইতেই বিদেশে গমন করিতেছেন, কিন্তু সেখান হইতে তাঁহারা কী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া আনিলেন, যদ্দ্বারা তাঁহারা স্ব-স্ব দেশকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারেন? তাঁহারা যদি যথার্থ জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়াই বিদেশে প্রবাস-জীবন যাপন করিতেন, তাহা হইলে এই সকল খ্যাতনামা বিদেশি লোকদের আদর্শ ও কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিয়া অনেকে লাভবান হইতে পারিতেন। তুলনামূলক বিচারপদ্ধতিতে অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা তাঁহারা দেশের সমস্যাগুলির বিচার করিতে পারিতেন এবং সমস্যার সমাধানের সুবিধাও করিতে পারিতেন। কিন্তু যাঁহারা আগে ব্রিটেনে গিয়াছেন, তাঁহারা হয় আইন, সিভিল সার্ভিস অথবা চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন। ইংলন্ড ও ইউরোপের রাজনীতিতত্ত্বের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এবং অর্থনীতিতত্ত্বের সহিত তাঁহারা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। তাঁহারা ইংরেজি ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষার সহিত পরিচিত ছিলেন না। কাজেই ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকেরই জাবর কাটিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মনীষাসম্পন্ন ছিলেন এবং রাজনীতিতে স্পৃহা ছিল, তাঁহারা জন ব্রাইট, ব্রাডল কেইন্ প্রভৃতি পার্লামেন্টের সভ্যদের সহিত পরিচিত হইতেন। ইঁহারাও ভারত সম্পর্কে দুই একটা ভালো কথা মধ্যে মধ্যে বলিতেন; ইহাই ছিল উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র। এই যোগাযোগের ফলে ইংলন্ডের মান্‌চেস্টার দলের রাজনীতি (Manchester-School of Politics) আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতাদের রাজনীতিক আদর্শ হয় এবং উহা এখনও আছে।

বুর্জোয়া দলের আদর্শ

এই আদর্শগুলি ব্যক্তিগত খামখেয়ালির দ্বারা পরিচালিত হয় নাই, ইহার পশ্চাতে ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যা আছে। ভারতে ইংরেজ সরকার কর্তৃক একটা মধ্যবিত্তশ্রেণী সৃষ্ট হয়। ইহারা ইংরেজ সাম্রাজ্যের কুক্ষি হইতে উত্থিত এবং ইংরেজ সভ্যতার ইতিহাস ব্যতীত অন্য সভ্যতার ইতিহাসের সহিত পরিচিত নয়। মেকলের ভবিষ্যবাণী — "ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করিয়া গঙ্গাতীরের কৃষ্ণবর্ণ যুবকেরা আমাদের শেক্সপীয়র ও মিল্টন পড়িবে এবং আমাদের সভ্যতারই স্পর্ধা ও বড়াই করিবে" — ইঁহারা সফল করিয়াছেন! তাঁহার এই আশা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। এইজন্য অন্য সভ্যতার কথা ভাবিতেই পারা যায় না। আজ নিজেদের অতীত বিস্মৃতপ্রায়, নিজেদের ইতিহাস হাস্যকৌতুকের গল্পে পরিণত প্রায়! তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক বড় বাঙালির কাছে বাঙালির সম্পর্কে স্টুয়ার্ট ও মেকলে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই একমাত্র সত্য। শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে পুরাতন ইউরোপীয় সংস্কৃতভাষাবিশারদগণ বেদ প্রভৃতি বিষয়ে যে তথ্য ও সংবাদ দিয়া গিয়াছেন, তাহাই একমাত্র সত্য — সরকারি ইউরোপীয়রা ভারতীয় ঐতিহ্য, ভাষা, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব — এককথায় ভারতীয় কৃষ্টি সম্পর্কে যাহা বলিয়া গিয়াছেন বা এখনও এই দল

হইতে যাহা বলা হইতেছে তাহাই একমাত্র অভ্রান্ত সত্য! ফলে ইহা বিশ্বাস করা হইয়া থাকে যে, বাহির হইতে শ্বেতবর্ণের 'আর্য' নামধারী ব্যক্তিরা আসিয়া প্রাচীন ভারতীয়দের জয় করে, আর বৈদিক জাতিসমূহ যে শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট ছিল না, তাহা শোনাও পাপ! উপস্থিত বড় বড় মনীষীগণ জার্মানি বা উত্তর ইউরোপ অথবা সাইবেরিয়া হইতে লালমুখ, নীলচক্ষু, কটা চুলবিশিষ্ট নর্ডিক (Nordic) জাতিকে বৈদিক জাতি বলিয়া ভারতে শুভাগমন করাইয়াছেন। বৈদিক লোকেরা নাকি এইরূপ চেহারার লোক ছিল — ইত্যাদি!

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহাদের বুদ্ধিশক্তির বিজয় সম্পূর্ণভাবেই হইয়াছে। মুসলমান শাসনকালে যাহা হয় নাই, এই যুগের শিক্ষায় তাহা হইয়াছে এবং তাহাও সম্পূর্ণভাবেই। সুতরাং এই শিক্ষার ফলে লোকের গোলামি মনোবৃত্তি পরিপুষ্টিই লাভ করিতেছে। তুলনামূলক শিক্ষা প্রাপ্তির অভাবেই উক্ত মনোবৃত্তি মনে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া আছে, বাল্যকাল হইতেই ইউরোপীয়দের দ্বারা ভারতীয় কৃষ্টির ব্যাখ্যা পুস্তকাদিতে পড়ানো হইতে থাকে, কাজেই উহার একটা দাগ মনে পড়িয়াই গিয়াছে, তদুপরি বিজিত জাতির মনস্তত্ত্ব — 'বিজেতৃ জাতি মনিব বা প্রভু যাহা বলে তাহাই অভ্রান্ত ও একমাত্র সত্য'-ও মনের উপর বিশেষভাবেই কার্যকরী হইয়াছে; মনিবের 'গোড়ে গোড়' দিলে অথবা গণ্ডায় এণ্ডা দিলে অন্ন-সমস্যার সমাধান হয় — এই সকল উপাদানের একত্র সমাবেশের ফলে গোলামি মনস্তত্ত্ব-এর সৃষ্টি হইয়াছে।

বিজ্ঞানে শ্রেণী-স্বার্থ

আজকালকার ইউরোপের চরমপন্থীরা বলেন, বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতির পশ্চাতে শ্রেণীস্বার্থও বিদ্যমান থাকে। তাঁহারা বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া সভ্যতাকে কায়েমি করিবার জন্য বিজ্ঞানকেও বিকৃত করা হইয়াছে। বর্তমান শ্রমশিল্প সভ্যতার পশ্চাতে রহিয়াছে মূলধনীদের টাকা; ইহার জোরে তাঁহারা ধনতন্ত্রবাদীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কিন্তু ধনতন্ত্রবাদের শোষণ-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিকল্প-প্রয়াস চলিতেছে। কাজেই গণ-সাধারণকে মোহাচ্ছন্ন করা প্রয়োজন, এই জন্য তাহাদিগেরই ইতিহাস হইতে দেখানো প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে যে, উক্ত অবস্থাই মানবের পক্ষে সনাতন ও শাশ্বত। এইজন্য বিজ্ঞানকে তাহাদের শ্রেণীস্বার্থে লাগানো প্রয়োজন; আর সেই উদ্দেশ্যে বুভুক্ষু বৈজ্ঞানিকদিগের ভাড়া করা, পরিচালনা করা শক্ত নয়। কাজেও হইয়াছে তাহাই; মানবচিন্তার সকল ক্ষেত্রে তাহাদের সেন্সরের কলম চালানো হয়। সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপে উদ্ভূত হওয়ার পর তৎসঙ্গে তাহাকেও লাগানো হইল। কাজেই নরতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদের কাজে লাগানো হইল। ইহারই ফলে বিভিন্ন প্রকারের Race Theory (মূলজাতি সম্বন্ধে মতবাদ) বাহির হইল — 'white man's burden' (শ্বেতকায় লোকের বোঝা), Control of the Tropies (গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলির শাসন), Race-Theory of the Whitemen (শ্বেতজাতির শ্রেষ্ঠত্ব), Nordicism (নর্ডিক মতবাদ)। শেষোক্ত মতের অর্থ এই, জার্মানগণই একমাত্র নর্ডিক জাতি (নীলচক্ষু ও কটা চুলবিশিষ্ট মানব); সুতরাং তাহারাই একমাত্র আর্য এবং এইজন্যই তাহারা জগতের শাসকজাতি! বিজ্ঞানে স্বজাতীয়তা

প্রেম দেখিয়া অনেকেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন! কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের উৎকট জাতীয়তাবাদীয় শক্তির সম্মুখে কেহই টিকিতে পারেন নাই! অনেকদিন আগেই 'জ্যান ফিনো' নামক ফরাসি সমালোচক বলিয়াছিলেন যে, 'আর্য' মতটা 'ইন্ডো-ইউরোপীয়' মতে পরিণত হয়, তাহাও আবার জার্মান মতে পরিণত হয়। ইহার অর্থ, বেদের 'আর্য' নামটি ম্যাক্স মূলার ইউরোপে প্রচলন করেন। তিনি ইহার অর্থ বেদের আর্যভাষা বুঝিয়াছেন। কিন্তু জার্মান-স্বজাতিপ্রেমিকতা ইহাকে নিজজাতির প্রতি প্রয়োগ করিয়া বলিল, জার্মানরাই একমাত্র "আর্য" এবং তাহারাই পৃথিবী শাসন করিবার পক্ষে একমাত্র উপযুক্ত। তবে প্রাচীন ইতিহাসকে না উড়াইয়া দিয়া তাঁহারা বলিলেন, জার্মানেরা গ্রিসে যায় এবং পারস্য ও ভারতে গিয়া তথাকার 'আইরা' ও আর্য নামে পরিচিত হয়। ইহার চিহ্নস্বরূপ এই সকল দেশের দেবতাদের নীলচক্ষু ও কটা চুলবিশিষ্ট ছিল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন (এই অপব্যাখ্যা সম্বন্ধে ইটালীয় নরতাত্ত্বিক সার্জির "The Mediteranean Race" দ্রষ্টব্য)।

এক্ষণে কথা এই নর্ডিক মতবাদের পশ্চাতে যে বৈজ্ঞানিক সত্য বা সাম্রাজ্যবাদীয় স্বার্থই থাকুক না কেন, ভারতীয়গণ সেই তালে নাচিবে কেন? এই মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, প্রথমে নিজেদের সম্বন্ধে প্রায় পরিপূর্ণ অজ্ঞতা, তজ্জন্য শাসকশ্রেণী বা ইউরোপীয়েরা যাহা বলে তাহাই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস ও গ্রহণ করা; দ্বিতীয়ত, শ্রেণীস্বার্থ। অনেক ব্রাহ্মণ্যবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি নর্ডিক মতবাদে ভারতে ব্রাহ্মণ বর্ণের স্বার্থ ও ভূ-দেবত্ব সংরক্ষণের শেষ খুঁটি বলিয়া মনে করেন, অথচ এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, জার্মানিতে নর্ডিক মতবাদের পরিণতি দেখিয়া ইংরেজ বৈজ্ঞানিক লেখকেরা এই বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন, ইহা নির্জলা সাম্রাজ্যবাদীয় মত এবং একটা দলবিশেষের রাজনীতিক ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে (Haddon and Huxley, "We Europeans", Childe, "The Aryans" দ্রষ্টব্য)।

এই সকল আলোচনা দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে, গোলামি মনস্তত্ত্ব নানাপ্রকারে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আমাদের শ্রেণীগত স্বার্থও লুক্কায়িত আছে। এই স্বার্থ জাতীয়তাবাদ, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে নানাপ্রকারে অন্তর্নিহিত আছে। এইজন্যই এদেশের নবোত্থিত বুর্জোয়াশ্রেণী ইংলন্ডে গিয়া ইংরেজ বুর্জোয়া জীবনেরই অনুধ্যান করিয়াছেন; স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া "ইঙ্গ-বঙ্গ" (এই অনুষ্ঠান কেবল বাঙলায়ই সীমাবদ্ধ নাই) হইয়াছেন; ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাজনীতিতে যোগদান করেন, তাঁহারা মাঞ্চেস্টার স্কুলেব মতেরই জাবর কাটিয়াছেন। দেশবাসীর উপর বিদেশীয়ের cultural conquest (কৃষ্টির জয়) কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা কংগ্রেসের 'নেহরু রিপোর্টে'র উপর লন্ডনের New Statesman নামক সংবাদপত্রের অভিমতেই প্রকাশ পায়। এই রিপোর্টের সমালোচনায় বলা হইয়াছিল যে, ইহা English constitution-এরই নকলমাত্র।

আমেরিকায় পূর্বে একটা পরিহাস-বাক্য প্রচলিত ছিল — একজন আমেরিকান মরিলে সে প্যারিসে যায়, প্যারিস তাহার স্বর্গ। সেইরূপ শিক্ষিত ভারতবাসী মরিলে সে কোথায় যায় — নিশ্চয়ই লন্ডন তাঁহার পক্ষে স্বর্গ!

ভারতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থ

ভারতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থ হইল ভারতকে দ্বিতীয় ইংলন্ড করা, অর্থাৎ ভারতীয় জীবনের সর্ব বিষয়ে ইংরেজ বুর্জোয়াদের নকল করা। ক্রমে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতিক জ্ঞানসঞ্চার হইল। তাঁহারা ইংরেজের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলিতে লাগিলেন — "আমাদেব কিছু সুবিধা (privilege) দাও।" কংগ্রেস ইতিহাসের প্রথম যুগের কর্ম ছিল বৎসরান্তে একবার সমবেত হইয়া কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং প্রয়োজন হইলে ইংলন্ডের জনমত স্বপক্ষে আনযন কবা। এইজন্যে মধ্যে মধ্যে ইংলন্ডে প্রতিনিধি প্রেরিত হইত। অতঃপর ক্রমবিকাশেব ধারায় দ্বন্দ্বভাবের ধারানুযায়ী কংগ্রেসের মধ্যে গরম দলের অভ্যুদয হইল। এই সমযের মনোভাব ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আবেদন আর নিবেদনের থালা, বহে বহে নতশির।" এই ধুয়া ধরিয়া তিনি গাহিলেন, "যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে হে মোর স্বদেশ, মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে পরি তার বেশ!" এসব গান তখনকার বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্তর্গত নূতনদলেব মনস্তত্ত্বের পরিচায়ক। তখন মধ্যবিত্তশ্রেণী সর্বত্র উদ্ভূত হইয়াছে এবং স্বাবলম্বীও হইয়াছে, ভারত শ্রমশিল্পের (industry) প্রথম স্তরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে; তাই "হাঁটি হাঁটি পায় পায়" করিয়া সরকারি বাঁধন-দড়ির (apron-string) সাহায্য আর প্রয়োজন নাই। সেইজন্য "স্বাবলম্বন" হইল নূতন দলেব মূলমন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ এই মন্ত্রকে সমূর্ত করিবার জন্য "স্বদেশী-সমাজ" রূপ Parallel Government (সরকারি-শাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী শাসন) স্থাপন করিয়া নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করিতে বলিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি আরমেনীয় জাতীয়তাবাদীদের রুশ গভর্নমেন্টের বিপক্ষে উক্ত প্রকারেব আড়াআড়ি শাসন প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিলেন। ইতিমধ্যে ভারতে স্বাধীনতাকামী একটি দলেরও উদ্ভব হয় — ইহার আদর্শ ছিল 'পূর্ণ স্বাধীনতা'। তাঁহাদেব বাঙলা মুখপত্র হইল — 'যুগান্তর পত্রিকা'। এই পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দ এক প্রবন্ধে অস্ট্রিয়ার ফ্রেডারিক লিস্টের উৎকট জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিক ব্যবস্থা (Economic Nationalism) অবলম্বন করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, এই উপায়ে, "সোনার শিকল কাট"।

আজকাল এইসব আন্দোলন ও মন্তব্য শিক্ষিত লোকের নিকট অতি অদ্ভুত ও সাধারণ জিনিস বলিয়া বিবেচিত হইবে, কিন্তু তৎকালে ইহাই ছিল ঘোর বৈপ্লবিক ধ্বনি! পাঠকের মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাই পূর্বের যুগের নবোত্থিত বুর্জোয়া শ্রেণীর মানসিক অবস্থা।

ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের ঢেউ বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর দিয়া ইহার পূর্বে চলিয়া গিয়াছে; একদলের কাছে লন্ডনই স্বর্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহারই ফলে 'ইঙ্গ-বঙ্গ' সমাজ সৃষ্ট হয়, আর এই সমাজের অনেকেই রাজনীতিক নেতৃত্ব করিতেন। অবশ্য তাঁহারা ইংলন্ডের ইতিহাস হইতে পিম, হ্যামডেন প্রভৃতির জীবনী হইতে অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করিতেন। কিন্তু উক্ত ইংরেজ নেতাদের কার্যের পশ্চাতে তাঁহাদের যে শ্রেণীগত কঠোর সাধনা ছিল, সেই বিষয়ে তাঁহারা সচেতন ছিলেন না। কংগ্রেস প্যান্ডেল ও আইনসভাকে তাঁহারা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মনে করিতেন এবং কবডেন, ব্রাইট ও গ্ল্যাডস্টোনের

বক্তৃতার সুর ও স্বরের অনুকরণে তাঁহারা ভাবিতেন যে, জাতীয় পুনরুত্থান সংঘটন করিলেন। এ হেন কংগ্রেসকেই গান্ধীজি বলিয়াছেন, তাহারা একটা glorious debating house (বড় তর্কের স্থান) সৃষ্টি করিয়াছিল মাত্র। যাহা হউক, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিবর্তনের ধারায় তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং নিজ নিজ জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা সকলেই নমস্য।

চরমপন্থার আদর্শ

চরমপন্থী বুর্জোয়াদের আদর্শ হইল — 'স্বায়ত্তশাসন' (Autonomy) এবং স্বাধীনতাকামীর দল বলিলেন, পূর্ণ স্বাধীনতাই কাম্য। এই সময় ভারতের 'অতি-বৃদ্ধ' দাদাভাই নৌরজী ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেসের অধিবেশনে ঘোষণা করিলেন, "Swaraj is our birthright" (স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার)। ক্রমশ এই মত সর্বত্র প্রচারিত হইল যে, 'স্বরাজ' বা 'স্বাতন্ত্র্যই' হইতেছে ভারতের জাতীয়তাবাদের আদর্শ।

এইস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, মতভেদের কচকচি এবং আদর্শের তারতম্যের পাল্লা দেওয়া বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেই হইতেছিল। তখনও ভারতীয় রাজনীতি বুর্জোয়া শ্রেণীর বাহিরে প্রসার লাভ করে নাই; তবে অভিজাতশ্রেণী পশ্চাতে থাকিয়া বুর্জোয়াদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। জগতের সর্বত্রই বুর্জোয়াশ্রেণী মনে করে যে, তাহারা জনসাধারণের প্রতিনিধি। ভারতের বুর্জোয়া নেতারাও তদ্রূপ বলিতেন। কিন্তু সমাজ যে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত, সেই সকল শ্রেণীর স্বার্থও বিভক্ত; সুতরাং একশ্রেণীর উদ্দীপনা অন্য শ্রেণীকে প্রভাবান্বিত করে না। ইহা জাতীয়তাবাদীদের মস্তিষ্কে কখনও প্রবেশ করে না। কিন্তু জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হইতেছে 'Racialism' (মূলজাতির প্রতি প্রেম) — ইহার অর্থ 'জাতিত্ব' বোধ উদ্দীপিত করা। আগে মূল জাতিটা বাঁচুক, তৎপব শ্রেণীসমূহের স্বার্থের কথা বিবেচনা করা যাইবে — ইহা হইতেছে উক্ত আদর্শের মূল কথা। অবশ্য Racialism বা জাতিত্ব আজও সকল জায়গায় কার্যকরী হইতেছে, ইহার এখনও প্রভাব কমিয়া যায় নাই। কিন্তু জাতিত্ববোধ ও শ্রেণীস্বার্থবোধ — সবই আত্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। 'মনস্তত্ত্ব' বিজ্ঞানের একটি অংশ হইতেছে — Theory of Cognition, অর্থাৎ জিনিসকে বুঝা। বেদান্তের 'আত্মানাং বিদ্ধি' তত্ত্ব ইহারই অন্তর্গত। যতক্ষণ মানবের আত্মচৈতন্য না হয়, ততক্ষণ সে নিজের বিষয়ে সচেতন হয় না; সেইরূপ একটা শ্রেণী নিজের বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত না হইলে তাহার শ্রেণী-চৈতন্য (Class-Consciousness) হয় না — জাতিত্ব সম্পর্কেও তদ্রূপ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতে প্রাচীনকাল হইতে জাতিত্ববোধ (Race Consciousness) কখনও উদ্বুদ্ধ করা হয় নাই। ভারতও অখণ্ড একজাতীয়তা (Nationality) গঠন করিতে পারে নাই। প্রাচীন নেতারা তাহাদের ধর্মগত সাম্প্রদায়িক বোধ ও বর্ণবোধ (Caste-Consciousness) কেবল উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন; অবশ্য ইহার পশ্চাতে ছিল শাসকশ্রেণীর শোষণনীতি। পুরোহিততন্ত্র শাসকদের সহিত মিলিত হইয়া লোকদের তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, কেবল তাহাদের ধর্মজ্ঞান প্রদান করা হইত। এই জন্য ভারতীয়েরা প্রথমত রাজনীতিক জীব না হইয়া ধর্মান্ধ জীবরূপে বিবর্তিত হইয়াছে।

মুসলমান শাসনের যুগে উত্তর ভারতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ধর্মগত প্রভেদ দ্বারা একই জাতি পৃথক ও ভিন্ন হইয়া গেল। যখন একই রাজপুত, আহির, জাঠ, গুজার জাতিসমূহের একাংশ মুসলমান ধর্মাবলম্বী হইয়া গেল, তখন একজাতিত্ববোধের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক পার্থক্যবোধ, তাহাদের মধ্যে প্রবলভাবে জাগ্রত করা হইল। ফলে লোক আগে হিন্দু বা মুসলমান — পরে সে রাজপুত, জাঠ প্রভৃতি বলিয়া নিজেকে মনে করিতে লাগিল, আর ভারতীয় একজাতিত্ববোধ বরাবরই ধোঁয়াটে রকমের ছিল। এই কলহে তাহা আরও ধোঁয়াটে হইয়া দৃষ্টির অন্তরাল হইয়া যায়। এই অবস্থা আজও চলিতেছে। অবশ্য গুপ্ত ও অন্যান্য সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে প্রাচীনকালে একজাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ধর্ম ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহারই ফলে আজ লালমুখ কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ ও দক্ষিণের কালোমুখ ব্রাহ্মণ একই গোত্রের, অতএব একবংশের বলিয়া নিজেকে মনে করে। কিন্তু এক জাতিত্ববোধের অভাবে কাশ্মীরি ও দ্রাবিড়ি পৃথক জাতীয় লোক বলিয়া পরস্পরের সহিত সামাজিক আদানপ্রদান করে না।

সামাজিক চিত্রপটকে পশ্চাতে রাখিয়া ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছে। তবে ইংরেজি শিক্ষা এবং কেন্দ্রীভূত ইংরেজি শাসনের ফলে সকলেই "ভারতীয়" এই বোধটা উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা কিন্তু এখনও কৃষ্টির ভিতরই গণ্ডিভূত হইয়া আছে। সামাজিক জীবনে এখনও তাহা কার্যকরী হয় নাই।

গান্ধী আন্দোলন

এই প্রকারের রাজনীতিক পরিস্থিতির মধ্যে বিগত মহাযুদ্ধের পর গান্ধীজি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৯২১ খ্রি. অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যে কর্মপদ্ধতি প্রদান করিলেন, তাহাতে পুরাতন বুর্জোয়া নেতাদের কংগ্রেসে থাকা সম্ভব হইল না। তাঁহারা 'মন্টেগু সংস্কার' গ্রহণ করিয়া জাতীয় আন্দোলন হইতে নিজেদের অপসৃত করিলেন। গান্ধীজির দল কংগ্রেস দখল করিল। তিনি যে কর্মপদ্ধতি প্রদান করিলেন, তাহা এদেশে নূতন ও বৈপ্লবিক বলিয়া ধার্য হইলেও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যত অপ্রচলিত উদ্ভট ও পুরাতন ইউরোপীয় ন্যাশন্যালিস্ট ও সংস্কারকদের মত ও পদ্ধতি হিন্দু আকারে ভারতে গান্ধীবাদ নামে প্রচলিত হয়।

হাঙ্গেরির স্বাধীনতা প্রচেষ্টা পরাজিত হইলে ডিক (Deak) নামে এক হাঙ্গেরীয় স্বদেশপ্রেমিক অসহযোগ পদ্ধতি সেই দেশে প্রবর্তন করেন। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরবর্তীকালের কথা। ইহার বহু পরে আইরিশ জাতীয়তাবাদীরা বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আয়র্লন্ডে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ইহার নামকরণ হয় 'Sein Fein' অর্থাৎ স্বাবলম্বন। এতদুভয়ের পশ্চাতে থাকে লিস্টের Economic Nationalism (অর্থনীতিক জাতীয়তাবাদ)। এই আন্দোলন জীবনের সর্বক্ষেত্র হইতে বিদেশি প্রভাব অপসারিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। ইহাও গান্ধীবাদে গৃহীত হয়। তৎপর আমেরিকার 'Singletax' মতের প্রবর্তক হেনরি জর্জের কুটীরশিল্পের পুনঃপ্রচলন করিবার মতটি — যাহা ইংলন্ডের খ্রিস্টিয়ান-সোস্যালিস্ট রাসকিন, কিংসলি প্রমুখ নেতারা গ্রহণ

করিয়াছিলেন তাহাও ভারতীয় গান্ধীবাদের রথে সংযোজিত হইল। শেষে রুশিয়ার ধর্ম-অ্যানার্কিস্ট টলস্টয়ের অহিংসা মতবাদকে এই মতের প্রাণশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করা হইল। তৎপব আসে ফরাসি সিন্ডিক্যালিস্ট (অ্যানার্কিস্ট) দলেব Passive Resistance পদ্ধতি। এই সকল পদ্ধতিকে হিন্দুধর্মের আবরণে ভারতে 'অহিংস অসহযোগ' নামে প্রবর্তন করা হয়। লোকেও সনাতন বৈদিক ধারার ভিত্তিতে ভারত স্বাধীন করিবার এই প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল (বরিশালের প্রাদেশিক কনফারেন্সে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য; তিনি বলিয়াছিলেন, বেদান্তের উপর এখন ভারতীয় রাজনীতি স্থাপিত হইয়াছে)।

ইউরোপের পরিত্যক্ত ঐসব মতবাদ ভারতে প্রচলন করাতেই যেন কেহ মনে না করেন যে, ভারতে যথার্থ গণ-আন্দোলন হইয়াছে। পাতি-বুর্জোয়া মতবাদ ও কর্মপদ্ধতি এবং কাল্পনিক সোস্যালিস্টদের মত ও পদ্ধতি ভারতে প্রচলিত হওয়ায় কেহ যেন মনে না করেন যে, ভারতে গণ-শ্রেণীর জাগৃতির উদ্বোধন করা হইয়াছে। বরং এই পুরাতন কর্মপন্থা দ্বারা তাহাদের আরও সুষুপ্ত করা হইয়াছে। বিগত মহাসমরের পরে জগতের সর্বত্রই গণ-জাগরণ আরম্ভ হইয়াছিল। বরং রুশিয়ায় শ্রমিক ও কৃষকশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জগতের মূক গণ-শ্রেণীর মুখে ভাষা আসে, সর্বত্রই চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় — এবং ভারতেও সেই বন্যার ঢেউ আসিয়া লাগে। কিন্তু গান্ধী-আন্দোলনে সেই বন্যার স্রোতের মোড় ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ধর্মের হুজুগে ও চরকা (এই শব্দটি মূলত ফার্সী; 'চর্খহ্'!) আন্দোলন দ্বারা ম্যাঞ্চেস্টারের প্রস্তুত দ্রব্যাদির বর্জন ও বিতাড়ন এবং অসহযোগ দ্বারা ইংরেজ বুর্জোয়াতন্ত্রের অর্থনীতিক প্রভাব ক্ষুণ্ণ করা, আর তদ্দ্বারা রাজনীতিক প্রভাবশূন্য বাক্যে, বিশেষত এই ধর্মান্ধ দেশে মহাত্মা, মৌলানা, স্বামী, ব্রহ্মচারীদের রাজনীতিক্ষেত্রে অবতরণ করাইয়া এবং ধর্মের ছেঁদো (বাকচাতুরীময়, কপট) বুলি আওড়াইয়া গণ-সাধারণকে বুর্জোয়াতন্ত্রের রথে পুনর্যোজিত করা হইল। ১৯২১ খ্রি. বাঙলা সরকারের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে যে রিপোর্ট বাহির হয়, তাহাতেই স্বীকৃত হয় যে, এক বৎসরে বাঙলায় ৪৪টি ধর্মঘট হয় এবং বাঙলায় শ্রমিক স্বীয় গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়াছে (Labour has come to its own), অর্থাৎ তাহার শ্রেণীচৈতন্য জাগ্রত হইয়াছে।

গণ-শ্রেণীর উত্থান যে বুর্জোয়াশ্রেণী ভালো চক্ষে দেখেন নাই এবং তজ্জন্য মিলমালিক ও মূলধনীর দল 'চরকা-আন্দোলন ও গান্ধীবাদে'র পশ্চাতে থাকিয়া শ্রেণীস্বার্থ বাঁচাইবার চেষ্টা করেন, তাহা বুর্জোয়া নেতারা অস্বীকার করেন নাই। ১৯২৩ খ্রি. চট্টগ্রাম কনফারেন্সে পরলোকগত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছিলেন যে, রুশ বিপ্লবের পর গণ-জাগরণের যে বন্যা ভারতে আসে, মহাত্মাজি তাহার মোড় ফিরাইয়া দিয়াছেন।

যাহা হউক, এই পাতি-বুর্জোয়া আন্দোলন আসলে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন; শুধু পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্তে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তবে এই আন্দোলনের দান এই যে, নানা প্রকারের ধর্মের ও অর্থনীতিক উদ্ভট মত ভারতীয় কংগ্রেসে ঢুকাইয়া রাজনীতিকে ঘোলাটে করিয়া রাখিয়াছে।

গণ-আন্দোলন

জাতীয়তাবাদীরা গণ-আন্দোলন চাহেন নাই এবং যেখানে সুযোগ পাইয়াছেন, সেখানেই উহার প্রতিবন্ধকতা করিয়াছেন। তাঁহারা অবশ্য গণ-শ্রেণীদের (masses) চাহেন, কিন্তু সেটা অন্যপ্রকারে; তাঁহারা গণসমূহকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের রথে বাঁধিয়া নিজেদের কার্য উদ্ধার করিয়া লইতে চাহেন। এইজন্য তাঁহারা চাহেন Class-Collaboration (শ্রেণী-সহযোগ) অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণী সহযোগিতা করিয়া কার্য করিবে। কথাটা কিন্তু শুনিতে বেশ মনোরম ও শ্রুতিসুখকর, কিন্তু সবল ও শিক্ষিতের সহিত দুর্বল ও অশিক্ষিতের সমানভাবে সহযোগিতা কি প্রকারে সম্ভবে? যেখানে পরস্পরের স্বার্থের প্রতিনিয়ত ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে, সেখানে সহযোগ কী প্রকারে হয়? বস্তুত উহা আসলে Class-domination অর্থাৎ একশ্রেণীর ঘাড়ে আর এক শ্রেণীর চড়াতে পর্যবসিত হয়। ইউরোপে ইহাকেই 'ফ্যাসিস্ট' মতবাদ বলা হয়। এই মত বিগত মহাযুদ্ধের পর যখন সর্বত্র শ্রমিকচাঞ্চল্য দেখা দিল, ১৯২৫ সালে যখন পূর্ব ইউরোপে 'সবুজ বিপ্লব' (Green Revolution) হইতে লাগিল, অর্থাৎ পূর্ব ইউরোপের কৃষকেরা জমিদারের জমি দখল করিতে লাগিল ইত্যাদি, তখন ইউরোপের ধনিকশ্রেণী বিশেষ চিন্তাকুল হইয়া পড়ে এবং এই সময়েই ফ্যাসিস্ট মতবাদ উদ্ভূত হয়। ধনীশ্রেণী নানা উপায়ে গণ-আন্দোলনগুলিকে দমিত করিয়া শাসনযন্ত্র দখল করে এবং আইন জাহির করিল যে, ধনী তাহার ধন নিয়োজিত করিয়া কারখানাদি স্থাপন করুক আর শ্রমিকদল তথায় খাটিয়া স্বীয় জীবিকা অর্জন করুক। ধর্মঘট, অসহযোগ প্রভৃতি দ্বারা কার্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে উহা আইনত দণ্ডনীয় হইবে। যদি তাহার কোনও অভিযোগ থাকে তবে তাহা সালিশি বোর্ডে (Arbitration Board) উপস্থিত করা হউক। আর এই দ্বন্দ্বের শেষ বিচার সরকারের হাতে। এতদ্দ্বারা বিগত পঞ্চাশ ষাট বৎসর ধরিয়া শ্রমিকের হাতে 'অসহযোগ'-রূপ একমাত্র যে শেষ অস্ত্রটি ছিল তাহাও কাড়িয়া নেওয়া হইল। শ্রমিকের কোনও অভিযোগের সুরাহা হওয়ার উপায় বন্ধ হইয়া যায়। এখন গভর্নমেন্ট মূলধনীদের করায়ত্ত, সুতরাং তাহার কথা শুনে কে? জার্মানিতে নাৎসিবাদ আরও ভীষণাকার ধারণ করে। সমগ্র দেশের কল্যাণের নামে Totalitarian State গঠিত হয়; সমাজের সকলকেই একযোগে দেশের কার্য করিতে হইবে, দেশ বড় হইলে দেশেরও সমগ্র লোক বড় হইবে ইত্যাদি। কিন্তু আসলে শ্রেণী-সহযোগিতার নামে একটি শ্রেণী-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়; ডেমোক্রাটিক শাসনপ্রণালী স্থগিত করা হয়। এ-দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর মনস্তত্ত্ব অন্যান্য দেশের সমশ্রেণীরই অনুরূপ। এইজন্যই ফ্যাসিস্টবাদ, নাৎসিবাদ প্রভৃতির এত সুখ্যাতি এই দেশের বুর্জোয়াদের নিকট শোনা যাইত।

কিন্তু নেতাদের মত ও প্রচেষ্টা যাহাই হউক, ক্রমে শ্রমিক কংগ্রেস, কিষানসভা প্রভৃতি ভারতের সর্বত্র স্থাপিত হইতে লাগিল। অবশ্য বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী ও পুরাতন পন্থার মডারেটরগণ এইসব আন্দোলনকে স্বীয় কুক্ষিগত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহারা সফলকাম হন নাই। শ্রমিক আন্দোলন অনেক ঝগড়া-কলহের পরও সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়া নেতৃত্ব হইতে বিমুক্ত হইতে পারে নাই বটে, তবু 'শ্রেণী-চৈতন্য' তাহাদের সকল

দলের শ্রমিকের মধ্যেই উদ্ভূত করা রহিয়াছে। 'স্বরাজ' অর্থ শ্রমিকরাজ — ইহা সকল দলেই স্বীকৃত হয় ইত্যাদি। আর কৃষক আন্দোলন কংগ্রেসপন্থীয় গরমদলের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। সোসালিস্ট আদর্শানুযায়ী রাষ্ট্র কৃষকের আদর্শ, একথা প্রথম হইতেই স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি ইহাও এখানে উল্লেখ করিতে বাধ্য যে, বিহার প্রদেশে কংগ্রেসের বুর্জোয়াশ্রেণী কৃষকসভার অনুসৃত আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন খাড়া করিয়া, এই সর্বব্যাপী আন্দোলনকে ব্যাহত করিতে চেষ্টা করেন; বাঙলায় নানা উপায়ে সেই কর্ম করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আজ কৃষক আন্দোলন গোঁড়া কংগ্রেসপন্থীদের হাতে নাই; যাঁহারা ইহার মধ্যে ছিলেন তাঁহারা নিজেদেব অপসৃত করিয়াছেন। আজ ভারতীয় কৃষক আন্দোলন বেশির ভাগ জায়গায়ই সাম্যবাদীর হস্তে।

কংগ্রেস মনস্তত্ত্ব

জাতীয় কংগ্রেস আজ মধ্যবিত্তশ্রেণীর মুখপাত্ররূপে স্থাপিত। আজ পর্যন্ত ইহা ঐ শ্রেণীর দ্বারাই অধ্যুষিত। পুরাতন মতের ও পথের নেতৃবৃন্দের সহিত ইহার বর্তমান নেতাদের কর্মপন্থা এবং আদর্শ পৃথক থাকিলেও, আসলে ইহা বুর্জোয়া আদর্শেই প্রভাবিত। আজ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি পূর্ণস্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু একমাত্র জাতীয় কংগ্রেসই এই উদ্দেশ্যে সাধনা করে। কাজেই কংগ্রেসের মত ও পথকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেস সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান হইলেও, ইহা সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়াতন্ত্র অধ্যুষিত। কাজেই ইহার আদর্শ বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদ। এইজন্য ধনিকতন্ত্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে এই প্রতিষ্ঠান যাইতে পারে না। ইহার প্রকট প্রমাণ কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত 'মৌলিক অধিকার' সমূহের শর্তগুলি বিশ্লেষণ করিলেই ধরা পড়িবে যে, ইহার সহিত ফ্যাসিস্ট পদ্ধতির প্রভেদ বা পার্থক্য নাই, বিশেষত শ্রমিক বা মূল শ্রমশিল্প সম্পর্কিত শর্তসমূহ সম্পূর্ণ ফ্যাসিস্ট-পদ্ধতি অনুসারী। এতদ্ব্যতীত কংগ্রেস আজ পর্যন্ত গণশ্রেণীসমূহের সম্পর্কে এই ধারণাই পোষণ করিয়া থাকেন, তাহাদের বাস্তব দুঃখকষ্ট যাহাই থাকুক না কেন, কংগ্রেসের নামে বা নেতাদের নামে তাহারা দেশপ্রেমে মতোয়ারা হইয়া স্বাধীনতার সাধনায় প্রমত্ত হইবে। কিন্তু বুর্জোয়াগণ আজ পর্যন্ত একবার বিচার করিয়া দেখিলেন না যে, গণসমূহকে যে আহ্বান করা হইতেছে তাহা দেশমাতৃকার বেদিতে আত্মবলিদানের নিমিত্ত, না উক্ত নামে শ্রেণীস্বার্থে তাহারা আহুতি প্রদত্ত হইবে। গণসাধারণ যে সর্বত্র বিশেষভাবে সাড়া দেয় না তাহাই প্রমাণ যে, তাহাদের মনে কী ভাব জাগরিত হইতেছে।

বুর্জোয়া নেতারা আজও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না যে, ভারতীয় জাতীয়-আন্দোলন ১৯২১ সালের জায়গায় পড়িয়া রহে নাই, এই আন্দোলনের রঙ্গমঞ্চ আর তাহাদের একাধিপত্যে নাই, আরও অন্যান্য আদর্শের ও শ্রেণীর নেতারা উত্থিত হইয়া কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের স্বার্থত্যাগও কম নয় এবং তাঁহাদের অনুগামী লোকসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

সাম্যবাদী আন্দোলন

অনেকদিন হইতে শ্রমিক-আন্দোলনকে ভিত্তি করিয়া ভারতে সাম্যবাদীয় মত প্রচারিত হইতেছে। ইহাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিবার জন্য নানাদিক হইতে যতই চেষ্টা করা হইতেছে, ততই ইহা অধিক শক্তিশালী ও প্রসার লাভ করিতেছে। এই আন্দোলন নিজের সম্প্রদায়ের অনেক শহিদ সৃষ্টি করিয়াছে। স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তের একটা লম্বা ফিরিস্তিও রচনা করিয়াছে। এই আন্দোলন যে ভুয়া নয় তাহা দেখা যায় তাহাদের কর্মীদের অদম্য উৎসাহ, কর্মনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগে। এই আন্দোলনের মধ্যে কয়েকটি সম্প্রদায় আছে তন্মধ্যে একটি সুবৃহৎ আকার ধারণ করিতেছে।

সাম্যবাদী আন্দোলনকে ব্যাহত করিবার জন্য নানা প্রচেষ্টা চলিয়াছে। একটি দল উত্থিত হইয়াছে, তাঁহারা কার্ল মার্ক্সের দোহাই দেন বটে, কিন্তু কার্যত গান্ধীবাদী দলের বথে সংযুক্ত। একবার এক সভায় এই দলের এক নেতাকে তাঁহাদের দলের অদ্ভুত নামকরণের সম্পর্কে লেখক প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে নেতাটি বলেন, তাঁহারা মার্ক্সবাদী এবং এই দলের সৃষ্টি হইয়াছে To fight the communists and the reactionaries of the Congress. কিন্তু এই সকল বিষয়ে তাঁহারা কতটা কৃতকার্য হইয়াছেন তাহা বাহির হইতে যতটা দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে তাঁহাদের মার্ক্সবাদ খুব প্রবল নয়।

এই সঙ্গে ওঠে কমুনিস্ট মতাবলম্বীদের কথা। আজকাল প্রায় সকলেই নিজেকে মার্ক্সের সোসালিজম-এ আস্থাবান বলিয়া জাহির করেন। তবে যাঁহারা একটা বিশিষ্ট মার্ক্সীয় কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং কমুনিস্ট তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহারই কমুনিস্ট পদবাচ্য। আসলে সোসালিজম্ ও কমুনিজম এক জিনিস। বিগত মহাসমরের পর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লেনিন তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংগঠন করিলেন এবং স্বীয় দলের জন্য সোসালিস্টদের পুরাতন নাম কমুনিস্ট নামটি গ্রহণ করিলেন। অবশ্য কার্যপদ্ধতির মধ্যে একটি বিশিষ্ট প্রভেদ সৃষ্ট হইল, সোসালিস্ট নামধারী মার্ক্সবাদীগণ পার্লামেণ্ট পদ্ধতি দ্বারা শ্রমিকরাজ আনয়নেচ্ছুক; পক্ষান্তরে কমুনিস্ট নামধারীরা বিপ্লব দ্বারা উহার প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী।

মতের বিভিন্নতার জন্য সোভিয়েট রুশ ব্যতীত আর সকল দেশেই কমুনিস্টরা নির্যাতিত এবং অনেক দেশে এই আন্দোলন বেআইনি বলিয়া বিঘোষিত ও বিবেচিত। কিন্তু স্টালিনের নেতৃত্বে রুশিয়ায় যখন Socialism in one country (সোসালিজম এক দেশেই আগে প্রতিষ্ঠিত হউক, পরে বিশ্ব-বিপ্লব দেখা যাইবে) মতটি ট্রটস্কির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রাধান্য লাভ করে, তখন হইতে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত তৃতীয় আন্তর্জাতিকের খুব মাখামাখি বড় কম হইতে আরম্ভ হয়। এই মহাসমিতির দপ্তরখানা মস্কোতেই থাকিত; কারণ অন্য কোনও দেশ দপ্তরের বাৎসরিক অধিবেশন হইতে দেন নাই বা দপ্তরখানার অফিস স্থাপিত হইতে দেয় নাই। এবং বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া নাকি তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বাৎসরিক অধিবেশনই হয় নাই। অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্কে একবার অধিবেশন আহ্বান করিবার চেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমেরিকান গভর্নমেন্ট তজ্জন্য অনুমতি প্রদান করেন নাই।

বিগত বৎসরে কানাডার পর সংযুক্ত রাষ্ট্র (United States) কমুনিস্ট পার্টিকে আইন-সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করেন। সম্প্রতি মস্কো হইতে কমুনিস্ট আন্তর্জাতিক নিজেই দল ভাঙিয়া দিয়াছে। এইজন্য আজ কমুনিস্ট বা তৃতীয় আন্তর্জাতিক আর নাই, এখন বিভিন্ন দেশের কমুনিস্ট পার্টি সোসালিস্টদের ন্যায় দেশগত দল। দেশের বাতাবরণের মধ্য দিয়াই তাহাদের কর্ম করিতে হইবে।

কমুনিস্ট ও সোসালিস্ট আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কী হইবে, তৎসম্বন্ধে কাহারও পক্ষে সঠিক কিছু বলা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু এটা ঠিক যে, কমুনিস্ট আন্দোলন এশিয়ায় প্রবল আকার ধাবণ কবিতেছে। এশিয়ার কৌমগত বর্ববাবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাব মধ্যে খাম্বিরের (Leaven) কার্য করিতেছে Bolschevism। ফরাসি বিপ্লবের ঢেউ সমগ্র ইউরোপ প্লাবিত করিয়া যেমন বর্তমান ইউরোপ সৃষ্টি করে, 'বোলচেভিক বিপ্লব' (Bolschevic Revolution) তদ্রূপ ইউরোপ এবং এশিয়ায় কার্য করিতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসন বলিয়াছিলেন, ইউরোপে খ্রিস্টধর্মের প্রচারের পর 'বোলচেভিক' মতের ন্যায় প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি (Spiritual force) ইউরোপে আর আসে নাই। এশিয়ায়ও বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ও ঐশ্লামিক বন্যার পর এত বড় প্রবল শক্তিশালী প্রবাহ আর আসে নাই, বরং ইহাদের অপেক্ষাও সর্বপ্রকারে মুক্ত এবং কৃষ্টিতে উন্নততর মানব এই আন্দোলন সৃষ্টি করিতেছে। সাইবেরিয়ার অসভ্য বর্বর জাতিগুলি, তুর্কিস্থানের অজ্ঞ ও ধর্মান্ধ মুসলমান, মঙ্গোলিয়ার অজ্ঞ বৌদ্ধ বুরিয়াট ও মঙ্গোল, সকলেই এক নূতন আলোক পাইয়া নূতন মানবরূপে গড়িয়া উঠিতেছে। আজ বুরিয়াট সোভিয়েট রিপাব্লিকের পরিচালিকা একজন মহিলা — টিসডেনোভা (Tysdenova)। তিনি পূর্বে গোয়ালিনী ছিলেন (Soviet Union News, Vol. 11. No 8. Aug.'43 p. 25 দ্রষ্টব্য)। আর বোখারার সোভিয়েট স্থাপনের অগ্রণী ছিলেন — মামুদ। এখন শ্রমিক চীনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, সেখানকার কমুনিস্টরা চীনের একাংশ শাসন করে এবং আজ ন্যাশন্যালিস্টদের সহিত সম্মিলিত হইয়া জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে (এদের সম্পর্কে Edgar Snow-র Scorched Earth দ্রষ্টব্য); পুনঃ সিংকিয়াং বা পুরাতন চীন-তুর্কিস্থান আজ এক নূতন শাসনাধীনে নূতনভাবে গড়িয়া উঠিতেছে (এডগার স্নো দ্রষ্টব্য)।

এই ভাব-তরঙ্গের ধাক্কা ইরান, তুর্কি, আফগানিস্তান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় লাগিয়াছে। যেখানে রাজশক্তি সহায় হইতেছে বা কমুনিস্টরা রাজশক্তি করায়ত্ত করিয়াছে, সেখানে এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিয়া নূতন শিক্ষার আলোকে নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে। আজ আফগানিস্তানে প্রত্যেকটি চায়ের দোকানে প্রত্যেক যুবকের মুখে মামুদ ও আমিনার গল্প শোনা যাইতেছে, (রামনাথ বিশ্বাস — 'আফগানিস্তান ভ্রমণ')। সামাজিক অত্যাচারে জর্জরিত ও দরিদ্র মামুদ রুশ (সোভিয়েট শ্রমিকের কার্য করে এবং বোখারায় সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা করিয়া সামাজিক অত্যাচার ও আমিনার অপমৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়। আজ বালখের তাজিক, উজবেগ ও তুর্কি তরুণেরা ভারতে Pioneer আন্দোলন নাই বলিয়া মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নজীর নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যুবকেরা বলে যে,

পুরোহিতেরা আজ দোজখে (নরক) গিয়াছে;কারণ তাহারা আব লোক ঠকাইতে পারে না (পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের সোভিয়েট ভূমি দ্রষ্টব্য)।

এশিয়ায় সর্বত্রই যুবকদের মধ্যে এক নবজাগরণ আসিয়াছে। ফুঙ্গি, ভিক্ষু, মোল্লা প্রভৃতি আর তাহাদেব মনের খোরাক জোগাইতে পাবিতেছে না। তাহা হইলে ইহা কি খুব বিস্ময়ের বিষয় যে, ভারতে এইজন্যই বোলচেভিক মতবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও শক্তিশালী হইবে

লোকে বলে, ভারতে কমুনিস্টের সংখ্যা বড় দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে — ইহাতে আশ্চর্যের কথাই বা কি আছে? শিক্ষিতদের মধ্যে পুবোহিত ঠাকুরদের প্রাধান্য বামমোহন রায়ের সময় হইতেই যাইতে বসিয়াছে। তুকতাক ও স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা কেহ আর ব্যাধি আরোগ্য করে না। একশত বৎসর ধরিয়া লোক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পাইতেছে এবং ভারত শ্রমশিল্পেব দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রবেশোন্মুখী (হুইটলি কমিশন বিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। ধর্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, বাষ্ট্র-বিপ্লব প্রচেষ্টা, সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতি নানা প্রকাবের আন্দোলন আসিয়াছে ও গিয়াছে। উপস্থিত অনেকেই ধারণা করিতেছেন যে, আমূল পরিবর্তন না হইলে ভারতেব সমাজের পুনরুত্থান সম্ভব নহে। তৎপর গান্ধীবাদ কিছুকাল এক দলকে বিমোহিত কবিয়া রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা এক প্রকারের ধর্মরূপেই পর্যবসিত হইযাছে — তাহা শিক্ষিত তরুণদের আর আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না। কাজেই এখন বড প্রশ্ন, তরুণদের চিন্তার খোবাক আর কে যোগাইবে?

কংগ্রেসি আদর্শ

ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে, ফ্যাসিস্টবাদের ন্যায় ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়াদেব আদর্শই কংগ্রেসের আদর্শ। অবশ্য সকল দেশেই বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদীদের ইহাই হইতেছে আদর্শ। কিন্তু ইহার মধ্যে গান্ধীবাদেব একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে — ইহা 'রাম-রাজত্ব' চায়। গান্ধীভক্তেরা মন্ত্রের ন্যায় রঘুপতি বাঘব শ্লোক আওড়ান এবং কোনও আন্দোলনের সময়ে এইটিই তাঁহাদের 'ধ্বনি'। 'রামরাজ' অর্থ রামের ন্যায় রাজা। ইহা তো সেই সুদূর অতীতের গল্পের কথা। কিন্তু বর্তমানে রামরাজত্ব লোকের কি মহৎ উপকারে আসিবে? লোকে যখন রামরাজত্বের কথা বলে, তখন উহার ভিতরকার অর্থ কি উপলব্ধি করেন? রাম বড় ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন; কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণদের অভিযোগক্রমে শম্বুক নামক এক নিরপরাধ উগ্রতপা শূদ্র তাপসের শিরচ্ছেদ করেন। অপরাধ, তিনি শূদ্র হইয়াও তপস্যা করিতেছিলেন!

প্রাচীনকালের Serf Empire-এর (গোলামের রাজা) মধ্যে এবম্প্রকারের কাণ্ড চলিতে পারিত, কিন্তু এইযুগে এরূপ কর্ম একেবারে অচল। বর্ণাশ্রমীয় রাষ্ট্র হিন্দুদের অতীতে বাঁচাইতে পারে নাই এবং বর্তমানে ভারতের লোক (দুই-একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছাড়া) এবম্প্রকারের রাষ্ট্রে আদৌ অনুরাগী নহে। একবার জনৈক গান্ধীভক্তের সহিত লেখকের এই বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, ইহার অর্থ গান্ধীজি Paternal system of Government বোঝেন। প্রত্যুত্তরে লেখক বলিলেন, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই প্রকারের শাসন বা benevolent despotism প্রভৃতির আর স্থান নাই। পুনঃ বাঙলার শ্রেষ্ঠ

গান্ধীভক্তের সহিতও লেখকের এই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। তিনিও বলিয়াছিলেন, 'আপনি ঐ কথার উক্ত অর্থ নেন কেন?'

কিন্তু উপায় কি? দলগত ধ্বনি (slogan) দ্বারাই দলের আদর্শের অর্থ সাধারণের নিকট বোধগম্য হয়। যদি ইহার প্রতিকল্পে শূদ্রেরা Dictatorship of the Proletariat (শ্রমিক আধিপত্য বা শাসন) প্রতিষ্ঠা চায় এবং সম্প্রদায়বিশেষ Theocratic (দেবরাষ্ট্রীয় বা ধর্মরাষ্ট্রীয়) পাকিস্তান চায়, তাহা হইলে কি তাহাদের দোষ দেওয়া যায়?

এখানে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করার হেতু এই যে, যে কংগ্রেসের নেতারা ভারতে স্বাধীনতা আনয়নের জন্য বদ্ধপরিকর তাঁহাদের আদর্শ সম্পর্কে একটা বড় ধোঁয়াটে অস্পষ্ট ধারণা রহিয়া গিয়াছে। তাঁহারা চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মস্তিষ্কের ও হৃদয়ের খোরাক যোগাইতে পারিতেছেন না। কাজেই চিন্তাশীল যুবক অন্য কোনো বিষয় হইতে উহা আহরণের জন্য চেষ্টা করিতেছে।

সাম্যবাদী দর্শন

মার্ক্সবাদ যুবকদের মনের খোবাক যোগাইতেছে। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ (Dialectics) আজ বৈজ্ঞানিক ও উদার খ্রিস্ট সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছে (Mckieffert-এর পুস্তক দ্রষ্টব্য); বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনও উহা গ্রহণ করিয়াছে। সকল সভ্যদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্ক্সবাদের ভুল ধরিবার অপচেষ্টা হইতেছে এবং সমালোচনাও হইতেছে। তথাপি মার্ক্সীয় দল ও আন্দোলন ক্রমশ প্রসারলাভ করিতেছে। ইহা কেবল কতকগুলি শুষ্ক মতের (dogma) দোহাই দিয়াই প্রসারলাভ করে না, ইহা মনের খোরাকও যোগায়। এইজন্যই ইহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। দর্শনের দিক হইতে মার্ক্সবাদীগণ বলেন, যখন কেহ জিজ্ঞাসা করে, আমাদের দার্শনিক কে? তখন জবাব দেওয়া হয় — বর্তমান ইউরোপের তিনজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আমাদের দার্শনিক : যথা স্পিনোজা, কান্ট ও হেগেল (Kienthal-Marxische Lehre দ্রষ্টব্য)। এই সঙ্গে ফয়ারবাকের নামও আসে; ইনিও মার্ক্সবাদকে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন।

এইগুলি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ তাঁহাদের সামাজিক ও অর্থনীতিক দর্শন লিখিয়াছিলেন। অতঃপর ইউরোপে আরও সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতি বিশারদ মার্ক্সীয় আন্দোলন মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছেন। এই দেশ তাঁহাদের নামের সহিত পরিচিত নহে। তাঁহারা মানবজীবনকে তন্নতন্নভাবে বিশ্লেষণ করিয়া নিজেদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন।

কিন্তু এদেশে জাতীয়তাবাদ কী করিয়াছে? কেবল ভাবপ্রবণতা, উচ্ছ্বাস এবং গুরুবাদ!

ফরাসি বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের পূর্বে ঐ সকল দেশে যে সকল মনীষীর উদ্ভব হইয়াছিল, যে প্রখর চিন্তাস্রোত-তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিল, এদেশে তাহা কোথায়? চিন্তার খোরাক তুলসীদাসের রামায়ণ বা শিবাজীর জীবনী অথবা টলস্টয়ের জীবনী হইতে আর সংগ্রহ না করিয়া লোকে অন্যত্র অন্বেষণ ও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্যের কথা কি আছে?

নূতন প্রভাব

আজ ভারতের চিন্তাক্ষেত্রে সর্ববিভাগে যুবকদের মধ্যে একটা নূতন ভাবের স্পন্দন দেখা যাইতেছে। আজ সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতিতত্ত্ব, ইতিহাস, ললিতকলা, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনার মধ্যে এই নূতনভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আজকালকার যুবক ও নূতনভাবে দীক্ষিত লেখকেরা ভারতীয় কৃষ্টির সর্ববিষয়েই অনুসন্ধান করিয়া নূতন দৃষ্টিকোণ ও আলোকে তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। অবশ্য ইহার বিপক্ষে খ্যাতনামা লেখকেরা নিজেদের গোঁড়ামি বজায় রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু নূতন যখন আসিয়াছে এবং সেই আলোকে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি উদ্ভাসিত হইতেছেন, তখন ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা শুধুই বৃথা। প্রাচীনপন্থীদের শ্রেণীস্বার্থসঞ্জাত ভারতীয় কৃষ্টির ব্যাখ্যার ভুল যদি নূতনেরা ধরাইয়া দেয়, তাহাতে কি ভারতীয় কৃষ্টির চর্চার ক্ষতি হইবে, না উহা আরও শক্তিশালী হইবে?

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গুটিকতক ব্রাহ্মণধর্মীয় সংস্কৃত পুস্তক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুবাদ করিয়া বলিয়া বসিলেন, ইহাই হিন্দুদের ধর্ম এবং ভারতীয় সভ্যতা। আর তাহা পাঠ করিয়াই এদেশের লোকেরা তাহাকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করে, ইহার প্রতিবাদে ও বিপক্ষে কোনও কথা বলিলে তাহা পাপ এবং মস্কোর 'বোলচেভিজম্' বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু আজ ভারতীয় কৃষ্টির অনুসন্ধান এই ক্ষেত্রে নূতন আলোকসম্পাত করিতেছে। আজ হিন্দুর ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রের জ্ঞান কেবল কয়েকখানি ব্রাহ্মণ্যবাদীয় স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে আবদ্ধ নয়। আজ ভারতের পুরাতন ইতিহাসের সংবাদ মার্সম্যান, এলফিনস্টোন প্রভৃতির মধ্যেও আবদ্ধ নাই, আজ বাঙলার অতীতের সংবাদ মিনহাজের 'তাবাকাতি নাসিরি', স্টুয়ার্টের বাঙলার ইতিহাস, মেকলের গালাগালির মধ্যে নিবদ্ধ নয়। কিন্তু প্রাচীনপন্থীরা এই পুরাতন গণ্ডির বাহিরে যাইতে চাহেন না। নূতন আলোক ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া কেহ কিছু বলিলে তাহা 'মস্কো-বোলচেভিজম্' বলিয়া অপবাদ দিবার চেষ্টা করা হয়। একবার কোনও এক সভার সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বড় অধ্যাপক লেখককে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'উনি ত চিরকালই উল্টো রথে চড়েন।' বক্তৃতার পর লেখক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'পরিনির্বাণ সূত্তে', লিখিত আছে যে বুদ্ধের মৃত শরীর সম্পূর্ণরূপে দাহ করা হয় নাই, কঙ্কালটি উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। ইহার অর্থ কি? অধ্যাপক মহাশয় ভারতীয় কৃষ্টির একটি বিভাগের বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাত, সেইজন্যই তাঁহাকে উক্ত প্রশ্ন করা হইয়াছিল। এই শবদাহ সম্পর্কে ইংলন্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এলিয়ট স্মিথ বলিয়াছেন, ইহা প্রাচীন ভারতের এক প্রকারের 'মুমী' করা (mummification) পদ্ধতি (Diffusion of culture দ্রষ্টব্য)। এই সমস্যাটির সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হওয়ার জন্যই উক্ত প্রশ্ন করা হইয়াছিল। অধ্যাপক মহাশয় দুই হাত তুলিয়া দশটি আঙ্গুলি ফাঁক করিয়া নাড়িয়া বলিলেন, 'ভাল দেখতে লাগবে বলিয়াই করা হইয়াছিল।' অধ্যাপক মহাশয়ের যদি ঋক্‌বেদের শবদাহ বিষয়ে সূক্ত, গৃহ্যসূত্র, অগ্নিপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে মৃতদেহের সৎকার বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুদের কী ব্যবস্থা ছিল তাহা জানা থাকিত

তাহা হইলে তিনি এই অদ্ভুত উত্তর দিতেন না। অবশ্য কেহ বলিবেন না যে, এইসব পুস্তক মস্কোতে লিখিত হইয়াছে। সুধীগণ বিচার করিবেন, কে 'উল্টা রথে চড়েন'।

ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থও শিক্ষার মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়া আছে। সেইজন্য আজ ভারতের সর্বত্র প্রাচীন পুস্তকগুলির উল্টা ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে। সর্বত্রই বর্তমানের সামাজিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া সংস্কৃত পুস্তকগুলির অনুবাদ প্রকাশ করা হইতেছে। এমনকি যেসব শ্লোক বর্তমান অবস্থার পরিপন্থী বলিয়া প্রতীত হয়, সেগুলি বঙ্গানুবাদে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমান বাঙালির ইতিহাসে পঠিত হয় যে রামমোহন রায় বেদ হইতে রঘুনন্দন উদ্ধৃত 'সতীদাহ' সম্পর্কে শ্লোকটি জাল করা হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আজও তাহাই সংঘটিত হইতেছে। যেসব সংস্কৃত পুঁথি মুদ্রিত হইতেছে, তাহাতে প্রয়োজনমতো শ্লোক গৃহীত ও পরিত্যক্ত হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে বাহিরের নানা ব্যাপার ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। এইপ্রকার কারণবশতই আজকাল ঋগ্বেদে 'ওঁ' শব্দ এবং 'স্বস্তিক' চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরেজ গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আজও সংস্কৃত পুস্তকসমূহেব বিকৃত ও বিপরীত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে। এইসব পণ্ডিতদের মনস্তত্ত্ব এখনও প্রাচীন স্মৃতিকার গৌতম ও মনুর যুগেই রহিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের হয়তো ধারণা, দেশের লোক সবই মূর্খের দল; তাঁহারা খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ যাহা বলিবেন দেশের লোকও তাহাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য, অন্যথায় 'মস্কো-বোলচেভিজমে'র অপবাদ রটানো হইবে। কিন্তু প্রাচীন 'ভূসি সে ক্যাবল প্রভু' গল্পের আগন্তুকের ন্যায় ভুল ধরাইবার জন্য বহু কৃতবিদ্ ব্যক্তিরও আবির্ভাব হইতেছে।

চর্চার ক্ষেত্রে যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। রাজনীতিক আন্দোলনও পঙ্কিল অবস্থায় পড়িয়া আছে। একদিকে নানা উদ্ভট প্রথাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের কার্যকরী পদ্ধতি বলিয়া জাহির করা হইয়াছে, টলস্টয়ের অহিংসবাদ ভগবদগীতায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' দলবিশেষের আদর্শ মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এক কথায়, নদীর স্রোতের বেগ যেমন প্রতিহত স্থানে পঙ্কিলাবস্থা সৃজন করে, এদেশের রাজনীতিক্ষেত্রের জাতীয় আন্দোলনও তদ্রূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। জাতীয় আন্দোলনের মুখপাত্র জাতীয় কংগ্রেস এখন অনেকের 'অ্যাডভেঞ্চার' করিবার রঙ্গমঞ্চ হইয়াছে। ইহা দৃষ্ট হয় যে, যাঁহার অর্থ হইয়াছে তাহার নাম জাহির করিবার জন্য এবং নাম ও পদলাভ হেতু যেসব সুখসুবিধা উদ্ভব হয়, তাহা লাভ করিবার জন্য তিনি কংগ্রেসের রঙ্গমঞ্চে নানাবিধ লীলা করেন এবং দেশভক্তির মালা গলায় পরেন, পরে কার্য হাসিল হইয়া গেলে বা অধিকতর সুবিধা আদায় করিবার জন্য নিতান্ত নির্লজ্জভাবে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া গভর্নমেন্টের কোলে বসিয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। সকলেই জানে, ধনী না হইতে পারিলে কংগ্রেস মন্দিরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না বা তাহার কথায় কর্ণপাত করা হয় না। অবশ্য কংগ্রেসের বেশির ভাগ লোক গরিব একথা সত্য, কিন্তু তাহারা তাঁবেদার মাত্র, ভারবাহী লোক মাত্র। এবম্প্রকারের ধনী লোক প্রয়োজন হইলে কংগ্রেসে দেশভক্তির চরম দেখান এবং অন্যান্য প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইয়া বা গভর্নমেন্টের বিশ্বাসী হইয়া অন্য সুর গাহেন। এই দেশের অনেক বড় বড় রাজনীতিকই এই প্রকারের। পুরাতন

কংগ্রেসের বড় নেতা এবং উপস্থিত সময়ের সাম্প্রদায়িক কায়েদ-ই-আজাম আর হালের Forward Block-এর অন্যান্য অনেক নেতৃবৃন্দের সম্পর্কেই এই একই কথা। জাতীয় কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের নৈষ্ঠিক কর্মীর স্থান বড় নিম্নে, ওই তল্পিদারি (মোটবাহক) পর্যন্ত তাহার দৌড়, কিন্তু সুবিধাবাদী বুর্জোয়ার স্থান শীর্ষদেশে। ফল হইয়াছে, যে-প্রতিষ্ঠানের নামের অনুকরণে ভারতীয় কংগ্রেসের নামকরণ হয়, সেই প্রতিষ্ঠানের অগ্রণী তরুণ সভ্য প্যাট্রিক হেনরীর ন্যায় ভারতীয় কংগ্রেসে কোনও অগ্রণী নাই, যিনি বলেন, 'Give me liberty or give me death'। তদ্রূপ সেই কংগ্রেসের যুবক নেতা টমাস জেফারসনের Declaration of Rights লিখিবার সময় লিপিবদ্ধ বাণী — 'All men have equal rights in respects of life, liberty and in pursuit of happiness.' প্রতিধ্বনি করিবার মত কয়জন লোক ভারতীয় কংগ্রেসে আছেন? ইহা সত্য যে, ভারতীয় কংগ্রেসের Declaration of Rights-এর মধ্যে এই পদটি ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ আমেরিকার বিপ্লবের পর হইতে পৃথিবীর সকল দেশের এই প্রকারের ঘোষণাপত্রে ওই পদটি অনুকৃত হয়। ভারতে ইহা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কর্তৃকই কংগ্রেসের ঘোষণাপত্রে প্রবেশ করানো হইয়াছে। তিনি এবং তাঁহার ন্যায় অনন্যসাধারণ কর্মী ও নির্ভীক ত্যাগীর জন্যই আজও কংগ্রেস জনসাধারণের প্রিয়, জনসাধারণও উহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত। কিন্তু অনেকেই সুবিধাবাদী এবং সুযোগ পাইলে রাজপাদোপজীবী। এইজন্যই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে সেই তেজ নাই, যে অমিততেজ ইতালি ও আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে ম্যাট্‌সিনি ও প্যাট্রিক হেনরি প্রভৃতি লেনিনের বোলচেভিক দলের মধ্যে ছিল এবং ইহাও জোর করিয়া বলা যায়, স্বদেশিযুগের স্বাধীনতাকামীদের যে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠভাব ছিল তাহা বেশিরভাগ কংগ্রেস সভ্যদের মধ্যেই আজ নাই। ইহার কারণ কি? সেই দেশ, সেই জাতি, সেই আদর্শ আর সেই সাধনা রহিয়াছে কিন্তু বাতাবরণ পরিবর্তিত হইয়াছে; আজ কংগ্রেসের কর্ম কেবল নেতা ও উপদলীয় চক্রান্ত ও ব্যক্তিগত কলহে পর্যবসিত হইয়াছে, জাতীয় আন্দোলনে থাকা আর অপরের বৃথা কলহে স্বীয় জীবন অতিবাহিত করা একই কথা হইয়াছে। আজ কংগ্রেসে নেতৃত্বের মোহ ও নানা প্রকারের কায়েমি স্বার্থ (vested interests) সৃষ্টি হইয়াছে; তজ্জন্যই এই কলহ ও বিবাদ হইতেছে। এইজন্যই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তাহার গন্তব্যস্থলের পথে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

উপস্থিত প্রয়োজন

এক্ষণে কথা, উপস্থিত কর্তব্য কি? অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে বক্তব্য যে জাতীয় কংগ্রেসকে নূতনভাবে ঢালিয়া সাজিতে হইবে। কংগ্রেসের নূতন পর্যায় আরম্ভ করা প্রয়োজন। গণশ্রেণীসমূহ ও নূতনাদর্শের একনিষ্ঠ সাধক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ লইয়া কংগ্রেসে প্রবেশ করিলে কংগ্রেস পুনরুজ্জীবিত হইবে।

পঞ্চদশীর 'তাবৎ গর্জন্তি বিপিনে জম্বুকা যাবৎ ন গর্জতি বেদান্তকেশরী' কথা সত্য হইবে, যতদিন না শিক্ষাপ্রাপ্ত গণশ্রেণীসমূহ আত্মজ্ঞান ও চৈতন্য লাভ করিবে ও রাজনীতিক্ষেত্রে নিজেদের প্রকট করিবে এবং ততদিন সুবিধাবাদী ও আত্মপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াসীদের

খামখেয়াল ও প্রাধান্য থাকিবেই। চৈতন্যপ্রাপ্ত গণসমূহ রাজনীতির কর্ণধার হইলে চুক্তির ভিত্তিতে ভাষা সৃষ্টি ও একজাতীয়তা লাভ, স্বাধীনতা অর্জন করা প্রভৃতি উদ্ভট তথ্যসমূহ অন্তর্ধান করিবে, ভারত নিজের স্বরূপ জানিতে পারিবে। ইতিহাসপাঠে ইহাই স্পষ্ট চক্ষে ধরা পড়ে যে, মহাপদ্ম-নন্দ হইতে রণজিৎ সিংহ পর্যন্ত অনেক যুগপ্রবর্তক রাজ-চক্রবর্তী অতি নিম্ন স্তরের বা জাতির লোক ছিলেন — ইহার মধ্যে কয়েকজন রাজা আবার জারজ ছিলেন। নিম্নশ্রেণী হইতে একটি কুল (Clan) একজন শক্তিমান পুরুষের নেতৃত্বে উত্থিত হইয়াছে ও রাজত্ব এবং সুবিধানুসারে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। অবশ্য চন্দ্রবংশীয় বা সূর্যবংশীয় ইরানি, তুরানি বা সৈয়দ অভিজাত বংশোদ্ভবের গল্প চাটুকারেরা সৃষ্টি করিয়াছে (গুপ্ত ও পাল সম্রাটদের বংশের উৎপত্তি ও তাহাদের জাতির কথা আজও অজ্ঞাত রহিয়াছে — গুপ্তদের গোত্র আর্যেয় নয়) ভারতের কৃষ্টির মূলে আছে গণশ্রেণীসমূহ, বেদের "শূদ্রারাইয়াউ" (শূদ্র ও বৈশ্য), অর্থাৎ কায়িক শ্রমজীবী ও কৃষকের দল। তৎপর অনেক সংস্কারকামী ধর্মপ্রচারক ও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাগণ, নিম্নবর্ণের লোক ছিলেন। এমনকি আলোয়ার মহাপুরুষদের মধ্যেও অস্পৃশ্যজাতীয় লোকও ছিলেন। এইজন্যই ইতিহাস স্বীকার করিতে বাধ্য যে, পদদলিত শূদ্র বা গণশ্রেণীসমূহই ভারতের ভবিষ্যৎ ভরসা ও আশাস্থল — শক্তির উৎসই সেইখানে। সুতরাং শূদ্রের পুনরুত্থানে ভারত পুনর্জীবন লাভ করিবে।

ততঃ কিম্

এক্ষণে কথা, এই সকল বিশ্লেষণের পর কী করা কর্তব্য। জ্ঞানানুসারে দুই-এক কথায় বর্তমান পরিস্থিতির কথা বর্ণিত ও আলোচিত হইয়াছে মাত্র। পূর্বে দেশের জন্য যাঁহারা যে সাধনা করিয়াছেন, তাহা ভারতের সামাজিক-রাজনীতিক বিবর্তনের অন্তর্গত। তাঁহাদের কর্ম ও সাধনার জন্য তাঁহারা দেশের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ও নমস্য। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র শরীর স্থাণুবৎ এক জায়গায় অবস্থিত থাকিতে পারে না;সমাজ ও রাষ্ট্রকে গতিশীল হইতেই হইবে; নচেৎ মৃত্যু অনিবার্য। এইজন্য জাতীয় জীবনে নূতন অধ্যায় আরম্ভ করা প্রয়োজন।

এক্ষণে চাই একদল প্রখর মৌলিক গবেষকের দল যাঁহারা ভারতীয় কৃষ্টির সকল দিকেই মৌলিক ও তুলনামূলক পাঠ ও বিচার এবং গবেষণার দ্বারা জাতির সাধনার সত্য তথ্য আবিষ্কার করিবেন। চাই ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালের Encyclopaedists দলের ন্যায় মৌলিক চিন্তাশীল ভাবুক, চাই রুশ-বিপ্লবের পূর্ব যুগের ন্যায় মৌলিক অনুসন্ধানকারী ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ যাঁহারা দেশের এই সকল বিভিন্ন বিষয়ের যথার্থ তথ্য লোকের সম্মুখে ধরিয়া দিবেন। জাতির জীবনের অতীতের গতি না বুঝিতে পারিলে, বর্তমানের পরিস্থিতির কার্যকারণ বোধগম্য হইবে না এবং তজ্জন্য ভবিষ্যতের পথের সন্ধানও পরিষ্কাররূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। এই সকল কারণবশত চাই চিন্তাক্ষেত্রে বিপ্লব ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন কর্মীদল। কর্মফল, প্রাক্তন পূর্বজন্ম, নিয়তি, কিসমত প্রভৃতি মত আঁকড়াইয়া ধরিয়া উহার গোলকধাঁধায় আবদ্ধ হইয়া লোক মাটির মানুষ হইয়া পড়িয়াছে। যেদিন পাঞ্চালরাজ প্রবাহণ জাবালা ব্রাহ্মণ উদ্দালককে কর্মফল ও

পূর্বজন্মরূপ ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান কবেন (ছান্দোগ্য উপনিষদ) ও তাঁহার প্রশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলার গণতান্ত্রিক বিদেহ জাতির সভায় এই মত প্রচার করেন এবং সাফল্য ব্রাহ্মণের মস্তকচ্যুত করান আর গার্গীকে ধমকাইয়া বসাইয়া দেন, সেইদিন ক্ষত্রিয়-রাজা প্রবাহণ ও তাঁহার ব্রাহ্মণ শিষ্যের দল কি বুঝাইয়াছিলেন যে, ভারতীয় জাতির পদে কি নিগড় তাঁহারা পরাইতেছেন। (এই বিষয়ে মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন কৃত 'বোল্গাসে গঙ্গা' গল্পের পুস্তকে 'প্রবাহণ' শীর্ষকগল্পটি দ্রষ্টব্য! যেদিন রাজারা ও তাঁহাদের পুরোহিতেরা প্রজাদের শোষণ ও দমন করিয়া রাখিবার জন্য এইসব অ-বৈদিক মত প্রচার করেন, সেইদিন তাঁহারা কি জানিতেন যে, ইহার প্রতিক্রিয়াব ফলে তাহাদেবই বংশধবগণেব কি দুর্গতি ভবিষ্যতেব গর্ভে সঞ্চিত হইয়া বহিল? স্বল্পায়াসে সিন্ধুবিজয় (চাকনামা দ্রষ্টব্য) ও বঙ্গবিজয় (তাবাকাতি নাসিরি) কি এই বিশ্বাসেব ফলেই সম্ভব হয় নাই? ভারতবাসীর মনের জড়তা ও পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক শাসনাধীন হওয়া কি এই বিশ্বাসেরই ফল নয়? দার্শনিক হেগেল বলিয়াছেন — 'হিন্দুর মনে দ্বন্দ্বভাব (Anti-thesis) নাই, ভারত কখনও রাজনীতিক বিপ্লব সাধন করে নাই' (History of Philosophy দ্রষ্টব্য)। এই সিদ্ধান্ত কি একেবারে উড়াইয়া দিবার বস্তু, এই বিষয়ের সত্যতার অনুসন্ধান কি একান্ত প্রয়োজন নয়?

এই সকল বিবিধ কারণবশত এদেশের জাতীয় জীবনের নূতন আলোকপ্রাপ্ত কর্মীর দল প্রয়োজন, নূতন মৌলিক গবেষকের প্রয়োজন, যাঁহারা ইঁহাদেব চিন্তার খোরাক যোগাইবেন, নূতন নেতার প্রয়োজন যিনি আমাদেব বাবিলনীয় গোলামিত্ব হইতে বাহিব করিয়া লইয়া যাইবেন। The young men dream dreams and old men see visions. বাইবেলের এই উক্তি ভারতে সফল হউক!

অখণ্ড ভারতের সাধনা

ক্ষিতিমোহন সেন

এক এক জন মানুষ সারা জন্মই অন্য লোককে জ্বালাইয়া যায়, ছেলেবেলায় এইরকম এক গ্রাম জ্বালানিয়া'র কথা শুনিয়াছিলাম। মরিবার সময় উপস্থিত হইলে তাহার মনে হইল, 'এখন তো আমি চলিলাম, ইহার পরে গ্রামের লোককে জ্বালাইয়া অতিষ্ঠ করিবে কে?' এই ভাবিয়া সেই দুষ্ট মরিবার পূর্বে কোনোমতে গ্রামের নিকটবর্তী বনে গেল। তখন বনের বাঘেরা মানুষ খাইতে জানিত না। তাহারা অন্য জীবজন্তু ধরিয়া খাইত। সেই দুর্বৃত্ত গিয়া বাঘেদের বলিল, 'তোমরা আমাকে খাও।' বাঘেরা বলিল, 'সে আবার কি কথা? বাঘে আবার মানুষ খায় নাকি।' সেই 'গ্রাম-জ্বালানিয়া' বলিল, 'কখনও তো খাও নাই, একবার খাইয়া দেখ।' বিস্মিত বাঘের দল মুমূর্ষু লোকের কথায় তাহাকে খাইয়া দেখিল, অপূর্ব স্বাদ মানুষের মাংসের। তখন তাহারা বলিল, 'চমৎকার মাংস তো, ইহার পরে পাইলে আর মানুষকে ছাড়িব না।'

'গ্রাম-জ্বালানিয়া' অতিশয় আনন্দে প্রাণত্যাগ করিল। মরিবার সময় বলিয়া গেল, 'বাঁচা গেল, মরিতে মরিতেও লোককে অতিষ্ঠ করিবার উপায় বলিয়া গেলাম, এখন আর মরিতেও দুঃখ নাই।'

ইংরাজও বিধাতার বিধানে বিদায় নিতে বাধ্য হইল। কিন্তু আগুন জ্বালাইয়া দিয়া সে গেল। স্বার্থ, সঙ্কীর্ণতা, বিদ্বেষের বিষ বাঘের দংশন হইতেও দারুণ। সেই বাঘ সে সৃষ্টি করিয়া গেল। বিদায় লইয়াও সে এখনও সেই সব বাঘের সহায়তা করিতে কসুর করিতেছে না।

সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ধার্মিক, সাধক ইংরাজ ও য়ুরোপীয়ের বিরুদ্ধে কাহারও কোনও অভিযোগ নাই। অভিযোগ হইল সেইসব সাহেব লোকদের বিরুদ্ধে যাঁহারা রাষ্ট্রশাসন, ব্যবসা, বাণিজ্যের নাম করিয়া ভারতকে চিরদিন শোষণ ও পেষণ করিয়াছেন। তাঁহারাও যখন যুগ-বিধাতার ইতিহাস-নিয়ন্তার নির্দেশে ভারতবর্ষ ছাড়িতে বাধ্য হইলেন তখন তাঁহারা ভদ্রভাবে বিদায় নিলে উভয়দিকে প্রীতি-মৈত্রী বজায় থাকিত। কিন্তু সেই সদ্বুদ্ধি ইঁহাদের হইল কই?

যাইবার সময় তাঁহারা ঐ 'গ্রাম-জ্বালানিয়া'র মতো নিজের স্বার্থনাশ সত্ত্বেও চারিদিকে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, ভেদবুদ্ধির বিষ নানাভাবে ছড়াইয়া গেলেন। অখণ্ড ভারতকে তাঁহারা শুধু যে ভৌগোলিক ভাবেই খণ্ড খণ্ড করিয়া বিদায় নিলেন তাহা নহে, ঘরে বাহিরে চারিদিকের মনের মধ্যেও ভাঙন ধরাইয়া গেলেন। তাঁহাদের দীক্ষা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যেসব

অল্পমতিরা সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, জাতিভেদের নামে নানা অসঙ্গত দাবি করেন তাঁহাদের উপর রাগ করিয়া লাভ কি? বনের বাঘের মতো ইঁহাদিগকে মানুষ-রক্তের আস্বাদ দিয়া যেসব দুর্বৃত্তেরা বিদায় লইয়াছেন দোষ তাঁহাদেরই।

আমাদের ভারতবর্ষ এক অখণ্ড সাধনাভূমি। এই অখণ্ডিত দেশেই বেদপূর্ব ও পরবর্তী সব সভ্যতার সাধনাই পাশাপাশি বিরাজমান। এই দেশ সিন্ধু বা হিন্দু নদের দ্বারা পরিচিত হিন্দু দেশ বা হিন্দুস্থান। এখানকার সকল সংস্কৃতির সম্মেলনেই হইল হিন্দুধর্ম। এই দেশের সব সাধনার দানই রহিয়াছে সেই ধর্মে। এই অখণ্ড দেশের সর্বত্রই বৈদিক সন্ধ্যা গায়ত্রী ও বিবাহাদি অনুষ্ঠানের মন্ত্র একই। বিষ্ণু শিব ও দেবীর অর্চনাও সর্বত্র। শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র পূজিত। রামায়ণ মহাভারত সর্বত্র সমাদৃত। এই সব সাধনা বেদবাহ্য, ইহা ভাগবতদের। তন্ত্রমতে তো ভারতের ৫২ পীঠ একই দেবী জগন্মাতার ৫২টি অঙ্গ। তাহাতে হিমালয়ের জ্বালামুখী হইতে দক্ষিণের কুমারিকা তীর্থ, পশ্চিমের হিংলাজ হইতে আসামের কামরূপ সবই দেবীর আপন জীবন্ত অঙ্গ। সেই দেবীর জীবন্ত দেহকে আমরা যেন খণ্ডিত না করি ইহাই শক্তি সাধনার মর্মগত কথা।

আবার এই দেশই আমাদের বহিঃস্থিত ভৌতিক দেহ। আমাদের দেহও আবার দেশের চিন্ময় বিগ্রহ। এই মানবদেহেই সর্বতীর্থস্থান অবস্থিত। পুরশ্চর্যার্ণব বলেন স্বদেশের মধ্যে অবস্থিত তৎ তৎ পীঠস্থানে পীঠন্যাস পূর্বক সাধনা করিবে। (পৃ. ৩৪০)।

আমাদের কাম্য দেবতাকে ভারতের উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে চারিধামে (৮৪) চৌরাশ তীর্থে দর্শন ও অর্চনা করিলেই এবং সব তীর্থোদকে তাঁহার পূজা করিলেই পূর্ণাভিষেক হয়। নচেৎ তাঁহার সকল অভিষেকই অসম্পূর্ণ। আমাদের যে-কোনো তীর্থই সকল ভারতবর্ষের জীবন্ত বিগ্রহ।

কাশীতে সমস্ত ভারতবর্ষকেই দেখা যায়। কাশীর ঘাটে সর্বপ্রদেশের তীর্থার্থীদেরই স্থান। মণিকর্ণিকায় ভারতীয় সকল প্রদেশবাসীর দেহই ভস্মীভূত। গয়া প্রভৃতি তীর্থগুলি সর্বপ্রদেশের মৃতগণের শ্রাদ্ধস্থান।

সারা ভারতে একই রকমের জাতিভেদ। সমাজ-ব্যবস্থা, দশকর্ম, একই রকমের মাস-বৎসরাদি গণনা। মালাবারেও চৈত্র সংক্রান্তিতে বিষুবপূজা দেখা যায়। সর্বত্রই শারদীয়া ও বাসন্তীদেবীর পূজা দোল, রথযাত্রা প্রভৃতি। সারা ভারতে সংসারীর আচার সামান্য ইতরবিশেষ হইলেও সর্বত্রই প্রায় একরূপ। ব্রহ্মচারী, দণ্ডী, পরমহংসরাও ভারতে সর্বত্রই সমান মান্য। শঙ্করাচার্যের জন্ম মালাবারে। তাঁহার চারি মঠ ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে। তাঁহার সম্প্রদায় সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত। হিমালয় বদ্রীনাথে তাঁবই শিষ্যের দল তীর্থগুরু। শঙ্করের দশনামী সম্প্রদায়ের মতো রামানুজ নিম্বার্ক মাধ্ব সম্প্রদায়ও সর্বভারতে পূজ্য। মন্বাদি স্মৃতির হুকুম ভারতের সর্বত্র চলে।

মুসলমানেরাও ভারতে সাধনার দ্বারা যেসব তীর্থ করিয়াছেন তাহার মধ্যে লাহোরে হুজবেরীর সাধনা, আজমীরে মৈনুদ্দীন চিস্তির দরগাহ, পাকপত্তনে ফরিদসকরগঞ্জের তীর্থ ও শ্রীহট্টের সাহ জলালের সাধনা। এক মুসলমান সাধনা সারা ভারতে ছড়াইয়া চিশ্‌তী, সুরবর্দী, কাদিরী নক্‌সবন্দী, মদারী প্রভৃতি নানা মতে সারা ভারতেই প্রতিষ্ঠিত।

ভারতবর্ষে প্রাদেশিকতার স্থান কই? বাঙালি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা কান্যকুব্জ হইতে আগত। দেড় হাজার বছর আগে নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণেরা নাকি বাঙলাদেশ হইতে গিয়াই মালাবারে বাস করেন। মালাবারের নায়ারেরা তাঁহাদেরই সেবক ও ভক্ত। বঙ্গবাসীদের মতো ইঁহারাও নিজবাড়ির চতুঃসীমার মধ্যেই পুষ্করিণীতে স্নান করেন। মৃত্যুতে নিজ উদ্যানেই তাঁহাদের দেহ দগ্ধ হয়। মৃত্যুর পরে আমগাছ কাটিয়া দাহ হয়। অশৌচকালে গলায় লোহার চাবি ঝুলাইতে হয়। এই সবই বঙ্গীয়, বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গের প্রথা। বিবাহে উলুধ্বনি হয়। কাঁসার দর্পণ ও অস্ত্র লইয়া বর বিবাহযাত্রা করেন। সঙ্গে নিতবর থাকে, বিবাহে বরকন্যা মাটিতে পুকুর কাটিয়া মাছধরার খেলা খেলেন। বরের দেওয়া মাদুলি কন্যার গলায় ঝুলাইতে হয়। ধোপা নাপিত ছাড়া ক্রিয়া হয় না। ধোপা নাপিত বন্ধ হইলে সমাজ বন্ধ। তিন-বিপ্র তিন-শূদ্র একত্র গেলে অযাত্রা। এই সব বাঙলা দেশেও দেখি, বিশেষত পূর্ববঙ্গে।

হাজার বারোশত বৎসর পূর্বে বিস্তর বাঙালি হিমালয় গাড়ওয়াল প্রদেশে গিয়া বাস করেন। তথাকার হিন্দিভাষায় লিখিত ও মুদ্রিত ইতিহাসে তাহা পাই। সারস্বত ব্রাহ্মণেরা গৌড় দেশ হইতে মহারাষ্ট্রে যান। নাগর ব্রাহ্মণেরা শ্রীহট্ট হইতে গুজরাটে গিয়া বাস করেন। কর্ণাট রাজবংশের লোক বাঙলা দেশে সেনবংশ প্রবর্তন করেন। তাঁহাদেরই বংশের রাজারা পরে হিমালয়ে সুকেত মাণ্ডী প্রভৃতি স্থানে রাজ্য স্থাপনা করেন। দক্ষিণ ভারতের রাজা সাতবাহনের সময়ের কলাপ ব্যাকরণ চলে কাশ্মীরে ও পূর্ববঙ্গে। কল্যব্দের যেরূপ গণনা পূর্ববঙ্গের বল্লালসেনের ইতিহাসে দেখা যায়, সেইরূপই গণনা চলে কাশ্মীরে।

আমরা বাল্যকালে গল্প শুনিতাম দক্ষিণদেশের কাঞ্চী রাজপুত্রের কথা। আমাদের বণিক ও রাজপুত্রেরা যাইতেন কাঞ্চীতে সিংহলে। বিক্রমাদিত্য ও ভোজরাজার গল্পই ছিল আমাদের ও সারা ভারতের উপজীব্য। পূর্ববঙ্গের গোপীচাঁদের করুণ সন্ন্যাস-কাহিনি সারা ভারতকে কাঁদাইয়াছে। কর্ণাটের বিল্বমঙ্গলকে আমরা সকলেই মনে করি নিজ নিজ ঘরেরই লোক। পূর্ববঙ্গের মধুসূদন সরস্বতীর গ্রন্থ সারা ভারতে আদৃত। চৈতন্যমতের লোক ডেরাগাজীখাঁয়ে সিন্ধু লারকানায় ও গুজরাটে দেখিয়াছি।

বড় হইয়া যখন স্নানমন্ত্র দেখিলাম তখন দেখিলাম স্নানকালে সারা ভারতের সকল নদীকেই আবাহন করিতে হয়। সারা ভারতই সেখানে এক।

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

—পুরোহিত-দর্পণ, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পৃ. ৬

ঘটস্থাপনে মন্ত্র বলিয়াছি,

গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সরাংসি জলদা নদাঃ।
সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্তু সন্নিধিং॥

গঙ্গা প্রভৃতি সকল নদী সর্বতীর্থ এখানে সমবেত হউক। স্নানকালে এই মন্ত্রও উচ্চারণ করিতে হয় —

কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্ত্বিহ॥

—ঐ, পৃ. ১০১

কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ আমার স্নানকালে এখানে সমবেত হউক। অর্থাৎ গোটা ভারত একত্র না হইলে আমাদের স্নান করাও চলে না।

মৃত্যুর পরেও এই মন্ত্রেই আমাদের দেহ স্নাত হয় —

গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চযাঃ।
কুরুক্ষেত্রং চ গঙ্গাং চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাম্॥
কৌশিকীং চন্দ্রভাগাং চ সর্বপাপপ্রণাশিনীম্।
ভদ্রাবকাশাং সরযূং গণ্ডকীং পনসং তথা॥
বৈণবং চ ববাহং চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা।

—ঐ, পৃ ৫৫৬

গয়া প্রভৃতি সব তীর্থ, ভারতের পবিত্র সব পর্বত, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা, যমুনা, কৌশিকী, চন্দ্রভাগা, ভদ্রাবকাশা, সরযূ, গণ্ডকী প্রভৃতি সব নদী, পনস, বৈনব, বরাহ, পিণ্ডারক প্রভৃতি সব তীর্থকে আবাহন করি। সকলে সন্নিহিত হইয়া এই বিগতপ্রাণ দেহকে পবিত্র করুন। জনমে, মরণে অখণ্ড ভারতকে আবাহন না করিলে আমাদের চলিত না।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের অখণ্ড দেশকে এমন অখণ্ড করিয়াই ধ্যান করা হইয়াছে। সেই দেশকে এখন যাঁহারা খণ্ডিত করিলেন তাঁহারা যে কতদূর সর্বনাশ করিলেন তাহা বলা অসম্ভব। আবার আমরাও প্রাদেশিকতা প্রভৃতির দ্বারা তাহারই সমর্থন করিতেছি। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে কিসে?

ভারত ছাড়িবার পূর্বে ইংরাজ এই সর্বনাশ আমাদের করিয়া গেল। চিরদিন এই পাপ ভারতকে দগ্ধ করিয়া মারিবে।

১৯২৪ সালে লোকগুরু রবীন্দ্রনাথ চীনদেশের নেতা পরলোকগত লিয়াং-চি-চাওকে বলিয়াছিলেন, 'ইংরাজ ও য়ুরোপীয়রা এসিয়া ছাড়িবে তাহার পূর্বসূচনা দেখিতেছি।' লিয়াং-চি-চাও জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন বৃথা ছাড়িবে তাহারা? আমরা তো তেমন শক্তিলাভ এখনো করি নাই।' কবি বলিলেন, 'এসিয়াতে সর্বত্র লোক জাগিয়া উঠিতেছে'। গৃহস্থ যতক্ষণ ঘুমায় ততক্ষণই তস্করদের সুযোগ। গৃহস্থ জাগিলেই তস্করকে পলাইতে হয়। ভাল য়ুরোপীয়দের কথা বলি না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নমস্য। কিন্তু যারা তস্কর, তারা এতকাল আমাদের নানাভাবে ঘুম পাড়াইয়া লুণ্ঠন করিয়াছে, এখন আর সেই পন্থা চলিতেছে না। এখনও কিছু কাল শেষ চেষ্টা করিয়া তাহাদের পলাইতে হইবে।

'কিন্তু যাইবার আগেও তাহারা নানাভাবে আমাদের জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিয়া যাইবে। জাপান বিজ্ঞানে ও শিল্পে অগ্রসর। কিন্তু জাপানকে ইহারাই দস্যুমন্ত্রে (Imperialism) যে দীক্ষা দিয়া চলিয়াছে তাহাতেই তাহারা সর্বনাশ করিবে। ভারতে তাহারা প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা ক্রমশঃই সজোরে চালাইয়াছে। ভারতে জাতিভেদ কালের ধর্মে ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া আসিত। কিন্তু লোকগণনাতে (Census) আদালতে হলফ প্রভৃতি নানা উপায়ে সেই জাতিভেদকে ইংরাজেরাই দিন দিন প্রবল করিয়া তুলিতেছে এবং তাহাতেই সে জাতিতে-জাতিতে বিচ্ছেদ আনিবে। আমাদের গোঁড়ারাও সেই নষ্টামি না বুঝিয়া তাহাতেই ঘৃতাহুতি দিবেন। চীনের জন্যও ভয় হয়।'

লিয়াং-চি-চাও বলিলেন, 'চীনে জাতিভেদ নাই। আমাদের সর্বত্র একই বর্ণমালা-গত

ভাষা। কাজেই প্রাদেশিকতাও নাই। ধর্ম ও সম্প্রদায় লইয়া আমরা কখনও গোলমাল করি না। তবে আমাদের মারিবে কেমন করিয়া?' কবি বলিলেন, 'হয়তো তবে রাজনীতির দিক দিয়া চীনদেশে এমন আগুন ইহারা জ্বালাইবে যে, তাহার চোটেই চীনকে চির-দুর্বল হইয়া থাকিতে হইবে। জাপান, ভারত ও চীনকে মারিয়া রাখিতে পারিলে ঐসব দস্যুদের আর কোনও বিপদ নাই।'

আমরাও এখন দেখিতেছি তাহারাই জাপানকে দস্যুমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া চীন ও ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার সর্বনাশ করিল। চীনকে চিরদিনের মতো ভাঙিয়া রাখিল। চীনের দুই দলেরই মূলমন্ত্র য়ুরোপেরই আমদানি। ভারত ছাড়িবার সময়েও তাহারা সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়া ভারতকে ভাঙিয়া গেল। বিভক্ত ভারতেও হিন্দুকে হিন্দু যাহাতে চিরদিন জ্বালাইতে পারে, তাহার জন্য প্রাদেশিকতার আগুন জ্বালাইয়া গেল। প্রদেশের মধ্যেও যেন সোয়াস্তি না থাকে, তাহার জন্য 'সিডিউল' 'নন-সিডিউল' প্রভৃতি নানাভাবে জাতিভেদের বিষ ছড়াইয়া গেল। তাহার পরেও যদি সর্বনাশ না হয়, তবে য়ুরোপেরই আমদানি নানাবিধ রাজনীতির দীক্ষা ও মন্ত্র ছড়াইয়া গেল। গ্রাম-জ্বালানিয়া বিদায় লইল বটে, কিন্তু শত শত বাঘ খাড়া করিয়া গেল। ইহারাই চিরকাল আমাদের চিবাইয়া খাইবে। স্বার্থ ও সংকীর্ণতার দন্ত বাঘের দাঁত হইতেও দারুণ। বিপক্ষের কোনও বিশেষ একজনের উপর রাগ করিলে হইবে কি? ঘরে বাহিরে ইহারা যাইবার সময় শতভাবে শত উত্তরাধিকারী রাখিয়া গিয়াছে। কত দিকই বা আমরা সামলাইব। হায়দরাবাদ কাশ্মীর জুনাগড় সর্বত্র সেই একই ব্যাপার। তাহারা কোথাও যদি আগুন নিবিয়া আসিতে দেখে, তবে নানাভাবে ফুঁ দিয়া দুর্বল আগুনকে সবল করিতে তাহাদের আলস্য নাই। গ্রাম-জ্বালানিয়া মরিয়া ভূত হইয়াও আবার মরে নাই। ইহারা ভূত হইয়াও মারিতে চায়। কিন্তু দুর্বৃত্তদেরই কি চিরদিন জয় হইবে? ভগবানের শাশ্বত সত্য কি চিরদিনই দুষ্টবৃত্তদের পদদলিত হইবে? অখণ্ডদেশকে কি চিরদিনই ইহারা খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিতে পারিবে? সর্বত্র মানবজাতিকে যিনি এক করিয়া দেখিয়াছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ এতখানি দুর্বৃত্তপনা ভাবিতেও পারেন নাই।

ভারত বিভাগ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়া যান নাই। কিন্তু বঙ্গ বিভাগ দেখিয়া যে তাঁর কী বেদনা হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। তাই খণ্ডিত বাঙলাকে মিলিত করিবার জন্য তিনি ৩০শে আশ্বিন 'রাখীবন্ধন উৎসব' প্রবর্তিত করিলেন। এই মিলনের রাখী-উৎসব তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল।

তাহার বহু বৎসর পরে ১৯৪১ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইলেন, তখন সারা ভারতের পালনীয় মিলন-মহোৎসব রাখী-পূর্ণিমার দিনই তিনি দেহরক্ষা করিলেন। তিনি কি তবে ভারতবর্ষের ভবিষ্যতে দারুণতম কোনও বিচ্ছেদের সম্ভাবনা মনে মনে জানিয়া পূর্ব হইতেই মৃত্যুর দ্বারা তাহার যোগসাধনের জন্য রাখী-উৎসবের দীক্ষা দিয়া গেলেন? আজও তাঁহার অমর আত্মা বলিতেছে, 'বিচ্ছিন্ন হইও না। স্বার্থ, সঙ্কীর্ণতা ও দ্বেষ ত্যাগ করিয়া সকলে মিলিত হও।' কবিগুরু চিরদিনই মানবের বিচ্ছেদের মধ্যেও যোগেরই সন্ধান করিয়াছেন। দুর্বলের উপর প্রবলের জুলুম তাঁহার দুঃসহ ছিল। সেই জুলুমের বেদনায় তিনি গাহিয়াছেন —

রইল বলে রাখলে কারে
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই
রবার যেটা সেটাই রবে॥
ভাবছ হবে তুমি যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে,
হয় না যেটা সেটাও হবে।

জুলুমবাজ দুর্বৃত্তদের ডাক দিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন,

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান।
তুমি কি এমনি শক্তিমান।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান
তোমাদের এমন অভিমান।
আমাদের শক্তি মেরে, তোরাও বাঁচবি নেরে,
বোঝা তোর ভারি হ'লেই ডুবরে তরীখান।'

আবার তিনি জোর করিয়া শুনাইয়াছেন —

ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে
গড়বে ততই দ্বিগুণ করে,
ওরা ধর্ম যতই দলবে, ততই ধূলায় ধ্বজা লুটবে
ওদের ধূলায় ধ্বজা লুটবে॥

ভগবানের বিধানে তাঁহার অটল ভরসা ছিল বলিয়াই তিনি বলিয়াছেন —

নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন হবেই হবে।
যদি পণ ক'রেই থাকিস,
সে পণ যে তোর রবেই রবে॥
ওরে মন হবেই হবে॥'

তাই তিনি সকলকে সকল স্বার্থ, লোভ, দ্বেষ, বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া প্রেমের মিলনের জন্য হাতে হাত ধরিতে ডাক দিয়াছেন —

এখন, আর দেরি নয় ধর গো তোরা
হাতে হাতে ধর গো,
আজ আপন পথে ফিরতে হবে,
সামনে মিলন স্বর্গ।

বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে
মরতে হয় তো মর গো॥

ভারতবর্ষ হইল সকল ধর্মের সকল মানবজাতির মহামিলনক্ষেত্র। এখানেও ভেদ-বিভেদ কেন? ভারতের ইতিহাসের ধারাতে তিনি এই সত্যই জাজ্বল্যমান করিয়া দেখাইয়াছেন। সেই সত্যই তাঁহার গানে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

হে মোর চিত্ত. পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন —
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।

য়ুরোপকেও তিনি এই মহামিলনে ডাক দিয়াছেন; কিন্তু দস্যুভাবে নয়। সাধকের মতো তারও এখানে নিমন্ত্রণ আছে।

পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে —
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান —
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে —
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

মায়ের সেবার সাধনায় উচ্চ-নীচ ভেদ নাই। ধনি-নির্ধন ভেদ নাই। তাই জন-গণ-মন অধিনায়ক গানে তিনি বলেন —

পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদারবাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী,
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে! ভারত ভাগ্য বিধাত

☐ *দেশ*, সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৮৩

যৌথ পরিবার

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রাচীনেরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলেন, হিন্দুব পবিবার ভাঙায় হিন্দু জাতির অধঃপতন হইতেছে। যদি জাতির পুনরুদ্ধার করিতে হয়, যদি সনাতন ধর্মকে রক্ষা করিতে হয, তাহা হইলে সমাজে একান্নবর্তী পরিবারের সনাতন আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

কিন্তু সমাজের ঘড়িব কাঁটা উলটা দিকে ফিরাইবাব চেষ্টা বৃথা। আমাদেব যৌথ পরিবারের পূর্ব পবিসর, বর্তমান যুগের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থাব পীড়নে বাধ্য হইয়া সংকুচিত হইয়াছে। নূতন সমাজব্যবস্থার সহিত পরিবারেব অন্তর্নিহিত একীকরণ শক্তির বিকাশ কতকটা নূতন বকমের হইতেই হইবে। সুতবাং জাতীয শক্তি সংযোগের চেষ্টা, ভবিষ্যতে ঠিক অতীতের আদর্শে করিলে চলিবে না।

আমাদের সনাতন পরিবার যে আজ নূতন করিয়া ভাঙিতেছে বা পরিবর্তিত হইতেছে এরূপ মনে করা ভুল। প্রাচীন সমাজনীতি সম্বন্ধে আমরা প্রাচীন সাহিত্যে যে পরিচয় পাই তাহা সম্যকরূপে আলোচনা করিলে ইহাই দেখিতে পাই যে, সে সাহিত্য যে যুগযুগান্তরের সৃষ্টি সেই সমুদয় যুগে পরিবার সম্বন্ধে কোনো একটি চিরস্থায়ী সংস্কার বা আদর্শ ছিল এমন নহে। বরং ইহাই স্পষ্ট দেখা যায় যে, পরিবারের গঠন ও আদর্শ নানা যুগে নানা রূপে বিকশিত হইয়াছে; এবং আজ যেমন আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার গতিকে পরিবারের মূর্তি ফিরিতেছে তেমনই অতীতকালেও জাতির সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত পরিবারের গঠন ও আদর্শের নানা প্রভেদ দেশকালভেদে ঘটিয়াছে।

সুদূর অতীতে, বেদের যুগে সমাজের আকৃতি প্রকৃতি কীরূপ ছিল এবং তাহা সমাজের পরিবর্তনের এবং আর্যেতর জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে নানা দেশে নানা যুগে কীরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে তাহার সমুদয় সূত্রগুলি অনুসরণ করিয়া দেখানো সাধ্য হইলেও বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। আমি এ প্রবন্ধে আমাদিগের ধর্মশাস্ত্র হইতে হিন্দুজাতির পরিবার গঠন সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক বিষয়ের দেশকালভেদে কীরূপ প্রভেদ ঘটিয়াছিল তাহারই কয়েকটি নিদর্শন দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে দেখা যাউক, কোন্ কোন্ ব্যক্তি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই বর্তমান অভিশপ্ত যুগেও আমরা নিতান্ত একা থাকি না, আমাদেরও এক-একটা পরিবার আছে। তবে নব্যদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, আমাদের পরিবারের গণ্ডি ক্রমশ অতি সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

আমাদের পরিবার স্বামী, স্ত্রী এবং পুত্র, কন্যায় পর্যবসিত। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়াও আমরা বড় থাকিতে চাই না, দূর কুটুম্বের ত কথাই নাই।

কিন্তু এই সংকীর্ণ পরিবারের আদর্শ অত্যন্ত প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্য হইতে দেখানো যাইতে পারে যে, সেকালে আর্যেরা প্রায়ই ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হইয়াই থাকিতেন। বৈদিক সাহিত্যে যে সমুদয় উপাখ্যান আছে তাহাতে বহুকুটুম্বপরিবৃত বিপুল সংসারের বড় অধিক পরিচয় নাই। অধিকাংশ পরিবারই স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ও দাস-দাসীতে পর্যবসিত। ব্রাহ্মণাদিতে এবং প্রয়োগগ্রন্থে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের জীবনের যে অবস্থা দেখিতে পাই তাহাতে এই আদর্শই যেন যথার্থ সনাতন আদর্শ বলিয়া মনে হয়। সেকালে ব্রাহ্মণগৃহে এবং সম্ভবত ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-গৃহেও সকলেরই উপনয়ন-সংস্কারের পর গুরুগৃহবাস অবশ্যকর্তব্যরূপে কল্পিত হইয়াছে। সে গুরুগৃহের যে সকল বর্ণনা আছে তাহাতে অন্তেবাসী যতই অধিক থাকুক, সেখানে বহুগোষ্ঠীর কোনো পরিচয় পাই না। তাহা ছাড়া গুরু, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র ও গুরুকন্যার প্রতি কর্তব্যের যথেষ্ট উপদেশ থাকিলেও তাঁহাদের অধিকতর দূর-কুটুম্বের প্রতি কর্তব্য বা সম্মানাদি প্রদর্শন সম্বন্ধে কোনো বিধান পাই না। ইহাতে মনে হয়, আচার্যগণ পত্নীপুত্র ও অনূঢ়া কন্যা লইয়াই সংসার করিতেন, অন্য পরিবার তাঁহাদিগের ছিল না।

তার পর বিধি আছে যে, গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে শিষ্য গুরুকে বরপ্রদান করিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে স্নান করিবে। স্নাতক গৃহে ফিরিয়া দার পরিগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিবে। প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থে এবং অতি আধুনিক গ্রন্থেও আমরা এই বিধান বার বার দেখিতে পাই। এখন এই গৃহপতির অগ্নি-প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহা কেবলমাত্র স্বতন্ত্র পরিবার প্রতিষ্ঠার অঙ্গ। এই অগ্নি আজিকার বস্তু নহে। সকল গৃহেই আর্যগণ অগ্নি প্রতিষ্ঠিত করিতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষ, পারস্য, গ্রিস, রোম প্রভৃতি সকল দেশেই দেখিতে পাই, এই অগ্নি গৃহের দেবতা এবং গৃহের একত্বের লিঙ্গ। এক গৃহে এক অগ্নি ব্যতীত দুই অগ্নি যে থাকিতে পারে না তাহারও ভূরিভূরি প্রমাণ আছে। তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নূতন অগ্নি-প্রতিষ্ঠা, নূতন এবং স্বতন্ত্র গৃহ-প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক। এইরূপ যখনই নূতন সংসার পাতিবার পরিচয় পাই, তখনই নূতন অগ্নি-প্রতিষ্ঠা তাহার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গস্বরূপে নির্দিষ্ট দেখিতে পাই। স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে সংসার ঘুচিয়া যাওয়ার নিদর্শনস্বরূপ সেই অগ্নিতে পত্নীকে দাহ করিয়া পুনরায় নূতন অগ্নি-প্রতিষ্ঠার — অর্থাৎ বিবাহের ব্যবস্থা আছে। যৌথ পরিবারের বিভাগ হইলে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সংসার স্থাপন করিতে হইবে। সর্বত্রই দেখিতে পাই, নূতন অগ্নি সর্বত্রই স্বতন্ত্র সংসার স্থাপনের পরিচায়ক। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, স্নাতকের বিবাহ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার ব্যবস্থা যে যুগের, সে যুগের সাধারণ ধর্ম ইহাই ছিল যে, লোকে বিবাহ করিয়া পিতৃগৃহ হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র গৃহ স্থাপন করিত।

উক্ত শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে ইহা অনুমান করা অসংগত হইবে না যে, পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রবধূ, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি নানা পরিবার লইয়া ভিড় করিয়া এক গৃহে থাকাটা সেসময়ে আর্যদিগের রীতি ছিল না। ইহা সম্ভবত শূদ্ররীতি, এবং সামাজিক অনুষ্ঠান ও আচারাদির পরিবর্তনের সহিত শূদ্রদের ওই অনার্য রীতি আর্য পরিবারে সংক্রান্ত হয়। কী

কারণে ওইরূপ ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে এই অনুমান করা যাইতে পারে যে, যখন দ্বিজগণ অধিকাংশ আচারভ্রষ্ট হইয়া গুরুগৃহে বাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহে বাস করিতে লাগিল তখন তাহাদিগের সহিত পিতৃপরিবারের বিচ্ছেদ তত সহজ হইত না। হয়তো-বা জীবনসংগ্রামের পীড়নে, অন্নবস্ত্র সংগ্রহের অক্ষমতাবশত অনেকে স্বতন্ত্র গৃহ করিয়া উপবাসী থাকা অপেক্ষা পিতৃগৃহে থাকা শ্রেয় মনে করিত। ধনী পিতার পুত্র সহসা পিতার সংসারের ধনদৌলত ফেলিয়া নিজের এক দরিদ্র সংসার পাতা সুবিধাজনক মনে করিত না। এইরূপ নানা কারণে প্রাচীন আর্যজাতির ভিতরে সনাতন ক্ষুদ্র পরিবারের স্থলে ক্রমে বৃহৎ পরিবারের সৃষ্টি হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য এ সমুদয় কারণ সম্পূর্ণ আনুমানিক এবং এ সম্বন্ধে যে কোনো প্রমাণ আছে এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না।

২

যাহা হউক, প্রাচীন আর্য পরিবারের গঠন-সম্বন্ধে যেমন আমরা একদিকে এই আদর্শ দেখিতে পাই, তেমনই ধর্মশাস্ত্রে আর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শও দেখিতে পাই। তাহা একটি বৃহৎ পরিবার; তাহাতে পিতা-পুত্র-পৌত্র ও প্রপৌত্র একত্রে বাস করে, অবশ্য সপরিবারে। দায়গ্রহণ-বিষয়ক ত্রৈপুরুষিক সপিণ্ডতা পরিবারের এই আদর্শের পরিচয় দেয়। দায়বিভাগ-সম্বন্ধীয় বিধানগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে, সেই বিভাগের অংশী কেবলমাত্র ভ্রাতৃগণ নহে, মৃত ভ্রাতার পুত্র, পৌত্র পর্যন্ত অংশ পায়। এই প্রথা হইতে ইঙ্গিতজ্ঞ বুঝিবেন যে, যেকালে এই ব্যবস্থার প্রচলন ছিল সেকালে প্রপৌত্র লইয়া একসংসার পাতা সম্ভব ছিল। তথাপি এই সমুদয় বিধান আলোচনা করিলে ইহাই মনে হয়, এই বৃহৎ পরিবারে সম্মিলনের সূত্র পিতা-মাতা; এবং পিতার মৃত্যুর পর এইরূপ পরিবার ভাঙিয়া যাওয়া এবং ভ্রাতৃগণের স্বতন্ত্র পরিবার প্রতিষ্ঠাই স্বাভাবিক ছিল। তবে সংসৃষ্টি বা ভ্রাতৃগণের বা পিতৃব্য ভ্রাতুষ্পুত্রের একত্র বাস একেবারে ছিল না এমন বলা যায় না।

এই বৃহৎ পরিবারে যে কেবলমাত্র পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র থাকিত তাহা নহে, অপরাপর ব্যক্তিও থাকিত; তাহারা দায়াধিকারী নহে কিন্তু ভরণাধিকারী। এই ভরণাধিকারীগণ যে পরিবারভুক্ত তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদিগের সংখ্যা ও পরিচয় সম্বন্ধে স্মৃতিকারদিগের নানা মতভেদ আছে। এ কথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না যে, ভরণাধিকারী সম্বন্ধে এই মতভেদ দেশকালভেদে ভরণাধিকারীর সংখ্যাভেদের পরিচায়ক। সকল দেশে বা সকল কালেই একই কুটুম্ব বা আশ্রিত ব্যক্তি ভর্তব্য ছিল এরূপ নহে; ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিকারগণ তাঁহাদিগের স্ব স্ব দেশ ও কালের সমাজের পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের পরিচয় দিতে গিয়াই যে এরূপ মতভেদে উপনীত হইয়াছেন, এরূপ অনুমান করা অসংগত হইবে না।

এই বৃহৎ পরিবার হিন্দুশাস্ত্রের সনাতন পরিবার নহে। ইহা বৈদিক যুগের পরবর্তী যুগের সৃষ্টি। এই দুইটি স্বতন্ত্র আদর্শের তুলনা করিলে দেখিতে পাই — উভয় আদর্শের প্রধান প্রভেদ ধন লইয়া। প্রাচীন পরিবার নির্ধন বা অল্পধন; অর্বাচীন যৌথ পরিবার ধনী। ইহা হইতে এই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ধনের তারতম্যের কারণেই এই আদর্শের তারতম্য; এবং

পরবর্তীকালে আর্যগণের ধনবৃদ্ধি আর্য পরিবারের এই পরিসরবৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ। অপরাপর কারণ সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান এত অল্প যে সে সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছুই বলা যায় না।

ঔরসপুত্র ছাড়া আরও একাদশবিধ পুত্রের পরিচয় আমরা ধর্মশাস্ত্রে প্রাপ্ত হই। বৈদিক ও পৌরাণিক দৃষ্টান্ত হইতে এরূপ নানাবিধ পুত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণও আমার পাই। ইহারা পরিবারভুক্ত ছিল কিন্তু সকল যুগেই যে দ্বাদশবিধ পুত্র পরিবারভুক্ত ছিল এরূপ অনুমান করা সংগত হইবে না। সকল স্মৃতিকার সকল প্রকার পুত্রের উল্লেখ করেন নাই এবং *মনুসংহিতা* প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্মৃতি ব্যতীত অতি প্রাচীন গ্রন্থে আমরা দ্বাদশবিধ পুত্রের পরিচয় পাই না, আবার কোনো কোনো স্থলে পুত্র কাহার হইবে তাহা লইয়া মতভেদও দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্থলে ক্ষেত্রজ পুত্রের কথা বলা যাইতে পারে। মন্বাদির মতে ওই পুত্র মাতার স্বামীর পুত্র বলিযা গণ্য হইবে, স্থলবিশেষে সে দ্ব্যামুষ্যায়ণ বা দ্বিপিতৃক হইতে পারে। কিন্তু আপস্তম্বের মতে ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মদাতার পুত্র। এই সমুদয় মতভেদ ও পরিগণনাভেদের তাৎপর্য আমি ইহাই বুঝি যে, ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিকার আপন আপন কালের সমাজে যে সন্তান যাহার পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইত তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। এ বিষয়ে সমাজভেদে আচারভেদ ছিল। অপরের ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন বহু সমাজে প্রচলিত থাকিলেও তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ছিল না। কোথাও বা তাহার উদ্দেশ্য অপুত্র বিধবার পুত্রলাভ, কোথাও বা অপুত্রক পুরুষের পুত্রলাভ,এই উদ্দেশ্যভেদে সমাজব্যবস্থায় পিতৃত্বের প্রভেদ দেখা যায়। ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ও ভিন্ন ভিন্ন কালে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পুত্র পরিবারের মধ্যে পরিগণিত হইত।

কন্যাগণ পরিবারের মধ্যে সাধারণত পরিগণিত না হইলেও স্থলবিশেষে হইত। পুত্রের ন্যায় পুত্রিকা পিতার পরিবারভুক্ত থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত অপরাপর কন্যাও অবস্থাবিশেষে পিতৃগৃহে বাস করিতেন। পতিকুল নির্মূলষ্য হইলে বিধবা কন্যা পিতৃগৃহে আশ্রয় লইতেন — শাস্ত্রে ইহার বিধান আছে। তাহা ছাড়া ব্রাহ্মাদি চারিপ্রকার প্রশস্ত বিবাহ ব্যতীত অপর কোনো উপায়ে কন্যা ভর্তৃযুক্ত হইলে পিতৃকুলে তাহার বাস করা অসম্ভব ছিল না। *স্মৃতিচন্দ্রিকা*-র মতে ব্রাহ্মাদি চারিপ্রকার বিবাহেই গোত্রান্তর হয়;গান্ধর্বাদি বিবাহে গোত্রান্তর হয় না। এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে ঠিক যে কোনো স্মৃতি বা শ্রুতির বচন আছে এরূপ বলা যায় না। তথাপি এ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ গোত্রান্তর হওয়া একটি অদৃষ্ট ফল, ইহা অদৃষ্টার্থ কার্য ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না; শাস্ত্রোক্ত বিবাহবিধির অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রাদিসংযুক্ত অনুষ্ঠান দ্বারাই ইহা সম্পাদিত হয়; এবং ওই বিবাহবিধি কেবল ব্রাহ্মাদি বিবাহেই প্রযুজ্য, নিন্দিত বিবাহে ওই বিধির প্রয়োগ হইতে পারে না। সুতরাং রাক্ষসাদি বিবাহে গ্রোত্রান্তর হইতে পারে না। সুতরাং এই সমুদয় বিবাহে কন্যার পিতৃগোত্রচ্ছেদ হয় না। এই ব্যবস্থার গোড়ার কথা তলাইয়া দেখিলে এই অনুমান সংগত বোধ হয় যে, এপ্রকার বিবাহে ভর্তৃযুক্ত কন্যা অনেকস্থলে পিতৃকুলেই বাস করিত।

সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত কন্যার পিতৃগৃহে বাস এবং দৌহিত্রের মাতামহের পরিবারভুক্ত হইবার প্রথা প্রচলিত হওয়া স্বাভাবিক। এবং এইরূপ কোনো আচারের ফলেই

বোধ হয় কন্যা ও দৌহিত্রের দায়াধিকারিত্ব প্রতিষ্ঠিত। কারণ অতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে কন্যা ও দৌহিত্রের দাযাধিকারের পরিচয় পাওয়া যায় না। সামাজিক অবস্থার পীড়নে কন্যা পিতৃকুলে ও দৌহিত্র মাতুলগৃহে কীরূপ অচল হইতে পারে তাহার পরিচয় বঙ্গের কুলীনসমাজে। মেলবন্ধনাদি কারণবশত বিবাহযোগ্য পুরুষের অসদ্ভাবই বঙ্গদেশে এইরূপ পারিবারিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কারণ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে বিবাহযোগ্য কন্যার অভাববশত দক্ষিণাপথে নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অন্যপ্রকার আচারের সৃষ্টি হইয়াছিল। নম্বুদ্রিগণ যে আর্য ব্রাহ্মণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাহাদিগের স্বীকৃত অনার্য আচার এবং অদ্ভুত পরিবার-গঠনপ্রণালি সম্পূর্ণরূপে সামাজিক অবস্থা হইতেই প্রচলিত হইয়াছে।

এইসকল দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষে দেশভেদে ও কালভেদে পরিবারের আয়তন কখনও প্রসারিত কখনও সংকুচিত হইয়াছে। সকল দেশে সকল সময়ে একই শ্রেণীর ব্যক্তি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পবিগণিত হইত না। যাহাদিগকে আমরা যৌথ পরিবারের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে করি তাহারা যে সকলসময় পরিবারভুক্ত ছিল এরূপ নহে। এবং পূর্বপক্ষগণ যাহাদিগকে পরিবারভুক্ত বলিয়া কল্পনাও করিতে পারেন না তাহারা পূর্বে কোনো কোনো সমাজে পরিবারভুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইত।

৩

পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের পরস্পর-সম্বন্ধ আলোচনা করিলে আমরা আরও স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইব যে, পরিবারের ব্যক্তিবর্গের পরস্পবের উপর পরস্পরের অধিকার সম্বন্ধে দেশকালভেদে কত গুরুতব পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

অতি প্রাচীনকালে দেখিতে পাই যে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং দাসের উপর গৃহপতির সমান অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব! দান আধান ও বিক্রয় যে পুত্র সম্বন্ধে ঘটিতে পারে তাহার পরিচয় স্মৃতিবাক্যেই পাই। বৈদিক উপাখ্যানে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। নচিকেতা পিতা কর্তৃক বিশ্বজিৎ-যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিলেন; শুনঃশেফকে তাহার পিতা যজ্ঞে বলির জন্য বিক্রয় করিয়াছিলেন। পুরাণেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যুধিষ্ঠির পত্নী দ্রৌপদীকে অক্ষক্রীড়ায় পণ রাখিয়া হারিয়াছিলেন; হরিশচন্দ্র পত্নী ও পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। যজ্ঞাদি বিধানেও এই ধারণা সুস্পষ্ট। মন্ত্র বলিতেছেন, "বিশ্বজিৎ-যজ্ঞে সর্ব্ব 'স্ব' দান করিবে, ভার্য্যা ও পুত্র দান করিবে না।"

ইহা হইতে বুঝা যায় পত্নী ও পুত্র 'স্ব' বা সম্পত্তির ভিতর গণ্য হইলেও এই বিশেষ বাক্যের দ্বারা তাহার দান-প্রতিষেধ হইয়াছে। অবশ্য শবরস্বামী প্রভৃতি মীমাংসকেরা এ ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু স্ত্রীপুত্রকে দান কার যায় এই ধারণাই যে এই মন্ত্রের মূলে আছে ঐতিহাসিক তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুতরাং পিতার এবং গৌতমাদির বচনমতে মাতারও যে পুত্রকে দানাধান বিক্রয় করিবার অধিকার ছিল এবং স্বামীর যে স্ত্রীকে ঘোড়া-গোরুর মতো বেচিবার অধিকার ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। শুনঃশেফের উপ্যাখ্যান হইতে অনুমান করা যায় যে, পুত্রকে বধ করিবার অধিকারও পিতার ছিল এবং সে অধিকার ক্রেতা পাইতে পারিত; শারীরিক দণ্ডাদি সম্বন্ধে তো কোনো কথাই নাই।

ভার্যা পুত্রাদির যেখানে এইরূপ অবস্থা সেখানে তাহাদেব যে গৃহপতির অর্থে কোনো অধিকার ছিল না ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অপরপক্ষে পুত্র বা পত্নী যদি কোনো ধন স্বয়ং উপার্জন করিত তাহাও গৃহপতির নিজস্ব হইত। ইহার পরিচয় পরবর্তী স্মৃতিকারধৃত অতি প্রাচীন কয়েকটি বচনে পাই; তাহা হইতে ভার্যা পুত্র ও দাস যে সমভাবে গৃহপতির অধিকৃত বা স্বোপার্জিত ধনে অধিকারবিহীন তাহা প্রমাণ হয়। পুত্র বা স্ত্রীর ধনাধিকার পরবর্তী স্মৃতিতে ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাই। ইহাদিগের এই অধিকার এক দিনে বা এক স্থানে স্বীকৃত হয় নাই — যুগযুগান্তের অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার চেষ্টার ফলে এই অধিকার তাহারা লাভ কবিযাছিল।

কালক্রমে কীরূপভাবে একটির পর একটি এই সমুদয় অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল, সামাজিক কোন্ কোন্ পরিবর্তনের ফলে এইসব পরিবর্তন হইয়াছিল তাহার বিশদ আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নহে। আমি এ বিষয়ে বিধিব্যবস্থার পরিবর্তনের মোটামুটি কযেকটি দৃষ্টান্ত দিয়া ক্ষান্ত থাকিব।

শরীর সম্বন্ধে গৃহপতির অধিকার ক্রমশ অনেক খর্ব হইয়া আসিয়াছিল দেখিতে পাই। পুত্রকে দত্তকস্বরূপ দান করিবার অধিকার সর্বকালে স্বীকৃত হইলেও তাহাকে বা পত্নীকে সম্পত্তিরূপে গণ্য করিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছ দান-বিনিয়োগ, মীমাংসক এবং নিবন্ধকারগণ নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই অভিমতের স্বপক্ষে স্মৃতিপ্রমাণের অভাব নাই। পুত্রকে বধ করা দূরে থাকুক, তাহাকে যথেচ্ছ শাস্তি দিবার অধিকারও স্মৃতিতে স্বীকৃত হয় নাই। অপরাধ করিলে পুত্র বা শিষ্যকে কীরূপে তাড়ন করিতে হইবে এবং কীপ্রকার বেত্র দ্বারা কোথায় আঘাত কবিতে পারিবে তাহা স্মৃতিতে উক্ত আছে। তদতিরিক্ত শাস্তি দিবার ক্ষমতা কেবল রাজারই ছিল।

স্বোপার্জিত অর্থে পুত্রের স্বাতন্ত্র্য, স্মৃতিতে ক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রথমে দেখিতে পাই কেবলমাত্র শৌর্য, বিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা অর্জিত ধনের স্বত্ব তাহাকে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য 'পিতৃদ্রব্যাবিবোধেন যদন্যৎ স্বয়মার্জ্জিতং' বলিয়া এক সাধারণ সূত্রে সকলপ্রকার স্বোপার্জিত সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। এই বাক্যের ব্যাখ্যা লইয়া নিবন্ধকারদিগের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ আছে; সে সমস্ত মতভেদ তাঁহাদিগের সমসাময়িক ও স্বদেশস্থ সমাজের ব্যবস্থা ভেদমূলক। বিজ্ঞানেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের বিধিকে খর্ব করিবার যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন এবং পৈতৃক অর্থ বা উপাদানের সামান্যমাত্র সাহায্যে যাহা কিছু অর্জিত হইয়াছে তাহা স্বোপার্জিত বলিয়া স্বীকাব করেন নাই। এমনকী মৈত্র এবং ঔদ্‌বদ্বাহিক সম্পত্তি সম্বন্ধেও তিনি পিতৃদ্রব্যের বিরোধ-সম্ভাবনা দেখিয়াছেন। *মিতাক্ষরা*-কার একদিকে যেমন পুত্রের স্বোপার্জন-ক্ষমতা সংকুচিত করিয়াছেন অপরদিকে তাহার পারিবারিক সম্পত্তিতে অতিরিক্ত অধিকার স্বীকার করিয়াছেন।

পিতার সম্পত্তি পবম্পরাগতই হউক, আর স্বোপার্জিতই হউক, অতি প্রাচীনকালে তাহাতে যে পুত্রদিগের কোনো স্বত্ব ছিল না তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। তার পরবর্তীকালে পারিবারিক সম্পত্তিতে পুত্রাদির অধিকার সম্বন্ধে স্মৃতিগ্রন্থে নানাজাতীয় বাক্য দেখা যায়, সেগুলিকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা যায়, যথা :

প্রথম স্তর — পারিবারিক সম্পত্তিতে পিতার সম্পূর্ণ অধিকার, কিন্তু দায়-বিভাগে পিতা পুত্রদিগের মধ্যে অসমান বিভাগ করিতে অধিকারী নহেন।

দ্বিতীয় স্তর — পারিবারিক পরম্পরাগত সম্পত্তির মধ্যে কয়েকপ্রকার সম্পত্তিতে পিতা পুত্রদিগের সম্মতি ব্যতীত দান-বিক্রয়ের অধিকারী নহেন; তবে সম্পত্তিতে অধিকার পিতারই।

তৃতীয় স্তর — পরম্পরাগত স্থাবরাদি সম্পত্তিতে পিতার একার স্বামিত্ব নাই, তাহাতে পিতা এবং পুত্রের সমান স্বামিত্ব। স্বামিত্ব সমান হইলেই অধিকার সমান হয় না, পরিবার যত দিন পর্যন্ত একান্নবর্তী থাকে তত দিন পর্যন্ত সেই সম্পত্তির ব্যবহার সম্বন্ধে পিতার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ।

চতুর্থ স্তর — তৃতীয় স্তরের আনুষঙ্গিক; ইহাতে পুত্রের বিভাগাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কোনো বাক্যে বিভাগাধিকার পিতার ইচ্ছায় হইতে পারে বলিয়া উল্লিখিত কোথাও বা পিতার অনিচ্ছায়ও অবস্থাবিশেষে বিভাগ হইতে পারে, এরূপ স্বীকৃত।

সুতরাং প্রাচীন হিন্দু পরিবারের সম্পত্তিতে পুত্র-পৌত্রাদির অধিকার নানা যুগে নানাবিধ ছিল, এরূপ অনুমান করা সংগত। এক যুগে দেখিতে পাই পুত্রের কোনোই অধিকার নাই আর এক যুগে দেখিতে পাই পুত্র পিতার সহিত সমান স্বামী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বিধিসমূহের এই ভেদ, দেশভেদ ও কালভেদে, সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা ও আদর্শের ভেদ অনুসারেই যে হইয়াছিল সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যেকালে সম্পত্তি যৎসামান্য, সেকালে সমাজে সনাতন পৈতৃক অধিকার অব্যাহত ছিল; এবং যেকালে পরিবারের ক্রমাগত সম্পত্তিব পরিমাণ অধিক ছিল এবং পুত্র-পৌত্রাদি এক পরিবারভুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল সেকালের পিতা কর্তৃক পরম্পরাগত সম্পত্তি যথেচ্ছ ব্যবহার সংকুচিত করিয়া পুত্রদিগের ন্যায্য অধিকার নানারূপে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। পিতার সহিত পুত্রগণের সমান স্বামিত্ব এবং পিতার অনিচ্ছায় বিকৃতচেতা বা অতিবৃদ্ধ পিতার নিকট হইতে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইবার পুত্রের অধিকার দান, এই চেষ্টার শেষ সীমা।

ব্যবহারশাস্ত্রে আমরা পারিবারিক আদর্শ ও গঠনভেদের যে পরিচয় পাই স্মৃতিসাহিত্যে তাহার পরিসমাপ্তি হয় নাই। পরবর্তীকালে টীকাকার ও নিবন্ধকারগণ নিজ নিজ সমাজের অবস্থা অনুসারে শ্রুতিস্মৃতির বিধান ভাঙিয়া-চুরিয়া ব্যবস্থার ভেদ করিয়াছেন। *মিতাক্ষরা*-কার পুত্রদিগকে পারিবারিক পিতার সহিত সমান সাম্য দান করিয়াছেন এবং কোনো কোনো অবস্থায় পিতার অনিচ্ছায়ও সম্পত্তিবিভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অপরপক্ষে জীমূতবাহন পিতার সম্পূর্ণ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। এ প্রভেদ সকলের সুপরিচিত। কিন্তু কেবল *মিতাক্ষরা* ও *দায়ভাগ*-এ যে এই প্রভেদ তাহা নাহে। উভয়গ্রন্থেই আমরা বিশ্বরূপ, ধারেশ্বরাদি বহু পূর্বাচার্যের পরিচয় পাই এবং এই প্রভেদ যে পূর্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল তদ্‌বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া গৌণ নিবন্ধাদিতেও-ছোটোখাটো বিষয়ে পিতাপুত্রের অধিকার সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। *সরস্বতীবিলাস স্মৃতিচন্দ্রিকা* ও *ব্যবহারময়ুখ* এই বিষয়ে *মিতাক্ষরা*-র সহিত সম্পূর্ণ একমত নহে।

৪

পরিবারের ভিতর নারীর অধিকার সম্বন্ধে শ্রুতিস্মৃতিতে যে ব্যবস্থার তারতম্য দেখা যায় তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন ব্যবস্থায় স্ত্রী অধন, নিরিন্দ্রিয় অদায়াদ অর্থাৎ স্ত্রী কোনো সম্পত্তি স্বয়ং অর্জন করিতে পারে না এবং কোনোমতে দায় গ্রহণ করিতে পারে না। স্মৃতিসাহিত্যে দেখিতে পাই, ক্রমে স্ত্রীর ধনার্জনের ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে; কয়েকপ্রকার বিশিষ্ট ধন সম্বন্ধে স্ত্রীর অর্জনক্ষমতা স্বীকার করিয়া সেগুলিকে স্ত্রীধন বলা হইয়াছে। স্ত্রীধনের পরিগণনা হইতে দেখিতে পাই যে, রিকৃথ, ক্রয় সংবিভাগ প্রভৃতি সাধারণ উপায়ে স্ত্রীর কোনোরূপ ধনাধিকার প্রথমে ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে স্ত্রীর দায়াধিকার স্বীকৃত হইয়াছে; তাহা লইয়াও নানারূপ মতভেদ। পত্নীকন্যা প্রভৃতির দায়াধিকার এবং তাহাদিগের সম্পত্তির উপর তাহাদিগের স্বতন্ত্র অধিকার সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। স্মৃতিকারদিগের পরবর্তী টীকা ও নিবন্ধকারগণ দেশ, কাল ও সামাজিক অবস্থাভেদে এসম্বন্ধে নানা ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইযাছেন। *মিতাক্ষরা*-কার নারীর দানাধিকার সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন এবং যে-প্রকারেই নারী সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকুক তাহা স্ত্রীধন হইবে এবং তাহাতে তাহার সমান অধিকার হইবে, বলিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যাকারগণ স্ত্রীলোকের সমুদয় সম্পত্তিতে দান-বিক্রয়ের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। জীমূতবাহন স্ত্রীলোকের দায়াধিকার এবং অপরাপর উপায়ে লব্ধ ধনে অধিকার স্বীকার করিয়া বিভিন্নপ্রকার ধনে ভিন্ন ভিন্ন অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। কোথাও বা তাহার যথেষ্ট বিনিয়োগের অধিকার আছে, কোথাও বা তাহা নাই। *ব্যবহারময়ূখ*-এ এবং *সংস্কারকৌস্তুভ*-এ স্ত্রীগণের অধিকার আরও বিস্তৃত হইয়াছে। এই সমুদয় গ্রন্থে কেবল যে স্ত্রী দায়াদ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা নহে, *মিতাক্ষরা*-কার বিনিয়োগাদিতে পিতা স্বামী প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত রক্ষাকর্তাদিগের যে নিষেধাধিকারের ইঙ্গিত করিয়াছেন কমলাকর ভট্ট তাহাও প্রায় উড়াইয়া দিয়াছেন। অপরপক্ষে *স্মৃতিচন্দ্রিকা*-য় স্ত্রীলোকের অধিকার অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। স্ত্রীজাতির এইপ্রকার অধিকারভেদ বিভিন্ন সমাজে ও বিভিন্ন যুগে স্ত্রীজাতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ অবস্থার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এইপ্রকার অন্যান্য কুটুম্বের দায়াধিকার ও ভরণাধিকার সম্বন্ধে অসংখ্য তারতম্য দেখা যায়। সে সমুদয় তারতম্য দেশকালভেদে পরিবারের গঠন ও আদর্শ-বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। একটি দৃষ্টান্ত দত্তক পুত্র। দত্তকের দায়াধিকার এক্ষণে সকল দেশে সমানভাবে স্বীকৃত। কিন্তু সকল স্মৃতিকারদিগের বচনে ঐক্য নাই। কোনো কোনো স্মৃতিকার দত্তককে মুখ্য দায়াধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কেহ কেহ তাহাকে অপরাপর জাতীয় পুত্রের পরে বসাইয়াছেন, আবার কেহ বা তাহাকে অদায়াদ বান্ধবের দলে ফেলিয়াছেন। দত্তক গ্রহণান্তর পুত্র হইলে দত্তকের স্থান এবং অসিদ্ধ দত্তকের অধিকার সম্বন্ধেও গোলযোগ আছে। কোনো কোনো স্থানে দত্তক আংশিক উত্তরাধিকারী, কোথাও বা ভরণাধিকারী, কোথাও বা দাসরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এবং অতীত যুগের ব্যবহার সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় গৌণপুত্রগণের মধ্যে দত্তকের স্থান পাইতে বিস্তর বিলম্ব হইয়াছিল।

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাগতিকে পরিবারের আদর্শ বা গঠনসম্বন্ধে যে সমুদয়

পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা কেবলমাত্র গৌণ বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। অত্যন্ত মৌলিক বিষয়ে কতকগুলি ব্যবস্থার ভেদ ঘটিয়াছে। কী কী কারণে কোন্ পরিবর্তন হইয়াছিল তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু সামাজিক অবস্থাভেদ, ধর্ম ও নীতিগত তারতম্য, অর্থশাস্ত্রীয় সম্পর্কভেদ, অন্যান্য জাতি ও অন্যান্য সমাজের সংঘর্ষ, নরনারীসংখ্যার তারতম্য প্রভৃতি বিবিধ কারণে দেশকালভেদে হিন্দু পরিবার ভাঙিয়া-গড়িয়া নানারূপ হইয়াছে। আজ আবার রেল টেলিগ্রাফের দিনে, নানাবিধ নৈতিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থাভেদে সমাজে পরিবারের এক নূতন মূর্তি গড়িয়া উঠিতেছে। ইহা পুরাতন হইতে ভিন্ন; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সেই পুরাতনও সনাতন নহে বা তদপেক্ষা অধিক পুরাতন পারিবারিক আদর্শ হইতে অভিন্ন নহে। এ পরিবর্তন ভালো হইতেছে কী মন্দ হইতেছে সে বিচার আমি করিতে চাই না। ইহার যে একটা মন্দ দিক আছে তাহাও আমি অস্বীকার করিতে চাই না, কিন্তু এ পরিবর্তন যে স্বাভাবিক, এবং হিন্দু সমাজের পক্ষে পরিবর্তন যে একটি অপূর্ব ভয়াবহ পদার্থ নয়, ইহা প্রমাণ করিতে পারিয়া থাকিলেই আমি শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

☐ *প্রবন্ধসংগ্রহ*, ২০০২

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

জগদীশচন্দ্র একদিন বলেছিলেন — "তবে ত আমরা এই অসীমের মধ্যে একেবারে দিশাহাবা। কতটুকুই বা দেখিতে পাই? একান্তই অকিঞ্চিৎকর। অসীম জ্যোতির মধ্যে অন্ধবৎ ঘুবিতেছি এবং ভগ্ন দিক-শলাকা লইয়া পাথার লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। হে অনন্ত পথের যাত্রী, কী সম্বল তোমার? সম্বল কিছুই নাই, আছে কেবল অন্ধবিশ্বাস, যে বিশ্বাস বলে প্রবাল সমুদ্রগর্ভে দেহাস্থি দিয়া মহাদ্বীপ রচনা করিতেছে। জ্ঞান-সাম্রাজ্য এইরূপ অস্থিপাতে তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আঁধার লইয়া আরম্ভ, আঁধারেই শেষ, মাঝে দুই-একটি ক্ষীণ আলোরেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায় বলে ঘন কুযাশা অপসাবিত হইবে এবং একদিন বিশ্বজগৎ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিবে।"

এক মহাজ্ঞানীব মনীষা ও অধ্যবসায় বলে কীরূপে ঘন কুজ্ঝটিকার একদিক অপসৃত হযে নবারুণরশ্মি জগৎকে উদ্ভাসিত করল ও প্রাচীন ভারতের ঋষিগণের বাণী "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হল, তারই এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হল।

তুমি কথা বললে, আমি শুনলুম। ব্যাপারটা বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা করতে হয়। তোমার ও আমার মধ্যে বায়ু রয়েছে; তুমি যখন কথা বললে, তখন তুমি বায়ুতে ঢেউ তুললে; সেই ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তা সেকেণ্ডে মোটামুটি ১১২০ ফিট বেগে ধাবিত হল। কিছুটা ঢেউ আমার কানে প্রবেশ কবে আমার কর্ণপটাহকে কাঁপাতে থাকল; তার ফলে হল আমার শব্দের অনুভূতি। এখন কম্পন সংখ্যা সেকেণ্ড-প্রতি কমও হতে পারে, বেশিও হতে পারে; কম্পন-সংখ্যা বেশি হলে সুর হবে চড়া। কম্পন-সংখ্যা বাড়তে বাড়তে যদি সেকেণ্ড-প্রতি মোটামুটি ত্রিশ হাজারের বেশি হয় — তখন বায়ুর কম্পন চলতে থাকলেও সে কম্পন আমাদের শব্দের অনুভূতি জাগায় না। নীচের দিকেও সেই রকমের। কম্পন-সংখ্যা যদি সেকেণ্ড-প্রতি ত্রিশের কম হয় তবে সে সম্বন্ধেও আমরা বধির। মাঝের মাত্র এগারটি পর্দার ঢেউ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে।

আলো ওই রকমেরই ব্যাপার। তার উৎপত্তিও তরঙ্গে, তবে সে তরঙ্গ বায়ুর নয়, বিজ্ঞানীর কল্পিত ঈথরের। বায়ু পৃথিবীর উপরে মাত্র কয়েক শ মাইল গিয়ে শেষ হয়েছে, কিন্তু ঐ ঈথর মানুষের দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত রাজ্য পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে এই রকম কল্পনা করা হয়। ঈথর তরঙ্গ চলে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে। এখানেও দর্শনেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা আছে, আর সে অসম্পূর্ণতা আরও বেশি। ঈথর স্পন্দনের মাত্র

একটি সপ্তক আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। স্পন্দন-সংখ্যা যদি সেকেণ্ড-প্রতি চারশ লক্ষ কোটিবার হয়, তবে আমরা তাকে লাল আলো বলে উপলব্ধি করি, কম্পন-সংখ্যা দ্বিগুণ হলে বেগনি রঙ দেখি। পীত, সবুজ, নীল আলো এই সপ্তকের অন্তর্ভুক্ত। উপরের বা নীচের স্পন্দন অদৃশ্য।

ঈথর স্পন্দনেই আলোকের উৎপত্তি — দৃশ্য আলোক, অদৃশ্য আলোক উভয়ই। এখন প্রশ্ন হল এই, অদৃশ্য রশ্মি কী ভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে, কী করেই বা তা ধরা যেতে পারে? কথাটা একটু গোড়া থেকে আরম্ভ করা যাক।

গত শতাব্দীর মাঝখানে ইংলন্ডের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওএল বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য প্রকাশ করলেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে তিনি দেখলেন, যে ঈথর-তরঙ্গ আমাদের দৃষ্টির অনুভূতি জাগায় বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সেই ঈথরের মধ্যে দিয়েই পরিচালিত হতে পারে। গাণিতিক আলোচনার সাহায্যে ম্যাক্সওএল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। ১৮৮৭ সনে জার্মানিতে বিজ্ঞানী হার্জ যন্ত্রের সাহায্যে ম্যাক্সওএলের তথ্য অনুযায়ী বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি করলেন। সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞানী মহলে একটা সাড়া পড়ে গেল। এর প্রায় দু বছর আগে জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি তাঁর ক্লাসে ছাত্রদের হার্জের ওই সব পরীক্ষা দেখাতে লাগলেন। হার্মোনিয়ম হতে আমরা 'সা' সুরও শুনলুম, 'রে' সুরও শুনলুম। উভয়ই বায়ু তরঙ্গ হতে উত্থিত। সেকেণ্ড-প্রতি প্রথমটার কম্পন-সংখ্যা কম, দ্বিতীয়টার বেশি। তেমনি হার্জের উদ্ভাবিত এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও সাধারণ আলোক, উভয়ই এক গোত্রীয়, উভয়ই ঈথর তরঙ্গ, তবে প্রথমটির তরঙ্গ -দৈর্ঘ্য বেশি, দ্বিতীয়টির কম। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হল দুটি পর পর তরঙ্গের মাথার মধ্যে দূরত্ব। এখন কথা হচ্ছে, উভয়ই যে এক গোত্রীয় তা প্রমাণিত হবে কী রকমে?

আলোকের কতকগুলি ধর্ম আছে। প্রথম, আলোক সোজা পথে চলে, আর সোজা পথে যায় বলে আলোক অনচ্ছ পদার্থের ছায়া ফেলে। দ্বিতীয়, আলোক প্রতিফলিত হয়। তৃতীয়, আলোকের প্রতিসরণ আছে;অর্থাৎ একটি স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করলে আলোকের পথ বেঁকে যায়। চতুর্থ, আলোক-তরঙ্গের কোনও শৃঙ্খলা নেই;এই তরঙ্গগুলি কতক উপর-নীচে, কতক ডাইনে-বামে এলোমেলোভাবে বিভিন্ন সমতলে কম্পিত হয়ে চলে। কিন্তু কতকগুলি স্ফটিক আছে যার ভিতর দিয়ে আলো চললে বহুমুখ কম্পন একমুখ হয়ে দাঁড়ায়;আবার কয়েকটি পদার্থ আছে যারা এই কম্পনের তল ঘুরিয়ে দেয়। হার্জ যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি করলেন তা যদি দৃশ্য আলোকের সমগোত্রীয় হয়, তবে ওই সকল ধর্মও হার্জীয় তরঙ্গেও দেখা যাবে। হার্জ এ-সম্বন্ধে মীমাংসায় অগ্রসর হলেন। কিন্তু হার্জের পরীক্ষায় অনেক বাধা দেখা দিল।

প্রথম, আলোক সোজা পথে চলে অনচ্ছ পদার্থের পিছনে যে ছায়া ফেলে হার্জের পরীক্ষায় তা দেখানো সম্ভব নয়;সম্ভব যে নয়, তার কারণ এই, আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব ছোট বলে ছায়া পড়ে, কিন্তু যে ঢেউ-এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বড় তা ছায়া ফেলে না, যেমন জলের ঢেউ-এর সামনে একখানা ছোট পাথর ধরলে পাথরের পিছনেও ঢেউ দেখা দেয়। হার্জীয় তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব বড়, সুতরাং এই অদৃশ্য আলোক কোন ছায়া ফেলতে পারে না।

প্রতিফলন, প্রতিসরণ পরীক্ষা হার্জ দেখালেন বটে, কিন্তু ওই সব পরীক্ষা বিশেষ সন্তোষজনক হতে পারল না। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব বড়, এই ত হল প্রধান অন্তরায়, দ্বিতীয় কারণ এই যে, যে যন্ত্র এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরবে তা খুব সূক্ষ্ম ধরনের ছিল না;একটু দূরে রাখলে বৈদ্যুতিক তবঙ্গ ধবা পড়ে না। জগদীশচন্দ্র হার্জেব উদ্ভাবিত যন্ত্রের দু'ভাবে উন্নতি সাধন করলেন। হার্জের বৈদ্যুতিক উর্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কয়েক গজ, আর জগদীশচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত যন্ত্র হতে যে বৈদ্যুতিক উর্মি বের হয়ে এল তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব অল্প, এক ইঞ্চির ছ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই তবঙ্গ ধরবার জন্য জগদীশচন্দ্র এক নতুন ধরনের উপায় অবলম্বন করলেন; এই গ্রাহকযন্ত্রে এক টুকরা গ্যালিনাব উপব একটি সরু তাব এসে ঠেকেছে। বর্তমান যুগে বেতাব যন্ত্রেব 'ক্রিস্টাল সেট'-এ জগদীশচন্দ্র-উদ্ভাবিত পদ্ধতি অবলম্বিত হচ্ছে।

জগদীশচন্দ্র এখন বিভিন্ন পরীক্ষা আবম্ভ করলেন। তাঁর গ্রাহকযন্ত্রে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পড়লে যন্ত্রেব মধ্যস্থিত একটা কাঁটা নড়ে যাবে। একে কৃত্রিম চক্ষু বলা যেতে পারে। যে লণ্ঠনে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের উদ্ভব হচ্ছিল, তার মুখে একটি নল লাগিয়ে সেই নলের সোজা লাইনে ওই কৃত্রিম চক্ষু ধরলেন;চক্ষুর মধ্যে কাঁটা নড়ে উঠল। কৃত্রিম চক্ষু এক পাশে ধরা হল, কোনও উত্তেজনা-চিহ্ন দেখা গেল না। সুতরাং অদৃশ্য আলোক যে সরল রেখায় যায় তা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হল। তারপর আলোক যেমন দর্পণে প্রতিফলিত হয় ও প্রতিফলিত রশ্মি কয়েকটি নিয়ম পালন করে, জগদীশচন্দ্র দেখালেন, অদৃশ্য আলোক ঠিক সেই রকমই করে থাকে। কাচের মধ্যে দিয়ে চললে দৃশ্য আলো যেমন বেঁকে যায়, অদৃশ্য আলোও ঠিক সেই রকম বেঁকে। এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে করতে তিনি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। দৃশ্য আলোকের পক্ষে কাচ স্বচ্ছ, জল স্বচ্ছ, ইটপাটকেল অস্বচ্ছ, আলকাতরা ত বটেই। এই অদৃশ্য আলোক কিন্তু জলের মধ্যে দিয়ে যায় না, কিন্তু ইটপাটকেল, আলকাতরার মধ্যে দিয়ে অবাধে চলে যায়।

দৃশ্য আলোক কাচের মধ্যে প্রবেশ করে বেঁকে যায়, হীরকের মধ্যে আরও বেশি বাঁকে, আর এই কারণে আলোক ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা কাচ অপেক্ষা হীরকের বেশি। হীরকের ঔজ্জ্বল্যের এই হল কারণ;তাই হীরকের এত মূল্য। জগদীশচন্দ্র দেখলেন যে, দৃশ্য-আলোক সম্বন্ধে হীরকের যে ক্ষমতা, অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে চীনা মাটির ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশি। কল্পনায় মনে করা যেতে পারে এই অদৃশ্য আলোক একদিন মানব চক্ষুর দৃষ্টিগোচর হল। তখন মানবের কাছে চীনাবাসন হীরক অপেক্ষা উজ্জ্বল দেখাবে। তাই জগদীশচন্দ্র রহস্যের সঙ্গে এক জায়গায় লিখছেন —

"প্রথমবাব বিলাত যাইবার অভ্যাস্থ সংস্কার হেতু চীনাবাসন স্পর্শ করিতে ঘৃণা হইত। বিলাতে সম্ভ্রান্ত ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া দেখিলাম যে, দেওয়ালে বহুবিধ চীনাবাসন সাজানো রহিয়াছে। ইহার কী মূল্য যে এত যত্ন? প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, এখন বুঝিয়াছি। ইংরেজ ব্যবসাদার;অদৃশ্য আলো দৃশ্য হইলে চীনাবাসন অমূল্য হইয়া যাইবে। তখন তাহার তুলনায় হীরক কোথায় লাগে। সেদিন সৌখিন রমণীগণ হীরকমালা প্রত্যাখ্যান করিয়া পেয়ালা-পিরিচের মালা সগর্বে পরিধান করিবেন।"

এর পরের পরীক্ষাগুলি বিজ্ঞানীদের স্তম্ভিত করল। সাধারণত আলোক-তরঙ্গ সর্বমুখ,

কিন্তু টুর্মালিন প্রভৃতি স্ফটিকের ভিতর দিয়ে গেলে তা এক মুখ হয়ে বের হয়ে আসে। এই আলোর সামনে যদি আর একখানি টুর্মালিন ঠিক আগের মত ধরা যায় তবে তার মধ্যে দিয়ে ওই আলো যাবে; কিন্তু টুর্মালিনটা যদি আড় করে ৯০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে ধরা যায় তাহলে কিন্তু আলো তার ভিতর দিয়ে যাবে না। দৃশ্য আলোক ও অদৃশ্য আলোক যদি একজাতীয় হয় তবে অদৃশ্য আলোকেও অনুরূপ ঘটনা দেখা যাবে। জগদীশচন্দ্র তাঁর যন্ত্রে তাও দেখালেন। দৃশ্য আলোক সম্বন্ধে টুর্মালিন যা করে, তিনি দেখালেন যে, বেশি কিছু নয়, বহুপাতার একখানি পুস্তক ঠিক তাই করে থাকে। যে লণ্ঠন হতে অদৃশ্য আলোক বের হচ্ছিল তার সামনে তিনি একখানা মোটা বিশ্ববিদ্যালয়েব ক্যালেন্ডার ধরলেন, লম্বালম্বি করে; কৃত্রিম চক্ষুর দিকে আর একটি ক্যালেন্ডার ঠিক একইভাবে ধরা হল; কৃত্রিম চক্ষুর কাঁটা ঘুরল। কিন্তু প্রথম ক্যালেন্ডারটা ঠিক রেখে যেই দ্বিতীয় ক্যালেন্ডারটি ৯০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে আড়াআড়িভাবে ধরা হল তখন কৃত্রিম চক্ষু সাড়া দিল না, দ্বিতীয় ক্যালেন্ডার হতে কোনও তরঙ্গ বের হয়ে এল না। দৃশ্য আলোক সম্বন্ধে টুর্মালিনে ঠিক এই রকম ব্যাপারই ঘটেছিল।

দৃশ্য আলোক ও অদৃশ্য আলোক যে একজাতীয় জগদীশচন্দ্র কর্তৃক তা নিঃসংশয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হল।

জগদীশচন্দ্র যে কৃত্রিম চক্ষু তৈরি করলেন তাতে বিদ্যুৎতরঙ্গ পড়লে বিদ্যুৎস্রোত প্রবাহিত হয়, একটা কাঁটা ঘুরে যায়। কিন্তু এই বিদ্যুৎপ্রবাহ ত কাঁটা না ঘুরিয়ে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজাতে পারে, বারুদের স্তূপে আগুন ধরাতে পারে। আর ইটপাটকেলের মধ্যে দিয়ে যখন এই বিদ্যুৎতরঙ্গ যায় তখন মাঝের দেওয়াল ভেদ করে ও পার্শ্ববর্তী ঘরে ওই বিদ্যুৎতরঙ্গ ধাবিত হতে পারে; আর জগদীশচন্দ্র নির্মিত কৃত্রিম চক্ষু ত খুবই কাজেব, অতদূরে থেকেও নিশ্চয়ই তা সাড়া দেবে। ১৮৯৪ সনে নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি এক পরীক্ষার আয়োজন করলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঘর থেকে বিদ্যুৎতরঙ্গ বেরল, মাঝের দরজা বন্ধ, সে দরজা রক্ষা করছেন তাঁর পূর্বতন অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ; ঘর ভেদ করে পাশে অধ্যাপক পেডলারের ঘরে ওই বিদ্যুৎতরঙ্গ পৌঁছে একটা পিস্তল ছুড়ল।

পৃথিবীতে বিনা তারে বার্তা প্রেরণের এই হল সূচনা। এই বিষয়ে তিনি যে মার্কনির পূর্বগামী তা নিঃসংশয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর জগদীশচন্দ্রকে লিখিত অধ্যাপক লফোঁর চিঠির এই অংশ সেই সত্যকে ঘোষণা করছে —

"My dear Jagadish,

I would like to give a public lecture at St. Xavier College Hall on "Telegraphy without wires," but as the instruments you so kindly gave me are not in working order and as I would like to take this opportunity to vindicate your rights to priority over Marconi, would you assist me in my lecture with your presence and work your own instruments? Let me know as soon as possible as I intend inviting the Leiutenant Governor ......

Very sincerely yours,

E. Lafont S. J.

জগদীশচন্দ্রেব এই আবিষ্কাব কাহিনি সমস্ত জগতে প্রচাবিত হল। কিছুদিন পরে বাংলাব লেফটেন্যান্ট গবর্নব সাব উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জিব উপস্থিতিতে জগদীশচন্দ্র যে পরীক্ষা দেখালেন তাতে বিদ্যুৎতবঙ্গ দুটি রুদ্ধ ঘব ও পাট সাহেবেব বিপুল দেহ ভেদ কবে ৭৫ ফিট দূবে তৃতীয় ঘবে পৌঁছল, আব সেখানে একটা লোহাব গোল নিক্ষেপ কবল, পিস্তল আওয়াজ করল, বারুদস্তূপ উড়িয়ে দিল। এই পবীক্ষায় তিনি তাঁর যন্ত্রের সঙ্গে একটি দণ্ড লাগালেন আর তাব সঙ্গে একটি টিনের চাকতি আটকে দিলেন। এই হল প্রথম এরিয়াল (Aerial)। এবার তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এক মাইল দূরে তাঁর বাসভবনে বিদ্যুৎ তবঙ্গ পাঠাতে মনস্থ কবলেন কিন্তু অবিলম্বে তাঁকে বিদেশ যাত্রা কবতে হল।

হার্জের পব লজ, বিখি প্রভৃতি কয়েকজন বিজ্ঞানী বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধববার নানারকম যন্ত্র উদ্ভাবন কবেন, কিন্তু জগদীশচন্দ্রেব যন্ত্র শীর্ষস্থান অধিকাব করল। কেলভিন, র‍্যালে, জে জে টমসন, পযেনকেযাবেব কাছ থেকে তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা পেলেন। ইংলন্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিব বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে তিনি বক্তৃতা দিলেন, পবীক্ষা দেখালেন। ইংলন্ডের 'ইলেকট্রিসিযান' পত্রিকা লিখল — বর্তমান সমযে বিনাতাবে বার্তা প্রেরণ করবার যতগুলি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে জগদীশচন্দ্র বসুর যন্ত্র তাদের সকলকে হটিযে দিল।

১৮৯৪ সন হতে ১৮৯৯ সন পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র বিদ্যুৎ-তবঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা করেন। এব পব তাঁব গবেষণা অন্যদিকে চলে গেল। বিজ্ঞানী মার্কনি বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে ব্যবহারিক কাজে লাগাতে দ্রুত অগ্রসব হতে থাকলেন, আর ১৯০৭ সনে তিনি তারহীন সংবাদ প্রেবণ করবার পেটেন্ট নিলেন। মার্কনির দান সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র লিখছেন —

"তাঁহাব অত্যদ্ভুত অধ্যবসায় ও বিজ্ঞানের ব্যবহাবিক উন্নতি সাধনে কৃতিত্ব দ্বারা পৃথিবীতে এক নূতন যুগ প্রবর্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর ব্যবধান একেবাবে ঘুচিয়াছে। পূর্বে দূরদেশে কেবল টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরিত হইত, এখন বিনাতারে সর্বত্র সংবাদ পৌঁছিয়া থাকে।"

জড় ও জীবের সাড়া

১৮৯৯ সন থেকে ১৯০২ সন পর্যন্ত জগদীশচন্দ্রের গবেষণা হল, কী রকমে বাইরের উত্তেজনায় প্রাণী উদ্ভিদ ও জড় বিবিধ রকম সাড়া দেয। লোকের মনে একটা প্রশ্ন জাগে বিদ্যুৎ তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করতে করতে হঠাৎ তিনি ওই দিকের আলোচনায় মন দিলেন কেন? কিন্তু দেখা যাবে এতে তাঁর চিন্তাশক্তি একটা নির্দিষ্ট যুক্তির ধারা অনুসরণ করছে।

বিদ্যুৎতরঙ্গ নিয়ে কাজ করতে করতে তিনি লক্ষ্য করলেন, কৃত্রিম চক্ষুর সাড়ার পরিমাণ ক্রমশ ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। একবার নয়, দুবার নয়, বার বার, প্রতিবারই তিনি এই রকম লক্ষ্য করলেন। তবে কি প্রাণীর ন্যায় জড়েরও বাইরের ধাক্কা খেতে খেতে একটা ক্লান্তি, একটা অবসাদ এসে পড়ে? জগদীশচন্দ্র এখন এই আলোচনায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করলেন। কৃত্রিম চক্ষুর উপর বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পড়লে তার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ বইতে থাকে। কেন তা হয়? জগদীশচন্দ্র সিদ্ধান্ত করেন যে, চক্ষুমধ্যস্থ পদার্থের আণবিক পরিবর্তনের জন্য ওই রকম ঘটে। এই নিয়ে বিজ্ঞানী লজ-এর সঙ্গে তাঁর অনেক বাদানুবাদ হয়। শেষ অবধি জগদীশচন্দ্রের মত সর্বত্র গৃহীত হল। এখন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন

যে, এই আণবিক পরিবর্তন যদি বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা ঘটে থাকে তবে বাইরের অন্য রকমের উত্তেজনায় তা সম্ভব হবে, আর সেই পরিবর্তন ত সাড়ারূপে দেখা দিতে পারে। তখন তিনি জড়কে বিবিধ উত্তেজক অবসাদক প্রয়োগ করতে লাগলেন, তার তজ্জনিত সাড়া লিপিবদ্ধ করতে থাকলেন। এই লিপিবদ্ধ করবার প্রণালীও বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন যুগ আনল। এমন সব যন্ত্র তিনি নির্মাণ করতে লাগলেন যা চালালে জড়, উদ্ভিদ বা প্রাণীর সাড়া আপনা হতে লিপিবদ্ধ হতে থাকে। বিলাতে ডেভি-ফ্যারাডে পরীক্ষাগারে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে এই সব পরীক্ষা তিনি সেখানেই করতে থাকেন। আর এখানেই তিনি জড়, উদ্ভিদ, প্রাণীর সাড়া লিপির একতা লক্ষ্য করেন।

কয়েকটি সাড়া-লিপি নিয়ে তিনি কেমব্রিজের বিখ্যাত শারীর বিদ্যাবিশারদ সার মাইকেল ফস্টরের কাছে উপস্থিত হলেন। ফস্টর সেগুলো দেখে বললেন — এতে আশ্চর্য হবার কী আছে, বহুদিন থেকে লোক এসব জানে। জগদীশচন্দ্র বললেন — আপনি এগুলিকে কী মনে করছেন? ফস্টর উত্তর করলেন — কেন, কোনও পেশীর সাড়ালিপি। জগদীশচন্দ্র বললেন, না এটা একখণ্ড টিনের সাড়া-লিপি। টিন! — ফস্টর লাফিয়ে উঠলেন; অনেক আলোচনা চলল। ফস্টব রয়াল ইন্সিটিটিউশনে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন।

১৩০৮ সালের আষাঢ় সংখ্যা নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' জগদীশচন্দ্রের এই বক্তৃতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন এখানে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত হল।

"আচার্য জগদীশ জড় ও জীবের ঐক্যসেতু বিদ্যুতের আলোকে আবিষ্কার করিয়াছেন। আচার্যকে কোন কোন জীবতত্ত্ববিদ বলিয়াছিলেন, আপনি ত ধাতব পদার্থের কণা লইয়া এতদিন পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যদি আস্ত একখণ্ড ধাতুপদার্থকে চিম্‌টি কাটিয়া তাহার মধ্য হইতে এমন কোন লক্ষণ বাহির করিতে পারেন, জীবশরীরের চিম্‌টির সহিত যাহার কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে আমরা বুঝি!

"জগদীশবাবু ইহার উত্তর দিবার জন্য এক নূতন কল বাহির করিয়াছেন। জড়বস্তুকে চিমটি কাটিলে যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, এই কলের সাহায্যে তাহার 'পরিমাণ' স্বতঃ লিখিত হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের শরীরে চিমটির ফলে যে স্পন্দনরেখা পাওয়া যায়, তাহার সহিত এই লেখার কোনও প্রভেদ নাই।

"জীবনের স্পন্দন যেরূপ নাড়ী দ্বারা বোঝা যায়, সেইরূপ জড়েরও জীবনীশক্তির নাড়ীস্পন্দন এই কলে লিখিত হয়। জড়ের উপর বিষ প্রয়োগ করিলে তাহার স্পন্দন কীরূপে বিলুপ্ত হইয়া আসে, এই কলের দ্বারা তাহা চিত্রিত হইয়াছে।

"বিগত ১০ই মে তারিখে আচার্য জগদীশ রয়াল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতা করিতে আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক তাড়নায় জড় পদার্থের সাড়া (The response of inorganic matter to mechanical and electrical stimulus) এই সভায় ঘটনাক্রমে লর্ড রেলি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু প্রিন্স ক্রপট্‌কিন এবং বৈজ্ঞানিক সমাজের প্রতিষ্ঠাবান লোকেরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

"এই সভায় উপস্থিত কোন বিদুষী ইংরাজ মহিলা (সিস্টার নিবেদিতা) সভার যে বিবরণ আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, নিম্নে তাহা হইতে স্থানে স্থানে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"সন্ধ্যা নযটা বাজিলে দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং বসুজাযাকে লইয়া সভাপতি সভায় প্রবেশ করিলেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী অধ্যাপকপত্নীকে সাদবে অভ্যর্থনা করিল। তিনি অবগুণ্ঠনাবৃতা এবং শাড়ি ও ভাবতবর্ষীয় অলঙ্কারে সুশোভনা। তাঁহাদেব পশ্চাতে যশস্বী লোকেব দল এবং সর্ব পশ্চাতে আচার্য বসু নিজে। তিনি শান্ত নেত্রে একবার সমস্ত সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অতি স্বচ্ছন্দ সমাহিতভাবে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"তাঁহার পশ্চাতে রেখাঙ্কনচিহ্নিত বড় বড় পট টাঙানো বহিয়াছে। তাহাতে বিষপ্রয়োগে, শ্রান্তির অবস্থায় ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি আক্ষেপে, উত্তাপের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্নায়ু ও পেশীর এবং তাহার সহিত তুলনীয় ধাতুপদার্থেব স্পন্দনবেখা অঙ্কিত বহিযাছে। তাঁহাব সম্মুখের টেবিলে যন্ত্রোপকরণ সজ্জিত।

"তুমি জান, আচার্য বাগ্মী নহেন। বাক্য রচনা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য নহে;এবং তাঁহার বলিবার ধরনও আবেগে ও সাধ্বসে পূর্ণ। কিন্তু সে বাত্রে তাঁহার বাক্যের বাধা কোথায় অন্তর্ধান করিল। এত সহজে তাঁহাকে বলিতে আমি শুনি নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার পদবিন্যাস গাম্ভীর্যে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইযা উঠিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে তিনি সহাস্যে সুনিপুণ পরিহাস সহকারে অত্যন্ত উজ্জ্বল সরলভাবে বৈজ্ঞানিকব্যূহের মধ্যে অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগিলেন। তিনি রসায়ন পদার্থতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাপ্রশাখার ভেদ অত্যন্ত সহজ উপহাসেই যেন মিটাইয়া দিলেন।

"তাহার পবে, বিজ্ঞানশাস্ত্রে জীব ও জীবের মধ্যে যে সকল ভেদনিরূপক সংজ্ঞা ছিল, তাহা তিনি মাকড়সাব জালের মত ঝাড়িয়া ফেলিলেন। যাহার মৃত্যু সম্ভব, তাহাকেই ত জীবিত বলে, অধ্যাপক বসু একখণ্ড টিনের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে দাঁড় করাইয়া আমাদিগকে তাহার মরণাক্ষেপ দেখাইতে প্রস্তুত আছেন, এবং বিষপ্রয়োগে যখন তাহার অন্তিম দশা উপস্থিত, তখন ঔষধ প্রয়োগে পুনশ্চ তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে পারেন।

"অবশেষে অধ্যাপক যখন তাঁহার স্বনির্মিত কৃত্রিম চক্ষু সভার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং দেখাইলেন, আমাদের চক্ষু অপেক্ষা তাহাব শক্তি অধিক, তখন সকলের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

"ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহৎ ঐক্য অকুণ্ঠিতচিত্তে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই ঐক্য সংবাদ আধুনিককালের ভাষায় উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের কীরূপ পুলক সঞ্চার হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। মনে হইল যেন বক্তা নিজের নিজস্ব আবরণ পরিত্যাগ করিলেন, যেন তিনি অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন, — কেবল তাঁহার দেশ এবং তাঁহার জাতি আমাদের সম্মুখে উত্থিত হইল — এবং বক্তার নিম্নলিখিত উপসংহারভাগ যেন সেই তাহারই উক্তি!

"I have shown you this evening the autographic records of the history of stress and strain in both the living and non-living. How similar are the two sets of writings, so similiar indeed that you cannot tell them one from the other! They show you the waxing and waning pulsation, of life – the climax due to stimulants, the gradual decline

of fatigue, the rapid setting in of death-rigor from the toxic effect of poison.

"It was when I came on this mute witness of life and saw an all-prevading unity that finds together all things – the mote that thrills on ripples of light, the teeming life on earth and the radiant suns that shine on it – it was then that for the first time I understood the message proclaim by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago –

"They who behold the One, in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else.

"বৈজ্ঞানিকদের মনে উৎসাহ ও সমাজের অগ্রণীদের মধ্যে শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সভাস্থ দুই-একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ধীরে ধীরে আচার্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার উচ্চারিত বচনের জন্য ভক্তি ও বিস্ময় স্বীকার করিলেন।

"আমরা অনুভব করিলাম যে, এতদিন পরে ভারতবর্ষ — শিষ্যভাবেও নহে, সমকক্ষভাবেও নহে, গুরুভাবে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক সভায় উত্থিত হইয়া আপনার জ্ঞানশ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল — পদার্থতত্ত্ব জ্ঞানী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে যে প্রভেদ তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিল।

"লেখিকার পত্র হইতে সভার বিবরণ যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অহঙ্কার বোধ করি নাই। আমরা উপনিষদের দেবতাকে নমস্কার করিলাম;ভারতবর্ষের যে পুরাতন ঋষিগণ বলিয়াছেন, "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি", এই যাহা কিছু সমস্ত জগৎপ্রাণেই কম্পিত হইতেছে, সেই ঋষিমণ্ডলীকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া বলিলাম, হে জগদ্‌গুরুগণ, তোমাদের বাণী এখনও নিঃশেষিত হয় নাই, তোমাদের ভস্মাচ্ছন্ন হোমহুতাশন এখনও অনির্বাণ রহিয়াছে, এখনও তোমরা ভারতবর্ষের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছ! তোমরা আমাদিকে কৃতার্থতার পথে লইয়া যাইবে।"

১৯০৩ সন থেকে জগদীশচন্দ্র জীবের মধ্যে প্রাণীর ও উদ্ভিদের জীবনী-ক্রিয়া যে এক, বিবিধ পরীক্ষায় তা প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যাপৃত রইলেন, আর জীবনের শেষদিন অবধি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে এই কাজে নিয়োজিত রাখলেন। সেইটি হল তাঁর গবেষণার তৃতীয় পর্যায়।

□ *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৩০ নভেম্বর ১৯৫৮

ইতিহাস

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

প্রাচীন ভারতবর্ষেব যে ইতিহাস নেই এই ঘটনায় আমবা কখনও লজ্জা পাই, কখনও গর্ব করি। আর সব সভ্যজাতির লোকেরা তাদের জয়-পরাজয় কাজ-অকাজের নানা কাহিনি লিখে গেছে, প্রাচীন হিন্দু তা করে নি। এই স্বাতন্ত্র্যকে, মনের অবস্থা-মতো, আধ্যাত্মিকতার প্রমাণও বলা চলে, আবার ঐতিহাসিক বোধেব অভাবও বলা যায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতবাসীর কথা যাই হোক, নবীন ভারতবাসীর ইতিহাসকে উপেক্ষা করার জো নেই। আধ্যাত্মিকতাব দাবি তাদের পূর্বপুরুষদের ছেড়ে দিতে হয়েছে, সুতবাং আধুনিকতার দাবি আর ছাড়া চলে না, এবং ঐতিহাসিক বোধ হচ্ছে আধুনিকতাব একটা প্রধান লক্ষণ। নবীন ভাবতবাসীর প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুসন্ধানের চেষ্টার মধ্যে প্রাচীনেব উপর ঔৎসুক্য যতটা আছে, আধুনিকতার দৌড়ে পিছিয়ে পড়ার লজ্জা তার চেয়ে কম নেই।

লজ্জাব খাতিরে ইতিহাস-প্রীতি আমাদের অস্বাভাবিক অবস্থার আর পাঁচটা ফলের মতোই একটা অদ্ভুত ফল। প্রাচীন যুগের কথা শোনার মানুষের যে স্বাভাবিক আগ্রহ, আর ভবিষ্যৎ-মানুষকে নিজের কথা শোনাবাব যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, এই দুয়ে মিলে প্রকৃত ইতিহাসের সৃষ্টি। আজকের দিনের যেসব ছোটোখাটো তুচ্ছ ঘটনা, অখ্যাত মানুষের অকিঞ্চিৎকর কাহিনি, মানুষের চোখ ও মন স্বভাবতই এড়িয়ে যায়, হাজার বছর আগেকার ঠিক এমনি সব ব্যাপারের কথা শুনতে মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই। আবার হাজার বছর পরের মানুষের কাছে এইসব তুচ্ছ ঘটনা ও নগণ্য কাহিনিই কবির কথায় — 'সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।'

অতীতের আলো-ছায়ার খেলায় মানুষের মনে যে বিস্ময়রসের সৃষ্টি করে ইতিহাসের তাই প্রধান আকর্ষণ। আর ছবি এঁকে, মূর্তি গড়ে, অক্ষরে লিখে অনাগত কালকে নিজের কথা জানাবাব মানুষের যেসব উপায়, তাবাই ইতিহাসেব প্রধান উপকরণ। ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য না করে শুধু বর্তমানে আবদ্ধ মানুষের। যে ক্রিয়াকলাপ ও জীবনখাতা, তার প্রত্নখণ্ড দিয়ে ইতিহাসকে পরীক্ষা করা চলে, সৃষ্টি করা চলে না। মানুষ প্রাচীন ইতিহাস জানতে পারে, প্রাচীন কালের লোকেরা কোনো-না-কোনো উপায়ে সে ইতিহাস জানিয়ে গেছে বলে।

মানুষ অতীতের মধ্যে নিজেকে দেখতে চায়, ভবিষ্যৎকে নিজের স্পর্শ দিতে চায়। ইতিহাস এই আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তির উপায়। কিন্তু যারা ইতিহাস লেখে ও যারা ইতিহাস পড়ে তারা এ কথা মানতে রাজি নয় যে, ইতিহাসের কাজ মানুষ সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল মেটানো। তাদের মতে এতে ইতিহাসকে অতি খাটো ও খেলো করা হয়। যে জিনিস

মানুষের হাতে, হাতিয়ারের যে কাজ তার সাহায্য না করে, তার আবার মূল্য কী? সুতরাং তারা প্রমাণ করে যে ইতিহাস মানুষের মহা উপদেষ্টা। অতীতের আলো দিয়ে ইতিহাস বর্তমানের পথ দেখায়। 'বর্তমানের ঘটনা বা উদ্যোগ-অনুষ্ঠান অতীতের ঘটনাপ্রবাহের সহিত কার্য-কারণ সম্বন্ধে অচ্ছেদ্যরূপে বদ্ধ, মানবের সমাজগত জীবনের অখণ্ড ঘটনা-প্রবাহের প্রত্যক্ষ অংশ; সুতরাং বর্তমানের উদ্যোগ-অনুষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালিত করিতে হইলে অতীতের ইতিহাসের ধারা দেখিয়া শুনিয়া লওয়া, অর্থাৎ প্রচলিত কথায় যাহাকে বলে দেশ কাল পাত্র তাহা সাবধানে হিসাব করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া কর্মী মাত্রেরই কর্তব্য, নতুবা অনেক ভ্রম-প্রমাদ ঘটিতে পারে।'[১] বর্তমান যদি 'অতীত' কারণের কার্য হয়, অখণ্ড ঘটনাপ্রবাহের একটা অংশ মাত্র হয়, তবে ঐ প্রবাহের বেগে তা নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে ভেসে যাবেই। ইতিহাস সে দিকটা পূর্ব থেকে বলে দিতে পারে এ যদি সত্যও হয়, তবুও সে জ্ঞানের ফলে দিকের কোনো পরিবর্তন ঘটার কথা নয়। স্রোতের টানে কোথায় যাচ্ছি তা জানা থাকলেই সে গতিকে কিছু নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। আর কর্মীরা যে দেশ-কাল-পাত্রের হিসাব করে কর্মে সফলতা লাভ করে তা বর্তমান দেশ, বর্তমান কাল ও বর্তমান পাত্র। সে বর্তমানের অতীত ইতিহাস অবশ্য আছে, কিন্তু কর্মীর যা সাবধানে হিসাব করতে হয় তা ঐ ইতিহাস নয়, ইতিহাসের ফলে যে বর্তমান গড়ে উঠেছে সেই বর্তমান। যাকে পাথর কাটতে হয়, পাথরের গড়ন জানা তার দরকার। কিন্তু সে গড়নের যে ইতিহাস ভূতত্ত্ব থেকে জানা যায় তাতে তার প্রয়োজন হয় না। আর ভূতত্ত্বের পণ্ডিত যে পাথর কাটার কাজে অন্যের চেয়ে সহজে ওস্তাদি লাভ করতে পারে এ কথা অবশ্য কেউ বিশ্বাস করে না। পৃথিবীর বড় কর্মীরা সকলেই নিজের প্রতিভার আলোতে বর্তমানকে চিনে নিয়েছে, ইতিহাসের আলোতে নয়।

প্রাচীন ইতিহাসের যে বর্তমানকে চেনাবার শক্তি কত কম ঐতিহাসিক গিবন তার একটা 'ক্লাসিক' উদাহরণ রেখে গেছেন।

এডোয়ার্ড গিবনের তুলি রোম-সাম্রাজ্য-ধ্বংসের বারো শো বছরের যে ইতিহাস এঁকেছে, তার মতো প্রকাণ্ড ও জটিল ঐতিহাসিক চিত্র আর কোনো ঐতিহাসিক কখনও আঁকে নি। এই বহু জন, বহু জাতি ও বহু ঘটনা সংঘাতের বিচিত্র কাহিনির বর্ণনায় গিবন মানব-সমাজের স্থিতি গতি ও ধ্বংসের যে উদার গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন সকল ঐতিহাসিকের তা চিরদিন বিস্ময় জাগাবে। গিবন রোমান সাম্রাজ্য থেকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাঁর সমসাময়িক ইউরোপীয় রাজ্যগুলির দিকে তাকিয়েছেন। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের ইতিহাস শেষ করে গিবন লিখছেন : '..... and we may inquire, with anxious curiosity, whether Europe is still threatened with a repetition of those calamities which formerly oppressed the aims and institutions of Rome. Perhaps the same reflections will illustrate the fall of that mighty empire, and explain the probable causes of our actual

১. রমাপ্রসাদ চন্দ, "ভূত ও বর্তমান", 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪।

security' এবং এই পরীক্ষার ফলে গিবনেব মনে হয়েছে যে, তাঁর সমসাময়িক ইউরোপের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা মোটামুটি দৃঢ় ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে আছে : 'The abuses of tyranny are restrained by the mutual influence of fear and shame; republics have acquired order and stability; monarchies have imbibed the principle of freedom, or at least of moderation.' গিবন তাঁর ইতিহাস লিখে শেষ করেন ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ ফরাসি বিপ্লবের দু বছর পূর্বে। তাঁর সমসাময়িক ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে যে বিপ্লবের আগ্নেয়গিরির পাথর-গলা আরম্ভ হয়েছে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ গিবনের মনে হয় নি। রোম-সাম্রাজ্য-ধ্বংসের ইতিহাস তাঁর বর্তমানের দৃষ্টিকে কিছুমাত্র তীক্ষ্ণতর করে নি। যে ঐতিহাসিক ইতিহাস জ্ঞানের জোরে বর্তমানকে উপদেশ দিতে সাহস করেন তাঁর একবার ভেবে দেখা ভালো যে, তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টি গিবনের চেয়ে সূক্ষ্মতর কি না।

২

বর্তমান যে অতীতের ইতিহাসকে কাজে লাগায় না তা নয়। বর্তমানের কাজে মানুষ প্রাচীন ইতিহাস অনেক সময়েই ডেকে আনে; কিন্তু সে উপদেশ লাভের জন্য নয় অতীতকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়স্বরূপ অস্ত্রের মতো ব্যবহারের জন্য। ইতিহাসে যা এর অনুকূল লোকে তাকে প্রচার করে; যা প্রতিকূল তার দিকে চোখ বুজে থাকে। ইংলন্ডের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পলিটিশ্যানেরা দেশের প্রাচীন ইতিহাস থেকে নজির তুলে রাজশক্তির বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বত্ব ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে ইতিহাস যে সব সময়েই সত্য ইতিহাস, তার ব্যাখ্যা যে সকল সময়েই নির্ভুল ব্যাখ্যা হত — এ কথা এখন কোনো ঐতিহাসিক স্বীকার করবে না। কিন্তু ঐ ইতিহাসই ছিল সেদিনের কাজের ইতিহাস। বিশুদ্ধ ও নির্ভুল ইতিহাসে সেদিনকার কাজ চলত না, কাজ অচল হত; এর উদাহবণের জন্য সাগর-পারে যাবার প্রয়োজনও নেই। বর্তমান হিন্দুসমাজের যাঁরা সংস্কার চান আজ তাঁরা হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাস থেকে নজির আনছেন, আর যাঁরা সে সংস্কারকে বন্ধ রাখতে চান তাঁরাও ঐ ইতিহাস থেকেই নজির তুলছেন। এর কোনো ইতিহাসই সম্পূর্ণ সত্য নয় বা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। গোটা প্রাচীন ইতিহাসকে কোনো কাজে লাগানো যায় না, তা থেকে অংশবিশেষ বেছে নিতে হয়। কে কোন্ অংশ বেছে নেবে তা ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার গরজের উপর।

৩

যাকে 'ঐতিহাসিক সত্য' বলা হয় — যা থেকে মানুষ তার বর্তমান গতিবিধি সম্বন্ধে মূল্যবান উপদেশ পায় বলে অনেকের বিশ্বাস — তার স্বরূপটি কী? যা ঘটে গেছে সেই ঘটনার তথ্য নির্ণয় 'ঐতিহাসিক সত্য' নয়, প্রত্নতত্ত্ব মাত্র। ইতিহাস থেকে যারা উপদেশ চায় তারা ধরে নেয়, সে ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্যের মধ্যে তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে, যাকে ঘটনার বিশেষত্ব থেকে মুক্ত করে অবিশেষ সাধারণ সত্য বলে ব্যবহার করা চলে। ঐতিহাসিকের

সবচেয়ে বড় কাজ, প্রত্নতত্ত্বের তথ্য থেকে এই ঐতিহাসিক সত্য বা তত্ত্বের আবিষ্কার করা। প্রতি ইতিহাসের মধ্যেই কোনো-না-কোনো তত্ত্ব আছে। যথার্থ ঐতিহাসিকের চোখে সে তত্ত্ব ধরা পড়ে।

সমসাময়িক ঘটনা, অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতৃদের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ও মত এক নয়। এদের মূল্য ও ভালোমন্দ বিচারে মতভেদের অন্ত নেই। বর্তমান থেকে অতীতের কোঠায় গেলেই যে এদের মূল্য সবার চোখে এক দেখাবে, এদের বিচারে মতভেদের অবসর থাকবে না, এমন বিশ্বাসের কারণ কী? বর্তমানের ঘটনা নিয়ে অনেক তর্ক যে ভবিষ্যতের ঘটনা দিয়ে মীমাংসা হয় সে কথা সত্য, কিন্তু ঘটনা থেকে যে তত্ত্বোপদেশের আশা করা হয় তার তর্কের অবসান নেই। কারণ একই ইতিহাস সকলের চোখে ও সকল সময়ের চোখে একরূপ নয়। মানুষের মনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, ভাব ও চিন্তার পরিবর্তনের সঙ্গে ইতিহাসেরও মূর্তিপরিবর্তন হয়। মানুষের যাত্রাপথের প্রতি বাঁক থেকে পিছনের ইতিহাসের চেহারা বিভিন্ন দেখায় — যেমন পাহাড়-পথের যাত্রী পথের নানা স্থান থেকে সমতলভূমির নানা চেহারা দেখে। এর কোন্ চেহারা সত্য, কোন্ চেহারা মিথ্যা? প্রতি যুগের মানুষ ইতিহাসকে নূতন করে লিখছে ও নূতন করে লিখবে। ইতিহাসের এই নূতন নূতন রূপের কোনো রূপই মিথ্যা নয়, কারণ ও সব রূপই ব্যবহারিক অর্থাৎ আপেক্ষিক। ইতিহাসের কোনো পারমার্থিক রূপ নেই। ইতিহাসের ঘটনানির্ণয়ের শেষ থাকতে পারে, কিন্তু তার ব্যাখ্যার কখনও শেষ হবে না।

ইতিহাসকে যারা উপদেশের খনি মনে করে তারা তার এই রূপ-পরিবর্তনের কথাটা ভুলে থাকে। অথচ ইতিহাস সম্বন্ধে এর চেয়ে সহজ সত্য আর কী আছে। কোন্ বড় ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা ব্যক্তির বিচারে ঐতিহাসিকেরা একমত? বেশি উদাহরণের প্রয়োজন নেই, এক ফরাসি বিপ্লব ও তার কর্মীদের যে সব ইতিহাস লেখা হয়েছে ও হচ্ছে, তার কথা মনে করলেই যথেষ্ট হবে। ইতিহাসের ঘটনা ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদাহরণ নয়। ও তত্ত্ব মানুষ নিজের মনে মনে গড়ে নেয়, অর্থাৎ যার যেমন মন সে তেমনি তত্ত্ব ইতিহাসের মধ্যে খুঁজে পায়। ইতিহাসের যে উপদেশ তা ইতিহাস থেকে মানুষের মনে আসে না, মানুষ নিজের মন থেকে ইতিহাসে তা আরোপ করে।

৪

মানব-সমাজের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় তার জীবনের প্রয়োজনে। মানুষের আশা ও ভয়, বর্তমানের চাপ ও ভবিষ্যতের কল্পনা, তার জীবনের পথ কেটে চলেছে। ইতিহাসের কাজ জীবনের এই বিচিত্র লীলাকে দর্শন করা, মনন করা, নিদিধ্যাসন করা। যেসব তত্ত্ব দিয়ে মানুষ জীবনকে ব্যাখ্যা করতে চায়, জীবন তাদের চেয়ে অনেক জটিল। তাই কোনো ঐতিহাসিক তত্ত্বই ইতিহাসের চরম ব্যাখ্যা দিতে পারে না, এবং এক আংশিক ব্যাখ্যায় অসন্তুষ্ট হয়ে ঐতিহাসিকেরা অন্য এক আংশিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। ইতিহাস-জ্ঞানের চরম লাভ, মানবসমাজের গতি ও পরিণতির এই রহস্যলীলার সঙ্গে পরিচয়। যে ইতিহাস পাঠকের মনে এই রহস্যের বোধকে জাগিয়ে তোলে সেই ইতিহাসই যথার্থ ইতিহাস। বাকি সব হয়

গল্প নয় প্রপাগাণ্ডা। ইতিহাস জীবনলীলাব কাব্য। যার চোখে আর্টিস্টের উদার দৃষ্টি নেই, আজকের দিনের ভালোমন্দ-রাগবিবাগের উপরে উঠে মানুষের জীবনধারাকে যে দেখতে জানে না, তার ঐতিহাসিক হবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। আর ইতিহাসের প্রতি পাতায় যারা উপদেশ খোঁজে তাদের বিশ্বাস, ইতিহাস হচ্ছে কথামালারই জ্ঞাতি-ভাই।

৫

ইতিহাস কার্যকারণ সম্বন্ধ দিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা করে। তার অর্থ এ নয় যে, মানুষ সমাজে ও জীবনে নূতন কিছু ঘটাতে পাবে না;তার বর্তমান তার অতীতেব কার্য মাত্র, আর তার ভবিষ্যৎ তার বর্তমানের অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা যখন ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলে চালাতে চান তখন এমনি একটা ধারণা তাঁদের ভাবনার মধ্যে গুপ্ত থাকে। সাদা চোখে অবশ্য আমরা সবাই দেখি যে, মানুষ তার জীবনে নিত্য এমনসব ঘটনা ঘটাচ্ছে যা তাব অতীত ও বর্তমান থেকে কেউ কখনও অনুমান করতে পারত না। ঘটনা যখন ঘটে যায় তখন কার্যকারণ সম্বন্ধ দিয়ে তার ব্যাখ্যাও সম্ভব হয। কিন্তু তত্ত্বের খাতিরে সত্যকে উপেক্ষা না করলে সহজেই বোঝা যায় যে, কার্যকারণের ব্যাখ্যা পেলেই নূতনের অভিনবত্ব দূব হয না। মানুষের ইতিহাসে যেগুলি তার গৌরবের অধ্যায় তার অনেক ঘটনাকে মানুষ ঘটিয়েছে অতীতকে অতিক্রম করে, বর্তমানকে নাকচ করে — ইতিহাসকে ধরে থেকে নয়।

বাঙালি ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের যে প্রবন্ধ থেকে পূর্বে বচন তুলেছি তাতে তিনি 'কার্যক্ষেত্রে ঐতিহাসিক হিসাব-কিতাবের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য' যে দুটি উদাহরণ দিয়েছেন তার প্রথম উদাহরণ, 'অস্পৃশ্যতা বর্জন', নিয়ে পরীক্ষা করা যাক। চন্দমহাশয় 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে কয়েকটি ঘটনা তুলে প্রমাণ করেছেন যে, 'অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলে উভয় পক্ষই পাপভাগী হইবে, এইপ্রকার বিশ্বাস অস্পৃশ্যতাব মূল।' এবং তিনি বলেন, 'এইপ্রকার বিশ্বাস হিন্দু সাধারণের মধ্যে এখন খুব দুর্বল হইলেও, ইহাব বীজ যে এখনও হিন্দুর মনের ভিতব হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না।' এর শেষ সত্যটি ঐতিহাসিক সত্য নয়, বর্তমান কালের কথা। যাব চোখ আছে সে, চৈতন্যচরিতামৃত পড়া না থাকলেও, বর্তমান হিন্দুসমাজ দেখে এ তথ্য জানতে পারবে। যার সে চোখ নেই চৈতন্যচরিতামৃত তার এ কাজে কোনো সাহায্য করবে না। তার পর চন্দমহাশয় বলেছেন, 'ধর্মবিশ্বাস অপেক্ষাও অস্পৃশ্যতার প্রবলতর সহায় জাত্যভিমান। ইউবোপ এবং আমেরিকা প্রত্যাগত অনেকের হিন্দুজাতিতে উঠিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে বুঝিতে পারা যায় জাত্যভিমান কি প্রবল পদার্থ।' চন্দমহাশয় প্রশ্ন করেছেন, 'এই প্রবর্ধমান ব্যাধির আরোগ্যের উপায় কি?' এবং উত্তর দিয়েছেন, 'আমার মনে হয়, এই ব্যাধির আরোগ্যের প্রধান উপায়, যথাবিধি সামাজিক রীতিনীতির ইতিহাস অনুশীলন এবং জনসাধারণকে ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক হিসাবে এইসকল বিষয়ের বিচার কবিতে শিক্ষা দেওয়া।'

ঐতিহাসিক অনুশীলন ও বৈজ্ঞানিক বিচার যে কী উপায়ে অপচীয়মান ধর্মবিশ্বাস ও প্রবর্ধমান জাত্যভিমানের ধ্বংস করবে চন্দমহাশয় তা কিছু বলেন নি। ইতিহাস অনুশীলনে হয়তো পাওয়া যাবে যে, মানুষের সমাজে বড়-ছোটর বোধ সভ্যতার সঙ্গে একবয়সি। আর

ঐ ভেদকে অবলম্বন করেই সভ্যতার ইমারত গাঁথা আরম্ভ হয়েছিল। এ বোধ বা জাত্যভিমান যা হোক কিছু-একটাকে অবলম্বন করে চিরদিন মানুষের সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর 'যথাবিধি' ঐতিহাসিক শিক্ষাটি কী? এ ভেদকে দূর করলে সভ্যতার মন্দির ভেঙে পড়বে, না সভ্যতার মন্দির এতটা গড়ে উঠেছে যে ও 'স্কাফোল্‌ডিং' এখন সরিয়ে নেওয়া চলে? এর কোনো অনুমানকেই কি অনৈতিহাসিক বলা যায়? আর যদি বলাও যায় তবে ইতিহাসের তর্কে হেরে এক মতের লোক অন্য মতের চালে চলবে এ মনে করা মানব-চরিত্রের সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় নয়। লেনিন ও মুসোলিনির দ্বন্দ্ব যে ঐতিহাসিক সম্মিলনীতে মীমাংসা হবে এ স্বপ্ন ঐতিহাসিকেও কখনও দেখে না। আর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় কি সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন যে 'অ্যানথ্রপলজি' থেকে মানুষ সমাজ-সংস্কারের প্রেরণা পাবে?

চন্দমহাশয় চৈতন্যচরিতামৃতের যেসব ঘটনা তুলেছেন তার প্রধান কথা, শ্রীচৈতন্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের ধর্ম-সংস্কারকে নিজে বিন্দুমাত্র মানতেন না।

'মোরে না ছুঁইহ প্রভু পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচ জাতি অধম আর কণ্ডুরস গায়॥
বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥"

এ যে 'ঐতিহাসিক অনুশীলন' বা 'বৈজ্ঞানিক বিচার'-এর ফল নয় তা চন্দমহাশয়কেও স্বীকার করতে হবে। চৈতন্যের যেসব ভক্তে তাঁর পাণ্ডিত্যের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন তাঁরাও তাঁদের তালিকায় ইতিহাস ও বিজ্ঞানের নাম উল্লেখ করেন নি। মহাপ্রভু 'কণ্ডুক্লেদ গায়' অস্পৃশ্যকে আলিঙ্গন দিয়েছিলেন ইতিহাস অনুশীলন করে নয়, সমস্ত ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করে।

সমাজে নূতন কিছু আনতে হলে শ্রীচৈতন্যের প্রয়োজন হয়। ইতিহাস-অনুসন্ধান-সমিতি দিয়ে সে কাজ চলে না। মানুষ জীবনের টানে এগিয়ে চলে, সৃষ্টির প্রেরণার নূতন সৃষ্টি করে। ইতিহাস জীবনের এই সৃষ্টিলীলার দর্শক। এ লীলার কলাকৌশল বুঝলেই সৃষ্টির ক্ষমতা আসে না, যেমন কাব্য বুঝলেই কবি হওয়া যায় না। তা যদি হত তবে মম্‌সেন ইতিহাসের পুঁথি না লিখে একটা রাজ্যস্থাপন করতেন, আর ব্র্যাড্‌লির হাতে আর একখানা হ্যাম্‌লেট লেখা হত।

□ *ইতিহাসের মুক্তি*, ১৯৫৭

আমাদের ভাষাসমস্যা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

আমরা বঙ্গদেশবাসী। আমাদের কথাবার্তার, ভয় ভালোবাসার চিন্তাকল্পনার ভাষা বাংলা। তাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। দুঃখের বিষয়, জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় এই সোজা কথাটিকেও আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দিলেও তাঁহারা জোর করিয়া বুঝিতে চাহেন না। তাই মধ্যে মধ্যে আমাদের মাতৃভাষা কী কিংবা কী হইবে, তাহার আলোচনা সাময়িক পত্রিকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। হা আমাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি।

মাতৃভাষা ব্যতীত আব কোন ভাষা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া পরান আকুল কবে? মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন্ ভাষার ধ্বনির জন্য প্রবাসীর কান পিয়াসি থাকে? মাতৃভাষা ব্যতীত আব কোন্ ভাষায় কল্পনা-সুন্দরী তাহার মন-মজানো ভাবের ছবি আঁকে? কাহাব হৃদয এত পাষাণ যে মাতৃভাষার অনুরাগ তাহাতে জাগে না? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোনও জাতি কখনও কি বড় হইতে পাবিযাছে? আরব পারস্যকে জয় করিয়াছিল। পারস্য আরবের ধর্মের নিকট মাথা নিচু করিয়াছিল, কিন্তু আরবের ভাষা লয় নাই; শুধু লইয়াছিল, উহার ধর্মভাব আর কতকগুলি শব্দ তাই আনোয়ারী, ফারদৌসী, সাদী, হাফিয, নিযামী, যামী, সানাই, রুমী প্রমুখ কবি ও সাধক বুলবুল কুলের কলতানে আজ ইরানের কুঞ্জকানন মুখরিত। যে দিন ওয়াইক্লিফ লাটিন ছাড়িয়া ইংরাজি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিলেন, সেই দিন ইংরাজের ভাগ্য-লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইল। যতদিন পর্যন্ত জর্মানিতে জর্মান ভাষা অসভ্য ভাষা বলিয়া পরিগণিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত জর্মানির জাতীয় জীবনের বিকাশ হয় নাই। বেশি দূর যাইতে হইবে না। আমাদেরই প্রতিবেশী আমাদের হিন্দুস্থানি মুসলমান ভাইগণ সংখ্যায় এত অল্প হইয়াও এত উন্নত কেন? আর আমরা সংখ্যায় এত বেশি হইয়াও এত অবনত কেন? ইহার একমাত্র কারণ তাঁহারা মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত আর আমরা মাতৃভাষার প্রতি বিরক্ত। হিন্দুস্থানি আলিমগণ উর্দু ভাষায় কোরআনশরীফের অনুবাদ এবং তফসীর, ফিকহ্, হদীস, তসউউফ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া কিংবা এতদ্বিষয়ক আরবি, পারসি ও ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া উর্দু ভাষায় সর্বাঙ্গসুন্দর ইসলামি সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু দুই চারিজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত আমাদের মৌলবি মৌলানাগণ বঙ্গ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা দূরে থাকুক, বঙ্গভাষা কাফেরী ভাষা, তাহাতে ধর্ম গ্রন্থের অনুবাদ করিলে ধর্ম-গ্রন্থের অমর্যাদা করা হয় ইত্যাদি রূপ প্রলাপ উক্তি

করিতে ছাড়েন না। বিশুদ্ধ রূপে বাংলা বলা বা লেখা তাঁহারা অপবাদজনক মনে করেন। ফলে তাঁহাদের ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা শুনিয়া সামান্য বাংলা-জানা শ্রোতারা পর্যন্ত হাসিবে কি কাঁদিবে, তাহা ঠিক করিতে পারে না। তাঁহাদের বাংলা ভাষায় যেমন দখল উর্দুতেও তেমন। স্কুলের ন্যায় যে পর্যন্ত বাংলার মাদ্রাসায়ও বাংলা ভাষা অবশ্যপাঠ্য দেশীয় ভাষা রূপে স্থান না পাইবে, সে পর্যন্ত আমাদের এ দুরবস্থা ঘুচিবে না। যে পর্যন্ত আরবি পারসি জানা মুসলমান লেখক বাংলা ভাষার সেবায় কলম না ধরিবেন, সে পর্যন্ত কিছুতেই বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য গঠিত হইবে না।

সে দিন অতি নিকট, যে দিন বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভাষার স্থান অধিকার করিবে। বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার মতন সৃষ্টিছাড়া প্রথা কখনও টিকিতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত তাহা না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত আমাদিগকে একটি সময়োপযোগী শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। স্কুলের ছাত্রদের জন্য তৃতীয় মান পর্যন্ত কেবলমাত্র বাংলা থাকিবে। চতুর্থ মান হইতে ইংরাজি আরম্ভ হইবে। পঞ্চম মান হইতে classical language শুরু হইবে। মুসলমান ছাত্রের পক্ষে কোন্ classical language লওয়া উচিত, ইহার উত্তরে প্রত্যেক মুসলমান এক বাক্যে বলিতে বাধ্য হইবেন — আরবি। আল্লাহ্-র শেষ প্রত্যাদেশ আরবিতে। আল্লাহ্‌র শেষ নবি আরবি। আমরা সেই নবির উম্মত (মণ্ডলী)। সেই শেষ প্রত্যাদেশের উত্তরাধিকারী। অনুবাদে মূলের ছায়া পাওয়া যায় মাত্র; মূলের প্রাণ অনুবাদে থাকিতে পারে না। যদি ইসলাম ধর্মকে তাহার প্রাথমিক যুগের অনাবিল অবস্থায় বজায় রাখা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, যদি শত দেশ ভেদ এবং সহস্র ভাষাভেদ সত্ত্বেও ইসলামের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তবে মুসলমানকে তাহার কোরআন হাদীস মূল ভাষায় পড়িতে হইবে, পড়িয়া বুঝিতে হইবে, বুঝিয়া মজিতে হইবে। যদি মরুকে নগর করিবার, পশুকে মানুষ করিবার, অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করিবার, কাঙ্গালকে আমীর করিবার, ভীরুকে বীর করিবার, আমোঘ মন্ত্র শিখিতে চাও তবে আরবি কোরআন শিখ। যেমন প্রত্যেক খ্রিস্টান বালক তাহার বাইবেল জানে, যে পর্যন্ত মুসলমান বালক তেমনই তাহার কোরআন শরীফকে না জানিবে, সে পর্যন্ত মুসলমান সমাজ জাগিবে না। সমস্ত জগতের বদলে যে মুসলমান তাহার কোরআন ছাড়িতে প্রস্তুত ছিল না, আজ দেখ সেই মুসলমান সন্তান সংস্কৃত, পারসি কিংবা পালি ভাষার বিনিময়ে কিরূপে তাহার কোনআনকে বর্জন করিতেছে। হা ধিক্ আমাদের মৌখিক ধর্মানুরাগকে! হা ধিক্ আমাদের দুনিয়া-পুজাকে! আমি বলি না মুসলমান কূপমণ্ডুক হইয়া কেবল আরবি সাহিত্যই আলোচনা করিবে। জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার মুসলমানেরই জন্য। ধর্মগুরু এইরূপ বলিয়াছেন যে, "বিজ্ঞান মুসলমানের হারান ধন, যেখানে পাও তাহাকে গ্রহণ কর।" পুনশ্চ, "জ্ঞান অনুসন্ধান কর, যদিও তাহা চীন দেশে হয়।" আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই আগে ঘরের খবর জান, পরে পরের খবর জানিও।

স্কুলের ন্যায় মাদ্রাসায়ও দেশীয় ভাষা, প্রধান ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা এই তিন ভাষার চর্চা হইবে। মাদ্রাসাতেও স্কুলের ন্যায় ১ম হইতে ১০ম পর্যন্ত দশ মানে জুনিয়ার বিভাগ এবং ১ম বর্ষ হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত ছয় বর্ষে সিনিয়ার বিভাগ রাখিতে হইবে। ১ম ২য় ও তৃতীয়

মানে কেবল মাত্র বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে। চতুর্থ মান হইতে আরবি ভাষা এবং পঞ্চম মান হইতে দ্বিতীয় ভাষা আরম্ভ হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, দ্বিতীয় ভাষা কী হওয়া উচিত? আমি বলি ইংরাজি। ইংরাজি ভাষার সাহায্যে আমাদের মৌলবি সাহেবগণ আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞানেব তত্ত্ব পাইবেন। যদি আমাদেব আলিমকুল কুফূরী ফৎওযারূপ প্রচণ্ড দণ্ড দ্বারা আমাদেব ইংরাজি শিক্ষিত সমাজকে ভীতচকিত ও দলিতমথিত করিয়া ইসলামের অপ্রতিহত ক্ষমতার পরিচয় দিতে না গিয়া, বাস্তবিক তাহাদের হৃদয়রাজ্যে ভক্তির আসন লাভ করিতে চান; যদি তাঁহারা ক্রমবর্ধনশীল শিক্ষিত সমাজকে ইসলামের গণ্ডি হইতে খাবিজ কবিযা না দিয়া তাহাদের প্রকৃত ধর্মোপদেশক হইতে চান, তবে তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপক্ব হইতেই হইবে। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে বলিলে যাঁহাদের মতে অতি ভালো মুসলমানও কাফের হইয়া যায়, পৃথিবী মাছের পিঠে আছে, পৃথিবীর চারিদিকে কাফ পাহাড় দিয়া ঘেরা ইত্যাদিরূপ বালকোচিত মত যাঁহারা আজও গম্ভীরভাবে প্রচার করেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সমস্ত ধার্মিকতা সত্ত্বেও শিক্ষিত সমাজ ভক্তি করিতে অক্ষম।

স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা সর্বত্রই উর্দু বা পারসি বৈকল্পিক বিষয় (optional subject) থাকিলে মুসলমান ছাত্রগণের ভাষা সমস্যার সমাধান হয়। যাহাতে উর্দু বা পারসি বৈকল্পিক বিষয় হইতে পারে, তজ্জন্য আমাদিগকে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণকে সম্মত করাইতে হইবে।

অনেক দিন পূর্বে উর্দু বনাম বাংলা মোকদ্দমা বাংলার মুসলমান সমাজের ভিতর উঠিয়াছিল, তাহাতে বাংলার ডিক্রি হইয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া যায়; বর্তমানে আবার সেই মোকদ্দমার ছানি বিচারের জন্য উর্দু পক্ষকে বিস্তর সওয়াল জওয়াব করিতে শুনিতেছি। কিন্তু ন্যায়বান্ বিচারক দেখিবেন যে উর্দু বাংলার দখল উত্যক্তে কিছুতেই খাস দখল পাইতে পারে না; দখল বাংলারই থাকিবে, তবে উর্দু বাংলার অধীনে উপযুক্ত করে ইচ্ছাধীন প্রজাই স্বত্বে কিছু ভূমি বন্দোবস্ত পাইতে পারে মাত্র।

বাংলা ভাষা চাই-ই। মুহম্মদ ই-বখতিয়ারের বাংলা জয়ের পরে যখন হইতে মুসলমান বুঝিল এই চিরহরিত ফলশস্যা-পূরিতা নদ-নদী ভূষিতা বঙ্গভূমি শুধু জয় করিয়া ফেলিয়া যাইবার জিনিস নহে; এদেশ কর্মের জন্য, এ দেশ ভোগের জন্য, এ দেশ জীবনের জন্য, এ দেশ মরণের জন্য, তখন হইতে মুসলমান জানিয়াছে বাংলা চাই। তাই বাংলার পাঠান বাদশাহগণ বাংলা ভাষাকে আদর করিতে লাগিলেন। যে ভাষা দেশের উচ্চ শ্রেণীর অবজ্ঞাত ছিল, তাহা বাদশাহের দরবারে ঠাঁই পাইল। নসরৎ শাহ, হোসেন শাহ্, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁর নাম বাঙালি ভুলিতে পারিবে না। বাদশাহের দেখাদেখি আমির ওমরা বাংলার খাতির করিলেন। আমির ওমরার দেখাদেখি সাধারণে বাংলার আদব করিল। গোঁড়া ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত ও চোখ রাঙানিকে ভয় না করিয়া বাঙালি নবীন উৎসাহে তাঁহার প্রিয় ধর্ম পুস্তকগুলি বাংলায় অনুবাদ করিল, কত দেশ প্রচলিত ধর্মকথা বাংলায় প্রকাশ করিল, কত মর্মগাথা বাংলায প্রচার কবিল। মুসলমানও চুপ করিয়া থাকে নাই। হিন্দুর রামায়ণ আছে; মুসলমানের "জঙ্গ নামা" আছে। হিন্দুর

মহাভারত আছে, মুসলমানেব "কাসাসোল আম্বিয়া" আছে। হিন্দুর মহাজন পদাবলি আছে; মুসলমানেব মারফতী গান আছে। হিন্দুর বিদ্যাসুন্দর আছে; মুসলমানেব "পদ্মাবতী" আছে।

এই পুথি সাহিত্যকে ঘৃণা করিলে চলিবে না। ইহাই বাঙালি মুসলমানের খাঁটি সাহিত্য। সেই সময়ের কথিত ভাষায় পুথিগুলি রচিত হইয়াছিল। তখন পারসি রাজ-ভাষা। মুসলমানেরা বাংলা দেশে নূতন ভাব ও নূতন জিনিস আনিয়াছিলেন। এই নূতন ভাব ও নূতন জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পারসি নাম বাংলা ভাষায় ঢুকিয়া পডিল। রাজভাষার প্রভাব কথিত ভাষার উপব হওযা স্বাভাবিক। এখন যেমন বাঙালি চলিত ভাষায় ইংবাজিব বুকনি ঝাড়েন, তখন ঝাড়িতেন পারসির বুকনি। মুসলমান সেই পারসির 'আমেজ' দেওয়া কথিত ভাষাতেই পুথি লিখিতেন। হিন্দু কিন্তু লিখিবাব সময যথাসাধ্য পারসি বর্জন করিয়া শুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করিতেন। এখনও বাংলা ভাষায় প্রায দুই হাজার পারসি বা পারসিগত আরবি শব্দ পারসি প্রভাবের পরিচয় দিতেছে।

গুটিকতক শিক্ষিত লোককে ছাড়িয়া দিলে, এখনও এই পুথি সাহিত্যই বাংলার বিশাল মুসলমান-সমাজের আনন্দ ও শিক্ষা সম্পাদন করিতেছে। পুথি-পাঠক যখন সুর করিয়া পুথি পড়িতে থাকে তখন শ্রোতৃবর্গ কখনও কারবালার শহিদগণের দুঃখে গলিয়া যায়, কখনও আমির হামজার বা রোস্তমের বীরত্বে মাতিয়া উঠে, কখনও বা হাতেমের দয়ায় ভিজিয়া যায়। বেচারাদের আহার নিদ্রার কথা, ঘর সংসারের কথা, চিরদৈন্যের কথা আর মনে থাকে না। দীনেশবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ন্যায় কে আমাদের এই পুথি সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিবে?

যদি পলাশি ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানের ভাগ্য-বিপর্যয় না ঘটিত, তবে হয়তো এই পুথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত। যাউক সে কথা। অতীতকে যখন আমরা বদলাইতে পারিব না, তখন সে কথা লইয়া বেশি আলোচনায় লাভ কি? এখন বর্তমানে আমরা বুঝিয়াছি পুথির ভাষা আর চলিবে না। তাহার সময় গিয়াছে। অতীত যুগের জীব-কঙ্কালের ন্যায় তাহাকে কেবল দেখিবার জন্য রাখিয়া দাও। এখন আমাদের শিক্ষিত সমাজের রুচি সাধু ভাষার দিকে। এখন এই ভাষাই চলিবে। ইহাতেই লেখাপড়া করিতে হইবে। ইহাতেই আমাদের ভাবী বাঙলার মুসলমান সাহিত্য রচনা করিতে হইবে।

আর এক কথা। মুসলমানের ধর্ম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম নহে। তাহা সর্বজনীন ধর্ম। মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য তাহার ধর্ম তাহার প্রতিবেশীকে বুঝাইয়া দেওয়া। সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদিগকে ইসলামের মহত্ত্ব, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, ইসলামের সৌন্দর্য প্রচার করিতে হইবে। এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই যে বাঙালি হিন্দু মুসলমান ধর্ম অপেক্ষা খ্রিস্টান ধর্মের অধিক পক্ষপাতী। সে কি খ্রিস্টান ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাবে নহে? প্রচারের উদ্দেশ্যে আমাদিগকে আমাদিগের প্রতিবেশীর ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে। যে ভাষা তাঁহাদিগের মর্ম স্পর্শ করে, সেই ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। হিন্দুর ভাষায় ইসলামি ভাব ফুটাইতে হইবে। কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন —

সুখন কষ বহবে দী গোঈ চে ইবরানী চে সুবিযানী।
মর্কা কষ বহবে হক্ জোঈ চে জাবল্‌কা চে জাবল্‌সা॥

ধর্মেব তবে আছে সব বাণী, কি বা সে হিন্দু কিবা সুরিয়ানী।
সত্যেব তবে খোঁজ সব ঠাই, পূর্ব-পশ্চিম কোন ভেদ নাই।

মুসলমানি বাংলাব কটমট বুলি বাংলার হিন্দুর কানে স্থান পাইবে না, অন্তরে ত নযই। খোদা, পয়গম্বর বেহেশ্‌ত, দোজখ, ফেবেশ্‌তা, নামাজ, রোজা প্রভৃতি পারসি শব্দ ব্যবহার করিতে যদি আপত্তি না থাকে, তবে ঈশ্বর, স্বর্গ, নবক, উপাসনা, উপবাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহাবে আপত্তি কেন? পানি, চাচা, নানা, দাদা, ফুফু প্রভৃতি শব্দগুলি ত হিন্দি বা বাজপুতানি ইহাদেব জন্য এত মারামারি কেন?

মুসলমানি বাঙলা বাংলাদেশে প্রাদেশিক বুলির ন্যায় চলিত ভাষায় থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সাহিত্যের ভাষা হইবে না। জলকে পথ নির্দেশ কবিয়া দিতে হয় না। সে আপনার পথ আপনি চিনিয়া লয়। বাঙলার মুসলমানের মন আপনিই জানিতে পারিয়াছে কোন্ ভাষায় তাহাকে সাহিত্য রচিতে হইবে। এখন মৌলানা, মৌলবি ও পণ্ডিত, যিনিই বঙ্গ ভাষায় স্বতঃপ্রণোদিত হইযা কিছু লিখিতেছেন, তিনিই সাধু ভাষা ব্যবহার করিতেছেন। দুই এক জন যদি কেহ মুসলমানি বাংলা চালাইতে চেষ্টা করেন বা তাহাতে বই লেখেন, তাহা শুধু কলমের জোবে। ইহাদেবই সমশ্রেণীর মহাত্মারা বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা কলমের জোরে উর্দু করিযা দিতে চান। কখনও কখনও আমাব মনে হয় হয়তো ইহাদের কলম বনমানুষের হাড়ে তৈরি, তাহা না হইলে এত গুণ কোথা হইতে আসিল।

বনমানুষের হাড়ে কত গুণ?
নুনকে বানায চুণ, চুণকে বানায় বেগুন।

এখানে এক নূতন সমস্যা উপস্থিত হইতেছে। বর্তমানে বাংলা লেখকগণের মধ্যে ভাষার রীতি (style) লইয়া তিন দলের সৃষ্টি হইয়াছে। একদল কলিকাতার বিভাষাকে সামান্য একটু মাজিয়া ঘষিয়া চালাইতে চান। এই দলের চাঁই "সবুজ পত্রের" সম্পাদক প্রমথবাবু। আমি রবিবাবুকে এই দলের প্রধান বলিয়া মনে করি। ইহাদিগকে চরমপন্থী বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় দল সাবেক দল। ইহারা ভাষার কোনও পরিবর্তন সহ্য করিতে পারেন না। "সাহিত্য" পত্রিকা এই দলের মুখপাত্র। ইহারা প্রাচীন পন্থী। তৃতীয় দল সকলের বোধগম্য সহজ সরল বাংলা প্রচলন করিতে চান। পরলোকগত অক্ষয়কুমার সরকার ও মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি এই মতাবলম্বী। ইহাদিগকে মধ্যপন্থী বলা যাইতে পারে। এই তিন দলের মধ্যে কোন্ দলে আমরা যাইব? এই প্রশ্নের একটি গা-জোরি উত্তর না দিয়া ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক কোন দলে আমাদের যাওয়া উচিত।

যেমন রাজনীতিক্ষেত্রে অভিজাত তন্ত্র (Aristocracy) এবং গণতন্ত্র (Democracy) আছে, ভাষাক্ষেত্রেও তদ্রূপ অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র আছে। ভারতীয় ভাষা হইতে আমি ইহার উদাহরণ দিতেছি। যে সময় ঋষিগণের মধ্যে বৈদিক ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই

সময় সাধারণ আর্যগণের মধ্যে বৈদিক হইতে কিছু বিভিন্ন লৌকিক ভাষা প্রচলিত ছিল। বৈদিক ছিল অভিজাতর ভাষা, লৌকিক ছিল গণতন্ত্রের ভাষা। ঋষিরা বলিলেন "লৌকিক ভাষা অগ্রাহ্য অকথ্য। ন ম্লেচ্ছতবৈ। নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করিও না। অপভাষা ব্যবহার করিও না। যদি কর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" ঋষিরা বলিলেন, "খবরদার! ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিংবা স্বরের উচ্চারণে যদি এক চুল পরিমাণ এদিক ওদিক হয়, তবে আর তোমার রক্ষা নাই। দেখ না অসুরেরা 'হে অরয়ঃ হে অরয়ঃ' স্থানে 'হেলয়ঃ হেলয়ঃ' বলিয়াছিল, তাই তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল। দেখ না বৃত্রের পিতা পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ইন্দ্রশত্রু শব্দ বলিতে স্বরে অপরাধ করিয়াছিল। তাই বৃত্র ইন্দ্রের জেতা না হইয়া ইন্দ্রই বৃত্রের নিহন্তা হইল।" ঋষিদিগের শত সহস্র দোহাইতেও কিন্তু বৈদিক ভাষা পূজা অর্চনায় ছাড়া অন্যত্র লৌকিক ভাষার নিকট টিকিতে পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

পরবর্তীকালে উচ্চ বর্ণেরা লৌকিক ভাষাকে মার্জিত করিয়া সংস্কৃত করিয়া লইল। সাধারণে লৌকিক ভাষা পালি ব্যবহার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকারেরা বলিলেন, "ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত — ম্লেচ্ছভাষা শিখিও না।" তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দুর্দশা, বৌদ্ধ ধর্ম তাহার নবীন তেজে দণ্ডায়মান। কেহ ব্রাহ্মণের কথা শুনিল না। বৌদ্ধ গণতন্ত্রের পক্ষ হইল। পালি ভাষা এক বিপুল সাহিত্যের ভাষা হইল। গণতন্ত্রের নিকট অভিতাজতন্ত্রের পরাজয় হইল।

আর এক যুগ আসিল। এখন রাজশক্তি বৌদ্ধ। বৌদ্ধ এখন অভিজাততন্ত্রের দিকে। বৌদ্ধ এখন ধর্মের দোহাই দিয়া পালিকে ধরিয়া রাখিতে চাহিল;তখন কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষ লইল জৈন ধর্ম। তখন লৌকিক ভাষা প্রাকৃত। পালি প্রাকৃতের নিকট তিষ্ঠিতে পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

আর এক যুগ আসিল। এ-যুগ অন্ধকারময়। এ যুগে উচ্চ শ্রেণীর প্রাকৃত নিম্ন শ্রেণীর অপভ্রংশের নিকট পরাজিত হইল। এই অপভ্রংশ হইল বাংলা, ওড়িয়া, আসামি, হিন্দি, গুজরাতি, মারহাঠি প্রভৃতি দেশীয় ভাষাসমূহের জননী।

তারপর আধুনিক যুগ। এ যুগে পণ্ডিতেরা সাধারণের ভাষাকে মাজিয়া ঘষিয়া সাধু ভাষা করিয়া লইলেন, বিশাল জনসাধারণের ভাষাকে ইতর ভাষা বলিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। বর্তমানে এই ইতর ভাষা পণ্ডিতের ভাষার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। পণ্ডিত তাঁহার অন্ধ সংস্কৃত ভক্তির জন্য বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুর্বহ শিকলে বাঁধিতে চাহিতেছেন। আর ইতর ভাষা সেই শিকলকে কাটিতে চাহিতেছে। তাহার চেষ্টা ফলবতী হইবে কি? যদি ভারতের ভাষা ইতিহাসের শিক্ষা মিথ্যা না হয়, তবে নিশ্চয়ই একদিন এই ইতর ভাষা সাধু ভাষাকে, যেমন লৌকিক বৈদিককে, পালি সংস্কৃতকে, প্রাকৃত পালিকে, অপভ্রংশ প্রাকৃতকে ঠেলিয়া দিয়াছিল সেইরূপে ঠেলিয়া ফেলিবে। সাধুভাষা মৃত ভাষারূপে পুস্তকে ঠাঁই পাইবে। যেমন মিলটন, জনসন প্রভৃতির লাটিন-বহুল ভাষা এখন কেবল কেতাবি ভাষা হইয়া রহিয়াছে। এখনকার সাধু ভাষার অবস্থাও সেই রূপ হইবে। পরিণামে চরম পন্থারই জয় হইবে। তবে মধ্যম পন্থা বর্তমান পরিবর্তনশীল যুগের (Transitional period এর)

উপযুক্ত ভাষা বটে। একেবারে নি হইতে সা-তে সুর নামাইতে গেলে অনেকের কানে বেখাপ্পা লাগিবে নিশ্চয়ই।

ভাষাবিজ্ঞান শিক্ষাদান করে যে বহু প্রাদেশিক বিভাষার মধ্যে যে বিভাষায় বহু সদ্ গ্রন্থ রচিত হয় বা যাহা রাজশক্তির আশ্রয় পায়, তাহা সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠে। জীবজগতের ন্যায় বিভাষাগুলির মধ্যেও যোগ্যতমের পবিত্রাণ নীতি চলিয়া আসিতেছে। সাহিত্যিক শক্তিতে নবদ্বীপের বুলি সমস্ত বাংলায় সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। এখন পুনরায় সাহিত্যিক শক্তিতেও রাজশক্তির আশ্রয়ে কলিকাতার বুলি বাংলা সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিতেছে। এখন বাংলার বিভিন্ন জেলার ভদ্রলোক আপোসে কথাবার্তাব জন্য কলিকাতার বুলিই ব্যবহার করেন। সাহিত্যিক ভাষা হইয়া উঠিবার ইহাই সূচনা। তারপর রবিবাবু প্রমুখ কলিকাতাবাসী সাহিত্যিক গণের প্রভাবে কলিকাতার বিভাষা সাহিত্যের ভাষার স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে।

ভাষার-রীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। এক দল অন্ধ সংস্কৃতভক্ত বাংলা ভাষার মধ্যে প্রচলিত আরবি পারসি শব্দগুলিকে যাবনিক বলিয়া বর্জন করিতে চাহেন। আমি বলি আগে তাঁহারা বাংলা দেশ হইতে যবনকে দূর করুক, পরে ভাষা হইতে যাবনিক শব্দগুলি দূর করিবেন। যখন সংস্কৃত ভাষা হোরা, কেন্দ্র, জামিত্র, দীনার প্রভৃতি গ্রিক শব্দ এবং ইকবাল, মুকাবিলা প্রভৃতি আরবি শব্দ গ্রহণ করিয়াছে, তখন বাংলা ভাষার বেলায় আপত্তি কেন? ঐ সকল আরবি পারসি শব্দ বাংলা ভাষার অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে। ভাষা হইতে ইহাদিগকে তাড়ানো সহজ ব্যাপার হইবে না। দোয়াত, কলম, কাগজ, জামা, কামিজ, কমর, বগল প্রভৃতি আইন আদালতে প্রচলিত সর্বসাধারণের সহজবোধ্য হাজার খানিক শব্দ ত্যাগ করিয়া নূতন শব্দ গড়িলে তাহা নামের জোরে পুস্তকে চলিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ভাষায় চলিবে না। বাংলা ভাষায় আরবি, পারসি, তুরকি, ইংরাজি, ফরাসি, পর্তুগিজ প্রভৃতি যে কোনও ভাষার শব্দ বেমালুম খাপ খাইয়া গিয়াছে, তাহারা নিজদের দখলি স্বত্ত্ববলে বাংলা ভাষায় থাকিবে। তাহাদিগকে তাড়াইতে গেলে জুলুম করা হইবে।

□ *স্মারকগ্রন্থ*, ১৯৬৯ (বাংলা একাডেমী, ঢাকা)

বিবেকানন্দ দু-মুখো ছুরি

বিনয়কুমার সরকার

বিবেকানন্দ'র দিগ্‌বিজয়

বিবেকানন্দ-পূজা দুনিয়ায় বাড়িয়া চলিয়াছে। বিবেকানন্দ'র দিগ্‌বিজয় এতদিন প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবদ্ধ ছিল। বৎসব খানেক হইল দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা দেশে প্রচারকার্যে গিয়াছেন, স্বামী বিজয়ানন্দ। সে দেশের লোকেরা এখানকার বেলুড় মঠের সঙ্গে চিঠিপত্র চালাইয়া খরচপত্র দিয়া বাঙালি প্রচারককে লইয়া গিয়াছে। সেদেশে বিজয়ানন্দকে কথাবার্তা বলিতে হয় স্প্যানিস ভাষায়। পয়সা খরচ করে ওরা, গুরুগিরি করি আমরা। ইহার নাম যুবক বাঙলা। জয় বিবেকানন্দ'র জয়।

মাস চারেক হইল জার্মানির ভিজবাডেন শহরের এক দর্শন কেন্দ্র হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। বেলুড়মঠ হইতে স্বামী যতীশ্বরানন্দকে পাঠানো হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, আজকালকার জার্মানি হিটলারি জার্মানি। হিটলারশাসিত জার্মান সমাজেও হিন্দু দর্শনের ডাক পড়িয়াছে। বাঙালি দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারককে হিটলারি জার্মানি গুরুর পদে বসাইয়াছে। যে জার্মান নরনারী হিটলারি আইনকানুনের প্রভাবে ইহুদি এবং অন্যান্য বিজাতীয় নরনারীর সঙ্গে আত্মিক সংস্রব বর্জন করিতেছে, সেই জার্মান নরনারীই ভারতসন্তানকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। সেকালের ভারতধর্ম আর একালের বঙ্গদর্শন দুই-ই বিবেকানন্দ শিষ্যের মারফত জার্মানিতে প্রচারিত হইতেছে। স্বামী যতীশ্বরানন্দ লিখিয়াছেন যে, জার্মান সমাজে ভারতীয় ও বাঙালি দর্শনের পসার বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। হয়তো তাঁহাকে জার্মানিতে বেশিদিন থাকিতে হইবে। জার্মান সমাজে বিবেকানন্দ'র নামে প্রতিষ্ঠিত জার্মান কেন্দ্র এই প্রথম।

বিবেকানন্দ'র লেখালেখির ভিতর গোরু হারাইলেও ঢুঁরিয়া পাওয়া যায়। বিবেকানন্দ সাহিত্য এক বিপুল বিশ্বকোষ, ঠিক একখানা মহাভারত আর কি! কাজেই যাব যখন যেমন খেয়াল সে তখন বিবেকানন্দ'র নিকট হইতে সেইরূপ পাঁতি বাহির করিয়া লয়। কখনও কখনও বিবেকানন্দ আমার চিন্তায় ফরাসি নেপোলিয়নের জুড়িদার। বিবেকানন্দকে আমি ইংরেজ কার্লাইল সমঝিয়াও থাকি। আবার জার্মান ইহুদি নিট্‌শের সঙ্গে বিবেকানন্দকে এক আসনে বসানো আমার খেয়ালে দেখা গিয়াছে। মার্কিন হুইটম্যান অথবা ইংরেজ ব্রাউনিঙ, ইত্যাদির সঙ্গে বিবেকানন্দ'র তুলনা করিয়া আমার আত্মা মাঝে মাঝে আনন্দ পাইয়া থাকে। অধিকন্তু, একালের জার্মান যৌবনাবতার হিটলারকে বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতা ভরপুর বিবেচনা করাও আমার দস্তুর। তাহা ছাড়া বিবেকানন্দকে

সেকেলে বৌদ্ধ বীবদেব রাহুল উপালি মহাকচ্চায়ন ইত্যাদির সমকক্ষ সম্‌ঝিতেও আমি অভ্যস্ত।

আজ বিবেকানন্দ'র বিশ্বকোষ হাঁটকাইয়া এই দিগ্‌বিজয়ী বাঙালি বীরের কয়েকটা জীবন-মন্ত্র বাহির করিব। মন্তরগুলা হয়তো বা কোনো বকাবকির ভিতর পাওয়া যাইবে, হয়তো কোনো প্রবন্ধের ভিতর পাওয়া যাইবে, হয়তো বা কোনো মোলাকাতের ভিতর পাওয়া যাইবে। আর যদি বিবেকানন্দ বিশ্বকোষের ছাপা হরফে এই সকল বিবেকানন্দ-বাণী সশরীরে ঢুঁরিয়া পাওয়া না যায়, তাহা হইলে হযতো সেই সব পাওয়া যাইবে বিবেকানন্দ মানুষটাব ভিতর। কথাগুলা বিবেকানন্দি নীতিব অ, আ, ক, খ বিশেষ।

"বাপের বেটা হ'স ত' একে একে লড়ে' যা"

বিবেকানন্দ দুমুখো ছুরি। এই ছুরির কোনো মুখই ভোঁতা নয়। দুই-ই চক্‌চকে, ধাবালো, জোরালো, — যাহাকে আমাদের বিক্রমপুরে বলে "চোখা"। বিবেকানন্দ "মিছরির ছুরি" নয়। এই ছুরি বিলকুল তেতো, বিষাক্ত। বিবেকানন্দ জবর বিষ, জবর যম, — কোনো কোনো লোকের পক্ষে, কোনো কোনো দলের পক্ষে, কোনো কোনো চিন্তা প্রণালীর পক্ষে, কোনো কোনো কার্যপ্রণালীর পক্ষে। বিবেকানন্দ'র ব্যবসায় দুনিয়াকে লড়াইয়ে ডাকা, আহাম্মুকদের বেয়াকুবিগুলাকে কুচি-কুচি করিয়া কাটা আর কাপুরুষদের মেজাজ ও হাত-পা-কে গুঁড়া করিয়া ফেলা।

ইয়োরামেরিকার দিকে, খ্রিস্টিয়ানদের দিকে, সাদা চামড়াওয়ালা নরনারীর দিকে, পশ্চিমাদের দিকে বিবেকানন্দ'র এক মুখ। অপর মুখ পুবের দিকে, এশিয়ার দিকে, ভারতের দিকে আর বিশেষ করিয়া আমাদের বাঙলার দিকে। পশ্চিমমুখো বিবেকানন্দ আর পুবমুখো বিবেকানন্দ, দুই বিবেকানন্দই জবরদস্ত শক্তিযোগী, দুই বিবেকানন্দই লড়াইয়ের পায়রা ঢুঁরিতে অভ্যস্ত।

পশ্চিমাদের দিকে তাকাইয়া বিবেকানন্দ বলে, "আরে ভাই মার্কিন, আরে ভাই ইয়াঙ্কি, বাপের বেটা হস্‌ তো একে একে লড়ে' যা।" আমেরিকানরা জিজ্ঞাসা করিতেছে, — "আরে বিবেকানন্দ, কি হল ছাই, বল ভালো করে বুঝিয়ে।" বিবেকানন্দ'র জবাব নিম্নরূপ — "দ্যাখ্‌ আমেরিকান নরনারী তোদের লম্ফঝম্ফ এত বেশি কেন জানিস? তোদের টাকা আছে, তোদের বাড়ি ঘর আছে, তোদের ব্যবসা আছে তোদের ব্যাঙ্ক আছে, তোদের জাহাজ আছে, তোদের ব্যাপারী আছে, তোদের কনসাল আছে, তোদের পল্টন আছে, তোদের এই ধরনের কত কি আছে। তোরা যখন লম্বাচৌড়া কথা বলিস তখন তোদের পেছনে থাকে এতগুলা লোক, দল, সঙ্ঘ, দপ্তর, অর্থশক্তি, রাষ্ট্রশক্তি, সমর-শক্তি। আর আমি বঙ্গচন্দ্র গোলামের বাচ্চা। আমার না আছে পয়সা, না আছে নাম। আমাদের বাঙলা দেশের লোককে জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝিতে পারবি। বিবেকানন্দ'র নামগন্ধ পর্যন্ত কেহ জানে না। দু'আনা, চার আনা, দশ আনা কুড়াইয়া কেহ কেহ কোনোমতে আমাকে তোদের মুল্লুকে পাঠাইয়া দিয়াছে। আমার জোর "কৌপীনবন্ত খলু ভাগ্যবন্তঃ।" কষ্টেসৃষ্টে সমুদ্রে সাঁতার কাটিয়া মার্কিন মুল্লুকে আসিয়া হাজির হইয়াছি। আমার পেছনে কেহ নাই — যদি থাকে

তো ভগবান রামকৃষ্ণ। সেই জন্য বলি তোরা একজন একজন করিয়া এই ন্যাংটা বাঙালি বাচ্চার সঙ্গে লড়িয়া যা। দেখি তোদের মুরদ কত।"

ইংরেজকেও বিবেকানন্দ বলে, — "ভাই ইংরেজ তোকেও জানি, বেশ জানি, ভালোরকমই জানি। তোদের নিজের দেশে, বিলাতে যতগুলা বড় বড় ইস্কুল কলেজ আছে তাতে তোদের ছেলেপিলেদের সঙ্গে আমাদের ছেলেপিলেরাও পড়ে। আমাদের বাঙালি বা অন্যান্য ভারত সন্তান যারা বিলাতি পাঠশালায় পড়িতে যায় তারা সকলেই যে বাছাবাছা ভালো ছেলে তা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কী দেখি? বাঙালি ছোকরারা, অন্যান্য ভারতীয় ছোকরারা, তাদের কেহ কেহ তোদের যত সব পয়লা দরের ছেলে তাদের অনেকেরই সমানে সমানে চলে ও বড বড় পারিতোষিক, মেডেল, প্রশংসাপত্র ইত্যাদি যা কিছু তোদের মোড়লেরা সব-সে-সেরা ছেলেদেরকে দিতে অভ্যস্ত তার অনেক কিছুই আমাদের ছোকরারা মাঝে মাঝে লুটিয়া আনিয়াছে ও আনিতেছে। কাজেই বলি ভায়া হে, বাপের বেটা হ'স্ তো একে একে লড়ে' যা। তারপর এই যে ভারতখানা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত তাহার ভিতরেই বা কী দেখি? যে যে দপ্তরে, যে যে কাজে, যে যে ব্যবসায় আর যে যে পেশায় বাঙালিরা আর অন্যান্য ভারতসন্তানেরা তোদেরই কায়েম করা আইনের ফলে কিছু কিছু ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছে, সেই সকল কর্মক্ষেত্রে ইহারা তোদের স্বজাতীয় লোকের চেয়ে ছোটো দাঁড়ায় নাই। উকিল, ডাক্তার, ইস্কুল মাস্টার, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, দপ্তরের ডিরেক্টার ইত্যাদি হিসাবে ইংরেজরা বাঙালি বাচ্চাকে অথবা অন্যান্য ভারতবাসীকে ডিঙাইয়া যাইতে পারে নাই। এই সকল কথা তোদেরই গেজেটে, তোদেরই খবরের কাগজে, তোদেরই পার্লামেন্টের দলিলে খোদা আছে। তাই বলছি, গবর্মেন্টের মেজাজ ভুলিয়া, ফৌজ আর পল্টনি জাহাজের দেমাক ভুলিয়া, টাকাকড়ির গরম ভুলিয়া বাপের বেটা হ'স তো একে একে লড়ে যা। দেখা যাউক, গবর্মেন্টহীন, ফৌজহীন, ব্যাঙ্কহীন, কারখানাহীন, পদবিহীন মামুলি ইংরেজরা বাঙালি বাচ্চার চেয়ে অনামী, অজ্ঞাত কুলশীল ডাল-ভাত খাওয়া বঙ্গচন্দ্রের চেয়ে বড় কি না।"

ফরাসিকে, ইতালিয়ানকে, জার্মানকে, দুনিয়ার সাদা চামড়াওয়ালা সকল পশ্চিমী নরনারীকেই বিবেকানন্দ "কলা" দেখাইতেছে। আর বলিতেছে — "বাপের বেটা হ'স তো একে একে লড়ে' যা। দেখা যাউক কার কত মুরদ, কার মগজে কতখানি ঘি, কার চরিত্রে কতখানি মনুষ্যত্ব।"

এই গেল পশ্চিমমুখো বিবেকানন্দ। দুনিয়ার লোক বিশেষত পশ্চিমা নরনারী শুনিল আর ভাবিল — "তাই তো, এ যে বিপ্লব, দুনিয়ায় যুগান্তর! সংসারের ছোট বড় ইত্যাদি শ্রেণী সম্বন্ধে এই প্রণালীতেও চিন্তা করা সম্ভব?" পশ্চিমারা এইরূপ ভাবিল আর বলিল — "বিবেকানন্দ বাপকা বেটা। এশিয়ায় লোক পয়দা হইয়াছে। বঙ্গচন্দ্রও পারিবে শাসিতে, হাসিতে হাসিতে, সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে।"

"বাঙালির আবার বাণী"

বাপকা বেটা বিবেকানন্দ, পশ্চিমা মেয়ে পুরুষের চিত্তে যুগান্তর সাধক বিবেকানন্দ,

ইয়োরামেরিকায় বিপ্লব প্রবর্তক বিবেকানন্দ, এবার পুব মুখো হইল, বাঙালি মুখো হইল। বাঙালিরা জিজ্ঞাসা করিতেছে — "আরে ভাই বিবেকানন্দ বলত ভাই, আমাদের কি বাণী?" বিবেকানন্দ জিজ্ঞাসা করিতেছে — "আরে পদা, কাদের বাণী শুনবি?" পদা, যদু, হরা, ইসমাইল, আবদুল, সকলে একসঙ্গে বলিতেছে — "শুনতে চাই আমরা ভারতবাসীর বাণী, বাঙালির বাণী, আধুনিক বাঙালির বাণী, বর্তমান ভারতের বাণী।" পুবমুখো বিবেকানন্দ বলিতেছে — "বাঙালির আবার বাণী? বর্তমান ভারতের বাণী শুনতে চায়! বর্তমান বাঙলার বাণী শুনতে চায়! ভারতবাসী তো ম্যাড়াকান্ত, বাঙালিরা তো গোরু, ম্যাড়াকান্তগুলা, গোরুগুলা আবার চায় বাণী ফলাতে! এরা তো ভ্যাঁ ভ্যাঁ, ম্যাঁ ম্যাঁ করে। এই সব নরনারীর এই গোরুগুলার আবার বাণী কিরে?"

পুব মুখো বিবেকানন্দ'র মুখ ঝাড়া খাইয়া ভারতবাসীর আর বাঙালির তো চক্ষু স্থির। দেশের লোক ভাবিল — "ইহার নাম বিবেকানন্দ? এতো চাবুক, এ যে জুতা।" বিশ্ববাসী বলিল — "ইহার নাম বিপ্লব, ইহার নাম যুগান্তর।"

বাঙালির মাথায় এতদিনে প্রবেশ করিল — "তাই তো, বাঙালির তবে সত্য সত্যই কোনো বাণী নাই।" ভারতবর্ষের অন্যান্য নরনারীও প্রথম ভাবিতে শুরু করিল — "তবে কি বাস্তবিক পক্ষে, আমরা সকলেই গোরু, ম্যাড়াকান্ত? দুনিয়ায় বর্তমান ভারতের কোনো ইজ্জত নাই।" বিবেকানন্দ'র জুতা খাইয়া ভারতসন্তান আর বিশেষত বঙ্গচন্দ্র — চাঙ্গা হইয়া উঠিল। ভারতের যেসব লোক "নিজের বিচারে" নিজেকে হোমরা চোমরা বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত তাহাদিগকে জুতাইয়া দুরস্ত করিল বিবেকানন্দ। দুনিয়ার বাটখারায় ফেলিলে আমাদের ভারতখানা যে আহাম্মুকের বাথান আর কাপুরুষের চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কিছুই নয়, এই বাণী সেই বাঙালির মান্দ্রাজির মারাঠির আর পাঞ্জাবির কানে ঢুকিল, তৎক্ষণাৎ ইহাদের নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবার রেওয়াজ কাটিতে শুরু করিল। যুবক বাঙলার জন্ম হইল, জগতে যুবক ভারত দেখা দিল।

মারে জুতা, খায় পূজা

বাঙলাদেশে আর গোটা ভারতে যুগের পর যুগ ধরিয়া অনেক বড় লোকের জন্ম হইয়াছে। কিন্তু দেশের লোককে বিবেকানন্দ'র মতন জুতাইতে পারে নাই আর কেহ। বরং আমাদের দেশে যে যখন নতুন কথা বলিয়াছে সে তখন দেশের লোকের হাতে মার খাইয়াছে। "নতুন" একটা কাজের প্রস্তাবে আমাদের দেশের লোক কোনো সমাজ সংস্কারককে বা স্বদেশ সেবককে বড় শীঘ্র তারিফ করে নাই। জনসাধারণের মার খায় নাই এমন করিতকর্মা বা চিন্তাশীল লোক বাঙলা দেশে ছিল কি না সন্দেহ। বিবেকানন্দ'র কপাল ভালো। বিবেকানন্দ মুখ ঝাড়া ছাড়া আর কিছু জানে না। তার বচনমাত্রই তীব্র কশাঘাত। প্রতি মুহূর্ত দেশের লোককে গাল দেওয়া, তিরস্কার করা, চাবুক লাগানো আর জুতাইয়া লম্বা করা, এই ছিল বিবেকানন্দ'র দস্তুর। কিন্তু মজার কথা, দেশের লোক বিবেকানন্দ'র জুতা যত খাইয়াছে ততই তাহাকে আরও বেশি সম্মান করিয়াছে, ভালো বাসিয়াছে, পূজা করিয়াছে। মারিয়াছে জুতা আর খাইয়াছে পূজা — এই হইল বাঙালি মুখো বিবেকানন্দ'র চরিতকথা।

বিবেকানন্দ'র মক্কেল — কেরানি-ব্যাপারী-জমিদার

বিবেকানন্দকে লোকেরা এত ভালো বাসিল কেন? দেখা যাউক বিবেকানন্দ'র মক্কেল কাহারা। মফস্‌সলের খবর যাহারা রাখে তাহারা জানেন, রেলের কেরানি, স্টিমারের কেরানি, ডাকঘরের কেরানি, আদালতের কেরানি ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরা বিবেকানন্দ'র ভক্ত। পাড়াগাঁয়ের ছোটো-বড়ো-মাঝারি লাইব্রেরিতে যে দুশ' পঁচিশ' বই আর খবরের কাগজ বা মাসিক পত্র থাকে তাহার ভিতর গল্পের বইয়ের পরেই কাটে বোধ হয় বিবেকানন্দ'র বইগুলা। আর বিবেকানন্দ সাহিত্যের খাদকদের ভিতর বাঙালি মধ্যবিত্তের নানা শ্রেণী বেশ পুরু দল। আজকাল বাঙলা দেশে হাজারখানেক গ্রন্থাগার চলিতেছে। তাহাদের কর্মকর্তাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলে বিবেকানন্দ'র বাজারটা বুঝিতে পারা যায়।

মফস্‌সলে আজকাল আর এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। তাহারা বীমার দালাল। গুনতিতে ইহারা হাজার কয়েক। অধিকন্তু সাড়ে সাতশ, আটশ বা হাজার "কুটির ব্যাঙ্ক" (লোন আফিস) চলিতেছে। এই সমুদয়ে চাকরি করে বোধ হয় হাজার তিন-চার। এই দুই শ্রেণীর বণিকদের পরিবারে পরিবারেও বিবেকানন্দ'র কাট্‌তি বেশ বেশি।

মধ্যবিত্তদের আর এক শ্রেণীর লোক জমিদারের মুহুরি ও অন্যান্য কর্মচারী। ইহারা অনেকেই সাবেক পন্থী। সেকেলে ধরনধারণ ও মতিগতি, পাড়া গেঁয়ে চরিত্র ইত্যাদি এই সম্প্রদায়ের স্বভাবসিদ্ধ। এই সমাজে পড়াশুনার রেওয়াজ একটু আধটু বাড়িতেছে। সেই রেওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে "স্বামীজি"'র বচন, বক্তৃতা, মন্তর, উপদেশ ইত্যাদিও বাঙালি সমাজে শিকড় গাড়িতে শুরু করিয়াছে।

খবর লইয়া দেখিয়াছি যে, জমিদারেরাও বিবেকানন্দ সাহিত্যের মক্কেল। জমিদারেরা ডিস্পেন্সারি রাখিতে অভ্যস্ত। সেই সূত্রে দু'একজন ডাক্তার কম্পাউন্ডারের সঙ্গে তাহাদের আনাগোনা স্বাভাবিক। ডাক্তার কম্পাউন্ডারদের অনেকেই বিবেকানন্দ'র দু-একখানা বই বগলদাবা করিয়া চলিতে অভ্যস্ত অথবা বালিশের নীচে রাখিয়া সংসার চালানো তাহাদের দস্তুর। জমিদারেরা এই সংসর্গে পড়িয়া বিবেকানন্দ'র মক্কেলে পরিণত হয়। জমিদারদের আর এক সহায় হইতেছে নিজ নিজ "গার্জ্যিয়েন টিউটর" বা মাস্টার মশায়। ইস্কুল প্রতিপালন করা বাঙালি জমিদার গৃহস্থালীর এক প্রকার নিত্যকর্মপদ্ধতি স্বরূপ। সুতরাং কয়েকজন ইস্কুল মাস্টারও জমিদারদের আবহাওয়ায় সর্বদাই থাকে। গার্জ্যিয়েন টিউটর আর ইস্কুল মাস্টারদের বোধ হয় কমসেকম চার আনা খাঁটি বিবেকানন্দ ভক্ত। কাজেই বিবেকানন্দ'র পসার পরোক্ষভাবে জমিদারদের অন্দরমহল পর্যন্তও ধাওয়া করিতে পারিয়াছে। অধিকন্তু, ছোকরা-উকিলদের সঙ্গেও জমিদারদের ভাব কম নয়। ছোকরা উকিল সম্প্রদায়ের অনেকেই বিবেকানন্দ'র গুণগ্রাহী। ফলত জমিদারেরা নিজ ঘরোয়া লাইব্রেরিতে বই কিনিবার সময় "বিবেকানন্দ এক ছেট" অর্ডার দিতে ভুলে না।

অপর দিকে জমিদারেরা একালের এঞ্জিনিয়ার, রসায়নিক, ব্যবসায়ী, বণিক ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের সঙ্গেও বন্ধুত্ব রাখে। অনেক জমিদারই আধুনিক শিল্পবাণিজ্য শিখাইয়া আনিবার জন্য বাঙালি যুবাকে জাপানে, আমেরিকায়, জার্মানিতে পাঠাইবার কাজে অর্থ

সাহায্য করিয়াছে। স্বদেশি কাবখানা চালাইবার জন্য চাঁদা দেওয়া অথবা শেযাব কেনা ইত্যাদি কাজও জমিদারের মামুলি স্বদেশ সেবার অন্তর্গত। এই সকল কাজে যে সব যন্ত্রনিষ্ঠ বিজ্ঞাননিষ্ঠ বাণিজ্যনিষ্ঠ যুবা মোতাযেন তাহাদেব অনেকেই কখনো না কখনো দেশে বিদেশে বিবেকানন্দ কথা প্রচার করিযা জীবন ধন্য করিয়াছে। ইহাদেব মাবফতেও জমিদারের আবহাওয়ায় বিবেকানন্দ পূজা প্রসারিত হইয়াছে।

একালে যাহারা মজুর-আন্দোলন চালাইতেছে তাহাদের বোধ হয় প্রায় সকলেই বিবেকানন্দকে নিজ নিজ জীবন প্রভাতে গুরু সমঝিতে অভ্যস্ত ছিল। আজও, "সোশ্যালিজম্"-"কমিউনিজ্‌মে"ব জোয়ারকালেও, বিবেকানন্দ পূজা মজুব পন্থীদেব মহলে বেশ কিছু বজায আছে। তাহা ছাড়া অন্যান্য "ন্যাশন্যালিস্ট"-পন্থী স্বদেশ সেবকেরা তো বিবেকানন্দকে নিজেদের ভগীবথ বা পথ প্রদর্শক রূপে চিরকালই পূজা করিয়া আসিতেছে। তাহাব উপব আছে ছেলে-ছোকরাদেব দল। আজকাল শ' এগারো-বারো ম্যাট্রিকুলেশন ইস্কুলে পড়ে প্রায় পৌনে তিন লাখ ছেলেমেয়ে। ফি বছব পুরস্কার বিতরণেব সময় তাহারা সকলেই অন্তত একবার বিবেকানন্দ'র "মা, আমায় মানুষ কর" আওডানো শুনিতে অভ্যস্ত। আওডায় বটে দশ বৎসরের বাচ্চা, কিন্তু মাতে শত-শত লোক, — ছেলে-বুড়া, বাপ-মা, ইস্কুল-মাস্টার, ইস্কুলের সেক্রেটারি।

হাতের কাছের কর্তব্য বনাম কালী-কৃষ্ণ-শিব-ব্রহ্ম

কেরানিকে কেরানি, মুহুরিকে মুহুরি, ইস্কুল-মাস্টারকে ইস্কুল-মাস্টার, এঞ্জিনিয়ারকে এঞ্জিনিয়ার, বণিককে বণিক, ডাক্তারকে ডাক্তার, জমিদারকে জমিদাব, — দেখিতেছি বাঙালি সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই বিবেকানন্দ-ভক্ত। এত বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন আয়ের, বিভিন্ন বয়সের লোক বিবেকানন্দকে লইয়া মাতামাতি করে কেন? বিবেকানন্দ'র ভিতর এমন কী আছে যাহাতে পঁচিশ-ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকার আয়ের গৃহস্থ হইতে পাঁচহাজার-পতি, দশহাজার-পতি, লাখ-পতি পর্যন্ত সকলেই তাহাকে সমানভাবে পূজাযোগ্য সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত? জবাব অতি সোজা। গরিব মানুষ, বড়ো মানুষ, মাঝারি মানুষ সকলেই বিবেকানন্দ'র ছোঁয়ায় তাতিতে আরম্ভ করে। বিবেকানন্দ'র কথাগুলায় যে-কোনো মানুষেরই প্রাণ ছ্যাঁক করিয়া উঠে। যে শুইয়া আছে সে উঠিয়া বসে, যে বসিয়া আছে সে খাড়া হইয়া পড়ে, যে খাড়া আছে সে চলিতে থাকে, আর যে চলিতেছে সে দৌড়াইতে লাগিয়া যায়। ঠিক যেন ছোকরারা জোয়ান হয়, আর জোয়ানরা পালোয়ান হয়।

বিবেকানন্দ'র কাছে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বয়সের আর অবস্থার উপযোগী কর্তব্যের হদিস পায়। সকলেই বুঝিতে পারে যে, তাহার নিজের একটা কিছু করিবার আছে। আর সেই কর্তব্যটা পাঁচ-সাত-দশ বৎসর বা পাঁচ-সাত-দশ জন্মের পর পালন করিলে চলিবে না কর্তব্যটা এখনকার, এই মুহূর্তের, এই ক্ষেত্রের। প্রত্যেক কেরানি, মুহুরি, জমিদার, ডাক্তার, ইস্কুল-মাস্টার, সমাজ-কর্মী, মজুর-নায়ক, স্বদেশ-সেবকের নিকট বিবেকানন্দ ব্যক্তিগত কর্তব্যের কথা বলে। বিবেকানন্দ'র বাণী সোজাসুজি সকলেরই নিজ-নিজ কর্তব্য-জ্ঞানে ঘা লাগায়।

রামপ্রসাদের মতন "কালী বলে' বস্‌না ধ্যানে" প্রচার করিতে গেলে বিবেকানন্দ একালের বাঙালি সমাজে ফেল মারিত। সকলেই বলিত — "আরে ভায়া, সে সব তো জানি ঠানদিদির মালসী গানে।" "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্" আওড়াইলেও বিবেকানন্দ'র কক্কে জুটিত না। এদিকে ব্রহ্মপূজার মন্তর দিলেই কি বিবেকানন্দ'র মক্কেল জুটিত বেশি? তাহারও সম্ভাবনা কম। "শিবোঽহম্", শিবোঽহম্" হরদম চালাইলেও কেরানি-বণিক-জমিদারের দল বিবেকানন্দ'র পূজায় সিধা জোগাইতে ভিড়িত না। এমন কি, "গীতা-নাম গীতা-নাম গীতা-নামৈব কেবলম্" অথবা বেদান্ত ছাড়া "কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"-বুলিতেও একালের কলি গলিত না।

আট পৌরে জীবনে শক্তিদাতা বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ'র বকাবকির ভিতর কালী আছে, উপনিষৎ আছে, শিব আছে, ব্রহ্ম আছে, গীতা আছে, যোগ আছে, রামকৃষ্ণ আছে, আর বেদান্ত তো আছেই। বিবেকানন্দি বিশ্বকোষে এই সব ধর্ম, দর্শন, নীতি, দেবদেবী, হরির লুট, পাঁঠাবলি, উপাসনা, প্রার্থনা, সাকার পূজা, দরিদ্র-নারায়ণ কাঙালি-ভোজন, তীর্থগমন ইত্যাদি কোনো কিছুরই অভাব নাই। যার মাথায় ঘি থাকে সে অনেক কিছুই আলোচনা করিতে পারে। বিবেকানন্দ'র মগজ ঘি-য়ে ভরা ছিল। কাজেই তাহার সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলির ভিতব আশ্‌মান-জোড়া আলোচনা আছে।

কিন্তু মুহুরি, বণিক, বীমার দালাল, ইস্কুল-মাস্টার, দোকানদার ইত্যাদি লোক ভগবানের "সামীপ্য" লাভের লোভে মাতোয়ারা হয় নাই। ভগবানের সঙ্গে "সাযুজ্য" পাইবার আশা বা আকাঙ্ক্ষা যে বাঙালি মধ্যবিত্ত বা ডাক্তারবাবু কিংবা জমিদারদের খুব বেশি তাহা বিশ্বাস করিবার কারণও নাই। লোকেরা চায় এমন কিছু যাহাতে রোজের কাজে রোজ সাহায্য পাওয়া যায়। প্রতিদিনকার আটপৌরে জীবনে উৎসাহদাতা, মন্ত্রদাতা, শক্তিদাতা আবশ্যক হয় দুনিয়ার প্রত্যেক গৃহস্থের, প্রত্যেক নরনারীর!

এইরূপ শক্তিদাতাই বিবেকানন্দর মুখঝাড়া। ভগবান কাহাকে বলে, আত্মা কাহাকে বলে, এই সব কথা জানা থাকিলে নিত্যকর্ম পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া যায় না। পরকাল কী বস্তু, ইহকালের সঙ্গে পরকালের কী সম্বন্ধ এই বিষয়ে মাথা জবররূপে খেলিলেও বর্তমান মুহূর্তের কর্তব্য পালন সম্বন্ধে আনাড়ি থাকা খুবই সম্ভব। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগাযোগ কায়েম করিবার হদিস জানিয়া সংসারের কাজকর্ম বা গৃহস্থালী চালাইবার দর্শনে ফেল-মারা বিশেষ কিছু নয়। এই সব চিজ বিবেকানন্দি বিশ্বকোষের বড়ো কথা, প্রধান কথা অথবা আসল কথা হইলে বিবেকানন্দ'র মুখঝাড়া খাইবার জন্য কেহ লালায়িত হইত না।

আত্মা ভগবান ইত্যাদি বিষয়ক কথা অতি মামুলি। শুনিয়া-শুনিয়া লোকের কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে, আর কপ্‌চাইয়া-কপ্‌চাইয়া দাঁতে খিল লাগিয়াছে, আর জিহ্বা ভোঁতা মারিয়া গিয়াছে। এইসব শব্দের ভিতরে বা পশ্চাতে বস্তু ঢুঁরিয়া বাহির করা অতি কঠিন। এই সবের ভিতর জীবন কতটুকু আছে তাহার বিশ্লেষণও বড়ো সহজ নয়। জীবন গঠনের পক্ষে এই সকল শব্দে কিছু মশলা পাওয়া যায় কিনা তাহার গবেষণা বেশ কিছু জটিলতাপূর্ণ। বিবেকানন্দ'র বিশ্বকোষে সেই আলোচনা-বিশ্লেষণ-গবেষণা আছে সন্দেহ

নাই। এই সব বিষয়ে বিবেকানন্দ নিজেই বড়ো ওস্তাদও বটে। কিন্তু এই সব গবেষণার পেছন পেছন ছুটিয়া বাঙালি কেবানি-জমিদাব-ইস্কুলমাস্টাব হয়বান হয় নাই। যতই বেয়াকুব হউক, একালেব বাঙালি জাত এত আহাম্মুক নয়।

নিরেট আত্মোন্নতির হদিস

"যেই কৃষ্ণ সেই কালী" — এই ধবনের সমন্বয় বিবেকানন্দ'র পূর্বে অনেকেই চালাইয়াছে। বিবেকানন্দ'ব মাথাযও এই সমন্বয় আসিয়াছে। তাহাব উপর আসিয়াছে খ্রিস্টিয়ান-বৌদ্ধে-হিন্দুতে-মুসলমানে, পূর্বে পশ্চিমে নানাপ্রকাব সমন্বযেব মুসাবিদা। কিন্তু দুনিয়াব্যাপী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডজোড়া, সর্বজাতি-সমন্বয়কারী হিতোপদেশ বা ধর্মপ্রচার যদি বিবেকানন্দ'র বকাবকিব ভিতর প্রধান "মুদ্দা" থাকিত, — একটা আমাদের মালদহী বোল ঝাড়া গেল, — তাহা হইলে কেরানিরা বলিত — "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। রামপ্রসাদের মালসীই আবার গাওয়া যাউক। অথবা বোষ্টম-বোষ্টমীর তুলসী-তলায় গিয়া নাচানাচিই বা করি না কেন? বিবেকানন্দ, তাহা হইলে তুমি চরে খাও বনে জঙ্গলে, — অথবা আবার আমেরিকায়।" ইস্কুল-মাস্টারেবা, বীমার দালালেরা আর ব্যাপাবীরাও ঠিক এইরূপই বলিতে বাধ্য হইত। এইরূপ অলীক বিশ্বধর্মের হিড়িকে ভাসিয়া যাইবার উন্মাদনা এযুগের বাঙালি জানে না।

বিবেকানন্দ বলে — "দ্যাখ, তুই বোষ্টম, কি শৈব, কি ব্রাহ্ম, কি মুসলমান, কি আর কিছু, কি সবকিছু তাতে বয়ে গেল। তুই যাই হ'স তোকে সংসারে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য লড়াই করিতেই হইবে। তোর জীবনকে উন্নতি কবিবাব' জন্য কতকগুলা কাজ করা আবশ্যক। সেই কাজগুলা তোকে এখনি করিতে হইবে। তুই যত বড়ো লোকই হ'সনা কেন, তোর কতকগুলা অভাব আছে। সেই অভাবগুলা তোকে পূরণ করিতে হইবে — এখনই। দায়িত্ব প্রত্যেকেরই নিজনিজ। নিজের উন্নতি সাধনই জীবনের আসল কাজ। তোর জীবন ব্যক্তিগত জিনিস। তোর কর্তব্য বস্তুনিষ্ঠ নিরেট কাজে।"

জ্ঞানযোগী বিবেকানন্দ বাঙালি সমাজকে তর্কশাস্ত্রের কচকচানির ভিতর আনিয়া ফেলে নাই। ভক্তিযোগী বিবেকানন্দ'র পাল্লায় পড়িয়া বাঙলার নরনারী একটা নয়া বৈষ্ণব-আন্দোলনের ভক্তি বন্যায় ভাসিয়া যায় নাই। কিন্তু বাঙলার নবনারী কর্মযোগী বিবেকানন্দ'র জুতা খাইয়া প্রতিমুহূর্তের ব্যক্তিগত কর্তব্যনিষ্ঠায চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালি ছোঁড়া-বুড়ারা মানবজাতির ধর্ম, বিশ্বপ্রেম, সর্বজাতি সমন্বয়ের নীতি ইত্যাদি বুলিতে না মজিয়া নিজনিজ উন্নতি সাধন, নিজনিজ হাতের কাছের কর্তব্য পালনে প্রস্তুত হইতে শিখিয়াছে। ধরা ছোঁয়া যায় এমন নিরেট আত্মোন্নতির হদিস দিতে পারিয়াছে বলিয়াই বিবেকানন্দ একালের বাঙালির যুগাবতার।

বিবেকানন্দ'র বাঙালি বলিতেছে — "মা, আমায় মানুষ কর।" বলিতেছে না — "মা, দুনিয়াকে মানুষ কর।" বলিতেছে না — "রামাকে মানুষ কর, শ্যামাকে মানুষ কর, খ্রিস্টিয়ানকে মানুষ কর, ইয়োরোপকে মানুষ কর, আমেরিকাকে মানুষ কর।" বলিতেছে — "আমাকে মানুষ কর।" বলিতেছে না — "আহাম্মুকগুলাকে মানুষ কর, কাপুরুষগুলাকে

মানুষ কর।" বলিতেছে — "আমি আহাম্মুক, আমাকে মানুষ কর।" বলিতেছে — "আমি কাপুরুষ, আমাকে মানুষ কর।"

বিবেকানন্দি-নীতির চার খুঁটা

বিবেকানন্দ'র মানুষ গড়ার কল অতি সোজা। ইহার ভিতর আধিদৈবিক আর আধ্যাত্মিক বুজরুকি কিছুই নাই। ইহার পয়লা খুঁটা — "লাগা কুস্তি জোরসে"। বিবেকানন্দ বলিতেছে — "চাই হাতের জোর, চাই পায়ের জোর, চাই কোমরের জোব, চাই কব্‌জির জোর। চেহারাটা দুরস্ত হইবা মাত্র তোব মনিব তোকে দেখিয়া সম্মান করিতে শিখিবে। সেলাম করিবে তোকে তোর অন্নদাতা। বুঝ্‌লি? আর তুইও প্রতিমুহূর্তই মানুষের মতন জীবন চাখিয়া বেড়াইতে পারিবি।"

মানুষ গড়ার দ্বিতীয় কথা — "খা দু বেলা পেট ভরিয়া।" বিবেকানন্দ বলিতেছে — "আধপেটা-খাউয়া বাঙালি, একবেলা খাউয়া ভারতবাসী, তোরা আবার বাণী চালাবি কি রে? লাগিয়া যা চাষে লাগিয়া যা ব্যবসায়। লাগিয়া যা কুটীর-শিল্পে। লাগিয়া যা ফ্যাক্‌টরিতে যার যেমন সুযোগ, মুরদ বা মর্জি! কর্ দেশেব ধনবৃদ্ধি। খা দুবেলা পেট ভরিয়া। তাহা হইলেই বুঝিবি 'সিন্ধুনীরে আর ভূধরশিখরে যাওযা, কিংবা গগনের গ্রহ তন্নতন্ন করিয়া স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া' কি চিজ তাহা হইলেই দেখিবি যে, তোদেরও বাণী আছে আর সেই বাণী শুনিবার জন্য দুনিয়াও উদ্‌গ্রীব।"

তৃতীয় খুঁটা হইল লোকসেবা। বিবেকানন্দ বলিতেছে — "নিজের শরীরটা তো বেশ পাকাইয়া তুলিতেছিস্। ভালোকথা। ডন কছরত করিতে কবিতে নিজ স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হইতেছে বুঝিতেছিস্। এইবার লাগিয়া যা তোর পাড়ার লোকের ভিতর ডন, কছরত, কপাটি, ফুটবল ইত্যাদি কায়েম করিতে। লাগিয়া যা দেশসুদ্ধ লোকের স্বাস্থ্যোন্নতির কাজে। অকালমৃত্যু নিবারণের কাজে। যাদের শরীর দুর্বল। কর্ সাহায্য তাদেরকে সবল হইতে। ওষুধপত্র নাই যাদের কর তাদের জন্য দাওয়াইয়ের আর চিকিৎসার ব্যবস্থা। খোল্ হাসপাতাল, খোল্ ডিস্পেন্সারি। কর্ সবত্র জঞ্জাল পরিষ্কার, কর্ পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, দে লাগিয়ে জোড়া খালে-বিলে, দে ঝেড়ে ফেলে নোংরামি।" এই গেল শহরের মফস্‌সলের ছোটোবড়ো সকল নরনারীর জন্য স্বাস্থ্যোন্নতির পাঁতি। মুচিকে মুচি, ম্যাথরকে ম্যাথর, বিবেকানন্দ'র পাঁতিতে কেহই বাদ যাইবার নয়। প্রত্যেক গৃহস্থই মুচি-ম্যাথরের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান নিজ স্বাস্থ্যোন্নতিরই সঙ্গে সঙ্গে স্বধর্মপালনের অন্তর্গত করিতে শিখিয়াছে।

লোকসেবার আর একটা বড়ো কথা — জলদান আর অন্নদান। বিবেকানন্দ বলিতেছে — "দুবেলা নিজের খাবার তো বেশ জুটিয়াছে দেখিতেছি। এইখানেই শেষ করিলে চলিবে না। পাড়ার লোকগুলা খাইতে পারিতেছে কিনা খুঁজিয়া দ্যাখ্। চালা পল্লি গবেষণা — জেলায় জেলায় আর্থিক অনুসন্ধান। কোন্ কোন্ পরিবারের ঘরে হাঁড়ি চড়িতেছে না, কোন্ কোন্ লোক দুবেলা আঁচাইবার সুযোগ পায় না, বাহির কর্ বাড়ি-বাড়ি টহল করিয়া, মোলাকাৎ চালাইয়া। আর সঙ্গে সঙ্গে কর্ খরচ গরিবদেরকে ভাতকাপড়ের মাপে ঠেলিয়া

তুলিবার জন্য। আর পারিস তো দে তাদেরকে দুমুঠো ভাত। খোল্ অন্নসত্র, খোল্ অনাথ-আশ্রম।" এই পাঁতির ভিতরও আবাব বামুন-সেবা, চামার-সেবা, মুর্দাফরাস-সেবা সবই সমানভাবে বিবাজ করিতেছে।

লোকসেবার আর এক পাঁতি হইল বিদ্যাদান। বিবেকানন্দ বলিতেছে — "লেখা পড়া তো শিখিয়াছিস্ দেখিতেছি ভালোই। কিন্তু পাড়ার লোকগুলা কি নিরক্ষর থাকিবে? যা লাগিয়া পাঠশালা খুলিতে। দে হর রোজ ঘণ্টা খানেক করিয়া মুচির ছেলে মেয়েকে, চাষির ছেলেমেযেকে, অস্পৃশ্যের ছেলেমেয়েকে, মায় নিরক্ষর বামুন-কায়েথ-বৈদ্যের ছেলেমেয়েকে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখাইবার জন্য।"

খোলা-চোখের মহাপুরুষ

বিবেকানন্দী-নীতির এই সকল খুঁটা মুহুরিও বুঝে, ব্যাপারীও বুঝে, আদালতের কর্মচারীও বুঝে, উকিল-হাকিমও বুঝে, জমিদার বুঝে, ইস্কুল মাস্টারও বুঝে। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্" — মন্তব অনুসারে যে কোনো লোকই জীবন গড়িয়া তুলিতে রাজি। "দারিদ্র্য দোষো গুণরাশিনাশী" — এই বয়েৎটা বুঝেনা সংসারে এমন কোনো লোক নাই। তাহা ছাড়া জলদান, অন্নদান, বিদ্যাদান আর ঔষধদানের মারফত নারায়ণকে দরিদ্রের মধ্যে পাক্ড়াও করিতে পাবিলে অথবা দরিদ্রকে ছুঁইয়া ভগবান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিলে সকলেরই জীবনে আশার সঞ্চার হয়।

বিবেকানন্দ সংসারের লোককে ডাকিয়া হাঁকিয়া বলিতেছে — "তুই যেখানে আছিস সেইখানেই নামজাদা বীর হইতে পারিস। মহাপুরুষ বনিবার জন্য তোর গৃহস্থালী ছাড়িবার দবকাব নাই, তোর বনে-জঙ্গলে যাইবার দরকার নাই। চোখ বুজিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান-ধাবণায় বসিবার দরকার নাই। খোলা চোখে, রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতেই, দোকানদারি, উকিলি আব ইস্কুলমাস্টারি চালাইতে চালাইতেই তুই দেবতা হইতে পারিস্।" যে বিবেকানন্দ চোখ বুজিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত সেই বিবেকানন্দ'র মুখেই এই বাণী।

কথাটার দাম লাখ টাকা আর লোক সমাজে ইহার আদর বেশি।

বিবেকানন্দ বলিতেছে সজোরে যেখানে সেখানে আর যখন তখন — "পালোয়ান হইলে, ভাত কাপড়ে কাহারও গলগ্রহ না থাকিলে, কুস্তির আখড়া খুলিলে এবং অন্নসত্র-হাসপাতাল-পাঠশালা ইত্যাদি গঠন করিলে নরদেবতা হওয়া সম্ভব, বাপ কা-বেটা হওয়া সম্ভব, মানুষ হওযা সম্ভব।" এই কথাটা যে লোক শুনে সেই লোকের বুক চওড়া হয়। আর আত্মা বাড়িয়া উঠে "তিন হাত"। তার রক্তের স্রোত ছুটিতে থাকে সবেগে আনন্দে। আর বাস্তবিক পক্ষে বাঙালি জাতির নানা প্রকার পুরুষ-নারীকে বিবেকানন্দ'র বকাবকি "তিন হাত" চাঁড়িয়াছেও। প্রতিদিনকার মামুলি খাওয়াপরায় আর চলাফেরায় মানুষকে ঠেলিয়া তুলিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া বিবেকানন্দ বঙ্গসমাজের অলিতে গলিতে দিগ্‌বিজয়ী বীর। মামুলি মানুষকে এইরূপ বাড়তির পথে আনিয়া খাড়া করিবার ক্ষমতায়, সংগ্রামময় জীবনের কর্মক্ষেত্রে ঠেলিয়া তুলিবার ক্ষমতায়, — বিবেকানন্দ'র বিশ্বকোষ জগদ্‌বরেণ্য।

দেখা কলা দুনিয়াকে

এইখানেই বিবেকানন্দ'র মানুষ গড়ার কর্মকৌশল খতম করা সম্ভব। কিন্তু আরও কিছু আছে, — বেশ জবররূপেই আছে। বিবেকানন্দি পাঁতির চতুর্থ খুঁটা হইতেছে — "দেখা কলা দুনিয়াকে।"

বিবেকানন্দ বলিতেছে — "দ্যাখ্ কেরানি, দ্যাখ জমিদার, দ্যাখ্ ইস্কুল মাস্টার, ঘরবাড়ি-গাছ-পাহাড় সবকিছুর দিকে তাকাবি আর ভাব্‌বি যে, দুনিয়াখানাকে গুঁড়া করিয়া ফেলা তোর মর্জিরই অধীন। সংসারের যা কিছু দেখিতে পাস্ সবকিছুর উপরেই তোর কর্তামি রহিয়াছে। সবই তোর পায়ের তলায় অবস্থিত। বাধা আসুক হাজার হাজার, বিঘ্ন আসুক পর্বতপ্রমাণ। সবই তোর ব্যক্তিত্বের নিকট লোপাট হইতে বাধ্য। বল্ সর্বদা যে, দুনিয়াকে গোলাম করিয়া রাখিবার জন্যই তোর জন্ম। বল্ যখন-তখন যে, বাধাবিপত্তি গুলাকে পিষিয়া ফেলিয়া অথবা সেইসব গুলাকে কাজে লাগাইয়া তাহার উপর বিজয় ঝাণ্ডা উড়ানোই তোর স্বধর্ম।"

বিবেকানন্দ'র কর্মে ও চিন্তায় যদি কিছু "আধ্যাত্মিকতা" থাকে তবে তাহা এই "অহঙ্কারের" ভিতর ঢুঁড়িতে হইবে। অহঙ্কারের এই দস্তুল যে জীবনে নাই সেই জীবনে বিবেকানন্দ প্রবেশ করে নাই। অহঙ্কারের এই দস্তুলে যে জীবন চাঙ্গা হইয়াছে সেই জীবনই বিবেকানন্দ'র লীলাক্ষেত্র। লোকেরা হয়তো বলিবে — "আরে ভায়া, এই ব্যক্তিত্বনিষ্ঠা, এই পুরুষকার, এই পৌরুষ প্রতিষ্ঠা, এই আত্ম-গৌরব, এই আত্ম-চৈতন্য, এই আত্ম-কর্তৃত্ব, এই অহঙ্কার, এই সবই যে বেদান্ত।" বিবেকানন্দ বলিবে — "আরে ভাই পদা, আরে ভাই আবদুল এসব বেদান্ত কিনা জানিনা। এই সবই আমি, এই সবই বিবেকানন্দ।"

☐ *বাড়তির পথে বাঙালী*, ১৯৩৫

ভাষার অত্যাচার

সুকুমার রায়

হাতের কাছেই যাহা থাকে, যাহাকে লইয়া অহরহ কারবার করিতে হয়, তাহার যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে খুব একটা স্পষ্ট অনুভূতি আমাদের মধ্যে অনেক সময়েই দেখা যায় না। এই দেহটাকে মাটির উপর খাড়া ভাবে দাঁড় করাইয়া রাখা যে কতটা অচিন্তিত নৈপুণ্যের পরিচায়ক ও প্রতিমুহূর্তে তাহার পতনের সম্ভাবনাকে অক্লেশে এড়াইয়া চলায় গণিতের কত জটিল তর্ক যে পদে পদেই অতর্কিতে মীমাংসিত হইয়া যায়, তাহার বিস্তৃত হিসাব লইতে গেলে এ ব্যাপারের গুরুত্ববোধে হয়তো আমাদের চলাফেরার স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিত।

তেমনি কতকগুলি কৃত্রিম অযৌক্তিক ধ্বনির সংযোগে কেমন করিয়া যে আমার মনেব নাড়ীনক্ষত্র সমস্ত দশজনের কাছে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহার সূত্রান্বেষণ করিতে গেলে মনে হইতে পারে যে এতবড় আজগুবি কাণ্ড বুঝি আর কিছু নাই। 'গাধা' শব্দটা উচ্চারণ করিবামাত্র দশজন লোকে কোনো চতুষ্পদবিশিষ্ট সহিষ্ণু জীবের কথা ভাবিতে লাগিল। নিমন্ত্রিতের পেটে যে ক্ষুধানল জ্বলিতেছে তাহা কেহ দেখে নাই; কিন্তু সে 'লুচি' 'লুচি' বলিয়া বাতাসে একটা তরঙ্গ তুলিবামাত্র চক্রাকার ঘৃতপক্ক দ্রব্য বিশেষ দেখিতে দেখিতে তাহার পাতে হাজির! অথচ এ সকলের কোনো ন্যায়সঙ্গত সাক্ষাৎ কারণ দেখা যায় না; কারণ নামের সঙ্গে নামির সাদৃশ্য বা সম্পর্ক যে কোথায়, তাহা আজ পর্যন্ত কেহ নির্দেশ করিতে পারে নাই। সুতরাং বলিতে হয়, ভাষা জিনিসটা গোড়া হ'তেই একটা কৃত্রিমতার কারবার। কিন্তু তাই বলিয়া ভাষার ব্যবহারে কেবা নিরস্ত থাকে!

সুবিধার খোঁজ করিতে গেলেই তাহার আনুষঙ্গিক দু-চারটা অসুবিধা স্বীকার করিতেই হয়। সুবিধার খাতিরে আজ একটা জিনিসকে স্বীকার করিয়া লইলে দুদিন বাদে সে কিছু-না-কিছু অন্যায় দাবি করিবেই। কার্যের সুব্যবস্থার জন্যই লোকে নানারূপ কার্যপ্রণালী ও নানারূপ নিয়মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু কার্যত অনেক সময়ে তাহার ফল দাঁড়ায় ঠিল উল্টা। যেটা উপলক্ষ থাকা দরকার সেইটাই একটা প্রধান লক্ষ্য হইয়া নূতন কতগুলি অসুবিধার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। সমাজের এক-একটা বিধিব্যবস্থা মূলত সুযুক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেও, কালক্রমে অন্যায় রকম ব্যাপকতা ও ঔদ্ধত্য লাভ করিয়া তাহারা কিরূপে পুরুষপরম্পরায় মানুষের সহজবুদ্ধির ঘাড়ে চাপিয়া বসে, আমাদের দেশে তাহার ব্যাখ্যা বা দৃষ্টান্তের আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। যে কারণে মানুষ শাস্ত্রব্যবস্থার উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়া তাহার অনুশাসন লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, ঠিক সেই কারণেই মানুষের চিন্তা আপনার উদ্দিষ্ট

সার্থকতাকে ছাড়িয়া কতগুলি বাক্যের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে চায়। এ অবস্থায় বাক্য যে মাথায় চড়িয়া বসিবে তাহাতে বিচিত্র কি?

সব জিনিসেরই একটা সোজা পথ বা শর্টকাট খুঁজিবার চেষ্টা মানুষের একটা অস্থিমজ্জাগত দুর্বলতা। কোনো একটা চিন্তাধারার আদ্যোপান্ত অনুসরণরূপ দুরূহ কার্যকে সংক্ষেপে সারিবার জন্য আমরা মোটামুটি কতগুলি শ্রুতি বা আপ্তবাক্যের আশ্রয় লইয়া মনে করি ঐসকল তত্ত্বের সহিত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল। ডারউইনের ইভোলিউশন থিওরি বা অভিব্যক্তিবাদ জিনিসটা যে কি, সেটা অনুসন্ধান করা আবশ্যক বোধ করি না। কিন্তু ইভোলিউশন বা অভিব্যক্তি কথাটাকে আমরা খুব বিজ্ঞের মতো গ্রহণ কবিয়া বসি, এবং আবশ্যক হইলে ও বিষয়ে সাবধানে দু-চারটা মতামত যে ব্যক্ত করিতে না পারি এমন নয়।

কথায় বলে, "ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হয়।" ভাষারূপ বাহনটার খাতিরে চিন্তা যে কেমন করিয়া পঙ্গুত্বলাভ করে তার দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি চারিদিকেই। যে কোনো জটিল জিনিসকে কতগুলি পরিচিত নামের কোঠায় ফেলিয়া লোকে মনে করে বিষয়টার একটা নিষ্পত্তি করা গেল। ইংরিজি গীতাঞ্জলি পাঠ করিয়া একজন ইংরেজ আকাশ-পাতাল ভাবিয়া অস্থির যে এই লেখাগুলিকে তিনি কোন পর্যায়ভুক্ত করিয়া কী ভাবে দেখিবেন! পরে যখন তাঁহার খেয়াল হইল যে এগুলিকে মিস্টিক্ আইডিয়ালিজিম্ বা ঐরূপ একটা কিছু বলা যাইতে পারে তখন তাঁহার সমস্ত উৎকণ্ঠা দূর হইল এবং তিনি এমন একটা নিশ্চিন্ততার ভাব প্রকাশ করিলেন যেন তাঁহার আর কিছু বুঝিতে বাকি নাই।

এক একটা কথা আসে অতি নিরীহভাবে চিন্তার বাহনরূপে। কিন্তু চিন্তার আদর তো চিরকাল সমান থাকে না; সুতরাং তাহার আসনচ্যুতি ঘটিতে কতক্ষণ? বাহনটা কিন্তু অত সহজে হটিবার নয়; সে তখন একাই চিন্তার ক্ষেত্রে দাপাদাপি করিয়া আসন জমাইয়া রাখে। ইহাকেই বলি ভাষার অত্যাচার। ভাষা ভাববাহন কার্যেই নিযুক্ত থাকুক; সে আবার চিন্তার আসরে নামিয়া আপনার জের টানিতে থাকিবে কেন? শঙ্করাচার্যের অদ্বৈততত্ত্বে 'মায়া' শব্দটার অর্থ কি, আমরা হয়তো কোনকালে ভুলিয়া বসিয়াছি কিন্তু ঐ 'মায়া' শব্দটা আমাদের ছাড়ে নাই। সংসারকে এইভাবে 'কিছু নয়' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত কি না, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় বাস্তবিক কী ভাবে কী করিতে বলা হইয়াছে সে কথা ভাবিবার অবসর হয় না। কতগুলি শব্দ শুনি যাহার অর্থ বা ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের চিন্তার যোগ অতি সামান্য অথচ আমাদের ধারণা এই যে কথাগুলির মধ্যে খুব এক-একটা গভীর চিন্তা নিহিত আছে। তাহার উপর এক একটি শব্দ আবহমানকাল হইতে নিরঙ্কুশভাবে চলিত থাকিলে কালক্রমে তাহার মধ্যে স্বভাবতই এমন একটা চূড়ান্ত মীমাংসার ভড়ং প্রকাশ পায় যে শব্দের মোহে পড়িয়া আমরা কথাগুলিকেই নাড়াচাড়া করি আর মনে করি খুব একটা উচ্চচিন্তার আলোড়ন চলিতেছে। একটি প্রবীণ গোছের ভদ্রলোক কৃষ্ণলীলার সমর্থনের উদ্দেশ্যে তর্ক করিতেছিলেন। তাঁহার যুক্তি প্রণালীটা এইরূপ — সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণাশ্রিত পুরুষ তিন রকম ভাবাপন্ন সুতরাং তিনের সাধনমার্গ ও অধিকারভেদ তিনপ্রকার। সুতরাং নিম্নস্তরের অবিদ্যাশ্রিত আদর্শের দ্বারা সাত্ত্বিকী প্রকৃতির

আশ্রয়ীভূত নিত্যমুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিচার করিলে চলিবে কেন। — ইত্যাদি। প্রতিপক্ষ বেচারা বাক্যজালে আবদ্ধ ও প্রত্যুত্তর দানে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। সগুণ-নির্গুণ পুরুষপ্রকৃতি প্রাণ কারণ শব্দব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি শব্দঘটার সাহায্যে নিজ নিজ বক্তব্যের মধ্যে গাম্ভীর্য সঞ্চয়ের জন্য অনেকেই সচেষ্ট, কিন্তু শব্দের মধ্যে যে ভাবটুকু ছিল, সে কোনকালে খোলস ছাড়িয়া পলাইয়াছে কে তাহার খবর রাখে? ঐ এক-একটা কথায় আমরা যে পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়া পড়ি, তাহাকে যতবার এবং যত সহজে মুখস্থ বুলির মতো আওড়াইতে থাকি, চিন্তাও ততই প্রমাদ গণিয়া একপা-দুইপা করিয়া হটিতে থাকে। কে অত পরিশ্রম করিয়া লুপ্তচিন্তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে! শব্দের গায়ে চিন্তার ছাঁটছুট যাহা লাগিয়া থাকে তাহাই যথেষ্ট, বাকিটুকু তোমার রুচি ও কল্পনা অনুসারে পুরাইয়া লও। ছাতার নীচে চটি চলিতেছে দেখিয়া লোকে বুঝিত বিদ্যাসাগর চলিয়াছেন। আমরা দেখি ভাষার ছাতা আর চটি, জীবন্ত বিদ্যাসাগরকে আর দেখা হয় না।

এক একটা কথার ধুয়া আমাদের স্বাভাবিক চিন্তাশক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া দেয়। মানুষের যে কোনো আচার অনুষ্ঠান চালচালন বা চিন্তা-ভঙ্গির প্রতি কটাক্ষ করিয়া লোকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কি সনাতন ধর্মবিধিকে উড়াইয়া দিতে চাও?" এবং সনাতন ধর্মের নজিরকে অর্থাৎ ঐ "সনাতন" শব্দটার নজিরকে এমন অকাট্যভাবে মনের সম্মুখে দাঁড় করায়, যেন ইহার উপর আর কথা বলা চলে না। তখন যাহা কিছু যথেষ্ট জীর্ণ ও পুরাতন তাহাই আমাদের কাছে সনাতনত্বের দাবি করে এবং আমাদের কল্পনায় সনাতনধর্ম জিনিসটা যে-কোনো বিধি নিয়ম আচার অনুষ্ঠানাদির সমারোহ শজারুবৎ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া ওঠে। কারণ, এই সকল শোনা কথায় আমরা এতই অভ্যস্ত যে ইহাদের এক-একটা মনগড়া অর্থ আমাদের কাছে আপনা হইতেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সেটাকে আবার ঘাঁটাইয়া দেখা আবশ্যক বোধ করি না। শাস্ত্রে 'ত্যাগ' বলিতে কি কি ছাড়িতে উপদেশ দেয় তাহা বুঝি আর নাই বুঝি আমরা ঐ ত্যাগ শব্দটার সঙ্গে ছাড়ার সংস্কারটুকুকে ধরিয়া রাখি। অমুক সংসার ছাড়িয়া পলাইয়াছেন, তিনি ত্যাগী; অমুক এত টাকা দান করিয়াছেন, তিনি ত্যাগী; অমুক এই অনুষ্ঠানে শক্তি ও সময় নষ্ট করিয়াছেন, তিনিও ত্যাগী। কর্মফলাসক্তি কিছুমাত্র কমিল না, দেহাত্মবুদ্ধির জড় সংস্কার ঘুচিল না, প্রভুত্বের অভিমান ও অহঙ্কার গেল না; অথচ শাস্ত্রবাক্যেরই দোহাই দিয়া 'ত্যাগের মাহাত্ম্য' প্রমাণিত হইল। এইজন্য এক একটা কথা সংশ্লিষ্ট চিন্তাকে মাঝে মাঝে আঘাত দিয়া জাগাইয়া দিতে হয়। কারণ, চিন্তা সে নিজগুণে যতই বড়ো হউক না কেন, আর দশজনের মনে নিত্য নূতন খোরাক না পাইলে তাহার ক্ষয় অনিবার্য। 'জাতীয়ভাব' 'ভারতীয় বিশেষত্ব' 'হিন্দুত্বের ছাঁচ' প্রভৃতি নাম দিয়া আজকাল যে জিনিসটাকে আমরা শিল্পে সাহিত্যে অশনে বসনে প্রয়োগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি, তাহার স্বরূপলক্ষণাদির বিষয়ে আমাদের ধারণা যতই অস্পষ্ট হউক না কেন, তাহাতে ঐ ঐ শব্দনির্দিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি আমাদের আস্থা ও সম্ভ্রমের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। সেটা হয়তো ভালোই, কিন্তু দশদিক হইতে যথেষ্ট মাত্রায়, অথবা যথার্থভাবে আঘাত না খাওয়ায় জিনিসটা যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে বোধহয় যে ঐ শব্দগুলিকে একবার বিশেষ রকমে ঘাঁটাইয়া দেখা আবশ্যক।

আমার চিন্তাকে কতগুলি শব্দের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলাম বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। সে চিন্তাতরঙ্গের ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাহাতেই আমার অজ্ঞাতসারে কতকগুলি শব্দের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়ে। শব্দের অর্থ তো চিরকাল একভাবে থাকে না, পরে একসময়ে হয়তো এক একটা শব্দের অর্থ লইয়াই মারামারি বাধিয়া যাইবে, আমার চিন্তার সদগতি হওয়া তো দূরের কথা। ঋগ্‌বেদের একটি ঋকের অর্থ রমেশবাবু প্রভৃতি এইরূপ করেন —

"বৃষ্টিজল শব্দ করিয়া পড়িল এবং (মেঘ বায়ু ও কিরণ) এই তিনের যোগে গাভীরূপী পৃথিবী বিশ্বরূপী (অর্থাৎ শস্যাচ্ছাদিত) হইল" — ইত্যাদি।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের মতে ইহারই অর্থ —

"পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সূর্যশক্তি এই ঘুরানকার্যে নিযুক্ত আছেন। এই শক্তিসকলের মধ্যস্থলে গর্ভদেবতা অটলভাবে স্থির রহিয়াছেন" — ইত্যাদি। ("আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ")

এখানে এক একটি শব্দের অর্থবাহুল্যই এইরূপ ব্যাখ্যা বিপর্যয় ঘটাইয়াছে। আবার, পুরাণাদি বর্ণিত রূপগুলিকে নিংড়াইয়া বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব নিষ্কাশনের চেষ্টায় যে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অর্থবিভ্রাট ঘটিয়া থাকে, তাহা সকলেই জানেন। একই কথার অর্থ তোমার আমার কাছে একরকম আর অন্য দশজনের কাছে অন্যরকম, এরূপ ঘটিলে ভাষার উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যায়। তত্ত্ব জিনিসটা যখন কবিত্বের খাতিরে রূপকের মধ্যে একেবারে হাত পা গুটাইয়া বসে, অথবা সে যখন 'হিং টিং ছটের' আকার ধারণ করে, তখন ভবিষ্যদ্বংশের কল্পনায় সে অতি সহজেই কাব্য বা ইতিহাস বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা, যাহা ইচ্ছা তাহাই হইয়া দাঁড়ায়।

একে তো ভাষার অর্থভেদ সর্বদাই ঘটিতেছে তাহার উপর নিজের পছন্দমতো অর্থ বাহির করিবার দিকে মানুষের স্বভাবতই একটু আধটু নজর থাকে। ইহার মধ্যে আবার যদি ইচ্ছাপূর্বক বা স্পষ্টই খানিকটা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে মানুষের বুদ্ধি এ অনর্থ ঘটাইবার সুযোগ ছাড়িবে কেন? সেকালে রোমীয় ধর্মশাসনের বিধি অনুসারে অবিশ্বাসী ধর্মদ্রোহীর জন্য এই মর্মে একটা ব্যবস্থা দেওয়া হইত, "ইহাকে আঘাত করিও না, কিন্তু বিনা রক্তপাতে ইহার দুর্মতির প্রতিবিধান কর।" এ কথাটার অর্থ করা হইত "এ ব্যক্তিকে পোড়াইয়া মার!" এইরূপে অশ্বত্থামার নিধনসংবাদে 'ইতিগজ' সংযোগের ন্যায়, ব্যক্তভাষায় অব্যক্ত অভিপ্রায়ের স্বগত উক্তিটা ভাষার অর্থকে যে কখন কোনমুখে ফিরাইয়া দেয় তাহা অনেক সময়ে নির্ণয় করা কঠিন।

ভাষা যে কেবল চিন্তাকে বিপথে ঘোরাইয়া বা তাহার আসন দখল করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহা নহে; সে এক এক সময়ে উদ্যোগী হইয়া আমাদের অজ্ঞতার উপর পাণ্ডিত্যের রঙ ফলাইতে থাকে। নিতান্ত সামান্য বিষয়েরও প্রকাণ্ড সংজ্ঞানির্দেশ করিয়া, অথবা যাহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না তাহারও একটা নামকরণ করিয়া, আমাদের বিজ্ঞতার ঠাট বজায় রাখে এবং আমাদের পাণ্ডিত্যের অভিমানকে নানারূপ ছেলেভুলানো কথার সাহায্যে আশ্চর্য রকমে জাগাইয়া রাখে। একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো একটা জিনিস হয়তো

আপাতদৃষ্টিতে সাক্ষীগোপালের কাজ করে মাত্র, অথচ তাহার উপস্থিতিটা কেন যে সেই ক্রিয়া নিষ্পত্তির সহায়তা করে, বৈজ্ঞানিক তাহার কারণ খুঁজিয়া পান না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছাত্র যখন এই ব্যাপারটাকে 'ক্যাটালিটিক একশন্' নাম দিয়া ব্যাখ্যা করে তখন সে হয়তো মনেই করে না যে এখানে ঐ শব্দটার আড়ালেই একটা প্রকাণ্ড অজ্ঞতার ফাঁক রহিয়াছে। আফিং খাইলে ঘুম আসে কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে মানুষ এক সময়ে সোমনিফেরাস প্রিন্সিপিলস্ বা নিদ্রোৎপাদিকা শক্তির কল্পনা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত। কিন্তু নিদ্রোৎপাদিকা শক্তির গুণে নিদ্রা আসে এ ব্যাখ্যা আর এখনকার যুগে ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রাহ্য হয় না; কারণ কেবল ভাষার উলট-পালটে যে যুক্তির প্রতিষ্ঠা হয় না, এ তত্ত্বটা এ ক্ষেত্রে নিতান্তই স্পষ্ট দেখিতে পাই। কিন্তু সৃষ্টিরহস্যের মূলে 'মায়া' বা 'অবিদ্যার' কল্পনা ঠিক এই শ্রেণীভুক্ত না হইলেও উহা যে আদৌ একটা ব্যাখ্যা বা মীমাংসা নয়, মূল প্রশ্নেরই স্পষ্টতর পুনরুক্তি মাত্র এবং এই নামকরণে যে কেবল আমাদের চিন্তার পরাজয়কেই স্বীকার করা হয়, একথা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না। বিজ্ঞানের এক একটি সিদ্ধান্ত বা 'ল' আওড়াইয়া আমরা মনে করি খুব একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল। অমুক কাজটা অমুক 'ল' অনুসারে সম্পন্ন হইল; 'এ্যকর্ডিং টু নিউটন'স্ থার্ড ল অফ মোশন', নিউটনের গতিবিষয়ক তৃতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান হইল। বলা বাহুল্য আইনটার খাতিরে কাজটা নিষ্পন্ন হয় না। কার্যত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার তুল্যতা দেখা যায় বা এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। 'অমুক সিদ্ধান্ত অনুসারে হয়' বলায় নূতন কিছুই বলা হইল না, কেবল সিদ্ধান্তকে তত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া দেখা গেল। তেমনি, আলোকতত্ত্বের বর্ণনায় 'ট্রান্‌সভার্‌স্ ভাইব্রেসনস্ অফ দি লিউমিনিফেরাস্ ইথার' বলায় চিত্তের চমক লাগিতে পারে; কিন্তু তাহাতে যে 'আমার আলোক চৈতন্যের কোনরূপ মীমাংসা হয় না, এ কথাটা শিক্ষিত লোকেও অনেক সময়ে ভুলিয়া যায়।

ভাষার একট বিশেষ সুবিধা ও অসুবিধা এই যে, চিন্তার আদ্যোপান্ত ইতিহাস বহন করিতে সে বাধ্য নয়। বড়ো বড়ো তত্ত্বগুলিকে সে এক একটা সংক্ষিপ্ত নাম বা সূত্রের আকারে ধরিয়া রাখিতে পারে। জ্যামিতিতে বিন্দু কল্পনার আবশ্যক হইলে, প্রত্যেকবার বলিতে হয় না যে — "এমন একটি অতিক্ষুদ্র দেশাংশ গ্রহণ কর যাহার আয়তন-কল্পনা সম্ভব নয় কিন্তু অবস্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে।" বিন্দু শব্দটার উল্লেখ করিলেই এই সকল চিন্তার ছায়া মনের মধ্যে আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। সেইরূপ অনেক জটিল তত্ত্ব আছে যাহাকে গোটাতত্ত্বের আকারে প্রত্যেকবার আওড়ানো চলে না। অথচ তাহাকে সংক্ষেপে দু-চারিটা কথায় সারিতে গেলেও বিপদের সম্ভাবনা। বিশেষত আত্মতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এক একটা কথার সঙ্গে মানুষের সঙ্গত অসঙ্গত নানাপ্রকার সংস্কার এমনভাবে জড়িত থাকে যে এক একটা শব্দ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের অলক্ষিতে এক একটা ব্যক্তিগত সংস্কারের প্রতিষ্ঠা করা হয়। ধর্ম বলিতে, আত্মা বলিতে, হাজার লোকে হাজার রকম অর্থ করে, অথচ এই কথাগুলি লইয়া লোকে এমনভাবে মারামারি করে যেন অর্থ সম্বন্ধে আর কোনো মতান্তর নাই।

এক ইংরেজ ভদ্রলোক বাইবেলের একটু উক্তি তুলিয়া বলিতেছিলেন, "তোমরা তো

বিশ্বাস কর যে এই সংসাবটা কেবল 'ফ্লেস' নয়, জড়ের ব্যাপার নয়, ইহার মধ্যে স্পিরিট আছে।" আমি অতর্কিতে কথাটাকে স্বীকার করায় তিনি ভারি খুশি হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমরা ওরিয়েন্টাল (প্রাচ্য) লোক কিনা, তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে। তোমাদের পক্ষে প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করা খুব স্বাভাবিক।" তখন বুঝিলাম তিনি স্পিরিট বলিতে ভূতপ্রেত ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না।

জগতের কাছে দাঁড়াইতে গেলে চিন্তামাত্রকেই কতগুলি শব্দকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইতে হয়। কোনো কোনো স্থলে এই যোগটা এত ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়ায় যে শব্দটাকে বাদ দিয়া চিন্তাটাকে ব্যক্ত কবা দুঃসাধ্য হইযা পড়ে। বৈষ্ণবতত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলেই লীলা রস ভক্তি ভক্ত ভগবান প্রভৃতি কতগুলি শব্দকে একেবারেই বাদ দেওয়া চলে না। পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশতত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলেই হেরিডিটি, ভেরিয়েশন, স্ট্রাগল্ ফর এক্সিস্‌টেন্স্, ন্যাচারাল সিলেকশন, (উত্তরাধিকার, পরিবর্ত, জীবন-সংগ্রাম, যৌননির্বাচন) প্রভৃতি কথাগুলি অপরিহার্যরূপে আসিয়া পড়ে। কথাগুলিকে না বুঝিয়া গ্রহণ করায় তো বিপদ আছেই, বুঝিয়া গ্রহণ করিলেই যে বিপদ একেবারে কাটিয়া যায় তাহাও নহে। মনের এক-একটি চিন্তাকে কতগুলি শব্দের আটঘাটের মধ্যে বাঁধিয়া দিলে সে চিন্তার পথ ভবিষ্যৎ যাত্রীর পক্ষে অনেকটা সুগম হইতে পারে; কিন্তু চিন্তাটাও ক্রমে প্রণালীবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং অনেক সময়ে দেখা যায় যে পরবর্তী যুগে যাঁহারা সেইসকল তত্ত্বের পূর্ণ মীমাংসা করিতে আসেন, তাঁহারা গোড়াতেই দু-একটা কথার বাঁধ ভাঙিয়া লইতে বাধ্য হন। যে বিষয়কে বা মতকে সাধারণ কথায় তত্ত্বের মতো করিয়া বুঝাইতে গেলে মনে তেমন কোনো সম্ভ্রমের উদয হয় না, সে-ই যখন দু-একটা বহুজনস্বীকৃত শব্দের ধ্বজা উড়াইয়া আসে তখন তাহার মর্যাদা ও গুরুত্ব যেন অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায। শব্দের আধিপত্য তখন আমাদের কাছে নানারূপ অসঙ্গত দাবি করিতে থাকে। ক্রমে হয়তো সেই ব্যাপারটাই যদি কেহ অন্যরূপ ভাষায় বা অন্য কোনো দিক হইতে ব্যক্ত করিতে আসে, সেই পরিচিত শব্দগুলির অভাবে তাহা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য হইয়া ওঠে। অথবা কাহারও চিন্তা ঠিক সেই সেই শব্দ নির্দিষ্ট পথে না চলিলেই মনে হয় যেন তাহা না জানি কোন অদ্ভুত পথে চলিয়াছে। হয়তো আর দশজন লোকের চিন্তার মধ্যে সেই পরিচিত প্রচলিত শব্দগুলির ঠিক যথাযথ স্থান নির্ণয় করাটা তখন ভারি একটা আবশ্যকীয় ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। মনের এইপ্রকার সংস্কারই মানুষের কাছে সর্বদা 'হাঁ-কি-না' 'এটা-না-ওটা' 'মানো-কি-মানো না' গোছের একটা প্রশ্ন দাঁড় করায়। নিরীহ ধর্মার্থীর কাছে সে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তুমি দ্বৈতবাদী না অদ্বৈতবাদী?" অথচ সে বেচারা হয়তো কোনো একটা বিশেষ বাদের পক্ষ হইয়া লড়াই করিবার কোনো প্রয়োজনই অনুভব করে না, হয়তো তাহার মনের কথাটাকে ঐরূপ একটা তত্ত্বের মারামারির আকারে প্রকাশ করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আমাদের রাজনৈতিক মত নির্ণয়ের জন্য এক সময় জিজ্ঞাসা করা হইত, "তুমি মডারেট না একস্‌ট্রিমিস্‌ট্" এই প্রশ্নই যেন রাজনীতির প্রকাণ্ডতম সমস্যা আর ইহার মধ্যেই যেন রাজনৈতিক শ্রেণী বিভাগের নিগূঢ়তম সঙ্কেত নিহিত রহিয়াছে। মডারেট একস্‌ট্রিমিস্‌ট্ (মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী) লিবারেল কন্‌সারভেটিভ (উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল) ক্যাথলিক

প্রোটেস্টানট্ (প্রাচীনপন্থী ও প্রতিবাদপন্থী) প্রভৃতি কথার দ্বন্দ্ব একেবারে নিরর্থক না হইলেও, ইহার ফলে কতগুলি সাময়িক মতবৈষম্য অযৌক্তিক দ্বৈততত্ত্বের আকাব ধারণ করিয়া এক একটি বিরোধকে চিরস্থায়ী করিবার পথ প্রশস্ত করিযা দেয়। আপাতবিরুদ্ধ কথার মূলে যে সমন্বয়তত্ত্ব নিহিত থাকে ভাষার বিরুদ্ধতা সে তত্ত্বটাকে গোপন করিয়া রাখে। এদেশে জ্ঞান ও ভক্তিব বিরোধ, কর্ম ও বৈরাগ্যের বিরোধ, প্রেম ও অনাসক্তির বিরোধ, কতক পরিমাণে শব্দবৈষম্যমূলক কৃত্রিম দ্বন্দ্বেরই পরিচায়ক। যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে এইসকল কথার ঘোরফেবের মধ্যে আটকাইয়া যান তাঁহাদের, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, একটা না হয় অপরটাব পর্যাযে পড়িতেই হয়।

মানুষে প্রশ্ন করে, "তুমি জাতীযতা জিনিসটা বিশ্বাস করা কিনা" "তুমি হিন্দুত্বকে মানো কিনা" আর সঙ্গে সঙ্গে একটা হাঁ-না গোছের জবাব প্রত্যাশা করে। বাস্তবিক কিন্তু অনেক স্থলেই পাল্টা প্রশ্ন ছাড়া আর কোনো জবাব সম্ভব হয় না, নতুবা কোন কোন অর্থে কী কী কথা কতদুর স্বীকাব করি বা না করি তাহার একটা বিস্তৃত ফর্দ দিতে হয়। আগে শুনি তুমি যাহাকে জাতীয়তা বল সেটার লক্ষণ কি? হিন্দু বা হিন্দুত্ব বলিতে তুমি কী কী জিনিস বুঝিয়া থাক? তবে তো বলিতে পারি তোমার জাতীযতাকে, তোমার হিন্দুত্বকে আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত কিনা। আমি অমুক জিনিসটাকে মানি আব অমুকটাকে মানি না, এক নিশ্বাসে একথা বলিযা ফেলা কার্যত যেমন সহজ তেমনি মারাত্মক। জগতের অর্ধেক মারামারি কেবল কথারই মারামারি। আমার অমুক ধর্ম বাস্তবিক কি বলেন তাহাও আমি জানি না, আর তোমার যথার্থ বক্তব্য ও আদর্শ কি তাহাবও ধার ধারি না, অথচ তোমার কাছে উত্তর দাবি করি তুমি অমুক ধর্মটা মানো কিনা অর্থাৎ ঐ শব্দসংসৃষ্ট আমার সংস্কারগুলিকে মানো কিনা। পুরাণে লেখে গন্ধর্বেরা বাক্যভোজী, তাহারা নাকি শব্দ আহার করিয়া থাকে। এক হিসাবে, গন্ধর্বশ্রেণীর জীব আমাদের মধ্যে বড়ো কম নয়। কিন্তু অর্থই যে বাক্যের সার এবং অর্থটাকে সম্যকরূপে পরিপাক না করিলে শব্দটা যে মনের পুষ্টি সাধনের অন্তরায় হইয়া উঠিতে পারে এই সহজ কথাটা আমাদের মনে থাকে না বলিয়াই চিন্তার কুপুষ্টিজনিত নানারকম রোগের সৃষ্টি হয়। বিচারবুদ্ধির পাদুকাস্পর্শে বাক্যমাত্রসার প্লীহাজীর্ণ সংস্কারগুলির অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া আমরা এক একটা শিখানো বুলিকে অতিরিক্ত যত্নের সঙ্গে যুক্তিতর্ক সন্দেহের কবল হইতে বাঁচাইয়া রাখি। "বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহুদূর" বলিয়া প্রাণপণে তর্ক করি এবং বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করি যে 'বস্তু'কে পাইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

ভাষা যে নিজের অর্থ গৌরবেই সত্য, একথা ভুলিয়া সে যখন কেবলমাত্র শব্দগৌরবে বড়ো হইতে চায়, তাহার অত্যাচার অনিবার্য। চিন্তা কোনোদিনই শব্দের দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে ও সম্যকরূপে ব্যক্ত হইতে পারে না। সেইজন্যই এক একটা সত্যকে পঞ্চাশবার পঞ্চাশরকম ভাষায় পঞ্চাশদিক হইতে দেখা আবশ্যক হয়। কিন্তু তবু দেখা যায় যে সত্যের মূলে প্রবেশ করিতে হইলে আর ভাষা পাওয়া যায় না, অথবা এমন ভাষা পাওয়া যায় না যাহা সত্যানভিজ্ঞের কাছে তত্ত্বকে ব্যক্ত করিতে পারে। অদ্বৈততত্ত্বের কথা নির্বিকল্প সমাধির কথা বলিয়াও এবং "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানা সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপং বিহায়" ইত্যাদি রূপকের

ব্যবহার করিয়াও ঋষিরা বলিতেছেন, "এ সকল তত্ত্বকে প্রকাশ করা যায় না, ইহা ভাষায় জানাজানি হইবার বিষয়ই নহে।" বুদ্ধদেব নির্বাণ তত্ত্বের কথা আজীবন বলিয়া গেলেন কিন্তু "নির্বাণ কি" এ প্রশ্নের সোজাসুজি কোনো উত্তরই দিলেন না। আমরা কিন্তু এ সকল কথাকে ভাষার মজলিশে টানিয়া অহরহই মারামারি করিয়া থাকি।

ভাষার আশ্রয় লইয়া যে কোনো অপকর্ম হয় তাহাকেই যদি ভাষার অত্যাচার বলা যায়, তবে ভাষা ঘটিত আরও অনেকপ্রকার অত্যাচারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমার কার্যটা তোমার মনঃপূত না হইলে তুমি যে সকল বাক্য ব্যবহার কর, সেও এক হিসাবে ভাষার অত্যাচার। অনিচ্ছুক ছাত্রকে পণ্ডিতমহাশয় যখন শাসন অনুশাসনের দ্বারা সংস্কৃত পড়িতে বাধ্য করেন ছাত্র নিশ্চয়ই তাহাকে ভাষার অত্যাচার বলিবে। তোমার ক্ষুধার সময়ে বা ব্যস্ততার মুহূর্তে তোমার কাছে দর্শনের তত্ত্ব বা কবিত্বের কথা আওড়াইতে গেলে তুমিও বলিবে — ভাষার অত্যাচার। ভাষা যখন বন্ধন ছিঁড়িয়া বি-ইউ-টি বাট পি-ইউ-টি পুট ইত্যাদিবৎ বৈষম্যের সৃষ্টি করে অথবা সে যখন রুশিয়ার মানচিত্রে বসিয়া তোমার উচ্চারণ শক্তির পরীক্ষা করিতে থাকে, সেও একরূপ ভাষার অত্যাচার বৈ কি! আর সর্বশেষে, এই প্রবন্ধটিকে আরও বিস্তৃত করিয়া ফেনাইতে গেলে তাহাও অত্যাচার বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

❑ *বর্ণমালা তত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ*, ১৩৬৩

কাব্য ও জীবন

মোহিতলাল মজুমদার

আধুনিক কালে য়ুরোপীয় সাহিত্যে যে কাব্য-বিজ্ঞানের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে বহু মনীষী কাব্য সম্বন্ধে যে সকল উপাদেয় তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ করিতেছেন, সে সকলের মধ্যে একটা কথা বিশেষ ভাবে সকলকেই আলোচনা করিতে দেখি। সে কথা এই যে, সকল উৎকৃষ্ট কাব্য জীবনেরই সত্য ও সুন্দরতম প্রতিরূপ — জীবন দীপিকা। কাব্য কল্পনামাত্র নয়, জগতেব বিপুল বিস্তারের মধ্যে যে সত্যসুন্দরের প্রতিবিম্ব শতখণ্ড দর্পণে ভগ্ন ও অসংলগ্ন ভাবে বিকীর্ণ হইযা আছে — অতি চঞ্চল ঊর্মি বন্ধুর নদীবক্ষে চন্দ্রবিম্বের ন্যায় যাহা পূর্ণাবয়ব হইতে পারিতেছে না — তাহারই একটি পূর্ণ প্রতিচ্ছবি কবি কল্পনায় ধরা পড়ে; কবি প্রতিভাই সেই প্রজ্ঞা, যাহার বলে সৃষ্টির এই অশান্তলীলায় — এই দিক্‌ভ্রান্তকাবিণী কামরূপা প্রকৃতির কটাক্ষ ঈক্ষণের — অন্তরালে ক্ষণিকের জন্য একটা গভীরতর অর্থ প্রকাশ পায়, জীবন ও জগতের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এজন্য ম্যাথু আর্নল্‌ড্‌ কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছিলেন — Criticism of Life: কিন্তু এই বাক্যের সুগভীর তাৎপর্য বুঝিতে না পারায় আজও পর্যন্ত এ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কের অবসান হয় নাই। এজন্য ম্যাথু আর্নল্‌ড্‌কে দায়ী করা যায় না;নানা উদাহরণ সহযোগে তিনি নিজেই এই বাক্যের যে অর্থ নির্দেশ করিযাছিলেন তাহাতে criticism-কথাটির আভিধানিক অর্থ ধরিয়া আপত্তি করিবার কোনো কারণ নাই। সকল কবি-সৃষ্টির মধ্যে একটা আত্মগত criticism যে থাকে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, এবং জীবনের criticism বলিতে যাহা বুঝায়, কবির সৃষ্টিধর্মের সহিত তাহার বিরোধ নাই। হোমার, শেক্‌স্‌পীয়ার, গেটে প্রভৃতি মহাকবিগণের কাব্য যে কারণে উৎকৃষ্ট বলিয়া ধারণা হয় — তাহাকে "Criticism of Life" বলিয়া অভিহিত করিলে এই বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে কোনওস্বরূপ গোলযোগ হইতে পারে না। মানুষ আপনার কল্পনাবলে যে জগৎ সৃষ্টি করে তাহা যতই মনোহর হউক, তাহাতে মানুষের স্বতন্ত্র কল্পনার মাহাত্ম্য যতই প্রমাণিত হউক, তাহার সঙ্গে ভাগবতী সৃষ্টির গভীরতর সামঞ্জস্য যদি না থাকে, তাহা হইলে এমন একটা সঙ্গতি বা সত্যের হানি হয়, যাহার জন্য মানুষের অন্তরতম চেতনা আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে; সে কাব্য সত্যকার বেদনা, আশ্বাস ও সান্ত্বনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। আবার, এই "criticism of life" কথাটার তাৎপর্য এই নয় যে, যাহা কিছু প্রত্যক্ষ ও পরিদৃশ্যমান, সেই ব্যবহারিক বাস্তব জীবনকেই কাব্যে যথাযথ চিত্রিত করিতে হইবে, অথবা তাহারই সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কারণ ম্যাথু আর্নল্‌ড্‌ একথাও বলিয়াছেন যে, কাব্যে যেমন 'truth of substance' থাকা চাই,

তেমনই 'high poetic seriousness' না থাকিলে তাহা উৎকৃষ্ট কাব্য হইতে পারে না। যথাদৃষ্ট জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতামূলক কতকগুলি Idea থাকিলেই কাব্য হইবে না, জীবনের গভীরতম সত্য কবির গভীরতম চেতনায় উদ্ভাসিত হওয়া চাই। "The high seriousness which comes from absolute sincerity" — এই যে কথাটি ম্যাথু আর্নল্ড্ অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন, ইহার সম্যক অর্থ করিলে তাঁহার 'criticism of life' কথাটির সম্বন্ধে আপত্তির কারণ থাকিবে না।

যে কল্পনায় বাস্তব জীবন সম্বন্ধে কোনও গভীর বেদনার অনুভূতি নাই, যাহা — সম্পূর্ণ নির্ভাবনায় জীবনের যতটুকু ভোগ করিতে পারে তাহা হইতেই — নানা রসরূপের সৃষ্টি করে, তাহা যে মিথ্যা এমন কথা ম্যাথু আর্নল্ড্ বলেন নাই। কিন্তু সেরূপ কাব্যে জীবনসম্বন্ধে 'absolute sincerity' নাই, এজন্য 'high seriousness'-ও নাই। যাহা কবির নিজস্ব খেয়াল কল্পনার ফল, তাহাতে 'truth of substance' নাই বলিয়া, তাহা ভাগবতী সৃষ্টির রহস্যে অনুপ্রাণিত নয় — তাহাতে sincerity নাই, 'adequate poetic criticism of life' নাই। এই প্রসঙ্গে এই কথাও তিনি বলিয়াছেন —

> For supreme poetical success more is required than the powerful application of ideas to life; it must be an application under the conditions fixed by the laws of poetic truth and poetic beauty.

অবশ্য এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কবি কাব্যরচনাকালে সজ্ঞানে এমন একটা নিয়ম পালনের সংকল্প করিয়া বসেন না — কাব্যসৃষ্টির মধ্যেই কবিপ্রতিভার এই গূঢ় প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণে ম্যাথু আর্নল্ড্ শেলীর মতো কবির সম্বন্ধেও এমন কথা বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই —

> – that beautiful spirit building his many-coloured haze of words and images" – "pinnacled dim in the intense inanne.

অবশ্য শেলীর কাব্যসম্বন্ধে ম্যাথু আর্নল্ডের এই মত কতখানি কি অর্থে যুক্তিসঙ্গত, মূল কাব্য-জিজ্ঞাসার পক্ষ হইতে সে বিচারের প্রয়োজন আছে;এবং ইহাও সত্য যে, কাব্যে যদি কোনও হিসাবে 'criticism of lfie' না থাকে, তবে তাহাকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে না। কিন্তু সে বিচার এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

ম্যাথু আর্নল্ড্-নির্দিষ্ট এই "sincerity"-কথাটির অর্থ কি? তিনি প্রমাণস্বরূপ যে সকল কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই হিসাবে যে সকল কাব্য অপকৃষ্ট বলিযা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে এই কথার একটা স্পষ্ট অর্থ পাওয়া যায়। জীবন ও জগৎ ব্যাপারে যে কবির হৃদয় সাড়া দেয় নাই, যিনি এই সৃষ্টির রহস্যকে উপেক্ষা করিয়া, জাগ্রত প্রত্যক্ষকে অবহেলা করিয়া, আত্মরতির মোহবিকারে স্বপ্ন প্রলাপ রচনা করেন, তাঁহার কাব্যে সত্যকার অনুভূতি নাই; তিনি মিথ্যারই মায়াজাল রচনা করেন। জীবনের চেয়ে সত্যকার কিছু নাই — কবিধর্মও জীবনধর্ম। প্রকৃতির নেপথ্য-গৃহে যাঁহার দৃষ্টি প্রবেশ করে নাই, যিনি এই জীবন যজ্ঞের হোতারূপে আপনাকে আহুতি করিয়া, সেই জল স্থল আকাশবিসর্পী বিশ্বপ্রাণ অগ্নির

হবিঃশেষ পান করিয়া দিব্যানুভূতি লাভ করেন নাই, তাঁহাব কাব্যে যেমন 'truth of substance' নাই, তেমনই sincerity-ও নাই; কারণ তাহা ভাববিলাস, কল্পনাবিলাস, সূক্ষ্ম চিন্তারসবিলাস মাত্র; তাহার মধ্যে সেই দিব্যশক্তি নাই যাহাব বলে কবিই বহির্জগৎ ও অন্তরের অহং — এই উভয়ের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান অতিক্রম করিতে পারেন, যাহাতে subject ও object -এর মধ্যে এক অপূর্ব উপায়ে সেতু যোজনা হয়; এবং কাব্যসৃষ্টির কতটুকু subjective ও কতটুকু objective — এ প্রশ্নের সমাধানে Psychology-র মূঢ়তা প্রকাশ পায়। কাব্যে আমরা সেই অহং অনুবিদ্ধ অথচ অহং নিরপেক্ষ চিরবিস্ময়কর সত্তাকে একটি অপূর্ব অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি কবি; এজন্য কাব্যই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ। যে কবির কল্পনা এই সৃষ্টিরহস্যেরই অনুগত নয়, যাঁহার বাঁশির রন্ধ্রগুলি এই জগজ্জীবন প্রশ্বাসবায়ুতে পূর্ণ নয়, যিনি এই রহস্যেব নিকটে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া "make me thy lyre"-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারেন নাই, তাঁহার কাব্যসৃষ্টি সন্ধ্যাকাশের বর্ণচ্ছটার মতোই ক্ষণস্বপ্নের ইন্দ্রজাল — চিরন্তন হরিতনীলিমার অমৃতরসে সিঞ্চিত নয়।

আমাদের দেশে বহুকাল পূর্বে যে ধরনের কাব্যবিচার প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাকে Metaphysic of Aesthetic Sentiment বলা যাইতে পারে। কাব্যবস্তুকে প্রাধান্য না দিয়া, কাব্যের বহিরঙ্গটাকেই মুখ্য স্থির করিয়া, কাব্যের যে স্বাদ-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহাতে ভারতীয় মনীষার গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু সেই বিচারের মধ্যে মধ্যযুগের scholasticism—বিষয়নিরপেক্ষ যুক্তিপ্রবণতাই — সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্যের শাঁস-খোসা বাদ দিয়া তাহার দেহগত details-কে কতকগুলি সাধারণ সূত্রে বাঁধিয়া আলঙ্কারিকগণ কাব্যের আত্মার সন্ধান করিয়াছিলেন।, এ বিচার কাব্য অপেক্ষা Aesthetics-এর অধিকতর উপযোগী। কারণ, classification বা generalisation কাব্য-জিজ্ঞাসার পক্ষে কতটুকু আবশ্যক তাহা, আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের রস যাঁহারা আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন। এই প্রাচীন কাব্যবিচারে কবি-মানসের পরিচয় নাই — যে সৃষ্টিশক্তি বা Imagination আধুনিক কাব্য-জিজ্ঞাসার একটি প্রধান বিচার্য বিষয় আলঙ্কারিকগণ কুত্রাপি তাহার মূল্য নির্ধারণ করেন নাই। কাব্যের সকল উপাদান ও উপকরণকে একটি নির্বিশেষ রসতত্ত্বের অধীন করিয়া লইলে, একটা philosophy of art দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু তাহা যথার্থ কাব্য-জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য সাধন করে না। কাব্য শুধুই একটা mode of art নয়, a mode of higher interpretation-ও বটে। জগতের প্রাচীনতম উৎকৃষ্ট কাব্য হইতে আধুনিক শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির সম্বন্ধে একথা খাটে। কবির কাব্যনির্মাণে যে সৃষ্টি-প্রেরণা আছে রসসৃষ্টিই তাহার সজ্ঞান উদ্দেশ্য নয়। তবে এ প্রেরণা আসে কোথা হইতে? এবং সে প্রেরণার sincerity কোথায়? এই জীবন ও জগতের সঙ্গে কবি-হৃদয়ের যে নানারূপ স্পর্শ ঘটে তাহাতেই কাব্যসৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হয়। এই স্পর্শহেতু যে গভীর ও বিচিত্র বেদনা, যে আকুল রহস্য-বিস্ময় কবিকে অভিভূত করে, তাহাতেই কবিচিত্তে সৃষ্টিপ্রেরণা জাগে; কারণ, বাস্তবের যে নিগূঢ় স্বরূপ তখন কবিকল্পনায় প্রকাশিত হয়, সেই রূপটিকে ধরিবার বা রূপ দিবার যে প্রবৃত্তি, তাহা এত সহজ ও এত প্রবল যে, তাহার জন্য কোনও সজ্ঞান উদ্দেশ্যের প্রয়োজন হয় না। এই যে সৃষ্টি — ইহা

প্রত্যেক কবির নিজস্ব; ইহা এতই স্বতন্ত্র, ইহার রূপ ও ভঙ্গি, এতই বিচিত্র যে, ইহাকে কোনো কতকগুলি বাঁধা-ধরা emotion -এর মার্কা দিয়া classify করিলেই জিজ্ঞাসার শেষ হয় না। যে-কোনো কাব্য বিশ্লেষণ করিলে যে একই রসতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, একথা আমি অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু কাব্যবিচারে কাব্যের সেই বৈচিত্র্য — কাব্যবস্তু ও তাহার রূপভঙ্গির অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করিয়া দিলে কাব্যের কাব্যত্বই থাকে না। প্রত্যেক কাব্যের এই যে বৈশিষ্ট্য, ইহার কারণ কি? জীবন ও কাব্যবস্তুর অসীম বৈচিত্র্য এবং তাহার সঙ্গে প্রত্যেক কবির কবিমানসের স্বাতন্ত্র্যই এই বৈশিষ্ট্যের কারণ। শেক্‌স্‌পীয়ার, মিলটন, ব্রাউনিং এই তিন কবির কবিমানস যেমন স্বতন্ত্র, তাঁহাদের কাব্যও সেইরূপ স্বতন্ত্র; আবার, একই-কবির বিভিন্ন কাব্যও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিচিত্র বিষয়-বস্তুর সঙ্গে বিচিত্র ভাবের এই যে সম্মিলন, এবং তাহার ফলে প্রত্যেক কাব্য যে অভিনব সৃষ্টিসৌন্দর্যে মণ্ডিত হইতেছে, যুগে যুগে যে নব নব রূপ গ্রহণ করিতেছে — এমন কি, রসিকের রসবোধেও যে স্বাদবৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহারই রহস্যসন্ধান আধুনিক কাব্য-জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়।

কাব্যরস-উপভোগের মধ্যে জগৎ ও জীবনসংক্রান্ত বস্তুবিশেষের emotion সর্বত্র প্রবল। রসবাদীদের মতে তাহা যদি নিম্নাধিকারীর কথা হয়, তথাপি বলিব — কাব্যরস-আস্বাদনে এই বস্তুবিশেষের চেতনা universal-এর অনুভূতির মধ্যেও জাগ্রত থাকে, এবং থাকে বলিয়াই একটি অপূর্ব সংবেদনার সঞ্চার হয়। যাহা particular, তাহা particular থাকিয়াই, একটি অসীমতার ব্যঞ্জনা করে বলিয়া কাব্যরস অনির্বচনীয়। কাব্যবস্তুর সম্পর্কে কাব্যরসের বিচারে একজন সমালোচক বলিতেছেন—

> It will be part of our theory that poetry with varying intensity reveals to us a world which answers to the gravest and deepest requirements of the mind, a world ideal in its harmony and its permanence, in its security and, above all, in its significance, but nevertheless a world real in its substance. That is to say, we must raise our speculation of this art until we can see every poem as the capture and preservation of some perfection of experience.

ম্যাথু আর্নল্‌ড্‌ যাহাকে 'poetic truth of substance' বলিয়াছিলেন, এখানে তাহাকেই 'perfection of experience' বলা হইয়াছে। ইহাই কবির অপূর্ব imagination -এর ফল, ইহারই নাম—খণ্ড, অস্পষ্ট ক্ষুদ্র বাস্তবকে পূর্ণ ও অখণ্ড করিয়া তোলা। ইহাই ম্যাথু আর্নল্‌ডের কথায় — "powerful poetic application of ideas to life", অথবা "a criticism of life under the conditions fixed by the laws of poetic truth and poetic beauty." এইজন্য সত্যকার কবিসৃষ্টি যেমন জীবন ও জগৎকে অতিক্রম করিয়া অবাস্তবের সাধনা করে না, তেমনই জীবনের মর্মগত রহস্য-বাস্তবের গভীরতর reality-কে-প্রকাশিত করাই শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম। জীবনের সহিত কাব্যের এই সম্বন্ধ—কবি-প্রতিভার এই সত্যকার সৃষ্টিধর্ম—কাব্যবিচারে সর্বাগ্রে গণনীয়। এই অর্থেই অপর একজন রসবিদ্‌ কাব্য-সমালোচক বলিয়াছেন—

If the technical art of poetry consists in making patterns out of languages, the substantial and vital function of poetry will be analogous, it will be to make patterns out of life"—"The poetry of each age must re-interpret and re-incarnate life anew.

আমাদের দেশীয় কাব্যবিচারে রসের উচ্চতত্ত্বের সন্ধান থাকিলেও কাব্যের এই "substantial and vital function"-এর দিকটা উপেক্ষিত হইয়াছে। এজন্য, Modern Study of Literature বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার পক্ষে এই ধরনের কাব্যজিজ্ঞাসা অনেকটা নিষ্ফল হইয়াছে। বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী—কাব্যের রসপরিমাণ-প্রক্রিয়া বুঝাইবার জন্য এই সকল ভাবের পর্যায় নির্দেশ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু scholsticism-এর প্রভাবে এগুলিকে (চিন্তাপ্রণালীর পথে) পশ্চাতে ফেলিয়া, আমাদের আলঙ্কারিকেরা একটি তত্ত্বের উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমি মহাকবি ও মহামনীষী গেটের কয়েকটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিব।

In aesthetics it is hardly correct to speak of the Idea of the Beautiful, for by so doing we dissever the Beautiful which after all cannot be conceive as being detached.

It matters a great deal whether the poet is seeking the particular for the universal or seeing the universal in the particular. The latter is the nature of poetry. It gives expression to the particular without in any way thinking of or referring to the universal. And he, who vividly grasps the particular will at the same time also grasp the universal, and will either not become aware of it at all, or will only do so long afterwards.

—শেষের কথাটিতে, পূর্বে যে কবিদৃষ্টির কথা বলিয়াছি, যাহার বলে খণ্ড, ক্ষুদ্র ও পরিচ্ছিন্নের মধ্যে অসীমের আভাস ফুটিয়া উঠে — বাস্তব experience perfect হইয়া দাঁড়ায় — তাহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

আমাদের আলঙ্কারিকেরা এই particular-কে উচিত মর্যাদা দেন নাই — দিলে, তাঁহারা যাহাকে 'সঞ্চারী' ভাব বলিয়াছেন, রসবিচারে তাহাকেই মুখ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন; এ সম্বন্ধে গেটের আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এ আলোচনা শেষ করিব। গেটে বলিতেছেন—

In a work of art, the question 'what' interests a man far more than the 'how', hence comes the practice of laying stress upon particular parts in which, if we pay particular attention, we shall ultimately find that the effect of totality is not wanting, even though it remained unnoticed by every one.

আলঙ্কারিকের কাব্যজিজ্ঞাসার এই how-টাই বড়ো হইয়াছে, what-কে তাঁহারা আমল দেন নাই;— এজন্য কাব্যবিচারে, সকল রসগ্রাহী পাঠকের পক্ষে যে প্রশ্ন সহজ ও স্বাভাবিক, কবিকর্মের সকল সৌন্দর্য যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে — তাহার সমাধান বা বিশ্লেষণ

নাই; জীবনসমুদ্রের ছায়ালোক-বিচিত্র ঊর্মিমালায় যে ক্ষণ-সৌন্দর্য কাব্যের ভিতর দিয়া চিরন্তনের ইঙ্গিতরূপে রসিকচিত্ত আকুল করিয়া তোলে, কবি-প্রতিভার সেই সর্বপ্রধান কৃতিত্বের কথা ইহাতে নাই।

কেন নাই? এ প্রশ্নের বোধ হয় উত্তর আছে। অন্তত আমাদের সাহিত্যে কাব্যের এই substantial ও vital function-এর স্পষ্ট লক্ষণ না থাকার একটা কারণ নির্দেশ করা দুরূহ নয়। কিন্তু তাহার পূর্বে সাহিত্য সম্বন্ধে একটা কথা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। অন্যান্য ইতিহাসের মতো সাহিত্যের ইতিহাসেও Mediaevalism বলিয়া একটা ব্যাপার লক্ষ করা যায়। শেক্‌স্‌পীয়ারের Hamlet বা গেটের Faust-কাব্যের সম্বন্ধে একটা কথা সকলেই বলিয়া থাকেন যে, ওই দুই কাব্যে মানব-মনের modern রূপটি বিশেষ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সাহিত্যের এই modern ভাবধারা বিশ্লেষণ করিলে, যে একটি প্রধান লক্ষণ ধরা পড়ে তাহারই অভাবাত্মক ধারণাই Mediaevalism। য়ুরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে মানুষের ভাবরাজ্যে যে যুগান্তর সুস্পষ্ট রূপে দেখা দেয়, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে Renaissance—একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক তাহার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন এইরূপ — "Discovery by mankind of himself and of the world"। ইহার পর হইতেই য়ুরোপের সর্ববিদ্যাবার্তাবিধি — Modern বলিতে যাহা বুঝায় — তাহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। গ্রিক সাহিত্য, কলা ও দর্শনের সঙ্গে আকস্মিক পরিচয়ে মানুষ জগৎ ও জীবনকে আর এক চক্ষে দেখিতে লাগিল।

> Human life which the mediaeval Church had taught them to regard but as a threshold and stepping-stone to eternity, acquired suddenly a new momentousness and value; the promises of the Church paled like its lamps at sunrise and a new paganism ran like wild-fire through Italy

— এই যুগান্তের পূর্বে সকল বিষয়ে seriousness হয়তো ছিল, কিন্তু scholsticism-এর চাপে জীবনের স্ফূর্তি কুত্রাপি ছিল না। আমাদের দেশেও এইকালে সাহিত্যরচনায় যেমন, তেমনি তাহার আদর্শবিচারে, জীবনের গভীরতম অনুভূতির স্থান বড়ো বেশি ছিল না। সেকালে কাব্যসৃষ্টিতে সত্যকার imagination বা 'perfection of experience'-এর প্রয়োজন হয় নাই; জীবনকে কতকটা আড়ালে রাখিয়া বাস্তব-মুক্তির সাধনাই ছিল রসচর্চার নিপুণতম কৌশল। আমাদের দেশে, এ যুগে একদিক দিয়া কাব্যের একটা বৃহত্তম মূল্য ছিল — it was a means of escape from the ills of the life। কিন্তু এই artistic monasticism-এর দ্বারা যে মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায় তাহা তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন নয় — এ অবস্থা বেশিক্ষণ টিকে না; তাই জার্মান দার্শনিক Schopenhauer খাঁটি Asceticism-এর পক্ষপাতী। তাঁহার মতে — "The Hindu Sannyasin shows the way"। জীবন ও জগতের সম্বন্ধে যে মনোভাবের ফলে ভারতীয় কাব্যবিচারে রস-বাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই, Imagination-এর পরিবর্তে Fancy, এবং স্বাভাবিকতার পরিবর্তে conceit কাব্যের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে। কাব্যরচনার জন্য কবিগণ যেন একটু সাজসজ্জা করিয়া বসিতেন — মানস-

চক্ষে বাস্তব-বিস্মৃতির অঞ্জন পরিয়া লইতেন। যে personality ও ব্যক্তিগত জীবনের গভীরতম experience-এর বাস্তব পরিচয় আমরা সকল উৎকৃষ্ট কাব্যে পাই বলিয়া একটি সুগভীর আনন্দ-বেদনায় মুগ্ধ হই, এবং কবিব এই ব্যক্তিগত ভাবদৃষ্টিব সাহায্যেই পাঠকের মনেও একটি সুগভীর আত্মপরিচয়ের আশ্বাস জাগে, সে রস এ সাহিত্যে বিরল।

এই বাস্তব-চেতনা বলিতে আমি কী বুঝি এবং বুঝাইতে চাই, তাহা পাশ্চাত্য সাহিত্যের ইতিহাস হইতে এক উদাহরণ দিয়া দেখাইব। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ফরাসি দেশে একজন কবির উদয় হইয়াছিল, ইঁহার নাম Francois Villon — এ নাম বোধ হয় অনেকেবই পবিচিত। একজন সাহিত্য-সমালোচক Villon-র সম্বন্ধে বলেন —

> He is the first poet in France and the greatest rouge in the history of Literature.

ইহার পরেই বলিতেছেন —

> With the advent of Villon mediaevalism breathed its last and with the death of mediaevalism was born the modern poetry of France.

এমন কথা বলার কারণ কি? তাহার উত্তর —

> The two hundred verses of the Grand Testament present for the first time in the literature of France, a distinct and striking personality, a personality distinct because he is alone a being of real flesh and blood, among a crowd of shadows
> It is from the contemplation of his own experience that the poet speaks... he looked in his heart and wrote, and his life is the theme of his writing.

সমালোচক আরও বলেন যে Villon-র কাব্যে মৃত্যু সম্বন্ধে যে গভীর বাস্তব-অনুভূতি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই তাঁহার কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য — Villon-র কবি-যশ ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত—

> In death he can see nothing but the horrors of dissolution. In brighter moments he may seek to console himself by a kind of philosophy, that all beauty must perish, that life is but fleeting and so on; but even while he speaks his teeth are chattering, and there rise up before his eyes the creaking gibbets of Montfaucon with his own place prepared and ready, and he hears the hollw croaks of the magpies rising upon the night air.
> (Villon নিজের জীবনে বহুবার গুরুতর দুষ্কৃতির জন্য কারাবাস এবং একাধিকবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।)

উপরিউক্ত উদাহরণের দ্বারা আমি কাব্যের আদর্শ নির্ণয় করিতেছি না — Villon-র কাব্যই যে আদর্শ কাব্য, এমন কথা বলিতেছি না। আমার প্রধান বক্তব্য এই যে, গভীরতম বাস্তবানুভূতি বা সত্যকার হৃৎস্পন্দনের উপরেই কাব্যপ্রেরণা নির্ভর করে। এই Villon-র

কাব্য সম্বন্ধে ম্যাথু আর্নল্ড্ একস্থানে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলে, এ বিষয়ে কিছুই বলিবার প্রয়োজন হইবে না। ম্যাথু আর্নল্ড্ লিখিয়াছেন —

> A voice from the slums of Paris, fifty or sixty years after Chaucer, the voice of poor Villon out of his life of riot and crime, has at its happy moments more of this important poetic virtue of seriousness than all the productions of Chaucer. But its apparition in Villon, and in men like Villon, is fitful : the greatness of the great poets, the power of their criticism of life, is that their virtue is sustained.

এই কথারই পুনরুক্তি করিয়া বলি, Hamlet ও Faust -কাব্যে experience, এই truth of substance, এই criticism of life, high and excellent seriousness দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে; তাই সে কাব্যের মূল্য এত বেশি। এই perfection of experience-ই কাব্যের প্রাণ; ইহাকেই ম্যাথু আর্নল্ড্ criticism of life বলিয়াছেন। পরবর্তী সমালোচকেরা এ বাক্যের ভিন্ন অর্থ করিয়া নানা বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই criticism of life – epic, drama বা narrative কবিতায় concrete কাব্যনির্মাণেই সে প্রকাশ পাইবে, এমন কথা কেহই বলিবেন না; উৎকৃষ্ট 'লিরিক' কবিতায় ভিন্ন ভঙ্গিতে ইহার প্রকাশ দেখা যায় — Villon-র কবিতাও 'লিরিক'। আবার, শুধু ভাবে বা রূপে নয়, ভাবনামূলক কবিতার মধ্যেও উৎকৃষ্ট কাব্যলক্ষণ থাকিতে পারে। যাঁহারা কবিতাপাঠ কালে ভাবনালেশহীন রসাস্বাদের পক্ষপাতী, তাঁহাদের মনে হয়তো এই শেষোক্ত শ্রেণীর কবিতা কবিতাই নয় — কিন্তু এ সকল কবিতার ভাবনাও যে ভাবহীন নয়, ছন্দ ও সুরের সহিত বাক্যযোজনার আবেগেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমি কালিদাসের একটি নিছক কবিতা ও তাহারই সঙ্গে সুইনবার্নের কয়েকটি ভাবনা প্রধান শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিব; ইহার কোন্‌টি কাব্যহিসাবে কতখানি সার্থক হইয়াছে, পাঠক সে বিচার করিবেন। কালিদাসের শ্লোকটি এই —

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম্
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি॥

[মেঘদূতের বিরহী যক্ষ প্রিয়ার উদ্দেশে বলিতেছে — হে চণ্ডি, আমি শ্যামালতায় তোমার অঙ্গসৌষ্ঠব, চকিত হরিণীর নয়নে তোমার দৃষ্টি, চন্দ্রে তোমার মুখকান্তি, শিখিপুচ্ছে তোমার কেশরাশি, এবং ক্ষুদ্র নদীতরঙ্গে তোমার ভ্রূবিলাস দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু হায়! কোনও একটির মধ্যে তোমার সমগ্র রূপসাদৃশ্য নাই]

সুইনবার্নের কাব্যের লাইন এইরূপ —

Love, that for very life shall not be sold,
Nor bought nor bound with iron nor with gold;
So strong that heaven, could love bid heaven farewell,

Would turn to fruitless and unflowering hell;
So sweet that hell, to hell could love be given
Would turn to splendid and sonorous heaven
Love that is fire within thee and light above,
And lives by grace of nothing but of love;
Through many and lovely thoughts and much desire
Led these twain to the life of tears and fire;
Through many and lovely days and much delight
Led these twain to the lifeless life of night.

এই দুইটি কবিতার কাব্যবস্তু স্বতন্ত্র হইলেও — একটি যেমন প্রিয়া বিরহিত প্রেমিকের একখানি ভাবচিত্র, অপরটি তেমনই প্রেম সম্বন্ধে কবির অতিশয় আবেগমূলক ভাবনার উৎসার। তথাপি সুইনবার্নের কবিতায় মানবজীবনের একটি মুখ্য experience-কে যে ভাবনাব দ্বারা মণ্ডিত করা হইয়াছে, সেই ভাবনার মূলে এমন একটি দিব্যানুভূতির আবেগ ভাষায়, ছন্দে ও সুরে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাতে জীবন-রস-রসিকের চিত্তেও সাড়া জাগে; অর্থাৎ এই ভাবনা অতিমাত্রায় ভাব তান্ত্রিক হইলেও, ইহাতে sincerity ও seriousness আছে। অপর পক্ষে, কালিদাসের কবিতাটিতে বিশুদ্ধ কল্পনাবিলাসই আছে, বাস্তবের নামগন্ধও নাই; এরূপ প্রেমোন্মাদ যদি সত্যকার জীবনে ঘটে, তবে তাহা কাব্যের বিষয় না হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্রের অধীন হওয়াই উচিত; কিন্তু বাস্তবের নামগন্ধ নাই বলিয়াই রসবাদী আলঙ্কারিকের মতে ইহাই একটি উৎকৃষ্ট রস-রচনা।

আধুনিক কালের কাব্যে এই জীবনের অনুভূতি গভীরতর হইয়া উঠিলেও সকল যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলিতেই criticism of life, বা higher interpretation of life আছে। কেবল, যখনই কোনো জাতির মধ্যে জীবনধর্ম, যে কোনো কারণেই হোক, ক্ষীণ হইয়া আসে, অথবা মানসবৃত্তির অতিরিক্ত প্রাধান্য ঘটে, তখনই সেই জাতির কাব্যে sincerity ও seriousness-এর অভাব হয়। কবি কল্পনা, হয় কেন্দ্রাতিগ ভাব মার্গে স্বপ্নপ্রয়াণ করে; নয় প্রাণহীন পঙ্কবিলাসে অধঃপতিত হয়। মধ্যযুগের পারলৌকিকতা ও বৈরাগ্যের অন্ধকার হইতে য়ুরোপ বহুদিন মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই জীবন ধর্ম আজ পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছে। কি কারণে, এবং কতকাল ধরিয়া এই অবস্থা ঘটিয়াছে সে অনুসন্ধান ঐতিহাসিক করিবেন, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটা passive পাশব চেতনা — একটা তামসিক দেহধর্মই — আমাদের মধ্যে আজও টিকিয়া আছে; জড়ের সহিত সংঘর্ষে আত্মার যে সজীবতা — হৃদয়কে অবারিত ও প্রসারিত করিয়া, ইন্দ্রিয়দ্বারে বাহিরকে সম্পূর্ণরূপে অন্তরে গ্রহণ করিয়া যে আত্মোপলব্ধি — তাহা হইতে আমরা বহুদিন বঞ্চিত আছি। মধ্যে মধ্যে যে দুই চারিজন মনীষী আবির্ভূত হইয়া জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে এই রক্তমাংসগঠিত দেহের মধ্যে যে প্রাণদেবতা রহিয়াছেন, তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় ও নিস্তেজ করা হইয়াছে; দেহের মধ্যেই দেহহীন হইয়া থাকিবার — স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি নিরোধ করিয়া অস্বাভাবিক মনোবৃত্তির অনুশীলন

করিবার — মানুষ না হইয়া অতিমানুষ হইবার পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আজিকার দিনেও এই অতীন্দ্রিয়বাদ, এই ভূমা, এই দেহতত্ত্ববর্জিত অধ্যাত্মজ্ঞান একটি নূতন রূপে দেখা দিয়াছে। যে monasticism এতকাল ধর্মে কর্মে জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিল্পকলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল — সেই নিঃসঙ্গ গুহাবাসীর ধ্যানবিলাসই আজ আবার সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় কাল্‌চারের দুষ্প্রধর্ষ Idealism য়ুরোপীয় কাব্যকলাকে আত্মসাৎ করিয়া — ভারতীয় ভাববাদ য়ুরোপীয় রূপবাদকে আশ্রয় করিয়া — যে আশ্চর্য নবজন্ম লাভ করিয়াছে, তাহাতেও জীবন ও জগতের সঙ্গে দেহগত পরিচয় নাই; "discovery by mankind of himself and of the world" বলিতেযাহা বুঝায়, সেই জগৎ সাক্ষাৎকার ও জীবন চেতনার পরিচয় নাই;তাই এ সাহিত্য প্রাণের উদ্বোধন করিল না। কবির বাঁশিতে অর্ধশতাব্দী ধরিয়া যে রাগিণী উৎসারিত হইয়াছে, সে সঙ্গীত একটি অপ্রাকৃত সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিয়াছে;তাহাতে কাব্যের দিক দিয়া ভারতীয় রসবাদের হয়তো হানি হইবে না, কিন্তু জীবনের দিক দিয়া এমন একটি আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে যাহাতে, বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ একটি পরম সত্যের ভাবস্বর্গে নিশ্চিন্ত হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে।

আমাদের Mediaevalism ঠিক য়ুরোপের Mediaevalism নয়; সেখানকার পারলৌকিকতা কখনও এমন একটি সুদৃঢ় অদ্বৈতভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে নাই — ইহলোকের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল মাত্র, তাহাকে শেষ করিতে পারে নাই। এজন্য প্রাণের দ্বন্দ্ব কখনও ঘুচে নাই, মানুষ অবশেষে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। তাই যেমনই সহসা দুয়ার একটু খুলিয়া গেল, অমনি য়ুরোপ ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। প্রকৃতির নিষ্ঠুর পীড়নে সেখানে প্রাণধর্ম বা দেহ চেতনা কখনও অলস হইতে পারে নাই — প্রাণকে ঘুম পাড়াইয়া মনের অদ্বৈতমহিমা জয়ী হইতে পারে নাই। এখানে প্রকৃতির শাসন অতিশয় শিথিল হওয়ায় জীবন সমস্যা অপেক্ষা মৃত্যুর সমস্যাই বড়ো হইয়াছে;বাস্তব প্রত্যক্ষের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করিতে হয় নাই বলিয়া, অবাস্তব অপ্রত্যক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার অবসর মিলিয়াছে; যে বীর্য জীবনযুদ্ধের জন্য প্রয়োজন হয় নাই তাহাই অধ্যাত্মসংগ্রামে নিয়োজিত হইয়াছে। এখানকার মানুষ কল্পনায় আত্মজয় তথা বিশ্বজয় করিয়াছে;বহুপূর্বকাল হইতেই দলে দলে সন্ন্যাসীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে;দিগ্বিজয়ী গ্রিকবীরকে ভারতীয় নগ্নক্ষপণক সঘৃণ কৃপাকটাক্ষের দ্বারা পরাস্ত করিয়াছে। এই মনোভাব আমাদের অস্থিমজ্জাগত। জগতে বাস করিব অথচ জগৎকে ভ্রূক্ষেপ করিব না, দেহ ধারণ করিয়া দেহকে মানিব না — এই প্রবৃত্তি বহুদিন প্রশ্রয় পাইয়া একদিন এমন অবস্থায় দাঁড়াইল যে তখন প্রাণ-ধর্মকেই সবচেয়ে প্রয়োজন কিন্তু সে আর সাড়া দেয় না। ভারতবর্ষ, দেহ ও আত্মা, অর্থ ও পরমার্থ এই দুইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়া নির্বিবাদে বাস করিতেছিল; কিন্তু একদিন বাহিরের এক দুর্ধর্ষ প্রাণবান জাতি এই ঘুমন্ত পুরীতে আপতিত হইয়া তাহার সুখ-স্বপ্ন নষ্ট করিল। কিন্তু তখন আর উপায় নাই, প্রাণ স্বাস্থ্য হারাইয়াছে। সেই দিন হইতে ভারতের ইতিহাসে যে অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে আজ তাহারই শেষ পৃষ্ঠা খুলিয়াছে। আজ সেই প্রাণ-ধর্ম যাহাদের মধ্যে জ্ঞানে ও বীর্যে পূর্ণবিকশিত হইয়াছে, পশ্চিমের সেই প্রকৃতি উপাসক জাতি ব্রহ্মের অগুব্যবসায়ীদের শেষ পিণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছে। এই মৃত জাতি মৃত্যু ধর্মকেই আঁকড়াইয়া আছে, কবির মুখ দিয়া জগৎকে

শুনাইতেছে — দেহেব চেয়ে আত্মা বড়ো; প্রকৃতির শান্ত আনন্দময়ী মূর্তিব ধ্যান কব; জাতীয়তা বর্জন করিয়া মহামানবেব আসন প্রস্তুত কব; মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতে প্রস্থান কব। এখনও সেই কথা, সেই উচ্চ চিন্তাব শূন্যবাদ, সেই বাস্তব ব্যভিচাবী শাশ্বত সনাতনের পূজা!

ভারতবর্ষ যে সত্যকে চাহিয়াছিল সে সত্য প্রকৃতির সত্য নয়, সে মন্ত্র জীবনের মন্ত্র নয়। প্রকৃতিও সনাতনী, তাহার ধ্বংস ও সৃষ্টি লীলার মধ্যে যে চিবন্তনী ধারার আভাস পাওয়া যায়, সে তত্ত্ব স্বতন্ত্র — তাহাকে ধ্যানের দ্বারা নয়, মূক-মুগ্ধ জীবনাবেগেব দ্বারাই উপলব্ধি কবিতে হয। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্' — এই বাক্যে যে সত্যেব ধাবণা আছে, তাহাব জয যে জগতে ঘটে, তাহা মানুষের জীবন-রঙ্গভূমি নয়। সে সত্যেব পূজা করিতে হইলে শ্মশানকেই তীর্থভূমি করিতে হয়, সর্বনাশকেই সর্বপ্রাপ্তি বলিযা মানিতে হয়। যতদিন সৃষ্টি থাকিবে ততদিন শ্মশানচারী দিগম্বরের প্রভুত্ব চলিবে না, তাহাব বক্ষে কালীই নৃত্য কবিবে; ততদিন উন্মাদবিজৃম্ভিত শ্বাশ্বত সত্য বা দেশকালাতীত অবাস্তবের সাধনা কখনও জয়ী হইবে না।

এই অবাস্তব ভাববিলাস জীবনকে পঙ্গু করে বলিয়াই সাহিত্যকেও প্রাণহীন করিয়া তোলে; সকল সাহিত্যেই ভাব যখন বস্তুকে ছাড়াইয়া উঠে, তখনই কাব্যের অধঃপতন হয়। আমাদের বর্তমান জীবন এইরূপ ভাববিলাসের অতিশয় অনুকূল। কিন্তু, একে জীবনীশক্তি ক্ষীণ, জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় বহুকাল যাবৎ ঘটে নাই, তাহার উপর ভাবস্বর্গের কল্পধেনুদোহন — ইহার ফলে জীবন চেতনার মতো সাহিত্য চেতনাও অসাড় হইয়া উঠিতেছে; তাই আমাদের কাব্য কেবল ছন্দ ও বাক্যের কঙ্কাল — অর্থহীনতাই তার রস, এবং অস্বাভাবিকতাই তাহার মৌলিকতা। জার্মান রোমান্টিকগণের ভাববিলাস যখন অতিচারী হইয়া পরিশেষে প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল, কবি Heine তখনকার সেই সাহিত্যের যে সমালোচনা করিয়াছিলেন, আমাদের আধুনিক কাব্য সেরূপ সমালোচনার উপযুক্ত হইতে পারিলেও ধন্য হইত; বরং গেটে এই যে কথাগুলি একস্থানে লিখিয়াছেন, আমাদেব কবিদের সম্বন্ধে তাহাই অধিকতর সত্য —

If feeling does not prompt, in vain you strive;
If from the soul the language does not come,
By its own impulse, to impel the hearts
Of hearers, with communicated power,
In vain you strive – in vain you study earnestly,
Toil on for ever; piece together fragments,
Cook up your broken scraps of sentences,
And blow, with puffing breath, a struggling light,
Glimmering confusedly now, now cold in ashes;
Startle the schoolboys with your metaphors;
And, if such food may suit your appetite,
Win the vain wonder of applauding children,

But never hope to stir the hearts of men,
And mould the souls of many into one,
By words which come not native from the heart,

— কিন্তু words আসিবে কোথা হইতে? — heart কোথায়? তাই এ সকল কবিতা সম্বন্ধে গেটের ভাষাতেই বলিতে হয় —

Oh! these fine holyday phrases,
In which you robe your worn-out common-places,
These scraps of paper which you crimp and curl,
And twist into a thousand idlc shapes,
These filigree ornaments are good for nothing,
Cost time and pains, please few, impose on no one;
Are unrefreshing as the wind that whistles
In autumn, 'mong the dry and wrinkled leaves.

কিন্তু এই ব্যাধি একটি নূতন রূপে দেখা দিয়াছে আধুনিক ছোকরা কবিদের কাব্যে। ইহারা নাকি এই বিলাসের বিরোধী — ইহারা জীবনেরই পূজারি। কিন্তু জীবন কোথায়? পিতৃপিতামহের মধ্যে তাহার যেটুকুও অবশিষ্ট ছিল, ইহাদের মধ্যে সেটুকুও আর নাই। তবু জীবন চাই-ই। য়ুরোপীয় সাহিত্যে জীবনের এত স্ফূর্তি! আমাদের ভিতর খুঁজিয়া তাহার এতটুকুও কি মিলিবে না? কিন্তু মেলে না যে! অগত্যা দেহের শেষদশাতেও যাহা একেবারে শেষ হয় না, সেই যৌন প্রবৃত্তিকেই ইহারা জীবনধর্ম বলিয়া ঘোষণা করিল; এবং অতিশয় অকথা কুকথাপূর্ণ — ব্যাকরণ অভিধানবর্জিত ভাষায় কাম বিদ্রোহ প্রচার করিল — শীর্ণ শবদেহকে দানোয় পাইল। ইহারই নাম হইল সাহিত্যের জীবনধর্ম! এই সম্পর্কে Faust হইতে আরও কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা চলে —

> The Night and Churchyard poets are engaged in an interesting conversation with a newly arisen vampire, from which they anticipate the development of a new school of poetry.

জীবনের নামে এ যুগের তরুণদের এই যে বিকারজনিত পিপাসা — সর্বাঙ্গে পঙ্কলেপন ও ধূলিভক্ষণ — জাতির পক্ষে ইহা যে কতবড় মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি, সে কথা হৃদয়বান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। জীবনকে চাই, এ জ্ঞান জন্মিয়াছে — পরের জীবন, পরের সাহিত্য দেখিয়া; কিন্তু সত্যকার জীবনধর্ম হইতে যাহারা বঞ্চিত, জীবন যে কি বস্তু তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি যাহাদের নাই, তাহারা পরের অনুকরণে যে জীবন ধর্মের পরিচয় দিতেছে তাহা কুৎসিত স্বপ্নবিলাস ও নির্জীব কাম জৃম্ভণ মাত্র। যাহা নাই, কল্পনায় তাহার ছায়া ধরিয়া একটা উন্মাদ উল্লাসের মর্মভেদী দৃশ্য আমরা সম্প্রতি রাজনীতির ক্ষেত্রেও দেখিয়াছি। হায় জীবন! বড়ো বিলম্ব হইয়া গিয়াছে; আরও পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এ পিপাসা জাগে নাই কেন? তখন জাতির দেহটা অন্তত সবল ছিল, এমন মস্তিষ্ক বিকৃতির সম্ভাবনা ছিল না।

জীবনের সহিত কঠিন প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বেদনা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যেও তেমন কবিয়া কবি প্রেরণার সাহায্য করে নাই; যে বেদনা কবিচিত্তে প্রতিফলিত হইয়া মৃত্যুকেও অমৃত করিয়া তোলে, ভারতের তত্ত্বজ্ঞান তাহাকে অবস্তু বলিয়া চিরদিন দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, জীবনকে জীবনের দিক হইতে দেখিবার চেষ্টাই করে নাই। তাই ভারতীয় কাব্যে ট্র্যাজেডির স্থান নাই। কিন্তু জীবন ও জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের এই যে বেদনা ইহাই সুরময় হইয়া কাব্যসৃষ্টি করে;এই সুরই মানুষের চিত্তকে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে — যাহা কঠিন, কর্কশ রুদ্র ও নির্মম তাহারই শোণিত-মাংস-লব্ধ বেদনায় মানুষ দেবত্বের সন্ধান পায়। কবি যথার্থই বলিয়াছেন —

Who ne'er in weeping ate his bread,
Who ne'er throughout the night's sad hours
Hath sat in tears upon his bed,
He knows you not ye Heavenly Powers!

এই যে দুঃখ, মনুষ্যজীবনে ইহা তো নিত্যনৈমিত্তিক, তথাপি ইহা জাতিবিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের কাব্যপ্রেরণার বস্তু হয় না কেন? তাহার কারণ, এই দুঃখ যদি শুধু passive পাশব চেতনার স্তরেই থাকিয়া যায়, তবে তাহার seriousness কোথায়? আবার যদি ইহা অবস্থাগুণে দেহচেতনারও আড়ালে থাকিয়া যায়, এবং প্রবল মানসিকতার চাপে চিন্তাবিলাসের বস্তু হয়, তবে তাহার sincerity কোথায়? আজ আমাদের দুঃখ পাইবার শক্তিও নাই, Idea-র জগতে বাস করিবার উপায়ও নাই। আজ সব ফাঁকি ধরা পড়িয়াছে, বঞ্চিত জীবন বহুকালসঞ্চিত ঋণের পরিশোধ দাবি করিতেছে, কিন্তু সে দাবি মিটাইবার ক্ষমতা নাই। আজ সেই ক্ষুধিত ব্যাধিগ্রস্ত জীবন বাস্তবেও যেমন কাব্যেও তেমনি, তার সেই vital substantial function-এর অভাবে আলেয়ার মতো দিক্‌ভ্রান্ত করিতেছে। একদিন এই জীবনকে উপেক্ষা করিয়া যে স্বতন্ত্র কাব্যজগৎ গড়িয়া উঠিয়াছিল আজ তাহা যেমন নিষ্ফল হইয়াছে, তেমনি এই জীবনেরই নামে যে অক্ষম মেরুদণ্ডহীন বাস্তব বিলাস দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে তাহার ফলও শোচনীয় হইয়াছে।

কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে আমি যে আলোচনা করিলাম তাহাতে কাব্যজিজ্ঞাসার সকল প্রশ্নের মীমাংসার দাবি করি না। আধুনিক কাব্যজিজ্ঞাসার প্রধান প্রয়োজন কি, তাহারই একটা ধারণা খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছি। Literature as a mode of art — বিচার করা এ প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নয়। Literature as a higher interpretation of life and nature বিচার করিবার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহাই আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কেবল Aesthetics ধরিয়া কাব্য বিচার করিলে কাব্যের যথার্থ বিচার হয় না;জীবনের সঙ্গে কাব্যের কোথায় কতখানি যোগ আছে তাহা বুঝিতে না পারিলে কাব্য বিচারে নানা অনর্থের সূত্রপাত হয় — সমাজনীতি ও ধর্মের কচকচি, অথবা তত্ত্ববিশেষের কুহেলিকায় কাব্যকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, কাব্যের সঙ্গে জীবনের এই নিগূঢ় সম্বন্ধ বুঝিতে পারায়, এতদিনে কাব্যের প্রকৃত সংজ্ঞা ও মূল আদর্শ ধরা পড়িয়াছে — ইহাতে বহু বিতর্কের অবসান হইবে। জীবনের প্রকাশ ও বিকাশ যেমন বিচিত্র, কাব্যের আদর্শও

তেমনি সচল। কাব্য জীবন ধর্মী বলিয়াই নবনবোন্মেষশালী। আবার রসসৃষ্টিতে যেমন, রসবোধের মধ্যেও তেমনি, এই বিকাশধর্মের লক্ষণ আছে — অভিনব কাব্যসৃষ্টির প্রভাবে রসিকেরও চিত্তবিকাশ হয়। তাই, গেটের মতো রসিকও অসঙ্কোচে স্বীকার করেন —

> I begin to find new qualities in the work, and new faculties in myself.

অতএব কাব্যবিচারে কাব্যের এই vital and substantial function-এর কথা যদি বুঝিয়া লওয়া হয়, তবে একদিকে যেমন তাহার বৈচিত্র্য ও স্বাধীন স্ফূর্তির ধারণা অক্ষুণ্ণ থাকে, তেমনই আর একদিকে তাহার স্ব-প্রকৃতির ব্যভিচার সহজেই ধরা পড়ে। কি প্রাচীন কি আধুনিক — সকল কাব্যের উৎকর্ষ বিচারে ইহার যে প্রামাণ্য লক্ষণ আমরা নির্দেশ করিতে পারি, তাহা এই —

> Poetry with varying intensity reveals to us a world which answers to the deepest and gravest requirements of the mind: a world ideal in its harmony and its permanence, in its security, and above all, in its significance, but nevertheless a world real in its substance.

আর একটা প্রমাণ এই যে, আমাদের দেশে আজকাল কাব্য বিচারে যে বাদবিসংবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে — কাব্যকে এইদিক দিয়া দেখিলে, তাহা মুহূর্তেই দূর হইতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দিব। অভিজাত সাহিত্য বা সাহিত্যের আভিজাত্য বলিয়া যে কথাটা কাব্যবিচারে আজকাল মাঝে মাঝে শুনিতে পাই, সে কথাটা যে কতখানি ভুল, তাহা সহজেই ধরা পড়িবে। কাব্যের উৎকর্ষ বিচারে ইহাই দেখিলে চলিবে না যে, তাহার মধ্যে Idea-র perfection বা Idealism কতখানি আছে, দেখিতে হইবে তাহাতে perfection of experience আছে কি না। যে কল্পনা কাব্যের আভিজাত্য রক্ষা করিবার জন্য জীবনের কায়াকে ত্যাগ করিয়া তাহার ছায়া লইয়া একটি সূক্ষ্ম মায়াজাল রচনা করে, সে কল্পনা কাব্যের পক্ষেও মিথ্যাচার। কাব্যবিচারে আভিজাত্য কথাটাই নিরর্থক। কাব্যে সৌন্দর্যই তাহার শুচিতা — সেই শুচিতা রক্ষা করিবার জন্য কবিকে ছুৎমার্গ অবলম্বন করিতে হয় না; কেন না, চাই perfection of experience; তাহা যদি হয়, তবে কাব্য সুন্দর হইতে বাধ্য; সেই সৌন্দর্যই তাহার শুচিতা। অপর পক্ষে, কল্পনার শুচিতা রক্ষা করিয়া যে সৌন্দর্যসৃষ্টি তাহাতে Idealism-ই থাকিবে, perfection of experience না থাকাই সম্ভব, এবং তাহা উৎকৃষ্ট কাব্য হইবে না। এইরূপ বৃথা তর্কের অবসান যাহাতে হয় সেই উদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা — নিজে যেমন বুঝিয়াছি তেমন করিয়া বুঝাইতে হয়তো পারি নাই; তথাপি আশা করি, এ আলোচনা একেবারে ব্যর্থ হইবে না।

□ *সাহিত্য বিচার*, ১৯৬৬

শিল্পকলার কথা

নলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রত্যেকটি কলাবিদ্যা আপনাতে আপনি পূর্ণ, কোনোটি কোনোটির অপেক্ষা বাখে না (*sui generis*), মানুষের অন্তরাত্মা হইতে সবগুলিই যুগপৎ ছুটিযা বাহির হইয়াছে। যে প্রেরণার সার্থকতাব জন্য সেই দিন মানুষের কণ্ঠে সুব দেখা দিল, সেই প্রেরণার সার্থকতাব জন্য সেই দিনই তাহাব হাতে উঠিল তুলিকা, বাটালি আব লেখনী। সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য আর কাব্য — মানুষেব একই সৌন্দর্যবোধের সৃষ্টি — প্রত্যেকটিই আপন আপন ধবনে সেই সৌন্দর্যসৃষ্টিব চবম পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে; সকলেই সকলের সমান, 'কেহ নহে ঊন'। সুতরাং মোলিয়েব যে নৃত্যেব ও সঙ্গীতের দুই ওস্তাদের মধ্যে একটা কলহের চিত্র দিয়াছেন (*Le Bourgeois Gentilhomme*) সেই রকম শিল্পীতে শিল্পীতে দ্বন্দ্ব করিবার কিছু নাই। তবে দ্বন্দ্ব যে সময়ে সময়ে দেখি, তাহার কারণ শিল্পীদেব আপন আপন শিল্পটির উপর আত্যন্তিক অনুরাগ, তাঁহাদের সৌন্দর্যবোধের একদেশদর্শিতা।

ঐতিহাসিক হিসাবে বোধহয় আগে পবে নাই, ভিতরের সারবস্তুর মূল্য হিসাবেও বড়ো ছোটো নাই, তবুও তত্ত্বের দিক দিয়া, অন্তরাত্মার অভিব্যক্তির দিক দিয়া কলাবিদ্যাগুলিকে স্তরে স্তরে আমরা সাজাইতে পারি, গুণ কর্ম হিসাবে তাহাদের মধ্যে একটা তারতম্য, অথবা তারতম্য যদি না বলিতে চাই তবে একটা ক্রম নির্দেশ করিতে পারি। মূলত যেমন চাতুর্বর্ণ্যের মধ্যে আগে পরে বা শ্রেয় হেয় নাই অথচ সেখানেও একটা স্তরবিভাগ যেমন করা যায় বা আছে — অথবা যেমন দেহের পক্ষে মাথার ও পায়েব সমান প্রয়োজন, এমনকি সেই প্রয়োজনীয়তা হিসাবে উভয়ের মর্যাদাও সমান অথচ মাথার স্থান মাথায় আর পায়ের স্থান পায়ে — সেই রকম শিল্পবিদ্যাসকল সমান্তরাল রেখায় চলে, এ কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও আমরা ন্যায্য ভাবেই দেখাইতে পারি যে সেখানে আছে উপরের বলিয়া রেখা, আর নিম্নের বা তলের রেখা।

ভিতরের অন্তরের উপলব্ধিতে পাওয়া একটি সত্যসুন্দরকে বাহিরে রূপ দিয়া সৃষ্টি করার নামই কলা, শিল্প বা আর্ট। আর্টে আর্টে পার্থক্য এই বাহিরের রূপের উপকরণ বা মালমশলার পার্থক্য। গায়ক সত্যসুন্দরকে রূপান্বিত করিতে চাহিতেছেন ধ্বনির, স্বরের সহায়ে; চিত্রকর চাহিতেছেন রঙের, রেখার সহায়ে; ভাস্কর চাহিয়াছেন কঠিন নিরেট বস্তু — পাথর; আর কবি চাহিয়াছেন মানুষের মুখের বাক্য বা কথা। কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেই ভিতরের সত্যসুন্দর। যে উপকরণের ভিতর দিয়াই হউক না কেন, যিনি যখনই সেই সত্যসুন্দরকে একটু জাগ্রত, জ্বলন্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন তিনিই তত

বড়ো স্রষ্টা বা শিল্পী, এই হিসাবে সকল শিল্পের সমান মর্যাদা। বীঠোভেন, রাফাএল, মাইকেল এঞ্জেলো আর শেকস্‌পীয়র সমানভাবে আমাদের আদরণীয় বরণীয় নমস্য।

কিন্তু উপকরণের পার্থক্য যদি শুধু উপকরণেরই পার্থক্যে আবদ্ধ থাকিত, সে পার্থক্য যদি আর কোনো পার্থক্যকে সঙ্গে ডাকিয়া না আনিত, তবে ঐখানেই সকল কথার শেষ হইত। কার্যত দেখি উপকরণের ভিন্নতা আনিয়া দিয়াছে ভঙ্গিরও ভিন্নতা, আধারের ধরনধারণ তুলিয়া দিয়াছে আধেয়ের, সেই এক সত্যসুন্দরেরই মধ্যে এক একটা বিশেষ ভাব বা প্রকরণ। অথবা অন্য দিক হইতে যদি আমরা দেখি তবে বলিতে পারি, ভিতরের উপলব্ধির একটা বিশেষ ভাব, অন্তরাত্মায় আবির্ভূত সত্যসুন্দরের একটা বিশেষ ধরন শিল্পীকে বিশেষ বিশেষ ধারায় চালাইয়া লইয়াছে, তুলিয়া দিয়াছে এক এক শিল্পীর হাতে এক এক যন্ত্র। এখন আমরা বলিতে চাই এই অন্তরের ভাবে একটা ক্রম আছে, সেই ক্রমানুসারেই শিল্পসমূহে একটা স্তরবিভাগ করা যাইতে পারে, মূলত যদিও সে ভাব হইতেছে এক অখণ্ড সাম্য-স্বরূপ।

সত্যসুন্দরের যে ভাবময় সত্তাটুকু, যে অরূপ রহস্যলাঞ্ছনা, যে অনন্ত দ্যোতনা সকল সীমা কাটিয়া মুছিয়া দিয়া কেবলই আপনাকে দূর হইতে দূরে ছড়াইয়া চলিয়াছে, গান তাহাই ফুটাইতে চাহিতেছে। সেই ভাবকে, অনির্দেশ্য ইঙ্গিতকে, অসীম অরূপকে নির্দিষ্ট অর্থের বিশেষ রূপের মধ্যে প্রথম ধরিতে চাহিল চিত্র;ভাস্কর তাহাকে আরও স্ফুট আরও স্পষ্ট, আমাদের এ জগতের স্থূলের কেবল আলো ছায়া রেখা রঙের বাহারে নয়, কিন্তু মাংসপেশীর মধ্য দিয়া যেন আমাদেরই মতো শরীরী ও জীবন্ত করিয়া তুলিতে চাহিতেছে। কবি তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, তিনি রূপের বিগ্রহের মুখ দিয়া আবার কথা ফুটাইতে চাহিতেছেন। গান যেন অন্ধ সেই অদেহী ঋষিবর;চিত্রে তাঁহার চক্ষু ফুটিয়াছে, দেহও দেখা দিয়াছে, কিন্তু সে দেহ এখনও সূক্ষ্ম দেহ;ভাস্কর্যে তিনি যেন তাঁহার স্থূল ভৌতিক দেহটি পাইয়াছেন। গান অন্ধ; চিত্র ও ভাস্কর্য অন্ধ না হইলেও মূক; মূক ঋষি কথা পাইয়াছেন, পূর্ণভাবে প্রকট হইয়াছেন কাব্যে। গান হইতেছে যেন যোগসমাধি, সে সমাধির উপলব্ধি ব্যুত্থানের পথে যেন চিত্রে ভাস্কর্যে স্ফুটতর হইয়া ক্রমে কাব্যে পূর্ণ জাগ্রত হইয়া দেখা দিয়াছে।

আমরা বলিয়াছি আর্ট হইতেছে সত্যসুন্দরের সৃষ্টি, কিন্তু সৃষ্টির জন্য সৃষ্টির মূলে চাই একটা আবেগ, একটা নিবিড় চঞ্চলতা। সকল সত্তাই হইতেছে গতির সমষ্টি বা সংহতি। সত্যসুন্দরের অঙ্গে অঙ্গে যে লাবণ্যের ঢেউ উঠিয়াছে, সত্যসুন্দরের যে প্রাণতরঙ্গ তাহা যখন শিল্পীর প্রাণের উপর গিয়া আঘাত করে, তখনই শিল্পীর মধ্যে জাগিয়া উঠে তাঁহার সৃজন আবেগ বা স্পন্দন;এই গতিলাস্য হইতে উঠিয়াছে শব্দ, ধ্বনি, মূর্ছনা। এই মূর্ছনার যে সূক্ষ্ম স্বরূপ — অন্তরাত্মায় যে প্রথম স্পন্দন, প্রাণের নিভৃত সত্তায় যে কলগতি — তাহারই নাম নাদব্রহ্ম; উহার স্থূল রূপ বা পরিণতিই হইতেছে শব্দ, ধ্বনি। স্থূল শব্দ বা ধ্বনির সহায়ে সঙ্গীত সেই নাদব্রহ্মকে প্রকট করিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে — যে নাদব্রহ্ম আত্মার সাড়ার মৌলিক অভিব্যক্তি, আদিম উল্লাস। তাই গানই হইতেছে আদি আর্ট — সকল আর্টের প্রতিষ্ঠাতা। সত্যসুন্দরের সত্তায় যে মূর্ছনা, গানে তাহারই নাম সুর। সুরই আর্টের গোড়ার কথা। কিন্তু সত্তার গতি মূর্ছনাই সব নয়, মানুষ সত্যসুন্দরের সাগরের

ঢেউয়ের শুধু কলরোল শুনিয়াই থামিয়া যাইতে চায় না। গতির আছে একটা ভঙ্গি একটা ধারা, তাহাকে রেখায় তুলিয়া দেখান যায়; তরঙ্গের গায়ে আছে একটা আবেগের রঙের খেলা তাহাকে ফলাইয়া ধরা যায়। গতির একটা দিক, তাহার মূর্ছনাটি আমরা কান পাতিয়া শুনিতে পারি; কিন্তু গতির আর একটা দিক, তাহার রূপটি চক্ষু দিয়াও যে দেখিতে চাহি। প্রথমে নাম শুনা — পূর্বরাগ।

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

তারপর রূপ দেখা — অনুরাগ

মেঘ মালা সঙে তড়িত লতা জনু।

গানের পর তাই তখন ছবির জন্ম। গান দিতেছে সত্যসুন্দরের ভাবটুকু (ইংরাজিতে ইহাকে আমরা বলিতে পারি Intuition, আর ইহারই অন্য নাম 'শ্রুতি' নয় কি?) — এই ভাব হইতেছে যাহা অবাঙ্‌মনসগোচর, যাহা সূক্ষ্ম সাধারণ। কিন্তু ভাবের আছে একটা বিশেষ প্রকরণ (Ideation বা Imaging — ইহাই না 'স্মৃতি'?) — চিত্র চাহিতেছে এই জিনিসটি দেখাইতে, সূক্ষ্মকে সাধারণকে একটা স্থূলতর বিশেষ আধারের মধ্যে ধরিয়া দিতে। গান যেন সাধারণ সূত্র, আর চিত্র যেন তাহারই বিশেষ উদাহরণ। প্রথমে শ্রুতির বেদের তত্ত্ব, তারপর স্মৃতির পুরাণের রূপক।

কিন্তু শ্রবণের পরে, দর্শনের পরে চাই যে স্পর্শন, অনুরাগের এখন মিলন, এখন যে

প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

তাই তো ভাস্কর্যের স্থাপত্যের উদ্ভব। গতির সুর আছে, গতির ধারা আছে, গতির আবার আছে একটা বস্তুসত্তা। কারণ, গতি এক হিসাবে কতকগুলি দ্রব্যের, ভৌতিক পদার্থের — স্থূল অণুপরমাণুর — অর্থাৎ যাহা স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাদের একটা সাজানোর সমাবেশের ধরন, তাহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ। স্থাপত্য বা ভাস্কর্য সত্যসুন্দরের গতিলাঞ্ছনাকে এই ভৌতিক পদার্থগত সম্বন্ধের, আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহায়ে প্রকটিত করিতেছে, ধরিয়া দিতেছে। সত্যসুন্দরের আছে অসীম অরূপ ভাব, তারপর আছে সসীম ব্যঞ্জনাপূর্ণ রূপ। এই রূপের আবার প্রথম বিকাশ চোখের দেখায় — রেখায় রেখায় ও রঙে; চিত্রবিদ্যা উঠিয়াছে এই স্তর হইতে। রূপ আরও স্পষ্ট, আরও স্থির নিবিড় হইয়া উঠে স্পর্শে, মাংসপেশীর চালনায় — যখন হাতে নাড়িয়া চাড়িয়া একটা বস্তুর বিগ্রহেরই পরিচয় আমাদের হয়; এই স্পর্শ, পেশীচালনা, হাতে নাড়া চাড়া, এই বস্তুপরিচয় জন্ম দিয়াছে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যবিদ্যাকে। সকল শিল্পের মূলে আছে যে গতিবেগ তাহাকে ধরিয়া জমাট করিয়া স্থায়ী স্থাণু — বস্তু করিয়া রাখিতে চাহিতেছে সেই শিল্প।

কিন্তু স্পর্শেও মানুষের শেষ তৃপ্তি নয়, মানুষ চায় আবার মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে

সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে —

এই 'বাখান' ব্যতীত ভিতরের উপলব্ধিটি বাহিরে সম্পূর্ণরূপে, একেবারে শেষ করিয়া যেন ঢালা হয় না; বাক্য ছাড়া অন্তরের অনুভব যেন সবখানি ব্যক্ত, পরিস্ফুট হয় না। তাই কাব্যের উদ্ভব। মিলনের পর সম্ভোগের আনন্দকে পরিপূর্ণ করিয়াছে এই কথা বলা। কবির প্রাণ তাই 'কথা কও' 'কথা কও' বলিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাই

বলিয়াও, কবি তাঁহার বলা শেষ করিতে পারিতেছেন না, ফিরিয়া আবার বলিতেছেন।

সত্যসুন্দরের যে গতিচ্ছন্দ দিব্যকর্ণে তাহা শুনিয়া শিল্পী গানের সৃষ্টি করেন সত্যসুন্দরে যে ভঙ্গিমা তাহা দিব্যচক্ষে দেখেন আর ছবি আঁকিয়া তুলেন, সত্যসুন্দরের সত্যকে গতির আধারকে অন্তরাত্মার স্পর্শ দিয়া আলিঙ্গন করেন আর মূর্তি গড়িয়া তুলেন। আর সত্যসুন্দরের সাথে অন্তরাত্মার বাণী দিয়া আলাপন করেন আর কাব্যসৃষ্টি করিতে থাকেন।

এই আলাপন, কথা বলা মানুষের যতখানি সোজাসুজি অতি আপনারই জিনিস ততখানি আর কিছুই নয়। ভাষার মধ্যে মানুষের মানুষত্ব যেমন স্পষ্ট ধরা দিয়াছে, আর কোনো জিনিসে তেমন ধরা দেয় নাই। মানুষ মানুষ — কারণ, তাহার ধর্ম মনন চিন্তন, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, তাহার মস্তিষ্ক পরিচালনা। আর এইসব কথা বা ভাষার মধ্যেই আসিয়া জমা হইয়াছে, বাক্যরূপেই ইহারা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভাবের অভিব্যক্তির আবরণই ভাষা, কে বলিয়াছিল? আমরা মনে করি, ভাষাই তো ভাবের ভাস্বর বিগ্রহ! শ্রবণ দর্শন স্পর্শন জিনিসের ভিতরকার পরিচয় দেয় যেন গৌণভাবে; অথবা জিনিসটি ঠিক ঠিক দিলেও, জিনিসের যে বার্তা, যে 'প্রাণের কথা' তাহা পুরাপুরি দিতে বা প্রকাশ করিতে পারে না। অন্যান্য শিল্প হইতে কাব্যের পার্থক্য এই যে, কাব্যের মধ্যে যতখানি চিন্তার বুদ্ধিবৃত্তির খেলা (intellectual) আছে অন্যত্র তাহা নাই, তাই কাব্যে মানুষ যেমন আপনাকে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিতে পারে আর কোথাও তেমনটি পারে না। গান দিতেছে উক্ত অশরীরী তুরীয় ভাব, চিত্র ও ভাস্কর্য দিতেছে এই ভাবের সাথে সাথে একটা বাহ্য রূপ। কিন্তু ভাব ও রূপের মাঝখানে একটা জিনিস আছে সেটি গান, চিত্র বা ভাস্কর্য দেয় নাই — এটি দেওয়া তাহাদের ধর্ম নহে। এই মাঝখানের জিনিসটি কি? আত্মা ও আত্মা অধিষ্ঠিত দেহ এই দুই-এর মাঝে আছে কি? আছে অন্তঃকরণ, ভাবের ও রূপের মাঝে আছে অর্থ, চিন্তা — 'বাখান'। আত্মা, ভাব হইতেছে যেন সূর্য; দেহ, রূপ হইতেছে যেন পৃথিবী। কিন্তু অন্তঃকরণ, মন, চিন্তা, অর্থ হইতেছে অন্তরীক্ষ। কবি পৃথিবী ও সূর্যকে মিলাইয়া ধরিয়াছেন; তাঁহার মধ্যে অন্তঃকরণটি সুপরিস্ফুট, ব্যাখ্যানের ভিতর দিয়া মনের চিন্তার সহায়ে তিনি ভাবকে রূপান্বিত, আত্মাকে শরীরী করিয়া তুলিয়াছেন। কবির উপকরণ বাক্য এই অন্তঃকরণের মনের চিন্তার বাহন। অন্যান্য শিল্পে অর্থগৌরব যদি থাকে তবে আছে মৌনভাবে, কাব্যেই তাহাকে সাক্ষাৎভাবে পাই।

ইদানীন্তন কালের ঝোঁক অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা কাব্যেরই উপর যে বেশি দেখিতে পাই তাহাতে আমাদের কথাটিই প্রমাণিত হয়। কারণ আধুনিক যুগ অন্তঃকরণের ধর্মে যেমন অনুপ্রাণিত, চিন্তাসমূহে যেমন আঢ্য, সে রকম আর কোনো যুগে ছিল না।

প্রাচীনতর যুগে কাব্যসৃষ্টি যথেষ্টই হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি সব শিল্পবিদ্যাই মানুষের ভিতর হইতে যুগপৎ বাহির হইয়াছে। কিন্তু তবুও তখন কাব্য অপেক্ষা অন্যান্য শিল্পেরই ছিল প্রাধান্য ও প্রসার। এক সময়ে ছিল গান। আমাদের বেদ কাব্যহিসাবে ততখানি লক্ষিত হইত না যতখানি হইত মন্ত্রের গানের হিসাবে। তাই শ্রীভগবান বলিতেছেন — বেদানাং সামবেদোঽস্মি; কারণ সামবেদ হইতেছে সামগান। তাই গীতার

নাম গীতা। এই গানেবই জেব বঙ্গসাহিত্যে আমরা টানিয়া আনিয়াছি পদাবলিগাথা পর্যন্ত। প্রাচীন গ্রিসে গানের রাজা অবফিউসেব প্রতিভা গ্রিসেব সকল শিল্পসৃষ্টির গোড়ায়। গান যে আদি মৌলিক শিল্প তাহাও এই সঙ্গে আমরা বুঝিতে পাবি। আর এক এক সময়ে ছিল চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রাধান্য ও প্রসার — যেমন ভারতে বৌদ্ধযুগ ও মোগলযুগ, ইউবোপে মধ্যযুগ রেনাসেন্স (Renaissance)-এর যুগ। আধুনিক কালে কিন্তু চিত্র ও ভাস্কর্যের সে রকম প্রভাব তো নাই, ববং এই দুইটি বিদ্যা লোপ পাইতে বসিয়াছিল। ইহার কারণ আমরা নির্দেশ করি, বুদ্ধিবৃত্তির উপর আধুনিক প্রাণের আত্যন্তিক ঝোঁক। কিন্তু কি চিত্রে, কি সাহিত্যে ও ভাস্কর্যে এই বুদ্ধিবৃত্তিব খেলার তেমন সুযোগ নাই, আধুনিক শিল্পীর মন এইসব কলায় তেমন তৃপ্তি পায় না। সঙ্গীতবিদ্যাও কাব্যের তুলনায় যেন পিছনে পড়িয়া গিযাছে। ফলত কাব্য আধুনিক জগৎকে যেন ছাপাইয়া ফেলিয়াছে। বুদ্ধিতে প্রাণ আধুনিক যুগসাহিত্যের সহিত যে মিল ও যে সহজ সম্বন্ধ একটা পাইয়াছে আর কোনো শিল্পের সাথে তাহা পায নাই। এই সাহিত্যের মূল্য কি, সে কথা আমরা উত্থাপন কবিতেছি না; আমরা শুধু দেখাইতে চাহিতেছি সাহিত্যের প্রভাব কতখানি হইয়াছে।

শুধু তাহাই নহে, কাব্য যেন আর আর শিল্পকে নিজের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়াছে। প্রত্যেক শিল্পের আপন আপন অভিব্যঞ্জনাটি ধরনধারণটি কাব্য আপনার মধ্যে প্রতিফলিত করিতে পারে, সে সামর্থ্য কাব্যের আছে। গান গাহিবার বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া কাব্য যখন সৃষ্টি হইয়াছে তখনই আমরা পাইয়াছি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শেলী রবীন্দ্রনাথ ভের্‌লেন মেটেরলিঙ্ক — সমস্ত গীতিকাব্য ইহার ফল। কাব্যের মধ্যে, কেবল কথার সহায়ে ছবি আঁকিয়া যাইতে পারা যায় কি বকমে তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ফরাসি কবি থেওফিল গোতিয়ে; কালিদাসকেও আমরা এই সঙ্গে স্মরণ করিতে পারি। সমস্ত রোমান্টিক সাহিত্যের গঠনে দেখিতে পাই গানের ও চিত্রেরই প্রভাব। আর ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ভঙ্গিমা লইয়া সমস্ত ক্লাসিক সাহিত্যটি গড়িয়া উঠিয়াছে। ভর্জিল বা মিলটনের, বা আমাদের মধুসূদনের কাব্য, কর্নেইর নাটক যেন এক একটি মর্মরে প্রস্তুত অট্টালিকা। প্রতি সর্গ, প্রতি অঙ্ক, প্রতি ছত্র যেন এক একটি প্রস্তর মূর্তি, এক একখানি শিলাস্তম্ভ — এমন নিবিড় সংহত নিথর স্থাণু একটা ভঙ্গি তাহাদের অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্যের সাধারণ রচনাভঙ্গির কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা যদি দেশরীতির দিক দিয়া বিচার করি, তবে দেখিতে পাই এক একটি দেশের কাব্যসৃষ্টিতে এই রকম এক একটি বিশেষ শিল্পের ছাপ রহিয়া গিয়াছে। সমগ্র সংস্কৃতসাহিত্যে মোটের উপর দেখিতে পাই, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের প্রভাব — সংস্কৃতে কিছু রচনা করিতে গেলে আপনা হইতেই সে কেমন পাথরের মূর্তি হইয়া উঠিতে চায়। লাতিনসাহিত্য এ বিষয়ে সংস্কৃতসাহিত্যের অনুরূপ। ইতালি সাহিত্যে শুনি গানের লীলায়িত মূর্ছনা; গ্রিকসাহিত্যও অনেকখানি এই ধরনের — গ্রিকের শিল্পদেবীর নাম (Muse-Mousa) হইতেই আসিয়াছে সঙ্গীতের নাম (music)। আমাদের বাংলাসাহিত্যও এই গানেরই ধর্মে অনুপ্রাণিত। আর ছবির ধরনে কাব্য আঁকিয়া তোলার দৃষ্টান্ত আমি দেখাইতে চাই — ফরাসির ভাষায়। সূক্ষ্ম সুষীম তরলিত রেখায় ভাবের

প্রতি অঙ্গ ফলাইয়া ধরা, ব্যঞ্জনার আলো ছায়ার রঙে রঙে বক্তব্যকে বিচিত্র করিয়া ধরা — একটা রূপকে চোখের সম্মুখে জ্বলন্ত সরাগ করিয়া ধরা ফরাসি সাহিত্যের জন্মগত অযত্নসিদ্ধ কৃতিত্ব।

কাব্যকে তাই আমরা সকল শিল্পের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করিতে চাই। ব্রাহ্মণের মতো কাব্যের প্রাণ হইতেছে জ্ঞান, ব্রাহ্মণেরই মতো কাব্যের উদ্ভব সহস্রশীর্ষ পুরুষের মুখ হইতে — জ্ঞানের প্রেরণায় বাক্যকে আশ্রয় করিয়া কাব্য সত্যসুন্দরকে উপলব্ধি করিতেছে, প্রকটিত করিতেছে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য অন্তরাত্মার একটা সংহত শক্তিবোধের সৃষ্টি, শিল্পবিদ্যার মধ্যে উহারা তাই ক্ষত্রিয়, সহস্রশীর্ষ পুরুষের বাহুবলেই ভর করিয়া উহারা যেন গড়িয়া উঠিয়াছে। চিত্রবিদ্যাকে বলা যাইতে পারে শিল্পের বৈশ্য — বৈশ্যের ধর্ম যে নৈপুণ্য, কৌশল, চমৎকার করিয়া সাজানো, তাহাই যেন চিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। আর সঙ্গীত হইতেছে শূদ্র — সঙ্গীত সকল শিল্পের গোড়ার পদমূলে প্রতিষ্ঠায়, উহার ধর্ম আর-সকল শিল্পবিদ্যার সেবা করা, সকল শিল্পবিদ্যাকে ললিতকলার একটা মূল ভঙ্গিমা বা সুর দিয়া সে চলিয়াছে।

সঙ্গীত হইতেছে শূদ্র; সঙ্গীতের স্থান সকলের নীচে, কিন্তু অধম বলিয়া নয় — সে সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে বলিয়া। পাছে আমাদের কথা কেহ ভুল বোঝেন, তাই আমরা সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলিতে চাই। যখনই কোনো শিল্পকলায় একটা নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখনই দেখিতে পাই, মূলে রহিয়াছে সেই শিল্পকলার সুরের পরিবর্তন, একটা নূতন সুরের সৃষ্টি — সেই শিল্পকলার প্রতিষ্ঠায় আছে যে সঙ্গীতের ভাগ তাহার অভিনব রূপ ও ভঙ্গি। গানে যাহাকে সুর বলি, চিত্রে ভাস্কর্যে স্থাপত্যে তাহাই সঙ্গতি সম্মেলন সামঞ্জস্য, কাব্যে তাহাই ছন্দ। বাল্মীকি অনুষ্টুপ ছন্দ রচিয়া সংস্কৃতে আদিকবি আখ্যা পাইয়াছেন। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের সুর দিয়া বাংলার কাব্যপ্রাণের একটা নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে রূপান্তর আনিয়াছেন, তাহা তাঁহার বস্তুদানের উপর ততখানি নির্ভর করে নাই, যতখানি করিয়াছে তিনি যে ভঙ্গি যে ছন্দ যে সুর দিয়াছেন তাহারই উপর। রোদিন বা মেস্ট্রোভিকের মূর্তিরচনা, মিলেট ও হুইস্‌লার অথবা আমাদের অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন ভাস্কর্যে চিত্রে সঙ্গতি সম্মেলন সামঞ্জস্যের একটা নূতন ধরন নূতন ভঙ্গি দিতেছে অর্থাৎ সুরটি বদলাইয়া দিতেছে, তাই তাহারা একটা যুগপরিবর্তনের সূচনা করিয়াছে।

আর দেশে দেশে যে শিল্পকলার পরিকল্পনার পার্থক্য, তাহা মূলত প্রধানত গড়িয়া উঠিয়াছে এই মৌলিক সুরপরিকল্পনার পার্থক্যকে ধরিয়া। এক এক দেশের প্রাণে তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে এক এক রকম সুর; তাই রূপকরণের কথনের ধারা দেশে দেশে বিভিন্ন। গ্রিক বা হিব্রু যে আমাদের কাছে কেবলমাত্র গ্রিক ও হিব্রু, তাহার কারণ ইহাও বটে যে গ্রিক বা হিব্রু ভাষার অক্ষর আমাদের ভাষার অক্ষরের মতো নয়, উহাদের শব্দকোষ ভিন্ন, ব্যাকরণ ভিন্ন; কিন্তু আসল কারণ গ্রিকের হিব্রুর ছন্দ বা সুর ভিন্ন রকমের। অক্ষর-পরিচয় সহজ, শব্দকোষ বা ব্যাকরণ আয়ত্ত করাও খুব কঠিন নয়, কিন্তু যতক্ষণ কোনো ভাষার ছন্দ, গতিভঙ্গি, সুর হৃদয়ঙ্গম না করিতেছি, ততক্ষণ সে ভাষার উপর

আমার পূর্ণ অধিকার হয় নাই। পরন্তু, শব্দকোষ ব্যাকরণে এমনকি অক্ষর পরিচয়ও যদি তেমন পাকা না হয়, কিন্তু ছন্দবোধ থাকে পূর্ণমাত্রায়, তবে সে ভাষার স্বরূপটি বা অন্তরাত্মাটিরই সহিত আমাদের পরিচয় হইয়া গিয়াছে। ইউরোপ যে প্রাচ্যের চিত্র, ভাস্কর্য বা স্থাপত্যের সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে অপারগ, আর্চার সাহেবের মতো শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তিও যে ভারতের শিল্পকলাকে অবলীলাক্রমে 'barbarous, barbarian, barbarism' আখ্যায় ভূষিত করিতে পারেন, তাহার কারণ এই যে, বিদেশি বিদেশির সৃষ্টির উপকরণ গঠন সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিলেও সেই উপকরণের গঠনের ছন্দকে সুরকে সহসা ধরিতে পারেন না। বিদেশীয় কথার অর্থ বুঝিতে পারি, তাহার পরিচয় সব জানিতে পারি, তাহার মনকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তাহার প্রাণের সুর যদি আমার প্রাণে না বাজে তবে বিদেশিকে আমি চিনি নাই।

তাই দেখি সুরকে গানকে যখন ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছে, তখন শিল্প হইয়া পড়িয়াছে কৃত্রিম জড়পদার্থ। এই সুরকে গানকে হারাইয়া যদি বস্তু লইয়াই সে থাকে, তবে আর্ট তাহার প্রাণও হারাইয়া শুধু দেহটিকে লইয়া থাকে। কাব্য তখন হয় বাক্যসংগ্রহ, চিত্র হয় রঙের ও রেখার সমষ্টি, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য হয় পাথরের পুঞ্জ। কাঠামোকে যদি সঞ্জীবিত করিতে হয় তবে প্রয়োজন তাহাতে সঙ্গীতের উদ্বোধন, তাহার মধ্যে সঙ্গীতের প্রাণ বহাইয়া দেওয়া। ফলত উনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদের জড়ত্বের পর আজ শিল্পজগতে যে নূতন সৃষ্টি দেখিতেছি তাহার সর্বত্র গানেরই প্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্য চিত্র এমনকি ভাস্কর্য পর্যন্ত যেন গানকেই মূর্তিমান করিতে চাহিতেছে। Mystic school, Impressionist school — আমাদের বাংলার ভাবাত্মক (আধ্যাত্মিক) চিত্রাঙ্কনরীতি গানেরই প্রভাবে ভরপুর। জীবন্ত শিল্পরচনার ইহাই শেষ কথা, ইহা শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি না হইতেঁ পারে কিন্তু নূতন জীবনের, আর্টে প্রাণপ্রতিষ্ঠার এখানেই যে আরম্ভ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

□ *রচনাবলী*, ১৯৭৫ (শ্রাবণ)

মধুসূদনের রাজসিকতা

কালিদাস রায়

বাঙালি জাতি তাহার সাত্ত্বিকতা হারাইয়াছিল। মধুসূদন যখন আবির্ভূত হন, তখন এ জাতি তামসিকতার মহাপঙ্কে লুণ্ঠিত হইতেছিল। এই সময়ে ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার মধ্য দিয়া ইউরোপ হইতে একটা রাজসিক ভাবতরঙ্গ আসিয়া পড়ে। এই তরঙ্গ এদেশের শিক্ষিত সমাজের মনের তটে আঘাত করিয়া তাহার বহুকালের সরীসৃপ-সুলভ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি জাতির নবপ্রবুদ্ধ রাজসিকতার মূর্ত বিগ্রহ এই শ্রীমধুসূদন।

মধুসূদনের রাজসিকতা সাত্ত্বিকতার প্রতিবাদ নয়। সাত্ত্বিকতার প্রতি 'সীতা সরমার' কবির যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহার রাজসিকতা তামসিকতারই বলদৃপ্ত প্রচণ্ড প্রতিবাদ। সেজন্য তাঁহার সাহিত্যসাধনাতে ও কোনো কোনো বিষয়ে যে বিদ্রোহাত্মক আতিশয্য দোষ ঘটিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

সে যুগে মধুসূদনের বন্ধু ভূদেবও যে তামসিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নাই, তাহা নয়। তবে তিনি ছিলেন শান্ত অনুদ্ধত সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। তিনি সাত্ত্বিকতাকেই বাংলার জাতীয় জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এযুগে সমগ্র ভারতে যেমন মহাত্মা গান্ধী সে চেষ্টা করিয়াছেন।

রামগোপাল ঘোষ, রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি সে যুগের মনীষীগণও তামসিকতার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চরিত্রে মধুসূদনের মত প্রলয়ঙ্করী পৌরুষশক্তি ছিল না — আত্মাভিব্যক্তির প্রচণ্ড প্রয়াস ও অসামান্য সৃজনী প্রতিভাও ছিল না। সেজন্য তাঁহাদের বিদ্রোহে আতিশয্য দেখা যায় নাই। মধুসূদনের চরিত্রের অদম্য পৌরুষশক্তি ও অভ্রভেদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার রাজসিক জীবনে মাত্রাতীত প্রচণ্ডতা সঞ্চার করিয়াছিল। ইহার ফলে তিনি নিজের জীবনে ও সারস্বতসাধনায় শৃঙ্খল ও শৃঙ্খলা দুই-ই নির্বিচারে ভাঙ্গিয়াছিলেন।

কোনো প্রতিভাই গতানুগতিকতা সহ্য করিতে পারে না। প্রতিভার লক্ষণই হইতেছে গড্ডলিকা প্রবাহের প্রতিরোধ করিয়া অভিনব ধারার প্রবর্তন। সাত্ত্বিক প্রকৃতির প্রতিভা বলে — I have come not to destroy but to fulfil. যাহা বর্তমান আছে, তাহারই সংস্কার সাধন করিয়া সাত্ত্বিক প্রতিভা তাহাকেই নবকলেবর দান করিয়া তাহাতেই নবজীবনের সঞ্চার করে। আর যাহা আছে, তাহাকে অর্থাৎ গতানুগতিককে একেবারে সবলে চূর্ণ করিয়া রাজসিক প্রতিভা নূতন কিছু গড়ে। মাইকেলের রাজসিক প্রতিভা প্রচণ্ডবলে এক হাতে ধ্বংস করিয়াছে, অন্য হাতে গড়িয়াছে। গড়ার কাজ সম্পূর্ণ করার আগেই মধুসূদন মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন।

এই দুর্নিবার প্রচণ্ডতার জন্য একদিকে তিনি যেমন জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছিলেন,

অন্যদিকে তেমনি তিনি অমূল্য সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারে, দেশের কাব্যধারার পথ হইতে বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিয়া তাহাকে অবাধ অব্যাহত করিয়া গিয়াছেন — আর তামসিকতার পঙ্ক হইতে বঙ্গ-বাণীকে উদ্ধার করিয়া রাজসিকতার রক্ত পঙ্কজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

জাতীয় জীবনেই হউক আর ব্যক্তিগত জীবনেই হউক, সাত্ত্বিকতা যে সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তামসিক জাতিকে তো একেবারে সাত্ত্বিকতার স্তরে উন্নীত করা যায় না, তাহাকে রাজসিকতার স্তরের মধ্য দিয়া উঠিতে হয়। তাই অনেকে মনে করেন, সমগ্র জাতিকে মহাত্মা গান্ধীর সাত্ত্বিকতায় দীক্ষাদানের প্রয়াস ফলপ্রসূ হয় নাই।

মধুসূদন যে এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই রাজসিকতার প্রচারক হইয়াছিলেন — ইহা হয়ত ঠিক নয়। দেশের নবজাগরিত জাতীয় জীবনই রাজসিকতায় অনুপ্রাণিত হইয়া মধুসূদনের জীবনে পরিমূর্ত হইয়াছিল। মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যকে তামসিকতা হইতে উদ্ধার করিয়া রাজসিকতায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহা আজ রবীন্দ্রনাথের সাধনায় সাত্ত্বিকতায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে।

মধুসূদনের প্রচণ্ড রাজসিকতা তাঁহার 'জীবনযাত্রায়' ভাঙ্গিয়াছে শৃঙ্খলা, কিন্তু 'সাহিত্যসাধনায়' ভঙ্গ করিয়াছে শৃঙ্খল। পয়ার ত্রিপদীর তটবন্ধনে অনুপ্রাস শ্লেষযমকের উপলখণ্ডগুলিতে গীতিঝঙ্কার তুলিয়া বাঙলার কাব্যধারা গতানুগতিক ভাবেই বহিয়া চলিতেছিল। রসকলহ, বারোমাসিয়ার মামুলি অনুকরণ, চৌতিশার কৃত্রিমতা, লৌকিক ধর্মপ্রচার, ইতরশ্রেণীর রসিকতা, পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে লৌকিক গণ্ডীতে অবতারণ, নূতনত্বের প্রতি বিদ্বেষ, পুরাতনের চর্বিতচর্বণ বাঙলা কাব্য সাহিত্যের ছিল প্রধান সম্বল। গতানুগতিকতাই তামসিকতা। এই তামসিকতার জীর্ণ কন্থা হইতে মধুসূদন বাঙালির সাহিত্যরসবোধকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে রাজসিকতার পালঙ্কে স্থান দিয়াছেন।

মধুসূদনের চরিত্রগত রাজসিকতা তাঁহার রচনায়, ভাবকল্পনায়, চরিত্রসৃষ্টিতে, ছন্দের অভিনবতায়, পয়ার পায়ের বেড়ী ভাঙ্গায়, মহাকাব্যরচনায়, বীর ও রৌদ্ররসের সমাবেশে ও অভিনব নৈতিক আদর্শে সুপরিস্ফুট। এমনকি, শব্দের চয়নে বয়নে ও তদ্দ্বারা উদ্দাম ছন্দঃস্পন্দ সৃষ্টিতেও তাঁহার রাজসিকতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রামায়ণ ও মহাভারত হইতে তিনি শুধু পাইয়াছিলেন আখ্যান উপাদান ও কাব্যদেহের উপজীব্য। তিনি সাত্ত্বিক কবি মিল্টন হইতে পাইয়াছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রেরণা, ভাবকল্পনা ও চরিত্র সৃষ্টির আদর্শ পাইয়াছিলেন রাজসিক গ্রিক ও রোমক কবিগুরুদের গ্রন্থ হইতে। সেজন্য তাঁহার পরিকল্পিত পৌরাণিক চরিত্রগুলি অনেকটা অভারতীয় রূপ লাভ করিয়াছে। গতানুগতিক সামাজিক মন তাহাতে আঘাত পাইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের দিক হইতে কোনো ক্ষতি হয় নাই — বরং বাঙলা সাহিত্য অভিনব স্বভাবানুগত মানবিক আদর্শ লাভ করিয়া লাভবান হইয়াছে। অভিনবত্বের বৈচিত্র্য সর্ববিধ আতিশয্য ও বিজাতীয়তাকে কবলিত করিয়াছে।

মধুসূদন দেখিলেন, তাঁহার স্বজাতি দরিদ্র, দুর্বল, পরাধীন, জাতীয়তাবোধহীন, ভীরু, কর্মকুণ্ঠ ও অদৃষ্টের উপর একান্ত নির্ভরশীল। এই জাতির সম্মুখে এমন চরিত্রাদর্শ উপস্থাপিত করিতে হইবে যাহা বাঙালি চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। এইজন্য রাবণ চরিত্রের সৃষ্টি। সৃষ্টি

না বলিয়া আবিষ্কারও বলা যায়। কারণ বাল্মীকির রাবণের সঙ্গে মধুসূদনের রাবণের অনেক অংশে মিল আছে। বাল্মীকির রাবণ একজন বিরাট পুরুষ, পুরুষকারের মূর্ত বিগ্রহ, নিয়তির বিরুদ্ধে নিয়ত বিদ্রোহী। বাঙালি পাঠক কৃত্তিবাসের রাবণের সঙ্গে পরিচিত বলিয়া মধুসূদনের রাবণকে সম্পূর্ণ বিজাতীয় চরিত্র মনে করিয়াছে। যাহাই হউক, গ্রিকসাহিত্যের আদর্শেই রাবণ রাজসিকতার সম্পূর্ণাঙ্গ প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সহিত তামসিকতারও যেমন দ্বন্দ্ব — সাত্ত্বিকতারও তেমনি দ্বন্দ্ব। এইরূপ রাজসিক আদর্শই ছিল দীন দুর্বল ভীরু বাঙালি জাতির জন্য প্রয়োজন, কবি এই কথা মনে করিয়াছিলেন।

দরিদ্র বাঙালির চোখের সম্মুখে তিনি সোনার লঙ্কার অসীম ঐশ্বর্যভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। ভীরু বাঙালির সম্মুখে তিনি বীরত্বের আদর্শ মেঘনাদকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। অদৃষ্টের হাতের পুতুলদের তিনি দেখাইয়াছেন, পুরুষকারের মূর্ত বিগ্রহ রাবণকে। অবলা বাঙালি নারীর চোখের সম্মুখে ধরিয়াছেন — বীরাঙ্গনা প্রমীলা ও জনাকে। বাঙালির দুর্নাম আছে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। সেজন্য তিনি বিভীষণের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া বাঙালির জাতীয় চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। স্বজাতি ও স্বদেশের জন্য কেমন করিয়া নির্বিচারে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে হয়, তাহারই আদর্শ মেঘনাদ বধের প্রাণস্বরূপ।

মহৎ চরিত্র না হইলে মহাকাব্য হয় না, তাহা তিনি জানিতেন। মহাকাব্যে নায়কচরিত্র থাকে মহান্, প্রতিনায়ক চরিত্রও কম মহান্‌রূপে চিত্রিত হয় না। 'মহান্ মহত্ত্বেব করোতি বিক্রমম্'। মহানের সঙ্গে মহানের সঙ্ঘর্ষই মহাকাব্যের প্রধান উপজীব্য। ভারতীয় মতে সাত্ত্বিকতায় মহানের সঙ্গে রাজসিকতায় মহানের সঙ্ঘর্ষই মহাকাব্যের মেরুদণ্ড। মধুসূদন নিজে ছিলেন রাজসিকতার মূর্ত বিগ্রহ, তাই তিনি রাজসিকতায় মহানকেই কাব্যের নায়ক পরিকল্পনা করিয়াছেন।

মধুসূদন জীবনে স্বধর্মত্যাগী হইয়াছিলেন, কিন্তু সাহিত্যে তিনি স্বধর্মচ্যুত হন নাই, অর্থাৎ তিনি রাজসিকতা ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিকতাকে প্রাধান্য দেন নাই। বিচক্ষণ পাঠক বলিবেন — 'না, জীবনেও তিনি স্বধর্মচ্যুত নহেন — তিনি পিতৃধর্মচ্যুত। রাজসিকতাই ছিল তাহার ধর্ম, সে ধর্ম তিনি আমরণ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।' স্বধর্মের সহিত জীবনের, জীবনের সহিত সৃষ্টির সামঞ্জস্য যদি উচ্চ সাহিত্যের একটা লক্ষণ হয়, তাহা হইলে মধুসূদনের কাব্যে সে সামঞ্জস্য পূর্ণমাত্রায় ছিল বলিতে হইবে।

মধুসূদনের রচনা যাঁহারা মন দিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ করিবেন, মেঘনাদবধের সীতাসরমা সংবাদে, কতকগুলি সনেটে, বীরাঙ্গনা কাব্যের রুক্মিণী ও ভানুমতীর পত্রে এবং দুর্গোৎসব ও অন্যান্য পুণ্যানুষ্ঠানের বার বার উল্লেখে কবি সাত্ত্বিকতার মহিমাও স্বীকার করিয়াছেন। ইহা তাঁহার কপটতা নয়। বিদেশীয় চরম শিক্ষাও তাঁহার জাতীয়তাকে সম্পূর্ণভাবে কবলিত করিতে পারে নাই। রাশি রাশি কুখাদ্য-অখাদ্য তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত পিতৃপুরুষের শোণিতধারাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই। বাঙালির সরস কোমল মধুর হৃদয়টি তাঁহার কোটপ্যান্টের অন্তরালে স্পন্দিত হইত।

কবি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না। যদি তিনি দীর্ঘায়ু হইতেন, তাহা হইলে স্বাভাবিক নিয়মেই রাজসিকতার উপরের স্তরে তিনি আরোহণ করিতেন। ইহা 'নিশার স্বপন সম' হয়ত নয়!

□ *বঙ্গসাহিত্য পরিচয়* (প্রথম খণ্ড) ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৩৭২ (পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ)

রামায়ণ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ দ্যুলোকে প্রচরিষ্যতঃ।
তাবদ্ বামায়ণী কথা ভূলোকে প্রচবিষ্যতি॥

একজন ভক্ত খ্রিস্টান লেখক যিশু খ্রিস্টের জীবন চবিতকে the Greatest story in the World অর্থাৎ 'পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিরাট্ উপাখ্যান' আখ্যা দিয়া কিছুকাল আগে আমেরিকায় ও ইউরোপে খ্রিস্টায়নের বা যিশুচরিতের পুনঃপ্রচার করিবার জন্য চেষ্টা করেন। যে কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যেই হউক না কেন, ভক্তেব নিকটে তাঁহার ইষ্টদেবতার কথাব চেয়ে বড়ো আর কিছুই নাই — পাঠে শ্রবণে কীর্তনে অনুধ্যানে নব নব অনুপ্রেরণা ও রসানুভূতির চিরন্তন উৎস স্বরূপ হইয়া, ভক্তের প্রাণে তাঁহার ইষ্টদেবতার কথা চিরতরে বিরাজমান থাকে। কিন্তু এমন কতকগুলি উপাখ্যান বিশ্বমানবের রস সর্জনার ভাণ্ডারে সুপ্রাচীন কাল হইতেই বক্ষিত হইয়া আছে যেগুলি অমব, যুগযুগান্তর ধরিয়া যেগুলি মানুষের চিত্তকে রসাভিষিক্ত করিয়া আসিতেছে, এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকে যেগুলি বিভিন্ন দেশে নবকলেবর ধারণ করিলেও মূল কথা বস্তুকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার আভ্যন্তর মহত্ত্বের আবেদন আপামর সাধারণের নিকটে পহুঁছাইয়া দিতেছে। রামায়ণের উপাখ্যান সমগ্র বিশ্বমানবের চিত্তের রসায়ন স্বরূপ এইরূপ কতকগুলি উপাখ্যানের মধ্যে অন্যতম প্রথম শ্রেণীর উপাখ্যান। প্রাচীন ভারতবিদ্যার আধুনিক রীতির আলোচকগণের মতে, অন্তত আড়াই হাজার বছর পূর্বে ভারতে আর্যভাষায় বামায়ণ কথা তাহার প্রথম রূপ গ্রহণ করে। পরে ভারতবর্ষের মধ্যেই নানা সাহিত্যিক ও মৌখিক রূপভেদকে আশ্রয় করিয়া এই উপাখ্যান পরিবর্ধিত ও মার্জিত হয়;এবং ভাবতের বিভিন্ন কথ্য ভাষায় প্রচলিত মৌখিক রূপগুলির বিলোপ সাধন না করিয়া, পরন্তু সেগুলিকে অতিক্রম করিয়া, মহর্ষি বাল্মীকির পুণ্য নামের সহিত জড়িত সংস্কৃতভাষায় রচিত রামায়ণরূপে এই উপাখ্যান এমন একটি চিরস্থায়ী মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছে, যাহা কেবল ভারতীয় মানবের পক্ষে নয়, বিশ্বমানবের পক্ষেও এক অতি মহৎ সাহিত্যিক রিক্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই রিক্থের অন্তর্নিহিত পারিবারিক ও ধার্মিক আদর্শ ও নীতি তথা রম্য ভাবসম্পুট, সমগ্র মানবজাতিকে সর্বকালে অনুপ্রাণনা দান করিবে ও আকুল করিতে সমর্থ হইবে।

ভারতবর্ষের সভ্যতার সহিত রামায়ণ ও মহাভারতের নাড়ীর যোগ রহিয়াছে, ভারতের ভারতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে রামায়ণ ও মহাভারতের মাধ্যমেই। বিগত দুই

হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের বাহিরে এশিয়া খণ্ডে ও অন্যত্র যেখানেই ভারতের বাণী প্রচারিত হইয়াছে, সেখানে সেখানেই রামায়ণ এবং মহাভারতের উপাখ্যান ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা অথবা প্রচার হইয়াছে। ভারতের ভারতীয়তার প্রসারের ফলে এশিয়া খণ্ডের কতকগুলি দেশকে Greater India অর্থাৎ, 'বৃহত্তর ভারত' নাম দিয়া বিশালতর ভারতবর্ষের এক একটি অংশ বলিয়া ধরা হয়। এই দেশগুলি হইতেছে, Farther India বা 'প্রতর ভারত' অর্থাৎ ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ, কোচিন-চীন বা চম্পা এবং লাওস্ অঞ্চল (Viet-nam ভিয়েৎনাম বা Indo-China ইন্দোচীনের অনামী ভাষী জনগণের দ্বারা অধ্যুষিত দেশ, ঠিক মতো বৃহত্তর ভারতের অংশ নহে — এই দেশ বাস্তবিক 'বৃহত্তর চীন'-এরই অংশ); Malaya বা মালয় উপদ্বীপ, ও Indonesia ইন্দোনেসিয়া অর্থাৎ 'দ্বীপময় ভারত' বা দ্বীপান্তরের দ্বীপসমূহ (সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, লম্বক, সুম্বাওয়া, তিমোর, সুলাবেসি, বোর্ণিও প্রভৃতি); এবং Serindia অর্থাৎ প্রাচীনকালের মধ্য এশিয়ার কতকগুলি প্রদেশ (যেমন কুস্তন বা খোতন, অর্থাৎ পশ্চিম Sin-Kiang সিন-কিয়াং বা চীনা তুর্কিস্থান; ক্রোরায়না বা পূর্ব-সিন-কিয়াং; ঋষীক দেশ বা তোখারিস্তান অর্থাৎ উত্তর-সিন্-কিয়াং, চুলিক বা সুগ্‌দ দেশ অর্থাৎ প্রাচীন সোগ্দিয়ানা)। ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত দেশে ভারত ধর্মের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রচার হইয়াছে, সেই সমস্ত দেশে রামায়ণ মহাভারত ও নানা পৌরাণিক উপাখ্যানও পহুঁছিয়াছে — তবে ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠার উপরই এইসব দেশে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে। এই জন্য মধ্য এশিয়া হইয়া চীনে রামায়ণ কথা পহুঁছায় বটে, কিন্তু 'রামঞ্‌ঞদেস' বা সুবর্ণভূমি অর্থাৎ দক্ষিণ ব্রহ্মের, ও দক্ষিণ শ্যামের দ্বারাবতী রাজ্যের Rmen 'মেঞ্' বা Mon মোন্-জাতি, Cambodia বা কম্বুজদেশের Khmer খ্‌মের জাতি, উত্তর ও মধ্য ব্রহ্মের Thul-Cuk থুল-চুক্ অথবা Pyu প্যু এবং Mran-ma ম্রন্-মা বা ব্রহ্ম জাতি, উত্তর-শ্যামের Dai দৈ বা Thai থাই জাতি, চম্পার Cham চাম জাতি, মালয় উপদ্বীপের Malay মালাই জাতি এবং যবদ্বীপের সুন্দা, মাদুরা ও যবদ্বীপীয় জাতি তথা বলিদ্বীপের ও লম্বকদ্বীপের অধিবাসিগণ — ইহারা সকলেই এককালে ব্রাহ্মণ আদর্শে অনুপ্রাণিত ধর্ম ও সমাজ গড়িয়া তুলে, এবং এই ধর্ম ও সমাজকে জীবনে সমৃদ্ধ করিয়া তুলে। সেই হেতু ইহাদের মধ্যে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের — বিশেষ করিয়া রামায়ণের — এক লক্ষণীয় প্রভাব দেখা যায়। এক বলিদ্বীপ ও আংশিকভাবে লম্বকদ্বীপ ছাড়া এই সমস্ত দেশে আর এখন ব্রাহ্মণ্য বা ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ বা ধর্ম বিদ্যমান নাই; — ব্রহ্মে, শ্যামে, কম্বুজদেশে ও চম্পায় লোকে এখন বৌদ্ধধর্ম পালন করে, যদিও তাহারা কিছু পরিমাণে ধার্মিক ও সামাজিক জীবনে তৎতৎ দেশের ব্রাহ্মণের নির্দেশ মানিয়া চলে; অন্যত্র — মালয় উপদ্বীপে ও দ্বীপময় ভারতে জনসাধারণ মুসলমান ধর্মই স্বীকার করিয়া লইয়াছে; তথাপি তাহাদের জীবনে অতীতের অবশেষ স্বরূপ ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ প্রভাব এখনও গভীরভাবে কার্য করিতেছে, বিশেষ করিয়া যবদ্বীপে; — স্বাধীন ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময় ভারত রাষ্ট্রের আমাদের ভারতে প্রেরিত প্রথম রাজদূত শ্রীযুক্ত Soedorsono সুদর্শন ভারতবর্ষে অবস্থান কালে এক সভায় বলিয়াছিলেন যে, ইন্দোনেসিয়ার ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে,

বাহিরে মুসলমানধর্ম সকলে মানিলেও, রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব এখনও বিশেষ প্রবলভাবে বিদ্যমান।

বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ ছাড়া, প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত রামায়ণ উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বহু ছোটো-বড়ো কাব্য-নাটকাদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল;এবং প্রাচীন ভারতীয় অন্যান্য ভাষায়, যথা পালি ও বিভিন্ন প্রাকৃতে, রামায়ণকথা নানাভাবে মিলে। রামায়ণ জৈনদের মধ্যেও বিশেষ লোকপ্রিয় ছিল, এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃতে জৈন রামায়ণ আছে। ভাবতের দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে, উত্তরভারতের আর্য ভাষার মতই, রামায়ণের বিভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়। তামিল্ ভাষায় মহাকবি কম্বন্ রচিত রামায়ণ তামিল্ সাহিত্যেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তেলুগু, কন্নড় ও মালয়ালম্ ভাষায় রামায়ণ আখ্যান লইয়া বহু কাব্য ও নাটক আছে। বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রামকথা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার অন্যতম প্রধান গ্রন্থ হইতেছে — রামায়ণাশ্রয়ী কোনো-না-কোনো মহাকাব্য। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহৃদয় সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিগণের চেষ্টায় রামায়ণের একাধিক অনুবাদ বা রূপায়ণ ফারসি ভাষাতেও হইয়াছে।

ভারতের বাহিরে, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ প্রভাবের ফলে, তিব্বতী, চীনা, বর্মী, মোন্, খ্মের, শ্যাম, মালাই, প্রাচীন ও মধ্য যুগের যবদ্বীপীয় ও সুন্দানী ভাষায়, এবং বলিদ্বীপের ভাষায় সংক্ষিপ্ত রামকথা অথবা নাতি-ক্ষুদ্র রামায়ণগ্রন্থ উপলব্ধ হইয়াছে। যবদ্বীপীয় ভাষায় একাধিক রামায়ণ বিদ্যমান। ভারতের ভিতরে ও ভাবতের বাহিরে যে এতগুলি বিভিন্ন রূপে রামকথা প্রচলিত আছে, সেগুলির বিষয়বস্তু সর্বত্র এক নহে — ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা পার্থক্য সেগুলির মধ্যে দেখা যায়। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন রামকথার রূপভেদ সম্বন্ধে প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন — তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে কৃত্তিবাসের রামায়ণ আলোচনা প্রসঙ্গে। দীনেশবাবু এই বিষয়ে পরে আরও বিশদ করিয়া তাঁহার ইংরেজি পুস্তক (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২০ সালে প্রকাশিত) The Bengali Ramayanas-তে আলোচনা করেন। তিনি দেখাইয়া দেন, মহর্ষি বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ ও বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণ, এই উভয়ের মধ্যে ভাবের ও ঘটনার পার্থক্য কত বেশি। বস্তুত একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কেবল মূল কথা-বস্তুর ব্যত্যয় না করিয়া, রাম-কাহিনি আশ্রয় করিয়া রচিত সংস্কৃত বাল্মীকি-রামায়ণ ও বাংলা কৃত্তিবাসী-রামায়ণ, দুইখানি পৃথক পুস্তক। তুলসীদাসের কোসলী (হিন্দি) রামায়ণ, যাহার কবিদত্ত নাম হইতেছে, 'শ্রীরামচরিত-মানস', এইরূপ আর একটি স্বতন্ত্র পুস্তক — ইহাতে কেবল বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসরণ করা হয় নাই — তুলসীদাস স্বয়ং বলিতেছে —

নানা-পুরাণ-নিগমাগম-সম্মতং যদ্
রামায়ণে নিগদিতং, ক্বচিদ্ অন্যতোঽপি বা।
স্বান্তঃসুখায় তুলসী রঘুনাথগাথা-
ভাষানিবন্ধম্ অতিমঞ্জুলম্ আতনোতি॥

'অনেক পুরাণ, বেদ ও শাস্ত্রসম্মত যে কথা রামায়ণে আছে, আরও অন্যত্র হইতে

(নিজের অনুভব) একত্র করিয়া, নিজের অন্তরের সুখের জন্য রঘুনাথজির গাথা, ভাষায় মনোহর ছন্দাদিরূপে বিস্তারপূর্বক তুলসী রচনা করিতেছে।' (শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের বঙ্গানুবাদ)।

তুলসীদাস নিজ অনুভব ও কবি-কল্পনার প্রয়োগে তাঁহার 'রামচরিত-মানস'-কাব্য রচনা করিয়াছেন;এবং সর্বোপরি এক অপূর্ব ভক্তির ধারায় তাঁহার রাম-কথা তিনি আপ্লুত করিয়া দিয়াছেন। এই বস্তু বাল্মীকি-রামায়ণে নাই। এই জন্য তাঁহার কাব্য ভক্তিরসের এক অপূর্ব উৎস হইয়া বিরাজমান, সহৃদয় পাঠক একবার তুলসী-রামায়ণের রস আস্বাদন করিলে তাহাকে আর ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। ছোটো-খাটো বিষয়ে তিনি বাল্মীকি-রামায়ণকে পুরাপুরি অনুসরণ করেন নাই, — দুই-চারটি এমন ঘটনার সমাবেশ তিনি করিয়াছেন যাহাতে মূল আখ্যায়িকার হানি হয় নাই অথচ তাহা আরও কল্পনোজ্জ্বল হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জনকের সভায় বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণের আগমনের পূর্বে মিথিলার রাজোদ্যানে রাম ও সীতার পরস্পরকে দর্শন ও পূর্বরাগ — ইহাতে মূল উপাখ্যান আরও যেন সুন্দর হইয়াছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, দক্ষিণ ভারতের তামিল্ মহাকবি কম্বন্-এর রামায়ণে এই পূর্বরাগের কথাও আছে — কম্বন্ তুলসীদাসের প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বেকার কবি; সুতরাং অনুমান করা যায় যে, এ বিষয়ে রামায়ণবহির্ভূত অন্য কোনো রাম-কথার ধারা অনুসৃত হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যেই রামায়ণের কতকগুলি পৃথক্ ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। 'অদ্ভুত রামায়ণ' আছে;তদ্ভিন্ন রাম-কথার দার্শনিক ব্যাখ্যা লইয়া 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' এবং 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রচলিত রাম-কথার বিভিন্ন রূপ লইয়া বিচার করিলে একখানি অতি উপাদেয় গবেষণাত্মক পুস্তক রচিত হইতে পারে। মূল উপাখ্যানের অতিরিক্ত, বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন যুগে রচিত রাম-কথায় যে ঘটনা-বৈচিত্র্য পাওয়া যায়, তাহা লক্ষণীয়। সাধারণ অন্য পুরাণানুমোদিত বহু ব্যাপার রামায়ণের সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছে। বাংলাদেশে যেমন, অন্যত্রও কবিগণ সাধারণত বাল্মীকির গ্রন্থ লইয়াই অনুবাদ করিতে বসিতেন না। রাম-কথা আকাশের আলো ও বাতাসের মতো দেশের মানুষের মনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিয়া আসিয়াছে। কবিরা সহজভাবে চোখের জ্যোতি ও নাসিকার শ্বাসের মতো রামায়ণ-কথা নিজ নিজ চিত্তে গ্রহণ করিয়া, ও পুরাণ-পাঠক এবং রামায়ণ-গায়কের দ্বারা প্রচারিত নানা পুণ্যময় প্রাচীন আখ্যায়িকা বা ঘটনা-সমাবেশ দ্বারা, ইহার পরিপুষ্টি করিয়া, নূতন ভাবে দেশের জনগণের মধ্যে রামায়ণকথার প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষের বাহিরেও রাম-কথার লক্ষণীয় বিকাশ বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটিয়াছে। পালি জাতক-গ্রন্থে প্রাপ্ত 'দশরথ-জাতক'-এ যে ভাবে রাম-কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা প্রচলিত রাম-কথা হইতে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের — ইহাতে রাবণ বা সীতা-হরণের স্থান নাই। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ হিমালয় অঞ্চলে বনবাসে গিয়াছিলেন, এবং পরে সেখান হইতেই তাঁহারা রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন;পালির দশরথ-জাতকের মধ্যে অদ্ভুত কথা এই যে, সীতা ছিলেন রামের ভগিনী ও পরে বিবাহিতা স্ত্রী। কোনো কোনো মতে, রামায়ণ-কথায়

অন্তত তিনটি বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র উপাখ্যানেব সমাবেশ বা সংমিশ্রণ আছে — অযোধ্যার কথা, কিষ্কিন্ধ্যাব কথা, এবং লঙ্কাব বাবণের কথা। চীন দেশে ৪৭২ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধ অবদান-কথাব অনুবাদেব মাধ্যমে বাম-কথা পহঁছায — সে বাম-কথা পালি দশবথ-জাতকেবই আখ্যানের মতো। কিন্তু ইহার প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে, মধ্য-এশিয়াব সোগ্‌দিয়ানা বা চুলিক-দেশের এক ভিক্ষু কর্তৃক চীনা ভাষায যে রাম-কথা অনূদিত হয়, তাহা কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণের অনুরূপ — ইহাতে রাম-সীতার নির্বাসন, রাবণ-কর্তৃক সীতা-হবণ, জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধ, বালী ও সুগ্রীব-সংবাদ, সেতুবন্ধ, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা প্রভৃতি মূল বিষয়-বস্তু আছে; কিন্তু লক্ষণীয় কথা, বাম সীতা লক্ষ্মণ প্রভৃতিব নামগুলি মূল সংস্কৃত রূপে নাই। রামাযণ-কথাব প্রারম্ভিক রূপ আলোচনার জন্য দশরথ-জাতক ও চীনায অনূদিত রাম-কথাগুলির সার্থকতা আছে। চীনারা ভারতীয (সংস্কৃত) নামেরও চীনা অনুবাদ কবিত, এবং তাহাদের এই অনুবাদ, অনেক সময়ে আমাদের কাছে সুপরিচিত সংস্কৃত নামের আধারে না হইয়া, অন্য অনুরূপ ও অজ্ঞাত নামেবই অনুবাদ হইত। তদ্দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, প্রাচীন ভাবতে এই-সব নামের অন্য বিকল্পরূপও প্রচলিত ছিল। চীনারা 'ধৃত-রাষ্ট্র' না বলিয়া (বা বলিবার চেষ্টা না করিয়া) অনুবাদ করিত 'তী-কুও' (Tu-Kuo অর্থাৎ Hold Kingdom); 'তথাগত' = 'ঝু-লাই' (Ju-laı অর্থাৎ That-way Gone), 'অশ্বঘোষ' = 'মা-হেঙ্' (Ma-heng = Horse-Neıgh), তদ্রূপ 'দশ-রথ' এই নামের অন্য কোনো প্রচলিত রূপ 'দশ-বত' ধরিয়া তাহাবা অনুবাদ করিয়াছে, Shıh-hsı, 'শ্যঃ-শী' = Ten-Pleasures; 'দশরথ' = Ten-Charıots-এর অনুবাদ হয় Shıh-choe 'শ্যঃ-জ্যো'। সুতরাং যে প্রাচীন রামায়ণ-কথা প্রথম চীনা ভাষায অনূদিত হয়, তাহাতে 'দশ-রত' নামটিই ছিল — 'দশ-রথ' নহে। (তুলনীয়, 'ভারত' শব্দের প্রাচীনকালে প্রচলিত দুইটি রূপ — 'ভাবত' ও 'ভারথ'; এই 'ভারধ' হইতেই প্রাকৃতে 'ভারথ', 'ভারহ' এবং আধুনিক ভোজপুরি প্রভৃতি ভাষায় 'ভারথ')।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-খণ্ডে, ইন্দোচীনে ও ইন্দোনেসিয়া-তে, রামায়ণ-কথা খ্রিস্টিয় প্রথম সহস্রকের প্রথম ভাগেই প্রচারিত হইয়াছিল। কম্বুজদেশের Veal Kantel বেআল্ কান্তেল্ নামক স্থানে প্রাপ্ত খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকের একটি সংস্কৃত লেখ হইতে জানা যায় যে, সেখানকার একটি মন্দিরে রামায়ণ, অশেষ বা সম্পূর্ণ ভারত অর্থাৎ মহাভারত, এবং পুরাণ গ্রন্থ, রাজা ভববর্মা কর্তৃক অর্পিত হইয়াছিল, এবং ঐ-সকল গ্রন্থ প্রত্যহ পঠিত হইত—

রামায়ণ-পুরাণাভ্যাম্ অশেষং ভারতং দদৌ।
অকৃতাহন্বহম্ অচ্ছেদ্যাং বাচনাস্থিতিম্॥

চম্পা-দেশের Tra-Kıeu ত্রা-কিয়্যো লেখ, যাহা রাজা প্রকাশবর্ম (৬৫৩-৬৭৯ খ্রিস্টাব্দ) কর্তৃক উৎকীর্ণ হয়, তাহা হইতে জানা যায় যে, রামায়ণের কবি মহর্ষি বাল্মীকির একটি প্রতিমা পূজার জন্য ঐ দেশে স্থাপিত হইয়াছিল। এইরূপ "পাথুরে' প্রমাণ" হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এখন হইতে অন্তত দেড়-হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীনে রামায়ণ-মহাভারত কিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। ইন্দোচীনের-কম্বুজ ও চম্পার, তথা শ্যামের-ভাষা-সাহিত্যে ও শিল্পেও রামায়ণের অপরিসীম প্রভাব দেখা যায়। পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্য শিল্প-সৃষ্টি হইতেছে Angkor Vat অঙ্কর বাৎ-এর (অর্থাৎ 'নগর-বাস্তু'র) বিখ্যাত বিষ্ণু-মন্দির

— এই মন্দির খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে গঠিত কম্বুজরাজ্যের এক বিরাট্ কীর্তি — তাহার প্রস্তরময় ভিত্তি-গাত্রে রামায়ণের চিত্র উৎকীর্ণ আছে। কম্বুজ দেশের ভাষা Khmer খ্মের ভাষায় প্রচলিত রামায়ণের কোনো ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ দেখি নাই। কিন্তু শিল্পে রামায়ণ-কথার এই বিরাট্ প্রকাশ এইরূপ অনুবাদেরও অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। চম্পার Cham চাম-জাতির লোকেরা এখন জাতি-হিসাবে ধ্বংসের পথে — তবে তাহারা এখনও বিকৃত ব্রাহ্মণ্যধর্ম পালন করে। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে প্রাচীনকালের স্মৃতি ও প্রাচীন ধর্মের কথা এখন প্রায় অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। শ্যামের অধিবাসী Dai দৈ বা Thai থাই জাতির মধ্যে রামায়ণ-কথা সমধিক প্রচলিত, এবং রামায়ণের পাত্র-পাত্রীর নামের ও কৃতির সঙ্গে সকলেই পরিচিত। বাঙ্কক-নগরী শ্যামের রাজধানী, সেখানে শ্যামের জাতীয় সংগ্রহশালার প্রবেশ-চত্বর-গৃহে ব্রোঞ্জ-নির্মিত মানবাকার ধনুর্ধারী রামচন্দ্রের সুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্যামের দৈ জাতির প্রথম শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ইন্দ্রাদিত্য রাজার পুত্র রাজা রাম গম্‌হেঙ্ (খন্‌হেঙ্) ত্রয়োদশ শতকে দৈ বা থাই জাতিকে কম্বুজ-রাজের অধীনতা হইতে মুক্ত করেন। তাঁহার নাম হইতে তখনকার দিনেও থাইজাতির মধ্যে রাম-কথার প্রভাব সূচিত হয়। ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে নূতন এক রাজবংশের পরাক্রান্ত রাজা রামাধিপতি নূতন 'অযোধ্যা' (Ayuthia আইয়ুথিয়া) নগর স্থাপন করিয়া সেখানেই নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্যাম দেশের এখনকার রাজ-বংশের নাম 'মহাচক্রী' বংশ, এই বংশের প্রত্যেক রাজা "রাম" নামে অভিহিত। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে এই বংশের পত্তন হয়; প্রথম রাজার নাম ছিল রাম ফা বুদ্ধ, য়োদ্ ফা চূড়ালোক, অথবা প্রথম রাম (১৭৮২-১৮০৯ পর্যন্ত ইঁহার রাজ্যকাল) ;তৎপরে ফ্রা বুদ্ধ লোএস্ লা নাভালৈ দ্বিতীয় রাম (১৮০৯-১৮২৯), ফ্রা নাঙ ক্লাও তৃতীয় রাম (১৮২৯-১৮৫১), ফ্রা চোম ক্লাও মহা মংকুৎ চতুর্থ রাম (১৮৫১-১৮৬৮), চূড়ালঙ্কর পঞ্চম রাম (১৮৬৮-১৯১০), বজ্রায়ুধ ষষ্ঠ রাম (১৯১০-১৯২৫), প্রজাধিপক সপ্তম রাম; এবং এখন অতুলতেজাঃ (অদুলদেৎ) নবম রাম রাজত্ব করিতেছেন — শ্যামদেশে ১৭০ বৎসর ধরিয়া — সাত পুরুষ জুড়িয়া সত্যকার 'রামরাজ্য' চলিয়া আসিয়াছে।

শ্যাম-ভাষায় যে জনপ্রিয় রামায়ণ প্রচলিত, যাহা সকলেই পাঠ করে ও যে রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া জীবন্ত নটনটী ও নৃত্যশিল্পী দ্বারা অভিনয় ও নৃত্যনাট্য করা হয়, ও চিত্র-সাহায্যে Hnang 'হুঙ্' বা ছায়া-নাট্য দেখানো হয়, সে রামায়ণ 'রামায়ণ' নামে অভিহিত নহে, এবং তাহা বাল্মীকির রামায়ণের আধারেও রচিত নহে। সে রাম-কথা 'রামকীর্তি' নামে অভিহিত হয় (যেমন তুলসীদাসের কোসলী হিন্দি ভাষায় রচিত রামায়ণের 'রামচরিত-মানস')। 'রাম-কীর্তি' শব্দটি শ্যামীদের উচ্চারণে প্রথমে Rama-Kir "রাম-কীর্" রূপ গ্রহণ করে, এবং শ্যামীরা অন্ত্য-র কারকে ন-রূপে উচ্চারণ করে বলিয়া "রাম-কীর্তি" শব্দ এখন শ্যামী ভাষায় Rama-Kien 'রাম-কিয়েন্' রূপে পরিচিত।

কিছুকাল হইল, শ্যাম দেশের রাজধানী ব্যাঙ্কক নগরের 'থাই-ভারত সংস্কৃতি মন্দির' (Thai-Bharat Cultural Lodge) শ্যামী 'রাম-কিয়েন্'-এর এক ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৯)। অনুবাদ করিয়াছেন ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বর্গীয় সত্যানন্দ পুরী এবং শ্যামী লেখক চারোএন সারাহিরান্ Charoen Sarahiran। স্বামী সত্যানন্দ পুরী

বাঙলা দেশ হইতে ১৯৩৫ সালের দিকে শ্যামদেশে ভারত-ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চা ও প্রচার করিতে যান, তিনি সেখানে শ্যামী ভাষা খুব ভালো করিয়া শিখিয়া লন, শ্যামী ভাষায় দার্শনিক বিষয়ে একজন নামী লেখক বলিয়া শ্যামী সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, শ্যামীদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া বেদান্ত-প্রচারের কার্যে আত্মনিয়োজিত হন, কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে জাপানিরা তাঁহাকে নাকি গুলি করিয়া হত্যা করে। 'রাম-কিয়েন্'-এর অন্যতম আধার একখানি প্রাচীন শ্যামী গ্রন্থ 'নারায়ণ-সিপ্পাং' — ইহাতে নারায়ণের দশ-অবতারের কাহিনি আছে, অবতাবগুলির ক্রম ও কার্য বিভিন্ন — এই গ্রন্থ অনুসারে দশ অবতার এই ভাবেব ছিল : (১) বরাহ, (২) কূর্ম, (৩) মৎস্য, (৪) মহিষ — মহিষাসুর-বধ নারায়ণের এই মহিষ-অবতার কর্তৃকই সংঘটিত হয়, (৫) মুনি — ত্রিপুরাসুরের রাজধানী হইতে শিবলিঙ্গ উদ্ধার করেন, (৬) সিংহ (অর্থাৎ নরসিংহ) — হিরণ্যপকাসুরকে বধ করেন; (৭) কুব্জ — বামনের পবিবর্তে, দানব তাবন্‌কে পরাভূত করেন; (৮) কৃষ্ণ; (৯) অপ্সরা — নারায়ণ অপ্সবা-মূর্তি ধারণ করিয়া নন্দকাসুরকে মোহিত করিয়া পরে তাহার বধ-সাধন করেন (এই নন্দকাসুরই পরে 'দশকণ্ঠ' রাবণ রূপে অবতীর্ণ হয়); এবং (১০) রাম। "নারায়ণ-সিপ্পাং" গ্রন্থে বিষ্ণুই প্রধান দেবতা, কিন্তু 'রাম-কিয়েন্'-এ ঈশ্বর বা শিব হইতেছেন প্রধান।

'রাম-কিয়েন্'-এর রাম-কথা নানা বিষয়ে স্বতন্ত্র — রামায়ণের মূল উপাখ্যানটি ঠিক থাকিলেও ছোটো ও বড়ো ঘটনাগুলির বিস্তর হেরফের আছে, ভারতীয় রাম-কথায় অজ্ঞাত নানা কথা আছে, সুপরিচিত নামগুলিও বহুস্থলে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীর নাম 'রাম-কিয়েন্'-এ 'কৌসুরিয়া, সমুদ্রজা, কৈয়কেশী' হইয়া গিয়াছে। বশিষ্ঠের নাম ঠিক আছে, কিন্তু বিশ্বামিত্র হইয়া গিয়াছেন 'স্বমিত্র'। মন্দোদরীর শ্যামী নাম 'মন্ডো', এবং তিনি পূর্বজন্মে এক মণ্ডুকী বা বেঙ ছিলেন। রামের গাত্রবর্ণ হরিৎ, ভরতের (শ্যামীতে 'বরত') রক্ত, লক্ষ্মণের ('লক্ষণ') পীত এবং 'শত্রুদ্' বা শত্রুঘ্নের গাত্র-বর্ণ ছিল রক্তনীল। শ্যামী রামায়ণের উপাখ্যান-বৈচিত্র্য এবং পাত্র-পাত্রীদের নামের পার্থক্য, কতটুকু ভারতে প্রচলিত বাল্মীকি-রামায়ণের বহির্ভূত অন্য রাম-কথা বা পুরাণ-কথা হইতে প্রাপ্ত ও কতটুকু শ্যাম-দেশের প্রাচীন থাই-জাতির পুরাণ-কথার প্রভাবে সৃষ্ট, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। শ্যামী রাম-কথা লইয়া আর আলোচনা করিব না — তাহার পূর্ণ পরিচয় এক্ষেত্রে অনাবশ্যক; এবং কৌতূহলী পাঠকদের জন্য স্বামী সত্যানন্দ পুরীর অনুবাদ আছে। ভারতের ও শ্যামের (তথা যবদ্বীপের) রাম-কথা অবলম্বন করিয়া একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইতে পারে।

ইন্দোনেসিয়ায় (যবদ্বীপে ও অন্যত্র) রামায়ণের ইতিহাস অতি বিচিত্র। যবদ্বীপের রামায়ণ লইয়া, 'কবি' বা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় ও ডচ্ ভাষায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হিমাংশুভূষণ সরকার এম-এ (অধুনা খড়গপুর কলেজের অধ্যক্ষ) তাঁহার গবেষণাত্মক ইংরেজি পুস্তক Indian Influences on the Literature of Java and Bali (Greater India Society কলিকাতা হইতে ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত)-তে আলোচনা করিয়াছেন (অধ্যায় ৭, ৮, ৯, ১০, পৃ. ১৭০-২৩১)। প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণ ডচ্ সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত Hendrik Kern হেন্ড্রিক ক্যরন্ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত করিয়া দেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ডচ্ পণ্ডিত W.

F. Stutterheim স্টুটরহাইম জরমান ভাষায় মুনিক্ শহর হইতে Rama-legenden und Rama-reliefs in Indonesien অর্থাৎ 'ইন্দোনেসিয়ায় রাম-কাহিনি ও রাম-কথার প্রস্তর-চিত্র' বিষয়ে বৃহৎ সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে তিন খণ্ডে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ডচ্ সরকার কর্তৃক পরিচালিত জনশিক্ষা পরিষদ্ (Voolks-lektuur)-এর প্রকাশন-মন্দির, Weltevreden Batavia (অধুনা Djakarta জকর্ত)-নগরের Balai Poestaka 'বালাই-পুস্তকা' অর্থাৎ 'গ্রন্থ-গুহ' নামক প্রতিষ্ঠান হইতে Serat Rama 'রাম-কথা' পুস্তক রোমান লিপিতে ও যবদ্বীপীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। ইহাতে Tjandi Prambanan চাণ্ডী প্রাম্বানান্-এ খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের বিরাট মন্দিরত্রয়ের মধ্যে, মধ্যস্থলে অবস্থিত শিবের মন্দিরের প্রস্তরময় ভিত্তি-গাত্রে খোদিত অদ্ভুত-সুন্দর রামায়ণ-চিত্রাবলির প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে — এইরূপ সুন্দর রামায়ণ-চিত্র ভারতবর্ষেও কোথাও নাই; উপরন্তু, খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতকে Tjandi Panataran চাণ্ডী পানাতারান্ মন্দির-গাত্রের সম্পূর্ণ অন্য রীতিতে খোদিত চিত্রগুলিও প্রকাশিত হইয়াছে। যবদ্বীপে প্রচলিত রামায়ণের আলোচনা প্রসঙ্গে, এই পুস্তকে ভারতে ও মালয়-দেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন রামায়ণের বিচার আছে। বাল্মীকি-মতে মূল রাম-কথা প্রদত্ত হইয়াছে, ও যবদ্বীপের এক অতিপ্রসিদ্ধ কাব্যময় রাম-কথাও মুদ্রিত হইয়াছে।

যবদ্বীপে ও ইন্দোনেসিয়ার রামায়ণ, বাল্মীকি-রামায়ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে। শ্যাম-দেশের মতো অত পরিবর্তন ইহাতে হয় নাই। রাম ও সীতা যবদ্বীপে আদি স্রষ্টা, মানব-জাতির পিতা ও মাতা রূপেও কল্পিত হন ('র-মো, সী-ত্যো' রূপে নাম দুইটি উচ্চারিত হয়)। এ বিষয়ে পূর্ণ বিচারের এখন আবশ্যকতা নাই। বহু পূর্বে এ বিষয়ে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ও Rupam 'রূপম'পত্রিকায় কিছু লিখিয়াছিলাম। 'প্রবাসী'-তে চাণ্ডী প্রাম্বানান্-এর খোদিত রামায়ণ-চিত্র প্রকাশিতও হইয়াছিল। কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সীতা হরণের পরে রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অনুসন্ধানে কিষ্কিন্ধার নিকটে অরণ্যে ঘুরিতেছেন, এমন সময়ে রাম তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ জল আনিলেন নিকটে প্রবহমান একটি স্রোতস্বিনী হইতে। রাম সেই জল আস্বাদ করিয়া দেখিলেন, তাহা লবণাক্ত। রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ কারণ অনুসন্ধান করিতে নির্গত হইলেন — তিনি নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে উজাইয়া হাঁটিয়া চলিলেন, কোথায় সেই ক্ষুদ্র নদীটির উৎপত্তি তাহা দেখিবার জন্য। দেখিলেন, নদীটি আর কিছুই নহে, সুগ্রীব এক গাছের উপরে বসিয়া নিজ দুরবস্থার কথা ভাবিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন, তাঁহার চক্ষু হইতে নির্গত অবিরল অশ্রুধারা নদী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। এইভাবে লক্ষ্মণ-সুগ্রীব ও পরে রাম-সুগ্রীব মিলন ঘটিল। প্রাম্বানান্-এর মন্দিরের রামকথা-চিত্রে দেখা যায়, লক্ষ্মণ জলপাত্রের জন্য মোটা বাঁশের চোঙা লইয়া বৃক্ষে উপবিষ্ট রোরুদ্যমান সুগ্রীবের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। যবদ্বীপে রামায়ণ কথা লইয়া Wayang Koelit 'ওআইয়াং-কুলিৎ' অর্থাৎ ছায়ানাট্যও হইয়া থাকে। নৃত্যনাট্যও হয়। এইসব নাট্য-অনুষ্ঠানে ও রামকথার বিষয়বস্তুতেও কিছু কিছু অভিনবত্ব থাকে। ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যবদ্বীপ বলিদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণের সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল, সেই সময়ে যবদ্বীপের এক সামন্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর গৃহে আমাদের এই

প্রকার নৃত্যনাট্য দেখিবাব সুযোগ হইয়াছিল। এবিষয়ে আমার 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থে (কলিকাতায় ১৯৪০ সালে প্রকাশিত, পৃ. ৩৫০-৩৫১) আমি লিখিয়াছি। শূর্পণখার একসঙ্গে আট আটটি রাক্ষস স্বামীর কল্পনা — প্রত্যেকেবই মুখ মহিষ আর শূকবের মুখের ভাব মিলাইয়া প্রস্তুত মুখোশের দ্বারা আবৃত — এই মহিষশৃঙ্গ শূকরমুখ আটটি রাক্ষস যেন বর্বরতা ও মূর্খতাব প্রতীক — শূর্পণখার বিরহে আটজন স্বামীর নাচ-গানের মাধ্যমে চিত্রের অধৈর্য প্রকাশ, এবং দণ্ডকারণ্য হইতে শূর্পণখার প্রত্যাবর্তনে যুগপৎ আট স্বামীর সোল্লাস নৃত্য — যবদ্বীপে, অদ্ভুত ও বীভৎস মিশ্র হাস্যরসের এক অনপেক্ষিত পরিবেশের সৃষ্টি দ্বারা এইভাবে পল্লবিত বাম কথাকে জনপ্রিয় কবিয়া তুলিযাছে, পরন্তু মূল আখ্যানেব মর্যাদা ইহাতে মোটেই ক্ষুণ্ণ হয নাই।

রামায়ণকথা এইভাবে নানাজাতির চিত্তকে রসসিক্ত করিয়াছে। বিশ্বমানবের সাহিত্য-রসপিপাসু মনের জন্য বামকথা এক অক্ষয় রসভাণ্ডার রূপে বিরাজমান। বিরাট্ সাহিত্য সর্জনার গুণই এই — ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকাবের মনকে নানাভাবে আকুল করিতে পারে। আমাদের দেশে, রামাযণের সাহিত্য রস তো আছেই, এবং সেই সাহিত্য-রস, সাহিত্য রসিকজনেব চিত্তকে কি কারণে এবং কিভাবে আবিষ্ট করিয়া থাকে, আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কাবিকগণ তাহার বিচাব করিয়াছেন। রামায়ণে romance অর্থাৎ রমন্যাস বা রোচিষ্ণুতা আছে, এই রোমান্স সকলেব চিত্তকে আকুল করিবেই। ইহাতে বাস্তবানুসারিতাও আছে, বিশেষত চরিত্র-চিত্রণে, — সেই বাস্তবানুসারিতার সত্যদৃষ্টি আমাদের মুগ্ধ করে; উপাখ্যানের অলৌকিক অংশ বর্জন করিয়াও তাহার যৌক্তিকতা ও সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনের সন্দেহ এই সত্যদৃষ্টিই নিরসন করে। কিন্তু ইহার মধ্যে যে পারিবারিক জীবনের আদর্শ আছে, তাহাব আর তুলনা হয় না। রামায়ণের প্রথম প্রচারের সময় হইতেই ইহার অমৃত-প্রবাহ ভারতীয় পারিবারিক জীবনকে পবিত্র ও পুণ্যময় করিয়া রাখিয়াছে। সত্যনিষ্ঠা, পিতৃভক্তি, পাতিব্রত্য, পত্নীপ্রেম, সৌভ্রাত্র, প্রভুভক্তি, আশ্রিত-রক্ষা প্রভৃতি যে-সমস্ত গুণে সমাজে মানুষের মধ্যে শান্তি ও সুখ সহজলভ্য হয়, যে সমস্ত গুণে মানুষ দেবতার পদে উন্নীত হইতে পারে, নিখিল চিত্ত-মথনকারী মনোহর উপাখ্যানের মাধ্যমে, উপাখ্যানের পটভূমিকা নগর ও অরণ্য উভয়ের পারিপার্শ্বিকে, অদ্ভুত সুন্দরভাবে সকলকে প্রীত-বিস্মিত করিবার সে সমস্ত গুণ ও আদর্শ রামায়ণে প্রতিফলিত হইয়া আছে। রামায়ণের সামাজিক আদর্শ ও বিশেষ করিয়া পারিবারিক আদর্শই হইতেছে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের আদর্শ। সত্য বটে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সব যুগে ও সর্বত্র একইপ্রকার থাকে না বা হয় না। রামচরিত্র একদিকে মহীয়ান্, তাহার মহত্ত্বের তুলনা হয় না। অন্যদিকে, রামের কতকগুলি আচরণে বা কার্যে আধুনিক যুগের মানুষ সহমত হইতে পারিবে না; যেমন বালী-বধ, সীতার বনবাস ও শম্বুকবধ। কিন্তু তাহা হইলেও, রামায়ণের সহজ সরল পারিবারিক আদর্শকে আমরা কোনো কালে কোনো সমাজে উপেক্ষা করিতে পারি না। রামের চরিত্রের গৌরব, লক্ষ্মণের ও ভরতের কর্তব্যনিষ্ঠা ও ভ্রাতৃভক্তি, সীতার চরিত্রের বিপুল মাধুর্য ও মহিমা, উর্মিলার আত্মবিলোপ, হনুমানের ভক্তি ও কর্তব্য-পরায়ণতা — এ সমস্তই আমাদের হৃদয়ের বস্তু। ইহাদের চরিত্র বাল্মীকির মহাকাব্যে অতিমানব মহাপুরুষ, বীর এবং

বীরাঙ্গনার চরিত্র — মানবিকতার আধারে দণ্ডায়মান থাকিযাও, এই মহাগ্রন্থে তাঁহারা সকলেই দেবত্বের পদে অধিরূঢ় রহিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের চরিত্রের মানবিক গুণের জন্যই তাঁহারা আমাদের কাছে এত প্রিয়, এত আপনার হইয়া রহিয়াছেন। ভারতবর্ষের ও বহির্ভারতের প্রত্যেক অঞ্চলের জনসাধারণ, ইঁহাদিগকে সেই সেই অঞ্চলের জীবনের অন্তস্তলে টানিয়া লইয়া নিজেদের করিয়া লইয়াছেন। বাল্মীকি-রামায়ণের সীতা ক্ষত্রিয়াণী, বীরাঙ্গনা;বাঙলায় আসিয়া তিনি কৃত্তিবাস প্রমুখ বাঙালি কবির অঙ্কিত চরিত্রালেখ্যে বাঙলার গৃহস্থ ঘরের বধূ হইয়া গিয়াছেন। আবার রাজস্থানে তিনি মধ্যযুগের রাজপুতানি, কেরলে তিনি কেরল সীমন্তিনী, তুলসীদাস প্রমুখ কবির কল্যাণে তিনি উত্তর ভারতের লজ্জাশীলা অথচ তেজোদৃপ্তা কুলবধূ। সীতা মহীয়সী বীরাঙ্গনা, কিন্তু আমরা 'জনমদুখিনী' বাঙালি ঘরের লাজুক বধূ সীতাকেই জানি, তাঁহার পুণ্য চরিত্র আকুল চিত্তে পূজা করি — এবং এই জনমদুখিনী অথচ স্বামীর প্রেমে গরবিনী এবং স্বামীর আদর্শে ধন্যা ও অনুপ্রাণিতা রাম-ঘরণী সীতাকে, নূতন করিয়া গৌরাঙ্গ-জায়া বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে ও বামকৃষ্ণ-পত্নী সারদা দেবী রূপে পাইয়াও আমরা ধন্য হইয়াছি।

রামায়ণের কথা একাধারে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ধর্মাদর্শ-পূত-সুসংস্কৃত জীবনের কথা, এবং মধ্যযুগের ও আধুনিককালের ভারতীয় গৃহস্থ জীবনের শুচিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার কথা। ইহার প্রাচীন স্বরূপ প্রণিধানের জন্য আমাদের সমক্ষে মূল বাল্মীকির রামায়ণ রহিয়াছে। আমাদের জীবনের উপযোগী করিয়া ইহার অমর কাহিনির এক ঘরোয়া রূপ আমরা দিয়াছি। আবার প্রাচীন বীরগাথার যুগ, যেখানে বিরাট্ উপাখ্যানের পাত্র-পাত্রী হয় দেবধর্মী মানব, না হয় মানব- ধর্মী দেবতা, তাহাকে অতিক্রম করিয়া বা তাহাকে প্লাবিত করিয়া আমরা মধ্যযুগের ভক্তির এবং আত্মনিবেদনের ধারা বহাইয়াছি। বাল্মীকির রামায়ণ এক ধরনের বস্তু; কিন্তু তুলসীদাসের রামচরিত মানসে আছে ভক্তের পুলক স্বেদকম্প ও অশ্রুবর্ষণ, এবং ভক্তিশাস্ত্রের দার্শনিক বিচার ও জীবনে প্রতিফলন; তেমনি কৃত্তিবাসের রামায়ণে আমরা পাই, সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় যে রামায়ণ-কথা 'স্বে মহিম্নি' বিদ্যমান, তাহার উপাখ্যানের সংকলন, ও সঙ্গে সঙ্গে ধরাধামে অবতীর্ণ দেবতা রামচন্দ্রের ললিত কোমল স্নেহ-প্রবণ ভক্ত-বৎসল দেব-প্রকৃতির প্রকাশন। নানা দিক্ হইতে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ভাষার দ্বারা প্রচারিত এই রামায়ণ-কথার পূর্ণ সার্থকতা পরিস্ফুটিত হইতেছে।

কিন্তু একদিকে রাম-কথার অন্তর্নিহিত জীবনের আদর্শ ও নীতিনিষ্ঠতা, অথবা ইহার দ্বারা সমাজ সংস্করণ, অন্য দিকে রাম-কথার বাহ্য রূপের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অথবা সংস্কৃতির পরিচয়, প্রাচীন ভারতীয় জাতির পরিচয় — এ সকলের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে রামায়ণের ভিতরের কাব্য-প্রাণ, যেটি সোনার-কাঠির মতো মানব-মনে কাব্যামৃত-রসাস্বাদের সাহায্যে নূতন অনুভূতি, নবীন চেতনা আনিয়া দেয়; ও যাহাতে সমগ্রভাবে, কেবল পারিবারিক সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় প্রাণী রূপে নহে, মানবকে সংযত করে, পবিত্র করে, উন্নত করে, পরিপূর্ণ করে। এই জন্য রামায়ণ, মহাভারত, য়িহুদী পুরাণ, কালিদাসের নাটক ও কাব্য, ইরানী ইতিহাস-কথা শাহ্‌নামা, গ্রিক মহাকাব্য ইলিয়াদ ও ওডিসি, গ্রিক ট্র্যাজেডি নাট্যসম্পুট, শেক্স্‌পীয়ারের নাটকাবলি, গ্যোটের রচনাবলি, রবীন্দ্র-রচনাবলি প্রভৃতি

মহাগ্রন্থের সার্থকতা। ব্যাপকভাবে আমাদের জাতির পক্ষে, আমাদের জাতির প্রত্যেক নরনারীর পক্ষে, ইহা এক বিধিদত্ত পরম সৌভাগ্য যে, রামায়ণ মহাভারতের মতো গ্রন্থ আমাদের সভ্যতার আধার-ভূমি ও প্রকাশ-ভূমি হইয়া আছে। মহাকবির এবং সাধকের ভাষায় আমরা আমাদেরও প্রাণের ভাষা পাই; সেইজন্য, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মানবমনের প্রতি রামায়ণের আবেদন উদ্ধার করিয়া, আমার এই অক্ষম রামায়ণ-প্রশস্তি সমাপ্ত করিতেছি —

এতেক বলিয়া ক্ষণপরে কবি
করুণ কথায় প্রকাশিল ছবি
পুণ্যকাহিনী রঘুকুলরবি
রাঘবের ইতিহাস—
অসহ দুঃখ সহি নিরবধি
কেমনে জনম গিয়েছে দগধি,
জীবনের শেষ দিবস অবধি
অসীম নিরাশ্বাস।
কহিল, 'বারেক ভাবি দেখো মনে
সেই এক দিন কেটেছে কেমনে
যেদিন মলিন বাকল-বসনে
চলিলা বনেব পথে—
ভাই লক্ষ্মণ বয়স নবীন,
ম্লানছায়াসম বিষাদ-বিলীন
নববধূ সীতা আভরণহীন
উঠিলা বিদায়বথে।।
রাজপুরীমাঝে উঠে হাহাকার,
প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারে সার —
এমন বজ্র কখনো কি আর
পড়েছে এমন ঘরে।
অভিষেক হবে, উৎসবে তার
আনন্দময় ছিল চারি ধার
মঙ্গলদীপ নিবিয়া আঁধার
শুধু নিমেষের ঝড়ে।
আব একদিন, ভেবে দেখো মনে,
যেদিন শ্রীরাম লয়ে লক্ষ্মণে
ফিরিয়া নিভৃত কুটির-ভবনে
দেখিলা জানকী নাহি —
'জানকী জানকী' আর্ত রোদনে
ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে,
মহা-অরণ্য আঁধার-আননে,
রহিল নীরবে চাহি।
তার পরে দেখো শেষ কোথা এর,
ভেবে দেখো কথা সেই দিবসের —

এত বিষাদের, এত বিরহের
এত সাধনের ধন,
সেই সীতাদেবী রাজসভামাঝে
বিদায় বিনয়ে নমি রঘুরাজে
দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে
হইলা অদর্শন।
সে সকল দিন সেও চলে যায়;
সে অসহ শোক — চিহ্ন কোথায় —
যায় নি তো এঁকে ধরণীর গায়
অসীম দগ্ধরেখা।
দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার,
দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার,
সরযূর কূলে দুলে তৃণসার
প্রফুল্ল শ্যামলেখা।
শুধু সে দিনের একখানি সুর
চিরদিন ধ'রে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে;
সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহাসংগীতে
বাজে মানবের কানে।'

□ *ভূমিকা*, *রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত*, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, (সাহিত্য সংসদ) ১৩৬৪

সাহিত্যে বাস্তবতা

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রের' শ্রাবণসংখ্যায় (কাব্যের বাস্তবতা) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি গোড়াতেই লিখিয়াছেন, 'এমন কথা কেহ কেহ বলিতেছেন যে, আজকাল বাংলাদেশে কবিরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোকশিক্ষার কাজ চলিবে না।' 'প্রবাসীর' (আষাঢ়সংখ্যায়) 'লোক শিক্ষক বা জননায়ক' প্রবন্ধে আমি ঐ কথাই বলিয়াছি। অন্য কেহ ঐ কথা বলিয়াছেন কিনা জানি না। রবীন্দ্রনাথের আলোচনা আমার প্রবন্ধকেই লক্ষ করিয়াছে, তাই মনে করিয়া আমি একটা প্রত্যুত্তর দিতে সাহসী হইয়াছি।

তাহা ছাড়া রবীন্দ্রবাবু সাহিত্যের ভাব ও উদ্দেশ্যসম্বন্ধে যে সমস্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলি বিশেষ আলোচনা ও অনুধাবনযোগ্য। আমাদের বর্তমান-সাহিত্য রবীন্দ্রবাবুর মত ও আদেশানুযায়ী গড়িয়া উঠিলে তাহার উন্নতি কিরূপ সম্ভব তাহা ভাবিয়া দেখিবার একটা প্রধান বিষয় সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, 'সাহিত্যের সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি — সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার ভার লয় নাই।' সাহিত্যের সাধনা, — আনন্দরস সৃষ্টি, আর সাহিত্য-সাধনার সার্থকতা — সমাজকে আনন্দের দিকে লইয়া যাওয়া। কিন্তু সাহিত্য আপনার সৃষ্ট আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিলে চলিবে না। প্রায়ই দেখা যায়, যখন সাহিত্য আপনার সৃষ্ট আনন্দে তৃপ্তিলাভ করে, সমাজ প্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে আনন্দলাভ করে না, তখন সে সাহিত্য ধীরে ধীরে সমাজের সহিত তাহার নিগূঢ় সম্বন্ধ হারাইয়া আত্মম্ভরিত্ব দোষে দুষ্ট হয়। সাহিত্যে আত্মম্ভরিত্ব দোষ প্রবেশ করিলে সাহিত্য কৃত্রিম হইবেই, তাহার উন্নতি অসম্ভব।

নানা ভাব চিন্তা অভাব অভিযোগের ভিতর দিয়া সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। উন্নতির পথপ্রদর্শক যুগনির্দেষ্টা ভাবুকগণ। যুগনির্দেষ্টাগণের অঙ্গুলি সঙ্কেতে সমাজ যুগে যুগে কণ্টকময় পথ দিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আধুনিককালে শিল্পী নহে, ধর্মপ্রচারক নহে, সাহিত্যিকগণই যুগনির্দেষ্টার কর্তব্য কর্মে ব্রতী হইয়াছেন। সাহিত্যের চরমসাধনা হইয়াছে যুগধর্ম প্রকাশ করা, নবযুগ আনয়ন করা।

যুগধর্ম প্রকাশ করিতে যাইলে সাহিত্যকে বাস্তবের সহিত আত্মীয়তা করিতে হইবে, সাহিত্যকে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বড়োলোক, দীন, মধ্যবিত্ত, লোকসাধারণের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে, নিখিলের সংস্রবে না থাকিলে সাহিত্যে বাস্তবতা আসিবে না। নানা লোকের নানা অভাব, নানা সুখ দুঃখের মধ্যে না পড়িলে সাহিত্য অবাস্তব থাকিবে।

সাহিত্য বাস্তবকে অবলম্বন করিয়াই রস সৃষ্টি করে। রস জিনিসটার একটা আধার থাকা চাই, — সেই আধারটাই হইতেছে বাস্তব। বাস্তবের পরিবর্তন হইতেছে;— যুগে যুগে বাস্তব বিভিন্ন হইতেছে;সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-রসও বিভিন্ন হইতেছে। তবুও বাস্তবের মধ্যে, একটা নিত্যতা আছে;আর ঐ নিত্যতা আছে বলিয়া আমরা দেশকালপাত্র অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য-রসের আস্বাদন করিতে পারি।

রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, 'রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। কিন্তু বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা ওবেলা বদল হইতে থাকে। সরস্বতী বস্তু-পিণ্ডের উপরে তাঁহার আসন রাখেন নাই, রাখিয়াছেন পদ্মের উপরে। কাব্য যে গুণে টিকিবে তাহা নিত্য রসের গুণে।' রস ও বস্তু, দুইয়েরই মধ্যে একটা নিত্যতা আছে, একটা অনিত্যতাও আছে। বাস্তবের পরিবর্তন হইতেছে, রসেরও পরিবর্তন হইতেছে। অথচ ঐ পরিবর্তনের মধ্যেও নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর সহিত পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়। কাব্য যে গুণে স্থায়ী হয় তাহা নিত্যবসের গুণে বলিলে ঠিক বলা হয় না। কাব্য স্থায়ী হয়, নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর গুণে। প্রত্যেক কাব্যেই যুগে যুগে দেশকালপাত্রভেদে আমরা অনিত্য-রসের আস্বাদন করি, ইতিহাস-বস্তুরও সাক্ষাৎ পাই। সেই কাব্য নিত্য, যে কাব্য ইতিহাসের উপাদান না জোগাইয়া নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর সহিত আমাদের পরিচয় ঘটাইয়া দেয়। নিত্য রসস্বরূপ পদ্মের উপর সরস্বতী চরণ রাখিয়াছেন। পদ্ম কত প্রকার, — নীল, শ্বেত, রক্ত; — বিভিন্ন বাস্তবের ভিতর দিয়া পদ্ম বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়াছে। সরস্বতীচরণতলাশ্রিত সাহিত্য যুগে যুগে দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন রসের সৃষ্টি করিয়াছে। নীলপদ্ম, শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম সবই নিত্যরসের অভিব্যক্তি;আবার প্রত্যেক মৃণাল, প্রত্যেক লতিকা, — নিত্য-বস্তুর বিকাশ।

মৃণাল না থাকিলে, লতিকা না থাকিলে পদ্ম যে ঢলিয়া পড়িবে। বাস্তবকে অবলম্বন না করিলে সাহিত্যের সৌন্দর্য কী করিয়া ফুটিয়া উঠিবে? রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, 'বাস্তবের হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে।' বাস্তবকে হট্টগোল বলিয়া উড়াইয়া দিলে সাহিত্যের ধ্রুব আদর্শ বিকাশ লাভ করিবে না।

লতাকে উপেক্ষা করিয়া তো ফুল ফুটে না। সাহিত্য যদি বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া রস সৃষ্টি করিতে চাহে, তবে সে রস কাগজের ফুলের মতো অলীক ও কৃত্রিম হইবে — সে রস হইতে কেহ তৃপ্তি পাইবে না, জীবন পাইবে না।

আসল ফুল কাগজের গাছে ফুটে না — সরস জীবন্ত গাছে বিকশিত হয়। জীবন্ত গাছ হইতেছে সাহিত্যের আসল বাস্তব, সে গাছ তাহার শিকড়ের দ্বারা জাতির অন্তরতম হৃদয়ের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অটুট রাখিয়াছে — সমগ্র জাতির হৃদয় হইতে তাহার রস সঞ্চার না হইলে সাহিত্যের প্রকৃত সৌন্দর্য যে ফুটিয়া উঠিবে না শুধু তাহা নহে, সাহিত্য তাহার জীবনীশক্তি হারাইয়া নীরস গাছের মতো — শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে।

বিভিন্ন গাছের বিভিন্ন ফুল ফুটে। বিভিন্ন বাস্তবে এক গাছের ভিন্ন ফুল দেখা যায়। সাহিত্যের সৌন্দর্য বিকাশসম্বন্ধে একই নিয়ম খাটে। গোলাপ গাছে জবাফুল ফুটে না,

জবাগাছে শিউলিফুল পাওয়া যায় না। আবার স্থান কাল ও অবস্থাভেদে একই গাছের ফুলের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, — ইহা শুধু বৈজ্ঞানিক কেন, লোকসাধারণও বলিবেন। সাহিত্যের পক্ষেও তাহাই। সাহিত্য স্থান কাল ও অবস্থাভেদে, ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবে বিভিন্ন সত্যের উপলব্ধি করে, বিচিত্র সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে।

ফুলের মধ্যে যেরূপ প্রকারভেদ লক্ষিত হয় সেরূপ সত্য ও সৌন্দর্যেরও প্রকারভেদ হয়। কিন্তু সবগুলিই যেমন ফুল, সেরূপ সাহিত্যের সব সৃষ্টিই সত্য ও সুন্দর। একটা গোলাপগাছের যদি আশা হয়, সে স্থান কাল ও অবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া নীচের মাটি হইতে বসসঞ্চয় না কবিয়া, আলোক ও বাতাসের দানকে অবজ্ঞা করিয়া এককথায় বাস্তবকে না মানিয়া সে লিলিফুল ফুটাইবে তাহা হইলে তাহার যেরূপ বিড়ম্বনা হয়, কোনো দেশের সাহিত্যের পক্ষে দেশের সমাজ ও যুগধর্ম — বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া সৌন্দর্যসৃষ্টির চেষ্টাও সেরূপ ব্যর্থ হয়। সাহিত্যের সাধনা, — সত্যের ও সৌন্দর্যের প্রকাশ, দেশে দেশে যুগে যুগে বিভিন্ন বাস্তবের মধ্য দিয়া সে সাধনা বিভিন্ন হইয়াছে। অথচ দেশে দেশে যুগে যুগে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং পরম সত্য সুন্দরের মূর্তি সাহিত্যের ভিতর প্রকাশ পাইয়াছে।

পরিবর্তনশীল বাস্তবের মধ্যে পড়িয়া সাহিত্যকে নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর অনুসন্ধান করিতে হইবে। নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর অনুসন্ধান করা সাহিত্যের ধ্রুব আদর্শ। অনিত্য বাস্তবের মধ্যে নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুকে লাভ করা সাহিত্যের চরম সাধনা। শুধু লাভ করা নহে, নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুকে প্রকাশ করাও সাহিত্যের সাধনা। হীন ও নিকৃষ্ট বাস্তব নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর পবিচয় লাভ করিয়া মহনীয় ও সুন্দর হইয়া উঠিলে সাহিত্য-সাধনা সফল হয়। হেয় বাস্তব নিত্যরস ও নিত্যবস্তুর সংঘাতে পরিবর্তিত হইবেই — এই পরিবর্তন সংঘটনেই সমাজের উপর সাহিত্যের প্রভাব লক্ষিত হয়।

নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুব সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা কর্তব্য। রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, 'রসের একটা নিত্যতা আছে।' আর নিত্য-রসের গুণেই সাহিত্য স্থায়ী হয়। সাহিত্যে যদি কিছু নিত্য ও সর্বজনভোগ্য রস থাকে তাহার উৎস পুরুষ ও রমণীর সম্বন্ধ। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আমরা রসের নিত্যতা কিছুই দেখিতে পাই না। ইউরোপে হেটায়রা-বহুল গ্রিক সমাজের সহিত মধ্যযুগের রমণীপূজার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আবার মধ্যযুগের চিভালরী আধুনিক পাশ্চাত্যসমাজের স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন যুগে সাহিত্য স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধের বিভিন্ন আদর্শ প্রকাশ করিয়াছে, যুগধর্মের অনুযায়ী বিভিন্ন আদর্শের পূর্তবিধান করিয়াছে, — অথচ এই বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা প্রত্যেক সাহিত্যের ভিতর যুগধর্মের প্রভাব ও দেশকালপাত্রভেদকে অতিক্রম করিয়া স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধ হইতে একটা নিত্য রসের পরিচয় লাভ করিতে পারি। সাহিত্যের চঞ্চল রস-স্রোতের মধ্যে সেই সনাতন পুরুষ ও নারী নিত্য ভাসমান।

সাহিত্য এরূপে অনিত্য বাস্তবকে অবলম্বন করিয়া নিত্য-রস ও নিত্যবস্তুর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে;আর নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারিলে বাস্তবের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলন আসে, বাস্তবের যাহা কিছু হেয়, ঘৃণ্য, নগণ্য তাহা ধসিয়া পড়ে একটা সুন্দর, মহনীয় বাস্তব গড়িয়া উঠে। এইখানেই সাহিত্যের গুরু ও শিক্ষকের কার্যের পরিচয়

পাওয়া যায়। রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, 'সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাস্টারির ভার লয় নাই।' রবীন্দ্রবাবু আধুনিক ভারতের একজন যুগনির্দেষ্টা, আধুনিক ভারতীয় সমাজের তিনি একজন প্রধান শিক্ষক, — তাঁহার সাহিত্য আমাদিগকে এক নূতন শিক্ষা ও দীক্ষায় ব্রতী করিতেছে — কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে আজ এ কি কথা! রবীন্দ্রবাবু বলিতেছেন, আর্টের কোনো বন্ধন নাই;— সাহিত্য ধর্ম নীতি, রাজনীতির কোনো ধার ধারে না, — তিনি সাহিত্যকে সর্ববন্ধনবিহীন মুক্ত স্বাধীন করিতে চাহেন।

কিন্তু এ প্রকার সাহিত্য কি মানুষের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে? যে সাহিত্যের সহিত মনুষ্য জীবনের প্রধান সমস্যাগুলির কোনো সম্বন্ধ নাই, সে সাহিত্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিতে পারে সত্য, বিচিত্র মধুর রস উৎপাদন করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা মনুষ্যের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, মানুষের আত্মার নিকট সে সাহিত্য মূঢ় — নির্বাক।

এইখানেই প্রভেদ। তাহা ছাড়া তানসেনের সুর যে শুধু আনন্দেরই সৃষ্টি তাহাই বা কি করিয়া বলি? তানসেন কি আকবরের সভাকে একেবারেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, তিনি কি সবাব নিয়ম ছাড়িয়া শুধু কি নিজের প্রকৃতি দিয়া বিশ্বের সহিত আপনার যোগ অনুভব করিতেন? আকবরের সভা তানসেনের জন্য নিয়মকানুন বাঁধিয়া দিয়াছিল, তানসেনকে একা অব্যবহিতভাবে বিশ্বের সহিত যোগ উপলব্ধি করিতে দেয় নাই। বিশ্বের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ একান্ত বাস্তব ছিল না। তাই লোকসাধারণের প্রকৃতি তাঁহার সুরের সহিত আত্মীয়তা প্রবেশ করে কিনা তাহার জন্য কোনো চিন্তাই করেন নাই। রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, 'তানসেন তৈরি বলিবেন না। তাঁহার সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই;আর কোনো মৎলবে সে আর কিছু হইতে পারেই না।' তানসেন মেঠো সুর তৈয়ার করেন নাই, ইহা সত্য;কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার সুর যে সর্বাপেক্ষা মিষ্ট তাহা কি করিয়া বলিব? তানসেন গাহিতেছেন, অন্য লোক তাঁহার সুর গ্রহণ করিতেছে কি না;তাহাতে অনুভব করিতে পারে না;— লোকসাধারণের সাধনার অভাবকে ইহার দায়ী করিলে চলিবে না;তানসেনের গান কেন অবাস্তব তাহার কারণ নির্ণয় করিতে হইবে।

মানুষের অন্তরপ্রকৃতি বিশ্বের সহিত তাহার আত্মীয়তা যে সুরের দ্বারা সদাসর্বদাই অনুভব করিতেছে, সে সুরকে তানসেন স্পর্শ করিতে পারেন নাই; গোবিন্দদাসের গান, রামপ্রসাদের গান মেঠো সুর — সেই সুরকেই জাগাইয়া দেয় — সেই সুরই একান্ত বাস্তব এবং সেই জন্যই তাহা সর্বজনীন।

আজকাল আমাদের দেশে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে তাহাতে এই মেঠো সুরের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহা বাস্তব বলিয়া সাধারণের অন্তরতম প্রাণকে আন্দোলিত করিতে পারে নাই। সাহিত্যে আজকাল ভাঁজা সুরের প্রাচুর্য — কবিগণ বলিতেছেন, লোকসাধারণ! শিক্ষালাভ করুক, সাধনা করুক তবেই তাহারা সুর বুঝিতে পারিবে। সাহিত্য ক্রমশ অবাস্তব হইতে চলিয়াছে, নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর অনুসন্ধানে না থাকিয়া সাহিত্য এক্ষণে শিল্পনৈপুণ্যের অনুশীলন করিতেছে। সাহিত্যের এখন ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু জীবন নাই, সাহিত্য জীবন দিতে পারিতেছে না।

এখনকার এই হেয় ঘৃণ্য বাস্তবেব মধ্যে পড়িয়া দেশের সাহিত্য নিত্যরস ও নিত্যবস্তুকে পাইবাব জন্য সাধনা করুক। নিত্যবস্তুকে প্রকাশ করিয়া বাস্তবের মধ্যে তুমুল আন্দোলন আনুক, বাস্তবের মধ্যে তখন যাহা কিছু হেয়, অনিত্য ঝবিয়া পড়িবে, যাহা কিছু সুন্দর, মহনীয়, নিত্য তাহা উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তু প্রকাশের দ্বারা সাহিত্য বাস্তবের পরিবর্তন সাধনের ভার লউক, সাহিত্য ইস্কুল মাস্টারের ভার মাথায় পাতিয়া বরণ করুক।

সাহিত্য যে ইস্কুল মাস্টারির ভাব লইবে, সমাজেবও দীক্ষাগুরু হইবে ইহা ঠাট্টা বা বিদ্রূপেব বিষয় নহে। সাহিত্যেব পরম সৌভাগ্য, সাহিত্যেব চবম সার্থকতা যদি যে সমাজেব গুরুর স্থান অধিকার করিতে পারে। খ্রিস্ট, সেন্ট পল, বুদ্ধ, চৈতন্য সমাজের গুরু হইয়াছিলেন, এখন সাহিত্যিকগণ গুরু হইতেছেন, — কার্লাইল, রাস্কিন, টলস্টয় সমাজের শিক্ষা ও দীক্ষার ভার লইয়াছেন। মরিস মেটারলিঙ্ক তো স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, আধুনিক নাটক তো আব কিছুই করিবে না, সমাজের আধুনিক নীতির সমস্যাগুলির আলোচনা ও মীমাংসা করিবে, সমাজের গুরুগিরি করা ভিন্ন তাহার অন্য কোনো ভাব নাই। বার্নার্ড শ টলস্টয়কে একটা চিঠি লিখিযাছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, — 'I am not an Art for Art sake man, and could not little finger to produce to work of art if I thought there was nothing more than that in it'

শুধু বার্নার্ড শ-র নাটক কেন, আধুনিক নাটকমাত্রেই গুরুগিরি করিতেছেন। জার্মান নাটকের সমাজের গুরুস্থান অধিকারের কথা আমি অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। শুধু নাটক কেন, নভেল উপন্যাসও ইস্কুল মাস্টারির ভাব হাতে লইয়াছেন। রুশ-সমাজকে রুশ-নভেল কী ভাবে নূতন শিক্ষা ও দীক্ষায় ব্রতী করিয়াছেন তাহা আধুনিক সাহিত্যজগতে একটা স্মরণীয় বিষয়! আমি এ সম্বন্ধেও অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সাহিত্য, সমাজের গুরুস্থান অধিকার করিয়া আপনার শক্তি আবার নূতন করিয়া চিনিয়াছে।

রবীন্দ্রবাবু নিজে যাহাই বলুন না কেন, রবীন্দ্রসাহিত্য আধুনিক সমাজের যে ইস্কুল মাস্টারির ভার লইয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে চলে না। রবীন্দ্রবাবুর 'রাজা', 'ডাকঘর', 'গোরা' আর্ট হিসাবে পরম সুন্দর নহে; কিন্তু তাহাদের ভিতরকার তত্ত্ব বা যুক্তি অতি গভীর ও সুন্দর; রবীন্দ্রবাবু ঐ বইগুলিতে সমাজের কয়েকটি জটিল সমস্যার আলোচনা ও মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; রবীন্দ্রবাবু শিক্ষকের ভার লইয়াছেন এবং অতি নিপুণভাবে সে গুরুভার বহন করিয়াছেন, তাই বইগুলিতে আর্ট হিসাবে যাহা কিছু দোষ আছে তাহাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না, আমাদের দৃষ্টি পড়ে রবীন্দ্রবাবুর উপদেশের দিকে। ডাকঘর বা গোরা যখন পড়ি তখন আমরা একজন শিল্পীর প্রস্তুত দ্রব্য ভালো লাগিল কিনা তাহা বিচার করিতে বসি না। আবার রবীন্দ্রবাবু সময়ে কড়া ইস্কুল মাস্টারি করিতে ছাড়েন না। 'অচলায়তনে' রবীন্দ্রবাবু গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ড লইয়া সমাজকে কষাঘাত করিতে সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। ইস্কুলে বেত্রাঘাত উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু সময়ে সময়ে সে বেত্রাঘাত যে ছাত্রের পক্ষে কল্যাণকর তাহাতে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রবাবু তাঁহার রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন প্রভৃতিতে যে গভীর তত্ত্বসম্বন্ধে শিক্ষা

দিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমি অন্য এক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বাস্তবিক রবীন্দ্রবাবুর আধুনিক নাটক ও নভেল যে লোককে শিক্ষা দিবার কোনো চিন্তাই করে নাই ইহা বলিলে রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভাকেই খর্ব করা হইবে।

জগতে সেই সব কাব্য ও সাহিত্যের আদর, যে কাব্য সাহিত্যে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছে, — শুধু সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে নাই। কালিদাসের বিক্রমোর্বশী কেহ পাঠ করে তাঁহার শকুন্তলার ইস্কুল মাস্টারির কথা রবীন্দ্রবাবু নিজে যে ভাবে বলিয়াছেন অন্য কেহ তাহা বলিতে পারে না। গেটের সরোস্ অফ্ ওয়ার্থর কয়জন পড়েন? তাঁহার ফাউস্টের শিক্ষায় পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ হইয়াছেন — ফাউস্টের আদরের সীমা নাই। আমাদের সাহিত্যে এক্ষণে শিল্পনৈপুণ্যের অনুশীলন হইতেছে, রচনা ও কাব্যবিন্যাসের পারিপাট্য খুব দেখা গিয়াছে, — কিন্তু গভীর চিন্তা ও উচ্চপ্রকার ভাবুকতার অভাব হইয়াছে, ইহাতে আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি। শুধু তাহা নহে ভাষার পারিপাট্য ও শিল্পচাতুরীর দিকে অধিক ঝোঁক পড়াতে আমাদের সাহিত্যে কৃত্রিমতা আসিয়াছি, সাহিত্য আভিজাত্য গৌরবে গঠিত হইয়াছে, সাহিত্য লোকসাধারণের অন্তঃস্তল হইতে দূরে আসিয়াছে। এই সময়ে যদি এমন একটা যুক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া বলে, যে সাহিত্যে শুধু আনন্দের সৃষ্টি করিবে, আপনার রূপ মাধুরীতে আপনি মুগ্ধ থাকিবে, আপনার ঐশ্বর্য আপনি ভোগ করিবে পরকে ঐশ্বর্য বিলাইবার চিন্তা করিবে না, লোকসাধারণের সঙ্গে সাহিত্যের কোনো সম্বন্ধ নাই, সাহিত্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই, লোকসাধারণের বা আর কোনো উদ্দেশ্যে সে আর কিছু হইতে পারে না, — তাহা হইলে আমাদের সাহিত্য, সমাজ হইতে আরও দূরে আসিবে আরও 'অবাস্তব' হইবে সন্দেহ নাই। ইহা আমাদের সমাজ ও আমাদের সাহিত্যের পক্ষে দুর্ভাগ্যের কথা নিশ্চিত।

যতদিন না আমাদের সাহিত্য এই হেয় জঘন্য বাস্তবকে অবলম্বন করিয়া নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তু, — পরম সত্যকে পাইবার জন্য সাধনা না করিবে, রচনা ও ভাবব্যঞ্জনার পারিপাট্য, শিল্পনৈপুণ্য, আপনার ঐশ্বর্যের অহঙ্কার দূর না করিবে, ততদিন আমাদের সাহিত্যের স্ফূর্তি নাই সমাজের মঙ্গল নাই; আমরা সত্যের উপলব্ধি করিব না, সৌন্দর্যের বিকাশও দেখিব না। বাস্তবকে ছাড়িয়া দিলে আসল সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। নানা লোকের নানা ভাব, নানা লোকের নানা সুখ দুঃখ, নানা কালের নানা অভাব অভিযোগ লইয়া বাস্তব — অনন্তরূপী মহাবিষ্ণুর মতো বাস্তব। মহাবিষ্ণুর নাভিপ্রদেশ হইতে মৃণাল উঠিয়াছে, — নিখিল সৌন্দর্যের আধার মহাপদ্ম অনন্ত বাস্তবের অন্তঃস্তল হইতে উদগত। মহাপদ্মের উপর বসিয়া রহিয়াছেন স্রষ্টা — কবিং পুরাণমনুশাসিতারং; আর তাঁহারই অঙ্কশায়িনী মহাসরস্বতী, — জ্ঞান সৌন্দর্য স্বরূপিণী, নিখিল-সাহিত্য-জননী।

□ *বর্তমান বাংলা সাহিত্য*

ভবিষ্যতের বাঙালি

এস. ওয়াজেদ আলি

রাষ্ট্রের স্বভাব-ধর্ম হচ্ছে নিজের আত্মরক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা করা। আর সেইজন্য কোনো একটা রাষ্ট্র একবার বাস্তব-রূপ ধারণ করলে, তার পরিচালকদের প্রথম চেষ্টা হয় দেশের আত্মরক্ষামূলক (militarily defensible frontiers) ব্যবস্থা করা। আত্মরক্ষার ক্ষমতা যদি রাষ্ট্রের না থাকে, তা হলে সে প্রতিষ্ঠান এই স্বার্থপ্রধান জগতে স্থায়িত্ব লাভের আশা করতে পারে না। বর্তমান শতাব্দীর মহাযুদ্ধের ব্যাপারে এ সত্যের প্রমাণ আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করছি।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সহজেই বোধগম্য হয় যে, আকারে বড়ো হলেও, এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে প্রকৃতি দেবী একটি অখণ্ড দেশ করেই সৃষ্টি করেছেন। আত্মরক্ষামূলক সীমান্তের কথা তুললেই, আমাদের দৃষ্টি পড়ে খাইবার গিরিবর্ত্মের দিকে, হিমালয়ের অভ্রভেদী প্রাকারশ্রেণীর দিকে, আসামের দুর্গম পার্বত্য-ভূমির দিকে, আর দক্ষিণের অন্তহীন সমুদ্রের দিকে। এই সবই হল প্রকৃতি রচিত সেই আত্মরক্ষার কৌশল যাদের দরুন ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য অংশ থেকে স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। এদের সাহায্যেই ভবিষ্যতে ভারতবাসী বৈদেশিক শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার সহজ এবং কার্যকরী ব্যবস্থা করতে পারে। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রাজ্য এবং প্রদেশগুলির মধ্যে প্রকৃতিরচিত সেরূপ কোনো দুর্ভেদ্য ব্যবধান নাই। অবশ্য উত্তর-ভারত অথবা হিন্দুস্থান এবং দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ ত্রিকোণকে বিভক্ত করে বিন্ধ্যাচলের পর্বতমালা দাঁড়িয়ে আছে; এবং সেই জন্যই ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান অংশের মধ্যে যাওয়া-আসা কতকটা কষ্টসাধ্য। তবে প্রকৃতিরচিত এই প্রাকারশ্রেণীর মধ্যে অনেক ফাঁক এবং ফাটল রয়ে গেছে; তাই রামচন্দ্রের যুগ থেকে ইংরেজদের আমল পর্যন্ত বিন্ধ্যাচলের প্রাকার কোনো দিগ্‌বিজয়ীর পথরোধ করতে কিংবা তার অভিযান ব্যর্থ করতে সমর্থ হয় নি। অনেকে বলতে পারেন, খাইবার গিরিবর্ত্মও তো বৈদেশিক শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। আর্যদের সেই সুদূর যুগ থেকে আহমদ শাহ আবদালির যুগ পর্যন্ত এই খাইবার গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেই বৈদেশিক শত্রু ভারতবর্ষের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করেছে; সে কথা অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নাই। তবে এ কথা অন্তত আমরা সহজে বলতে পারি যে, ভারতবাসীর পক্ষে বৈদেশিক শত্রুকে খাইবারগিরিবর্ত্মের মুখে ঠেকিয়ে রাখা ভারতের অন্য কোনো স্থানে তার গতিরোধের চেয়ে অনেকখানি সহজসাধ্য কাজ। তারপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের লোকদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ করলে সত্যই মনে হয়, প্রকৃতিদেবী যেন ভারত রক্ষার সমস্যার কথা ভেবেই দেশের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে সেইসব দুর্ধর্ষ যুদ্ধকুশল জাতিকে

স্থাপিত করেছেন — যাদের বাহুবল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এ দেশের রক্ষাকবচ হয়ে আছে। সব দিক থেকে বিচার করলে, মনে এ ধারণা অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আত্মরক্ষার প্রাকৃতিক কুশলতার দিক থেকে ভারতবর্ষ এক অখণ্ড দেশ। সুতরাং রাষ্ট্রের হিসাবে ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড মহারাষ্ট্ররূপেই দেখতে এবং ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে এ কথাও ভুললে চলবে না যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের যুদ্ধকুশল জাতিগুলিকে যদি দেশের প্রহরীরূপে গ্রহণ না করা হয়, তাহলে বাহুবলের প্রভাবে তারা শেষে দেশের মালিকের স্থান অধিকার করবে।

তবে মানুষ যন্ত্র নয়। তাই রাষ্ট্রজীবনের আলোচনায় কেবল দুর্ভেদ্য সীমান্ত আর যুদ্ধকুশলতার কথা ভাবলেই চলবে না। এই যে সীমান্ত-প্রহরীর কথা ভাবতে হয়, এ থেকেই বোঝা যায় যে, লোভ, লালসা, দ্বেষ, হিংসা, রাগ, বিরাগ প্রভৃতি বিভিন্ন রিপুর তাড়নাতেই মানুষের জীবন পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া সামরিক বিশেষজ্ঞেরা যাই বলুন, রাষ্ট্রের সবচেয়ে মজবুত আত্মরক্ষার উপায় হল রাষ্ট্রবাসীদের অন্তরের স্নেহ, প্রীতি এবং ভালোবাসা। সাধারণ রাজনীতিকেরা এই মহাসত্যকে উপেক্ষা করেন বলেই রাষ্ট্রে অন্তর্বিপ্লব এসে দেখা দেয়, আর তার ফলে আত্মরক্ষার বিধি-ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, পরীক্ষার বেলায় রাষ্ট্র ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়।

সর্বদেশের সর্বমানব মিলে পরস্পরের প্রেম আর ভালোবাসার ভিত্তিতে যদি এই পৃথিবীতে এক অখণ্ড রাষ্ট্র স্থাপন করতে পারে, তা হলে সেই হত আমাদের আদর্শ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। সে রাষ্ট্রে দ্বেষ-হিংসা, দ্বন্দ্ব-কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি অপ্রীতিকর জিনিস কিছুতেই থাকত না। পরস্পরের মঙ্গলসাধনের জন্য, পরস্পরকে সাহায্যদানের জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব থাকত; মানুষের সেবা করতে পারলে, মানুষ নিজেকে ধন্য মনে করত; বিশ্বময় বিরাজ করত সুখ আর শান্তি, প্রেম আর প্রীতি, সেবা আর কৃতজ্ঞতা। এই পৃথিবীই তাহলে স্বর্গ হয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি! হবার কোনো সম্ভাবনাও আপাতত দেখা যাচ্ছে না। এর কারণ কী?

মানুষ অন্ধকার থেকে আলোয় আসবার চেষ্টা করছে বটে; কিন্তু এখনও সে অন্ধকারেই আছে। সংকীর্ণতার বাঁধ অতিক্রম করবার চেষ্টা সে করছে বটে, কিন্তু এখনও সংকীর্ণতা তার অন্তরকে দৃঢ়ভাবে ঘিরে আছে। পরের ছেলেকে সে ভালোবাসার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু নিজের ছেলেকেই সে বেশি ভালোবাসে; বিদেশির সঙ্গে, বিজাতীয়দের সঙ্গে সে সহানুভূতি দেখায় বটে, কিন্তু স্বদেশীয়দের প্রতি এবং স্বজাতীয়দের প্রতিই তার অন্তরের টান বেশি; সর্বধর্মের এবং সর্বকৃষ্টির প্রতি সে উদারতা দেখাবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু নিজের কৃষ্টি এবং ধর্মকেই সে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসে। মানুষের মনের এই স্বাভাবিক সংকীর্ণতা থেকেই বিভিন্ন দলের, সম্প্রদায়ের এবং গণ্ডির সৃষ্টি হয়। আর তাই থেকে আসে যত দ্বন্দ্ব আর কলহ, যুদ্ধ আর বিগ্রহ, বিরোধ আর অশান্তি!

রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে আত্মীয়তা। একই গোত্রের লোককে নিয়ে সুদূর কোন অতীত যুগে মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবন আরম্ভ হয়েছিল। গোত্রপ্রীতির প্রভাব এখনও প্রত্যেক রাষ্ট্রে গভীরভাবে অনুভূত হয়। তবে গোত্রীয় ঐক্য এখন আর রাষ্ট্রীয় জীবনে অপরিহার্য নয়। গ্রেট ব্রিটেন,

ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি উন্নতশীল রাষ্ট্রে কোনোরূপ গোত্রীয় ঐক্য নাই। বর্তমান যুগে ধর্মগত ঐক্যেরও প্রয়োজন দেখা যায় না। আধুনিক অধিকাংশ রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোক বাস করেন। গোত্রীয় এবং ধর্মৈক্যের স্থানে এখন অন্যবিধ ঐক্য এসে দেখা দিয়েছে। যথা ১. কৃষ্টিগত ঐক্য; ২. ভাষামূলক ঐক্য; ৩. স্বার্থসম্বন্ধীয় ঐক্য; ৪. আদর্শমূলক ঐক্য। প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক ধর্মের এবং গোত্রমূলক আত্মীয়তার স্থান এখন এই শেষোক্ত বন্ধনগুলিই দখল করেছে। এই বন্ধনগুলির সঙ্গে ভৌগোলিক ঐক্যের বন্ধন জুড়ে দিলেই একটা আধুনিক জাতির সৃষ্টি হয়। ভারতের জাতীয়তার সৌধকেও এই শ্রেণীর ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অবশ্য রাষ্ট্রগঠনের বেলায় সীমান্ত-রক্ষা-ব্যবস্থার কথাও মনে রাখা চাই।

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে অনেক সময়ে ব্যর্থ হয়, প্রাচীন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান যে অনেক সময় অন্তর্বিপ্লববশত আপনা থেকেই ভেঙ্গে পড়ে, তার কারণ কী? একটু অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাই, ঐক্যের যে সূত্রগুলি আমরা উল্লেখ করেছি, তাদের সবগুলির কিংবা কতকগুলির অভাব হয়েছিল বলেই সেরূপ ঘটেছে;ঐক্যের স্থানে তাই অনৈক্য এসে দেখা দিয়েছে, মৈত্রীর স্থানে দ্বন্দ্ব এসে দেখা দিয়েছে, সহযোগের স্থানে অসহযোগ এসে দেখা দিয়েছে আর তারই ফলে রাষ্ট্র-সৌধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

প্রথম মহাসমরের পূর্বেকার অস্ট্রিয়ান-সাম্রাজ্য পৃথিবীর অন্যতম প্রবল প্রতাপশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানরূপেই গণ্য হত। অথচ পরীক্ষার বেলা সে সাম্রাজ্য টিকল না; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে গেল। তুরস্ক-সাম্রাজ্যেরও সেই দশা ঘটল। সেই একই পরীক্ষায় জার্মান রাষ্ট্র কিন্তু টিকে রইল। অস্ট্রিয়ান এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যদ্বয়ের অভ্যন্তরীণ জীবনে সেই কৃষ্টিগত, ভাষাগত, স্বার্থগত এবং আদর্শগত ঐক্য ছিল না, যা সংকটের সময়ে তাদের বাঁচাতে পারত! জার্মান সাম্রাজ্যে সে ঐক্য প্রভূত পরিমাণেই ছিল। জার্মানি তাই টিকে থাকল।

আমাদের দেশের ইতিহাস খুললে দেখতে পাই, অখণ্ড ভারতীয় সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব কেন্দ্রীয় শক্তির বাহুবলের প্রাচুর্যের উপরেই নির্ভর করেছে, জাতির অন্তরের ঐক্যের উপরে নির্ভর করে নি। কেন্দ্রীয় শক্তিতে যখনই বাহুবলের অভাব ঘটেছে, অখণ্ড অন্তরের ঐক্যের অভাবে দেশ তখনই বিভিন্ন খণ্ড-রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। যে অন্তরের ঐক্যের উপরে একটি রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করে, সে ঐক্য অখণ্ড ভারতবর্ষে কখনও দেখা দেয় নি। আর তাই কেন্দ্রীয় শক্তি যখনই দুর্বল হয়েছে, স্বাভাবিক ঐক্যের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন খণ্ড রাষ্ট্রগুলি তখনই মাথা তুলেছে।

ভারতবর্ষে স্থায়ী রাষ্ট্রসংগঠন করতে হলে দুটি জিনিসের দিকে লক্ষ রাখা, আর রাষ্ট্রজীবনে তাদের উভয়বিধ প্রয়োজন পরিপূরণের সুব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। চতুঃসীমানার প্রাকৃতিক সীমান্তের দিকে লক্ষ্য রেখে সমস্ত ভারতবর্ষে এক সম্মিলিত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান গঠন করার দরকার; এবং অন্তরের স্বাভাবিক সহানুভূতির দিকে লক্ষ রেখে কৃষ্টিগত (কালচার), ভাষাগত মিল ও ঐক্যের ভিত্তির উপর দেশে বিভিন্ন খণ্ড রাষ্ট্রের বা উপরাষ্ট্রের সৃষ্টি করার দরকার। এইভাবে অগ্রসর হলে, ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে আমরা সাম্রাজ্যের শক্তি, আর জাতীয় জীবনে সুখ-শান্তি, নৈতিক বল এবং আত্মিক প্রেরণা —

উভয়বিধ সুবিধাই লাভ করতে পারব। একের মধ্যে বহুত্ব, আর বহুর মধ্যে একত্ব — এই উভয়বিধ মঙ্গলের সমাবেশে আমাদের জাতীয় জীবন অভিনব ঐশ্বর্য লাভ করবে।

দেশপ্রেম আমাদের যতই উগ্র হোক না কেন, বাস্তবতাকে ভুলে রাষ্ট্র গড়তে গেলে আমরা মারাত্মক ভুল করব। কেননা, একমাত্র বাস্তবতাই হল আদর্শ-সৌধের প্রকৃত ভিত্তি। সেই বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সহজেই আমরা বুঝতে পারব, সমস্ত ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস শেষ পর্যন্ত অসন্তোষ এবং ব্যর্থতাই এনে দেবে। কেননা, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে ভাষার ঐক্য নাই, কৃষ্টির ঐক্য নাই, স্বার্থের ঐক্য নাই, ধর্ম এবং গোষ্ঠীর ঐক্যও নাই। এরূপ ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে একটা বাহ্য একতানয়নের প্রয়াসে সমাজের অন্তর্নিহিত অনৈক্য আরও স্পষ্টতর হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক; আর হচ্ছেও তাই। দৈনন্দিন রাজনীতিক প্রয়োজন ও সাময়িক স্বার্থের তাগিদে জোর করে ঐক্যের অনুভূতি আনা যায় না। তার জন্য দরকার অন্তরের ভালোবাসা, অন্তরের সহানুভূতি, অন্তরের আকর্ষণ — আর দরকার স্বার্থ এবং আদর্শের ঐক্যানুভূতি।

তবে নিরাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। অতীত ইতিহাসের আলোচনা করলে দেখতে পাব — দুর্দিনে ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে এবং সাধারণত এমন কতকগুলি খণ্ড রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছিল, যাদের প্রত্যেকের মধ্যে জাতীয় (national) জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি প্রত্যক্ষভাবে অথবা সুপ্তাবস্থায় বিরাজ করেছে। 'মোটামুটিভাবে' এবং 'সাধারণত' বলার তাৎপর্য এই যে, রাষ্ট্রের ইতিহাসে কোনো জিনিসই ঠিক যৌক্তিকতার নিক্তির উপর নির্ভর করে বণ্টিত বা নিরূপিত হয় না। তবে বিভিন্ন প্রভাবের, বিভিন্ন গতির একটা মোটামুটি ফল জাতির জীবনের খাতায় তার অঙ্ক কষে যায়।

ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টিকেন্দ্র থেকে বিচার করলে, ভারতবর্ষে স্বাভাবিক কয়েকটি ভৌগোলিক বিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। যথা — বঙ্গদেশ, হিন্দুস্থান, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্থান, সিন্ধুদেশ, মহারাষ্ট্রদেশ ইত্যাদি। এইসব ভূখণ্ডের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব কৃষ্টি, নিজস্ব ইতিহাস, নিজস্ব নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা আছে। এই ভূখণ্ডগুলির নিজ নিজ বিশেষত্বের দিকে লক্ষ করলে, এদের প্রদেশ না বলে এক একটি রাষ্ট্র বা উপরাষ্ট্র বললেই সঙ্গত হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রতন্ত্রে এই বিভিন্ন উপরাষ্ট্রগুলির বিশেষত্বের দিকে লক্ষ রেখে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণশীল এক একটি রাজ্যের (Dominion) অধিকার দেওয়া দরকার — অবশ্য তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহের সম্পর্কে। আর ভারতরক্ষার জন্য এবং বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি চালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের সৃষ্টি করা দরকার। এই পথে গেলেই আমরা ভারতবর্ষে স্থায়ী এবং বর্তমান জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের উপযোগী রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রবর্তন করতে পারব। ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনের গতিপ্রকৃতি ও ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ আমাদের সেই নির্দেশই দিয়ে থাকে।

প্রাকৃতিক কারণে ভারতবর্ষ যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেছে, তার মধ্যে আমাদের বাংলা দেশ অন্যতম। বাংলা দেশের কী কী বিশেষত্ব আছে, যে জন্য ভারতের অন্যান্য দেশ থেকে সে স্বতন্ত্র এক আকার ধারণ করেছে, এখন তারই আলোচনা করা যাক।

প্রথমে যে বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে — সেটি হচ্ছে ভাষাগত ঐক্য। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলে একই ভাষা ব্যবহার করে; আর সেটি হচ্ছে বাংলা ভাষা। দ্বিতীয়ত, এদেশের বিভিন্ন ধর্মের লোকের মধ্যে মোটামুটিভাবে এমন একটা কুলগত ঐক্য আছে, যে জন্য কে কোন ধর্মের লোক, সহজে তা চেনা যায় না, পক্ষান্তরে যে কোনো বাঙালিকে যে কোনো অবাঙালি থেকে সহজেই পৃথক করে লওয়া যায়। এখানে দ্রাবিড়, আর্য, মোঙ্গল, সেমিটিক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির শত শত বৎসরের সংমিশ্রণের ফলে অভিনব অথচ সুনির্দিষ্ট একজাতির উদ্ভব হয়েছে, যাকে আধুনিক বাঙালি জাতি বলা যেতে পারে। আর সেই বাঙালি জাতির এমন কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে যে জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক থেকে সহজেই তাদের পৃথক করে নেওয়া যেতে পারে। যথা — বাঙালি শান্তিপ্রিয়; যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি সে ভালোবাসে না। বাঙালি বুদ্ধিমান, ভাবপ্রবণ — সংগীত, সাহিত্য কলাবিদ্যা প্রভৃতিকে অন্তরের সঙ্গে সে ভালোবাসে; ধর্মের বিষয়ে সে উদার মত পোষণ করে; গোঁড়ামি সে মোটেই পছন্দ করে না। বিদেশের আমদানি করা কৃত্রিম উত্তেজনা কখনও কখনও বাঙালির মনে ধর্মের গোঁড়ামির সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু সে মনোভাব বেশি দিন স্থায়ী হয় না। কেননা, ধর্ম বিষয়ে সংকীর্ণতা বাঙালির প্রকৃতিবিরুদ্ধ। নূতনের প্রতি একটা স্বাভাবিক ভালোবাসা বাঙালি তার অন্তরে পোষণ করে। নূতন ভাব, নূতন প্রথা, নূতন আদর্শকে নূতন বলেই সে বর্জন করে না, পক্ষান্তরে যাচাই করে নূতনের মূল্য নিরূপণ করতে চায়। কায়িক পরিশ্রমের চেয়ে ভাবের চর্চাই বাঙালির বেশি প্রিয়। সুযোগ এবং সুবিধা পেলেই সে কাজকর্ম ছেড়ে ভাবের চর্চায় বিভোর হয়ে যায়। নাগরিক জীবনের চেয়ে বাঙালি পল্লিজীবন ও স্বভাব-সৌন্দর্যকে বেশি পছন্দ করে। বাংলার ইতিহাস ধর্মের উৎকট দ্বন্দ্বে কলঙ্কিত নয়। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সহজে এবং স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি বাস করে আর গত হাজার বৎসরের ইতিহাস তাদের মধ্যে এক নিবিড় আত্মীয়তা এবং ঐক্য স্থাপন করেছে। তাদের এক জাতি বলতে এখন আর দ্বিধা বোধ হয় না। বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং সমস্যা এক। আর বাঙালির অর্থনৈতিক স্বার্থ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের অর্থনৈতিক স্বার্থ থেকেও ভিন্ন। প্রকৃতিদেবীই স্বার্থের এই বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন। হিন্দু এবং মুসলমান — এই দুই প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি এদেশে প্রায় সমান-সমান। তাই এক সম্প্রদায়ের উপর অন্য সম্প্রদায়ের প্রভুত্বের সমস্যা প্রকৃতপক্ষে এদেশে ওঠে না। তারপর ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে দীর্ঘ এবং ঘনিষ্ঠ সংস্রবের ফলে বাংলা দেশে এমন এক কৃষ্টি এসে দেখা দিয়েছে, যার দৃষ্টি স্বভাবতই ভবিষ্যতের দিকে এবং বিশ্বমানবতার দিকে। পশ্চাদ্‌মুখী সাম্প্রদায়িক কৃষ্টি সব ক্ষেত্রেই পিছে হটে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক ভাব (Democratic spirit) ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা দেশে অনেক বেশি গভীর এবং ব্যাপক। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালিই গণতান্ত্রিকতা এবং জাতীয়তাবাদের প্রধান এবং বিশ্বস্ত সমর্থক।

আমাদের মনে হয়, প্রকৃতিদেবী — নিত্য নূতনের সৃষ্টিতেই যাঁর প্রধান আনন্দ — ভারতের এই পূর্ব ভূখণ্ডে নূতন এক জাতির, নূতন এক সভ্যতার, নূতন এক জীবনধারার, নূতন এক কৃষ্টির, নূতন এক আদর্শের সৃষ্টিপ্রয়াসে নিরত আছেন। অতীতের বিভিন্ন

উপকরণের অভিনব সংযোগে বাঙালির জীবন নিয়ে তিনি এক নূতন শিল্প-নিদর্শনের সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। যাদের সাহায্যে তিনি এই নূতন রূপ রচনায় রত আছেন, সে জাতি এখনও তার ভবিষ্যৎ গৌরবের বিষয়ে অবহিত হয়নি বটে, তবুও মানুষ যেমন ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের আভাস তার অবচেতনায় পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, অথচ সে উল্লাসের কারণ স্পষ্ট বুঝতে পারে না — এই বাঙালি জাতিও তেমনি ভবিষ্যৎ গৌরবের অস্পষ্ট ইঙ্গিত তার অবচেতনায় পেয়ে এক অব্যক্ত আনন্দানুভূতি অনুভব করছে, নূতন কিছুর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছে, অভিনব কিছুর সন্ধানে দিশেহারা হয়ে ফিরছে; অথচ কেন যে এমন হচ্ছে, তা ঠিক তারা বুঝতে পারছে না। আর তাই মামুলি ধরনের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি নিয়ে বাঙালি সন্তুষ্ট হতে পারছে না; মামুলি ধরনের রাজনীতিক এবং সমাজনীতিকেরা তার অন্তর যেন স্পর্শ করতে পারছে না। স্পষ্টভাবে উপলব্ধি না করেও, বাঙালি ভবিষ্যতের পূর্ণতর রাজনীতির জন্য প্রতীক্ষা করছে — একটা সম্পূর্ণ কৃষ্টির জন্য, একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শের ও পূর্ণতম বিকাশের জন্য যেন বাঙালি এখনও প্রতীক্ষা করছে। রাষ্ট্রজীবনের যে পরিকল্পনা, সমবায়িক জীবনের যে ছবি বাংলা দেশের বাইরের ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করে, এই ভাবপ্রবণ কল্পনাকুশল জাতি সে আদর্শ, সে ছবি, সে পরিকল্পনা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না। তার কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন নিগূঢ় অবচেতনায় মহামানবতার মহত্তর এক আদর্শ, পূর্ণতর এক পরিকল্পনা, সুন্দরতর এক ছবি আঁকার এবং রূপ পরিগ্রহ করতে আরম্ভ করেছে। অদূর ভবিষ্যতে সেই মহনীয় আদর্শ, সেই পরিপূর্ণ পরিকল্পনা, সেই অপরূপ ছবি তার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠবেই, আর তার প্রভাবে বাঙালি এক অভিনব জীবনের আস্বাদ পাবে; এবং সেই শুভ দিন যখন আসবে, তখন বাঙালি কেবল ভারতবর্ষের নয়, কেবল প্রাচ্য-ভূখণ্ডের নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর পথ প্রদর্শক হবে — সত্য, সুন্দর, শুভ জীবন-পথের। বাঙালি এখন সেই মহামানবের প্রতীক্ষায় আছে, যিনি তাকে এই গৌরবময় জীবনের সন্ধান দেবেন — ভগীরথের মতো এই বাংলায় ভাবগঙ্গার সঙ্গম সুস্পষ্ট করে তুলবেন।

আরবের কবি বলেছেন, 'কবিরা হচ্ছেন অদৃশ্য মহাশক্তির ভাষ্যকার।' অতি সত্য — অতি মূল্যবান কথা। বাংলার গৌরবময় ভবিষ্যৎ — মন্ত্রীরা কিংবা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা, কিংবা রাজনীতিকেরা গঠন করবেন না; সে কাজ করবেন — দেশের সত্যকার কবি, মনীষী ও সাহিত্যিকেরা। যে অদৃশ্য মহাশক্তি মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছেন, তিনি ব্যাবসাদারি রাজনীতিকের স্থূল অনুভূতিতে বা তাঁর সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ মনের ক্ষেত্রে নিজেকে প্রকাশ করেন না; তিনি আত্মপ্রকাশ করেন ভাবুকের উদার মনে, তার বেদনা-করুণা প্রাণে, তার সুদূর প্রসারিণী প্রজ্ঞার জগতে। বাংলার কবিদের, বাংলার সাহিত্যিকদের বর্তমানের সীমাবদ্ধ স্বার্থ-ঝটিকার ঘাত প্রতিঘাতে বিক্ষুব্ধ, সাম্প্রদায়িকতার হিংসা-বিদ্বেষ, হীনতা এবং সংকীর্ণতার বিষবাষ্পে ভারাক্রান্ত বর্তমানকে ছেড়ে, কল্পনার বিমানে চড়ে ভবিষ্যতের মনোরম উদ্যানে চলে যেতে হবে — জাতির গৌরবোজ্জ্বল অনাগত জীবন দেখবার জন্য; আর প্রতিভার তুলিকায় তার ছবি বর্তমানের নৈরাশ্যক্লিষ্ট বাঙালির জন্য আঁকবার উদ্দেশ্যে; এবং আশায় উদ্দীপ্ত সাহিত্যের, সংগীতের ও শিল্পের সাহায্যে সেই গৌরবময় অনাগত যুগে অভিযানের জন্য তাকে অনুপ্রাণিত করতে। আমাদের কবিদের, আমাদের সাহিত্যিকদের, আমাদের

শিল্পীদের, আমাদের ভাববাদীদের, আমাদের আদর্শবাদীদের সত্যই এখন ভবিষ্যৎবাদী (Futurist) হতে হবে; কিম্ভূত-কিমাকার কোনো পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবার জন্য নয়, জাতিকে অমরাবতীর দ্বারে পৌঁছে দেবার জন্য, সেই অমরাবতীর কথা তাদের শোনাবার জন্য, আর সেই অমরাবতীর স্বপ্ন তাদের মনে জাগিয়ে তোলবার জন্য!

আমি এক শতাব্দী পরবর্তী যে বঙ্গদেশের স্বপ্ন দেখি, তা বর্তমানের ধূলি-ধূসরিত, বন-জঙ্গল-আগাছা-সমাকীর্ণ, শ্রীহীন, সৌন্দর্যভ্রষ্ট ঘর-বাড়িতে ভরা, হৃতগৌরব নদনদীর খাতের দাগে কলঙ্কিত বঙ্গদেশ নয়। আমি শতাব্দী পরের যে বাঙালি জাতির স্বপ্ন দেখি — সে বর্তমানের ক্ষীণকায়, মাংসপেশিহীন, রোগ-বিশীর্ণ, অনশন-ক্লিষ্ট, গতশ্রী, আনন্দহীন, প্রেরণাহীন, কলহপ্রিয় বাঙালি জাতি নয়। আমি যে বঙ্গনারীর ছবি দেখি, বর্তমানের ভারাতুর, লজ্জা-কাতর, স্বাস্থ্যহীন, শ্রীহীন, সৌষ্ঠবহীন, খর্বাকৃতি শীর্ণকায় বাঙালি নারী নয়! আমি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন দেখি, তাতে কেরানি-সৃষ্টির আগ্রহ নাই; গোঁড়া হিন্দু, গোঁড়া মুসলমান-সৃজনের উৎকট প্রয়াসও নাই; অতীতের প্রাণহীন দেহগুলি সাজিয়ে রাখবার জাদুঘর সে প্রতিষ্ঠান নয়! আমি ভবিষ্যতের যে রাজনীতির স্বপ্ন দেখি, তাতে চাকুরির ভাগ বাঁটোয়ারার কলহ নাই; স্বার্থ-সর্বস্ব, কুচক্রী, ভণ্ড তপস্বীদের অভিনন্দনেরও ব্যবস্থা নাই। আমি ভবিষ্যতের যে সাহিত্যের কল্পনা করি, সে সাহিত্য শুধু অতীতকে নিয়ে কুহক রচনা নয়, নিজেদের তুচ্ছতাকে ঢাকবার জন্য কাল্পনিক অতীতের অশোভন অতিরঞ্জন নয়! আমি যে নাগরিকের কল্পনা করি; তার জীবন সংকীর্ণ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নয়, তুচ্ছতার যূপকাষ্ঠে বৃহত্তর স্বার্থের অমর স্বত্বাধিকারীকে বলিদানের জন্য নয়। আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর সাধনার, সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর কামনার সুখস্বপ্ন দেখি। আমার সে স্বপ্ন কী, এখন তাই বলি।

আমি যে ভবিষ্যৎ বঙ্গদেশের কল্পনা করি, তাতে বর্তমানের মজানদীর এবং শুষ্ক খালের খাতে প্রচুর জলপ্রবাহের অশ্রান্ত কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে! তাদের বক্ষের ক্ষীরধারায় সমস্ত দেশ ফুলে-ফলে-শস্যে অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে। আমি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করি, তাতে বাংলার প্রত্যেক পল্লিতে এবং প্রত্যেক জনপদে তার নিজস্ব নদী অথবা খাল আছে, যাদের সাহায্যে উদ্বৃত্ত বর্ষার জল অবাধে সাগর-পথে প্রবাহিত হচ্ছে, বর্তমানের মতো সে জল ম্যালেরিয়ার মশার সূতিকাগারের সৃষ্টি করছে না। আমি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করি, তাতে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ি গৃহশিল্পের আলপনার সুন্দর এক একটি নিদর্শন হয়ে বিরাজ করছে। বর্তমানের মতো গৃহ-সৌন্দর্য-পিপাসুর মনে নিত্য সে নূতন যন্ত্রণার কারণ হচ্ছে না! আমি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করি, তাতে প্রত্যেক গ্রামের নিজস্ব বাগান, নিজস্ব খেলার মাঠ, নিজস্ব পাঠাগার, নিজস্ব ক্লাব ইন্সটিটিউট আছে। আর গ্রামবাসীরা সেই সব প্রতিষ্ঠানে পরস্পর সহযোগিতায় নিত্য নূতন আনন্দের সন্ধান পাচ্ছে। আমি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করি, তাতে প্রশস্ত সুগঠিত রাজপথ দেশের প্রত্যেকটি গ্রামের সঙ্গে প্রত্যেকটি গ্রামকে, প্রত্যেকটি নগরের সঙ্গে প্রত্যেকটি নগরকে সুলগ্ন রেখেছে! আমি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করি, তাতে বাংলার গৃহপালিত পশুপক্ষীর শ্রী এবং সৌন্দর্য বাংলার গৌরবের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে! আমি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করি, তার মাংসপেশিবহুল, সুঠাম, বলিষ্ঠ দেহ বাঙালি বৈদেশিকের বিস্ময়

উৎপাদন করছে। আমি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করি, তাতে বাঙালি নারীর স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য বিশ্ববাসীর প্রশংসার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে! আমি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করি, তার বিদ্যা-নিকেতনগুলির স্থাপত্য-সৌন্দর্য, তাদের উদ্যানের শোভা, তাদের বেষ্টনীর মনোহারিত্ব মানুষের মনকে সৌন্দর্যের অপরূপ জগতের সন্ধান দিচ্ছে! আর সেই সব প্রতিষ্ঠানের আচার্য এবং ছাত্রদের পরস্পরের স্নেহ এবং প্রীতি নাগরিকদের আদর্শ হয়ে উঠেছে; তাদের সত্য-শ্রেয়-সুন্দরের সাধনা বিশ্বের অনুকরণীয় গৌরবের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছি, তাতে হিন্দু তার ধর্মের অন্তর্নিহিত সনাতন সত্যের সন্ধান পেয়েছে, মুসলমান তার ধর্মের অন্তর্নিহিত শাশ্বত-সত্যের সন্ধান পেয়েছে; আর উভয়েই মর্মে মর্মে বুঝেছে যে, যেখানে সত্য সেখানে দ্বন্দ্ব নাই; যেখানে সুন্দর সেখানে দ্বেষ-হিংসা নাই; যেখানে শ্রেয় সেখানে সংকীর্ণতা নাই, কার্পণ্য নাই; আলোকের পথে অন্তহীন একাগ্র অভিযানই সকলের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, তাতে জ্ঞানসমৃদ্ধ, ভাবসম্পদে গরীয়ান বাঙালি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, দেশ-শাসনের ভার, নেতৃত্বের অধিকার উত্তম-বুদ্ধিবিশিষ্ট যোগ্যতমের উপর অতি সহজভাবেই ন্যস্ত করছে — নির্বাচনের অপ্রিয়তা ও স্বার্থান্ধতা সেখানে মুছে গেছে। আমি যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, তার সাহিত্য থেকে ফাঁকা আড়ম্বর আর ভাবের দৈন্য চিরতরে বিদায় গ্রহণ করেছে। সত্য-শ্রেয়-সুন্দরের নিত্য নূতন অনুভূতিতে সে সাহিত্য নিত্য নূতন পথ রচনা করছে। সে সাহিত্যের দৃষ্টি সম্ভাবনাহীন অতীতের দিকে নয়; দৃষ্টি তার সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে। সে সাহিত্য কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়, সে সাহিত্য মানুষের জন্য, বিশ্বমানবের জন্য, চিরন্তন মানবতার জন্য। সে সাহিত্য দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে অদৃশ্য জগতের, রূপের সঙ্গে অরূপের, দেহের সঙ্গে আত্মার নিত্য নূতন মিলন সংকেতে ভরপুর। আমি যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, তার নাগরিক হচ্ছে মানবতার আদর্শের অনিন্দ্যসুন্দর এক প্রতীক! বলিষ্ঠ দেহ, অটুট স্বাস্থ্য; জ্ঞানসমৃদ্ধ; ভাবে গরীয়ান, আর ত্যাগে মহীয়ান; প্রেমে ও দাক্ষিণ্যে সকলের আপন জন; সদা মঙ্গল-সাধনে রত; উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় বর্তমানকে রূপায়িত করবার জন্য সদাই ব্যস্ত এবং তৎপর। আমার মনে হয়, এই গৌরবময় ভবিষ্যতের চিন্তাই হল বাঙালির দেখবার মতো স্বপ্ন; এই গৌরবময় ভবিষ্যতের চিন্তাই হল বাঙালির মনের উপযুক্ত চিন্তা; আর এই গৌরবময় ভবিষ্যতের জন্য সাধনাই হল বাঙালির শক্তির উপযুক্ত সাধনা।

এ স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে, এ চিন্তাকে রূপায়িত করতে হলে, এ-সাধনাকে সার্থক করতে হলে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। যথা — ১. হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ২. বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য; আর ৩. শুভবুদ্ধি ও জ্ঞানের উদ্বোধন এবং সম্প্রসারণ।

আমার মনে হয়, এই শেষোক্ত প্রয়োজনটি পূরণের উপরেই অপর দুটির সাফল্য নির্ভর করছে। যাঁরা বাংলার এবং বাঙালির সত্যকার মঙ্গলকামী, তাঁদের চিন্তা এবং সাধনাকে এই জ্ঞানের উদ্বোধন এবং সম্প্রসারণের কাজেই নিয়োজিত করতে হবে।

আরব জাতির জাতীয়তাবাদ (Arab Nationalism) আজ বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এ জিনিসটি কারো কল্পনাতে ছিল না। আরব জাতি ধর্মে সাধারণত মুসলমান। অথচ আরব-জাতীয়তার গোড়াপত্তন করেছেন

আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত দুজন খ্রিস্টান মনীষী — নাজিফ এজিদি এবং বেতেরাস্ বোস্তানি। ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী দেশবাসীদের মধ্যে এই দুই মনস্বী জাতীয়তার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা প্রত্যেক দেশের দেশপ্রেমিকের অনুকরণীয়।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে আরবজাতি যখন নৃশংসভাবে খ্রিস্টান হত্যায় উন্মত্ত হয়ে উঠল, তখন সে হিংসানল-নির্বাপনের উদ্দেশ্যে বোস্তানি বাইরুটে এসে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন। খ্রিস্টানদের প্রতি আরবজাতির সম্প্রীতি-সাধন করতে গিয়ে বোস্তানি উপলব্ধি করলেন, মূঢ়তা ঘোচাতে না পারলে মানুষের গোঁড়ামি ঘুচবে না, এবং গোঁড়ামি না ঘুচালে মানুষের মন দ্বেষ-হিংসার কণ্টকে পবিপূর্ণ থাকবেই। আরবে তিনি শিক্ষা-প্রসারেব ব্যবস্থা করলেন। সে শিক্ষানিকেতন হল জাতীয় বিদ্যালয। আরব-প্রেমকে কেন্দ্র করে ধর্ম-বিদ্বেষ ত্যাগ করে এখানে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হল। এ বিদ্যালয়ে আরব শিক্ষকতার জন্য বোস্তানি পেলেন নাজিফ এজিদিকে। নিঃস্বার্থ-প্রেমিক বোস্তানির আদর্শে এজিদি শ্রদ্ধান্বিত হলেন এবং উভয়ের বিপুল সাধনায় আরবজাতি ক্ষুদ্রতা ভুলে, হিংসা-দ্বেষ ভুলে সর্ব ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শিখল — আববে আবার নূতন আরবের অভ্যুত্থান হল।

নবীন আরবি অথবা নব্য তুর্কির মতো প্রকৃতিব লীলা-নিকেতন এই সৌভাগ্যসম্পদশালিনী বাংলা দেশে, এই বাঙালির জীবনেই বা অখণ্ড এক আদর্শ জাতীয়তা সম্ভব হবে না কেন? এ সম্ভাব্যের প্রচুর উপকরণ বাঙালির প্রকৃতিতে এবং বাংলার আকাশে বাতাসে, নদী-নালায়, পথ-প্রান্তরে ও শ্যামলিমায় বর্তমান। শুভবুদ্ধি নিয়ে বাঙালি শুধু নিঃস্বার্থ নয়ন মেলে দেখলেই হয়!

❑ *এস ওয়াজেদ আলি রচনাবলি*, ১৩৯২ (বাংলা একাডেমী, ঢাকা)

সংস্কৃতির স্বরূপ

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকাল 'সংস্কৃতি' কথাটির বহুল ও ব্যাপক প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। শিক্ষা ও কলাবিদ্যার সহিত সম্পর্কিত প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানকেই 'সাংস্কৃতিক' নামে অভিহিত কবা হয়। মনে হয় ইংরাজি culture-এর প্রতিশব্দরূপে সংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু culture-এর তুলনায় সংস্কৃতি আরও অনির্দেশ্য ও সমষ্টিদ্যোতক গুণাবলির ইঙ্গিত করে। Culture শব্দটির অর্থ প্রধানত শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যসমাজের সহিত মেশার ফলে প্রসূত মার্জিত রুচি ও অনিন্দনীয় আচরণ। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল অনুশীলনের ফলে অর্জিত মানস-সম্পদ। 'সংস্কৃতি' শব্দে ইহা ছাড়া আরও অনেক বেশি কিছু বুঝায়। বোধ হয় সংস্কৃতি অপেক্ষা অধুনা অপ্রচলিত 'কৃষ্টি' শব্দই culture-এর অধিকতর সমার্থবাচক। 'কৃষ্টি' অর্থে কর্ষণ বা অনুশীলনের দ্বারা লব্ধ চিৎ-প্রকর্ষ। দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষ্টি শব্দটি বাংলা সাহিত্য বেশ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই — ইহার প্রয়োগ এখন বিরল হইতে বিরলতর হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই চিৎ-প্রকর্ষ-সম্বন্ধীয় সমস্ত কিছু উপাদান ও উপকরণ বুঝাইবার দায়িত্ব এখন 'সংস্কৃতি'-র উপর পড়িয়াছে। এই বহুধাবিভক্ত উৎকর্ষমণ্ডলের অর্থ — বিস্তৃতি বহন করিতে গিয়া সংস্কৃতি উহার মূল অর্থ ছাড়াইয়া শিথিল ও অস্পষ্ট প্রয়োগের অনির্দেশ্যতায় কতকটা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং অপপ্রয়োগে বিহ্বল এই অতি প্রয়োজনীয় শব্দটির মূল অর্থটি অনুসন্ধান ও পুনরুদ্ধার করার বাঞ্ছনীয়তা বিশেষ করিয়া অনুভূত হইতেছে।

'সংস্কৃতি' শব্দে একটা জাতির ভাবসাধনা ও জীবনচর্যার সমগ্রতা সূচিত হয়। ইহার মধ্যে ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজবোধ ও জীবনদর্শনের একত্রীভূত সারনির্যাস নিহিত আছে। ইহাতে জাতির মহত্তম ঐতিহ্য ও ক্ষুদ্রতম আত্মবিনোদন-প্রয়াস পাশাপাশি অবস্থিত। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় এই যে ইহাতে সচেতন অনুশীলন অপেক্ষা অর্ধচেতন অথচ অপরিবর্তনীয় রূপে স্থিরীকৃত মানসরুচি বা প্রবণতাই মুখ্যরূপে প্রতিভাত হয়। 'সংস্কারে'র সঙ্গে 'সংস্কৃতি'র কেবল রূপগত নয়, অর্থগত একটি গভীর সাম্য আছে। সংস্কার যেমন বুদ্ধি বা ইচ্ছার অতীত, জীবনের একটি নিগূঢ়, অস্থিমজ্জাগত, আত্মবিস্মৃত অভিপ্রায়ের স্পন্দন, সেইরূপ সংস্কৃতিও এই জৈবসংস্কারের একটি ভাবজীবনগত সূক্ষ্মতর প্রতিরূপ। যেমন জীবনধর্মের কয়েকটি স্থূল অথচ অপরিহার্য প্রয়োজন আমরা চিন্তা ব্যতিরেকে শুধু সংস্কারবশতই সম্পাদন করি, তেমনি একটি বিশেষ জাতির প্রতিনিধিরূপে আমরা একটি অখণ্ড মানস উত্তরাধিকার

অর্জন করিয়া মনের বিভিন্ন বিকাশের মধ্যে তাহার অজ্ঞাতসারে প্রয়োগ করিয়া থাকি। বংশধারা-সংক্রামিত দোষ-গুণের ন্যায়, রক্তকণাবাহিত শক্তি-দুর্বলতার ন্যায়, সমগ্র জাতির অতীত জীবন সাধনা হইতে প্রাপ্ত এই মানস বৈশিষ্ট্য আমাদের সচেতন চিত্তের ভিত্তি রচনা করে। অন্তরেব এই গোপন-স্তর-শায়ী প্রবণতা, ঐতিহ্য হইতে আগত মনোলোকের এই প্রচ্ছন্ন জীবনীশক্তিই সংস্কৃতির সত্য পরিচয়।

সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝিতে হইলে একটি প্রধান পার্থক্যের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। যাহা আমাদেব সচেতন মানস চর্চা, তাহা সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিলেও ও সংস্কৃতির দ্বারা পুষ্ট হইলেও সংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত নহে। যখন আমরা সচেতনভাবে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করি, বঘুবংশ কুমারসম্ভবের রস আস্বাদন করি বা শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ধর্মচর্চা করি, তখন এই সচেতন অনুশীলনকে সংস্কৃতি আখ্যায় অভিহিত করা হয় না। কিন্তু এই কাব্যচর্চা বা ধর্মচর্চার ফলে আমাদেব অজ্ঞাতসারে যে মানস প্রকৃতিটি গড়িয়া উঠে, যাহা অচেতন স্তরে নিমজ্জিত থাকিয়া আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞান — ধর্মসাধনার জগৎকে পাতালশায়ী কূর্মের ন্যায় ধরিয়া রাখে তাহাই সংস্কৃতি। বাস্তব জীবনের কোনো আকস্মিক আঘাতে, কোনো অপ্রত্যাশিত সঙ্কট মুহূর্তে, অবসর কালের আত্মবিনোদন বা সামাজিক উৎসবের স্মৃতিবাহিত প্রেরণায় এই সুপ্ত মানস প্রবণতা, হাজার বৎসর ধরিয়া অবচেতন মনের তলদেশে সঞ্চিত এই আত্মবিস্মৃত ভাব-সত্তা হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া সংস্কৃতির রূপে আত্মপ্রকাশ করে। নদীর জলপ্রবাহের ন্যায় আমাদের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কর্মধারা ও চিন্তাধারা যখন পূর্ব-পরিকল্পিত লক্ষ্যের মুখে ছুটিয়া চলে, তখন তাহা সংস্কৃতি নহে; কিন্তু এই বেগবান্ প্রবাহের নীচে নদীখাতেব যে গভীরতা সৃষ্ট হয়, তটভূমি যে রেখা-চিহ্নিত হয়, বালুকারাশির নীচে যে ফল্গুধাবা আত্মগোপন করিয়া সুশীতল নির্ঝররূপে উৎসাবিত হয়, সেখানেই আমরা মর্মমূল-জড়িত সংস্কৃতির গোপন পদচিহ্ন লক্ষ করিতে পারি।

২

জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ ধর্ম, সমাজবোধ ও সাহিত্যরূপী যে ত্রিধারার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, উহারাই সংস্কৃতির মূলে রসসিঞ্চনের প্রধান হেতু। কিন্তু সংস্কৃতির প্রসার উক্ত ত্রিধারার পরিধি হইতে অনেক বেশি। সংস্কৃতির মধ্যে জাতির উৎসব, উহার সুকুমার শিল্পকলার লৌকিক প্রকরণ, উহার মনোরঞ্জনের বিবিধ আয়োজন, ও লৌকিক স্তরের নৃত্য-গীত প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। জাতির মন কোনো বিশেষ-উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত না হইয়া যে উদ্বৃত্ত আনন্দ-রসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের বিচিত্র পথ অনুসন্ধান করে, তাহার মধ্যেই তাহার সংস্কৃতির পরিচয় নিহিত। উৎসবের পূজামণ্ডপে ও শাস্ত্রবিধিঅনুসরণে ধর্মের অধিকার; কিন্তু প্রতিমার চালচিত্রে অঙ্কিত যে সমস্ত মূর্তি পটুয়ার বন্ধনহীন কল্পনা-লীলার স্বাক্ষর বহন করে, উৎসব-প্রাঙ্গণে যে নানারূপ ক্রীড়াকৌতুক ও লোকচিত্তের অসংস্কৃত আনন্দোচ্ছ্বাস প্রাকৃত জনসাধারণের ভিড় জমায়েত করে, সেখানে ধর্মের সিংহাসনে সংস্কৃতি ভাগ বসাইয়াছে। কালোয়াতি সঙ্গীতের আসরে যে সমস্ত রসজ্ঞ বোদ্ধা সুর-তালের রহস্যভেদ করিয়া উহার পূর্ণ মাধুর্য আস্বাদনের অধিকার লাভ করিয়াছে তাহাবা অনুশীলনের প্রত্যাশিত পুরস্কারই

অর্জন করে। কিন্তু এই অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর পিছনে কলাকৌশল-অনভিজ্ঞ আর একদল শ্রোতাও এই আনন্দের প্রসাদ পায়। তাহাদের মনের গভীরে এই সুরের অনুরণন প্রবেশ করিয়া উহাকে একটা মাধুর্যরসে আপ্লুত করে ও উহার মধ্যে একটা সঙ্গীতমুখী আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়া উহার রুচি-গঠনে সহায়তা করে। এখানে আমরা পাই শিক্ষার পরিবর্তে উহার পরোক্ষ ফল সংস্কৃতি। যাহারা যাত্রা-অভিনয়ের বিষয়ের পৌরাণিক মহিমা সচেতন ভাবে উপলব্ধি করে তাহারা বিদগ্ধ শ্রোতা। কিন্তু এই যাত্রার আসরের সুদূর কোণগুলিতে আসীন নিরক্ষর, পুরাণজ্ঞানহীন যে শ্রোতৃমণ্ডলী কতক বুঝিয়া কতক না বুঝিয়া এই অভিনয়ের দৃশ্যগুলি মুগ্ধ, আত্মভোলা মনে অনুসরণ করে ও এক অনির্দেশ্য ভাবরোমাঞ্চের শিহরণে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে, তাহারা এক গোপন-চেতনাবাহী সংস্কৃতির অনতিক্রম্য প্রভাবের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বাউলের গান, রামপ্রসাদি সঙ্গীতের অধ্যাত্মব্যঞ্জনা এই সংস্কৃতির গোপন খনিত সুড়ঙ্গ পথেই প্রাকৃতচিত্তে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সহস্র বৎসরের শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনা আমাদের চারিদিকে যে একটা অদৃশ্য অথচ অতিমাত্রায় সজীব ও সক্রিয় ভাব-পরিমণ্ডল রচনা করিয়াছে আমরা অজ্ঞাতসারে উহা হইতেই নিশ্বাস গ্রহণ করি ও এই নিশ্বাস-বায়ুর ভিতর দিয়াই অতীত ইতিহাসের সবটাই আমাদের অনুভূতিতে সূক্ষ্ম অশরীরীরূপে পুনরাবৃত্ত হয়। জীবন-উদ্যানে ফুল ফোটাইবার কাজে হয়তো আমাদের কোনো সক্রিয় অংশ ছিল না, কিন্তু এই ফুলের সম্মিলিত সৌরভ কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মধ্যে ধরা পড়ে। এই অতীতের তীর হইতে বায়ুপ্রবাহের দ্বারা সঞ্চারিত সৌরভই সংস্কৃতি।

৩

আজকাল কিন্তু সংস্কৃতি শব্দটি সচরাচর যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা ধর্ম বা উচ্চতর সাহিত্য ও কলাবিদ্যার সহিত প্রায় নিঃসম্পর্কিত। অধুনা সংস্কৃতি বলিতে আমরা বেদ-উপনিষদ-গীতার ধর্ম বা কালিদাস-ভবভূতির কাব্য বুঝাইতে চাহিনা — জাতীয় প্রতিভার এই উচ্চতম বিকাশগুলি এখন সংস্কৃতির সর্বব্যাপী পরিধি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন সংস্কৃতি অর্থে জাতীয় মানসের লঘুতর রুচি ও প্রবণতা সমষ্টির প্রতি লক্ষ করা হয়। সামাজিক রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহারের মধ্যে কোনো বিশেষ সৌকুমার্য বা সুরুচিবোধ, উৎসবের মধ্যে ধর্মের প্রত্যক্ষসম্পর্কবর্জিত কতগুলি কৌতূহলোদ্দীপক অনুষ্ঠান, নৃত্যগীতের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট কলাকৌশল বা ভাবদ্যোতনা, মাঙ্গল্যকর্মে সজ্জাবিধান ও আলিম্পন-রচনা, মানস আভিজাত্যের কোনো বিশেষ পরিচয় — এইগুলিকেই বিশেষভাবে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সংস্কৃতি ক্রমশ উচ্চকোটি হইতে নিম্নকোটিতে নামিয়া আসিতেছে। জাতির অতীত কীর্তিকলাপ অপেক্ষা মানস-রুচি ও আপাতদৃষ্টিতে অকারণ উল্লাস, প্রাণ-হিল্লোলের অদম্য উচ্ছ্বাসের উপরেই ইহার দ্বারা বেশি ঝোঁক দেওয়া হইতেছে। বিবাহ বা অন্যান্য শুভকর্মে কতগুলি মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠান আছে — এগুলির হয়তো এককালে ধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ বা কিছু সাঙ্কেতিক অর্থ ছিল। এখন এগুলি সংস্কৃতির ক্ষীণসূত্রে বিধৃত ও সুস্পষ্ট-

তাৎপর্যহীন হইয়া কেবলমাত্র মনের উৎসববাগ বা আনন্দকম্পনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। উৎসবে নারীদের নৃত্যগীত ভদ্র বাঙালির সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো স্থানে এই প্রথা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও প্রচলিত ছিল, এবং এগুলিতে অঙ্গভঙ্গির যে সুরুচিসম্মত মৃদুচ্ছন্দ, যে সুষমাময় পরিমিতি-বোধ ও আতিশয্যবর্জনের পরিচয় মিলে তাহাতে ধর্মের অনুশাসন কেমন করিয়া ধীরে ধীরে সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা বোঝা যায়। লোকগীতির বিভিন্ন প্রকারের কবিগান, বাউলগান, দেহতত্ত্বঘটিত গান, ফকিরের গান — প্রভৃতিতেও ধর্মের আদিম ভিত্তির উপর সংস্কৃতির নবীন উন্মেষের নিদর্শন লক্ষ করা যায়। এই সমস্ত লোকগীতিতে শাস্ত্রধর্মের প্রভাব পরোক্ষ, মানস-চেতনার গভীর স্তরনিহিত, ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক আদর্শের মহিমা দীর্ঘ অনুশীলন ও অভ্যাসের ফলে স্মৃতিনিমজ্জনের অন্তরাল হইতে উত্থিত হইয়া এক নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সঙ্গীতের সুর স্তব্ধ হইলেও যেমন উহার রেশ মনে বাজিতে থাকে, তেমনি ধর্মসাধনার স্মৃতির আভাস সংস্কৃতির নবরূপায়ণের মধ্যে নিজ অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়।

তাহা ছাড়া মেয়েদের ব্রত-পাঁচালি, কৃষিপ্রধান দেশের নবান্ন, পৌষপার্বণ প্রভৃতি উৎসব, নিম্নশ্রেণীর ভাদুগান প্রভৃতির মধ্যে এই ধর্ম-প্রভাবিত সংস্কৃতির নানা বিচিত্ররূপ দৃষ্টিগোচর হয়। অস্থিমজ্জাগত, অত্যাজ্য সংস্কাররূপে বর্তমান ধর্মচেতনার সহিত লৌকিক আনন্দ মিশিয়া এই সংস্কৃতিরূপ মানস আবরণীর সূত্র রচনা করিয়াছে। এগুলির মধ্যে লক্ষ করিবার বিষয় এই যে নিছক মনোরঞ্জিনী বৃত্তি ও ঐহিক আমোদপ্রিয়তা ধর্মের আকাশ-বাতাস-ব্যাপী অদৃশ্য প্রভাবে একরূপ ঊর্ধ্বায়ন প্রবণতা লাভ করিয়াছে। যাহা স্থূল ভোগের বিষয়, যাহা সুখলাভের উপলক্ষ, যাহা সামাজিক মিলনের উপায় তাহাই ধর্মের সূক্ষ্ম আস্তরণে আবৃত হইয়া কাষায়-বস্ত্র-পরিহিতা পূজারিণী কুলবধূর ন্যায় একটি শান্ত-মৌন শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা যে মূলত ধর্মবোধ হইতে উদ্ভূত তাহার প্রমাণ ইহাদের সমাজ-মনের উপর বদ্ধমূল, অনপনেয় প্রভাবে। ইহাদিগকে শুধু লৌকিক আনন্দপ্রকাশের উপায়রূপে গ্রহণ করিলে ইহারা সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে স্বীকৃতি লাভ করিত না। প্রয়োজনবোধে ও উৎসাহ মন্দীভূত হইলে ইহাদিগকে ত্যাগ করা সহজ হইত। কিন্তু ধর্মের মূল অনুভূতি যে গভীরে প্রসারিত সেই মূলের সহিত জড়িত হইয়া ইহারা ধর্মেরই শাশ্বত মূল্য ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ধর্মের বন্ধুর পর্বতগাত্রে শ্যামশষ্পের কোমল শোভারূপে ইহারা পর্বতের দুর্জয় শক্তি ও ধ্বংসহীন চিরস্থায়িত্বের অংশীদার হইয়াছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র নিম্নশ্রেণীর কাহারদের জীবনযাত্রা বর্ণনার মধ্য দিয়া তাহাদের সংস্কৃতি ও জীবনবোধের যে অনবদ্য ছবি আঁকা হইয়াছে তাহাতে ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতি শাসিত জীবনের সুগভীর রহস্যটি চমৎকারভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

কাহার-পাড়ার মাতব্বর বনোয়ারীর প্রতিটি কর্ম ও চিন্তা, তাহার কুসংস্কার ও ভূতের ভয়, তাহার দলপতির কর্তব্যনিষ্ঠার আদর্শ, এমন কি তাহার পাপাসক্তি ও পদস্খলন ও কাহারগোষ্ঠীর মদের আড্ডায় অসংযম ও মাতামাতি — এ সমস্তই এক সদাজাগ্রত দৈবশক্তির অতন্দ্র পলকহীন পর্যবেক্ষণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উপনিষদের সেই মহামন্ত্র — 'ঈশাবাস্যমিদং জগৎ' এই নিম্নশ্রেণীর মানুষদের মূঢ়, সঙ্কীর্ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিত্তে কিরূপ

দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে ভাবিলে হিন্দু সংস্কৃতিব প্রসারণশীলতা ও জীবনের মূলদেশ পর্যন্ত অনুপ্রবেশ-শক্তির পরিচয়ে আশ্চর্য হইতে হয়।

৪

সংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল সেই মানদণ্ডে আধুনিক যুগের তথাকথিত সংস্কৃতির বিচার করিলে উহা কতদূর সংস্কৃতিপদবাচ্য সে সম্বন্ধে কতকটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়। সংস্কৃতির পরিধি ধর্মবোধ বা জীবনদর্শন হইতে ক্ষুদ্রতম আমোদ আহ্লাদ ও কলানুশীলনের খুসি-খেয়াল পর্যন্ত প্রসারিত। অবশ্যপালনীয় ধর্মানুষ্ঠান, পটুয়ার ছবি ও মেয়েদের হাতে আঁকা আল্‌পনা সবই একই অনুভূতি-কেন্দ্র হইতে উদ্ভূত। এই বিচিত্র বিকাশের সাধারণ বৃন্ত ও আশ্রয়স্থল হইল একটি জাতির জীবন-নিরীক্ষা-প্রসূত একটি কেন্দ্রগত জীবনবোধ। যেখানে এই বিশিষ্ট জীবনবোধ নাই, সেখানে সমস্ত সামাজিক উৎসব ও বিভিন্ন প্রকারের কলানুশীলন কেবল সৌন্দর্যসৃষ্টি ও চিত্তবিনোদনের বিচ্ছিন্ন প্রয়াসমাত্র। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বতন্ত্র হইয়াও এক কেন্দ্রীয় প্রাণলীলার বিভিন্ন রূপ প্রকাশ-দ্যোতনা; কিন্তু মৃত বা পঙ্গু দেহের অংশগুলি এই সামগ্রিকতার উপাদানরূপে প্রতিভাত হয় না। বৃক্ষের স্থূলকাণ্ড হইতে তাহার প্রান্তলগ্ন ক্ষুদ্রতম পাতাটি পর্যন্ত একই মূলে বিধৃত, শাখা-প্রশাখাবাহী একই রসে পুষ্ট, এক প্রাণ-সত্তার কোথাও বা বজ্রদৃঢ়, কোথাও বা পুষ্পপেলব লীলাভিব্যক্তি। জীবন্ত সংস্কৃতিরও সেইরূপ অত্যাজ্য ধর্মবোধ হইতে সামান্য আচার ও নৃত্যগীতের উল্লাসছন্দ পর্যন্ত একই বৃহৎ জীবনোপলব্ধির তরঙ্গোৎক্ষেপ মাত্র। সংস্কৃতির এই কঠোর ও কোমল দিকের যদি সমন্বয় না হয়, ধর্মের মধ্যে আনন্দ ও আনন্দের মধ্যে ধর্মের চেতনা যদি না থাকে, তবে তাহা আদর্শভ্রষ্ট ও জীবনীশক্তিহীন। যে নারী কেবল নিজের অঙ্কননৈপুণ্য দেখাইবার জন্য আল্‌পনা দেয়, তাহার মধ্যে সংস্কৃতির প্রভাব নিষ্ক্রিয়; যে আল্‌পনা আঁকিবার সময় ইহা যে লক্ষ্মীর চরণচিহ্নের পীঠস্থান, ইহা যে শুভের আমন্ত্রণের অর্ঘ্য-বচনা, ইহা যে অন্তরের একান্ত বিশ্বাস ও আকুতির চিত্ররেখা এই ধারণা উদ্ভূত হয়, তাহারই ক্ষেত্রে ইহা সংস্কৃতির সার্থক রূপায়ণ। যে ধর্মপ্রাণা মহিলা গার্হস্থ্যধর্মের উচ্চতম আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করিয়াছে, যাহারা সতীত্ব রক্ষার জন্য হেলায় প্রাণ বিসর্জন দিত বা স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিতে দ্বিধা করিত না তাহাদেরই মেয়েলি ব্রত-অনুষ্ঠান বা উৎসবে স্ত্রী-আচার-পালনের আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে সমগ্র-সত্তা-নিহিত জীবনসাধনার একটি কমনীয় রূপ প্রকাশিত হয়। আমাদের কঠোর বিধিনিষেধ-পালন, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক বিচার, আমাদের জীবনাদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিবার একটি প্রবল আগ্রহ ও উদ্যমই আমাদের চিত্তবিনোদনের বিশিষ্ট রীতি ও উৎসবের বিচিত্র বিন্যাস পদ্ধতির পটভূমিকা রচনা করে। পূজার আসনে বসিয়া যাঁহার ধ্যান করি, মন্দিরের অভ্রভেদী মহিমায় যাঁহার বিরাটত্বের প্রতিচ্ছায়া দেখি, সুকুমার শিল্পকলার দ্বারা তাঁহারই চরণে সৌন্দর্যের অর্ঘ্য নিবেদন করি, আনন্দে ও ক্রীড়া-কৌতুকে তাঁহারই প্রসন্ন সাহচর্যের স্নিগ্ধ স্পর্শ দেহমনে পুলক রোমাঞ্চ জাগায়। এই সর্বাঙ্গীণ জীবনানুভূতিই সংস্কৃতির মূলকথা।

বর্তমান যুগে শিক্ষা-দীক্ষার ফলে যে নূতন ধরনের মানস আগ্রহ ও বিনোদন-স্পৃহা উদ্ভূত

হইয়াছে তাহা পূর্ববর্ণিত সংস্কৃতির আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহা জীবনের মূলের সহিত নিঃসম্পর্ক, কোনো গভীর জীবনবোধ ইহার উৎস নহে। আজকালকার সভা-সমিতিতে মানস-অনুশীলন ও আনন্দবিতরণের যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়, তাহারা যেন ক্ষুদ্র স্বয়ং-সম্পূর্ণ দ্বীপের মতো জীবনস্রোতের উপর মাথা তুলিয়া আছে। উহাদিগকে সংস্কৃতি অপেক্ষা সচেতন কৃষ্টির সহিতই যুক্ত করা বিধেয়। সাহিত্য-আলোচনা, নৃত্যগীতের উৎসব, আবৃত্তি, অভিনয়, হাস্যকৌতুক — এগুলি আমাদের নূতন শেখা বিদ্যা ও মনোরঞ্জন বৃত্তির সামাজিক প্রয়োগ, ইহারা কোনো অখণ্ড জীবনানুভূতির নানামুখী প্রকাশ নহে। এখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় ও সমাজ জীবনে আমাদের সমগ্র মনোবৃত্তি ও হৃদযবৃত্তি অনুশীলনের কোনো সুযোগ নাই — কাজেই এই শিক্ষা ও সমাজ-চেতনা প্রসূত যে সংস্কৃতি তাহা জীবনের গভীর মূল পর্যন্ত প্রসারিত হয় না। তা ছাড়া আধুনিক জীবনযাত্রা কোনো সামগ্রিক জীবন-বোধ নিয়ন্ত্রিত নহে। যে সংস্কৃতি ধর্মবোধের সম্প্রসারণ বা পরিণত ফল তাহা স্বভাবতই কেন্দ্রাভিমুখী; কিন্তু যাহা তিল তিল করিয়া বিভিন্ন উৎস হইতে সংগৃহীত, যাহার মূলে কেবল আছে মানসিক আগ্রহ, মার্জিত রুচি ও সৌন্দর্যবোধ, যাহা বিবিধ আদর্শের যদৃচ্ছালব্ধ সার-সঙ্কলনে গঠিত তাহা অখণ্ড, আদিম জীবনানুভূতির অপ্রতিরোধ্য শক্তির অধিকারী হয় না, তাহা জৈবসংস্কারের মানবসংস্করণের মতো সমগ্র সত্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় না। হয়তো আধুনিক যুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের বিপুল পরিধি, আদর্শ-সংঘাতের বিভ্রান্তকারী প্রতিক্রিয়া ও মনের স্বেচ্ছানির্বাচন-প্রবণতার মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃতির কেন্দ্রিকতা পুনরাবৃত্ত হইবে না। আমরা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে যাহা কিছু আহরণ করিব তাহা মনের উপরিভাগে একটি মার্জিত স্তর রচনা করিবে, তাহা আমাদের সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে একটি শিষ্টাচারের আদর্শ, একটি লঘু আনন্দের মৃদুকম্পন, রুচিসখ্যগত একটা নৈকট্যবোধের সৃষ্টি করিবে। ইহার অতিরিক্ত কিছু আমরা আশা করিতে পারি না। ধর্মের বন্ধনই যেখানে শিথিল, জীবনবোধ যেখানে বিচ্ছিন্ন অনুভূতি-পরম্পরার সমষ্টি, যেখানে আস্বাদ-বৈচিত্র্যে নানাবিধ রুচিবৈষম্যের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে, সেখানে সংস্কৃতির সমগ্র জীবনব্যাপী প্রভাব প্রত্যাশা করা যায় না। কোনো ভবিষ্যৎ যুগেও যে এইরূপে সংস্কৃতি পুনরায় গড়িয়া উঠিবে তাহা অনুমানের অতীত। আমরা হয়তো কালের পরিবর্তনশীলতা ও অগ্রগতির সঙ্গে আনন্দের নূতন নূতন উপাদান খুঁজিয়া পাইব। ছায়াচিত্র যেমন এখন নাটক ও যাত্রাকে পিছু হটাইয়া নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে সেইরূপ হয়তো নূতন কোনো চিত্তরঞ্জনের উপায় পুরাতনকে স্থানচ্যুত করিবে। হয়তো পুরাতন পুতুল ভাঙিয়া ফেলিয়া শিশু যেমন নূতন পুতুলের দিকে আকৃষ্ট হয়, মানব-চরিত্রের মধ্যে যে শাশ্বত শিশু বাস করে সেও তেমন নূতন ক্রীড়াকৌতুকে মাতিবে। কিন্তু মহাকাব্যের মতো প্রাচীন সংস্কৃতির যে একীকরণ-শক্তি, সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতিকে একই লক্ষ্যাভিমুখী করার যে অমোঘ প্রভাব তাহা আর মানবজাতির ইতিহাসে পুনরাবৃত্ত হইবে কিনা সন্দেহ।

☐ *সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে*, ১৩৬৯

অন্ত্যেষ্টি

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে মৃতদেহের সংকারের জন্য সমাধি ও দাহ — এই দ্বিবিধ প্রথাই প্রচলিত ছিল। উভয় প্রথার মধ্য সমাধিই পূর্ববর্তী এবং দাহ পরবর্তী, ইহাই অনুমিত হয়। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দাহপ্রথার প্রচলন পরবর্তীকালে। পারস্যের রাজাদের মধ্য প্রাচীনকালে কেবল সমাধিপ্রথারই প্রচলন ছিল। প্রাচীন গ্রিসেও সংকারব্যবস্থা-রূপে সমাধিপ্রথাই প্রাচীনতম। সাইথিয়ান নৃপতিগণেরাও ছিলেন প্রাচীনকালে সমাধিপ্রথারই পরিপোষক। রোমান, কেল্টএবং টিউটনগণের মধ্যেও সমাধিপ্রথাই ছিল প্রাচীনতম প্রথা। কেবল ভারতবর্ষেই অতি প্রাচীনকাল হইতে সমাধি ও দাহ এই দুই প্রথার পাশাপাশি অবস্থান লক্ষ করা যায়।

সমাধি ও দাহ এই দুই প্রথার সহিত আর এক ধরনের সংকার প্রথারও প্রচলন ছিল। এই প্রথানুসারে শবদেহের পর দগ্ধদেহের অংশবিশেষ অস্থি বা ভস্মরূপে সমাধিস্থ করা হইত।

আদিমযুগে পৃথিবীর নানাপ্রান্তে নানাবিধ সংকারব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কোথাও শবদেহ পক্ষী বা জীবজন্তু দ্বারা ভক্ষণ করানো হইত, কোথাও নীলাকাশের নীচে শবদেহ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইত। কোথাও ছিল গুহাসমাধি, আর কোথাও বা ছিল সলিল-সমাধির ব্যবস্থা। তবে এই সকল ব্যবস্থার তুলনায় সমাধি ও দাহই অধিকতর প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

যে প্রথানুসারে হউক না কেন, ভারতবর্ষে প্রাক্‌বৈদিক যুগ হইতেই মৃতদেহের সংকার ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। সিন্ধুসভ্যতার যুগে, বৈদিক যুগে, গৃহ্য ও পৌরাণিক যুগে মৃতদেহের সংকার ব্যবস্থার নিদর্শন পাওয়া যায়।

কালের পরিবর্তনে সংকার ব্যবস্থায়ও কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। হয়তো বিশ্বাসেরও কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়া থাকিবে, কিন্তু দেহের বিনাশ হইলে তাহার যে সংকার আবশ্যক, এই মূল বিশ্বাসে কখনওই ফাটল ধরে নাই। মৃত্যু-চিন্তা, মৃত্যু-পরবর্তীকালে আত্মার অবস্থান, মৃতদেহের সদ্‌গতি — এইসকল প্রশ্ন লইয়াই তাঁহারা নিয়ত আকুল ছিলেন।

মহেঞ্জদারো ও হরপ্পা-খননের ফলে আমরা অবগত হইলাম যে সিন্ধুসভ্যতার যুগে মৃতের উদ্দেশে নানাবিধ উপহারদ্রব্য উৎসর্গ করা হইত। সেই উপহার দ্রব্যের সহিত থাকিত শবাধার, দগ্ধ অস্থি ও ভস্ম রাখিবার পাত্র। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অন্য সব কিছু পাওয়া

গেলেও অস্থির সন্ধান মিলিত না। দগ্ধ অস্থিগুলি তবে কি হইত? সম্ভবতঃ চূর্ণ করা হইত। কিংবা অন্য কোনো উপায়ে উহার সদ্গতি হইত। বেলুচিস্তানের নানাপ্রান্ত হইতে স্যার অরেল স্টেন উপরিউক্ত আকৃতির কিছু শবাধারের সন্ধান পান। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে মৃতদেহ দাহ করিয়া অতঃপর তাহার কিছু অংশের সমাধি প্রদানের কোনো প্রথা হয়তো তখন প্রচলিত ছিল।

বৈদিক যুগেও এই প্রথার নিদর্শন পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অধিকাংশ সূক্তই সংকারানুষ্ঠানবিষয়ক। যজুর্বেদ সংহিতায়ও সংকারসংক্রান্ত কিছু কিছু সূক্ত পাওয়া যায়। ভাষ্যকার সায়ণাচার্যের মতে ব্যবহারবিধিবিষয়ক এই সকল মূলগ্রন্থে দাহ এবং দাহ-পরবর্তী সমাধি ব্যবস্থা — মৃতদেহের এই দ্বিবিধ সংকার প্রথাই বর্ণিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ এবং অর্থববেদের সূক্তাবলী পারম্পর্যযুক্ত নহে। সূক্তের অর্থ হইতে অথবা মূলগ্রন্থ হইতে আমরা বিধি-বিধানগুলি অনুমান করিয়া লইতে পারি মাত্র। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সূক্তগুলি কিন্তু পারম্পর্যযুক্ত।

ঋগ্বেদের অন্ত্যেষ্টিসূত্রের অর্থ অনুসরণ করিলে আমরা কতগুলি তথ্য জানিতে পারি। ঐকালে সমাধি ও দাহ — এই দ্বিবিধ ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। একটি ছাগ এবং একটি গাভীকে মৃতদেহের সহিত দগ্ধ করা হইত। শবদেহটি গাভী অথবা ছাগের চর্ম, চর্বি এবং মজ্জাদ্বারা এরূপভাবে আচ্ছাদিত করা হইত যাহাতে অগ্নি দেহটিকে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করিতে না পারে। প্রজ্বলিত অগ্নির উত্তাপ যেন দেহটিকে তেমন যন্ত্রণা না দিতে পারে। সোমযাগের যিনি যজমান তাঁহার যজ্ঞের দ্রব্যাদি তাহার মৃতদেহের সঙ্গে দগ্ধ করা হইত। মৃতদেহটিকে যমরাজের নিকট বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য অগ্নিকে আহ্বান জানানো হইত। পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। মৃতদেহের নিরাপত্তার জন্য এবং পিতৃলোকে মৃতের উত্তরণের জন্য পূষণ, বায়ু, অগ্নি এবং সবিতৃদেবের উদ্দেশে প্রার্থনা জানানো হইত। জীবিতগণের নিরাপত্তার জন্য একটি প্রস্তরখণ্ড দিয়া গণ্ডি অঙ্কন করা হইত।

এই সকল তথ্য হইতে অনুমান করা যায় যে এই কালে সমাধি ও দাহ ও দাহ-পরবর্তী সমাধির প্রচলন ছিল। সমাধিব্যবস্থার মধ্য যতদিন সম্ভব মৃতের দেহটিকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইত। অথবা মৃতদেহটিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্য ছিল দেহের সহিত মৃতের আত্মাও যেন ঐ নির্দিষ্ট স্থানটিতে আবদ্ধ থাকে। নতুবা ঐ অশুভ আত্মা অপরাপর জীবিত স্বজনদের ক্ষতিসাধন করিতে পারে। পক্ষান্তরে, সমাধির বিপরীত ব্যবস্থা দাহপ্রথায় মৃতদেহকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করিবার মধ্য যে একটি আমূল পরিবর্তিত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ক্রমে মৃত্যু সম্বন্ধে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাসেও পরির্বতন হইল। দাহপ্রথার অনুকূলে মানুষ নানাবিধ যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাইল।

কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন দেহ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিবার সর্বাপেক্ষা ত্বরিত এবং সহজতম উপায় হইল দাহব্যবস্থা। ইহাদের মতে যতদিন দেহ রক্ষিত থাকে, আত্মাও ততদিন আবদ্ধ থাকে। ইহাতে আত্মার মুক্তি যেমন ব্যাহত হয় তেমনি ঐ আত্মার

পক্ষে অন্যান্য জীবিতগণের ক্ষতি সাধনও সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং কি মৃত কি জীবিত উভয়ের স্বার্থেই দাহব্যবস্থা প্রশস্ততম।

কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন আত্মা পরলোকে গিয়া যাহাতে শান্তি লাভ করে তাহার জন্যই এই ব্যবস্থার প্রয়োজন, কেহ কেহ আবার জীবিত স্বজনদের শান্তি রক্ষার উপরই অধিক প্রাধান্য দিয়াছেন।

কেহ কেহ অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন না যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একই সময় একই ধরনের চিন্তাধারার উদ্ভবে আর্যজাতির মধ্য শবদাহ প্রথার প্রসার ঘটিয়াছে। তাঁহাদের মতে, বিশেষ প্রথায় বিশ্বাসী উত্তর ইউরোপের এক উপজাতির বিজয় অভিযানের ফলে গ্রিস, রোম, পারস্য ও ভারতবর্ষে শবদাহপ্রথার প্রসার ঘটিয়াছিল। এই উপজাতি বিশ্বাস করিত মৃত্যুর দ্বারা জীবনে যে কলুষের, যে অপবিত্রতার সৃষ্টি হয় একমাত্র অগ্নিদ্বারাই সেই কলুষ বিনাশ সম্ভব এবং স্বর্গগমনের ইহাই একমাত্র উপায়।

কোনো কোনো চিন্তাবিদ্ মনে করেন, যে সকল জাতির নির্দিষ্ট কোনো বাসভূমি নাই তাহাদের পক্ষে দাহ ব্যবস্থাই প্রশস্ততম। কারণ, তাহাদের পক্ষে মৃতদেহ সুরক্ষিত রাখা অসুবিধাকর এবং অরক্ষিত মৃতদেহের সাহায্যে 'তুকতাক' জাতীয় অমঙ্গলসাধন সম্ভব। দাহপ্রথা প্রবর্তনের ফলে এই আশঙ্কা দূরীভূত হইল।

যাঁহার বিশ্বাস করিতেন মৃতব্যক্তি জীবিতগণের ক্ষতিসাধন করিতে পারেন — তাঁহাদের পক্ষেও দাহপ্রথা সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইল। দাহ প্রথা প্রচলনের পিছনে আরও কয়েকটি কারণ রহিয়াছে। আদিম আর্যগণ পরিবার এবং গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করিতেন। ঐ পরিবার ও গোষ্ঠীর অন্তর্গত মানুষদের মৃত্যুর পর বাসস্থানের সন্নিহিত কোনো স্থানে সমাধিস্থ করা হইত। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন মৃতের আত্মা ঐ সমাধিস্থলেই রহিয়াছে। কিন্তু কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গোষ্ঠীগুলি এক একটি রাজ্যে পরিণত হইল। রাজনৈতিক প্রয়োজনে এই সময় পরিবর্তিত বিশ্বাস লইয়া মানুষ ভাবিতে চাহিল মৃতের আত্মা একটি নির্দিষ্ট স্থান ছাড়িয়া কোনো দূরবর্তী লোকে গমন করে এবং সেই লোকটি কোনো বিশেষ শক্তিমানের দ্বারা শাসিত হয়। স্বর্গগমনের এই বিশ্বাস পোষণের পক্ষে সমাধি আদৌ অনুকূল প্রথা নহে, সুতরাং দাহপ্রথার প্রচলন হইল।

অধ্যাপক কীথের ধারণা, আত্মার স্বর্গগমনের জন্য মৃতদেহের দাহ প্রয়োজন — এ বিশ্বাস ঠিক বৈদিক যুগের নয়। ঋগ্বেদে এ নিদর্শন পাওয়া যায় যে সমাধি বা দাহ যে কোনো উপায়েই হউক সৎকার হইলেই মৃতদেহ স্বর্গ লাভ করিয়াছে। তাঁহার মতে অতি স্বাভাবিক নিয়মেই দাহপ্রথার প্রচলন ও প্রসার ঘটিয়াছে। দাহপ্রথার প্রবর্তনে মৃত্যুর অশুভ প্রভাব দূর করা সম্ভব হইয়াছে। যে অগ্নিকে মানুষ এবং দেবতাগণের সংযোগকারী বলিয়া মনে করা হইত সেই অগ্নির পূজারূপেই এই প্রথার সূত্রপাত। কিন্তু ভারতবর্ষে এই প্রথার সর্বপ্রথম সূচনা হইয়াছিল সম্ভবত যুদ্ধের প্রয়োজনে। কারণ যুদ্ধকালে শত্রুর হাতে মৃতদেহের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি এবং অসম্মান হইবার সম্ভাবনা ছিল। অধ্যাপক কীথ্ মোটামুটি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে সৎকারে দাহপ্রথার প্রচলন সম্পর্কে কেহ কেহ এই মতও ব্যক্ত করিয়াছেন

যে যেখানে জ্বালানি কাঠের অভাব সেখানে মৃতদেহ জলে ফেলিয়া দেওয়া, পশুপক্ষীকে খাওয়ানো ইত্যাদি উপায়ে বিনষ্ট করা হইত, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রায় সর্বত্র জ্বালানি কাঠের প্রাচুর্য থাকায় দাহপ্রথাই প্রচলিত সৎকারের ব্যবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশ্য জ্বালানি কাঠের প্রাচুর্যহেতু ভারতবর্ষে দাহপ্রথার প্রচলন হইয়াছিল এই যুক্তি আমরা মানিতে পারি না। আমরা বৈদিকসাহিত্যে এমন কতগুলি তথ্য লাভ করি যাহাতে স্বভাবতই মনে হয় এই দাহপ্রথার প্রসারের মধ্য বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রভাব গভীরভাবে কার্যকর।

ঋগ্বেদে এবং অথর্ববেদে 'পিতৃমেধ' যজ্ঞের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং অথর্ববেদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বলিয়াছেন মৃতের দাহ অনুষ্ঠানই 'পিতৃমেধ'। যদিও যজুর্বেদে কেবল অস্থিদাহ করাকেই 'পিতৃমেধ' বলা হইয়াছে তথাপি বৈদিকযুগে 'পিতৃমেধ' শব্দটি মৃতদেহের দাহ এবং অস্থিসমাধি এই উভয়বিধ অর্থেই প্রযুক্ত হইত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও এই অর্থেই 'পিতৃমেধ' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে শব্দটি 'পুরুষমেধ' এবং 'সর্বমেধ' যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গেই উল্লিখিত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণের অশ্বমেধ অধ্যায়ে 'পিতৃমেধ' শব্দটি উল্লিখিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য স্পষ্টই বলিয়াছেন যে 'পিতৃমেধ' এক প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান।

ঋগ্বেদের নানান্ সূক্ত হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেহকে আমরা অগ্নিদেবতার উদ্দেশে আহুতি দিই (হে অগ্নে যঃ প্রেতঃ, তে আহুতঃ, চেতৌ মন্ত্রেণ সমর্পিতঃ।)

বৈদিক সাহিত্যে এবংবিধ বহু সূক্ত দাহপ্রথা প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে মনে হয় আমাদের দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং দাহানুষ্ঠানের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। কেবলমাত্র সুবিধাজনক একটি ব্যবস্থারূপে অথবা এই ধরনের কোনো কারণে ভারতবর্ষে দাহপ্রথার প্রচলন ও প্রসারণ ঘটে নাই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, যজ্ঞানুষ্ঠানে আমরা যে বিধি-নিয়ম পালন করিয়া থাকি, দাহানুষ্ঠানেও তদনুরূপ নিয়ম পালন করিতে হয়। সুতরাং দাহপ্রথা আমাদের নিকট অগ্নিপূজারই নামান্তর। যজ্ঞপ্রথায় গভীর বিশ্বাস হইতে এই প্রথা এদেশে এমন একটি স্থায়ী ও তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান বলিয়া সম্মান লাভ করিয়াছে।

□ *স্মৃতি : আচার ও ধর্ম*, ১৯৭৭

স্বরূপ

জ্যোতির্ময়ী দেবী

জ্ঞানীজন বলেন, কাজ করলেই ফল আছে; ফলস্বরূপ হঠাৎ একজন এসে বললেন — আপনারা কী? —

স্বরূপ বস্তুটি কি? জিজ্ঞাসা করলে — বলতে হয়, —'জানিনে।'

নিজেকে দেখতে পাবারও উপায় থাকবে না বলেই বিধাতা চোখদুটো কপালের নীচে দিয়েছেন, হাতের তেলোয় দেননি। তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল জানিনে কিন্তু আপনাকে দেখতে না দেওয়ার অভিপ্রায় যে ছিল, সেটা মানতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এও দেখতে পাওয়া যায় যে, মনের স্বরূপও আমরা বুঝতে পারি না।

অর্থাৎ কথা হচ্ছিল, — মেয়েরা কী করতে পারেন এবং যখন পারেন না কেনই বা পারেন না? — আর আপনারা যে কী সব এতদিন ধরে বললেন তার — কাজ কী হল? — আর যেখানে কাজ কিছুই হল না — তা না হলই বা কেন? অবশেষে তাহলে কথা কয়ে প্রয়োজন কি? লাভ কি? ফল কী?

উপরি-উপরি এতগুলো প্রশ্নের চাপে হতবুদ্ধি হয়ে উঠলাম। যদি যুধিষ্ঠির হতাম তাহলে কা চ বার্তা কিমাশ্চর্যং-এর উত্তরের মতন 'দর্বীকণ্ঠাহ' ইত্যাদি কিংবা — 'নিয়ত জীবসকল শমনসদনে প্রেরিত হইতেছে দেখিয়াও মানবগণ আয়ুবিত্ত ইত্যাদি লাভের আয়াসে পরাঙ্মুখ হইতেছে না' ধরনের একটি বেশ 'গোলগাল' অর্থাৎ গোলমেলে জবাব দিতাম।

কিন্তু যখন বেদব্যাসের বিদ্যা আর গণেশের কলম ভগবান আমাদের দেননি, তখন তখনকার মতন চুপ করে থাকাই সুবিধে মনে হয়েছিল।

তবে এখন যখন ভাববার সময় পাওয়া গেছে এবং সামনে যক্ষের মতন প্রশ্নকর্তা কেউ নেই, তখন বেশ আস্তে আস্তে ভাবনাকে স্বপক্ষে কিছু জবাব দেবার জোগাড়ে লাগানো যেতে পারে।

'লাভ কি'-র উত্তর নেই। কেননা লাভ লোকসান দেখে কেউ ভাবে না। (এসব ভাবনা অন্তত)। দ্বিতীয়, যেটা ভাবে সেটা লেখেও না লাভ লোকসান দেখে। যখন কেউ অনাসৃষ্টি বা অপরূপ কিছু ভাবে, সেদিন লাভের কথা ভেবে ভাবে না, ভাবনাই তাকে ছাড়ে না, অস্থির করে তোলে, ক্ষেপিয়ে তোলে, আকাশের দিগ্‌দিগন্ত রাঙিয়ে দেয়, পৃথিবী শ্যামলা, সুজলা, সুফলা, সুন্দরী অপরূপ দেখে জলেস্থলে মরুৎব্যোমে ইউটোপিয়াকে স্পষ্ট দেখতে পায়। তাই সেটাকে প্রকাশ না করে থাকতে পারে না। হয়তো মনে হয় 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'-র মতন কি এক নতুন জগৎ ধ্যানের ক্ষেত্রের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা যেমন

ভেবেছিলেন — বুঝি এই পথে দেখিয়ে দিলে সবাই এই পথে চলবেন এবং পীড়িত আর্ত দীন মর্ত্যবাসীরা মৃত্যুময় অপূর্ব অমরত্ব পাবে। আধিব্যাধি দৈন্য ক্লেশ ইত্যাদি অনাদ্যন্ত সমস্যাগুলোকে সকলেই এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে বাঁচিয়ে পালিয়ে বা ছেড়ে যেতে পারবে। 'লাভ কি' 'ফল কি' জাতীয় ছোটো বিষয়েও মানুষ এইভাবেই লাভ লোকসান সুখ দুঃখ সুবিধে অসুবিধেকে এক একবার ভুলে গিয়ে একটি অপূর্ব আবিষ্কার করেছি মনে করে এক খাতা — একশো পাতা বই-ই লিখে মরে।

অতএব দেখা যাচ্ছে 'লাভ কি'-র জবাব ধর্মরাজ এবং তাঁর পুত্রই দিতে পারতেন অর্থাৎ সোজা কথায় সেদিনকাব প্রশ্নকর্তাকেই পালটে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

এখন থাকে ঐ স্বরূপ। স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় না বলেই ও'র সেস্থানে এত ছুটোছুটি। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমগ্রভাবে দেখবার আগ্রহ মানুষের যতখানি, নিজের চমৎকারিত্বের ধারণাও তার বড়ো কম নয়। ঐ না দেখা বস্তুটি মানুষকে মনের বনে বনে 'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম' করে নিয়ে বেড়ায়। তারই নেশায় লেখা, পড়া, হিতচেষ্টা প্রচার, প্রকাশ — কি নয় —।

মানুষ যখন ভাবতে আরম্ভ করে কোনোকিছু, প্রথমে তার আশার দিকটা চোখে পড়ে, সে কেমন সবটাই আলোয় উজ্জ্বল, আনন্দে উচ্ছল, উল্লাসে অপরূপ বস্তু। কিন্তু প্রথমকার ধ্যানমূর্তি যখন বাস্তব আকার ধরে দাঁড়াতে চায় তখন দেখা যায়, তার আরও যে আধিভৌতিক দিক্ আছে তাতে অত্যন্ত স্থূল সীমা আঁকা আছে, বেড়া দেওয়া আছে; যাকে বেশি ভাবতে গেলে মানুষ দুটো পথ খুঁজে পায়, একটি পার হয়ে যাবার অজানা নিরুদ্দেশযাত্রা, অপরটি অত্যন্ত পেসিমিস্টভাবে চুপ করে ভাবার।

একটি কথা মনে পড়ল, একবার একটি ছোটো মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তার নাম কি?

সে বললে, 'মেরী।'

আবার জিজ্ঞাসা করা হল — 'Mary What?' মেয়েটি একটু ভাবলে তারপর বললে — 'Mother always calls me, "Mary don't–"।'

বোধ হচ্ছে আমাদের স্বরূপের নামও ঐ 'মেরী don't' বেশ খাটে, আমাদের সর্বত্রই সমাজ-মাতা বেড়া দিয়েছেন, দিয়ে বলে দিয়েছেন, দেশসুদ্ধ মেরীকে 'Mary don't, Mary don't'—

যতক্ষণ ধ্যানের মাঝে স্বপ্নের জগতে বাস করা যায় কোনো আটক নেই, কিন্তু যেই সেটাকে আকারে অপরূপ করে তুলতে চাই, নাম দিতে চাই, অমনি দেখি চারিদিকের অভিভাবকেরা মায়ের হিতৈষিণী রূপ পরিগ্রহ করে বলছেন : 'Mary don't', 'Mary don't'—

বোঝাতে পারা যায় না বা সেটা বুঝতেও সহজে পারা যায় না, কিন্তু তার অনুভূতি একটা আছে, পায়ের তলার কাঁটার মতন খচ্খচ করে বেঁধে — চলতে বাধে।

চারিদিকে ধনধান্য ঐশ্বর্য সোনা মতি থাকা সত্ত্বেও যেমন ভারতবর্ষের লোক দলে দলে দুর্ভিক্ষে মরে, রোগে মরে, অখাদ্য ভেজাল খেয়ে মরে, — বস্তিতে থাকে, কুঁড়েয় থাকে,

সোঁতা দুর্গন্ধ স্থানে পড়ে বেঁচে থাকে, প্রাসাদ অট্টালিকাতে সুসজ্জিত নগরী সত্ত্বেও। একজন বা জনপ্রাণী — তার বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষের কোনো আপনার জনই ঐ ঐশ্বর্যের কণিকামাত্রে অধিকার রাখে না। তার স্থলেও ঐ একমাত্র নীতি। তার বেড়া ডিঙিয়ে যাবার যো নেই।

নিষেধের বেষ্টনী লেখন জেগে আছে।

প্রশ্নকর্তা বলতে পারেন, 'কেন মানে?'

উত্তর আসে, 'মার্শাল ল' আছে, মজ্জাগত স্বভাব আছে, ভক্তি (লয়্যালটি) আছে — তার জন্য চিরদিনের পিঠ চাপড়ানো আছে।'

আমাদের কি করা উচিত ছিল, কেন করিনি বা করতে পারি না, কাজ হল না এবং কেন হল না তার মূলে ঐ নিরুপায় অসহায়তা আছে। চিরদিন ধরে শুনে এসেছে, দেখে এসেছে, — 'মেরী don't'—

তবু মনে ওঠে, এই অসাড় নিশ্চেষ্টতাকে অতিক্রম করা যায় না? মন আপনার উপর রাগ করে, যেন বলতে ইচ্ছে করে, 'ক্লৈব্যং মাস্ম-গম' ..... কিন্তু প্রতিটি অঙ্গে তার আফিমের ইনজেকশন দেওয়া রয়েছে, কতটুকু তার সাড়া পাবে? ঠিক যেভাবে এই বাংলাদেশ থেকেই — দেশবাসীর এই গৃহহীন অন্নহীন আলয়হীন দেশ থেকেই নানাদেশি বিদেশি বণিকরা লাখে লাখে কোটিতে কোটিতে টাকা উপায় করে নিয়ে যায়, আমরা অবাক হয়ে ভাবি কেমন করে, আমাদের পথ নেই, অভ্যাস নেই, সহায় নেই, সংস্কারও নেই, — ধ্যান করি শুধু কী করে হয়, কেন? এবং সে ধ্যানেও নিষ্ঠা নেই, শুধু লোভ আছে, মোহ আছে। তবু ভাবি কী করে কী হয়।

উত্তর আসে অনেক, সবচেয়ে আগে মনে হয় দেশের কর্তা আমরা নই, — তারপর মনে হয় অনেকের অন্নমুষ্টিরও সংস্থান আমাদের নেই, দেবার লোক নেই, মতের ঐক্য নেই! কি নয়!

ঠিক এই অবস্থার জন্য লেখাপড়া শিখে আমরা চাকরি খুঁজি, রিসার্চ স্কলার হয়ে আমাদের দেশের মানুষ বৈজ্ঞানিক হয় না, বড়ো চাকরি করে; হিসাব-বিজ্ঞানে বড়ো পরীক্ষা যারা দিতে পারে তারা ব্যাখ্যা করতে পারে না, বিদেশি ব্যবসায়ীর হিসাবনবিশ হয়। চাষ করে আমাদের চাষারা নামমাত্র মূল্যে অন্যের সোনারতরীতে তার ফসল তুলে দেয়, আপনি উঠতে গেলেই তরী 'স্থান নেই স্থান নেই' বলে চলে যায়। ধন আমরা সৃষ্টি করি না উপার্জন করি, জ্ঞান নব-নব ধারায় আমরা সৃষ্টি করি না, আহরণ করি মাত্র; আর অন্ন আমরাই সৃষ্টি করি দুর্ভিক্ষে ম'রে।

আমার প্রশ্নকর্তাকে (যক্ষ) দেখতে পেলে হত এখন — আমি জিজ্ঞেস করতুম, কেন? মনে হয় যেন মেয়েদের এইরকম মরণের অবস্থা।

তারপর সংস্কার, সমাজ, স্বজন সকলে মিলে শিখিয়েছেন তার নাম — 'Mary don't'.

গোড়ায় নেই শিক্ষা, তারপর নেই সংস্থান, সর্বোপরি নেই আশ্রয়; সুতরাং স্বভাবতই সাহস নেই, ভরসা নেই।

তাই আমাদের সোনারতরীতে আমাদেরই স্থান সংকীর্ণ।

কিন্তু তবে আলোচনা?

ওর জবাব হচ্ছে, — 'নিয়ত জীবসকল শমনসদনে প্রেরিত হইতেছে, তথাপি আয়ুবিত্ত সন্তান লাভার্থে প্রযত্নে পরাঙ্মুখ হইতেছে না।'

ভাবতে ভাবতে প্রশ্নকর্তা এলেন কিন্তু জবাবে সন্তুষ্ট হলেন না।

বললেন, 'তবে ছাড়ুন সব। আগুনে যদি না ঝাঁপ দেবেন, জলে যদি না নাববেন, তবে কী করে জানবেন কিসে কী হয়? আগে ভুলে যান এক আধজন। আপনাদের কিছুই হবে না, আপনারা বোঝেন না।'

বুঝি বই কি। আবার বোঝাবার চেষ্টা চলে — ঐ। কিন্তু প্রশ্নকর্তা চলে গেলেন। নাঃ, এরা হেদোয় সাঁতারটা শেখার আগেই গঙ্গায় ডুবতে বলে, তাহলেও উপমা এসে দাঁড়িয়েছে, এলে বলব, ঐ কিরকম জানেন।

বড়ো বড়ো রেলওয়ে স্টেশনে দেখা যায় মেন লাইন থেকে দূরে লাইনে লাইনে কখনও কাছাকাছি, সারি সারি মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে;দু'চারখানা বা সুদূর সাইডিং-এ, কতকগুলো মাঝখানে, কদাচ কখন আধমাইল লম্বা গাড়ির সার দূরের পানে চেয়ে আছে একটা এঞ্জিন জুড়ে;কখন ছাড়বে কোথায় গন্তব্য, কিছুই জানা নেই, কোত্থেকে আসছে তাও বোঝা যায় না;কিন্তু গায়ে লেখা সবারই — যে খানা লাল হাতা দেওয়া সীমান্তে সাইডিং-এ আছে, সেটারও Return — অমুক দিনে অমুক সনে। ৩, ৫, ৩৯, ১০, ৩২ এমনি কত সংখ্যায়।

প্রশ্নকর্তা কাছাকাছি নেই, কাজেই মন নিরুদ্দেশে ধ্যান করে — Return 25th, 1935 Jan., মেয়েবা যেন ঐ মালগাড়ির শ্রেণী;কোথা থেকে কী নিয়ে ডেস্‌টিন্‌ড্ হয়ে এসেছে তারা জানে না। কে নিয়ে যাবে তাও জানে না, পথের মাঝে এঞ্জিন বদলও জানবে না, অথবা ভাববে না, কিন্তু একদিন ঐরকম Return 24.3.36. লেখার মতো ফিরবে। অবশ্য তারিখ সন সাল লেখা নেই তাদের গায়ে।

সুমুখে যক্ষ না থাকায় সুবিধা অনেক, মন ভাবতে লাগল। কিন্তু কখন ছেলেগুলো উঠোনে হৈ-হৈ লাগিয়ে দিয়েছে। তাদের দিকে চোখ পড়ল — রেল-রেল খেলা হচ্ছে।

দেখা গেল সবাই এঞ্জিন হতে চায়। জনকতক ছোটো মেয়ে এঞ্জিন বলে মেনে নিল দাদাকে। ছেলেরা মায়ের ভয় রাখে না, মায়েরাও মর্যাদা রাখে না;সাইডিং-এ কেউ থাকবে না, কলিশন হলে মারামারি হবে, সর্বোপরি সবাই এঞ্জিন হতে চায়। শেষ অবধি ঝগড়াই হয়ে গেল। মেয়েগুলো চলে গেল। তারা সাইডিং-এ ছিল।

আবার ভাবতে লাগলাম, তাই তো, সেদিন যে অতগুলো কথা শুনলাম জবাব কি তার? সত্যিই তো ভাববার কথা অনেক আছে, এমনিধারা জীবন। তা ভালো, না, তা মন্দ, কত কি;ভাবতে ভাবতে হঠাৎ —

মোটরের হর্ন! সব ক'টি ছেলে মোটর হয়ে গেছে আর এঞ্জিন নেই। সবাই স্বাধীন! আর দাদামশাই প্রবল রাগে কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে এলেন, 'হতভাগাদের জ্বালায় ঘুমিয়েও সুখ নেই।'

মোটরগুলো একটু থেমে গেল;কিন্তু হর্ন থামলো না, নানাবিধ সুরে দিকে দিকে যেতে লাগল।

মেয়েরা কই?

মেয়েগুলো একমনে বারান্দার রেলিং-এ রঙিন নেকড়ার ফালি বেঁধে বিনুনি তৈরি করছিল। ৪ গুছি, ৫ গুছি, ৮ গুছি! —

জবাব দেবার জন্যে ফ্যাক্ট্স্গুলো টুকে নিচ্ছি; প্রশ্নকর্তা দেখে বললেন, 'এ হয়নি, কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু হয়নি! এ আপনার চাল্শে-ধরা চোখে দেখা স্বরূপ।'

তা' হবে। চুপ করে গেলাম। —

বললেন, 'আদর্শ বড়ো করুন। স্বরূপের আদর্শ তৈরি করুন মহত্তর করে। ছিল মালগাড়ি, তাই বলে মোটর হবে না? এঞ্জিন হবে না? তৈরি করে নিন।' —

'সে কি? — ওতে থার্ডক্লাশ গাড়িই ভালো হয় না যে। এঞ্জিনের সাজসরঞ্জাম কই —?'

'ওই থেকেই করে নিতে হবে, — ওতেই হবে — না হয় ট্রলি হবে এখন। কিন্তু ideal বড়ো করা চাই।'

একটা বইয়ের জবাব মনে এলো, ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কিন্তু একজন পণ্ডিত বলছেন — "All ideals are logically speaking fictions–" আর "Taken literally, however our most valuable conceptions are worthless" (*The Art of Thinking*. p.95, *The Dance of Life*, by Havelock Ellis)।'

যক্ষই বলি, হেসে ফেললেন, বললেন 'ও! এইসব পড়ে আপনার স্বরূপ ঐ রকম আড়ষ্ট হচ্ছে। — ওসব পড়বেন না। আচ্ছা, আর একদিন আসব।' —

রান্নাঘরে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

□ *জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন*, ১৯৯৫

মার্ক্‌স্‌বাদ ও মনুষ্যধর্ম

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মার্ক্‌স্‌বাদের বিপক্ষে একটা বড়ো ও সাধারণ আপত্তি এই যে, তাতে ব্যক্তির কোনো স্থান নেই। অনেকেই এই আপত্তির জবাব দিয়েছেন। জবাবের মধ্যে দু'টি কথা সকলেই অবশ্য মানতে বাধ্য: ১. ধনতন্ত্রের দাপটে সমাজের অধিকাংশ মানুষই ব্যক্তিত্ব খুইয়েছে, অতএব ধনতন্ত্র না গেলে ব্যক্তিত্ব-স্ফুরণের অবকাশই মিলবে না; এবং ২. এই সমাজে মাত্র যে জনকয়েকের ব্যক্তিত্ব-প্রকাশের সুবিধা ঘটেছে, তাদের জীবনেও সেই সুবিধার পূর্ণ ব্যবহার হয় নি। প্রমাণস্বরূপ প্রত্যেক শ্রমিক ও 'ব্যাবিট্' শ্রেণীর অপরিণত জীবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ ছাড়া, অন্য স্তরের লোকেরাও প্রাণ ধারণে এত ব্যস্ত, আর্থিক শোষণে এতই ক্লান্ত যে ব্যক্তিত্ব তাদের পক্ষে গল্প মাত্র, ফুটিয়ে তোলা তো দূরের কথা। শিক্ষক সম্প্রদায়, আর্টিস্ট, বৈজ্ঞানিক, প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীরই আজ এই দশা। তবু এই ধরনের উত্তর নঙর্থক, কারণ ধনতন্ত্রে মানুষ ছোটো হচ্ছে মানলেই মার্ক্‌স্‌-পছন্দ সমাজে মনুষ্যত্ব ফুটবেই ফুটবে বলা যায় না। এইখানেই রাশিয়ার ঝগড়া ওঠে। কেউ বলছেন সেখানে মানুষ যাতা কলে পিষে মরছে, আবার কেউ বলছেন সেখানে মানুষ সব অতিমানুষ হয়ে উঠেছে। ওদেশে যখন যাইনি তখন মাত্র এইটুকু মানবো যে সেখানকার মানুষ নিজের উপর বিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। কিন্তু আমেরিকানরাও আত্মবিশ্বাসী। দুটোর মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে, তবে মনে হয় যে তার ইঙ্গিত পূর্বোক্ত মার্ক্‌স্‌সিজ্‌ম-এর সপক্ষে জবাবদিহির মধ্যে নেই।

অন্য উত্তর চাই। ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে দেখলে মন্দ হয় না। মানুষের সভ্যতায়, চিন্তায় ও ব্যবহারে বহুবার তার সঙ্গে প্রকৃতির ও সমষ্টির বিবাদ বেধেছে। আদিম তথাকথিত অসভ্য জাতির মধ্যে সর্বদা দেখি বিশ্বতত্ত্ব বা cosmology-র পাশে একটা নৃতত্ত্ব বা anthropology রয়েছে। দৃশ্য ও অদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তির সঙ্গে আদিম মানুষ প্রশ্ন করেছে তার নিজের উৎপত্তি কী ও কোথায়? প্রথমে দেখি ভূতড়ে ব্যাখ্যা আসছে, পরে মাইথলজি (mythology) সৃষ্টি হচ্ছে। তাই থেকে ধর্ম উঠল; এবং ধর্ম পুরাণকে নষ্ট না করে তাকে পুষতে লাগল। ফলে যেটা ছিল মাত্র জানবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এখন সেটা হল 'মানুষ কী' — সেই জ্ঞানেরই কর্তব্যবোধ। এই মন ঘুরে যাবার পর থেকেই মানুষ সমগ্র প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন ঐক্য, অর্থাৎ সমষ্টি থেকে বিচ্যুত হল। এতদিন প্রকৃতি ছিল নৈর্ব্যক্তিক সমগ্র ও সুনিশ্চিত, মানুষের পৃথক সত্তাই ছিল না; কিন্তু আত্মজ্ঞানের তাগিদে বহির্জগতের সূত্র গেল ছিঁড়ে, আর বেড়ে চলল প্রশ্ন আর সন্দেহ। বর্তমান সভ্যতার কত গোড়ায় এই আত্মজ্ঞান ও সন্দেহ শুরু হয়েছে দেখলে আশ্চর্য লাগে। এই থেকেই 'মনুষ্যধর্মের' আরম্ভ।

দর্শনের ইতিহাসে দেখি — "Scepticism has very often been simply the counterpart of a *resolute humansim.* By the denial and destruction of the objective certainty of the external world the sceptic hopes to throw all the thoughts of man upon his own being." – (Cassirer – *What is Man?*) — এই scepticism সন্দেহবাদের সঙ্গে মার্ক্‌সীয় তত্ত্ববিচারের সম্বন্ধ আছে, যদিও মার্ক্‌স্‌বাদের অন্যান্য প্রত্যয়ে সেটা ঢাকা পড়ে। সন্দেহবাদ ও আত্মজ্ঞানের পর্ব অনেকদিন চলে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জুডা, ইস্‌লাম ধর্ম সে পর্বের এক একটি অধ্যায়। লাভ হয়েছিল এই যে, মানুষ যে বিশ্বের কেন্দ্র একথা সে ভুলতে পারেনি। কিন্তু ক্ষতি হয়েছিল বিস্তর; নিজের উপর অতটা আস্থা থাকার দরুণ বাইরের অস্তিত্বটাই লোপ পেতে বসেছিল। অর্থাৎ প্রকৃতি-সমষ্টি পরিণত হয়ে গেল ব্যক্তি-বিন্দুতে। প্রতিক্রিয়া এল কোপার্নিকান ও কার্টেসিয়ান চিন্তা-পদ্ধতিতে। অনন্ত বিশ্বের প্রেক্ষিতে মানুষ আবার পেল ভয়। মানুষ গেল কুঁকড়ে, ছোটো হয়ে। রিনেসাঁ যুগের এই দিকটা ঐতিহাসিকরা বড়ো বেশি দেখাননি, তাঁরা হ্যামলেটের মানব-অর্চনা উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত। মনটেন লিখছেন : "Can anything be imagined so ridiculous, that this miserable and wretched creature, who is not so much as master of himself, but subject to the injuries of all things, should call himself master and emperor of the world of which he has not power to know the least part, much less to command the whole?" (এটা ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে; তখন ভারতবর্ষে সাধুসন্তের কৃপায় মানবধর্মের জোয়ার বইছে। আমাদের চিন্তা ও কর্মে কোপার্নিকান কিংবা কার্টেসিয়ান সিস্‌টেমের মতন অবিশেষ প্রকৃতি-ধর্মের প্রচার হয় নি। তার ফল বিচারের স্থান অন্যত্র।)

এইবার প্রশ্ন উঠল — প্রকৃতির নাগপাশ থেকে মানুষ কী করে মুক্ত হবে; যদি মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ হয়, তবে প্রকৃতির নিয়মাবলি থেকে মানুষের নিয়মাবলি, অর্থাৎ সমাজ, ইতিহাস, রাষ্ট্রের, পরিশীলন আচার ব্যবহারের নিয়মকানুন কী ভাবে ও কতটা বিভিন্ন? কোপার্নিকাস্‌, ডেকার্ট-এর চিন্তাধারায় মানুষ গণিতশাস্ত্রে শাসিত, কারণ প্রকৃতির মর্ম সংখ্যার হাতে। কিন্তু এই গণিতশাস্ত্রই মানুষকে তার পূর্বতন স্থানে ফিরিয়ে আনলে। অসীম বা infinite-এর বিচারে দেখা গেল যে মানুষ তার বিদ্যাবুদ্ধির জোরে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, এবং সে প্রকৃতির প্রতিবেশ এই পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ নয়, গ্রহনক্ষত্র আকাশ প্রসারী। অতএব, অঙ্কশাস্ত্র ও তার অধীনস্থ সর্বপ্রকার বিদ্যার সাহায্যে মানুষ আবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার সুযোগ পেলে। ব্যাপারটা মোটেই সহজ ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চলেছিল মানব-সংক্রান্ত সমগ্র ঘটনাকে অঙ্কশাস্ত্রে পরিণত করতে — বাক্‌ল, ফেক্‌নার থেকে সলভে, এজ্‌ওয়ার্থ-এর দৃষ্টান্ত সকলেরই মনে পড়বে।

কিন্তু গণিতবিদ্যার সাধারণত্ব ও অবরোহী পদ্ধতির বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াল জীববিদ্যা — biology। ডারুইনের কৃপায় আরোহী যুক্তি-পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ প্রসারিত হল। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে থেকেই রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি ঘটেছিল। জীবতত্ত্বের প্রচারে মানুষ প্রথমেই

অবশ্য প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে নি; বরঞ্চ মানুষ আরও পরাধীন হয়ে পড়েছিল, যেমন কোঁৎ, হার্বার্ট স্পেন্‌সার, শাফ্‌ল প্রভৃতির সমাজতত্ত্বে। টেন এক জায়গায় লিখছেন,ফরাসি বিপ্লবের পরে ফ্রান্সের ইতিহাস তিনি লিখবেন 'metamorphosis of an insect' হিসেবে। তবুও ফল বিপরীত হল দু'দিক থেকে : ১. জীবতত্ত্বের বিচারে একটা জীবনস্রোতের সন্ধান মিলল, যার জোরে মানুষ ক্রমশ নিজের চেষ্টায় প্রতিবেশ বদলে অন্য জীবের অপেক্ষা বেশি অগ্রসর হয়েছে মনে হল কিংবা দেখা গেল। এবং ২. এই উন্নতির ইতিহাস একটি অদৃশ্য উদ্দেশ্যে চালিত হয়েছে বলে ধারণা জন্মাল। ফরাসি বিপ্লবের গোড়াপত্তন থেকে আজ পর্যন্ত যতটা উন্নতিবাদের চলন হয়েছে তার মূলে ছিল ঐ উদ্দেশ্যবাদ, ঐ মানুষের প্রতি আস্থা, তার বর্তমানে গৌরব ও ভবিষ্যতে বিশ্বাস। উদ্দেশ্যচালিত উন্নতিবাদই হল আমাদের পরিচিত মানব-ধর্মের প্রাণবস্তু। গণিতের কবলে থাকলে মানুষ প্রকৃতির নিয়ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারতো না। (ক্যাসিরার এই উন্নতিবাদের ব্যাপারটা ধরতে পারেননি। এর খবর ক্রিস্‌টোফার ডসন দিয়েছেন চমৎকার।) একবার পথ যেই খুলল, অমনই মানুষ-সংক্রান্ত যত প্রকার বিদ্যা আছে সব এগিয়ে চলল। মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, কেউ পড়ে রইল না।

কিন্তু নতুন বিপদ এল। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই দু'নৌকোয় পা; কিছুদূর অগ্রসর হলেই প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের গহ্বরে, আবার না এগুলে কেবল বর্ণনার জঞ্জাল জড়ো করা। সেই পুরাতন তর্ক, সাধারণ বড়ো না বিশেষ বড়ো? সাধারণকে মানলে মানুষের ইতিহাস হয় অঙ্কের অধীন, না হয় 'ন্যাচারাল হিস্‌ট্রি' : আবার বিশেষকে স্বীকার করলে কোনো নিয়মই খাড়া করা যায় না, কোনো কাজই সম্ভব হয় না, কোনো কিছু বোঝাই যায় না। জনকয়েক ঐতিহাসিক বললেন, ইতিহাস বিজ্ঞানের মতন করেই লিখতে হবে; যেমন র‍্যাঙ্কে; আবার কেউ বল্লেন, ইতিহাস সাহিত্যের অঙ্গ, যেমন কার্লাইল। অবশ্য লেখবার বেলা কেউই নিজের মতানুসারে চললেন না। আর একটি বিপদ ঘটল এই যে, প্রত্যেক মানুষ সংক্রান্ত বিদ্যাই নিজের নিজের নিয়ম তৈরি করে দাবি জানালে যে সেইটাই একমাত্র নিয়ম, অন্য কোনো নিয়ম মানুষের বেলা খাটে না। এই বিভিন্ন দাবির উৎপাতে সেই পুরাতন ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর গড়া মূল পত্তন গেল ভেঙে। আজও সেজন্য হা হুতাশ শুনতে পাই, যেমন ক্যাসিরার — *An Essay on Man*, পৃ. ২১, ২২।

কিন্তু আমার মতে দুঃখের অতটা কারণ নেই। মার্ক্‌সবাদে এই দুঃখের অনেকটা অবসান হয়। এই মতে মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ;অথচ প্রকৃতি থেকে স্বাধীন, অর্থাৎ বুদ্ধি, বিচার ও কর্মের দ্বারা সে কেবল মানবপ্রকৃতিই নয় জড়প্রকৃতিরও নিয়ম বুঝতে, সমালোচনা করতে, এবং নিজের মতো ভেঙে গড়ে নিতে পারে। কোপার্নিকান-কার্টেসিয়ান পদ্ধতির বাঁধাধরা নিয়ম এতে নেই, তবে সমগ্র ধারার গতিপ্রবাহ এতে আছে। অনেকে একে এনভিরনমেন্টালিজম্-এর (environmentalism) পর্যায়ে ফেলতে চান; কিন্তু যদি এই ধরনের মন্তব্য করতেই হয় তবে হ্যুম্যান জিয়োগ্রাফির সঙ্গে একে যুক্ত করাই যুক্তিসাপেক্ষ। মার্ক্‌সিজম্-এ অন্ধনিয়তির স্থান নেই, আবার আকস্মিকতারও স্থান নেই। অসীমের বিচারে যেমন মানুষ স্বাধীনতার সন্ধান পেয়েছিল তেমনই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রত্যয়ে মার্ক্‌সবাদী আপনার প্রতি

বিশ্বাস অর্জন করতে পারে। মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌-এর যুক্তিপন্থা প্রধানত আরোহী। বিশেষ ক্ষেত্রে অবরোহী। এর মূলকথা জীবতত্ত্বের পরিচিত পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, সাধারণীকরণ, শ্রেণীবিভাগ ও অবিশেষ-চর্চা;এবং সেই অবিশেষ সংজ্ঞা ও প্রত্যয় থেকে কর্মক্ষেত্রের বিশেষত্বে প্রত্যাবর্তন। মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌-এ বিশেষ ও সাধারণের বিবাদ খানিকটা মিটেছে। কেবল তাই নয়, সেই জন্যে মার্ক্‌স্‌বাদী ইতিহাস ন্যাচারেল হিস্‌ট্রি থেকে পৃথক হতেও পেরেছে। তার উন্নতিবাদ গড্‌উইন, কন্‌ডর্স-এর অজানিত উদ্দেশ্যচালিত উন্নতিবাদ নয়। মানুষের চেষ্টার ওপর গ্রথিত বলে সেটা এত পাকা, এতটা সুনিশ্চিত হয়েও অনিশ্চিত। মোদ্দা কথা এই মার্ক্‌স্‌বাদ সেই বহু পুরাতন মনুষ্যধর্মের আধুনিক সংস্করণ। বলা বাহুল্য, এর সঙ্গে স্টোয়িক মানবতার (stoic humanism) আত্মকেন্দ্রিকতার মিল নেই;ভারতীয় মানবতার আত্মচর্চার সঙ্গেও তার মিল কম; য়ুরোপীয় রিনেসাঁ যুগের শেষভাগের মানবতার খাপছাড়া, মুনাফালোভী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরও বিপরীত ধর্মী; এবং আজকালকার বৈজ্ঞানিক মানবতার (scientific humanism) সঙ্গেও পার্থক্য তার অনেকখানি।

তা হলে দাঁড়াল এই : মার্ক্‌স্‌বাদের কেন্দ্র মানুষ। কিন্তু মানুষ আর ব্যক্তি কি এক বস্তু? যদি বলা যায় যে, মাত্র ব্যক্তিই সত্য, কারণ তারই মন ও দেহ আছে, তবে সকলেই মানতে বাধ্য যে মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌-এর সঙ্গে এই ব্যক্তিসত্তার সম্বন্ধ সাক্ষাতের বা সোজাসুজি নয়, একটা কোনো মানব গোষ্ঠীর মারফত;অর্থাৎ সেই গোষ্ঠী প্রথমে স্বাধীন হলে তবে 'ব্যক্তি' হবে মুক্ত। আর যদি কেউ বলেন যে, ব্যক্তি বলে কোনো বস্তু নেই, একটা কাল্পনিক সংজ্ঞা মাত্র, এবং সমষ্টিটাই সত্য, কারণ ব্যক্তি সমষ্টির দ্বারাই প্রভাবিত, প্রচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, তবে মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌-এর সঙ্গে মানব সমষ্টির সম্বন্ধ নিতান্ত প্রত্যক্ষ। আমার নিজের বিশ্বাস, অবশ্য তার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ব্যক্তি পদার্থটি একটি প্রকাণ্ড abstraction বা বিমূর্তভাব, যার উৎপত্তি ইংলন্ডে ধনিকতন্ত্রের যুগে এবং যার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার ও ভারতীয় সমাজের ও ঘটনার কোনো যোগ নেই। ভারতীয় চিন্তায় আছে পুরুষ;ও আমাদের সমাজে এখন পর্যন্ত এমন খুব বেশি 'ব্যক্তি' জন্মাননি যাঁদের চরিত-কথার প্রেরণায় ধন ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করা যায়। (তবে তাঁরা অবতীর্ণ হচ্ছেন)। ব্যক্তিত্ববাদের মূল কথা আর্থিক উন্নতির সাধনা। পুরুষবাদের তত্ত্বকথা বর্ণাশ্রম, অর্থাৎ সমাজের ভেতরে বিকশিত হবার পর গুটিপোকার মতন কেটে বেরোনো। মার্ক্‌স্‌বাদ আর হিন্দুত্ব এক বস্তু বলছি না;আমার বক্তব্য এই যে, ব্যক্তিত্বের নামে মার্ক্‌স্‌বাদের বিচার করা ভারতবাসীর মুখে মানায় না। মানায় ভারতীয় ধনিকদের এবং ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের। তাঁরা কি ভারতবাসী? মার্ক্‌স্‌বাদের অন্য গলদ থাকতে পারে;তবে ব্যক্তিত্ব নামক কল্পিত বস্তুর বিশেষ রকমের উন্নতিবিধানের স্থান, কিংবা জল্পনা কল্পনা মার্ক্‌স্‌বাদে নেই বলে তার সমালোচনা চলে না;কারণ, তা হলে সমগ্র মানব-প্রচেষ্টার গতির বিপক্ষে যেতে হয়;জ্ঞানের ইতিহাসকে অপমান করা হয়। মার্ক্‌স্‌বাদের সঙ্গে মানবধর্মের সম্বন্ধ পুরুষতত্ত্বের (personalism) ভেতর দিয়ে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মারফৎ নয়।

□ *বক্তব্য*, ১৯৫৭

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন দেশে — বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, কারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র পাঠানো হয় বছরে বছরে। এরা বিদেশে যায় মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার বিবিধ শাখায় জ্ঞানলাভের জন্য। কিন্তু প্রায়ই এটা লক্ষ করা যায় যে, ভারতীয় শিক্ষানবিশদের সেই প্রাথমিক শিক্ষার অভাব রয়েছে যা থাকলে পরে তাদের পক্ষে সম্ভব হত আধুনিক কর্মপদ্ধতি দ্রুত আয়ত্ত করা। সম্প্রতি আমেরিকা প্রত্যাগত একজন বিশিষ্ট ভারতীয় শিক্ষাবিদ্ জানিয়েছেন যে, আধুনিক ইঞ্জিন বা যন্ত্রপাতি চালাতে বললে আমাদের ছেলেরা অনেক সময় খুবই ত্রস্ত বোধ করে প্রস্তুতির অভাবে। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির ফলাফল বিশ্লেষণে বিপুল অনুপাতে ব্যর্থতা প্রকট হয়ে ওঠে প্রতিটি পরীক্ষায়। কী বিপুল অপচয় আমাদের জাতীয় প্রয়াসের! অনেক সময়ে আমার মনে হয়েছে যে, এই সব ত্রুটি ও ব্যর্থতার জন্য আসলে আমরা ছাত্রসমাজে যে উপাদান নিয়ে কাজ করি তার উৎকর্ষের নিজস্ব অভাবই দায়ী নয়। বরঞ্চ যথাযথ পরিচালনা ও সুযোগ লাভ করলে ভারতীয় ছাত্র সত্যই কৃতিত্ব অর্জন করে এবং সব দিকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা দেখায়। আমার বোধ হয় সময় ও প্রয়াসের এই অপচয় এড়ানো সম্ভব, একমাত্র যদি আমরা আমাদের শিক্ষণপদ্ধতির অসম্পূর্ণতার সন্ধান ও বিশ্লেষণ করি এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে তা অপসারণের কাজে দৃঢ়ভাবে ব্রতী হই। কিছুদিন আগে এই প্রস্তাব আমি এনেছিলাম যে, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তনের এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সর্বস্তরেই শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষা ব্যবহারের সময় এসে গেছে। শত শত ছাত্রের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটেছে এমন একজন শিক্ষক হিসাবে আমার স্থির অভিমত এই যে, যথেষ্ট সময় বাঁচানো ও ছাত্রদের মনে বৈজ্ঞানিক চিন্তার দৃঢ়তর ভিত্তি গাঁথা সম্ভব, যদি প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক ও ছাত্রেরা সহযোগিতা করেন, তাঁদের সমস্যার খোলাখুলি আলোচনা ও তার সমাধানের জন্য একযোগে কাজ করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনো বিদেশি ভাষা এসে দাঁড়ালে মস্ত অসুবিধা দেখা দেবেই। কথাবার্তা ও শিক্ষার বাহন হিসাবে সর্বদাই ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতে হলে অনুসন্ধিৎসু ছাত্র অনেক সময়েই ঠিক মতো মনের কথা বলতে পারে না এবং শিক্ষকও নিশ্চিত হতে পারেন না যে, ছাত্রকে যা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সে তার সবটাই বুঝতে পেরেছে কিনা। বর্তমান পদ্ধতি যে মুখস্থ করতে প্ররোচনা জোগায়, এতে যে শিক্ষণীয় বিষয়ের সারতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা জন্মায় না

— এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। কিছুটা সতর্কতার সঙ্গে প্রকাশ করা সত্ত্বেও আমার এই মত দেশের সর্বত্র বাদানুবাদের উদ্রেক করেছে এবং অনেকেই আছেন যাঁরা মনে করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরেজিকে বাদ দেওয়া দেশের প্রকৃত স্বার্থের অনুকূল নয়। একজন অত্যন্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ এই অভিমত জ্ঞাপন করেছেন যে, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহলে তার ফলে 'বিদ্যায়তনিক চলাচল' (academic mobility) ব্যাহত হবে এবং তার দরুন উগ্র প্রাদেশিকতার একমাত্র প্রতিষেধক চিন্তা ও আদর্শের অবাধ লেনদেনও বাধাপ্রাপ্ত হবে। অনেকেই এখন সাহসে ভর করে বলছেন যে, আমাদের দাসত্বশৃঙ্খল স্খলিত হলেও তা ইংরেজি ভাষার স্বর্ণসূত্রটিকে পিছনে রেখে গেছে, যা নাকি আমাদের সংহতির সপক্ষেই কাজ করেছে ও সহায়তা করেছে আমাদের আত্মার পুনরাবিষ্কারে।

এই সব লোক এখনও বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় আদর্শেই বিশ্বাসী। তাঁদের মতে সমসাময়িকতার বাস্তব চাহিদাকে অযথা বিরাট্ করে দেখা ঠিক নয় এবং তার চাপে আমরা যেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ও আমাদের পাঠ্যবিষয়াদি পরিবর্তন করতে বাধ্য না হই। তাঁরা মনে করেন যে আমাদের উচিত, শাশ্বতসত্যকে, আমাদের পিতৃপুরুষ যে দর্শনের অধিকারী ছিলেন — তাকেই শ্রেয়জ্ঞান করে চলা। আমাদের সব ছাত্রদের পক্ষেই জ্ঞানার্জনের সাধারণ পৃষ্ঠপট রচনার প্রধান উপাদান হিসাবে তাঁরা নির্ভর করে চলেছেন ক্লাসিক্স-চর্চা, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল, হিউম্যানিটিজ, ভাষা ও আইন শিক্ষার উপরেই। বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব নির্দিষ্ট সীমার চাইতে বেশি মনে করা ঠিক নয়। বিজ্ঞানের উপযোগিতা তাঁরা স্বীকার করেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীকে তাঁরা দেখেন সন্দেহের চোখে। তাঁরা বিশ্বাস করেন পুরানো আদর্শের স্থান নিতে পারে বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে এমন কিছুই নেই। কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী কার্যকর হাতিয়ার তৈরির ব্যাপারে হয়তো তাঁরা কাজে লাগেন; তবুও তাঁরা মনে করেন যে, ওই রাষ্ট্রে সংস্কৃতি ও উদ্দেশ্যমুখীন জীবন সঠিক ভাবে গড়ে তোলা সম্ভব প্রাচীন দর্শনের ভিত্তিতেই — অনেকেরই মতে সে দর্শন হল প্রধানত অহিংসা।

গণতান্ত্রিক দেশে ইতিহাসের শিক্ষা সম্পর্কে প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত পোষণের এবং নিজস্ব ভঙ্গিতে তার পাঠ ও ব্যাখ্যার স্বাধীনতা থাকে। অতএব ভারতীয় সভ্যতার অবনতির কারণ সম্বন্ধে একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ আছে।

নালন্দা ও তক্ষশীলার মতো আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ধারাবাহিকভাবে যে পারলৌকিকতার পোষকতা করা হত — যা ছিল আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির মেরুদণ্ডস্বরূপ — তাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত শাশ্বত সত্যের অতন্দ্র মনন, চিন্তন, নিদিধ্যাসনের উপরে। এরই ফলে ব্যক্তিবিশেষ আত্মজ্ঞান লাভ করতে এবং পৃথিবীকে দু'দিনের পান্থশালা মনে করতে সক্ষম হতেন। আর এই উপলব্ধি তাঁকে ব্যাকুল করে তুলত এই জীবনের দুর্ভোগ ও পরীক্ষা থেকে মুক্তিলাভের জন্যে। এ ধরনের মনন চিন্তনের দার্শনিক উৎকর্ষের আমরা যতই তারিফ করি না কেন এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, এ জগৎ দু'দিনের পান্থশালা, — ক্রমাগত এই প্রচার পার্থিব ব্যাপারে ঔদাসীন্যের উদ্রেক করেছে। ভারতীয়রা এরই জন্য শীঘ্রই জাগতিক ব্যাপারে আধিপত্য হারাল এবং অনতিবিলম্বে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে গেল বর্বরদের হাতে।

বহু শতাব্দীর শিক্ষা থেকে আধুনিক কালের ভারতীয়কে ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের উপরে অতিরিক্ত গুরুত্ব না দেওয়ার পাঠ গ্রহণ করা উচিত। হয়তো জীবনকে অন্য দৃষ্টিতে দেখাই ভালো। ব্যক্তিগত সুখদুঃখকেই দর্শনের প্রধান বিষয় কবা ঠিক নয়। বরং সাধারণ ঐতিহ্যের ঘনিষ্ঠ সূত্রে গ্রথিত দেশবিশেষের মানুষকে মনে করা যেতে পারে যেন এক 'রিলে দৌড়ের' প্রতিযোগী, যেখানে ব্যক্তিগত দৌড়বাজের ভাগ্যের চাইতে দেশের উন্নতি, জাতীয় পতাকার অগ্রগতি ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষপরম্পরা ধরে যদিও মানুষ পরিশ্রম করে যায় আর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের এবং দারিদ্র্য, রোগ ও মৃত্যুর উপরে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করতে কবতেই তার জীবনাবসান হয়, তবু ওই সব প্রয়াস দেশের ও জগতেব কতটা কল্যাণ করতে পেবেছে — এইটেই হচ্ছে আসল কথা। বলা যেতে পারে যে, এই ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিটিও ভাবতীয়, যদিও এতে হয়তো ব্যক্তির আত্মাকে পরমার্থ জ্ঞান করতে অস্বীকার করা হয় এবং প্রচারিত হয় কর্মের সার্বভৌম কর্তৃত্বের কথাই। বস্তুবাদী দার্শনিক এও বলতে পারেন যে, এই পারলৌকিকতা আসলে জড়ত্ব, স্বার্থপরতা ও লোভেরই প্রকৃষ্ট জন্মভূমি। মানুষের উদ্বেগ যখন তার নিজস্ব মোক্ষলাভের জন্যেই তখন সে লোকালয় ছেড়ে আশ্রয় খোঁজে গুহা-কন্দরে। এরই মধ্য দিয়ে সে মুক্তি পায়, আর যারা পিছনে পড়ে থেকে সংসারের অশুভ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সমাজ ও দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে তাদের ছেড়ে দেয় শয়তানের কবলে।

আমাদের এই দর্শনের আধিপত্য যখন কায়েম ছিল তখন আমাদের প্রথম সারির চিন্তাবিদেরা জীবনের গুরুত্ব স্বীকার করতে অবহেলা করতেন। এরই দরুন দ্বিতীয় সারির সেই সব ক্ষুদে মানুষেরাই প্রাধান্য পায়, যারা মৌখিক আনুগত্য জানাত দর্শনের প্রতি, অথচ কার্যত মাতামাতি করত — হিংসা, ঝগড়াঝাঁটি ও অভ্যন্তরীণ বিবাদবিসংবাদ নিয়েই। ফলে এল বিদেশি হানাদারের দল — অনেক ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত হয়েই এল — আর ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করল শতাব্দীর পর শতাব্দী জোড়া দাসত্ব। তবু আমাদের যে ঘুম ভাঙছে এটা একটা সুলক্ষণ। সমাধান ভিন্ন ধরনের হওয়া সম্ভব, সম্ভব পারলৌকিকতার সঙ্গে পার্থিব দায়িত্ব পালনের সুসংগতি। আমাদের দেশে সম্প্রতি মহান্ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। তিনি মোক্ষেরও উপরে স্থান দিয়েছিলেন দুর্গত মানবের সেবাকে।

সম্প্রতি আমার সুযোগ ঘটেছিল জাপান যাত্রার। সেখানেও প্রায় ভারতবর্ষের কাছাকাছি সময়েই পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা শুরু হয়। জাপান এখন একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত, তার অগ্রগতি সারা পৃথিবীর বিস্ময় ও প্রশংসার বস্তু। আমি তাই সাগ্রহে এ সুযোগ গ্রহণ করি এবং টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত 'আধুনিক জীবনে বিজ্ঞানের স্থান' বিষয়ক আলোচনাসভায় যোগ দিতে যাই। সেখানে গণিতবিদ্, পদার্থবিদ্, জীববিদ্ ও দার্শনিক এবং বহু বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। এঁদের অধিকাংশই জাপানি — কিছু ছিলেন বিদেশি, যেমন আমেরিকার এক দার্শনিক ও যুগোস্লাভিয়ার এক গণিতবিদ্। আমি ভেবেছিলাম এ ধরনের আলোচনা সভায় আমরা কোনো বিদেশি ভাষারই শরণাপন্ন হব। কিন্তু পৌঁছানোর পর আমাকে বলা

হল যে, অধিকাংশ জাপানি বিজ্ঞানী ইংরেজি, হয়তো বা তার উপরেও আরও কয়েকটা ভাষা বুঝতে পারলেও — অনেক সময়েই তাঁদের সব ভাষার বই পড়তে হয় — সারা দেশ জুড়ে শিক্ষা চলে জাপানি ভাষার ভিত্তিতে এবং আমাকে তৈরি থাকতে হবে আলোচনা সভায় প্রধানত জাপানি শোনার জন্যই। আমি অবশ্য একজন দোভাষীর সাহায্য পাব, যাঁর কাজ হবে আলোচনা সভায় বিভিন্ন বক্তা যা বলবেন তার ভাষান্তর করে দেওয়া এবং আমার পালা যখন আসবে, তখন জাপানি ভাষায় আমার বক্তব্য সহযোগী সদস্যদের কাছে উপস্থিত করা। স্পষ্টতই এই পদ্ধতি বেশ ফলপ্রসূ এবং আমি অবাক হলাম দেখে যে, আধুনিক রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে এক বিশেষ জটিল ও বিমূর্ত আলোচনা অনায়াসেই চালানো হল জাপানি ভাষায় আর আমরা বিদেশিরা যখন বললাম তখন তাঁরা বেশ ভালোভাবেই আমাদের চিন্তাসূত্রটি ধরতে পারলেন ও আমাদের নিবন্ধ সম্পর্কে তাঁদের অনুমোদন বা প্রতিবাদজ্ঞাপক সমালোচনা উপস্থিত করলেন বেশ ধারালো ভাবেই।

জাপানে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গেও দেখা হল। গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, সেখানে পদার্থবিদ্যার আধুনিকতম দিকগুলিও পড়ানো হচ্ছে জাপানি ভাষায় আর তারই পাশাপাশি জাপানি ছাত্রেরা চালাচ্ছেন বহু দুঃসাহসী ও অভিনব গবেষণা। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকেরা নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞানের আলোচনা করেন মাতৃভাষায়। নিশ্চয়ই তাঁরা বহু ধার করা শব্দ (loan words) ব্যবহার করেন কিন্তু তার জন্য তাঁরা মোটেই কুণ্ঠিত নন। খবর পেলাম যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল সম্পর্কে দু'জন ভারতীয় বিজ্ঞানীর ইংরেজিতে লেখা একটি বইয়ের জাপানি তর্জমা হয়েছে। আমায় জানানো হল ওই বইটি বেশ ভালোই বিক্রি হয়েছে — ছয় মাসে প্রায় তিন হাজারের মতো। শুধু জাপানি ভাষাই পড়তে পারেন এমন সাধারণ জাপানিরা পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল জানবার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন এবং হয়তো তাঁরা এ-ব্যাপারে নিরপেক্ষ ভারতীয় মতামতকেই বেশি বিশ্বাস করেন অন্যদের চাইতে। তবু আমাদের দেশে ওই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ইংরেজিতেই লিখে চলেছেন ও তার ফলে তাঁদের দেশবাসীর শতকরা ৮০ ভাগকেই অজ্ঞ রেখেছেন পারমাণবিক ভস্মপাতের বিপদ সম্পর্কে।

অনেক সময়ে বলা হয় যে, ভারতীয় ভাষাগুলিতে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব বাধা সৃষ্টি করতে পারে বিজ্ঞানচর্চায়। আমি বিশুদ্ধবাদী নই; তাই ইংরেজি টেকনিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের ছেলেরা যদি ওই শব্দ সহজেই বোঝে তবে ধার করা শব্দ হিসাবেই তা টিকে থাকবে ও সমৃদ্ধ করবে আমাদের জাতীয় শব্দভাণ্ডার। গোড়ায় বিদেশি উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে এমন বহু শব্দ এখন সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই চালু রয়েছে এবং সেগুলি সহজেই বোধগম্য আমাদের সাধারণ মানুষের কাছেও।

আশা করি বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু শব্দ এমনি ভাবে কাজে লাগানো হবে এবং আমাদের দেশবাসীর বৈশিষ্ট্য অনুসারেই তাদের রূপান্তর ঘটবে শেষ পর্যন্ত।

অনেক সময়েই বৈজ্ঞানিক শব্দের তর্জমা পণ্ডশ্রমমাত্র হয়ে দাঁড়াবে — রেলওয়ে,

রেস্তোরাঁ, কিলোগ্রাম, সেন্টিমিটার, হুইল, লেদ, থার্মোমিটার, বয়লার, কাটার, ইলেক্ট্রন, অ্যাটম, ব্যাক্‌টেরিয়া, ফাঙ্গাস, ডিফারেনসিয়াল কোইফিসিয়ান্ট, ইন্টিগ্রেশন, — এ প্রায় সকলেই বোঝেন। পেপার, চেয়ার, টেবিল তো এখন প্রাত্যহিক ব্যবহার্য জিনিস। দৃষ্টান্ত বাড়ানোর দরকার নেই। আশা করি শিক্ষক ছাত্ররা কোনো বিষয় আলোচনার সময়ে এ ব্যাপারে অনায়াসেই একটা বোঝাপড়া করে নেবেন আর শিক্ষকের দায়িত্ব হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের কাজে ভাষা প্রয়োগের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হালের অবস্থান্তর সম্পর্কে নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখা।

প্রতিপক্ষের সঙ্গে অনেক সময়ে বিজ্ঞানীকে বাধ্য হয়ে বিতর্কে নামতে হয় — লড়াই চালাতে হয় শব্দের হাতিয়ারযোগে। কিন্তু তিনি খুশি হন যখন তাঁর পক্ষে এমন যথাযথ পরীক্ষা চালনার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় যার ফলাফল তাঁর অভিমতের যাথার্থ্য যাচাই করতে পারে।

আমাদের দেশে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়বার পরীক্ষা খুবই বাঞ্ছনীয় যার বিশেষ ঝোঁক থাকবে বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের উপরে এবং যেটি চালানো হবে কোনো ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে। আমার বিশেষ আশা যে, একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সভাপতিত্বে মঞ্জুরি কমিশন এই প্রস্তাবটির প্রতি সদয় হবেন ও একে পূর্ণ সমর্থন জানাবেন।

আমাদের জাতীয় পতাকা জীবনের সর্বক্ষেত্রে উচ্চে তুলে ধরবার জন্য যদি আমরা মিলিতভাবে চেষ্টা করি তাহলে ছোটোখাটো ভুল বোঝাবুঝি ও নির্বোধ ঈর্ষা নিশ্চিতই সহজে দূর করা যাবে। কেবলমাত্র বিদ্যা অর্জন ও জ্ঞানের অগ্রগতিতে সহায়তা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হতে পারে না। জাতি, ধর্ম, মতবাদ, ধনী, দরিদ্র এবং সামাজিক ও বংশমর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ যে মূলত এক, এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচার করতে হবে। শেষ পর্যন্ত মানুষই যে পরম সত্য আমাদের সেই জ্ঞান হোক।

আমি আশা করি, আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটি দীর্ঘকালস্থায়ী এমন যজ্ঞক্ষেত্র হবে যেখানে শিক্ষক-ঋষিরা এবং ছাত্র-ঋত্বিক্‌গণ মিলিত হয়ে প্রচার করবেন, — 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এবং তাঁরা যেন উপলব্ধি করেন আমাদের কবিগুরুর অন্তরের প্রার্থনা :

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস-শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
....
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

☐ *রচনা সংকলন*, ১৩৮৭ (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ)

ব্যর্থতার প্রতিকার

কাজি আবদুল ওদুদ

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ আমাদের সামনে যে-রূপ নিয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাকে অবিশ্বাস করেন। তাঁরা বলেন — হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বহু রকমের পার্থক্য আছে, তার জন্য তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য কম, এ-সব কথা মানা যায়, কিন্তু তাদের যে উৎকট বিরোধ আজ দেশে জেগেছে তার যথেষ্ট কারণ এই ধরনের মনোমালিন্যই নয়, তাদের বিরোধের যা কারণ রাজনীতির ক্ষেত্রে তা সনাতন, তার ইংরেজি নাম Divide and Rule, — এর উত্তর বহুবৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ ভাবে সমস্যাটাকে দেখলে এর কোনো মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যাবে না, কেননা আমরা, অর্থাৎ দেশের হিন্দু ও মুসলমান, বড়ো দুর্বল আর যাঁরা divide and rule করছেন তাঁরা অত্যন্ত সবল, বিচ্ছিন্ন কোনো দিন মিলিতের সঙ্গে বিরোধে জয় লাভ করতে পারে না।

কিন্তু সম্প্রতি তাঁরও মতের পরিবর্তন হয়েছে মনে হয়। অন্তত তাঁর "রাশিয়ার পত্রে" এই কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে ভারতের সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য মুখ্যত দায়ী ভারতের শাসকবর্গ। রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ায় তখন ঢাকার দাঙ্গা হয়। পরজাতির সামনে তাঁর স্বদেশবাসীদের সেই মূঢ়তা ও বর্বরতা তাঁর যে গভীর লজ্জার কারণ হয়েছিল, মনে হয়, তারই জন্য এমন একটি ক্ষোভের সৃষ্টি তাঁর মধ্যে হয়েছিল।

যাঁরা বলেন সরকারি Divide and Rule নীতি দেশের সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য দায়ী তাঁদের মোট বক্তব্য এই — ভারতে এখন হিন্দু কিছু প্রবল হয়েছে, তাকে দমিয়ে দেওয়া রাজনীতির দিক দিয়ে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই নীতি যদি বাস্তবিকই দেশের পরিচ্ছিন্ন শাসন-নীতি হত তাহলে সাম্প্রদায়িক বিরোধে এক পক্ষেরই বেশি জয়ী হওয়া স্বাভাবিক হত। তা অবশ্য হয় নি। খবরের কাগজের কথা যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে বলতে হয়, এই সব বিরোধে কোনো কোনো স্থানে হিন্দু বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোনো কোনো স্থানে মুসলমান বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে, এমন ধরনের দাঙ্গা অনেক সময়ে হয়ে ওঠে হাটের মারামারির মতো; হাটে মারামারি লাগলে কে যে কার শত্রু অনেক সময়ে সেই জ্ঞানই পায় লোপ, কেবল চলে অন্ধ আঘাত আর প্রতিঘাত; কেউ নিরপেক্ষও থাকতে পারে না; সেইভাবে কোনো কোনো সরকারি কর্মচারীর কখনও কোনো পক্ষে ভিড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। আর নারদমনোবৃত্তিসম্পন্ন কর্মচারীও একান্ত দুর্লভ না হতে পারেন। রাজশক্তির তরফ থেকে দেশের অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের অকৃত্রিম উন্নতি চেষ্টা দেশের উন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের মনোদুঃখের কারণ হলেও প্রকৃষ্ট রাজনীতি — ভেদনীতি নয়।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধে স্পষ্ট ভেদ নীতির দোষ শাসকদের না থাকলেও অন্য রকমের দোষ থেকে তাঁরা মুক্ত নন। সেটি হচ্ছে এ দেশের সমাজ ও ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপে তাঁদের ভীতি। সিপাহিবিদ্রোহের স্মৃতি হয়তো তাঁরা মনে থেকে মুছে ফেলবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে ভারতবাসীর মনোভাবে যতটা অন্ধতা ছিল তার প্রভাব তাদের উপরে যে কম হয়েছে একথা স্বীকার করাও তাঁরা হয়তো সুবিবেচনা মনে করেন না। কিন্তু অন্ধতার প্রতিকার অন্ধতার দ্বারা হয় না। এদেশ যদি আচার-প্রধান হয়, অর্থাৎ বিচার এদেশের লোকদের কাছে সমাদৃত না হয়, তবে দেশের শাসন-কার্যের লক্ষ্য হবে সেই সব বিচিত্র আচারকে শুধু বিবদমান হতে না দেওয়া — এ নীতিতে বুদ্ধির পরিচয় থাকলেও দৃষ্টি ও শক্তির পরিচয় নেই। সেই জন্য এ-নীতি শান্তির প্রার্থী হলেও পায় অশান্তিই; কেননা, বিবাদের অবসানরূপ যে শান্তি জীবনে তা লাভ করা সম্ভবপর নয়। জীবনে শুধু লাভ কবা যায় সৃষ্টিধর্মের যে শান্তি, অর্থাৎ দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পরের প্রতি বর্ধমান শ্রদ্ধা, তাই।

কাজেই যাঁরা ভেদনীতিকে দেশের সমস্ত ব্যাধির মূল কারণ বলে বুঝেছেন তাঁদের মত বদলাবার ক্ষমতা আমাদের না থাকলেও তাঁদের মতের বিরুদ্ধে যে যুক্তি আছে সে-কথা বলবার অবসর আমাদের আছে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের যত কারণই থাকুক তাদের নিজেদের বহুকালের বিকৃত বুদ্ধি যে তার মূলে এ কথাটা সূত্র-স্বরূপ ধরে নেওয়া সঙ্গত বৈ অসঙ্গত নয়, কেননা শুধু ইতিহাস নয় বিচার ও আত্মবিশ্বাস এর অনুকূলে। পল্লির খড়ের ঘরে যে আগুন লাগে তার আশু-কারণ হয়তো আগুন ও গৃহস্থের অসাবধানতা, কিন্তু যিনি এর প্রতিকারে অগ্রসর হবেন তাঁর কাজ হবে সহজদাহ্য এই গৃহগুলির সংস্কার! আর এ সংস্কারে গৃহস্থের আগ্রহাতিশয্যই স্বাভাবিক।

হিন্দু ও মুসলমানের বিকৃত বুদ্ধিই যে তাদের বিরোধের মূলে এ চিন্তা আমাদের দেশের গত কয়েক শতাব্দীর শ্রেষ্ঠদেরও। তাঁরা এর নিরাকরণের চেষ্টাও কম করেন নি। তাঁদের সেই সব চেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

হিন্দু ও মুসলমানের সংঘর্ষ এদেশে যখন হয়েছে তাদের মিলনের চেষ্টাও প্রায় তখন থেকে হয়ে আসছে। পাঠান-যুগের অনেক সাধু-সন্তের বাণীতে তার পরিচয় রয়েছে। কিন্তু এ-চেষ্টা বেশ বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে কবীর ও আকবরের মধ্যেই। আকবরের হিন্দু মুসলমানের মিলনের চেষ্টার মূল্য তেমন দেওয়া হয় নি। তাতে অন্যায় তেমন হয়েছে মনে হয় না, কেননা আকবর অপূর্ব প্রতিভার অধিকারী হলেও তাঁর হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়চেষ্টায় খেয়ালিত্ব রয়েছে ঢের। তিনি যে বিভিন্ন ধর্মের কিছু কিছু আচার গ্রহণ করেছিলেন সে-সমন্বয় তাঁর নিজের জন্য, সেটি সকলের হোক এ কামনা তিনি করেছিলেন ভাবা কঠিন। আকবরের ভিতরে কবি-প্রকৃতি ছিল, বিভিন্ন রূপের পূজায় তাঁর সৌন্দর্যবোধ তৃপ্ত হত। এর দাম কম নয়। কিন্তু তাঁর সমন্বয় চেষ্টা মুখ্যত ব্যক্তিগত ব্যাপার বলেই মনে হয়। হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ সম্পর্কে তাঁর বড়ো কীর্তি হচ্ছে অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার—মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠদের বা সর্বযুগের প্রেমিকদের যা সাধারণ ধর্ম।

মধ্যযুগের সমন্বয়কারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান বোধ হয় কবীরের ও তাঁর পরে দাদূ ও

রজ্জবজীর। এক হিসাবে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের শ্রেষ্ঠ সমন্বয় এঁদের চিন্তায়ই রয়েছে। মানুষকে এঁরা সব স্থূল আবরণ উন্মোচিত করে দেখেছেন, আর সেই দেখাই যে সত্যকে দেখা সে-কথা পরম মনোহর ভাষায় প্রকাশ করে গেছেন। তাই তাঁদের চিন্তা সমসাময়িক রূপ যা পেয়েছিলেন তাইই সে সবের চরম রূপ নয়। সব বিক্ষোভের ভিতরে সত্যকে শান্ত হয়ে দেখবার সঙ্কেত এসবে আশ্চর্যভাবে সঞ্চিত আছে।

কিন্তু এঁদের চেষ্টায় যে আশানুরূপ ফল ফলে নি তার কারণ শুধু জনসাধারণের অক্ষমতাই নয়। এই ব্যর্থতার কারণ এঁদের বাণীর ভিতরেই নিহিত আছে মনে হয়। হিন্দু ও মুসলমানের যে বিরোধ দেশে জাগ্‌লো তা শুধু চিন্তা-ধারার বিরোধ নয়, সেই বিরোধের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক রূপও প্রবল। কিন্তু সে-সবের মীমাংসায় এই জ্ঞানীদের দৃষ্টি তেমনভাবে আকৃষ্ট হয় নি। কবীর বল্লেন—বেদ ও কোরআন ভব-বন্ধন স্বরূপ, ও-সবের ভিতরে তুমি কেবল ঘুরপাক খেয়ে মরবে। তাঁর এ কথায় হিন্দু ও মুসলমানের আচার-পূজা যোগ্যভাবেই তিরস্কৃত হল। কিন্তু বৃহত্তর সমাজ-জীবনে আচার অর্থাৎ নিয়ম-কানুন বিসর্জন সম্ভবপর নয়, তাই বেদ ও কোরআনের প্রবর্তিত আচার যদি গ্রহণ করা না হয় তবে অন্য কি আচার গ্রহণ করতে হবে সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ আবশ্যক। বলা বাহুল্য, মানুষের বৃহত্তর সমাজ-জীবনের প্রয়োজন এই জ্ঞানীদের বাণীতে মেটে নি বলে এঁদের বাণীর বিদ্যুৎচ্ছটায় মানুষের অন্তর আলোকিত হয়েছে কিন্তু বিদ্যুতের মতোই ক্ষণকালের জন্য। সে-উপলব্ধিকে সমাজ-জীবনে সার্থক করা যাবে কি উপায়ে সে-সম্বন্ধে তেমন কোনো নির্দেশ না পাওয়ার ফলে প্রাচীন চিরাচরিত পন্থাই তাদের জন্য পন্থা রয়ে গেছে।

উচ্চ চিন্তার এই যে সামাজিক রূপ গ্রহণে কুণ্ঠা, মনে হয় এ ভারতীয় চিন্তার মজ্জাগত দুর্বলতা। একে যদি কেউ ভারতীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য বলতে চান তিনি তা বলতে পারেন। এর স্বপক্ষেও কিছু বলা যে না যায় তা নয়। কিন্তু এ দুর্বলতাই কেননা, শুধু সুবিবেচনা নয় ভয়ও এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। বহুকাল পূর্বে এদেশে বহু জাতি ও সম্প্রদায়ের যে একত্র-সমাবেশ ঘটেছিল তার ফলে আচার-প্রাধান্যের সাহায্যে দেশে শৃঙ্খলা বিধানের চেষ্টা হওয়া বিচিত্র নয়। সেই থেকে আচার-ধর্ম এদেশে যে বড়ো ধর্ম হয়ে আছে তা বার বার কিছু কিছু আঘাত পেলেও মোটের উপর বিশেষ প্রতিপত্তিই সম্ভোগ করে আসছে। মধ্যযুগের জ্ঞানীরাও এদেশের সমাজ-জীবনে হস্তক্ষেপ করতে সঙ্কুচিত হয়েছেন এ কথা বলা যায়। এই আচার-প্রাধান্যের জন্যই এদেশে উচ্চ চিন্তা অনেকটা মানস সৌন্দর্যের ব্যাপার রয়ে গেছে। আর এই সব চিন্তা যে মানসলোক থেকে কর্ম-লোকে পদার্পণ করতে এমন সঙ্কোচ বোধ করেছে সেজন্য অদ্ভুতত্ত্বের সঙ্গে এসবের সংস্রব দুর্লভ হয়নি। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে — একদিন মহাপ্রভু চিন্তিত হলেন এই কথা ভেবে যে যবনজাতি "গোব্রাহ্মণ হিংসা করে মহাদুরাচার", তাদের উদ্ধারের কোনো উপায় দেখা যায় না;তখন হরিদাস বল্লেন তাদেরও মুক্তি অনায়াসে হবে, কেন না হারাম হারাম বলে তারা প্রকারান্তরে রাম নাম উচ্চারণ করে — নৃসিংহ পুরাণে আছে "দ্রংষ্ট্রীদ্রংষ্ট্রাহতে ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ উক্তাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্" (অন্ত্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। এ প্রসঙ্গ বাস্তবিকই চৈতন্যদেবের সঙ্গে হয়েছিল, না নাম-মাহাত্ম্য

সম্বন্ধে এটি ভক্তদের অতি-রঞ্জন, তা বলা শক্ত; তবে "চৈতন্যচরিতামৃতের" মতো একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে এ কথা যে স্থান পেয়েছে এই থেকে অনেকটা বোঝা যাচ্ছে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠদের চিন্তা-ভাবনার ধারা। সত্যকে নানা রকমে বার বার পরীক্ষা না করে পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করার যে মনোবৃত্তি মোটের উপর তা অজ্ঞানতার সঙ্গে আপস। আর সত্যের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক রূপ লাভ না হলে তাকে পরীক্ষাই করা হল না বলা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেশে যে জাগরণ এলো মধ্যযুগের মতন মুখ্যত তা ধর্মান্দোলন একথা আমরা বলতে প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু সেদিক দিয়ে মধ্যযুগের চাইতে এযুগের আন্দোলন দুর্বল কেননা ব্যাপকভাবে মানুষের আত্মিক উৎকর্ষের কথা এ যুগের নায়করা যতটা ভেবেছেন তার চাইতে বেশি ভেবেছেন নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকদের পারমার্থিক ও আর্থিক উৎকর্ষের কথা। (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলেছিলেন বটে, ব্রাহ্ম হিন্দুর অংশমাত্র নয়, কিন্তু সেটি এক অমূল্য মুহূর্তের প্রেরণার ফল, নিজেকে হিন্দু বলে পরিচিত করবার আগ্রহ তাঁরও ভিতরে কম নয়)। হিন্দু-মুসলমানবিরোধের মীমাংসা-চেষ্টা এযুগে হয়েছে গৌণভাবে মুখ্যভাবে নয়। তবু এই গৌণ চেষ্টার মূল্যও কম নয়। দেশের একটি স্থানে যদি প্রকৃত উন্নতি-চেষ্টা চলে তবে তার প্রভাব সর্বত্র সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ-চেষ্টা যে সমাজধর্মী হয়েছিল এজন্য দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ক্ষেত্রে তার মর্যাদা মধ্যযুগের সাধনার চাইতে কম নয় বরং বেশি। সেই চেষ্টা কীভাবে রাজনৈতিক মরীচিকায় বিভ্রান্ত হয়েছে তা আমরা দেখেছি। বাস্তবিক, দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরে যে প্রকৃত সংস্কার-চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল এইই হয়তো হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বলতে যা বোঝায় দেশের সেই দুরবস্থা উত্তরোত্তর অপনোদন করে চলত। এতেই এ সমস্যার মীমাংসা হয়তো হত না, তবু বর্তমানে এ বিরোধ যে ঘৃণিত রূপ ধারণ করেছে তা থেকে দেশ রক্ষা পেত।

দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আত্ম-অন্বেষণ-চেষ্টা অনেকটা রুদ্ধ হলেও হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা বরাবরই হয়ে আসছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সে-চেষ্টা অপ্রবল, কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে তার প্রাবল্য কম নয়। এই চিন্তার ক্ষেত্রে একালের দুজনের চেষ্টাই বিশেষ শ্রদ্ধার্হ — রামকৃষ্ণের ও রবীন্দ্রনাথের।

রামকৃষ্ণদেবের "যত মত তত পথ" বাণী জগতের বিরোধ সামঞ্জস্যের এক বড়ো মন্ত্র বলে কোনো কোনো মনীষী মত প্রকাশ করেছেন। সে চিন্তা-পদ্ধতিতে সত্য-দৃষ্টির চাইতে শুভ ইচ্ছা যে বড়ো একথা আমরা বলতে প্রয়াস পেয়েছি; কেননা পথ নির্দিষ্ট আছে এ সত্য নয়, পথ বার বার আবিষ্কার করতে হয় এইই সত্য — রামকৃষ্ণদেবের পথও চিরাচরিত পথ নয়, আবিষ্কৃত পথ। [দ্র. রামমোহন রায়]। তবে দেশের লোকে যদি অন্তত এই কথাটা বুঝতে পারে যে মানুষ বিচিত্র, মানুষের মতও বিচিত্র, সব এক ছাঁচে ঢালাই সম্ভবপর নয়, তাহলেও বিরোধ-শান্তির অনেকটা সহায়তা হয়। "যত মত তত পথ" কথাটিতে নবসৃষ্টি-প্রবণতা যতখানি তার চাইতে সমাজ ও ধর্মের প্রাচীন রূপের পূজার আগ্রহ বেশি। এর মধ্যে যে কাব্যসৌন্দর্য আছে তাতেই আকৃষ্ট হয়েছে অনেক ভাবুক ব্যক্তির চিত্ত, কিন্তু মানুষ আজ এত কাছাকাছি এসে হাজির হয়েছে যে তাদের দেশকালের পটে সাজিয়ে সাজিয়ে কল্পনার চোখে না দেখে সহজভাবে খোলা চোখে দেখবার প্রয়োজন বেশি হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়-বাদের দুটি ধারা। একদিকে, তাঁকেও বলা যায় "যত মত তত পথ"-বাদী — বিভিন্ন শ্রেণীগত ও দেশগত বৈশিষ্ট্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি শ্রদ্ধাপূর্ণ; আর এক দিকে তিনি বিশেষভাবে সৃষ্টিধর্মী — মানুষকে দেশে কালে বিভক্ত না দেখে এক অখণ্ড বিকাশমান সমাজের সভ্যরূপে দেখেছেন, সমাজ-জীবনে উৎকর্ষলাভ যার জন্য পরম সত্য। তাঁর Religion of Man-গ্রন্থে তাঁর এই মত বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই যে বিকাশ-ধর্মী মানুষ সমাজজীবনে অক্লান্তভাবে সৃষ্টিশীল হয়ে চলা যার জন্য সার্থকতার পথ, এর অভ্যুদয় দেশে না হলে হিন্দু-মুসলমানবিরোধ বলতে আমাদের যে দুঃখ বোঝায় তা দূর হবে না এইই আমাদেরও প্রধান নিবেদন।

এই বিকাশ-ধর্ম অথবা সৃষ্টিধর্ম কী? খুব ঘোরালো না করে সহজভাবে বলা যায় — জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের যে অন্তহীন কৌতূহল সেইটি তার সৃষ্টিধর্ম। শুধু নতুন কিছু করবার ঝোঁককে সৃষ্টি-ধর্ম বলা অসার্থক, কেননা, জ্ঞান সেখানে তেজোহীন। যুগে যুগে মানুষ যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেছে, নূতন নূতন কর্মের উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করেছে, সে-সব তার সৃষ্টিধর্মেরই প্রেরণায়। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে সৃষ্টিধর্মের প্রভাবে মানুষ রাতারাতি আগাগোড়া বদলে গিয়ে অদ্ভুত-কিছু হয়ে ওঠে। হয়তো অন্তরের নূতন উপলব্ধির গাঢ়তার দিক দিয়ে সে বদলেই যায়; কিন্তু আসলে, মানুষ জীবনের পথে ধীরে ধীরেই চলে, একেবারে নূতন হয়ে ওঠা তার শক্তির বাইরে। চারপাশের জীবনের সঙ্গে মানুষ যে নিবিড় যোগে যুক্ত সৃষ্টি-ধর্ম তাকে কখনও অস্বীকার করে না, বরং পূর্ণভাবে স্বীকার করে তাতে ফুটিয়ে তোলে নূতন সম্ভাবনা — আর ক্রমাগত চলে এর কাজ।

এই যে মানুষের ক্ষমতা — পরিবেষ্টনকে নিয়ে নূতন হয়ে ফুটে ওঠা — এ শুধু পরমাশ্চর্য নয় অত্যাবশ্যক, যেমন অত্যাবশ্যক দেহের কোষাণুসমূহের অক্সিজেনসংস্পর্শে প্রতিমুহূর্তে দগ্ধ ও পুনর্গঠিত হওয়া। আর যে-কারণে দেহ-শুদ্ধির এই প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত জন্মে — অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষায় অমনোযোগ অথবা ব্যাপক অমনোযোগ — সেই কারণেই ব্যাহত হয় সমাজজীবনে সৃষ্টিধর্ম। সমাজ-জীবনে এই অমনোযোগ বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করে, এত রূপে যে সে-সবের নামকরণ অসম্ভব — যেমন স্বাস্থ্যের এক নাম কিন্তু ব্যাধির নামের অন্ত নেই — তবে আমাদের দেশে এর বড়ো পরিচয়স্থল হয়েছে ধর্মসম্বন্ধে আমাদের ধারণা। সে-ধারণায় অমনোযোগ, অন্যকথায় চারদিকের জীবনের সঙ্গে সংস্রবের অভাব এবং মোহের প্রভাব, এমন আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছে যে তার প্রাচীনত্ব রীতিমতো সম্ভ্রমের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

হিন্দু-জাগরণ সম্বন্ধে আমাদের আরও আলোচনা করবার আছে। সেই জাগরণ-তত্ত্বেও দেখা যাবে, সেই প্রাচীন অমনোযোগের প্রভাব। হিন্দু-সমাজে সূচিত হয়েছিল এই জাগরণ এজন্য যদি একে হিন্দু-জাগরণ বলতে হয় তবে জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের সাধনার সাম্প্রদায়িক রূপকে অসঙ্গতভাবে বড়ো করে দেখা হয়। তার চাইতে, এ জাগরণে হিন্দুত্ব কতখানি অহিন্দুত্বই বা কতখানি তা বোঝা যাবে যাঁরা জাগ্রত হয়েছিলেন তাঁদের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে। যে সব কর্ম, যে সব চিন্তা, এমন কি যেসব ব্যক্তি থেকে তাঁরা প্রেরণা লাভ করেছিলেন সেসবে হিন্দুত্ব যতখানি আছে অহিন্দুত্ব তার চাইতে মোটেই কম নেই; আর

যাঁরা প্রেরণা লাভ করেছিলেন, প্রগাঢ় স্বজনপ্রীতি সত্ত্বেও, কোনটি হিন্দু কোনটি অহিন্দু এই বিবেচনার দ্বারা তাঁরা প্রেরণালাভের পথে চালিত হননি। বাস্তবিক, যাঁরা সৃষ্টিধর্মী, সত্য ও সৌন্দর্যের প্রেরণা তাঁরা যে জগতের যে-কোনো স্থান থেকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন, দেশ জাতি কাল এর কোনো ব্যবধান তাঁদের জন্য ব্যবধান হয় না, এই দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট কথা আমাদের দেশের অনেক সৃষ্টিধর্মী ব্যক্তিও যে মাঝে মাঝে কেমন করে বিস্মৃত হয়েছেন একথা ভাবলে বিস্ময়ে বিহ্বল হতে হয়। এর মুখ্য কারণ বোধ হয় এই যে সৃষ্টি-প্রবণতা তাঁদের মধ্যে স্বল্পক্ষণস্থায়ী হয়েছে, আর দেশের উচ্চশ্রেণীর ভিতরেও অজ্ঞানতার বহুবিস্তারের জন্য বিচারের পথ তাঁদের মনে হয়েছে দুস্তর।

দেশের একালের এই জাগরণের মূলে যত বিচিত্র প্রভাবের ক্রিয়া আছে সেসব বিস্মৃত হয়ে এবং সমস্ত দেশের জন্য এ-জাগরণ কত অর্থপূর্ণ সেই বৃহৎ দায়িত্বের পাশ কাটিয়ে হিন্দু-সমাজে আরব্ধ জাগরণ যে শুধু হিন্দু-জাগরণ নাম পেল এই মোহ অথবা অমনোযোগ ধর্ম-মোহ নাম পাবারই যোগ্য। ধর্মের যে গোড়ার কথা মনুষ্যত্ব-বোধ তার সঙ্গে মোহের নিত্য-বিরোধ; এ-ধর্ম হচ্ছে দীর্ঘকালের বিচারহীন আচারপ্রিয়তা — সাংসারিক জীবনের প্রচ্ছন্ন ব্যর্থতা-বোধ এই আচার-মোহকে অথবা ধর্ম-মোহকে এমন মধুর করেছে মনে হয়। ধর্ম-মোহই যে এদেশে মানুষের অন্তর্নিহিত সৃষ্টি-ধর্মের ব্যর্থতার প্রতিরূপ তার একটি বড়ো পরিচয় এই যে হিন্দু-জাগরণের প্রতিক্রিয়ায় দেশের মুসলমানদের ভিতরে বিশেষভাবে জাগলো সাম্প্রদায়িক ধর্ম-বুদ্ধি।

কিন্তু ধর্মকে যাঁরা আগাগোড়া মোহ বলেন তাঁদের মত আমরা গ্রহণ করি না, কেননা জীবনের সার্থকতা ধর্ম-বোধে, অর্থাৎ, সত্যে অথবা কোনো আদর্শে সমর্পিতচিত্ততায়। প্রচলিত ধর্ম-সম্প্রদায়গুলোর মধ্যেও এরূপ সমর্পিতচিত্তদের জন্ম হয়েছে। কাজেই এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের হতে হয় — প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়কে মোহ থেকে মুক্ত করে প্রকৃত ধর্ম-প্রীতিতে প্রতিষ্ঠিত করাই কি দেশের চিন্তাশীল কর্মীদের শ্রেষ্ঠ কাজ নয়? এই ভাবেই কি মানুষের সৃষ্টি-ধর্ম বা বিকাশ-ধর্ম সক্রিয় করে তোলা হবে না?

বলা বাহুল্য আমাদের দেশে এতদিন প্রধানত এই চেষ্টাই হয়েছে। তাতে ফল যে হয় নি সে কথা না বল্লেও চলে। কিন্তু ফল হয় নি চেষ্টার দোষেও বটে; দেশের বিভিন্ন ধর্মকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার না করে শুধু এই বিশ্বাসকে পাথেয়রূপে অবলম্বন করা হয়েছে যে সব ধর্মের ভিতরেই জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সত্য নিহিত রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের অর্থাৎ ধর্ম-বিধানের জীবননিয়ন্ত্রণের অধিকার পুরোপুরি স্বীকৃত হয়েছে।

এ-অনর্থের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভবপর হয় যদি ধর্মকে চিরস্থির বিধানরূপে গণ্য না করে আবিষ্কারের বিষয় বলে ভাবা যায়, তাহলে ধর্মগ্রন্থ ও মহাপুরুষ হবেন জগতের চিন্তাশীল ও তাঁদের বাণীর মতো মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু — তার পূজা-আরতির বস্তু নয়। কিন্তু ধর্ম-বিধানের পূজারি যাঁরা তাঁরা তাঁদের সাধ্যানুসারে উদারতম হয়েও এতে স্বীকৃত হবেন মনে হয় না। ধর্মবিধানের উপরে বিচার-বুদ্ধির স্থান দান তাঁদের চোখে ঘোর অধর্ম বলে বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক, যদিও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁরা প্রতিনিয়ত বিচার-বুদ্ধিকে বিধানের উপর স্থান দান করছেন, কেননা বিধানের ব্যাখ্যার পরিবর্তন নিয়তই হচ্ছে।

আমাদের দেশে ধর্মের যা প্রকৃতি তাকে নিছক আচার-পূজা না বলে উপায় নেই, সৃষ্টি ধর্ম তাই তার তরফ থেকে বাধাই বিশেষ ভাবে পায়। এহেন ধর্মকে জীবন-নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া বাস্তবিকই বিপত্তিকর। কতখানি বিপত্তিকর তা বোঝা গেছে মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা থেকে। তিনি প্রত্যেক ধর্মকে এমন পূর্ণাঙ্গ জানেন যে ধর্মান্তর গ্রহণ তাঁর চিন্তার অতীত। তিনি সজাগভাবেই এ-মত প্রকাশ করেছেন। ধর্ম বলতে তিনি যা বোঝেন তার ভিতরে আচারপ্রিয়তা থাকলেও প্রবল বিচার-বুদ্ধি বেশি করে আছে;তাই তাকে জীবননিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া অসঙ্গত বা অশোভন হয় না। কিন্তু তাঁর চিন্তার সেই অভিনবত্বের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি তেমন ভাবে আকৃষ্ট না করে তিনি যে তাদের হতে বলেছেন স্বধর্মে নিষ্ঠাবান্ এতে প্রকৃত ধর্ম-ভাব নয় ধর্মমোহই দেশে প্রবল হবার সুযোগ পেয়েছে। একালের বিবর্ধিত হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য তিনি আংশিকভাবে দায়ী একথা তাই বলা যায়। অসাবধানতা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিপজ্জনক। ধর্মের ক্ষেত্রে যাঁরা তাকে মনে করেন সার্থকতার পথ, এত অভিজ্ঞতার পরে আমাদের বলতেই হবে, তাঁরা ভুল করেন।

কাজেই এই যে সুপরিচিত সিদ্ধান্ত যে হিন্দু হিন্দুত্বে নিষ্ঠাবান্ হলে এবং মুসলমান মুসলমানত্বে নিষ্ঠাবান হলে তাদের মিলন সম্ভবপর হবে এর উপরে যাঁদের নির্ভর তাঁরা সাধু-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েও অন্ধকারে পা বাড়ান। এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে তাঁদের যাচাই করা উচিত — হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব বলতে তাঁরা কী বোঝেন। কিন্তু তেমনভাবে যাচাই করতে গেলে তাঁদের অবলম্বন হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব হবে না, হবে এই দুয়েরই অন্তর্নিহিত সৃষ্টিধর্ম। অন্যভাবে কথাটা বল্লে দাঁড়ায়, হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব অতীতে ও বর্তমানে যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল ও করেছে তাইই সে সবের প্রকৃত রূপ একথা অর্থহীন, তার পরিবর্তে এই সব ধর্ম ভবিষ্যতে কী ভাবে মানুষের জ্ঞান ও কর্ম-শক্তির সূতিকাগার হবে এইই হওয়া চাই হিন্দু মুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোকদেরই বিশেষ সাধনার বিষয়। এই কথাই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই বাণীতে — যা শাস্ত্র তাই বিশ্বাস্য নয়, যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র।*

এই সৃষ্টি-ধর্ম অদ্ভুত বা দুঃসাধ্য কিছু যে নয় প্রতিদিন তা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। মানুষ আরও বড়ো হবে আরও সুন্দর হবে এ বিশ্বাস মানুষের মর্মমূলে। এত যে ধর্ম জগতে প্রবর্তিত হয়েছে, এত বিচিত্র সভ্যতার বিকাশ হয়েছে, এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার হচ্ছে, সৃষ্টি-ধর্ম বা বিকাশ-ধর্ম ভিন্ন এসবের মূলে আর কিসের প্রেরণা থাকতে পারে। তবে, মানুষ সৃষ্টিধর্মী হলেও জাগ্রত ভাবে নয়। জগতের মানুষ একালে প্রায় একপরিবারভুক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সজাগ চেষ্টার পরিমাণ তাই যথেষ্ট বাড়াবার প্রয়োজন।

সৃষ্টি-ধর্মী না হলে দেশের যুগযুগান্তরের সংগৃহীত আচারের দাসত্বই যে দেশের লোকদের জন্য বড়ো হয়ে থাকবে, দেশের মনোজীবন ও সমাজজীবনের নব নব সম্ভাবনা

* পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীও এই অভিমত প্রকাশ করেন : লিখিত শাস্ত্রই পূর্ণাঙ্গ ধর্মশাস্ত্র নয়, ধর্ম হচ্ছে চিরন্তন বিবেক।

তাদের মনে হতে থাক্‌বে দুরাশামাত্র, একথাটা আমরা মহামূল্য জ্ঞান করি বলেই যে-সব চিন্তাশীল বলেন, ভারতের যে বিশেষ প্রকর্ষ-ধারা জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক তারই হওয়া উচিত ভারতবাসীর জীবনের নিয়ামক, তাঁদেরও কথা আমাদের মনে কিছু সন্দেহের উদ্রেক করে। এই চিন্তাধারা যাঁদের তাঁরা খুব বড়ো এই কথাটি বলেন যে-দেশের যে-বহুকালের ভৌগোলিক পরিস্থিতি ও জীবন-ধারা তা সেই দেশের লোকদের স্বভাবেব অঙ্গীভূত হয়ে যায়, সেই স্বভাবের দিকে দৃষ্টি রেখে না চললে স্বভাব সময়ে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেয়। এঁরা আহার-বিহাব পোশাক-পবিচ্ছদ থেকে আরম্ভ করে বিশেষ বিশেষ আদর্শেব অনুসরণ পর্যন্ত জীবনেব সর্বব্যাপারে দেশের লোকদেব যে দেশেব প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে বলেন এ খুব সঙ্গত কথাই বলেন। কিন্তু এই চিন্তাধারাব ভিতরে দুর্বলতা এই যে স্বভাব যে সৃষ্টিশীল আর সেই সৃষ্টিশীলতা মন্দ-গতি হলেও অশ্রান্ত-গতি, মানুষের কোনো দুর্বলতার প্রতি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যেমন তার স্বভাব নয় তেমনি কোনো দুর্বলতাকে চরম দুর্বলতা জ্ঞান করাও তার স্বভাব নয় — এই বড়ো কথাটা এর শ্রদ্ধার বিষয় তেমন নয়। একটু ভাবলেই বোঝা যায়, এই চিন্তার অধিনায়করা বেশ একটি সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করলেও মোটের উপব নির্দেশহীন এঁদের বাণী। ভাবতীয় সংস্কৃতি বলতে কোন সংস্কৃতি বোঝা হবে — বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, মরমী, মোগল অথবা ব্রিটিশ? — যদি এসবের মিশ্রণ হয় তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সে-মিশ্রণ কী কী ধরনের হবে কেন হবে? — এসব প্রয়োজনীয় কথা সম্বন্ধে এঁদের কোনো সদুত্তর নেই। আসলে, এসব কথা যাঁরা বলেন তাঁদের শ্রেষ্ঠরা সৃষ্টিধর্মী, সেই সৃষ্টির ব্যাপাবে তাঁরা ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় থেকে কিছু কিছু প্রেরণা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদের বোঝা উচিত তাঁদের মতো সবাই যে কেবল ভারতের ইতিহাস থেকে প্রেরণা গ্রহণ করবেন এ সম্ভবপর নয়, অপ্রয়োজনীয় এবং কতকটা অসম্ভবও বটে। তাঁরাও কেবল ভারতের ইতিহাস থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেন নি। শুধু বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় নয় জীবনের অনেক ব্যাপারে বিশ্বজোড়া একাকারত্ব একালে যেমন অপরিহার্য তেমনি বাঞ্ছনীয়। এর পরও বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য মানুষের জন্য দুর্লভ হবে না, যেমন এক পরিবারে বহু রুচির লোকের জন্ম হয়, একই ভাষায় বহু মতের সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে।

একালের হিন্দুচিন্তাশীলদের (ভারতীয় না বলে হিন্দু বলাই সঙ্গত কেননা এক্ষেত্রে মুসলমান চিন্তাশীলেরা হিন্দুচিন্তাশীলদের অনুকারী মাত্র) এই যে বৈশিষ্ট্য-প্রীতি এটি ভালো করে বুঝে দেখবার সময় এসেছে। কিছু নব জাতি গঠন — যার সূচনা নানাভাবে বহুকাল ধরে দেশে হয়েছে, দেশের একালের জীবনের জন্য যার প্রয়োজনের অন্ত নেই। মনোজীবন ও রাষ্ট্রজীবন দুই ক্ষেত্রেই অশ্রান্তভাবে চলবে তাঁদের সৃষ্টির কাজ। একালের যে ধর্মসম্প্রদায়গত রাষ্ট্রজীবন সেটি কদাচ তাঁদের সমর্থনের বিষয় হবে না, কেননা, তার ফলে এদেশের অভিশাপ-রূপ জাতি-ভেদ নব নব সম্ভাবনা লাভ করে চল্‌বে;তাঁদের সাধনার বিষয় হবে দেশের জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ, কেননা, তারই ভিতরে নিহিত রয়েছে দেশের রাষ্ট্র-জীবনের, অথবা জীবনের, সত্যকার বিকাশসম্ভাবনা।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞের অভিমত কতকটা এই। তবে মনে হয় তাঁরা বেশি খেয়ালি। তাঁরা যে বলেন যে বৈদেশিক শাসনের ফলে দেশের আর্থিক ও অন্যান্য বহুবিধ দুঃখ যত বেড়ে গেছে সেসব থেকে দেশকে মুক্ত করে তবে তার শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে, এ মোটের উপর চমকপ্রদ কথাই বেশি। এর পরিবর্তে সৃষ্টিধর্মী কর্মীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত জাপানের দিকে। মাঝে মাঝে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ক্ষতি-স্বীকার তার নিয়তি কিন্তু সেই নিষ্ঠুর নিয়তি স্বীকার করে চলেছে তার উন্নতি-চেষ্টা। মহাত্মা গান্ধী তাঁর কোনো এক কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে একবার বলেছিলেন, one step is enough for me এক পা বাড়াতে পারলেই আমি খুশি — কর্মের ক্ষেত্রে এ পাকা কথা। কোনো রকমের মোহ নয়, সত্যাশ্রয়িতা, প্রতিপদে সৃষ্টিধর্মী কর্মীদের অবলম্বন।

ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা নয় জ্ঞান ও জাতীয়তা দেশের লোকদের শরণ্য হবে, নিঃসন্দেহে; কিন্তু জাতি বলতে কী বোঝা হবে? বাঙালি, মান্দ্রাজি, পাঞ্জাবি? — না ভারতীয়? ভারতবর্ষ বহুকাল ধরে একটি দেশ। ভৌগোলিক পরিস্থিতির জন্য ভারতীয় না হয়ে ভারতবাসীর পরিত্রাণও নেই। তবু আপাতত বাঙালি, মান্দ্রাজি ও পাঞ্জাবি হওয়াই বেশি ভালো মনে হয়; কেননা তা বেশি স্বাভাবিক ও কম কষ্টসাধ্য। অবশ্য ভারতীয়ত্বের বিরোধী যে বাঙালিত্ব মান্দ্রাজিত্ব বা পাঞ্জাবিত্ব তা কদাচ কাম্য নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন — ভারতীয় জাতীয়ত্বের রূপ হবে ইসলামদেহ ও বেদান্ত-মস্তিষ্ক। তার চাইতে এই কথা বলাই ভালো ভারতীয় জাতীয়ত্বের রূপ হবে পূর্ণাঙ্গ মানব-দেহ ও পূর্ণাঙ্গ মানব-মস্তিষ্ক, সৃষ্টিশক্তির প্রকাশ যার ভিতরে হবে অবাধ। ইসলাম ও বেদান্ত মানুষের সৃষ্টিশক্তিরই পরিচয়-চিহ্ন। মানুষের সেই সৃষ্টি-শক্তি কোনো দিন নিঃশেষিত হবে না, চিরদিন অক্লান্ত ও অম্লান থাকবে, এইই তার জন্ম-অধিকার। সে অধিকার সত্য হোক।

□ *শাশ্বত বঙ্গ*, ১৯৯৪ (ব্র্যাক, ঢাকা)

সাহিত্যবিচারে মার্কসবাদ

নীরেন্দ্রনাথ রায়

মার্কসবাদের প্রথম প্রস্ফুট প্রকাশ কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণাপত্রে। ১৮৪৮ সাল ইওরোপের ইতিহাসে 'বিপ্লবের বৎসর' বলিয়া খ্যাত। ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইওরোপের বিভিন্ন দেশে গণ-অভ্যুত্থানের তরঙ্গ বহিয়া যায়। ঘোষণাপত্রের তরুণ রচয়িতারা বিপ্লবের পরিণামে সমাজবাদের যে প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই। প্রত্যেক দেশেই বিপ্লব প্রতিবিপ্লবের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। তবুও আজ ঠিক একশত বৎসর পরে পৃথিবীর দেশে দেশে বিপ্লবী জনগণের মধ্যে ঘোষণাপত্রের শতবার্ষিকী প্রতিপালিত হইতেছে। ঘোষণাপত্রের প্রকাশ বিশ্ববিপ্লবের ইতিহাসে স্মরণীয়তম ঘটনার অন্যতম। যতদিন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ধনবাদের উচ্ছেদ ঘটাইয়া বিশ্বব্যাপী সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত না হইয়াছে ততদিন পর্যন্ত এই ঘোষণাপত্রের কার্যকারিতা অব্যাহত থাকিবে, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

একটি ক্ষীণকাঙ্ক্ষ বিপ্লবী গোষ্ঠীর অব্যবহিত করণীয় পদ্ধতির বিশ্লেষণ আজ এই বৃহৎ গৌরব অর্জন করিল কেমন করিয়া; কেমন করিয়া সম্ভব হইল, শতবর্ষ পূর্বে ঘোষণাপত্রের অকস্মাৎ আবির্ভাবের কথা স্মরণ করিলে মনে পড়ে কবির উক্তি — পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ? তাহার কারণ, এই উচ্চতায় অভিরোহণ করিতে মার্কস ও এঙ্গেলস্‌কে প্রথমে পৃথকভাবে ও পরে যুক্তভাবে যে অসামান্য প্রস্তুতির ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছিল তাহা তখন ছিল মেঘাবৃত, লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢাকা। একশত বৎসরের ইতিহাস এই বিরাট যুগ্ম প্রতিভার বহুমুখীন কৃতিত্বের রহস্য ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে, যাহার আয়োজনে ও সার্থকতায় লেনিন ও স্টালিনের নাম সর্বাগ্রগণ্য। তত্ত্ব হিসাবে আজ যাহা মার্কসবাদ বলিয়া পরিচিত তাহা প্রধানত এই চারি মহাপুরুষের অভূতপূর্ব প্রতিভার অবদান। এখন ইহা প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত যে মার্কসবাদ মাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মপন্থায় নয়, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাজগতেও যুগান্তর প্রবর্তন করিয়াছে, যদিও এই পরিবর্তনের পরিমাণ সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে বিতর্কের অবধি নাই।

মার্কসবাদীর মতে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (মার্কসবাদের দার্শনিক অভিধা) একটি পরিপূর্ণ বিশ্ববীক্ষা। ইহাতে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক অভিব্যক্তির স্বতোবিরোধহীন এবং পরীক্ষা-নির্ভর বিবৃতি পাওয়া সম্ভব। ইহা হেগেলের বিশ্ববীক্ষা হইতে উদ্ভূত হইয়াও তাহার ঐকান্তিক নিরাকরণ। হেগেলের উদ্ভাবিত দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ইহাতে অঙ্গীকৃত, কিন্তু তাঁহার ভাববাদী সিদ্ধান্তগুলি ইহাতে অস্বীকৃত। বস্তুবাদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি

মার্কসবাদে জড়বাদী বিজ্ঞানকে ও ভাববাদী দর্শনকে সমন্বিত করিয়াছে। মার্কসবাদ, এক কথায়, দার্শনিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দর্শন। এঙ্গেলস্, লেনিন, কড্ওয়েল ছিলেন বিজ্ঞানে পারদর্শী; আর লাঁজভ্যাঁ, কুরী, হলডেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রয়োগে বিশ্বাসবান।

যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে মার্কসীয় দর্শন সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার পূর্বে একটি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে যাহা সকল দর্শনের মূলপ্রশ্ন — কে আগে, জড় না চৈতন্য? অর্থাৎ চৈতন্য হইতে জড়ের উদ্ভব, না জড় হইতে চৈতন্যের? বলা বাহুল্য, নিছক তর্কের দ্বারা এ প্রশ্নের সমাধান হয় না। এই ধরনের তর্কযুদ্ধের একটি উপাদেয় বর্ণনা পাওয়া যায় আনাতোল ফ্রাঁস-এর একটি উপন্যাসে :

> One camp maintained that before there were apples there was The Apple; that before there were jackanapes there was The Jackanapes; that before there were lewd and greedy monks there were The Monks, Lewd-ness, and Greed; that before there were feet to kick and backsides to be kicked, The Kick in the Arse existed from all eternity in the bosom of God.
>
> The other camp replied that on the contrary apples gave man the idea of The Apple, jackanapes the idea of The Jackanapes, monks the idea of Monk, Greed and Lewdness, and that the kick in backside existed only after having been duly given and received.
>
> The players grew heated and came to fisticuffs. I was an adherent of the second party which satisfied my reason better.

আনাতোল ফ্রাঁস-এর মতো মার্কসবাদীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও যুক্তিপ্রয়োগের পক্ষ সমর্থন করে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যান্ত্রিক জড়বাদ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যান্ত্রিক জড়বাদ জড় ও চেতনের পরস্পর প্রভাবশীলতা স্বীকার করে না, ও তাহাতে বিবর্তনজনিত অভিব্যক্তির স্বীকৃতি নাই। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে, চৈতন্য জড় হইতে উদ্ভুত হইয়াও জড়ের উপর প্রতিঘাত ও তাহাকে পরিবর্তিত করিতে পারে। এই মতানুসারে জড়ের জড়-প্রকৃতি সনাতন নয়, তাহারও বিবর্তন আছে। অ্যাটমেরও আছে ইতিহাস। সে ইতিহাস অলৌকিক নয়। তাহাও বিবর্তনবিধির নিয়মাধীন। জড়েরও অন্তরে আছে দ্বন্দ্ব যাহা তাহাকে নিয়ত ঠেলিতেছে পরিবর্তনের অভিমুখে। এই গতিশীলতা, নিয়মানুগ পরিবর্তনশীলতা, মার্কসবাদীর মতে, ইহাই হইতেছে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের চরম সত্য।

মানবের সামাজিক ইতিহাসও বিবর্তনশীলতার সাক্ষ্য দেয়। মানুষ সামাজিক জীব। তাহাকে সমাজ বাঁধিতে হইয়াছে জীবিকা-নির্বাহের তাড়নায়। জীবিকা-নির্বাহের জন্য যন্ত্র

ব্যবহারের প্রয়োজন। প্রকৃতিদত্ত আহার্য আহরণের পরিবর্তে মানুষ যেদিন যন্ত্র বা হাতিয়ারের সাহায্যে খাদ্য উৎপাদন করিতে শিখিল সেদিন হইল পশুত্ব হইতে পৃথক মনুষ্যত্বের সূত্রপাত। যন্ত্রের সাহায্যে সে শিখিল প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে। প্রকৃতির সহিত এই সংগ্রামে সে শিখিল তাহার ইচ্ছার বাহিরে আছে প্রকৃতির নিজস্ব সত্তা। প্রকৃতিতে কেমন করিয়া ঘটনাদি ঘটে ও কেমন করিয়া তাহাদিগকে ঘটাইতে পারা যায় — ইহা লক্ষ্য করিতে করিতে সে চিনিতে শিখিল প্রাকৃতিক হেতুবিধির আভ্যন্তর অবশ্যম্ভাবিতা। ক্রমে সে শক্তি অর্জন করিল প্রাকৃতিক বিধিকে নিজের উদ্দেশ্যসাধনে প্রযোগ কবিবাব। প্রকৃতিব দাস না থাকিয়া সে প্রকৃতির প্রভু হইয়া দাঁড়াইল।

উৎপাদনের জন্য এই যে পরিশ্রম আদিম যুগে তাহা ছিল সামূহিক, গোষ্ঠীবদ্ধ। অনেক হাতকে এক সঙ্গে খাটিতে হইত, তাহার জন্য প্রয়োজন হইল ইচ্ছাজ্ঞাপনের। পশুর মতো চিৎকার তাহাতে যথেষ্ট না হওয়ায় মানুষের কণ্ঠস্বর হইল স্পষ্টতর ইচ্ছা-দ্যোতক। উৎপাদনের এই পদ্ধতি হইতে ভাষার উৎপত্তি। ভাষার শ্রেষ্ঠতম ব্যবহার কবিতার ছন্দ-স্পন্দে। তাহাও উৎসাবিত হইয়াছে জীবিকা সংগ্রহের সামূহিক প্রচেষ্টা হইতে, বহু ভাষাবিজ্ঞানী ইহা স্বীকার করেন। মার্কসবাদী ভাষার ও ছন্দ-স্পন্দের অলৌকিক আবির্ভাবে বিশ্বাস করেন না।

ভাষা সাহিত্যের বাহন। ভাষা মানুষের ভাবপ্রকাশের ও জ্ঞাপনের মাধ্যম। ভাষার তারতম্যের উপরে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের গুণাগুণ নির্ভর করে। কিন্তু মার্কসবাদী সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে। তাহার মতে, সাহিত্য সৃষ্টি করিবার সময়, বা কেবলমাত্র সাহিত্যের রস সম্ভোগ করিবার সময়, কেহ সমাজতাত্ত্বিক না হইয়া নিছক সাহিত্যিক থাকিতে পারেন। কিন্তু যখনই উপভোগের সীমা পারাইয়া বিচারের ক্ষেত্রে উপনীত হইতে হয় তখনই প্রয়োজন হয় সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির। কোনো কিছুকে বিচার করিতে গেলে তাহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। সাহিত্য সমাজের অভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টার ফল, মুক্তা যেমন শুক্তির। তাই সাহিত্যের বাহিরে দাঁড়ানোর অর্থ, সমাজের ভিতরে আসিয়া দাঁড়ানো। এই সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই সাহিত্যের বিচার ব্যক্তিগত উপভোগ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। সাহিত্য বিচারে প্রয়োজন হয় মূল্যজ্ঞান নিরূপণের। কোনো ব্যক্তির পক্ষে সাহিত্যিক মূল্যজ্ঞানের পদ্ধতি তাহার বিশ্ববীক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রের মূল্যজ্ঞানের পদ্ধতি হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না। তাই মার্কসবাদীর সাহিত্যবিচার দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদেরই অঙ্গ — সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ।

মানুষের সমাজ স্থিতিশীল নয়, চলিষ্ণু। এই চলার মূলে আছে সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। বর্তমান কাল হইতে অতীতের যতদূর পর্যন্ত লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। শ্রেণীসংগ্রামই মানবসমাজের গতিশীলতার প্রধান উৎপাদক। শ্রেণীসংগ্রাম নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহের উপায়স্বরূপ উৎপাদন-যন্ত্রাবলির বিবর্তনের উপর। এগুলির উপর কাহার কী পরিমাণ কর্তৃত্ব, তাহা দিয়াই শ্রেণী-সম্বন্ধ নির্ধারিত হয়। আদিম গোষ্ঠী-সমাজ প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে ভাঙিয়া যাইবার পর হইতে দেখা যাইতেছে সমাজের একটি অংশের স্বল্পসংখ্যক লোক জীবিকার্জনের হাতিয়ারগুলির

উপর প্রভুত্ব করে ও সমাজের অপর অংশের বহুসংখ্যক লোক তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ পরস্পরবিরোধী না হইয়া পারে না। ইহার এক শ্রেণীর স্বার্থ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে অটুট রাখা, অপরের স্বার্থ ইহাকে বদলাইয়া স্ববশে আনা। এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রেরণায় মানব-সমাজের ইতিহাসে নানা বিবর্তন ঘটিয়াছে। ক্রীতদাস-ও ভূমিদাস-সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে বেতনদাসসমাজ আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। অবশ্য কয়েকটি দেশে সমাজবাদী সমাজেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মার্কসবাদীর মতে, যতদিন বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদী সমাজ — সমাজবাদী সমাজ যাহার প্রথম ধাপ — প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে ততদিন এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের একান্ত সমাপ্তি হইতে পারে না।

সাহিত্য সমাজ-মানসের ভাষাগত প্রকাশ। সমাজ-মানসের বিকাশও যুগে যুগে বিবর্তিত হইতেছে। তাই সাহিত্যেও নানা যুগধর্ম প্রকট। ট্রাইবাল যুগ, ফিউডাল যুগ, বুর্জোয়া যুগের সাহিত্যের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। যাহা সহজে চোখে পড়ে না তাহা হইতেছে ইহাদের উপর শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রভাব। ইহার অভাবে সাহিত্যের মূল্যনিরূপণ ব্যক্তিগত রুচির স্তরে থাকিয়া যায়, বৈজ্ঞানিক বিচারের স্তরে উন্নীত হয় না। আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে উৎপাদনের শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার অর্থ জীবনধারণের উপায়গুলিকেও নিয়ন্ত্রিত করা। মানুষ সব সময়েই অর্থনৈতিক কার্যে নিযুক্ত না থাকিলেও তাহার সকল কার্যেরই মূলে আছে অর্থনৈতিক প্রভাব। তাহার সকল কার্যের অর্থনৈতিক ফলাফল আছে বলিয়াই তাহার শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত না হইয়া উপায় নাই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এই সংগ্রামে যোগ দিতেই হয়। যেখানে সংগ্রাম চলিয়াছে ন্যায়ের সহিত অন্যায়ের, সত্যের সহিত মিথ্যার, অথবা বিশুদ্ধির সহিত বিভ্রান্তির, কোন্ সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক তাহাতে যোগ না দিয়া পারেন? না দিলে কর্তব্যে অবহেলা করা হইবে, একথাও বলা যাইতে পারে। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে ন্যায়, সত্য, বিশুদ্ধি, অন্যায়, মিথ্যা, বিভ্রান্তি ইত্যাদি ভাবগুলি শ্রেণীদ্বন্দ্বের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; অর্থনৈতিক মানদণ্ড বাদ দিয়া ইহাদের বিচার করা চলে না। যে জীবন হইতে তাঁহারা সৃষ্টি বা উদ্ভাবনার উপাদান সংগ্রহ করেন তাহা সর্বদাই শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রভাবে প্রভাবিত।

মানব-সমাজ বিবর্তিত হইতেছে মানিয়া লইলেই প্রশ্ন জাগে তাহা যে উন্নতির অভিমুখে যাইতেছে তাহার প্রমাণ কি? কোন নীতির মানদণ্ডে বিচার হইবে শ্রেণীহীন সমাজ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের চেয়ে উন্নততর? উত্তরে বলা যায়, বিবর্তন ধারার সেই স্তরকে তাহার পূর্বগামী স্তর অপেক্ষা উন্নত বলা যায় যাহা পূর্বতন স্তরের গুণকে অধিগত করিয়াও নূতন গুণের বিকাশ ঘটাইতে পারে। জীবিত প্রাণীর জৈবিক প্রক্রিয়া সম্যক বুঝিতে গেলে কেবল অ্যাটম বা ইলেক্ট্রনের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। অথচ জীবদেহের অস্তিত্বের জন্য ইহাদের পূর্বাস্তিত্ব অপরিহার্য। মানুষের অস্তিত্ব না থাকিলেও অ্যাটম, ইলেক্ট্রন থাকিতে পারে, কিন্তু অ্যাটম-ইলেক্ট্রন না থাকিলে মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। জীবদেহ জড় জগৎ হইতে উদ্ভূত হইয়াও তাই জড় জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। ইহা এক নূতন প্রকাশ। এ নূতনের অর্থ নয় পুরাতনের রদবদল, ইহা গুণগত উল্লম্ফন,

চৈতন্যের আবির্ভাব। এই চেতন জীব আবার পর্যায়ক্রমে অচেতন জড়বস্তুকে পরিবর্তিত করে;ও সেই সঙ্গে আপন প্রকৃতিতেও পরিবর্তন ঘটায়। এই বিচার অনুযায়ী দেখা যায় মানুষের সমাজও ক্রমিক উন্নতির পথে চলিয়াছে, চলিয়াছে তাহার চরম কাম্যের সার্থকতার পথে। মার্কসবাদীর মতে সামাজিক মানুষের চরম কাম্য এমন একটি সমাজব্যবস্থা যাহাতে ব্যক্তির সহিত গোষ্ঠীর বিরোধ বিলুপ্ত হইয়া সাযুজ্য স্থাপিত হয়, যাহাতে কর্মের প্রেরণা ও কর্তব্যের দাবির মধ্যে সংঘাত না বাধে, যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিমানবের স্বকীয় গুণাবলির চরম বিকাশ সার্বিক সমাজে অগ্রগতির অনুপন্থী হয়। এই সমাজের প্রধান লক্ষণ তাই অর্থের সমবণ্টন বা উপভোগের সুযোগের সাম্য নয়। তাহা তো হইত কেবল পুরাতনের রদবদল। ইহা সমাজ-জীবনে নূতন স্তরের প্রবর্তন, যাহাতে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবে মানুষের প্রকৃতিও বদলাইয়া যাইবে। ইহাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ পাইবে তাহার চরম পরিণতি সার্বিক কল্যাণবোধে। এই সমাজের আর্থিক ভিত্তি হইবে শ্রেণীশোষণের অবসানে, কল্পনাতীত উৎপাদন প্রাচুর্যে, যাহার মূলমন্ত্র — দাও নিজের যতটা শক্তি, নাও নিজের যতটা প্রয়োজন। এই কামনা প্রত্যেক মানুষের অন্তরে অনুস্যূত, অথচ ইহা ব্যর্থ হয় শ্রেণীসংগ্রামের প্রাদুর্ভাবে। যে-সমাজব্যবস্থা যে পরিমাণে এই আদর্শের অনুকূল, সেই সমাজব্যবস্থাকে সেই পরিমাণে উন্নতিশীল বলা যায়। সর্বমানবের স্বোপলব্ধির এই স্বাধীনতার সম্ভাবনা ক্রীতদাস-সমাজ, ভূমিদাস-সমাজ ও বেতনদাস-সমাজের ভিতর দিয়া বিস্তৃত হইয়া চলিয়াছে। এই পথ অতিক্রম না করিয়া সাম্যবাদী-সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই সাম্যবাদী-সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার মানদণ্ডে মার্কসবাদী বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার গুণাগুণ বিচার করে, উন্নতি-অবনতির পরিমাপ করে। পরলোকে স্বর্গের কল্পনায়, ইহলোকে ভগবৎ রাজত্বের কল্পনায়, যুগে যুগে ইউটোপিয়ার কল্পনায় এই কামনাই আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বাস্তবতাকে স্বীকার করিয়াও কোন পন্থায় সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, স্বপ্নকে রূপায়িত করা যায় অভিজ্ঞতায়, তাহার রহস্য মার্কসবাদ খুঁজিয়া পাইয়াছে বলিয়াই আজ তাহার প্রভাব দেশে দেশে বিস্তৃত। সাম্যবাদী সমাজ আজ আর চিন্তা-জগতের আকাশকুসুম নয়, কর্মজগতের স্থির লক্ষ্য। এই লক্ষ্য আয়ত্ত-সাপেক্ষ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মার্কসবাদী কর্মপ্রবণ। তাই তাহার কর্মপ্রেরণা চিন্তাহীন ভীতিপ্রদ কর্মবিলাস হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

সামাজিক বিবর্তনের অমোঘ বিধানে যদি আজ সাম্যবাদী-সমাজ প্রতিষ্ঠা অবধারিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইলে আবার মার্কসবাদী কর্মোন্মাদনার প্রয়োজন কোথায়? যাঁহারা এই প্রশ্ন তোলেন তাঁহারা ইহাতে সমাধানহীন নৈয়ায়িক কূট প্রশ্নের সন্ধান পান। আসলে এই প্রশ্নটির বাস্তব ভিত্তি নাই, নিখাদ কল্পনা-বিলাস। একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাক। রোগী দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন — তোমার আরোগ্য অবধারিত, কিন্তু তোমাকে এই বিধিগুলি পালন করিতে হইবে। রোগী যদি তখন বলে — আমি তো সারিবই, তবে আর নিয়ম পালনের প্রয়োজন কি? তাহা হইলে ডাক্তার বলিবেন — তোমার সারিয়া ওঠা সুনিশ্চিত অন্যান্য কারণের মধ্যে আমার ঔষধ সেবনের ফলে। আমি জানি অসংখ্য লোকে রোগে পড়িয়া ঔষধ খাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। যাহারা বাঁচিতে চায়

তাহারা ঔষধ খায়। ঠিক এমনি ভাবে শ্রেণী-দ্বন্দ্বে প্রপীড়িত জনসাধারণকে মার্কসবাদীরা বলে, যদি তোমরা শ্রেণী-শোষণের অবসান ঘটাইয়া শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাও তাহা হইলে তোমাদিগকে আমাদের কর্মপন্থা অনুযায়ী চলিতে হইবে। তাহারা বিশ্বাস করে শোষিত জনসাধারণ তাহাদের কথা শুনিবে ও পরিণামে বিজয়ী হইবে। এ বিশ্বাস ত্যাগ করার সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে যদি কোনো বিকৃতমস্তিষ্ক রোগীর মতো জনসাধারণ সামূহিক আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হয় তাহা হইলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা — বাচনিক প্রলাপ নয়। শাসক শ্রেণী তাহাদেব হস্তগত প্রভূত শোষণশক্তি বিনাসংগ্রামে হস্তান্তর করে না। এই সংগ্রামের জন্য অপরিহার্য সংঘবদ্ধ কৃতসংকল্প কর্মীর দল। কমিউনিস্ট পার্টি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাহারা বিপ্লবী চেতনার অগ্রদূত ও বিপ্লবী সাফল্যের পথকারক। বিপ্লব যখন আসে তখন আর নিরপেক্ষ বন্ধন-হীনতার অবকাশ থাকে না। শত্রু বা মিত্রপক্ষ বাছিয়া লইতেই হয়। সাহিত্যিক বা শিল্পী বলিয়া রেহাই কোথায়? এ বিপ্লব যে প্রত্যেক সামাজিক ব্যক্তির জীবন-মরণ সমস্যা। তাই বিপ্লবী পর্বে লেনিনের মতো মার্কসবাদী নেতা সাহিত্যিককে ডাকিয়া বলিতে একটুও কুণ্ঠিত নন যে তোমরা যদি জনগণের পক্ষ ও তাহার অগ্রগামী বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন না করো তাহা হইলে অকাট্যভাবে প্রমাণ হইবে তোমরা শোষক শ্রেণীর স্বার্থবহ। বিপ্লবের গতি অসমান; সকল দেশে একই কালে বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়া ওঠে না। কিন্তু যখনই যে দেশে শ্রেণীবিপ্লব দেখা দিবে, তখনই সে দেশের মার্কসবাদী বিপ্লবী নেতা লেনিনের অনুশাসনকে কর্মপন্থার সঠিক নির্ধারক বলিয়া মানিয়া লইতে দ্বিধা করিবে না। সাহিত্যিকের প্রতি মার্কসবাদীর এ অনুশাসন উদ্ভট কিছু নয়। সাহিত্য-সৃষ্টির সামাজিক প্রভাব চিরদিনই স্বীকৃত। তাই পরম সাহিত্যরসিক হইয়াও প্লেটো তাঁহার আদর্শসমাজ হইতে কবিকে সাগ্রহে বিতাড়িত করিয়াছেন। নহিলে যে তাহারা তাঁহার শাশ্বত সমাজে চাঞ্চল্যের কারণ হইতে পারে। তাঁহার শিষ্য তীক্ষ্ণতরদৃষ্টি আরিস্টোটল তাই ট্রাজেডিকে ব্যবহার করিতে চাহেন সমাজমানসের পরিশোধক রূপে, কবির আত্মতৃপ্তির জন্য নয়। গজদন্তমিনারে বাস করিয়া শ্রেষ্ঠ কবির পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায় না — সাহিত্যের ইতিহাসই তাহার লক্ষ্য। মেঘদূতের কবিও রাজসভার নিত্য-সহচর ছিলেন, আর বিরহী যক্ষের বিরহও স্বেচ্ছাবৃত নিঃসঙ্গতা নহে। আমরা বড়ো সহজে ভুলিয়া যাই যে তাহার সুদীর্ঘ বিলাপ প্রিয়াবিচ্ছেদের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ততটা নয় যতটা স্বাধিকারপ্রমত্ত সামান্য অনবধানের ত্রুটিতে সুখের স্বর্গ অলকা হইতে নির্বাসনের জন্য প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে করুণ অভিযোগ। প্রভুশক্তিকে উচ্ছেদ করার সম্ভাবনা তখন দেখা দেয় নাই, প্রতিবাদ করার সামর্থ্যও তখন জাগে নাই, তাই পরোক্ষ অভিযোগ করিয়াই যক্ষকে ক্ষান্ত থাকিতে হয়। তবুও যে মেঘদূত আজও আমাদের মনকে নাড়া দেয় তাহার কারণ রামগিরি প্রবাসী যক্ষের মতো আমরাও আমাদের কামনার স্বর্গ হইতে বঞ্চিত নিজেদের ব্যক্তিগত ত্রুটিবিচ্যুতিতে ততটা নয় যতটা বর্তমান নৈর্ব্যক্তিক প্রভুশক্তির প্রবল প্রতাপে। অতীতের ব্যর্থতার সুর বর্তমানের ব্যর্থতার তন্ত্রীতে অনুরণন জাগাইয়া তোলে। রাজসভার

আড়ম্বরের মধ্যে থাকিয়াও জনগণের ব্যর্থতাকে বিস্মৃত হন নাই বলিয়াই কালিদাস মহাকবি।

সাহিত্যিকের নিকট মার্কসবাদীর দাবি তাই কমিউনিস্ট পার্টির কর্মপন্থার প্রচার নয়, তাঁহার বিশিষ্ট উৎকর্ষ সম্বন্ধে অবহিত থাকা। তাহার মতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য চিরদিন জনবিপ্লবের সমর্থক। জনগণের জীবনকে, তাহার আশাআকাঙক্ষা, তাহার হর্ষশোক, তাহার সাফল্য-ব্যর্থতা প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হইতে পারে না। লেনিনের মতে, আর্ট হইতেছে আত্মেতর বাস্তবের প্রতিফলন। সাহিত্যিকের মানস, মুকুরের মতো, সামাজিক বাস্তবকে প্রতিফলিত করে। নাটকের বৃত্তি সম্বন্ধে হ্যামলেট-এর উক্তির সহিত এ মতের আশ্চর্যরকম মিল আছে। এই প্রতিফলনে, এই অনুচিত্রণে যে সাহিত্যিকের মন যে পরিমাণে প্রকাশধর্মী, তিনি সেই পরিমাণে বড়ো সাহিত্যিক। কোন্ শ্রেণীতে তাঁহার জন্ম ইহাই বড়ো কথা নয়। আসল কথা, সামাজিক বাস্তবকে তিনি কী পরিমাণে যথাযথ রূপ দিতে পারিয়াছেন, তাঁহার ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ দিয়া তাহাকে বিকৃত করেন যাই। এই মাপকাঠির ব্যবহারে সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার অনেকখানি আত্ম-নিরপেক্ষ হইয়া পড়ে — আপরুচিত্বের পরিধি সংকুচিত হইয়া আসে। মনে রাখিতে হইবে, যে প্রতিফলনের কথা এখানে বলা হইতেছে তাহা একান্ত নিষ্ক্রিয় নয়, ফটোগ্রাফির ক্যামেরার মতো। তাহাতে সামাজিক শক্তিগুলি সম্বন্ধে সামাজিক ন্যায়-অন্যায়, ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্বন্ধে উপযুক্ত আবেগ থাকা চাই। নহিলে সাহিত্য পাঠককে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না, সামাজিক ফলপ্রসূ হয় না। হ্যামলেটও যে নাটকের পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য ছিল কর্মপ্রেরণা। এই প্রতিফলনে বিম্বিত হয় সামাজিক সংস্থানের বিচার। ম্যাথু আর্নল্ড-এর সূত্রানুযায়ী ইহাকে বলা চলে জীবনের সমালোচনা, তাঁহার মতে যাহা কবিতার শ্রেষ্ঠ উপাদান। এই প্রতিফলন কথাসাহিত্যে যত স্পষ্ট, কাব্যে অবশ্য ততটা নয়। তাই বলিয়া কাব্যসাহিত্য এই মানদণ্ডের এলাকার বাইরে নয়। কবিতায় প্রথমত থাকে প্রকাশ্য আধেয়, তাহার বিজ্ঞাপিত বিষয়বস্তু। কিন্তু বিষয়বস্তু যাহাই হউক না কেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়া কবি জীবনের সমালোচনা করেন, ইহাই তাহার নিহিত আধেয়। যে কবিতার বিষয়বস্তু দেখিতে বিরাট কিন্তু তাহাতে নিহিত আধেয় অতি সাধারণ, তাহা উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য হইতে পারে না। অথচ সামান্য বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া ব্যঞ্জনায় গভীর নিহিত আধেয় প্রকাশ করিয়া ছোটো একটি গীতি কবিতাও মহৎ সাহিত্যের আসন পাইতে পারে। কবিতাকে, বিশেষ করিয়া গীতি কবিতাকে, এই দিক দিয়া স্বপ্নের সহিত তুলিত করা যায়। স্বপ্নের বাহ্য বিষয়বস্তুর সহিত তাহার নিহিত অর্থের প্রচুর ব্যবধান। তা সত্ত্বেও স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ নিষ্কাশন করা সম্ভব, ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির ইহাই বিরাট কৃতিত্ব। আত্মেতর সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন — এই সূত্রানুযায়ী মার্কসীয় পদ্ধতিতে বিচার করিলে সাহিত্যের, অর্থাৎ কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতির মূল্যবিচার অনেকখানি নির্ভরযোগ্য হইয়া ওঠে। যে কোনো ঐতিহাসিক কালে সামাজিক বাস্তবতার স্বরূপ কি, শ্রেণীদ্বন্দ্বের ভিত্তিতে তাহা নির্ধারণ করা আজ আর কোন বিশেষ কাব্যে তাহা কী ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার বিচারেও একান্ত

আত্মমুখীন হইবার প্রয়োজন নাই। এই পদ্ধতিতে যে সমস্ত মতভেদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে তাহা দাবি করা হইতেছে না। বলা হইতেছে এই পথে সাহিত্য আলোচনা সমালোচকের আপ্তবাক্য না হইয়া বিজ্ঞানপন্থী হইয়া উঠিবে। বিজ্ঞানেও মতভেদ হয়। পরবর্তী সিদ্ধান্ত আসিয়া পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে সংশোধন করে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীর পরিবর্তন হয় না। বৈজ্ঞানিক যে আত্মেতর পরিবর্তনশীল সত্য বিশ্বাস করেন, বৈজ্ঞানিক প্রণালী তাহার সমস্ত ভ্রম ও সংশোধনের ভিতর দিয়া তাহারই নিকটবর্তী করিয়া তুলিতেছে মানুষের জ্ঞানকে। তাই বিজ্ঞানের নিকট অজ্ঞাত অনেক কিছুই আছে, কিন্তু অজ্ঞেয় কিছুই নাই। আত্মেতর অথচ পবিবর্তনশীল সত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস ও তাহার ক্রমিক নিকটগম্যতা — ইহাই হইল বিজ্ঞানের বাস্তবতা।

কিন্তু বিজ্ঞান ও কাব্য এক নয়। বিজ্ঞান চায় সত্যের অনুধাবন কিন্তু কাব্যের কাম্য সুন্দরের প্রকাশ। ইহা সত্য কথা। কিন্তু মার্কসবাদ মানে না যে সুন্দর বলিতে বুঝায় কান্ট-উদ্ভাবিত একটি আত্মিক প্রত্যয়, আত্মেতর বাস্তবতায় যাহার মূল প্রোথিত নাই। মার্কসবাদ ইহাও মানে না যে সুন্দরের সহিত মননের কোনো সম্বন্ধ নাই, সুন্দর কেবলই বস্তুনিষ্ঠ, মানবের কর্মকুশলতার কোনো ঐতিহাসিক প্রভাব যাহার উপর পড়ে নাই, এবং যাহা মানুষের সংবেদনের ও অনুভূতির অতীত। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলি সুন্দর হইতে পারে, নাও হইতে পারে। মানুষের মনে সৌন্দর্য অনুভূতির বিকাশ হয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলির প্রভাবে, উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। আমরা যে পরিমাণে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছি সেই অনুসারে আমাদের সৌন্দর্যবোধও বিবর্তিত হইয়াছে। পর্বতমালাকে মানুষ যখন অধিকার করিতে পারে নাই তখন পর্বতের দৃশ্য ছিল মানুষের নিকট ভয়ের ও ঘৃণার কারণ। সাহিত্যের ও দৃশ্যচিত্রের ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ, ও সেই সঙ্গে সামাজিক জীবনের বিকাশ — ইহারই ফলে মানুষ পৃথক করিতে শিখিল কোন্‌টি সুগঠিত কোন্‌টি কদাকার; তাহা হইতে আসিল সৌন্দর্য, সুষমা ও সমন্বয়ের বোধ। এক্ষেত্রেও মার্কসের প্রতিজ্ঞা প্রযোজ্য যে মানুষ বাহ্য প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিতে গিয়া নিজের প্রকৃতিকেও বদলাইতেছে। দেখা যাইতেছে যে সুন্দর ও কুৎসিত এই বোধ শুধু চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখা বা বস্তুজগতের স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া হইতে জন্মায় নাই। তাহার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে যুগযুগান্তের কর্মশীলতা ও শিক্ষাদীক্ষা। এই সৌন্দর্যবোধের বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইতেছে শিল্পের বিকাশ, ফলিত ও লোকশিল্প হইতে যাহাকে বলা হয় 'বিশুদ্ধ' শিল্প তাহা পর্যন্ত। কারণ সমস্ত শিল্পের মূলে আছে জনসাধারণের উৎপাদনী শ্রমশীলতা।

মার্কসবাদ তাই ফলিত ও স্থায়ী সাহিত্য, বা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও গণসাহিত্যের আত্যন্তিক বিভেদ স্বীকার করে না। ফলিত সাহিত্য তাহাই যাহা সমাজ-বাস্তবের উপরের স্তরের সত্যকে প্রতিফলিত করে বলিয়া মাত্র সাময়িক আনন্দ দিতে পারে, গভীর ভাবে নাড়া দিতে পারে না। সাহিত্যের প্রধান বৃত্তি — শিক্ষা দেওয়া, আনন্দ দেওয়া। নাড়া দিতে পারা, বিচলিত করিতে পারা, ইহাই মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ। সমাজ-মানবের অন্তরে

আছে যে গভীর দ্বন্দ্ব, যাহা বাস্তবজগতের শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফল, তাহাকে যিনি রূপায়িত করিতে পারেন তিনিই পারেন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, মহৎ সাহিত্য, স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করিতে। সে রূপায়ণ অবশ্য কাব্যরীতিসম্মত হইতে হইবে। আঙ্গিকের কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি সামাজিক জ্ঞাপনশীলতা অর্জন করে, যাহা ছিল একের তাহা হইয়া উঠে সাধারণের, তাহার নির্বাচনে অথবা উদ্ভাবনে কবির ব্যক্তিগত প্রতিভার পরিচয়। সাহিত্যের ইতিহাসে যে-কোনো যুগে শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব হয় না। তাঁহারা আসেন সেই সব যুগে যখন সমাজ-বিন্যাসে এক স্তর ভাঙিয়া গিয়া অন্য স্তর উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। তখনকার শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলে সমাজজীবনের গূঢ় অন্তস্তলে যে সকল সমস্যা দেখা দেয় শ্রেষ্ঠ কবির অন্তরে সেগুলি মুকুরিত হয় ব্যারোমিটারের মতো। তাহাকে যখন তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে কাব্যে রূপায়িত করেন তখন তাহা সমদরদী পাঠকের নিকট পথপ্রদর্শক হইয়া ওঠে সামাজিক সত্যের উপলব্ধির পথে। তাহার প্রভাব যত বাড়িতে থাকে, সমাজবিবর্তনে সচেতন কর্মোদ্যম তত দ্রুত হইতে থাকে। শ্রেষ্ঠ কাব্য তাই সমাজবিপ্লবের শক্তিমান সহায়ক, ও শ্রেষ্ঠ কবি বিপ্লবী চেতনার জনক বলিয়া জনসাধারণের পূজার্হ। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্যাদা এই নয় যে তাহা মুষ্টিমেয় জনকয়েকের মাত্র বোধগম্য হইবে। বর্তমান সমাজে তাহাই সাধারণত ঘটিয়া থাকে। তাহার কারণ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্বাভাবিক দুর্বোধ্যতা নয়, জনসাধারণের শিক্ষার অভাব। জনশিক্ষার মান যতই উন্নত হইবে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আদর ততই বাড়িবে, সে সাহিত্য সমকালের হোক বা অতীত কালেরই হোক। সমাজবাদী রাষ্ট্রে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এখন স্পষ্ট করিয়া জানা দরকার সমাজবাদী সংস্কৃতি বলিতে কী বোঝায়। ইহা শূন্য হইতে উদ্ভূত উদ্ভট কিছু নয়, যাঁহারা নিজেকে সমাজবাদী সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ বলিয়া ভাবেন এইরূপ জনকয়েকের মস্তিষ্কপ্রসূতও নয়। মানবসমাজ ধনবাদী, সামন্তবাদী প্রভৃতি অতীত সমাজের শাসনের ভিতর দিয়াই যে জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত করিয়াছে সমাজবাদী সংস্কৃতি তাহারই ঐতিহাসিক পরিণতি। অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত পথ এই লক্ষ্যেই চলিয়াছে ও চলিতেছে এবং চলিতে থাকিবে। অবশ্য তাহাদিগকে যাচাই করিতে হইবে সমাজবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি হইতে।

এই যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য শিক্ষিত সমালোচক ও মার্কসবাদীর মধ্যে ঘটিয়া যায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। ধনবাদের গতিবিধির বিশ্লেষণ করিয়া মার্কস দেখাইয়াছিলেন কী ভাবে অতীতের সমাজব্যবস্থা অনিবার্য গতিতে ধনবাদ প্রতিষ্ঠার অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। আর ধনবাদের প্রগতির যুগে বাস করিয়াও তাঁহার জ্ঞাননেত্রে উদ্ভাসিত হইয়াছিল সেই বিরামহীন বিবর্তনধারা যাহা ধনবাদেরও অবসান ঘটাইয়া সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা করিবে। শুধু শ্রেণীদ্বন্দ্ব মানিলেই মার্কসবাদী হওয়া যায় না, কারণ শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বীকৃতি মার্কসের পূর্বেই হইয়াছিল। মার্কসবাদের বিশিষ্ট লক্ষণ শ্রমিক শ্রেণীর একাধিপত্যের স্বীকৃতি যাহাই কেবল শ্রেণীদ্বন্দ্বের উচ্ছেদ করিয়া সমাজবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। এই সূত্রের উপর নির্ভর করিয়াই লেনিন রুশবিপ্লবকে সমাজবাদী সাফল্য দিতে পারিয়াছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বগ্রাসী ফাশিস্টবাদের পরাজয়ের ফলে এই

একাধিপত্যের রূপান্তর ঘটিয়াছে। এখানকার একাধিপত্য শ্রমিক কৃষক ও বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের সম্মিলিত একাধিপত্য; প্রত্যেক ধনবাদী দেশে ইহারাই হইতেছে সবচেয়ে বিপ্লবী সবচেয়ে অগ্রসর শ্রেণী। সকল রকম সামাজিক অসাম্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে ইহারাই আজ অগ্রণী। ইহারাই আজ সামজবিপ্লবের পতাকাবাহক। এই পরিস্থিতি সম্ভব হইয়াছে অতীতের খ্যাত অখ্যাত লক্ষ লক্ষ বিপ্লবীর প্রচেষ্টায় ও আত্মত্যাগে। যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোনো যুগে সামাজিক অন্যায় ও অত্যাচারের সকল রকম প্রকাশকে ঘৃণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি তখন তাঁহার বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থায় বিপ্লবী শ্রেণীর প্রতিনিধি, শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিচালক। সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া তাই মার্কসবাদী সমালোচক খুঁজিয়া বাহির করেন জনসাধারণের সেই সব প্রবৃত্তিগুলিকে যাহার সাহিত্যিক প্রকাশ হইয়াছে প্রভুশক্তি ও দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাবে; ধর্মের বন্ধ্যাত্ব, নৃশংস অত্যাচার অথবা সুমার্জিত অপমানের প্রতিভাষণে। এই শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া বিশ্বসাহিত্যের বিচার করার অর্থ তাহাকে খণ্ডিত করা নয় বরং এই পন্থাতেই আমরা পাইতে পারি আমাদের ঐতিহ্য-লব্ধ বিপুল উত্তরাধিকারের অন্তর্নিহিত মর্ম ও নির্ণয় করিতে পারি কোথায় তাহার মহত্ত্ব। সেই সঙ্গে বর্তমানের স্পষ্টতর শ্রেণীদ্বন্দ্বের আলোকে আমরা দেখিতে পাইব তাহাতে কোথায় আছে বিচ্যুতি, অবসাদ বা অনিশ্চয়তার দোলানি। ইতিহাসের যে কোনো যুগের সাহিত্যের বিচারে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রভাব স্বীকার না করায় অন্যান্য শিক্ষিত সমালোচকের সহিত মার্কসবাদী সমালোচকের মতভেদ অনিবার্য।

এই বিভেদ প্রখরতর হইয়া ওঠে আধুনিক সাহিত্যের পর্যালোচনায়। ক্ষয়িষ্ণু ধনবাদের সহিত আজ চলিয়াছে বর্ধিষ্ণু সমাজবাদের দুনিয়াজোড়া লড়াই। দেশে দেশে আজ এই প্রশ্ন সকল কর্মপ্রচেষ্টার মূলে, কোন শ্রেণীর হাতে থাকিবে রাষ্ট্রশক্তির ব্যবহার, চিরশোষিত নির্বিত্তের না চিরাতৃপ্তলোভ মহাবিত্তের। এই সংগ্রামে কাহার জয় হইবে তাহাতে মার্কসবাদীর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই এবং তাহার বিশ্বাস এ বিজয় সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার নহে। এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশে দেশে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে একই সংগ্রাম চালাইতেছে। তাহাদের সকল চিন্তা, সকল কর্ম একই লক্ষ্যে কেন্দ্রিত। তাই তাহারা পাইতেছে বিশ্বব্যাপী শোষিত জনসাধারণের উত্তরোত্তর বিবর্ধমান সমর্থন। তাহাদের শক্তির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটিতেছে। তাহারই সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধতর করিতেছে জাতীয় আধারে সমাজবাদী আধেয়ের প্রবর্তনে। যে দেশে সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা প্রাণবান — যেমন পরাজিত ও পুনর্মুক্ত ফ্রান্সে — সেখানে সংস্কৃতিজীবীর পক্ষে তিনটি মাত্র পথ খোলা থাকে — কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত হওয়া, তাহার সহিত মৈত্রীভাবে চলা, ও তাহার প্রবল বিরোধিতা করা। বিখ্যাত লেখক ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক্-এর কমিউনিস্ট বিদ্বেষ বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু হিটলারি শাসনের যুগে তিনিও স্বীকার করিয়াছিলেন — লাঞ্ছিত পদদলিত ফ্রান্সের প্রতি আনুগত্য কেবল তাহার শ্রমিক শ্রেণীই দেখাইতে পারিয়াছে। শিল্পের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার দাবি পিকাসো-র চেয়ে উচ্চকণ্ঠে আর কেহ করিয়াছেন কি?

সেই পিকাসো ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ও তাঁহার মতে — চিত্রকলা হইতেছে শত্রুর সহিত আক্রমণ ও আত্মরক্ষণ যুদ্ধের হাতিয়াঁর। লুই আরাগঁ বিপ্লবের পূর্বযুগে ছিলেন আত্মকেন্দ্রিক সুর-রিয়ালিস্ট্ কবি। পরে তিনি সমাজবাদে আকৃষ্ট হন ও মৈত্রীভাবে চলেন। হিটলারি লাঞ্ছনার ফলে তিনি হন কমিউনিস্ট পার্টির গুপ্তনেতাদের অন্যতম। কবিতার ক্ষেত্রে আজ তিনি ফরাসি দেশে সবচেয়ে আঙ্গিক-কুশলী ও সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি, ইহা আপতিক ব্যাপার নহে। ফরাসি সংস্কৃতির ঐশ্বর্যবান ঐতিহ্যকে আয়ত্ত করিয়া তাহার রূপান্তর সাধনের উজ্জ্বল উদাহরণ লুই আরাগঁ।

ইংলন্ডে শ্রেণীসংগ্রাম এখনও তেমন প্রবল হয় নাই; তাহার সাহিত্যের স্রোতেও তাই আর জোয়ার নাই। অথচ এই ইংলন্ডেই ফিউডাল সমাজ-বিন্যাস ধ্বংস করার প্রথম সফল প্রচেষ্টা রূপায়িত হয় বিশ্বের বিস্ময় এলিজাবেথিয় সাহিত্যে। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী যুগের ইংরাজ কবিরা ক্ষীণকণ্ঠ, কায়াহীন, হতাশা ও বিভ্রান্তির মোহগ্রস্ত। যে সামাজিক পরিবেশে তাঁহারা স্থাপিত তাঁহাকে সানন্দে গ্রহণ করিতে তাঁহাদের ন্যায়বোধ ও সৌন্দর্যবোধ হয় পীড়িত, অথচ যে পথে তাহার প্রতিকার তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত। তাই তাঁহাদের কাব্যে না পাওয়া যায় দীপ্ত বুদ্ধির প্রখর প্রকাশ, না পাওয়া যায় দৃপ্ত মনুষ্যত্বের অপরাজেয় বাণী। ইহার ব্যতিক্রম পাওয়া যায় অন্তত একটি কবির কাব্যে — জন কর্নফোর্ড, যে একুশ বছরের তরুণ কমিউনিস্ট প্রাণ দিল স্পেনের গৃহযুদ্ধে।

কর্নফোর্ড-এর উল্লেখ স্বভাবতই মনে পড়ে আমাদের দেশের সুকান্ত-র কথা, যে কুড়ি বছরের তরুণ কমিউনিস্ট দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রাণ দিল যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে। যে কবির লাগি বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ কান পাতিয়া ছিলেন, সুকান্তকে বলা যাইতে পারে তাহার প্রতিভূকল্প। অস্ফুট যৌবন হইতে শুরু করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বাংলা দেশের সমাজ-মানসের চেতনা বিবর্তনের ইতিহাস পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, বাণীমূর্তি দিয়াছেন অতুল কাব্য-সম্পদে। কিন্তু ১৯১৯-এর পর হইতে যে সমাজবাদী চেতনা বাংলা দেশে বীজরূপে উপ্ত হইয়া ক্রমশ প্রসারলাভ করিল রবীন্দ্রনাথ তাহাকে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। বোধ হয় সে বয়সে তাহা কাহারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবুও একটা মৌলিক পরিবর্তন যে আসিতেছে তাহার অনুভূতি তাঁহার কবি-চিত্তকে আলোড়িত করিতে ছাড়িত না। তাই তাঁহার শেষ বয়সের কাব্যে পাওয়া যায় এক নূতন আকুতির সুর যাহা তাঁহার পূর্বজীবনের জীবনদেবতার লীলা সম্বন্ধে আকুতি হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। বাংলাদেশের সমাজবিপ্লবীরা বৃদ্ধ কবির এই সংবেদনশীলতাকে শ্রদ্ধা করে যেমন তাহারা পূজা করে তাঁহার কাব্যসাধনার পূর্বতন অক্ষয় অবদানকে। কিন্তু যে সমাজ-চেতনা বৃদ্ধ কবির পক্ষে ছিল আয়াস-লভ্য রবীন্দ্রনাথেরই উত্তরাধিকারী হিসাবে সুকান্ত-র ছিল তাহা জন্মগত প্রাপ্তি। ইহাতে বলা হয় না সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য কবি। বলা হয় রবীন্দ্রযুগের পর বাংলা কাব্য যখন মোড় ঘুরিতেছিল তখন সুকান্ত-র কবিতা তাহার দিক্-নির্ণায়ক। ভবিষ্যতের বাংলা কবিতার ধারা কোন্ খাতে বহিবে সুকান্তের কবিতা তাহারই পূর্বাভাস, যেমন বলা যাইতে পারে বিহারীলালের কবিতা ছিল রবীন্দ্রনাথের। হয়তো এ প্রাক্-উক্তি হঠকারিতা

নয় যে ভবিষ্যতের যুগ-ভাস্কর ইংরাজ কবি কর্নফোর্ডকে ও বাংলার কবি সুকান্তকে, আপন আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় সশ্রদ্ধে স্মরণ করিবে কাব্যগগনে পুরশ্চাররূপে। তাহাদের অকাল মৃত্যুতে কাব্যজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত। ইহা শোকের কথা সন্দেহ নাই। তবুও কেমন করিয়া ভুলিতে পারা যায় ইহাই চিরকাল বিপ্লবের মূল্য। যে বিপ্লবের ফলাফলের উপর সারা পৃথিবীর পূর্ণ মুক্তি নির্ভর করিতেছে, তাহার সাফল্যের তুলনায় কি এই মূল্য খুবই বেশি? "এই সংগ্রামের উপর সমগ্র পৃথিবীর মুক্তি নির্ভর করিতেছে। এবং এতটুকু নিরপরাধ রক্তক্ষয় না করিয়া কি এতবড় পুরস্কার লাভ করা যায়?" — ফরাসি বিপ্লবের নিহত নিরপরাধ গুণীজনের সম্বন্ধে মহামতি জেফারসনের এই অভিমত কি বর্তমান বিপ্লবে মার্কসবাদীকে সমর্থন করে না?

□ *সাহিত্য বীক্ষা*, ১৯৮৩

কীর্তন

দিলীপকুমার রায়

বাংলা সঙ্গীতে সবচেয়ে বৃহদঙ্গ সঙ্গীত যে কীর্তন সঙ্গীতসমাজে এ-বিষয় মতভেদ নেই — যদিও কীর্তনের সাঙ্গীতিক মূল্য নিয়ে নানান তর্ক আছে। একে কেউ বলেন লোকসঙ্গীত, কেউ-বা বলেন সেন্টিমেন্টাল সঙ্গীত, কেউ বলেন কথাপ্রধান সুরবৈচিত্র্যহীন সঙ্গীত — কেউ-বা বলেন মহান নাট্যসঙ্গীত। আমরা এই শেষের দলে। আমরা আরও বলি যে যদি বিশুদ্ধ সুরকারু শ্রুতিবিশুদ্ধির মাপকাটি দিয়ে না মেপে মানব-মনপ্রাণআত্মার বহুবিচিত্র গভীব আবেগমূলক নাট্যবাগ প্রেম ও ভক্তির মাপকাটি দিয়ে কোনো জাতীয় সঙ্গীতকে বিচার করতে হয়* তাহলে রবীন্দ্রনাথের মতে সায় না দিয়ে উপায় থাকে না যে, "উচ্চ অঙ্গে ব কীর্তন গানের পরিসর হিন্দুস্থানি গানের চেয়ে বড়ো। তার মধ্যে যে বহুশাখায়িত নাট্যরস আছে তা হিন্দুস্থানি গানে নেই। .... চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম যে-হিল্লোল তুলেছিল সে একটা শাস্ত্রছাড়া ব্যাপার। তাতে মানুষের মুক্তি-পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করতে ব্যাকুল হোলো। সেই অবস্থায় মানুষ কেবল স্থাবরভাবে ভোগ করে না, সচলভাবে সৃষ্টি করে। এই জন্য সেদিন কাব্যে ও সঙ্গীতে বাঙালি আত্মপ্রকাশ কবতে বসল।" (সঙ্গীতের মুক্তি)

কীর্তনকে যাঁরা লোকসঙ্গীতের কোঠায় ফেলেন তাঁদের ভুল এইখানে যে লোকসঙ্গীতের আঙ্গিক ও গঠনপদ্ধতি এত বহুবিচিত্র হয় না, হতে পারে না। বাউল ভাটিয়ালি সারি রামপ্রসাদী এরাই হল যথার্থ লোকসঙ্গীত। কীর্তনের গঠনপদ্ধতিতে যে "বহুশাখায়িত নাট্যরস" আছে, যে মহৎ স্থাপত্যশিল্প আছে, যে ছবি ও সুর, প্রেম ও কাব্য, রূপ ও ভাবের একত্র-সমাবেশ, তাল ও আঁখরের বৈচিত্র্য আছে সে-সবই সঙ্গীতের একটি উচ্চ সাধনার পরিণাম। বস্তুত কীর্তনের নানামুখী সমৃদ্ধির কথা ভাবলে মনে সম্ভ্রম না জেগে পারে না,

* একথা বলছি এইজন্যে যে একই বস্তুকে দৃষ্টিভঙ্গি বা মাপকাঠি দিয়ে মাপলে বিচাবী মনেব বায়ও বিভিন্ন হতে পাবে, এই কথাটি অনেকে ভুলে যান। য়ুরোপীয় সংধ্বনি সঙ্গীতকে (সিম্ফনি) যখন বিচাব করি তখন তার মধ্যে মেলডির দৈন্য থাকলেও মেলডিব দুর্ভিক্ষে তাব শ্রেষ্ঠতা নাকচ করা চলে না। তেমনি বাগসঙ্গীতের বিচারে স্বরসঙ্গতি (হার্মনি) খুঁজে এ-সঙ্গমেব সৌন্দর্য না পেলে বলা চলে না যে বাগসংগীত নিম্নশ্রেণীব সঙ্গীত। উইলার্ড সাহেব একথা বুঝতেন, সেই জন্যে বাব বাব তাঁব বইয়ে লিখে গেছেন যে হার্মনি ও মেলডিকে এক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে গেলেই ভুল হবে। কীর্তন ও বাগসঙ্গীত সম্বন্ধেও ঐ কথা : দুয়ের লক্ষ্য, রস, দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। কাজেই তুলনা কবতে যাওয়াটাই ভুল।

এ সিদ্ধান্ত না করে থাকা যায় না যে, একটা উদার সুরের আলো নেমেছিল প্লাবনের কূলছাপানো কল্লোলে — সে আলো মানব হৃদয়ের আবেগতটে লেগে উচ্ছ্বসিত উচ্ছলিত হয়েছিল প্রেমের তরঙ্গভঙ্গে — যার ফলে দিকে দিকে ছুটেছিল সে গানে তানে, ছবিতে রেখায়, গন্ধে বর্ণে, আঁখরে ভাবে — সর্বোপরি ভক্তিরসের মন্দাকিনী মাধুরী-বন্যায়।

যতদূর জানা যায় কীর্তনের প্রবর্তক — স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে : "বহিরঙ্গসনে নামসঙ্কীর্তন, অন্তরঙ্গ সনে রস আস্বাদন।" এখনও এই দুই শ্রেণীর কীর্তনের চল আছে — নামকীর্তন ও রসকীর্তন। রসকীর্তনের চারটি প্রধান শাখা : গরানহাটি, মনোহরসাহি, রেনেটি ও মন্দারিনি। শেষের দুটি হাল্কা, প্রথম দুটি উদাত্ত গভীর ঠায় লয়ে গেয়। শ্রেষ্ঠ কীর্তন বলতে গরানহাটি মনোহরসাহিই বোঝায়। তবে এ ব্যাখ্যা বা ইতিহাস এ-বইয়ের লক্ষ্যবহির্ভূত। তাই এ-প্রসঙ্গে শুধু নাম কয়টি উল্লেখ করেই সমাপ্তি টানছি — বিশেষ আরও এই কারণে যে কীর্তনের মতন বহুসমৃদ্ধ সঙ্গীতের যথাযথ বর্ণনা এ ছোটো পরিসরে সম্ভবও নয় — এখানে তার দরকারও দেখি না। তাই আমি কীর্তনের ধারা ও আমাদের সঙ্গীতে তার ভাস্বর স্থানটি কোথায় সে-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেই ইতি করব।

কীর্তন সম্বন্ধে প্রথম কথা যেটা মনে আসে সেটা এই যে ওর যথার্থ বিশেষণ হচ্ছে "ক্লাসিক"। তাই ওকে লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে ফেললে জহুরিপনার পরিচয় দেওয়া হয় না। একথা মানি অবশ্য যে কীর্তন লোকপ্রিয় — কিন্তু কীর্তনের মূল্যনির্ধারণে এ-বিচার অবান্তর। কেননা কীর্তন যেজন্যে লোকপ্রিয় সেজন্যে বড়ো নয়। পপুলারিটি বা লোকপ্রিয়তা কোনো বড়ো শিল্পকলার মহত্ত্বের পক্ষে প্রামাণিক নয়। এমন কি, একথাও বোধ হয় অকুতোভয়ে বলা যেতে পারে যে, কীর্তন অধিকাংশ স্থলেই পপুলার হয় তার ছোটো আবেদনটুকুরই জন্যে, তার মাতামাতি, ঝাঁপাঝাঁপি, হৈ হৈ রৈ রৈ এর জন্যে — যেমন হিন্দুস্থানি সঙ্গীতও অধিকাংশ ক্ষেত্রে করতালি পায় তার তালের টঙ্কার, তানের হুঙ্কার, কসরতের বাহ্বাস্ফোট — এককথায় মল্ললীলার জন্যে। সব বড়ো শিল্পেরই অবনতি হয় অরসিকদের অন্ধতায়, অসংখ্য ছোটো গ্রহীতার বহুবিস্তীর্ণ মাধ্যাকর্ষণে। সস্তা আবেদন ব্যাপক, গভীর রস হৃদয়ের অনুভূতির গভীরতার অপেক্ষা রাখে। মানুষ স্বতই চায় আদর, আত্মপ্রতিষ্ঠা। তাই সস্তা পথেই সে নগদ-বিদায়ের জন্যে লুব্ধ হয়ে ওঠে। সুরের, ভাবের, ছন্দের গভীর আবেদন লোকপ্রিয় নয় — অন্তত লোকশিক্ষার ও সংস্কৃতির এ-দৈন্যের যুগে তো নয়ই। ভবিষ্যতে আশা করি জনসাধারণও বিদগ্ধ রসিক, গভীর বোদ্ধা হবেন — কিন্তু সে আশাপূরণ বহুদূর এ নিশ্চয়। তাই উপস্থিত বলা যায় বৈ কি যে, বড়ো জিনিস বড়ো বিকাশ বড়ো আবেদন অন্তত বহুদিন ঠিকমতো গৃহীত আদৃত হবে না, যেজন্যে তারা বড়ো সেজন্যে প্রতিষ্ঠা পাবে না, পাবে অবান্তর কারণে।

যা বলছিলাম : কীর্তনকে পপুলার বলেই বলা হয় প্রায়ই : দেখ, এত লোকের ভালো লাগল, কাজেই এ বড়ো, যা সবাইয়ের ভালো লাগে তাই তো মহৎ — টলস্টয়ও বলেছেন — ইত্যাদি।

কিন্তু এ-কথায় "সবাইয়ের" মনে এ ডিমক্রাসির যুগে আত্মগৌরবের হিল্লোল বইলেও ডিমক্রাসির সস্তা নৌকা যে আজ বানচাল হবার জো হয়েছে একথা সব চিন্তাশীল মানুষই

স্বীকার করছেন। তার শেষরক্ষা হবার তো অন্তত গতিক নয়। কিন্তু সে যাই হোক সর্বসাধারণের কীর্তন ভালো লাগাটাই যে কীর্তনের মহত্ত্বের প্রতিপাদক নয় একথা অপ্রতিবাদ্য। Vox populı, Vox deı একথায় যে মন আর সাড়া দেয় না — উপায় কি? গণতন্ত্রের মহিমা সম্বন্ধে যে স্বপ্ন আমরা দেখছিলাম তা প্রায় ভেঙেছে বৈ কি। যাই হোক্, ফিরে আসি কীর্তনের কথায়।

সবাই জানেন কীর্তন ও বাউল এ-দুযের নাম প্রায়ই একনিশ্বাসে করা হয়ে থাকে। কিন্তু ওদের ভাবগত কিছু সামান্য সাদৃশ্য থাকলেও রূপগত কোনো মিলই নেই — বিশেষ সঙ্গীতবাজ্যে। বাউলই হল সত্যকাব লোকসঙ্গীত। অল্প এব গণ্ডি, অল্প এব কল্পনা, অল্প এব প্রতিভা, অল্প এর উচ্চাশা। এ মিষ্টি, সহজ আবেদনে সুললিত — যাকে ইংরাজিতে বলে ‘প্রেটি’, বাংলায় বলে — চিকণ বা চটকদার। এথেকে যেন কেউ আমাকে ভুল না বোঝেন। বাউল খুবই ভালো জিনিস। কিন্তু বাউল হল একতারা, একমুখী, অল্পসুখী। পক্ষান্তরে কীর্তন হল বহুতন্ত্রী, বহুবল্লভ, বহুঝঙ্কাব, বহুছন্দিত। রেশ ওর অশেষ, সুরের ভাবের সুষমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল — বহুমুখী। নানা বিকাশ-সম্ভাবনার ইঙ্গিতই ওব মধ্যে — প্রাণসম্পদ ওর অজস্র : শুধু কথায নয় — আঁখরে, তানে, তালে,ছন্দে, নাট্য-পরিকল্পনায় ও মহীয়ান্। তাই কীর্তনকেও ক্ল্যাসিক্যাল বা মার্গসঙ্গীতের পর্যায়েই ফেলা উচিত — দেশিসঙ্গীতের পর্যায়ে ফেললে অবশ্য আপত্তি নেই যদি না কীর্তনের গরিমা নাকচ কবা হয এই বলে যে ও মাত্র লোকপ্রিয়। একথা জানা এবং মানা দরকার যে কীর্তন একটি অতি উচ্চবিকশিত সমৃদ্ধ সঙ্গীত — কৌলীন্য শালীনতায় অচলপ্রতিষ্ঠ।

কিন্তু কীর্তনের ক্লাসিসিসম্ বা কৌলীন্য হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের সমশ্রেণীক নয়, ওর জাতই আলাদা। কী জাত ওর? বলি।

ববীন্দ্রনাথ কীর্তন সম্বন্ধে একটি পত্রে লিখেছেন : “বাংলাদেশে কীর্তন গানেব উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানি গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না, সে বন্ধন হোক না সোনার, বাদশাহি হাটে তার দাম যত উঁচুই হোক। অথচ হিন্দুস্থানি রাগরাগিণীর উপাদান সে বর্জন করে নি। সে সমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন সঙ্গীতলোক সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করতে হলে চিত্তের বেগ এম্‌নিই প্রবলরূপে সত্য হওয়া চাই।”

কীর্তন সম্বন্ধে এ হল লাখ কথার এক কথা। কেবল একটি কথা : কীর্তন হিন্দুস্থানি রাগরাগিণীর কাছে হাত পাতে নি : সুরসম্পদে ও একেবারেই স্বকীয় — রাগসঙ্গীতের সঙ্গে ওর নাড়ির যোগ নেই। তবে সে যাক, কবির আসল কথাটি সত্য : যে, কীর্তনের প্রেরণা এল মানুষের অন্তর্নিহিত গভীর ও দুর্নিবার হৃদয়াবেগ থেকে — বাইরের কোনো কলাকারু বা এস্থেসিস থেকে নয়। এর মানে নয় অবশ্য যে, হিন্দুস্থানি সঙ্গীতে হৃদয়াবেগের প্রেরণা নেই। আছে যথেষ্ট। প্রতি মহীয়ান শিল্পে হৃদয়ের, প্রাণের আবেগ থাকবেই নইলে সে শিল্পের কোঠায়ই পড়ে না। কিন্তু হলে হবে কি, হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের যে হৃদয়াবেগ তার ভঙ্গি, ছন্দ, ধারা ও প্রেরণা কীর্তনসঙ্গীতের সগোত্র নয়। হিন্দুস্থানি সঙ্গীতে রাগের রূপ-আল্পনা একটা মস্ত কথা;এত মস্ত যে, সেখানে হৃদয়াবেগ লুকিয়ে আছে রূপের উচ্চ আকুতির পিছনে।

ভাবটা এই যে, রূপ যদি ফোটে তবেই আবেগ সার্থক। কীর্তনে ঠিক উলটো; এখানে রূপ ফুটছে না বলি না — (তাহলে শিল্পই হয় না, যেহেতু শিল্পের কাছে রূপ মস্ত কথা — অন্তত গৌণ তো নয়ই) — কিন্তু প্রাণের ভাবকে হৃদয়ের আবেগকে ছাপিয়ে ও নিজেকে উদঘাটিত করে না। একথা বলতে ঠিক কী বুঝছি সেটা ছন্দের ওরফে তালের প্রসঙ্গে বলি। (একটু টেকনিকাল আলোচনা ক্ষমনীয় — কিন্তু শিল্পের আলোচনায় টেকনিকের আলোচনাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া চলে না যে।)

সবাই জানেন : হিন্দুস্থানি গানের উৎকর্ষের সঙ্গে তার তালনৈপুণ্যের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ধ্রুপদে চৌতাল সুরফাঁকতাল ধামার জাতীয় কল্লোলিত ছন্দকে যদি বাদ দেওয়া যায় তবে সুরের ইমারৎ ধসে পড়ে বললেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। এসব সঙ্গীতের স্থাপত্যশিল্পে তাল বহিরলঙ্কার নয় — ইমারতেরই উপাদান। ধ্রুপদী তালের জলদগম্ভীর কদম, তথা — কনট্রাস্‌টে — বাঁট, আড়ি, কুআড়ির বক্রগতিতে যিনিই দুলে উঠেছেন তিনিই জানেন একথা কত সত্য। মনে আছে ঁবিশ্বনাথ রাও বা ঁঅঘোর চক্রবর্তী বা আমার ধ্রুপদ-গুরু পূজনীয় ঁরাধিকা গোস্বামীর উদাত্ত লয়ে যখন তাঁরা সমে ফিরি ফিরি করতেন — মন আনন্দে উঠত অধীর হয়ে। সে-ছন্দকারুতে কোনো অহঙ্কার নেই, জাহিরিপনা নেই, মাতামাতি নেই — অথচ তবু তাল যেন সুরের সঙ্গে চলেছে হাত ধরাধরি করে, সই পাতিয়ে। পরমহংসদেব বলতেন দুধ ও দুধের সাদা রংকে আলাদা করে ভাবাই যায় না — এ-ও তেমনি। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ধ্রুপদ সঙ্গীতের বাঁধুনিতে তাল ও সুরের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। খেয়াল টপ্পা ঠুংরিতে তালের এই বাঁধাবাঁধি থেকে গান অপেক্ষাকৃত ছাড়া পেয়েছে বটে, কিন্তু তবুও একথা বললে বোধ করি কোনো সঙ্গীতজ্ঞই আপত্তি করবেন না যে, হিন্দুস্থানি গানে — এক আলাপ ছাড়া — তালের সঙ্গে সুরের সম্বন্ধ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ।

কীর্তনে তালের অভিব্যক্তি ঠিক এ-ধারায় হয় নি। এখানে ফের বলি — কেউ যেন আমাকে ভুল না বোঝেন : কীর্তনের তালের বিভূতি নেই এমন কথা বলছি না আমি মোটেই। কীর্তনের তালনৈপুণ্যেও চমৎকারিত্বের অভাব নেই। গরাণহাটি বা মনোহরসাহি কীর্তনের তেওট, মধ্যম-দশকুশি বিলম্বিত ঝাঁপতাল প্রভৃতিতে তালের মাধুর্য হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের ছন্দের মতনই অবর্ণনীয়। কিন্তু তবু হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের তালের সঙ্গে কীর্তনের তালের এই তফাৎ সর্বত্রই লক্ষিত হয় যে, কীর্তনের তাল হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের তালের মতন স্বাতন্ত্র্যবাদী নয়, বহির্মুখী নয়। কীর্তনে তালও সুরের মতনই অন্তর্মুখী — নিজেকে রাখে গোপনেই, চলে যেন অন্তঃশীলা ছন্দে। বড়ো সুন্দর তালের এ-ভঙ্গি কিন্তু সেই জন্যেই আবার অত্যন্ত কঠিনও বটে। কারণ যেখানে তালের লয় আপনাকে পদে পদে জানান দিয়ে যায় সেখানে তাল রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু যেখানে তালের লয় অন্তর্গূঢ় সেখানে তাল রাখাও দুরূহ, তালের রস পাওয়াও কঠিন। তাই বলে এ-তালের সুষমা কবিকল্পনা নয় : এ-ও কংক্রিট, বাস্তব। অর্থাৎ কীর্তনে তালেরও রস পাওয়া যায় — শ্রদ্ধার সঙ্গে শিখলে। এ আমার অনুমান নয় — অন্তরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য। কীর্তনের তেওট দশকুশির ছন্দে অপূর্ব রস পেয়েছি যে।

কিন্তু তবু বলব — কীর্তনের তাল বা ছন্দের রস হিন্দুস্থানি তালের রসের স্বজাতীয় নয়।

এখানে কীর্তনের ছোটো বা চুটকি তালের কথা বলছি না যেমন জপ, ধামালি, ছোটো দুঠোকা প্রভৃতি তাল : বলছি ওর কল্লোলিত বিলম্বিত তালগুলির কথা। এসব তালের রচনা-নৈপুণ্য অতি সুন্দর।

কিন্তু একটু কথা আছে। হিন্দুস্থানি সঙ্গীতে তাল অতি স্পষ্টভাবে সজাগভাবে অলঙ্কৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তালের নানা ভঙ্গি নানা লীলায়ন অতি আশ্চর্য কৌশলে প্রয়োগ করা হয় — তালের ছন্দের দুল্‌কি চালে শিহরণ জাগাতে। এ-ও কম কথা নয়। য়ুরোপে বড়ো বড়ো সঙ্গীতজ্ঞরাও দেখেছি বিস্মিত হতেন আমাদের হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের — বিশেষ করে বিষমপদী তাল-নৈপুণ্যে। তালেব জালবুনুনির যে কৌশল হিন্দুস্থানি সঙ্গীতজ্ঞের নখদর্পণে সে-নৈপুণ্য বিশ্বের বিস্ময়। আলাউদ্দিন খাঁর তালের ইন্দ্রজাল — তার মহিমার তুলনা সত্যই নেই। বিশ্বনাথ রাওয়ের তালের সাধনা ছিল অবিশ্বাস্য। জগদ্বিখ্যাত ফিলাডেলফিয়া অর্কেস্ট্রার নায়ক স্টকভ্‌সকি — যিনি একশো কুড়িটি বাদকের জুড়ি হাঁকান — তিমিরবরণের স্বরোদেব তাল-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে গোয়ালিয়র থেকে লিখেছিলেন আমাকে : "তালে আমরা তোমাদের কাছে শিশু।" এসব কথার অবতারণা করলাম শুধু দেখাতে যে কীর্তনেব তাল ঠিক এ-শ্রেণীর বিস্ময় জাগাবে না। কিন্তু সে প্রত্যাশাই যে ওর কাছে করা অসঙ্গত। কারণ বলেছি, কীর্তনে তাল আত্মবিজ্ঞপ্তি চায়ই না — ছন্দ সেখানেও আছে, কিন্তু অতিপ্রকট নয়। কীর্তনে তাল ও সুর উভয়েই অন্তরের ভাবগাঢ়তার আবেগোচ্ছলতার অনুবর্তী, তাবা বাইরের কোনো কারুকলার কাছে হাত পাতে নি — তার দরকারই হয় নি বলে। — "হৃদয়াবেগ"ই-যে ওর মূল প্রেরণা, ও যে স্বভাবঅন্তর্মুখী সঙ্গীত, ভাবমুখী সঙ্গীতঃ তালে বিস্ময়-জাগানো চমক-জাগানো ওর স্বধর্মই নয় যে। কীর্তনের ভাবঘন অন্তর্লোকে সব আগে ডেকেছিল ভক্তির বান প্রেমের বান — তাই তো ও বাধা মানে নি, সুরে ছন্দে আঁখরে কাব্যে এঁকে বেঁকে যথেচ্ছ গতিতে পথ কেটে বেরিয়ে চলেছে উধাও অসীমের পানে, অকূলের অভিসারে। তাই তো সুর তাল ওর আজ্ঞাবহ — হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের মতন অনুশাসক নয় : পরিচারক, ব্যজনীকার — হিন্দুস্থানি সংঙ্গীতের মতন সখী নয়।

বলেছি, হিন্দুস্থানি সঙ্গীত ও কীর্তনের তুলনা করাই উচিত নয়। এরা দুই আলাদা ধর্মের স্বভাবের সঙ্গীত। অবশ্য হিন্দুস্থানি সঙ্গীত ও কীর্তন উভয়ই উচ্চ-সঙ্গীত — চুটকি-সঙ্গীত নয়। কেবল এ দুয়ের বিকাশধারা আলাদা আলাদা পথ কেটে নিয়ে চলেছে — এদের প্রেরণা আলাদা বলে — লক্ষ্য আলাদা বলে। হিন্দুস্থানি সঙ্গীত চেয়েছে — স্বরশুদ্ধি, ছন্দনৈপুণ্য, রূপকৌশল। কীর্তন চেয়েছে ভক্তির প্রেমের তরঙ্গ — সুরের কল্লোলে, আঁখরের আল্পনায়, ছন্দের অন্তঃশীলা শিঞ্জনে। কেউই কারুর চেয়ে কম নয় — উভয়েই নিজের নিজের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবু যে এ-তুলনা করলাম সে শুধু দেখাতে যে, ওদের লক্ষ্য ভিন্ন — ওরা পরস্পরের সঙ্গী — প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

বলেছি কীর্তনের একটি প্রধান সম্পদ হল ওর নাট্যস্থাপত্যকারু — dramatic architec-tonics – তার কথা না বললে ওর একটি প্রধান কথাই না-বলা থেকে যায়।

এই স্থাপত্যকারুতে কীর্তন জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী — যেমন সুরের অতি-সূক্ষ্মতায় হিন্দুস্থানি সঙ্গীত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এক য়ুরোপের অপেরার সঙ্গে কীর্তনের খানিকটা তুলনা হয় দুই-ই

নাট্যসঙ্গীত-বর্গীয় বলে। কিন্তু অপেরাও কীর্তনের সমকক্ষ নয় ভাব-ব্যাখ্যানে। কারণ অপেরায় যন্ত্রসঙ্গীতই প্রধান — অনির্বচনীয়তাই তার লক্ষ্য। পক্ষান্তরে কীর্তন অনির্বচনীয় হয়েও শুধু সঙ্গীত নয় — কাব্যও বটে। তাই ও বচনীয়ও বৈকি। অপেরার কথা অতি অকিঞ্চিৎকর — আখ্যানভাগ প্রায়ই ছেলেমানুষি। পক্ষান্তরে কীর্তনের কথা অপূর্ব মনোহর, কাব্য উদাত্ত, মর্মস্পর্শী, সনাতন অথচ নিত্য-পুনর্নব।

কীর্তনের কাব্যোৎকর্ষ নিয়ে বেশি বলতে যাওয়া বাহুল্য। কিন্তু এ-কাব্য কী ভাবে যে স্থাপত্যকারুকে অবলম্বন করে মধুব হয়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

ধ্রুপদের স্থাপত্য বিধৃত মূলত সাঙ্গীতিক গঠন-পরিকল্পনায় — আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগ এই চার তুকে সে কখনও উদাত্ত কখনও অনুদাত্ত কখনও বিলম্বিত কখনও জলদ লয়ে অপরূপ সুর-সৌধ-রচনা-বিলাসী। কীর্তনীও কবি, স্থপতি — কিন্তু সে স্থাপত্য রচনা করে কাব্যের নানা ছবিতে — কাহিনিতে — বর্ণনায় — বিশেষ করে আঁখরে। এই আঁখর সম্বন্ধে কিছু বলার চেষ্টা করি।

কীর্তনের একটা প্রধান লক্ষ্য যে আলেখ্যশিল্প একথা বাঙালিকে বলারও দরকার নেই। কিন্তু এ-শিল্প ছবি হলেও সঙ্গীত বলে যেন চলন্ত ছবি গোছের হয়ে উঠল। তখন সে দেখল যে, সব টুকু বাঁধাধরা হলে গায়ক পঙ্গু হয়ে পড়ে। হিন্দুস্থানি মার্গসঙ্গীতে সুরলীলায় — improvisation এ — গায়ক ছাড়া পান সুরের পর সুরে, মিড়ের পর মিড়ে, তালের পর তালে, বাঁটের পর বাঁটে। এই সবেই তাঁর প্রতিভা পায় প্রকৃত সৃষ্টির অবকাশ। কীর্তনী কীর্তনে সৃষ্টির সুযোগ পান প্রধানত আঁখরে। এ-পদ্ধতি জগতের আর কোনো সঙ্গীতেই নেই। এ অপূর্ব, মনোহর। যাঁরা ভালো কীর্তনীর আঁখর শুনেছেন তাঁরা জানেন আঁখর-গৌরবে কীর্তনের ভাব-রস-রূপ সম্পদের শ্রী কীভাবে ফিরে যায়। সামান্য ছবিও আঁখরের আলোতে শোভায় রঙে ব্যঞ্জনায় হয়ে ওঠে দীপ্ত সুষমিত কুসুমিত। একটুখানি ভাবের স্ফুলিঙ্গে আঁখরের বাতাসে যেন যজ্ঞের আগুন ওঠে জ্বলে।

মানুষের মন অন্যমনস্ক — তার চেতনার সজাগ তন্তুজাল থেকে থেকে শ্লথ হয়ে পড়ে, — সে ঘুমিয়ে পড়ে। তাই যা বলতে চাই বলা হয় কই? কীর্তনী একথা জানেন। আরও জানেন — একটি স্থির চিত্রভঙ্গি কথার ঢেউয়ে ঢেউয়ে কীভাবে দুলে ওঠে। আন্‌মনা মনকে জাগাবার জন্যে এই যে ছবির আলোর সঙ্গে সুরের ঢেউ — এরা দুয়ে মিলেই হল আঁখর। তাই বড়ো ওস্তাদের গুণপনার প্রতিভার মাপকাঠি যেমন তাঁর সুরসৃষ্টিতে — বড়ো কীর্তনীর গুণপনার প্রতিভার মাপকাঠি তেমনি তাঁর আঁখর-যোজনায়। মার্গসঙ্গীতে ওস্তাদ দেন সুরের তান — কীর্তনে প্রেমিক দেন কথার তান — আঁখরের তান। এইখানেই তিনি সত্যিকার স্রষ্টা। আর এ-সৃষ্টির ভারা বয় কীর্তনীর প্রেমের গভীরতা ও কল্পনার বিস্তীর্ণতা। শ্রেষ্ঠ কীর্তনকারদের পদাবলীর পদলালিত্য ভাবমাধুর্য এমনি করেই প্রেমিক শ্রোতার মরমে পশে — আঁখরের অমোঘ শরসন্ধানে।

আঁখরের পদ্ধতিটিও বড়ো সুন্দর। যেন অশ্রুত রেশ ধীরে ধীরে শ্রুত হচ্ছে — পূর্বপটে ঔ একটি রং — উষার চাউনিতে ঐ আর একটি জাগল তারই মাথায় — ঐ ঐ আর একটি তার ঠিক পাশে ... এম্‌নি করে

বেখার উপর রেখা জাগে, রঙের উপর রঙ:
মাটি খোঁজে আকাশ-লীলা, আকাশ মাটির ঢঙ।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি ঠিক কী বলতে চাইছি। ধরা যাক্ জ্ঞানদাসের পদাবলী :

কী রূপ হেরিলাম কালিন্দী-কূলে:
অতি অপরূপ কদম্ব মূলে!

কীর্তনী এতে আঁখর দিচ্ছেন। এখানে অনুধাবনীয় কীভাবে আঁখর বিকশিত হয়ে উঠছে — ছোটো থেকে হচ্ছে বড়ো, সূক্ষ্ম থেকে স্পষ্ট, আভা থেকে আলো (এ-আঁখরগুলি আমার কীর্তনগুরু শ্রীনবদ্বীপ ব্রজবাসী মহাশয়ের কাছে পাওয়া।

ওগো	দুটি আঁখি—
আমায়	সবে দিলে দুটি আঁখি—
বিধি	দিলে দিলে দুটি আঁখি—
আমি	তাই বলি—সে কেমন বিধি?
হায়	দিলে বিধি দুটি আঁখি—
কেন	তাতেও আবার নিমিখ দিলে।
সখী,	যে হেরিবে কৃষ্ণানন—
তারে	কোটি নয়ন দেয় না কেন?

কী সুন্দর! কে জানত — কালিন্দীকূলে নবঘনশ্যামকে দেখে কবির অন্তর এ-হেন দুকূলভাঙা প্রেমের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে — এমন করে জানতে চায় সে-আনন্দের বেদনা — তৃপ্তির মাঝেও তৃষ্ণার আকুতি — তবু কাঙাল মন চায় সে তৃষ্ণাকেই করতে জপমন্ত্র।

ইংরাজিতে যুক্তিবাদীরা বলবেন — অতিশয়োক্তি, হাইপার্বোল! কিন্তু সত্যিই কি তাই? ভালো যে একবারো বেসেছে সে জানে যে প্রেমের উদ্বেল মুহূর্তে চিত্তাকাশে যখন রঙের আগুন লাগে তখন নগণ্যতমও হয় সে-আলোর শরিক। হায় রে, আমাদের আধার অপটু — রাখতে পারে না এ-আলো। নেমে আসে বাস্তব দৈনন্দিনতার ছায়ার পাখা, আমরা বলি — উচ্ছ্বাস, হাইপার্বোল! কিন্তু প্রেমের চেতনার ভুল হয় নি তো: সে যে দেখেছিল তাই না মজেছিল — তাই না খেদ করেছিল কোটি, আঁখির অভাবে! কিন্তু আশার কথা এই যে এ-উপলব্ধি না হলেও, যুক্তি তিরস্কার করলেও, এর রঙ আমাদের কল্পনাকে তোলে রঙিয়ে। তাই তো এ-অতিশয়োক্তিকে যুক্তির অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখতে এতটুকু সাধ যায় না — মন আর্দ্র হয়ে মেনে নেয় যে সে ভুবনমোহনের কান্তি যদি চোখে সত্যই পড়ত তাহলে এমনি কান্নাই উঠত জেগে, রোমে রোমে জাগত ঐ কোটি নয়নেরই আকাঙ্ক্ষা। এইখানেই না কাব্যের সার্থকতা, শিল্পের ইন্দ্রজাল — অনিবার্যতা — inevitability : গভীরে আমরা কী দেখি, কী গাই আমরাই কি জানি উপর-উপর-ভেসে থাকার মুহূর্তে? কবির আছে তৃতীয় নয়ন, তৃতীয় শ্রুতি — তিনি দেখতে পান শুনতে পান এ-অগম দর্শনের, এ-গহন গানের রেশ — ধরিয়ে দেন, দেখিয়ে দেন কোন্ দোলায় কী কাঁপন জাগা উচিত — আমাদের প্রাণের বাষ্পলোকে করেন বিদ্যুৎকটাক্ষ — অম্নি ছায়া-চেতনার দিগন্ত অবধি

ফেটে পড়ে আলো — আবেগের আলো, আনন্দের আলো, অঙ্গীকারের আলো — আর ঘুমন্ত মনের মাটিও জেগে ওঠে আশ্চর্য ভূমিকম্পে! আঁখরে সত্য কবি-কীর্তনী পারেন এই ভূমিকম্পের স্পন্দন জাগাতে।

আর শুধু কি আঁখরে? কত বিরহে মিলনে, আবেগে উচ্ছ্বাসে, পূজায় নিবেদনে কীর্তনের উচ্ছল প্রেম চেয়েছে নাট্যসঙ্গীতের আদিগন্ত রূপসাগরে ভাবের খেয়া বেয়ে চলতে — শরণার্থী ও শরণ্যের হাস্যালাপে, অশ্রুব্যথায়, রাসে ঝুলনে, গোষ্ঠে ব্রজে, যমুনাতটে কদমতলায় — সে কী ছবির পর ছবির সমারোহ, আশার পর আশার শোভাযাত্রা, স্বপ্নের পর স্বপ্নের জয়ধ্বনি! অপেরা কোথায় পাবে আধ্যাত্মিক প্রেমের এ অফুরন্ত ঐশ্বর্য, সান্তের সঙ্গে অনন্তের এ অপরূপ সাযুজ্য-রহস্য, সাঙ্গহীন স্বার্থবিলোপে আত্মার পরমার্থলাভের এ অতৃপ্ত পিপাসা?

তবে এখানে একটা কথা ভুললে অপেরার প্রতি অবিচার হবে : যে, আধ্যাত্মিকতা অপেরার লক্ষ্যই নয় — সে মূলত ঐহিক, দৈবিক নয়। তাছাড়া একথাও মনে রাখতে হবে যে, অপেরা হল ওদের দেশের সঙ্ঘবাদী জীবনের অভিব্যক্তি — যার গোড়াকার কথা হল ব্যূহরচনা, দলগড়া — বহুসুরের, বহুযন্ত্রের বহুকণ্ঠের : এক কথায় — অর্গ্যানিসেশনের। তাই অপেরা চেয়েছে — প্রাণশক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের কল্লোল, জনতার বহুমর্মর, হৃদয়ের অজস্র রূপব্যঞ্জনা — ধ্বনি সমবায়ে; অপেরা চেয়েছে রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য ও জনসঙ্ঘের আবেদনের মধ্যে দিয়ে জাগতিক মানবিক হাজারো বিরুদ্ধ গতির সুর-সামঞ্জস্য। কীর্তন চেয়েছে ঐকান্তিক ভাগবত প্রেম প্রীতি, যদিও একটি মাত্র পথে নয় — হৃদয়াবেগের নানামুখী ভঙ্গিতে শাখায়িত হয়ে, পল্লবিত হয়ে, পুষ্পিত হয়ে : অভিমানে, সখ্যে, দাস্যে, পূজায়, বেদনায়, মৃদুহাস্যে, আনন্দে, বিরহে, মিলনে, অশ্রুতে — সর্বোপরি অসীমের পায়ে ঐকান্তিক আত্মসমর্পণে, বরণের শরণাগতিতে। অধ্যাত্মিক নাট্যসঙ্গীত হিসেবে তাই কীর্তনের দোসর নেই। কথাকলি, জাভার নৃত্য প্রভৃতির রস কীর্তনের আত্মিক নাট্যরসের তুলনায় অগভীর — ছেলেমানুষি। কারণ অতি স্পষ্ট : কীর্তনের লক্ষ্য মানুষ নয়, ওর লক্ষ্য ভাগবত করুণা — হাবে ভাবে, আবেশে আবেগে, রূপে রসে, রঙে ঢঙে। মানুষের হৃদয়রাজ্যের গভীরতম অনুভূতি — প্রেম : কীর্তনে এ-প্রেমের ঢল নেমেছে দুর্নিবার প্লাবনে, অশ্রান্ত কল্লোলে, উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গে। তাই হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের রাগশুদ্ধির বাঁধাবাঁধির সব বাঁধকে সে খড়কুটোর মতন ভাসিয়ে নিয়ে গেল, সুরশাসকদেরকে বলতে পারল : "কার সাধ্য রোধে মোর গতি!" বলতে পারল তালনিয়ন্তাদেরকে : "আমি কাউকে মানি না।" বলতে পারল মার্গসঙ্গীতের ঐতিহ্যকে : "তোমাকে আমি পেলেও ঢেলে সাজাব মনে রেখো কিন্তু — কোনো আপত্তিই শুনব না — শুনব না — শুনব না।" এক কথায় কীর্তন আপন ধারায়, আপন স্রোতে সৃষ্টি করতে পেরেছে এক বিপুল পটভূমিকা — হৃদয়কে কেন্দ্র করে, প্রেমকে প্রতিমা করে, ভক্তিকে আরাধ্য করে।

কিন্তু মুশকিল এই যে, প্রেমের ভক্তির আবেগকে যাঁরা অবিশ্বাসের চোখে দেখেন তাঁদের কাছে কীর্তনের সুরকে হৃদয়ালুতা মনে হবেই। কেননা শুধু মস্তিষ্ক বা মনের বিচার দিয়ে ওর নাগাল মিলবে না। ওর যে-নাট্যরূপ, যে-মেলডিকরূপ যে-ছন্দেররূপ সে-সবের

কলাকারু নেই একথা অবশ্যই বলি না — কিন্তু তার মহিমা ও প্রবণতা হল একান্তভাবেই অন্তর্মুখী — অন্তর থেকেই তার উদ্ভব, অন্তরের প্রতি আবেগের ভাগবত উদ্বোধন ও উচ্ছল আত্মোৎসর্গেই তার সার্থকতা। তাই শুধু সুরজ্ঞ হলে যেমন কীর্তন গাওয়া যায় না তেমনি বোঝাও যায় না। ওর রসজ্ঞ হতে হলে হতে হবে প্রেমপন্থী, ভক্তিবল্লভ : ভাগবত ভক্তিকে বাদ দিয়ে কীর্তনের বিচার হল হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটকের সমালোচনেরি সামিল : বিড়ম্বনা।

কীর্তন সম্বন্ধে অনেক কিছুই ভালো করে বলা হল না — ওর কাব্যশিল্প, নাট্যশিল্প, স্থাপত্যশিল্প আঁখরে নিত্য নূতন কল্পনাশিল্প, রচয়িতার মূল সুরমূর্তি বজায় রেখেও গায়কের নিজের সুরকারু ও ভাবপ্রতিভাকে ফলিয়ে তোলার শিল্প — কত কী। এর প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে আলাদা আলাদা প্রবন্ধ লেখা যায়। সে কাজ পরে করার ইচ্ছা রইল। এখানে শুধু একটি কথা না বলেই পারছি না। সেটি এই যে কীর্তন মহান সঙ্গীত হলেও তার বিকাশ যে আর হতে পারে না এমন নয়, যেমন ধরা যাক সুরের দিকে। এ পর্যন্ত কীর্তন মূলত ভাবপ্রধান কাব্যপ্রধান হয়ে এসেছে। কিন্তু ভাব তো রূপের অন্তরায় নয় — সাথি। কাব্য তো সুরের পরিপন্থী নয় — মিতা। কীর্তন এ-যাবৎ সুরের সূক্ষ্ম শ্রুতিবিলাসের পথে যায় নি — যেমন গেছে হিন্দুস্থানি সঙ্গীত। কিন্তু তাই বলে সুরের সূক্ষ্ম কারুকলা কীর্তনের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হবার কোনো কারণই নেই। কীর্তনজ্ঞ খগেন্দ্রনাথ আমাকে একদিন বেশ সুন্দর করে বলেছিলেন এ-কথাটি : "দিলীপ, কীর্তনে সুরের কাজ কেন হবে না বলো দেখি? কণ্ঠ-সাধনায় সুর-সাধনায় সিদ্ধ গুণী কীর্তন গাইলে তা আরও অপরূপ হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই। কীর্তনের ভাব বজায় রেখে সুরের আরও বিকাশ খুবই সম্ভব এবং সেই কাজই করা উচিত তোমাদের — যারা হিন্দুস্থানি পদ্ধতিতে সুরের সাধনা করেছ, কিন্তু এজন্যে আগে ভালোবাসতে হবে কীর্তনকে — চিনতে হবে তার মহত্তম বিকাশকে — জপ করতে শিখতে হবে তার মূল মন্ত্রটিকে। এ-প্রেম বিনা কীর্তনের জগতে কোনো নব সৃষ্টিই করা যাবে না। আমার খুব দুঃখ হয় দেখে যে, সুরে-অসিদ্ধ লোক কীর্তনে সুর-সৃষ্টি করতে পারে না বলে সেই অক্ষমতাতেই ধরা হয় কীর্তনের স্বকীয় সুর-বন্ধ্যাত্বের চরম প্রমাণ।" কথাটা মনে লেগেছিল, এবং তার পরে কীর্তনে নানা রচনা করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কীর্তনেও ঢের বিকাশের পথ আছে। অবশ্য এ-বিকাশ হয়তো সব সময়ে মামুলি কীর্তনভঙ্গি হবে না। না-ই হল। কীর্তনের কাব্যশ্রী ও প্রেমশ্রীর সঙ্গে সুরশ্রী এসে মিললে সে-সমন্বয়ে যে অভিনব ত্রিবেণীসঙ্গমের উদ্ভব হবে সে-ও হবে এমনিই এক নবসৃষ্টি যেমন বাংলার শ্রেষ্ঠ সুরকারদের বাংলা গান হয়েছে অভিনব সৃষ্টি আধুনিক বাংলা সঙ্গীতে — যা বাংলার গৌরব। আর এ গৌরবের ভিত্তি হল বাঙালির স্বভাবসিদ্ধ ভাবপ্রবণতা রসার্দ্রতা। তাই রবীন্দ্রনাথ ২৯-৭-১৯৩৬ তারিখে একটি পত্রে আমাকে লিখেছিলেন :

"কীর্তন সঙ্গীত আমি অনেককাল থেকেই ভালবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনো সঙ্গীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সঙ্গীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তন সঙ্গীতে

বাঙালির এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি। ...কখনো কখনো কীর্তনে ভৈরোঁ প্রভৃতি ভোরাই সুরেরও আভাস লাগে কিন্তু তার মেজাজ গেছে বদলে — রাগ-রাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক। আমি কল্পনা করতে পারিনে হিন্দুস্থানি গাইয়ে কীর্তন গাইচে, এখানে বাঙালির কণ্ঠ ও ভাবার্দ্রতার দরকার করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কি বলা যায় না যে এতে সুর-সমবায়ের পদ্ধতি হিন্দুস্থানি পদ্ধতির সীমা লঙ্ঘন করে না? অর্থাৎ য়ুরোপীয় সঙ্গীতের সুরপর্যায় যে রকম একান্ত বিদেশী কীর্তন তো তা নয়। ওর রাগরাগিণীগুলিকে বিশেষ নাম দিয়ে হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে উপদ্রব করা হয় না। কিন্তু ওর প্রাণ, ওর গতি, ওর ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।"

একথা অংশত সত্য সন্দেহ কি? আর সেই জন্যেও কীর্তনকে আরও বলা চলে বাঙালির একমাত্র ক্লাসিকাল জাতীয় সঙ্গীত। কেবল একটা কথা : হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের কিছু আমেজ কীর্তনে আছে বলেই এ-সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, কীর্তন হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের "মূল উপাদানের" কাছে হাত পেতেছে। কবির ভাষায় নির্ভয়েই বলা যায় যে, এ-বিষয়ে কীর্তন সম্পূর্ণ অনন্যতন্ত্র। সেই জন্যেই কীর্তনের রাগরাগিণী নিয়ে নতুন হিন্দুস্থানি রাগের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব নয়। সম্ভব হত যদি কীর্তনের মূল ধারাটি কাব্যসুরের গঙ্গাযমুনাসঙ্গম-বিবাগী না হয়ে হত শুধু আলাপের একমুখী গঙ্গোত্রীমিলনোন্মুখ।

কিন্তু কীর্তনের মহিমা-তর্পণে এসব বিচার অবান্তর। কীর্তনের রসিক হতে হলে চাইতে হবে সব আগে গভীর হৃদয়াবেগের দাম দিতে শেখা, ভাগবত প্রেমের উদাসী হওয়া, ভক্তির সাধনাকে বরণ করতে চাওয়া। এ-সাধনার আলো অন্তরাত্মায় পড়লে সংশয়গ্রন্থি ভিন্ন হবে, মনে প্রত্যয় জাগবেই জাগবে যে, প্রেমের দিশারি করে যে-সঙ্গীত অচিনের অভিসারে চলে কোনো একান্ত-ঐহিক এস্থেটিক অণুবীক্ষণ দিয়ে তার রসঘন আত্মার নাগাল মেলে না।

□ *সাঙ্গীতিকী*, ১৯৩৮

মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচার

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

পেরিক্লিসীয় এথেন্স্, রিনেসাঁসের ইটালি ও অষ্টাদশ শতকের ফরাসিদেশ, এই সভ্যতাত্রয়ের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় — মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচারের প্রভুত্ব। এই দুটি বৈশিষ্ট্য যে সব সময় আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করে তা নয়, প্রায়ই একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। যুক্তিবিচারদৃঢ় মূল্যবোধ ও মূল্যবোধস্নিগ্ধ যুক্তিবিচার — প্রতি সভ্যতায়ই এই দুই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

এখানে প্রশ্ন হবে : মূল্যবোধ কাকে বলে, আর যুক্তিবিচার জিনিসটাই বা কি? — নিকটবর্তী স্থূল সুখের চেয়ে দূরবর্তী সূক্ষ্ম সুখকে, আরামের চেয়ে সৌন্দর্যকে, লাভজনক যন্ত্রবিদ্যার চেয়ে আনন্দপ্রদ সুকুমারবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ জানা এবং তাদের জন্য প্রতীক্ষা ও ক্ষতি স্বীকার করতে শেখা — এ-সবই মূল্যবোধের লক্ষণ; আর এ-সকলের অভাবই মূল্যবোধের অভাব। যুক্তিবিচারের প্রভুত্ব বলতে বুঝায় জীবনের সকল ব্যাপারকে বিচারবুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেবার প্রবণতা। যুক্তিবিচার সকলের ভেতরেই কিছু-না-কিছু থাকে, কিন্তু এই সাধারণভাবে থাকা নয়, বিশেষ ও ব্যাপক ভাবে থাকার কথাই বলা হচ্ছে। এ যেন যুক্তিবিচারের পূজা, অর্থাৎ তার আদেশ-পালন, কার্যসিদ্ধির জন্য তার নাম মাত্র ব্যবহার নয়। নিরঞ্জন শুভ্রবুদ্ধিই যুক্তিবিচার; স্বার্থের দাগ লাগা বুদ্ধিকে যুক্তিবিচার সম্মান দেওয়া যায় না। তখন সে আর প্রভু নয়, গোলাম — আমাদের স্বার্থের মোট বয়ে বেড়ানো তার কাজ। সচরাচর আমরা যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকি সে এই স্বার্থের মোটবওয়া গোলাবুদ্ধি, মুক্ত নিরঞ্জন প্রভুবুদ্ধি নয়।

বুদ্ধি কী করে স্বার্থকলঙ্কিত হয়ে তার নিরঞ্জনত্ব হারিয়ে বসে যত্রতত্রই তার নজির পাওয়া যায় — সেজন্য বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না। তথাপি একটা দৃষ্টান্ত দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছিনে। সেদিন আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ধর্ম, রাজনীতি, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করছিলুম। কথায় কথায় একজন বলে উঠলেন : আরে ছেঃ! হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা আর তুলো না, তা কখনও সম্ভব হতে পারে না। যারা আমাদের এতটা অবজ্ঞা করে যে, আমাদের নামগুলো পর্যন্ত শুদ্ধ করে উচ্চারণ করতে কি লিখতে পারে না, তাদের সঙ্গে মিল হতে পারে কী করে? অথচ দেখ না, আমরা কত সহজে তাদের নামগুলি, শুধু তাই নয়, তাদের দেবতাদেব নামগুলি পর্যন্ত, লিখে যেতে পারি — কোথাও একটুকু বানান ভুল না করে। — উপস্থিত সকলেই কথাটায় সায় দিলেন, আমিও বাদ রইলুম না। কিন্তু নির্জনে চিন্তা

করতে গিয়ে যখন নিরঞ্জন শুভ্রবুদ্ধির আলোক লাভ করলুম তখন বুঝতে পারলুম ভুল হয়ে গেছে, না ভেবে-চিন্তে তখন কথাটায় সায় দেওয়া ঠিক হয়নি। মুসলমান যে হিন্দুর নামগুলো যথাযথ বানান ও উচ্চারণ করতে পারে, সে মুসলমানের গুণ নয়, কেননা বাংলা মুসলমানের মাতৃভাষা, আর হিন্দুর নামকরণ সে ভাষাতেই হয়ে থাকে; আর হিন্দু যে মুসলমানের নামগুলো বিশুদ্ধভাবে বানান ও উচ্চারণ করতে পারে না, সে হিন্দুর দোষ নয় — কেননা মুসলমানের নামকরণ সাধারণত যে দুটি ভাষায় হয়ে থাকে, সেই আরবি ও ফারসি ভাষা হিন্দুর মাতৃভাষা নয়। (হিন্দুর কথা না হয় থাক্, শতকরা কজন মুসলমান মুসলমানের নামগুলি — সে সবের মধ্যে নিজেদেরগুলোও অন্তর্ভুক্ত — ঠিক মতো বানান ও উচ্চারণ করতে পারে, তা ভেবে দেখবার বিষয়।) অবশ্য ইচ্ছাকৃত ত্রুটি যে নেই তা নয়, কিন্তু বেশির ভাগই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি।

পরদিন কথাটা বন্ধুদের বললুম; কিন্তু তাদের অপ্রসন্নতাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি দেখে ও-সম্বন্ধে অধিক আলাপ করা আর সঙ্গত মনে হল না। সত্যের জন্য যাদের উন্মুখতা নেই, তাদের সত্য জানানোর চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। তর্ক করে লাভ নেই, তাতে খাম্‌খা মন বিগড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সত্যকে পাওয়ার আগ্রহ তলিয়ে গিয়ে জয়ের ইচ্ছাই বড়ো হয়ে ওঠে। এরূপ ক্ষেত্রে বুদ্ধির জগৎ ছেড়ে প্রাণের জগতে নেমে আসা স্বাস্থ্যকর। আমিও তাই করলুম। তর্ক ছেড়ে দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা শুরু করলুম।

যাক, যা বলছিলাম। সংকীর্ণবুদ্ধি তথা যুক্তি-তর্ক নয়, উদারবুদ্ধি তথা যুক্তিবিচার সভ্যতা: আর তার অভাবই বর্বরতা। তাই বুদ্ধিকে নিজের কাজে না লাগিয়ে নিজেকে বুদ্ধির কাজে লাগান দরকার। নইলে বুদ্ধির শুভ্রতা নষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও অবনতি ঘটে। প্রয়োগভেদে বুদ্ধির মূল্যভেদ হয়ে থাকে। একই বুদ্ধি সৌন্দর্য, প্রেম, আনন্দ ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তির সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করে মনীষার উচ্চস্তরে উন্নীত হয় : আবার মদ্ মাৎসর্য, লোভ ইত্যাদি অসুন্দর বৃত্তির সংস্পর্শে এসে চালাকির নিম্নস্তরে নেমে আসে। রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর বুদ্ধিকে সাহিত্য, শিল্প ও বিশ্বচিন্তায় না লাগিয়ে ব্যারিস্টারি কাজে লাগাতেন তো তাঁর বুদ্ধির উন্নয়ন না হয়ে অবনতিই ঘটত এবং তিনিও মনীষীর মর্যাদা না পেয়ে একজন সুচতুর আইনজীবীর সম্মান লাভ করতেন। তা হলে বলতে পারা যায়, মানুষের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে বুদ্ধির প্রাচুর্য নয়, উৎকর্ষই গণনার বিষয়। কার কী পরিমাণ বুদ্ধি আছে, তা দেখে লাভ নেই; কে কতখানি বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করেছে, তাই দেখবার বিষয়। বুদ্ধির অপ্রতুলতা কি প্রাচুর্যের জন্য মানুষের নিন্দা কি প্রশংসা করা ঠিক নয়। কেননা, তা প্রকৃতির দান, আর প্রকৃতির খেয়ালের উপর কারও হাত নেই। আমরা ইচ্ছা করলেই বুদ্ধির পরিমাণ বাড়াতে পারিনে, কিন্তু উৎকর্ষ বাড়াতে পারি। শিক্ষার কাজই হচ্ছে বুদ্ধির উৎকর্ষবৃদ্ধি, পরিমাণবৃদ্ধি নয়।

বুদ্ধিজীবীরা যে শিল্পী-সাহিত্যিকদের মতো মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধা পান না, তার হেতুও এখানে। বুদ্ধির প্রাচুর্যের দিক দিয়ে তাঁরা যে কারও চেয়ে কম যান তা নয় — হয়তো অনেক ক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিকদের বহু পশ্চাতেও ফেলে যান; কিন্তু সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেমের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করে চলেন না বলে উৎকর্ষের দিক দিয়ে তাঁরা অনেক পেছনে

পড়ে থাকেন। তাই প্রচুর বুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মনীষী আখ্যা তাঁদের ভাগ্যে জোটে না। কেননা, সংস্কৃত-সুন্দর বুদ্ধিই মনীষা, অসংস্কৃত অসুন্দর বুদ্ধি মনীষা নয় — চাতুর্য। উভয়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একটি নোঙরামিমুক্ত, নির্মল আত্মার সরোবরে ডুব দিয়ে যেন সুন্দর হয়ে উঠেছে; আরেকটা নোঙরা, কুশ্রী — ন্যক্কারজনকতার দরুন তার দিকে তাকানোই যায় না। অসংস্কৃত, অসুন্দর বুদ্ধিকে সংস্কৃত ও সুন্দর করে তোলা শিক্ষার একটি বড়ো উদ্দেশ্য। না, ভুল বলেছি, শিক্ষার মানেই তাই। বিবিধ জ্ঞানানুশীলন সত্ত্বেও বুদ্ধির সংস্কার না হলে শিক্ষা সার্থক হয়েছে বলা যায় না। বুদ্ধির সংস্কার মানে মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা; আর সৌন্দর্য, আনন্দ, প্রেম প্রভৃতি সুকুমারবৃত্তির সংস্পর্শে এসেই মূল্যবোধের উন্মেষ হয়।

মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচারের প্রভুত্ব সামাজিক নিরাপত্তার উপর নির্ভরশীল। নিরাপত্তার অভাবহেতু অসভ্যদের ভেবে-চিন্তে চলার সময় নেই। পরিবার ও আত্মরক্ষার জন্য সকল সময়ই তাদের সহজপ্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে চলতে হয। সহজপ্রবৃত্তি যা আদেশ করে, তাই তারা নিরুপায়ের মতো 'যো হুকুম' বলে তামিল করে — সহজপ্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে যে মন তার কোনো খবরই রাখে না। তাই প্রয়োজনের কারাগারে তারা আবদ্ধ — অপ্রয়োজনের মুক্ত প্রান্তরে বিচরণ করতে অক্ষম। একটি সুন্দর সনেট যে একটি সুস্বাদু ভাজা ডিমেব চেয়ে মূল্যবান, এ ধারণা অসভ্যদের নেই। শুধু অসভ্যদের কথাই বা বলি কেন, নিম্নস্তরের সভ্যদের মধ্যেও এ ধারণার অভাব। যন্ত্র-বিদ্যার চেয়ে সুকুমার বিদ্যা শ্রেষ্ঠ — অন্নবস্ত্রের চিন্তায় অস্থির মানুষকে একথা বুঝাতে যাওয়া বাতুলতা। প্রয়োজনের নিগড়েই যাকে সারাক্ষণ আবদ্ধ থাকতে হয়, প্রয়োজনাতিরিক্তের প্রতি নজব দেওয়ার তার সময় কোথায়? কাজ নিয়েই তার সময় কাটে, লীলারস সম্ভোগের অবসর জোটে না। তাই সভ্যতাসম্মত মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সভ্যতার জন্য অবসরের প্রয়োজন প্রশ্নাতীত, আর নিরাপত্তা অবসরের লালয়িত্রী। যেখানে নিরাপত্তা নেই সেখানে মূল্যবোধ ও বিচারশীলতা নেই, আর মূল্যবোধ ও বিচারশীলতার অভাব মানে — সুসভ্যতার অভাব।

নিরাপত্তা সভ্যতার সহায়। কিন্তু তাই বলে নিরাপত্তা অথবা তার উপায়কে সভ্যতা বলা যায় না। এই যে আমি নিশ্চিন্ত মনে বসে বসে রচনা লিখছি, এর পেছনে রয়েছে পুলিশের অস্তিত্ব। পুলিশ না থাকলে তা কখনো সম্ভব হত না — নিয়ত আমাকে পরিবার ও আত্মরক্ষার্থ ব্যস্ত থাকতে হত। কিন্তু তাই বলে পুলিশ সভ্যতা নয় সভ্যতার রক্ষক মাত্র। গোলাপের সঙ্গে কাঁটার যে সম্বন্ধ সভ্যতার সঙ্গেও পুলিশের সেই সম্বন্ধ — উভয়ই আত্মরক্ষার উপায়, আত্মবিকাশের উপায় নয়। তবু সঙ্গিন-বন্দুক, কামান-বারুদকে অনেকে সভ্যতা বলে ভুল করে।

প্রকৃতিবিজয়ের ফলে যা আসে তা সভ্যতা নয়, আত্মমার্জিতির ফলে যা পাওয়া যায়, তা-ই সভ্যতা। প্রকৃতিবিজয়ের মত্ততাহেতু মানুষ আত্মমার্জনার কথা একরকম ভুলেই যাচ্ছে। তাই মনে হয়, প্রকৃতিবিজয় মানুষের জীবনে আশীর্বাদের মতো না এসে মহা-অভিশাপের মতোই আবির্ভূত হয়েছে। বিজিতের চরণে সেলাম ঠুকে বিজেতা অসহায়ের

মতো দাসখৎ দিতে দ্বিধা করেনি। ফলে মূল্যবোধ তিরোহিত হল, বিচারবুদ্ধি স্বার্থসিদ্ধির কাজ ছাড়া আর কোনো বড়ো কাজে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ পেল না। অতএব বলতে ইচ্ছে হয়, প্রকৃতিবিজয় না হলেই যেন ভালো হত; কেননা, তাহলে বিজিগীষু মানুষ স্থূল বস্তুজগতের পরিবর্তে অন্য কোনো সূক্ষ্মজগৎ জয় করবার প্রেরণা লাভ করত এবং ধ্যান-কল্পনার পূজা করে ইতরতামুক্ত হতে পারত।

মনে রাখা দরকার, যা দিয়ে বাঁচা যায় তা সভ্যতা নয়, যার জন্য বাঁচা হয়, তা-ই সভ্যতা। তাই ভাত-কাপড়ের জোগাড়কে সভ্যতা না বলে সৌন্দর্য ও আনন্দের আয়োজনকেই সভ্যতা বলা সঙ্গত। মূল্যবোধের অভাবে মানুষ একথা উপলব্ধি করতে পারছে না বলে ক্রমবিকাশ ব্যাহত হচ্ছে — মানুষ যে-তিমিরে সে-তিমিরেই থেকে যাচ্ছে। উপায়কে উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করার এই শাস্তি। এই শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে হলে মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। মূল্যবোধের সচেতনতা মানে সৌন্দর্য ও আনন্দ সম্বন্ধে সচেতনতা।

কিন্তু আনন্দ আজ অবজ্ঞাত, আরাম তার স্থান দখল করে বসেছে। আরামের আয়োজনকেই আনন্দের আয়োজন মনে করে লোকে ভুল করছে। ও দু'বস্তু যে এক চিজ নয়, সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, সে-সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তুলতে না পারলে সমূহ ক্ষতি। আনন্দ মানসিক ব্যাপার, আরাম শারীরিক। আরামের জয়ে শরীরেরই জয় হচ্ছে। মনবেচারি কোণঠাসা হয়ে কোনোপ্রকারে দিনগুজরান করছে মাত্র। তার দিন ফিরিয়ে আনতে না পারলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কারণ, সংগ্রাম আরামের জন্যই হয়ে থাকে, আনন্দের জন্য হয় না। আনন্দ একান্তভাবে বস্তুনির্ভর নয়, আরাম একান্তভাবে বস্তুনির্ভর। আর বস্তুর জন্যই যুদ্ধ। তাই পৃথিবীকে যুদ্ধমুক্ত করতে হলে আরামের চেয়ে আনন্দ তথা শরীরের চেয়ে মনকে বড়ো করে তোলা দরকার। নইলে যুদ্ধবিরতির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। দৃষ্টিভঙ্গিই ইষ্টানিষ্টের মূল। তাই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন তথা মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি না রেখে সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করলে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। মূল্যবোধ লক্ষ্য, সমাজপরিবর্তন উপলক্ষ, এ-কথাটা ভালো করে মনে রাখা চাই। নইলে সমাজপরিবর্তন আমাদের বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত রাজতোরণে এসেও রাজার দেখা না পেয়ে আমাদের ফিরে যেতে হবে। যাঁরা বলেন, সমাজপরিবর্তন হলে মূল্যবোধ আপনা-আপনি সৃষ্টি হবে, সেজন্য পূর্ব থেকে সচেতনতা বা প্রয়াসের প্রয়োজন নেই, তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারিনে এই জন্য যে, মনুষ্যত্বকে তাঁরা যতটা সস্তা মনে করেন আসলে তা ততটা সস্তা তথা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সেজন্য সদাজাগৃতির প্রয়োজন; আর মূল্যবোধ তথা সৌন্দর্য ও আনন্দ সম্বন্ধে সচেতনতা সদাজাগৃতির লক্ষণ। মনুষ্যত্বকে যাঁরা সমাজপরিবর্তনের by-product মনে করেন, তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারলুম না বলে দুঃখিত।

মূল্যবোধের অভাবের দরুন আমরা আসলকে নকল, নকলকে আসল, লক্ষ্যকে উপায়, উপায়কে লক্ষ্য মনে করছি। তাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে। কোন জিনিসের উপর

কোন জিনিস স্থাপিত হওয়া দরকার, কোনটা জীবনের পাদপীঠ, কোনটা শিরোপা, তা বুঝতে পারা যাচ্ছে না বলে জীবনকে শিল্পের মতো ধাপে ধাপে সাজিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অন্নবস্ত্রের আয়োজন আনন্দ-উপভোগের উপায় না হয়ে আনন্দ উপভোগই অন্নবস্ত্র উপার্জনের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকেরা যখন সৌন্দর্য ও আনন্দের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তখন বিজ্ঞের মতো বলে থাকে : আরে একটু আনন্দ-উপভোগ না করলে কর্ম-উদ্যম বজায় থাকবে কী করে? আর কর্ম-উদ্যম বজায় না থাকলে আমরা জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকব কোন উপায়ে? — যেন কর্ম-উদ্যম বজায় রাখবার জন্যই আনন্দের প্রয়োজন, তার নিজস্ব কোনো সার্থকতা নেই। উপায়কে লক্ষ্য আর লক্ষ্যকে উপায় করে দেখার এ চমৎকার নিদর্শন। বিজ্ঞম্মন্যরা 'আনন্দ' কথাটা ব্যবহার করে বটে, কিন্তু আসলে তারা যা বোঝাতে চায় তা হচ্ছে 'ফূর্তি'। জীবনের গভীরতার সঙ্গে পরিচয় নেই বলে আনন্দ কী বস্তু, তা তারা ধারণা করতেই পারে না। পারলে তাকে উপায় না করে লক্ষ্যই করত।

বহির্জীবনের চেয়ে অন্তরজীবন বড়ো, এই মূল্যবোধের শিক্ষা। তাই বাইরের জন্য ভেতরকে, স্থূলের জন্য সূক্ষ্মকে বলি দেওয়া মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের মনঃপূত নয়। সুকুমারবৃত্তির বিকাশেই জীবনের চরিতার্থতা, স্থূল ভোগে নয় — এই বিশ্বাস আছে বলে সূক্ষ্ম উপভোগের দিকেই তার ঝোঁক। প্রয়োজনের দাবির চেয়ে অপ্রয়োজনের দাবিই তার কাছে বড়ো। কিন্তু তাই বলে প্রয়োজনের দাবিও সে অস্বীকার করে না। দেহের জন্য আত্মা বিক্রয় যেমন তার কাছে মহা অপরাধ তেমনি প্রয়োজনবোধে জীবনধারণের জন্য আত্মা বিক্রয় না করাও মহাপাতক। বেঁচে থাকার দাবিই তার কাছে সর্বাগ্রগণ্য। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। জীবনধারণের জন্য আত্মা বিক্রয় সমর্থন করলেও সাংসারিক উন্নতির জন্য আত্মা বিক্রয় সে কোনোদিন সমর্থন করে না। সে জানে সংস্কৃতির যদি কোনো শত্রু থাকে তো সে এই সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা। কেননা সংস্কৃতির মানে সুকুমার বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষসাধন, আর সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা শিলাবৃষ্টির মতো সুকুমারবৃত্তির বিকাশ উন্মুখ মুকুলিগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যায়। আগে জীবন পরে সংস্কৃতি একথা সে মানে, কিন্তু আগে সাংসারিক উন্নতি পরে সংস্কৃতি একথা সে কিছুতেই স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা সংস্কৃতিকামনাকে এমনভাবে দাবিয়ে রাখে যে, তা আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনা — আলো হাওয়ার স্পর্শবঞ্চিত ফুলের মতো অবচেতনের অন্ধকারে আবদ্ধ থেকে তা ধীরে ধীরে শুকিয়ে ঝরে যায়। লক্ষ্মীসরস্বতীর প্রাবাদিক কোন্দল ভিত্তিহীন নয়' ধন আর মন এক সঙ্গে যায় না। ধনকে যে চেয়েছে মনকে সে পর করেছে, আর মনকে যে কামনা করে ধন তার দিকে ফিরেও তাকায় নি — এতো সচরাচরই দেখতে পাওয়া যায়। তাই লক্ষ্মীর ধনভাণ্ডারকে সমভাবে বেঁটে দেওয়ার উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয়। অতিভোগ ও ভোগহীনতার পাপ থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার এই একমাত্র পথ। কিন্তু তা করতে হবে সরস্বতীর প্রতি দৃষ্টি রেখে লক্ষ্মীর দিকে নজর রেখে নয়। ধনসাম্যের উদ্দেশ্য হোক সর্বজনীন সরস্বতী পূজা : তবেই তা মানুষের সত্যিকার মুক্তির বাহন হতে পারবে। বলাবাহুল্য, লক্ষ্মী মানে কল্যাণ, আর সরস্বতী মানে সৌন্দর্য।

কল্যাণের জগৎ থেকে সৌন্দর্যের জগতে গমন প্রাণের পক্ষে অধিরোহণই, অবরোহণ নয়। আর কল্যাণের জগতে থেকে যাওয়াকে অবরোহণ না বলা গেলেও অধিরোহণ বলা যায় না। তাই কল্যাণকে সৌন্দর্যের বাহন করে তোলা দরকার, নইলে প্রগতি একটা তাৎপর্যহীন বাত-কি-বাত হয়ে দাঁড়ায়।

মূল্যবোধ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকতে হবে দুটি কারণে। প্রথমত: আমেরিকার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হতে চলেছে, আর আমেরিকা জাত হিসেবে স্থূলবুদ্ধি। গভীর জীবনের স্বাদ তারা পেতে চায় না। তারা যা চায় তা আনন্দ নয় — ফুর্তি। ভোগেই পটু, উপভোগে নয়। ছন্দো ও সুষমাময় জীবন তারা কল্পনাই করতে পারে না। সমস্ত দিন ব্যাঙ্কের লেজারের উপরে ঝুঁকে পড়ে হিসাব মিলানো আর সন্ধ্যাবেলা সুরামত্ত হয়ে সারাদিনের পরিশ্রমজনিত দুঃখ লাঘবের প্রয়াস — এই তাদের কাছে 'জীবন'। কোনোপ্রকার গভীর অনুভূতি কি সুন্দর কল্পনা তাদের জীবনে সাড়া জাগাতে পারে না। সুখের আত্যন্তিক প্রয়াস যে সুখের অন্তরায়, এ ধারণা তাদের নেই। অর্থকামনার চাকার নীচে জীবনের সুকুমারবৃত্তিগুলি মাড়িয়ে দিতে তারা কুণ্ঠাবোধ করে না। তাই আমেরিকা সভ্য হয়েই রইল, সুসভ্য হতে পারলে না। অবশ্য এসব কথা বলবার অধিকার আমার নেই এবং বলতুমও না যদি বারট্রান্ড রাসেল প্রমুখ চিন্তাশীলদের রচনার সঙ্গে পরিচয় না ঘটত। রাসেল তো মাঝে মাঝে আমেরিকার প্রতি রাগে লাল হয়ে ওঠেন। তাঁর দুঃখ এই যে, আমেরিকার মনোবৃত্তি সমগ্র পৃথিবীর মনোবৃত্তি হতে চলেছে — অচিরে সমস্ত দেশগুলি আমেরিকার মতো আনন্দবোধহীন ও স্থূলবুদ্ধি হয়ে পড়বে, এমন কি, এমন যে তাঁর প্রিয় দেশ চীন — যা তাঁর মতে চিন্তার স্বাধীনতা ও জীবনবোধের দেশ তাও বাদ পড়বে না। কেননা, সকল দেশই আধুনিক হতে চলেছে, আর আধুনিক হওয়া মানে মার্কিনি হওয়া। মূল্যবোধের অভাবের দরুন আমেরিকার প্রভাবে পৃথিবীর কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি। তাই সাবধান হওয়া দরকার।

আত্মিক ব্যাপারে অতৃপ্তি ভালো, তা জানার সীমানা ডিঙিয়ে অজানার রাজ্যে উঁকি দেওয়ার প্রেরণা জোগায়। কিন্তু বাস্তব ব্যাপারে অতৃপ্তিবোধ মারাত্মক, তা আত্মার সৃজনীশক্তিকে পঙ্গু ও অথর্ব করে রাখে — তাকে স্বচ্ছন্দগতি হতে দেয় না। A dissatisfied Socrates is thousand times better than a satisfied pig — এই উক্তিতে যে অতৃপ্তির প্রতি ইংগিত রয়েছে, তা এই আত্মিক অতৃপ্তি divine discontent — বস্তুগত অতৃপ্তি নয়। আত্মিক অতৃপ্তি একপ্রকারের সুখ — পরমবেদনা; বস্তুগত অতৃপ্তি নির্জলা দুঃখ, ছাড়া আর কিছুই নয়; তা সৃষ্টির প্রেরণা জোগায় না, ব্যাহত করে। তাই তা পরিত্যাজ্য। A happy man is he who knows what he wants বস্তুত কী চাই, তা ভালো করে জানা থাকলে মানুষ সহজেই সুখী হতে পারে। কিন্তু মুশকিল এই যে, আমেরিকানদের তথা আধুনিকদের অভাববোধের অন্ত নেই। তারা কেবলই 'আরো চাই' 'আরো চাই' করছে। কি তাদের দরকার, কি না হলেও চলে, তা জানা নেই বলে সব কিছুই তারা চায়, আর সব কিছু চাওয়া মানে জীবনে দুঃখকে দাওয়াত করা।

অভাবের মাত্রা বাড়িয়ে চলা আর দুঃখের মাত্রা বাড়িয়ে চলা এক কথা। বস্তুসাধনার উদ্দেশ্য বস্তুর বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া। প্রবল বস্তুসাধনা সত্ত্বেও আমেরিকা বস্তুর বন্ধন থেকে মুক্তি পাচ্ছে না এই উদগ্র ক্ষুধার জন্য। 'আরো চাই' 'আরো চাই' মনোবৃত্তি তাকে উন্নত ও সুন্দর জীবনের স্বাদ পেতে দিচ্ছে না। অমৃতের কামনা নেই বলে সে কেবলই বস্তুর দাস হয়ে পড়ছে। এই দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য This far and no further — এই পর্যন্তই, এর বেশি নয় — এই বাণীর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যে জাতি বা দেশ শুধু মুখে উচ্চারণ করে নয়, জীবনে রূপায়িত করে এই বাণী প্রচার করবে, তার দ্বারাই জগতের কল্যাণ সাধিত হবে। অতিভোগ ও ভোগহীনতার বর্বরতা থেকে মানব জাতিকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা তারই আছে। কিন্তু একটি কথা, তারও মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন থাকা চাই।

দ্বিতীয়ত আমরা নতুন রাষ্ট্রের অধিবাসী আর নতুন রাষ্ট্র ও যুদ্ধকালীন রাষ্ট্র মূল্যবোধকে তলিয়ে দিয়ে প্রয়োজনবোধকে উপরে তুলে ধরে। যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দাবিকে ভয়ের চোখেই দেখা হয়। তাই তাকে দমিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের জন্য জান কোরবানের বাণীকে লোভনীয় করে তুলে ধরা হয়। বাক-চাতুর্যের দ্বারা বীরত্ববোধ ও উগ্র স্বদেশপ্রেমের কাছে আবেদন জানানো হয় বলে বুদ্ধিবৃত্তি সহজেই কাবু হয়ে পড়ে — সমালোচনাশক্তি একেবারেই পঙ্গু হয়ে যায়। আরে ছেঃ ছেঃ নিজের জীবনটা ভোগ করতে চাও? নিজের জীবন তো সকলেই ভোগ করে; তাতে কি মহত্ত্ব আছে? মহত্ত্ব রয়েছে জীবন দেওয়ায়। যদি জাতির জন্য, ধর্মের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য জীবন দিতে পার তো বুঝব তোমার ধমনীতে দামি রক্ত প্রবাহিত; নইলে আর তোমার জীবনের মূল্য কি? বাস্ তরুণ সম্প্রদায়কে বোকা বানাবার পক্ষে এই যথেষ্ট। বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের মতো সমরানলে পুড়ে মরবার জন্য অমনি তারা দলে দলে ছুটে চলবে। তাদের এই প্রাণদানে জগতের কতটুকু লাভ হবে, তা একবারও ভেবে দেখবে না। সত্যি বলতে কি, যুদ্ধ জিনিসটা তরুণ সম্প্রদায়ের বোকামির উপর নির্ভর করেই আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে। আবেগের প্রাবল্য কমিয়ে দিতে তারা যদি একটুখানি সচেতনবুদ্ধির চর্চা করত, তবে তা বহু পূর্বেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। যুদ্ধে যে তরুণদেরই সবচেযে বেশি ক্ষতি আবেগের প্রাবল্যের দরুন তারা তা সহজে উপলব্ধি করতে পারে না।

যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রের এই চিত্র। নতুন রাষ্ট্রের চিত্রও অনেকটা এরই মতো। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সদ্ভাব না থাকলে এখানেও যুদ্ধের বাণী বড়ো হয়ে ওঠে, নইলে কর্মের বাণী প্রাধান্য লাভ করে। — কর্ম কর, কর্ম কর — হে নতুন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ! নিজের ভোগের দিকে না তাকিয়ে অনবরত রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য কাজ করে চল। ওই যে গোবরে পোকা, সেও তো নিজের জন্যই জীবনধারণ করছে। তা হলে তার জীবনে আর তোমাদের জীবনে পার্থক্য কোথায়? নিঃস্বার্থ কর্মই মনুষ্যত্ব। অতএব, স্বার্থলেশহীন হয়ে কাজ করে যাও; স্বার্থের কথা ভেবে না-হক জীবনকে কলঙ্কিত কোরো না। — কর্মের বাণীর সঙ্গে একটা মতবাদ বা আদর্শও মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় মানুষকে আত্মচেতনাহীন করে তুলবার উদ্দেশ্যে। তখন পুতুল-নাচের পুতুলের মতো তাকে যদৃচ্ছা চালনা করা সহজ হয়ে পড়ে।

নতুন রাষ্ট্রের সবচাইতে বড়ো ত্রুটি এই যে, তাতে সুকুমারবিদ্যার চেয়ে কেজোবিদ্যা প্রাধান্য লাভ করে, আর কেজোবিদ্যা ধীরে ধীরে সুকুমারবৃত্তির ধারগুলি বেমালুম ভোতা করে দিয়ে মানুষকে অনুভূতিহীন মাংসপিণ্ডে পরিণত করে। কেজোবিদ্যার বিরুদ্ধে আমাদের বলবার কিছুই নেই, তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সে যদি সুকুমারবিদ্যাকে গলা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তার গদিটি দখল করে বসতে চায় তো আপত্তি না জানালে অন্যায় করা হবে। শিক্ষার একটা বড়ো উদ্দেশ্য জীবন-উপভোগের ক্ষমতাবর্ধন। কেজোবিদ্যার দাবি বড়ো হয়ে উঠলে সেই উদ্দেশ্যটি চাপা পড়ে যায় — শিক্ষা জীবনার্জনের উপায় না হয়ে জীবিকা উপার্জনের উপায় হয়ে ওঠে। ফলে সূক্ষ্ম উপভোগের অভাবে বর্বরতার সীমানা ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না — মানুষ আত্মিক জগতে উন্নীত হয়ে বস্তুজগতেই আবদ্ধ হয়ে থাকে। আনন্দই আমাদের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জগতে নিয়ে যেতে পাবে — বস্তুর সে ক্ষমতা নেই — প্রয়োজনের তাগিদে নতুন রাষ্ট্রের কর্তারা সে কথাটা ভুলে যান। তাই নতুন রাষ্ট্রে মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন থাকার বিশেষ প্রয়োজন।

চূড়ার দিকে নজর রেখেই গোড়ার কথা ভাবা দরকার, নইলে গোড়াতেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয় — চূড়ায় ওঠা আর সম্ভব হয় না। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে নজর রেখেই রাষ্ট্র গড়ে তোলা দরকার, নইলে শেষ পর্যন্ত তা মানুষের মুক্তির উপায় না হয়ে বন্ধনের রজ্জু হয়ে দাঁড়ায়। মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্রের পুতুল পূজার জন্য মানুষের জন্ম হয়নি, মানুষের বিকাশের জন্যই রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। অতএব, লক্ষ্যের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হওয়া দরকার। নতুবা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। মানুষের মুক্তির জন্যই রাষ্ট্র আর মুক্তি মানে বস্তুর বন্ধনমুক্ত হয়ে সৌন্দর্য ও আনন্দলোকে উন্নয়ন। মানুষ ব্যক্তি হিসেবে অনেকদূর এগিয়ে গেছে — সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জগতে তার অভিযান চলেছে, কিন্তু জাতি হিসেবে সে বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারে নি। রাষ্ট্রের কাজ বস্তুর বন্ধন মুক্ত করে দিয়ে মানুষের ক্রমবিকাশে সহায়তা করা। এ-ব্যাপারে কেজোবিদ্যার দান অপরিসীম। কিন্তু মুক্তির মানে কেবল বস্তুর থেকে নিষ্কৃতি নয়, আরও কিছু। বস্তুর বন্ধনমুক্ত হয়ে ধ্যানকল্পনার জগতে যেতে না পারলে সত্যিকার মুক্তিলাভ হয় না। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ইত্যাদির সংস্পর্শে এসে মানবমনের যে ক্রমিক উন্মোচন, তারি নাম মুক্তি। এ-ব্যাপারে সুকুমারবিদ্যার একচেটে অধিকার, কেজোবিদ্যা এখানে দাঁত ফুটাতে পারে না। তাই সুকুমারবিদ্যার এত প্রয়োজন। সুকুমারবিদ্যাকে অবজ্ঞা করা আর মূল্যবোধহীনতার পরিচয় দেওয়া এক কথা।

যুক্তিবিচার আর মূল্যবোধে যে খুব পার্থক্য আছে, তা নয়। মূল্যবোধকে যাচাই করে নেওয়ার পদ্ধতিই যুক্তিবিচার। একই বস্তু অনুভূতিলোকে একরূপ, বুদ্ধিলোকে অন্যরূপ লাভ করছে, এই যা প্রভেদ। কিন্তু উভয়েই মূলত এক। মূল্যবোধকে সংশ্লিষ্ট যুক্তিবিচার, আর যুক্তিবিচারকে বিশিষ্ট মূল্যবোধ বললে ভুল বলা হবে না। তাই যুক্তিবিচার সম্বন্ধে আর বেশি কিছু বলা সঙ্গত মনে হল না।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, জীবনমান নয়, মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচারই জীবনসমৃদ্ধির পরিমাপক। এই দুই গুণের পরিচয় যিনি যত বেশি দিতে পেরেছেন, তিনি তত বেশি উন্নত বলে পরিগণিত হয়েছেন — যুগে যুগে, কালে কালে মানুষ তারই মহিমাকীর্তন করেছে ও করবে। তাই তাদের জয় কামনা করে আমি বক্তব্য সমাপ্ত করছি। যুক্তিবিচার আর মূল্যবোধ — এই দুটি কথা আমাদের জপমন্ত্র হোক; তাহলেই আমরা বর্বরতামুক্ত হয়ে সুন্দর ও সুসভ্য হতে পারব — চাই কি, যাকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ দিব্যসত্তা, তার সঙ্গেও আমাদের মোলাকাৎ হয়ে যেতে পারে।

পরিশিষ্ট

মূল্যবোধ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হলেও কি মূল্যবান, কি মূল্যবান নয় — সে সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছুই বলা হয়নি — সামান্য ইঙ্গিত মাত্র করা হয়েছে। এখানে সে অভাবটুকু পূরণ করবার চেষ্টা করছি। প্রথমত বলা দরকার, মানবজীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কোনো ব্যাপারকেই মূল্যহীন বলা যায় না। তবে মূল্যের কমবেশি আছে। তাই মূল্যবোধের মানে মূল্যের কমবেশি সম্বন্ধে ধারণা। সাধারণভাবে মন্তব্য করা যায় : প্রয়োজনীয় জিনিসের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যই বেশি। কেননা, প্রয়োজনীয় জিনিসে দেহের তৃপ্তি মাত্র, আত্মার তৃপ্তি নয় — আত্মার তৃপ্তি অপ্রয়োজনীয় জিনিসে। তাই একটি সুস্বাদু ভাজা ডিমের চেয়ে একটি সনেটের মূল্য বেশি। এখন প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় এ-দু'য়ের সংজ্ঞা দেওয়া যায় কী করে? যা না পেলে তীব্র দুঃখ, কিন্তু পেলে মামুলি সুখ, গভীর আনন্দ নয়, তাই প্রয়োজনীয়; আর যা না পেলে তেমন দুঃখ হয় না, কিন্তু পেলে গভীর আনন্দ, তা-ই অপ্রয়োজনীয়। নীচের দৃষ্টান্তগুলির দিকে নজর দিলেই কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হবে। ভাত না খেলে তীব্র দুঃখ অনুভূত হয়, কিন্তু খেলে গভীর আনন্দ পাওয়া যায় না। একটা সুন্দর সনেট না পড়লে দুঃখ নেই, কিন্তু পড়লে খুশিতে মন ভরে ওঠে। দৈনিক পত্রিকা না পড়লে দিনটা মাটি হয় বলে মনে হয়, কিন্তু পড়লে তেমন তৃপ্তি পাওয়া যায় না। একটা ভালো সাহিত্যের বই না পড়লেও চলে, কিন্তু পড়লে মন আনন্দে নেচে ওঠে — জীবনকে সার্থক বলে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছে হয়। এমনি আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তা আর দেওয়া হল না। তা হলে দেখতে পাওয়া গেল, যা না হলে চলে না তা-ই কম মূল্যের, আর যা না হলেও চলে তাই বেশি মূল্যের। অথবা অন্যভাবে দেখতে গেলে, যা শারীরিক অথবা নিম্নস্তরের মনের ব্যাপার (যেমন দৈনিক পত্রিকা-পাঠ) তারই মূল্য কম যা মানসিক তারই মূল্য বেশি। শারীর-ব্যাপার বলে কামের মূল্য কম, আত্মার ব্যাপার বলে প্রেমের মূল্য বেশি। তবে প্রেম বলে আলাদা কিছু বোধ হয় নেই, কামই যখন আত্মার রঙ লেগে সুন্দর ও শালীন হয়ে ওঠে তখনই তা প্রেম নামে অভিহিত হয়। প্রেম কামেরই ঊর্ধ্বমুখীন সুন্দর প্রকাশ। তাই জঠরের চেয়ে কাম বড়ো — Sex is more spiritual than belly. আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে কামের ঊর্ধ্বগতি আছে, জঠরের নেই। তাই কাম এতো কাব্য-সাহিত্যের উপজীব্য

হয়েছে, জঠর হয়নি। জঠর একটা ইতর ব্যাপার, তার কোনো সৌন্দর্য নেই। কেবল টিকে থাকবার জন্য তার প্রয়োজন। কিন্তু কাম ইতর ব্যাপার নয়, শ্রদ্ধেয় ব্যাপার। সৌন্দর্যের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, মহত্ত্বের সঙ্গেও। শ্রদ্ধেয় ব্যাপার বলেই তার বেলা এতো আঁটাআঁটি, এতো সাবধানতা। পূজালয়ে প্রবেশ করতে হলে যে শ্রদ্ধা আর নিষ্ঠার প্রয়োজন, এখানেও তাই আবশ্যক।[১]

(এই নিবন্ধে জীবনের বাইরের কোনো ব্যাপারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি। জীবনের ভেতরেই যে শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট, সুন্দর-অসুন্দর রয়েছে তারই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।) জীবনশিল্পের মানেই এই উৎকর্ষ অপকর্ষ সম্বন্ধে সচেতনতা। জীবনশিল্পীরা উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট উভয়কে মেনে নিয়ে জীবনকে শিল্পের মতো ধাপে ধাপে সাজিয়ে দেন। মূল্যবোধ সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতন থাকেন। প্রয়োজনের দিকটা প্রধান দিক হলেও যে শ্রেষ্ঠ দিক নয়, শ্রেষ্ঠ দিক অপ্রয়োজনের দিক, কেননা তাতেই মানুষের মুক্তি — এই বোধ না থাকলে সত্যকার জীবনশিল্পী হওয়া যায় না।

সমাজশিল্প জীবনশিল্পের বনিয়াদ। আর জীবনশিল্প মূল্যবোধেরই অভিব্যক্তি। দার্শনিক যাকে superstructure বলেছেন তার গোড়ায়ও মূল্যবোধ। তাই তা অবহেলিত হওয়ার মতো জিনিস নয়। বরং superstructure-এর দিকে লক্ষ্য রেখেই mainstructure গড়ে তোলা দরকার। নইলে সমাজ-পরিবর্তন মানুষকে বেশি দূর এগিয়ে দিতে সক্ষম হবে না। গ্রিসে superstructure (সৌন্দর্য জগৎ) প্রাধান্য লাভ করেছিল।[২] রিনেসাঁসের ইটালিতেও। কিন্তু তাদের mainstructure তথা কল্যাণের জগৎটি যথাসম্ভব ত্রুটিবিহীন ছিল না। অনেক নিষ্ঠুরতা ও ব্যভিচারের কাহিনি তাদের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রেখেছে। অধুনা কল্যাণের জগৎটি যথাসম্ভব ত্রুটিবিমুক্ত ও নিষ্কলুষ করে গড়ে তুলবার চেষ্টা চলেছে। সে ভালো কথা। কিন্তু superstructure এর দিকে লক্ষ্য রাখা চাই, কেননা তা-ই সভ্যতা। আর সভ্যতা আপনা-আপনি সৃষ্ট হয় না, তার জন্য বিশেষ আগ্রহ ও যত্নের প্রয়োজন।[৩]

---

১. বলা হয়েছে, জঠর ইতর ব্যাপার। তাই মানুষকে ইতরতা মুক্ত করতে হলে জঠরের সমস্যার সমাধান সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

২ শিল্প ও জ্ঞানের জন্য যদি পৃথিবীর কোনো জাতি বেঁচে থাকে, তবে তা গ্রিক জাতি। গ্রিসে প্রতি তিন ব্যক্তিব মধ্যে এক ব্যক্তি হয় ভাস্কব, নয় ভাস্করের সহকর্মী ছিল। আর্ট ও কালচার তাদের কাছে উপরি পাওনা ছিল না, ছিল জীবনেব প্রধান লক্ষ্য। তাই তাবা চমৎকার সভ্যতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

৩ কয়েক বছর আগে ক্লাইভ বেলকে অনুসরণ করে বিভিন্ন পত্রিকায় আমি সভ্যতা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি। সেগুলিতে বেল সাহেবের কথাই ছিল বেশি, আমার কথা সামান্য। বর্তমান প্রবন্ধে বেল সাহেবের কথা সামান্য, আমার কথাই বেশি। তথাপি প্রেরণা ক্লাইভ বেল থেকে নেওয়া হয়েছে স্বীকার করা দরকার। নইলে বিবেকদংশনের জ্বালা ভোগ করতে হবে।

☐ *সংস্কৃতি-কথা*, ১৯৬৭

আধুনিক বাঙলা ছন্দ

প্রবোধচন্দ্র সেন

আধুনিক বাঙলা ছন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরুদ্ধ হয়েছি। কাজটা প্রথমে যতটা সহজসাধ্য মনে হয়েছিল এখন কার্যত দেখছি মোটেই তা নয়। আধুনিক বাঙলা ছন্দ বলতে কি বোঝায় প্রথমেই তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। 'আধুনিক বাঙলা কবিতা' কথাটি সাধারণত যে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে আমরা সে অর্থ গ্রহণ করব না; বর্তমান প্রবন্ধে 'আধুনিক' কথাটিকে তার অভিধানিক অর্থেই স্বীকার করব। বর্তমান সময়ে বাঙলা কবিতায় ছন্দের যেসব বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা দেখা যায় তাই আমাদের আলোচ্য বিষয় এবং যে সময় থেকে ওসব বৈশিষ্ট্যের সূচনা তাকেই আধুনিক ছন্দের কালগত সীমা বলে গণ্য করব।

আধুনিক বাঙলা কবিতার ছন্দ আলোচনায় অগ্রসর হলে সহসা মনে হয় 'Othello's occupation is gone' — ছান্দসিকের কাজ বুঝি ফুরিয়েছে; মনে হয় আধুনিক বাঙলা কবিতায় ছন্দের বালাই প্রায় কিছুই নেই, যা আছে তাও এমন কিছু নয় যা নিয়ে একটা বৃহৎ প্রবন্ধ ফাঁদা যেতে পারে। কিন্তু একটু তলিয়ে লক্ষ করলেই বেশ বোঝা যায় আধুনিক বাঙলা ছন্দের বৈচিত্র্যও নেহাত কম নয় এবং তার সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রও স্বল্পপরিসর নয়। বস্তুত একটিমাত্র প্রবন্ধে আধুনিক বাঙলা ছন্দের সমস্ত দিক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। আমরা উক্ত ছন্দের কয়েকটিমাত্র বিশিষ্টতা এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তার পরিণতি লাভের পথ খোলা আছে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেই নিরস্ত হব।

মূল বিষয় অবতারণা করার পূর্বে আধুনিক বাঙলা কবিতার গঠনগত প্রধান কয়েকটি লক্ষণ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রথমেই নজরে পড়ে সুপরিমিত ও সুনিয়মিত ছন্দের অভাব অথবা পদ্যরীতির পরিবর্তে গদ্যরীতির প্রভাব। ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শানুসরণের ফলেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক আজকাল বাঙলায় গদ্যকবিতা রচনার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়েছে। বোধ করি রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' (১৯২২) গ্রন্থের 'কথিকা'গুলিতেই গদ্যকবিতা রচনার প্রথম সূচনা দেখা দেয়। বাঙলা কবিতায় গদ্যরীতির অন্যতম প্রবর্তক হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে গদ্যকবিতা রচনার রীতি সুপ্রচলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্যের পর থেকে। গদ্যরীতি আশ্রয়ের প্রেরণা কবির মনে কিভাবে দেখা দিয়েছিল সে ইতিহাসটুকু পাওয়া যাবে উক্ত কাব্যের ভূমিকায়; এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গদ্যকবিতা রচনার কলাকৌশল আমাদের আলোচ্য বিষয় না হলেও ও-সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য সাধারণ গদ্যসাহিত্যের রচনাভঙ্গি ও গদ্যকবিতার রচনাভঙ্গি ঠিক এক জাতের

নয়। গদ্যকবিতার ভাষায় এমন একটা ধ্বনিগত তরঙ্গভঙ্গি বা স্পন্দনময়তা থাকা চাই যা পাঠকের মনকে বিচিত্রভাবে দুলিয়ে দেয়; ফলে ও-রকম গদ্যরচনাতে পদ্যের আভাস অর্থাৎ ছন্দোময়তার অনুভূতি জেগে ওঠে। প্রকারান্তরে পাঠকের মনে ছন্দের আস্বাদ জাগিয়ে তোলাই গদ্যকবিতার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, ওই অনুভূতিকুটুই হচ্ছে গদ্যকবিতার বিশিষ্ট কাব্যরস পরিবেশনের প্রধান আধাব। সুতরাং গদ্যকবিতার ভাষাকে বলা যায় 'স্পন্দমান (Rhythmic) গদ্য'; আর সাধারণ গদ্য হচ্ছে নিস্পন্দ গদ্য। অবশ্য কোনো গদ্যই একেবারে স্পন্দনহীন নয়, তবে স্পন্দন-পরায়ণতা সাধারণ গদ্যেব বৈশিষ্ট্য নয় বলেই তাকে নিস্পন্দ বলা যায়। যেমন জগতের কোনো বস্তুই একেবারে তাপহীন নয়, তথাপি যেসব বস্তুর তাপ আমাদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে না সেগুলিকে আমরা তাপহীন বলেই গণ্য করি। কবিতার গদ্যরীতি সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি ('ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' নামক অচিরপ্রকাশিতব্য গ্রন্থের শেষ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এখানে অধিক বিশ্লেষণে অগ্রসর না হয়ে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, স্পন্দমান গদ্য রচনা আপাতদৃষ্টিতে যতটা সহজ মনে হয় আসলে তত সহজ নয়। আমার বিশ্বাস ছন্দোবদ্ধ পদ্য রচনায় যথোচিতভাবে হাত না পাকালে স্পন্দমান গদ্য রচনায় যথার্থ অধিকার জন্মে না। এজন্যেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক আধুনিক গদ্যকবিতায় অনেক স্থলে স্পন্দমানতা অনুভূত হয় না। বোধ করি কেউ কেউ গদ্য-কবিতার ভাষা স্পন্দমান করে তোলা নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। তাই গদ্যকবিতায় সাধারণত বাকপর্ববিন্যাসের যে রীতি দেখা যায়, কোনো কোনো আধুনিক রচনায় তারও একান্ত অভাব দেখা যায়। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। যথা —

আশা ও আকাঙ্ক্ষা দিয়ে স্টেজ বেঁধে নানা
কাহিনীর অভিনয় তো চলে আসছে কতকাল।
হাসি আনন্দ গানের যত নাটকীয়তা সবই
তো চোখের জলে নোনতা হয়ে যাচ্ছে।
সে নোনামির শেষ তো এই তেরোশো পঞ্চাশ
বছর পরেও ঘুচল না।

— শৈলেন ঘোষ : কালপুরুষ, নিরুক্ত, ১৩৫১, আষাঢ়

বলা বাহুল্য এই কবিতাংশটিতে গদ্যের স্পন্দনশীলতা সুস্পষ্ট নয় এবং এটিতে বাক্‌পর্বগুলিকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে দেখানো হয়নি।

মনে হয় গদ্যকবিতা রচনার যে ঝোঁক প্রথমে এসেছিল এখনই তার প্রবলতা কতকটা কমে এসেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যেও এই প্রবণতার আভাস পাওয়া যায়। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে তিনি চারখানি গদ্যকবিতার বই (পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট, শ্যামলী) প্রকাশ করেন। কিন্তু তার পরে তিনি আর গদ্যকবিতা লেখেননি বললেই হয়; অথচ ১৯৩৬ সালের পরে রচিত পদ্যকবিতার ধারা বেশ প্রশস্ত ও গভীর। এই গীতিকবিতার দেশে গদ্যকাব্য যদি কালক্রমে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের মতো বাঙলা সাহিত্যের একটি সংকীর্ণ কোণে স্থান পায়, তবে সেটা বিস্ময়ের বিষয় হবে না। "তিলোত্তমাসম্ভব" ও "মেঘনাদবধ কাব্য" প্রকাশের পরে এক যুগে অমিত্রাক্ষর ছন্দ তথা মহাকাব্য রচনার ধূম

পড়ে গিয়েছিল। আজ ও দুই বস্তুই বাঙলা সাহিত্য থেকে একেবারে নির্বাসিত না হলেও দুয়োরানির অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। গদ্যকবিতার দশা যদি সে রকম নাও হয়, তবু তার বর্তমান প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকবে না বলেই মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে বাঙলা free verse সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। এক হিসাবে ফ্রী ভার্সকে গদ্য ও পদ্যের মধ্যবর্তী অবস্থা বলে বর্ণনা করা যায়। এই জাতীয় রচনাকে সাধারণ গদ্য বলে তো মানা যায়ই না, স্পন্দমান গদ্য বলেও গণ্য করা যায় না; কেননা এরকম রচনাতে পদ্যের রীতি ও ভঙ্গি সুস্পষ্ট, কেবল তাতে কোনো বিশেষ ছন্দের আদর্শ সর্বত্র সমভাবে বজায় থাকে না — কবি তার প্রয়োজন অনুসারে স্বাধীনভাবে ছন্দের আদর্শ পরিবর্তন কবেন। এরকম স্বচ্ছন্দবিহারী রচনাকেই বলা যায় ফ্রী ভার্স। এর বাঙলা প্রতিশব্দ কী হতে পারে জানি না। আধুনিককালে ফরাসি সাহিত্যে এই স্বচ্ছন্দ পদ্য (vers libre) বচনার রীতি দেখা দেয়। ইংরেজিতেও ফ্রী ভার্স-এর যথেষ্ট নিদর্শন আছে। ইদানীং কেউ কেউ বাঙলাতেও স্বচ্ছন্দ পদ্যরচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই স্বৈর ছন্দের দৃষ্টান্ত নেই। মনে পড়ে বুদ্ধদেব বসুর কোনো কোনো রচনায় স্বৈর ছন্দের ব্যবহার দেখেছি। হাতের কাছে না থাকাতে দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল না। অমিয় চক্রবর্তীর অনেক রচনাকে এই পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

হায় বে, নেমন্তন্ন।
সাগরপারের লোক, দেখে যাও
অন্য দেশেব শিশু,
ডাকছে চোখ খুশিতে উজল
চল রে, নেমন্তন্ন।
ভাঙা ভাণ্ডের তলানিতে
এই হল তার প্রাণের নিমন্ত্রণ;
কাঙাল-সারি বসেছে পথে, উপরে ওড়ে কাক,
সেখানে ছুটে আসা। —
যে-শিশুরা আলোয় নামে, একটু পেয়েই হাসে
তাদের জন্য এই আয়োজন।
কেমন প্রজা, কেমন রাজা, কেমন সোনার দেশ,
ভারতমায়ের শিশুকে দেখে যাও।

বলা বাহুল্য এ রচনাটি গদ্য নয়, ছন্দের ভঙ্গি এতে সুস্পষ্ট। অথচ কোনো বিশেষ ছন্দোনীতিতে একে ধরা যায় না, পদে পদেই ছন্দের আদর্শ বদলে যাচ্ছে। এইজন্য এ ছন্দকে 'স্বৈর ছন্দ' বলে অভিহিত করেছি। ছন্দোগত কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি দিয়ে এর পরিমাপ করা যায় না; অতএব এটিকে 'অমেয় ছন্দ' নামও দেওয়া চলে।

পূর্বে বলেছি এই অমেয় ছন্দের রচনায় ছন্দের মাপকাঠি বা আদর্শের ঘন ঘন বদল ঘটে। একটি রচনার সর্বত্র ছন্দের একই আদর্শের অনুসরণ করা সাধারণ রীতি; সহসা আদর্শ বদল হলে আবৃত্তিকালে পাঠক অপ্রত্যাশিতভাবে হোঁচোট খায় এবং বলে ওখানে ছন্দপতন ঘটেছে।

পক্ষান্তরে ঘন ঘন আদর্শ-বদল ও তজ্জাত ছন্দপতন ঘটানোই উক্ত স্বৈর ছন্দের বৈশিষ্ট্য। মসৃণ পথের পরিবর্তে বন্ধুর পথে ঢেলা ভেঙে ভেঙে চলাতে একপ্রকার আনন্দ আছে সন্দেহ নেই। কিছুদিন অভ্যাসের ফলে অভিনবতার মোহ কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে আনন্দ উবে যায়। সুতরাং বাঙলা সাহিত্যে এই স্বৈর ছন্দের প্রচলন বেশিদিন চলবে কিনা সন্দেহ।

এই স্বৈর ছন্দের সঙ্গে ছড়ার ছন্দের একটু তুলনা করা অসংগত হবে না। ছড়ার ছন্দেও ঘন ঘন আদর্শের বদল ঘটে। যেমন —

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে,
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে।
কাজিফুল কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা,
হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম সীতারামের খেলা॥

এই ছড়ার ছন্দের সঙ্গে আলোচ্যমান স্বৈর ছন্দের পার্থক্য কোথায়? প্রধান পার্থক্য এই যে, ছড়ার ছন্দের যা কিছু অসমতা সবই আবৃত্তির ঝোঁকে সমান করে নেওয়া হয়, অর্থাৎ আবৃত্তিকালে যে সুরের টান (draw) ছড়ার পক্ষে স্বাভাবিক সেই টানে তার সব অসমতাই ঘুচে যায়। কিন্তু স্বৈর ছন্দের অসমতা স্বেচ্ছাকৃত এবং সে অসমতা দূর করার কোনো স্বাভাবিক ব্যবস্থাও নেই। তা ছাড়া, স্বৈর ছন্দের স্বেচ্ছাকৃত বৈচিত্র্যও ছড়ার ছন্দের চেয়ে বেশি। এই বৈচিত্র্যের আরেকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করছি —

মহাত্মাজী যদি মারা যান
আকাশ হবে না খান খান
পৃথিবী ঘুরবে
কঠিন প্রাণ নেবে জিনে
মাঠে অগণ্য চাষী
জলে রোদে দিনে দিনে।
ধনিক বণিক্ আর বহু বেতনিক
দুমুঠো পুরবে;
উপবাসী
তিনি চলে গেলে।

—অমিয় চক্রবর্তী

আধুনিক বাঙলা কবিতার দ্বিতীয় বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে মিলের অভাব। আজকাল বহু বিভিন্ন ধরনের কবিতাতেই মিল দেওয়া হয় না। বলা বাহুল্য, আধুনিক অমিল ছন্দ আব মধুসূদন-প্রবর্তিত 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দ একজাতীয় বস্তু নয়। মধুসূদন প্রবহমান পয়ার ছন্দকেই অমিল রূপ দিয়েছিলেন এবং অমিল প্রবহমান পয়ারকেই 'অমিত্রাক্ষর' নামে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু আজকাল প্রবহমান পয়ার ছাড়া আরও বহু রকম ছন্দোবন্ধেই মিল না দেবার রীতি দেখা দিয়েছে। এ-সব ছন্দ অমিল হলেও এগুলিকে 'অমিত্রাক্ষর' বলা চলে না। যথাস্থানে আধুনিক অমিল ছন্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে। এখনকার বাঙলা কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যথাক্রমে পঙ্‌ক্তিদৈর্ঘ্যের অসমতা এবং ত্রিপদী চৌপদী কিংবা নির্দিষ্ট

আকৃতির শ্লোকস্তবক (stanza) গঠনের প্রতি সজ্ঞান ও সচেষ্ট ঔদাসীন্য। শিশুসাহিত্য ছাড়া আজকাল অধিকাংশ স্থলেই ছন্দপঙ্ক্তির দৈর্ঘ্যগত সমতা দেখা যায় না এবং সুনিয়মিত ত্রিপদী চৌপদী কিংবা নির্দিষ্ট আকৃতির স্তবক রচনা সেকেলে রীতি বলে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিতই হয়ে থাকে।

গদ্যরীতি বা স্বৈর ছন্দের প্রচলন, মিলহীনতা, পঙ্ক্তিদৈর্ঘ্যের অসমতা এবং নির্দিষ্ট আকৃতির স্তবকের অভাব, এগুলিকেই আধুনিক যুগের কবিতায় সাধারণ অথচ বিশিষ্ট লক্ষণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। এগুলি সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনায় অগ্রসর হবার পূর্বে এই অভাবাত্মক লক্ষণগুলি উদ্ভূত হবার কারণ কি সে বিষয়ে একটু আলোচনা কবা প্রয়োজন।

আমার মনে হয় এই অভাবাত্মক লক্ষণগুলির একটি প্রধান কারণ হচ্ছে পূর্ববর্তী যুগের ছন্দোবিলাসের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও সনেট রচনার রীতি প্রবর্তন করেন এবং তখন থেকেই বাঙলা ছন্দ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা চলতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ পরীক্ষা সার্থকতার সন্ধান পায়নি। অবশেষে যেদিন রবীন্দ্রনাথের "মানসী" কাব্য (১৮৯০) প্রকাশিত হল সেদিন থেকে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছন্দের শতমুখী ধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়ে চলল। বাঙলা ছন্দের ইতিহাসে "মানসী" কাব্যের আবির্ভাব বিশেষভাবে স্মরণীয়; বস্তুত এ কাব্যখানিকে একটি নবযুগ-নির্দেশক বলে গণ্য করা যায়। যা হোক, সে যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনায় নিত্যনূতন ছন্দ উদ্‌ভাবিত হয়ে বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের মতো ছন্দোবিলাসী কবি পৃথিবীর ইতিহাসেই বিরল; আর কোনো দেশে কোনো কবি একা এত ছন্দ উদ্‌ভাবন করেছেন কিনা সন্দেহ। একা রবীন্দ্রনাথই যে বাঙলা ছন্দোভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তুলতে লাগলেন তা নয়। তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায় কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ বহু কবি অজস্র ছন্দের বিচিত্র লীলায় বাঙলা সাহিত্যকে লীলায়িত করে তুলতে লাগলেন। এই রবিমণ্ডলের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বৃহস্পতিস্থানীয়। সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ ছন্দ-প্রতিভার কথা সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথের উদ্‌ভাবিত ছন্দসমূহের বহুল প্রয়োগ তো তিনি করেছেনই, অধিকন্তু তিনি নিজেও বহু ছন্দের উদ্‌ভাবন ও প্রবর্তন করেছেন। রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত হয়েও যে তিনি ছন্দসৃষ্টির প্রতিভার জ্যোতি বিকিরণ করতে পেরেছিলেন সেটা তাঁর পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। নব নব ছন্দ-রচনার দিক থেকে "মানসী" রচনার সময় থেকে "পুনশ্চ" কাব্যের সময় অর্থাৎ ১৮৮৭ থেকে ১৯৩২ এই পঁয়তাল্লিশ বছরকে বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের ছন্দসৃষ্টির যুগ বলে অভিহিত করা যায় ("মানসী"-র পূর্ববর্তী তেরো-চোদ্দ বছরকে বলা যায় উন্মেষের যুগ এবং "পুনশ্চ"র পরবর্তী নয় বছর হচ্ছে অবসানের যুগ)। এই পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ অশ্রান্তভাবে যে অজস্র ছন্দ রচনা করেছেন বোধ করি কোনো দেশের কোনো কবিই একা এত ছন্দ সৃষ্টি করেননি। যাহোক, উক্ত পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যেই আবার মোটামুটি ১৯১২ থেকে ১৯২২ এই দশ বছরকে বিশেষভাবে সত্যেন্দ্রনাথের যুগ বলে অভিহিত করা যায়। এই দশ বছরে সত্যেন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যে ছন্দের যে ভেলকিবাজি দেখিয়েছেন তা সত্যই বিস্ময়কর। এই জন্যেই তাঁকে 'ছন্দের

জাদুকর' নাম দেওয়া হয়েছে। যাহোক, এমন একটা সময় এসেছিল যখন সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দ-রচনার নেশায় মেতে গিয়েছিলেন বললেই হয়, কাব্যরসের চেয়ে ছন্দরস সৃষ্টিকেই যেন তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। নব নব ছন্দ রচনার এই যে মত্ততা বা উত্তেজনা, তখনকার দিনে এটা অনেকের মধ্যেই সংক্রামিত হয়েছিল। যাঁরা তৎকালে এই নবছন্দরচনার আন্দোলনে অগ্রবর্তিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মোহিতলাল মজুমদার ও কাজি নজরুল ইসলামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সত্যেন্দ্রমণ্ডলীর কবিরা ছন্দের যে অতিপ্রাধান্য সৃষ্টি করলেন সাহিত্যের পক্ষে সেটা স্বাভাবিক বা কল্যাণকর বলে স্বীকৃত হতে পারে না। বস্তুত সত্যেন্দ্রনাথ-প্রমুখ কবিদের ছন্দ-পরীক্ষণের মূল্য যতই হোক না কেন, অনেক স্থলে যে ছন্দের অতিপ্রাধান্য সাহিত্যকে খর্ব করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। সুতরাং পরবর্তীকালে এর বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, এটা অস্বাভাবিক বা বিস্ময়ের বিষয় নয়। সে প্রতিক্রিয়া আজও চলেছে, যদিও তার বেগ ক্রমেই কমে আসছে বলে আমার বিশ্বাস। আধুনিক কালের বাঙলা কবিতায় যে অনেক সময় ছন্দ সম্বন্ধে অত্যুগ্র বিরুদ্ধ ভাব দেখা যায় তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ওই প্রতিক্রিয়া। বুদ্ধদেব-প্রমুখ অনেক আধুনিক কবিই যে সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর ছন্দ সম্বন্ধে কঠোর মনোভাব পোষণ করেন তার মূলেও (অন্তত আংশিকভাবে) রয়েছে ওই প্রতিক্রিয়া। এই জন্যই আজকালকার সাহিত্যে গদ্যকবিতার এত প্রাবল্য। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য গদ্যকবিতা-রচনার রীতিকে অনেকখানি উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল অতিনিরূপিত ছন্দ রচনার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে তবে স্পন্দনময় গদ্যকবিতা রচনার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু আজকাল অনেক নবীন কবি ছন্দোবদ্ধ রচনায় ভালো করে হাত না পাকিয়েই গদ্যকবিতা রচনায় অগ্রসর হন। তার ফলটা যে সব সময়েই শুভ হয় এমন কথা বলতে পারি না। অবশ্য অনেক ছন্দনিপুণ কবিও স্বেচ্ছায় গদ্যরীতিকে আশ্রয় করে থাকেন; তাঁদের বিরুদ্ধে বলবার কিছুই নেই। কিন্তু অনেক দুর্বল কবি যে নিজেদের ছন্দ-রচনার অক্ষমতাকে গদ্যরীতির আড়ালে ঢাকা দেবার চেষ্টা করে থাকেন তাতেও সন্দেহ নেই।

আধুনিক ছন্দোবিমুখতার অন্যতম কারণ হয়তো বিদেশি সাহিত্যের আদর্শানুসরণ, একথা পূর্বেই বলেছি। তাছাড়া এটা নবতর ছন্দোরীতি উদ্‌ভাবনের পূর্বাভাসও হতে পারে। নূতন সৃষ্টির পূর্বে পুরাতনকে ভাঙবার যুগ প্রায়শই দেখা যায়। ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনে এমন একটা সন্ধিপর্ব এসেছিল 'সন্ধ্যাসংগীত' রচনার সময়ে। বর্তমান বাঙলা সাহিত্যেও এমনি একটা সন্ধিপর্ব বা পরীক্ষণের যুগ চলছে বলেই আমি মনে করি। এখনকার দিনের ছন্দোগত অনিশ্চয়তাটা স্থায়ী হবার কোনো লক্ষণ দেখছি না; বরং এর মধ্যে একটা নূতন রচনারীতি উদ্‌ভাবনের প্রয়াসই প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

আধুনিক বাঙলা কবিতায় যে এত বেশি মিলের অভাব দেখা যায় তার মূলেও অনুরূপ কারণই রয়েছে। সুনির্দিষ্ট ছন্দের বন্ধনকে মেনে কবিতা রচনা করতে হলে কবির স্বাধীনতা ও কাব্যের স্বচ্ছন্দ গতি যে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয় তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং স্থলবিশেষে কবির পক্ষে সুনির্দিষ্ট ছন্দোবন্ধনের বাধা থেকে মুক্তি পাওয়া প্রয়োজন একথাও স্বীকার্য। মিল সম্বন্ধেও

এই কথা খাটে। মিল জিনিসটাও অনেক ক্ষেত্রে ভাবপ্রকাশের অন্তরায় হয়েই দাঁড়ায়। তাছাড়া মিল ছন্দের অত্যাজ্য অঙ্গও নয়। বস্তুত মিল ছন্দের অলংকরণ মাত্র। সুতরাং যেসব স্থলে নিরলংকার পৌরুষশক্তির দৃঢ়তা প্রকাশের প্রয়োজন সেসব ক্ষেত্রে মিল না দিলে কাব্যের গৌরব বৃদ্ধি হয়। এটাও আধুনিক কবিতায় অমিল ছন্দের বহুলতার অন্যতম কারণ। এজন্যই অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু-প্রমুখ অনেকে বাঙলা মিলের চিরাচরিত রীতির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ-বিষয়ে ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শও তাঁদের আনুকূল্য করেছে।

কিন্তু বিগতযুগের মিলগত অতিলালিত্যের প্রতিক্রিয়াই আধুনিক মিলবিমুখতার প্রধান কারণ বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের —

আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ
ধূলিমাখা দুটি লইয়া চরণ;

নজরুল ইসলামে, 'শেফালিকাতলে কে বালিকা চলে', কিংবা 'অলস বৈশাখে কলস কৈ কাঁখে' এবং যতীন্দ্রমোহন বাগচীর —

স্বর্ণ উষার কর্ণভূষার বর্ণতৃষার দুল,
চন্দ্রধবল সরসকান্তি
চন্দনজল-পরশশান্তি
মন্দমারুত বন্দনাবত গন্ধ তব অতুল।
সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা,
বন্ধ্যাবুকের গৌরবী আশা,
গুপ্ত প্রেমের সুপ্ত পিয়াসা বিরহের বুলবুল।

কিংবা

রজনীগন্ধা বাস বিলালো —
সজনী সন্ধ্যা, — আস্‌বি না লো?
বিদায়-মায়া বিছায় ছায়া,
ধরণীকায়া করুণ কালো।

ইত্যাদি রচনা থেকেই বোঝা যায়, এক সময়ে বাঙলা কাব্যে মিলের আতিশয্য কতখানি অগ্রসর হয়েছিল। এই বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে যদি আজ প্রতিক্রিয়া দেখ দিয়ে থাকে, তাহলে সেটাকে নিশ্চয় অস্বাভাবিক বলা যায় না। কিন্তু একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আজকাল অমিল ছন্দ রচনার ঝোঁকটা খুব প্রবল হলেও এটার উৎপত্তিও যে আজকালই হয়েছে তা নয়। মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও তার অনুকৃতির কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'অভিলাষ' এবং তৎকালীন অনেক রচনাতেই মিল দেখা যায় না (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০, বৈশাখ : 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা', পৃ. ৬৫১-৫৫ দ্রষ্টব্য)। রবীন্দ্রনাথের এই অমিল-প্রীতির অন্যতম কারণ বোধ করি তৎকাল-প্রচলিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার প্রভাব। সুতরাং এসব দৃষ্টান্তকে আমরা গণনায় আনব না। কিন্তু 'মানসী' কাব্যের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটির (১৮৮৭) মিলের অভাব বিশেষভাবে লক্ষ করার যোগ্য। একটু উদ্ধৃত করছি —

অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমিরতলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্যশিখা।

শুধু মিলের অভাব নয়; অন্যান্য বহু বিষয়েই এই কবিতাটিকে আধুনিক ছন্দের অগ্রদূত বলে গণ্য করা যায়। 'বলাকা' কাব্য যে ছন্দোবিশিষ্টতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছে সে বিশিষ্টতা এই কবিতাটিতে সুস্পষ্ট। শুধু এই জাতীয় ছন্দে নয়, অন্যরকম ছন্দেও মিল না দেবার দৃষ্টান্ত আছে। যথা —

গোলমাল দিনরাত,
কেমনে বা শুনিবে?
নানা দলে কলহের
চীৎকার তুলিছে; —
ভিক্ষুক ক্ষুধিত,
খনিজীবী খুশি নয়,
'শ্রম' নামে রাক্ষস
বন্ধনে অস্থির।
তবু কবি-কর্ম-
কারেদের নেহায়ে
পড়িতেছে হাতুড়ি, —
গড়িতেছে ছন্দ।

— সত্যেন্দ্রনাথ : তীর্থরেণু, সংগীতমিস্ত্রির নিবেদন

এই অমিল ছন্দের কবিতাটিকে অনেকাংশে আধুনিক অমিল রচনার পূর্বরূপ বলে মনে করা যায়। লক্ষ করা প্রয়োজন, এটিতে মিল না থাকলেও ছন্দের সুনির্দিষ্ট বন্ধন বজায় আছে। আধুনিককালে নানা বিচিত্র ছন্দের রচনায় অনেক সময় মিলও থাকে না এবং পঙ্‌ক্তিবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাও থাকে না। উপরের দৃষ্টান্তটি চতুর্মাত্রিপর্বিক। অন্য রকম দৃষ্টান্ত দিচ্ছি —

বুঝেছি কাঁদা হেথায় বৃথা, তাই
কাছেই পথে জলের কলে, সখা,
কলসী কাঁখে চলছি মৃদু চালে
গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এলো.

— সুভাষ মুখোপাধ্যায়; পদাতিক, বধূ

এর প্রতিপর্বে পাঁচ মাত্রা। ষন্মাত্রপর্বিক অমিল ছন্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি —

কখনো বাইরে দাঁড়ায়েছো এসে ঘুমের চোখে নরম ভোরে?

দ্যাখোনি আকাশ বোবা হয়ে আছে শেখেনি ভাষা
আলো এসে গেছে আসেনি আভা।
ঘুমিয়ে রয়েছে, কতবার এলো এমন ভোর এমন আলো।
পরীরা যখন দল বেঁধে নামে স্বপ্ন ছেড়ে
বনের ফটিক ঝর্নাতলে,
আফ্রোদিতির লঘু আনাগোনা বনের ধারে শোননি বুঝি?

— সঞ্জয় ভট্টাচার্য : সংকলিতা, ভোর

এর শুধু অমিলটাই নয়, এর ছন্দোগত বিশিষ্ট দোলটিও লক্ষণীয়।

আধুনিককালে মিল যে শুধু অবজ্ঞাতই হয়েছে তা নয়। মিলের খেলাও যথেষ্টই দেখা যায়। শিশুসাহিত্যে যে মিলের প্রাচুর্য দেখা যায়, এটা খুবই স্বাভাবিক। অন্যত্রও মিলের বৈচিত্র্য উপেক্ষিত নয়। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। —

জৈন বৌদ্ধ খ্রীস্টিয়ান,
শুভবুদ্ধির বৃষ্টি আন্।
বৃষ্টি যে এলো রাজপুতানার প্রান্তরে।
আজমীর ডোবে
বাঙলাও শোবে,
উৎকল ক্ষোভে ক্ষুব্ধ।
মিত্রশক্তি টাকডুমাডুম জয়যাত্রার গান ধরে॥

— হরপ্রসাদ মিত্র : ভ্রমণ, খণ্ডকাব্য

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। এই প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর মিল দেবার অভিনব রীতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টান্ত দিলেই আমার বক্তব্যটা স্পষ্ট হবে —

কচি কুঁকড়ানো চায়ের পাতায় সুরভি রোদের
সোনালি বোধের
ভাবটা খুঁজব বাগানে ভাভার।
বিদেশী হাওয়া
সিনকোনা ক্ষেতে সরুপথে যেতে
মকাবে চাওয়া
শ্যামল আভার।
দার্জিলিঙের মেঘলায়-মেশা
সরে-
যাওয়া
ছবি
ভোরে-পাওয়া রবি-নেশা,
মেটাবো অচেনা পাহাড়ি

দ্বীপের
ঘন সারি সারি
পত্রে নীপের
বনে,
ঠাণ্ডা সবুজ যেখানে কুয়াশা।

—অভিজ্ঞান-বসন্ত, শৌখীন ভ্রমণ

এখানে প্রতিপঙ্‌ক্তির গাঁটে গাঁটে মিল কেমন এলোমেলোভাবে ছড়ানো রয়েছে, সেইটেই লক্ষণীয়। এটা ছয় মাত্রার ছন্দ এবং এত লাইন ভেঙে ভেঙে মিলগুলি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য ছন্দের আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, তাতে মিলগুলি পঙ্‌ক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে।

মন্ত্রবীচি,
তারি টীকা অরণ্যানী
মৃন্ময় শ্যামল দোলে
স্বর্ণচক্রে পূরবী প্রতীচী, দোলে
মুগ্ধবাণী পল্লবে কল্লোলে, বৃক্ষলোকে
মর্মরিত শ্লোকে, মম
বীজমন্ত্র জপি।

— অভিজ্ঞান-বসন্ত, বীজমন্ত্র

এই দুটি অংশে যে ধরনের মিলের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল তা এখনও পরীক্ষণের প্রথম অবস্থাতেই আছে। সুতরাং এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এটুকু বোধ করি বলা যায় যে, মিলকে প্রকট করার জন্যেই হোক বা প্রচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যেই হোক ছন্দের লাইনকে কখনও এমনভাবে ভেঙে সাজানো ঠিক নয় যাতে তার যতিগত স্বাভাবিক বিভাগগুলি অস্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রবন্ধ বড়ো হয়ে যাচ্ছে, এবার বক্তব্য সংক্ষেপ করা প্রয়োজন। সুতরাং আধুনিক ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে আর দু-একটিমাত্র কথা বলেই প্রবন্ধ সমাপ্ত করব। একথা বললে বোধ করি অন্যায় হবে না যে, আধুনিক কবিরা কোনো নূতন ছন্দ উদ্‌ভাবন করেননি, তাঁরা যেসব ছন্দ ব্যবহার করে থাকেন সে সবই পুরাতন, তাঁদের রচনার বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্ব হচ্ছে প্রধানত ভঙ্গিগত। ভঙ্গির বৈচিত্র্যসৃষ্টির প্রতিই তাঁদের লক্ষ সবচেয়ে বেশি। এই ভঙ্গিবৈচিত্র্য আধুনিক বাঙলা ছন্দের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এই বৈচিত্র্য আজকাল অজস্র রূপ ধারণ করেছে; বস্তুত এ-বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক কবিরই কিছু না কিছু স্বকীয় দান আছে। অল্প পরিসরের মধ্যে তার একাংশেরও পরিচয় দেওয়াও সম্ভবপর নয়। তবে এ বিষয়ের দু-একটি সাধারণ লক্ষণের কথা বলছি।

মাত্রিক, লৌকিক ও যৌগিক এই ত্রিবিধ ছন্দের মধ্যে প্রথম দুই রীতির ছন্দের প্রচলনই অপেক্ষাকৃত বেশি, মাত্রিক রীতিতে চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দের অধিকতর প্রচলন একটি লক্ষণীয় বিষয়। রবীন্দ্রনাথ যদিও এ-ছন্দের উদ্‌ভাবয়িতা ('মানসী'তে), তথাপি সত্যেন্দ্রনাথের হাতেই এর পরিণতি ও জনপ্রিয়তা ঘটেছে। আধুনিক কালেও অনেকেই এ-ছন্দের বহুল ব্যবহার করে

থাকেন। বোধ কবি, জগদীশ ভট্টাচার্যের হাতেই এ-ছন্দ পরিসরে ও শক্তিতে সবচেয়ে বেশি পরিণতি লাভ করেছে। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

হাত ধরে চল সখি, শুরু হল জীবনের যাত্রা,
নিসঙ্গ সংসার, যেতে হবে প্রান্তর পারায়ে।
এ পথে দোসর নেই, দুঃখেরও নাই কোনো মাত্রা;
পথেরও চিহ্ন নাই, অদূরে রেখাটি গেছে হারায়ে।
সম্মুখে অমানিশি, আসে কালবৈশাখী রাত্রি,
ঝঞ্ঝা গর্জে ওঠে বিদ্রোহী মোরা দুই যাত্রী,
ঘুরিছে শীর্ষদেশে বিষ্ণু-সুদর্শন-চক্র —
খণ্ড খণ্ড হবে যৌবন-উন্মাদ স্বপ্ন,
শাসনের বক্ষেতে জ্বালিয়াছি বহ্নি উদগ্র,
নির্বাত নীড়ে তাই শ্মশানের ধ্বংস আসন্ন॥

— ক্ষণশাশ্বতী, উৎসর্গ

যৌগিক ছন্দকে সচেতনভাবে অক্ষরসংখ্যার গণ্ডি থেকে মুক্ত করে ধ্বনিমাত্রার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা দানের প্রয়াস আধুনিক কালের আরেকটি লক্ষণীয় বিষয়। যথা —

গোলদীঘি'র গর্তে চাঁদ ধরা পড়ে গেছে
বসন্ত সত্যিই 'আসবে'? কি 'দরকার' এসে?

— সুভাষ মুখোপাধ্যায় : পদাতিক, আলাপ

মাথায় শোলার টুপি, কালো 'চশমা' চোখে,
ক্যামেরা ঝুলছে কাঁধে, ব্যাগে আছে
কাগজ-'পেনসিল'।

—বুদ্ধদেব বসু : বিদেশিনী

'গোলদীঘি', 'আসবে' প্রভৃতি পাঁচ জায়গায় অক্ষরসংখ্যাকে অগ্রাহ্য করে উচ্চারিত ধ্বনিপরিমাণের উপরে ছন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটাই লক্ষণীয়। রবীন্দ্রসাহিত্যেই এর সূচনা হয়েছে। তারপরে অন্য কবিদের রচনার এ-রীতির ব্যাপকতর প্রয়োগ ঘটেছে।

মাত্রিক ও যৌগিক, এই উভয় রীতির ছন্দকেই রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষার ছন্দ বলে গণ্য করতেন এবং ও দুই রীতির ছন্দে তিনি সাধুভাষা অর্থাৎ করিল, করিবে, করিতে প্রভৃতি সাধু ক্রিয়াপদই ব্যবহার করতেন। কিন্তু একেবারে শেষ বয়সে তিনি ও দুই রীতির ছন্দেও হসন্তমধ্য চলতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। যথা —

বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি 'করতে' এসে
আনমনা হয়ে শেষে
কেবল তোমার ছায়া
রচে দিয়ে ভুলে ফেলে গিয়েছেন,
শুরু করেন নি কায়া।
যত রাজ্যের যত কবি তাকে

ছন্দের ঘের দিয়ে
আপন বুলিটি শিখিয়ে 'করত'
কাব্যের পোষা টিয়ে

— সানাই, সম্পূর্ণ

শুকনো কাশে আগুনের মতো
ছড়িয়ে 'পড়ল' খ্যাতি নিমেষে নিমেষে।

— পরিশেষ, খ্যাতি

এস্থলে 'পরিশেষ' কাব্যটি (১৯৩২) সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। ছন্দের দিক থেকে শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যে নয়, পরন্তু সমস্ত বাঙলা সাহিত্যেই এই কাব্যখানি একটি বিশেষ স্থান পাবার যোগ্য। ছন্দ এবং রচনারীতির অনেক বৈশিষ্ট্য আছে এই কাব্যখানিতে। যাঁরা কবিতা রচনার বৈচিত্র্য বিষয়ে উৎসুক, এই বইখানির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। যৌগিক ছন্দে অমিল রচনারীতি এবং চলতি বাঙলা, বিশেষত হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদের প্রয়োগ এই কাব্যখানির অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব। শুধু তাই নয় ছন্দের বন্ধনের মধ্যেও এটিতে যে বলিষ্ঠ ও অসংকুচিত গদ্যের ভঙ্গি রক্ষা করা হয়েছে তাতে এটির মর্যাদা অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, এটিতে যে-গদ্যের ভঙ্গি আনা হয়েছে তাও পোশাকি গদ্য নয়, একেবারে আটপৌরে চলতি গদ্য। ইতিমধ্যেই বুদ্ধদেব বসু-প্রমুখ কোনো কোনো কবি ক্ষেত্রবিশেষে 'পরিশেষ'-এর রচনাদর্শকে স্বীকার করে নিয়েছেন। 'পরিশেষ'-এর কতকগুলি কবিতা পরে এই গ্রন্থে বর্জিত এবং 'পুনশ্চ' কাব্যে গৃহীত হয়েছে, এটুকু মনে রাখা প্রয়োজন।

যাহোক, আমার বক্তব্য এই যে, চলতি ভাষা মায় হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ এবং আটপৌরে গদ্যরীতির অসংকুচিত ও বহুল প্রয়োগ হচ্ছে আধুনিক বাঙলা কবিতার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। তাছাড়া এই আটপৌরে চলতি গদ্যরীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রও 'পরিশেষ' কাব্যের চেয়ে অনেক বেশি। 'পরিশেষ' কাব্যের এই বিশেষ লক্ষণটি শুধু যৌগিক ছন্দের কোনো কোনো ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আধুনিক কবিরা মাত্রিক ও যৌগিক এই উভয় রীতির ছন্দের সকল বিভাগেই উক্তপ্রকার গদ্যরীতি ও চলতি ভাষার ব্যবহার করে থাকেন, দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবন্ধের আয়তন বাড়াতে চাইনে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আধুনিক কবিরা চলতি রীতির এতখানি অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের হাতে চলতি বাঙলার বিশিষ্ট ছন্দটি, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'প্রাকৃত বাঙলা ছন্দ' এবং যাকে আমি বলি 'লৌকিক ছন্দ' সেটিই যথোচিত মর্যাদা লাভ করেনি। অথচ রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের হাতে বাঙলা ছন্দের এই শাখাটি যেমন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তাতে এর ভবিষ্যৎ পরিণতির ক্ষেত্র যে খুবই প্রশস্ত তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কি কি উপায়ে এই ছন্দোরীতিটিকে আরও সমৃদ্ধ এবং আধুনিক কাব্যের উপযুক্ত বাহন করে তোলা যায়, সে প্রসঙ্গ তুলব না। ক্ষণিকা উৎসর্গ, খেয়া, পলাতকা এবং পরিশেষ — এই কাব্যগুলিতে লৌকিক ছন্দ যেভাবে ক্রমবিকাশ লাভ

করেছে, সে আলোচনাও করব না। কিন্তু 'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্যের শেষ তিনটি কবিতা (ছুটি, গানের বাসা, পয়লা আশ্বিন) এবং 'সানাই' (১৯৪০) কাব্যের দুটি কবিতা (বাসাবদল, পবিচয়), এই পাঁচটি রচনায় অমিল লৌকিক ছন্দ আটপৌবে গদ্যের ভঙ্গিতে যে বলিষ্ঠ স্বাভাবিকতার অধিকারী হয়েছে তাতে এটিকে বাঙলা সাহিত্যে একটা নূতন পথেব ইঙ্গিত বলে গণ্য করা যায়। অন্য কোনো আধুনিক কবির লেখায় এই অভিনব অথচ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছন্দোভঙ্গিটির সাক্ষাৎ পাইনি, অথচ এটি যে আধুনিক বাঙলা কবিতার একটি যোগ্যতম বাহন বলে গণ্য হতে পারে তাতে সন্দেহ নেই। এস্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটু অংশ উদ্ধৃত কবেই প্রবন্ধ সমাপ্ত কবছি —

এমন সময় বেডাজালেব ফাঁকে
পডল এসে মায়াবিনী,
বণিতা তাব নাম।
এ কথাটা হয়তো জানো
মেয়েতে মেযেতে আছে বাজিবাখাব পণ
ভিতরে ভিতরে।
কটাক্ষে সে চাইল আমায়, তাবে চাইলুম আমি,
পাশা ফেলল নিপুণ হাতের ঘুরনিতে,
এক দানেতেই হল তাবি জিত।
জিত? কে জানে তাও সত্য কিনা।
কে জানে তা নয় কি তারি
দারুণ হারের পালা।

—সানাই, পবিচয়

এই আটপৌরে চলতি গদ্যভঙ্গির ছন্দটি হচ্ছে বাঙলা ভাষার পক্ষে স্বাভাবিকতম। অথচ এটির যথেষ্ট ব্যবহার হয়নি। আমার বিশ্বাস, যথোচিত ব্যবহারের দ্বারা এ-ছন্দের উপযোগিতা বহুল পরিমাণে বাড়ানো যেতে পারে।

☐ *দেশ*, সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৮৩

ভোটমঙ্গল : সেকালের বাঙালির চোখে ইলেকশন

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

আমাদের দেশে পার্লামেন্টারি ডেমক্রেসি চলিবে না, এই কথা বলিলে সেদিন পর্যন্তও আধুনিক বাঙালিরা ক্ষেপিয়া মারিতে আসতেন। তাঁহাদের ভাবটা এই ছিল, যেন বিলাতি ডেমক্রেসির প্রতি নিষ্ঠা ভারতমাতার পক্ষে সতীত্বের মত ব্যাপার, উহা না থাকিলে তিনি অসচ্চরিত্রা বলিয়া কুখ্যাতি লাভ করিবেন। ইউ-এফ গভর্নমেন্ট বাংলা দেশে ১৯৬৭ সনে তাঁহাদের শাসনকালে অন্তত একটা ভাল কাজ করিয়াছেন। এই মোহ খানিকটা কাটাইয়া দিয়াছেন। এখন একমাত্র যাঁহারা ইলেকশন হইতে নিজেরা নিজেদের বৈষয়িক লাভের আশা রাখেন, ডেমক্রেসি ভাঙাইয়া করিয়া খাইতে চান, তাঁহারা ছাড়া আর বিশেষ কেহই ইলেকশনের জন্য উৎসাহী নন। আমার মনে হয়, এই বিতৃষ্ণা বাড়িবে বই কমিবে না।

এই মতপরিবর্তনকে খানিকটা বাঙালির পুরাতন মনোভাবে ফিরিয়া যাওয়া বলা যাইতে পারে। লর্ড রিপন যখন মিউনিসিপালিটি বা 'স্থানীয় আত্মশাসন' (কথাটা 'লোক্যাল সেলফ্ গভর্নমেন্ট'-এর বিদ্রূপাত্মক অনুবাদ) প্রবর্তন করিলেন তখন একদল বাঙালি একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। ইঁহারা নব্যপন্থী। ইঁহারা লর্ড রিপনের স্তুতি-বন্দনায় একেবারে দেশকে মুখরিত করিয়া তুলিলেন। আর একদল বাঙালি উচ্ছ্বসিত না হইলেও মনে মনে খুবই খুশি হইলেন। ইঁহারা বাঙালি সমাজের ঝানু দলপতির দল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, এই নূতন বিলাতি হুজুগে তাঁহাদের লাভ বই ক্ষতি হইবে না, যে কাজে তাঁহারা বহু যুগ ধরিয়া অভ্যস্ত, যাহাতে হাত পাকাইয়া তাঁহারা ওস্তাদ হইয়াছেন, সেই দলাদলি, চক্রান্ত ও দাঁও মারিবার নূতন পথ খুলিল। তৃতীয় আর একদল বাঙালি অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন, ভোট ও ইলেকশনের সত্যকার রূপ বাংলাদেশে কি হইবে। সুতরাং 'স্থানীয় আত্মশাসন' লইয়া ব্যঙ্গাত্মক রচনাও আরম্ভ হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্যে'ও এ-বিষয়ে একটু শ্লেষ আছে।

আমি সেদিন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এ-বিষয়ে সে-যুগে প্রকাশিত একটি বাংলা নাটক বা প্রহসন পড়িলাম। নাম — ভোটমঙ্গল বা দেবাসুরের মিউনিসিপাল-বিভ্রাট। 'ভগবান্ কল্কি অবতারের চেলা' আত্মপরিচয়ে জনৈক 'শ্রীমুদগরধারী হাস্য ভূষণ প্রণীত'। বইটার তারিখ নাই, তবে মনে হয়, ১৮৯০ সনের আগেই ছাপা হইয়াছিল। লেখক তৃতীয় দলের মুখপাত্র হিসাবে ইলেকশনের দুই নিদান অবিষ্কার করিয়াছেন— ১। উহা পুরাতন বাংলার দলাদলি, রেষারেষি ও ঘোট-মঙ্গলেরই নূতন রূপ; ২। উহা ইংরেজ শাসনের প্রতি রাজভক্তি শিখাইবার একটা গুপ্ত প্রয়াস। গীতা হইতে যে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা লেখকের

মনোভাবের বিশেষ পরিচায়ক। তিনি ভোট ইত্যাদিকে সনাতন ধর্মের বিরোধী বলিয়াও ধরিয়াছেন। তাই নিজেকে ম্লেচ্ছ বিনাশকারী কল্কির চেলা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইলেকশন সম্বন্ধে এই শ্রেণির বাঙালির মতামতের পরিচয় হিসাবে এই প্রবন্ধে বই-এর অনেক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। গল্পটা তুচ্ছ, তাই উহার চুম্বক আর দিলাম না, পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন।

ইলেকশনের উপক্রমণিকা

ইংরেজের উদারতা ও উদ্যোগে বাংলাদেশে সবেমাত্র মিউনিসিপালিটির প্রবর্তন হইয়াছে, উহার ফলে বাংলার সব দিকে উন্নতি হইতেছে অথচ স্বর্গরাজ্য পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং দেবাসুরেরা তাহাদের পুরাতন ঝগড়ায় লিপ্ত থাকিয়া শক্তির অপচয় করিতেছে, এইসব দেখিয়া স্বর্গরাজ ইন্দ্র মর্মাহত হইয়া দৈত্যরাজ বকাসুরকে এই পত্র লিখিলেন—

"মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত বকাসুর-হাবল মিত্রবর করকমলেষু। দৈত্যরাজ।

"একাল পর্যন্ত পরস্পর অধিকৃত মিউনিসিপালিটির সর্বত্র বিজয়ী যশোরাশি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সর্বলোকে একাধিপত্য করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ একটি সুসমৃদ্ধিশীল স্বর্গরাজ্যমধ্যে সভ্যতা, বিদ্যা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি মহৎ মহৎ আবশ্যকীয় পদার্থের পূর্ণ উন্নতি হইল না। এতদ্ব্যতীত মহামহিম সর্বভুক বিরাট রাজ্যের[১] অধীনস্থ রাজাগণের মধ্যে রাজভক্তি ও রাজবিদ্যা শিক্ষা একটি মহৎকার্য। এ সম্বন্ধে সর্বভুক সম্রাটের অধীন ব্যাঙ্গ দেশ একটি প্রধান উদাহরণস্থল। তদ্দেশবাসী ব্যাঙাচীরা রাজভক্তিগুণে এক্ষণে যেরূপ রাজ-অনুকরণপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন, বোধহয় অতি সত্বরই তাঁহারা গললগ্নকৃত শৃঙ্খল হইয়া, তাঁহাদের ভক্তিগুণের পরিচয় প্রদানে ত্রুটি স্বীকার করিবেন না। কারণ, ইতিমধ্যেই তাঁহারা রাজদ্বারে আবদ্ধ থাকিয়া, ভক্তিরসপূর্ণ ভেউ ভেউ ধ্বনিতে জগৎ মাতাইয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু আমরা এতাদৃশ সুবিশাল স্বর্গরাজ্যের অধিপতি হইয়াও রাজভক্তি ও রাজ-অনুকরণ এতদুভয়ের কোনটিরও যোগ্য পাত্র হইলাম না। এই সমস্ত মহাবিঘ্নকর বিষয়ের অভাব দূর করিবার জন্য একটি মহৎ উপায় স্থির করিয়া মহাশয়কে জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদিগের স্বর্গরাজ্যে যেরূপ সভ্যতা-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অতি সত্বরই এ সম্বন্ধে একটি পাকা বন্দোবস্তের আবশ্যক। আর তিন মাস পরে স্বর্গ মিউনিসিপালিটির ত্রৈবার্ষিক ইলেকশন হইবে। আমার ইচ্ছা, দেবাসুরের বৈরভাবের পরিবর্তে একতা ও রাজ্যোন্নতি বিষয়ে পরস্পর একটি চিরশান্তি স্থাপন হয়।"

দেবরাজ ইন্দ্রের এই প্রস্তাব দৈত্যরাজ গ্রহণ করিলেন এবং স্থির হইল, বারোয়ারি পূজা করিয়া এই মিউনিসিপাল নব্যধারা স্বর্গে প্রবর্তন করা হইবে। কিন্তু বারোয়ারি পূজা বাঙালিসমাজেই হউক বা দেবাসুরসমাজেই হউক, বারোয়ারি পূজার ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে না। ইলেকশনও সেই ধর্ম অবলম্বন করিবে। নারদমুনি ইহা আগেই বুঝিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনিই দেবরাজের নিমন্ত্রণ দৈত্যরাজের কাছে আনিযাছিলেন, এবং ইহার ফল কি দাঁড়াইবে তাহা ঋষিসুলভ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়া চিঠি দিবার আগেই এই স্বগত উক্তি করিয়াছিলেন—

"মন! স্বকার্যসাধন তোমার মৌরশী কার্য। অসুররাজ দেবতাদের গালে চড় মেরে, ফাঁকি দিয়ে যে মিউনিসিপালিটি কেড়ে নেবে, তা তো তুমি আভাসেই জেনেছ; এখন ফাঁকে ফাঁকে থেকে রগড় বাধিয়ে মজা দেখ। এখন ত দেবতাদের সুসভ্যতার ফেরে পড়ে গোঁপ-দাড়িতে কলপ দিলেম, চোনেট করা কাপড় চাদর আর বিলাতি জুতাও পরলেম, ইংরেজিও কিছু কিছু শিখতে হয়েছে, এখন যেনতেন প্রকারেণ বিবাদেন মহাফলং। হে নারায়ণ। যেন আমার চিরকেলে নামটা লোপ হয় না। দুরন্ত অসুর-মক্ষিকে চেয়ারম্যানরূপ মধুর কলসি দেখিয়ে কলে ফেলে পেষণ দিতে হবে; এখন ছলেকলে বিবাদটা গুরুপাকে দাঁড় করাতে পারলেই মজা হয়।

নারদঋষির মনোবাসনা একোবরে বারোয়ারি পূজা হইতে, অর্থাৎ ইলেকশনের উপক্রমণিকা হইতেই পূর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। পুরোহিত কে হইবে, দেবরাজের সভায় এই প্রশ্ন ওঠাতে কেউ কেউ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নাম করিল, শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিয়া বৃহস্পতি বলিলেন—

"বটেই তো, বটেই তো, সেটা কে? সেই অসুরদের পুরুত শুক্রাচার্য — সেটা ভণ্ড, গণ্ড, বেল্লিক, পতিত, তাকে ভাগ দেব, না তো দেব কাকে? বেটা বামন হয়ে গাড়োয়ানি করেছে, বেটা আবার পুরুতি করবে।"

নারদ স্বভাববশে কথাগুলি দৈত্যরাজসভায় শুক্রাচার্যকে বলিয়া দিলেন। আর যায় কোথায়! শুক্রাচার্য রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—

"কি, ব্যাটার এত বড় আস্পর্ধা! আমার উপর বড় কথা? বলি, ও নারদঠাকুর, সেটার বুঝি একঘরে হবার ভয় নেই? তার ঘরের কুচ্ছ বার কল্লে ঘাড়টা হেঁট করে 'বাপ বাপ' করে দৌড় মারতে হবে। জানে না, ব্যাটা হরমণি ব্যাওয়ার বাড়িতে ফলার করে চার আনা দক্ষিণা এনেছে, আর ব্যাটা হাটেবাজারে একটা পয়সার জন্যে মেছুনী মাগীর ঝাঁটা খায়, ব্যাটা আবার গাড়োয়ান নাড়া নাড়তে আসে। (মহারাজের প্রতি) ব্যাটাকে আনন্দবাজার থেকে ঘাড় ধরে বার করে দিন।"

যাহা হউক, সাধারণ ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়াই পূজা আরম্ভ হইল। এই ব্রাহ্মণ দেবপক্ষের। সে 'ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু' বলিয়া পূজা আরম্ভ করিল—

"ওঁ অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ। কাশ্যপ গোত্রস্য শ্রীসহস্রলোচন-দেবশর্মণঃ সপরিবারস্য সদেবস্য শুভকর্মার্থায় শুভ মিউনিসিপালিটি কার্যনিষ্পন্নার্থায় বারোয়ারি পূজাং করিষ্যামি।"

চিৎকার করিয়া বাজনদারদের বলিলেন, "ওরে বাজাদারেরা, বাজা, বাজা।"

এমন সময়ে দৈত্যপক্ষের যুবরাজ হুতুমের দারোয়ানরা পূজা নষ্ট করিবার জন্য দৌড়িয়া আসিল। প্রথম দারোয়ান ডলগু সিং বলিল,

"আরে নচমী সিং, পাকড়ো শালেকো, যুবরাজ হুতুম মহারাজকা বাত মানতা নেহি।"

নচমী সিং — "আরে সবুর ভাই। ও লোক ব্রাহ্মণ হ্যায়, ওস্কো ক্যা দোষ হ্যায়? (পুরোহিতের প্রতি) এ ঠাকুরজী, আরে জলদি উঠো। যুবরাজ হুতুম কা হুকুম হ্যায় তোমকো নেহি পূজা করনে দেগা।"

পুরোহিত (সকম্পনে) — "কেন বাবা, হামকো কি দোষ আছে, বাবা? কোথা যাব বাবা? দেবরাজ ইন্দ্র বাবা, তোদের বাবা, পায়ে পড়ি বাবা, বামনী বাবা, একা ঘরে বাবা!"

জব্বর সিং — "ক্যা শ্যালে, তোম্ গালি দেতো হ্যায়? তোম বাবা হ্যায়? শালে আদমী জানতা নেহি, শনিমহারাজ, অসুররাজ, গজোদরবাবু আউর কলিরাজ আকে ওনকো সেলাম দেতা হ্যায়?"

কিন্তু আবার দেবপক্ষ হইতে সবেগে সদলবলে শশধরবাবুর (অর্থাৎ চন্দ্রের—দেবতারা সকলেই বাবু হইয়াছেন) প্রবেশ। তিনি বলিলেন,

"কে আছিস রে। ধর শালাদের, খুঁটিতে বেঁধে পঁচিশ পঁচিশ জুতো হাক্‌রা ও ব্যাটাদের। হুতমো ব্যাটার কথায় পুজো বন্ধ। ব্যাটার তো গুণের অবধি নাই। ধর ব্যাটাদের ধর, এক ব্যাটাকে ছেড়ো না!" সঙ্গে সঙ্গে হুতুম যুবরাজের দারোয়ানরা পলায়ন করিল। শশধরবাবু বলিলেন,

"পুরুতমশাই! আপনি পুজো করুন। কোন শালা কি করে দেখি।"

ইহার পর ইলেকশন-পর্ব আরম্ভ। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিব যে, আমি অল্পবয়সে কলিকাতার উপকণ্ঠে বারোয়ারি পূজা এইভাবে সম্পন্ন হইতে দেখিয়াছি। একদল পূজা করিতেছে, এমন সময় পরাজিত দলের এক যুবক দৌড়িয়া আসিয়া অভিসম্পাত করিয়া পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিল। তখন বিজয়ী দলের নেতা যুবককে ধরিয়া হাড়িকাঠের দিকে টানিতে টানিতে বলিলেন, "শালাকে মায়ের কাছে বলি দেব!"

ইলেকশন অভিযান

নারদঋষি ইলেকশনের নোটিস পড়িয়া শুনাইলেন—

"এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আগামী ২৫শে জানুয়ারি তারিখে হেভেন মিউনিসিপালিটির ইলেকশন হইবেক। স্ব স্ব ওয়ার্ডের ভোটদাতাগণ উপস্থিত থাকিয়া কমিশনার নির্বাচন সম্বন্ধে ভোটপ্রদান করিবেন। সর্বভুক গভর্নমেন্ট হইতে ম্যাজিস্ট্রেট আসিয়া ইলেকশন কার্য সম্পন্ন করিবেন।"

তাহার পর ভোট যোগাড়ের পালা আরম্ভ হইল। প্রথমে ঘরে পরামর্শ, কাহাকে দেওয়া এবং কিসের জন্য দেওয়া বা না-দেওয়া। শনি নিজের বাড়িতে দুই পুত্র বৃশ্চিক ও কর্কটের উপরোধ ও ধমকের ফেরে পড়িয়াছেন। বৃশ্চিক বলিতেছে—

"না বাবা, তোমার মত হলেই গজোদরবাবুর জয় হয়, তোমার এইটি করতেই হবে।"

কিন্তু গজোদর সম্বন্ধে শনির ঘোরতর ব্যক্তিগত আপত্তি। তাই তিনি বলিলেন—

"দেখ বৃশ্চিক, সেবারকার দায়রা সপরোদ্দের কথা বুঝি মনে নেই? সরকারি উসুল ছাট টাকাকড়ি যা কিছু আমার সম্বল ছিল, ঐ গজোদর হতেই তো আমার সব গেছে। ঐ তো চৌগোপ্পা গেঁজেলকে সাহায্য করে আমাদের চোখের জলে নাকের জলে করেছে। না বাবা, আমি সে সব পারব না। আর দেবতাদের সর্বনাশ কার আর যাই করি, দেবতারা আমার অপর নয়।"

পিতার এই অমত শুনিয়া অন্য পুত্র কর্কট একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহার ব্যক্তিগত

শত্রুতা ইন্দ্রের উপর, সুতরাং তাহার পক্ষপাতিত্ব দৈত্যকুলের ক্যান্ডিডেটের দিকে। সে বাপকে ধমক দিল —

"আপনি অতি Stupid-এর মত কথা বলেছেন। Past event-এর সূচনা করা মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুরই পরিচয় নয়। সেদিন চিরবৈরী ইন্দ্র পুকুর-কাটা কথা নিয়ে রাজসভা মধ্যে আমাকে কি অপমানটাই না কল্লে। Revenge! Revenge! প্রতিহিংসাই এর প্রধান মুষ্টিযোগ! চিরকালটাই যে একভাবে থাকতে হবে, তার মানে কি? গজোদরবাবু একজন সামান্য লোক নন। আর এদিকে দেবতারাও তো তোমাকে একরকম একপেশে করেছে। পুজোর ভাগ গ্রহণ করে না, তুমি যেদিকে দৃষ্টিপাত কর তার ত্রিসীমানায় থাকে না। আবার আমাকে দাদাকে দেখে ঠাট্টা করা হয়। এ সব দেখে শুনেও বুঝি জ্ঞান জন্মায় না? Fie, fie!"

পিতাপুত্রে ঘোরতর ঝগড়া বাধিয়া উঠিল।

অন্যদিকে ভোটপ্রার্থীরা ভাল করিয়াই জানেন যে, শুধু বড়লোকের ভোট যোগাড় করিয়া জেতা যাইবে না, "ছোটলোকেরা" বেশিসংখ্যক, সুতরাং তাহাদের ভোটের মূল্য বেশি। তাই দৈত্যপক্ষের ক্যান্ডিডেট গজোদরবাবু মুসলমানপাড়ায় গিয়া নেমকহারাম গাজী মিঞাকে হাত করিবার চেষ্টা করিলেন, সঙ্গে তাঁহার দালালরাও আছে। গজোদর বলিলেন,

"আচ্ছা, গাজীসাহেব! তুমি যত টাকা নেও দেব, আমাদের পক্ষে ভোট দিতে হবেই; নয়ত তোমার এই খানকার[১] দ্বারদেশে পড়ে রইলুম। বুকে পা তুলে মেরে দে না; জয় জগদীশ্বর! যা কর বাবা গাজীসাহেব। আজ তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।"

গাজী— "আরে শালার ভাই শালারা বড় ভগরে (ফক্করে) ভেন্‌নেক (ফেললেক) যে! সুমুন্দির ভাই নড়ে না যে! যেন পাষাণ হোই দেখ, আত্তির দুপুরের বেলায় যেন একটা অগড় (রগড়) পেয়েচে। ডাকবো নাকি লোকগর, ছেড়ে দেনা।"

ব্যাপার দেখিয়া গজোদরবাবুর দালাল অকালকুষ্মাণ্ড ক্যানভাস করিবার ভার নিল—

"বাবা গাজী! তোর পায়ে পৈতে ছিঁড়বো।" (পৈতা জড়াইয়া গাজীর পদতলে পতন)

গাজী — "আরে শালা বামোন কল্লাক্ কি! হুঁ হুঁ আমার ছাবাল পোলাগার মোল্লি হোবাক যে, খেন্তো দে, খেন্তো দে।"

অকালকুষ্মাণ্ড — "বল্ বাবা, কালপেঁচাবাবুর দুটো ভোট? তুই যত টাকা চাস দেবো।"

গাজী (ক্ষণেক চিন্তার পর) — "আচ্ছা, বল শালা বামোন, ২৫ টাকা দিবি? হ্যাঁ ঝানলুম যে এক ঘা দায় অক্যে গেলা? দে ২৫ টাকা, দেবো তোমায় দুটো ভোঁট।"

ইলেকশন সম্বন্ধে নারীগণের আলোচনা

আজকাল মেয়েরা রাজনীতি ও ইলেকশনে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। ভোট দেওয়ার ব্যাপারে তাঁহাদের যে উৎসাহ, তাহা সংবাদ ও ছবি এই দুইটার সহযোগে খবরের কাগজে জাহির করা হয়। ভোটের নেশা তাঁহাদের ধরিয়াছে, সুতরাং সেই পুরাতন নিরপেক্ষ দৃষ্টি তাঁহাদের আর নাই। সে যুগে মেয়েরা এই হুজুগের বাহিরে ছিলেন, সুতরাং ব্যাপারটাকে অনেকটা সাদা চোখে দেখিতে পারিতেন। ইহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। স্বর্গ মিউনিসিপালিটির ইলেকশানের হাঙ্গামা যখন চলিতেছে, তখন নানা বয়সের কয়েকটি স্বর্গবাসিনী মানস

সরোবরে জল নিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আছেন বৃদ্ধা ক্ষ্যামাদিদি (কলসি-কক্ষে একটি বালিকা সহ) এবং সর্বমঙ্গলা, মধুমতী প্রভৃতি স্বর্গের ঋষিবালারা। ক্ষ্যামাদিদি বলিলেন, "হ্যাঁ লো মধুমতী, তোর ভাতার নাকি টোলে পড়া ছেড়ে দিয়ে দেবতাদের ছেলেদের সঙ্গে ইংরেজি পড়া আরম্ভ করেছে? ওমা, যাব কোথায়! আমরা বামন-পণ্ডিতের ঝি-বৌ, শাচতোর নেচতোর মানবো বলে বড় বড় ভট্টাচার্য দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন। তা ভাই, আজকাল কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়েছি।

কালে কালে দেখব কত,
দেখে শুনে বুদ্ধিহত।"

সর্বমঙ্গলা বলিলেন,

"তা ক্ষেমীদিদি, শুধু ওর ভাতার কেন, দেবতারা পর্যন্ত বিগড়ে গেছে! তার সাক্ষী দেখ না কেন, আমরা স্বর্গের ঋষিবালা, অধর্ম কাকে বলে তার নামটি পর্যন্ত জানতেম না; তা এখন তেমনই ধর্মকর্ম লোপ হয়েছে; দেবরাজ ইন্দ্রি, (নাকে হাত দিয়া) ওমা, তাকে আর দেবরাজ ইন্দ্রি বলবার যো নাই। তিনি এখন ইন্দিরবাবু হয়েছেন। আর সেই বুড়ো শশধর আর অগ্নি অবতার মিলে স্বগ্যে যে মিছরিপালী এনেছেন, ইন্দিরবাবুও তাতে যোগ দিয়েছেন। ওপরওয়ালারা তাঁদের নাকি বড় ভালবেসেছেন। তাই স্বগ্যের চার্দিকে পাকা রাস্তা, বাঁধা ঘাট, ইস্কুল-কলেজ, এই কুছিষ্টি করে একেবারে স্বগ্যসুদ্ধ খিস্‌টান করে তোলবার উয্যোগ তুলেচেন।"

মধুমতী (ইনি ঋষিবালাদের মধ্যে আধুনিকতার পক্ষে) বলিলেন, "ও ঠান্‌দিদি! বলি তোমরা কি আমাদের সভ্যভব্য হতে দেবে না? চিরকালটাই তোমাদের মুখে সেই মনসার ভাসান, আর দাতা কর্ণের পর্ব শুনব? এখন দেখ দেখি, আমরা কত নতুন নতুন বই পড়চি, কত দেশ-বিদেশের ইতিহাস, কত রাজ-রাজড়ার গল্প পড়চি। ইংরেজ সাত সুমুদ্দুর তের নদীর পারে কোথায় কি কচ্চে, আমরা স্বর্গরাজ্যে বসে তার সমস্ত খবর পড়চি, দেখ দিদি, কত সুবিধা।"

ক্ষেমা — "মর ছুঁড়ী, একেবারে গোল্লায় গিচিস। আচ্ছা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুই ইংরেজি পড়া মেয়ে, মিছরিপালীর খবর-টবর কিছু জানিস? বলি, নারুদে অলপ্পেয়ে যে, দিন নেই রাত্তির নেই কেবল 'ভোঁট' করে ঢোল পিঠে বেড়াচ্চে, এর মানেটা কি?"

মধুমতী (স্বগত) — "ভাল বুড়ির হাতে পড়েছি, লেখাপড়া না জানলে এই দশা হয়।" (প্রকাশ্যে) — "ওগো, মিছরিপালী নয়, মিউনিসিপালিটি, আর ভোঁট নয়, ভোট; শশধরবাবু আর অন্য অন্য দেবতারা মিলে যে মিউনিসিপালিটি এনেচেন, তারই তিন বচ্ছর অন্তর একটা করে ইলেকশন হয়।"

ক্ষেমা — "আ মলো! এ-লো-কা-শু-ন-দি আবার কি?"

মধুমতী — "*তোমার মাথা! এলোকাশুন্দি নয়, ইলেকশন, অর্থাৎ একটা নূতন বন্দোবস্ত হয়ে, মিউনিসিপালিটির কর্তা বাছা হবে, স্বর্গের সব লোক মিলে যারে পছন্দ করে, সে ওই কর্তাপদটি পায়, তাই এত ভোটের গোলমাল হয়েছে।*"

ক্ষেমা — "কে জানে ভাই! তোদের ও ইংরেজি-ফারসি কিছুই বুঝি নে।"

সর্বমঙ্গলা — "বলি, ও দিদি, এতদিন বোঝনি, এখন বুঝতে হবে। সেদিন আমাদের কত্তাকে নিয়ে হুলস্থুল বেঁধে গেছেলো। ইন্দিরবাবু বলেন, 'দুটো ভোঁট আমারে দিও', হুতুমবাবু বলেন, 'তা হবে না, আমাকেই দুটো দিতে হবে।' শেষে দাঙ্গার উয্যুগ আর কি! তারপর হুতুমবাবু রাত্রে কত্তাকে ডাকিয়ে নিয়ে এক থান বনাত, ২৫টে টাকা নগত, আর আমাদের হাঁসচাঁদকে একখানা খেঁশ না টোঁশা কি বলে, আর এক জোড়া সিমলের জুতো দিয়ে ভোট দেবার জন্যে কত্তাকে কবুল করে নেচেন।"

নেপথ্যে ঢোলের শব্দ শোনা গেল। ক্ষেমাঠাকুরানীর সঙ্গের বালিকা সক্রন্দনে ভীতস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, "ওই ভোট আসছে গো!"

ক্ষেমা — "ও মেয়েরা পালা রে, পালা। ওই সেই ভোঁট। ওরে দেবতাদের ভিটেয় ঘুঘু চরে আবুর (আব্রু) সম্ভ্রম সব গেল রে! ওরে পালিয়ে আয় রে, পালিয়ে আয়!"

এই ত গেল ঘাটের বিচার। এরপর ঘরের বিচার। বকাসুর স্বর্গে মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী। ভোট যোগাড়ের হিড়িকে অন্তঃপুরেও আসিতে পারেন নাই। আজ প্রাসাদের ভিতরে নিজ শয়নগৃহে শয্যায় শায়িত, পাশে রানী আমোদিনী। আমোদিনী বলিলেন,

"না, প্রাণনাথ! আজ আমি তোমাকে কখনও যেতে দেব না। আজ পনেরো দিনের পর তোমাকে দেখা পেয়েছি। আচ্ছা, তোমার মনে কি একটু মায়াদয়া নাই? মাগ-ছেলে, বিষয়-আশয় ফেলে কেবল 'ভোট' 'ভোট' করে ঘুরে বেড়াচ্চ! ছি ভাই, তুমি বড় বেরসিক। আজ আর আমি তোমাকে কখনও যেতে দেব না। আজ তোমাকে হারমোনিয়ামের সেই 'সাদের তরণী আমার' ভাঙা গৎখানি শেখাতে হবে। আর সেই অলপ্পেয়ে ডেকরা ঘোষমন্ত্রী এলে তারে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেব।"

আমোদিনীর অতঃপর হারমোনিয়াম আনয়ন। ভয় পাইয়া বকাসুর অনুনয় করিতে লাগিলেন — "ক্ষান্ত হও, প্রিয়ে! প্রায় খেঁশে এনেছি, আর দু-দুটো দিন মেহোন্নত কল্লে দেবতাদের গালে চড় মেরে চেয়ারম্যানি নেবো। তোমার পায়ে পড়চি, ভাই! এ-সময় বাধা দিও না।'

আমোদিনী না মানিয়া বলিয়া উঠিলেন,

"ভাল রসিকচূড়ামণি তুমি যা হোক। কি এক অলক্ষণে ভোট রোগ ধরে আমার এমন রসময়ের সোনার অঙ্গটি কালি করে দিলে।"

আরও অনেক কথা বলিয়া আমোদিনী হারমোনিয়াম সহযোগে গান ধরিলেন—

(রাগিণী সিন্ধু। তান মধ্যমান)

"যেও না, যেও না, প্রাণনাথ,
আমার মাথা খাও।
মিছে ভোটের আশে কেন (ও প্রাণনাথ!)
দিবানিশি কষ্ট পাও।
বার জনার কুমন্ত্রণা,
ও প্রাণনাথ, আর শুনো না,

ভোটেতে সে সুখ হবে না,
(ও নাথ) যে সুখ সংসারে পাও।"

কিন্তু বকাসুর ভোটের সন্ধানে বাহির হইয়া গেলেন।

শাশুড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "ও বউ, আমার সোনার চাঁদ ছেলে বেরিয়ে গেল, আর এই কি তোমার গান গাইবার সময়!" দুই দুঃখিনী নারী কথাবার্তা বলিয়া যুগধর্মের কাছে নিবেদন করা ছাড়া আর কোনও পথ দেখিল না। তাই আমোদিনী প্রার্থনা করিলেন—

"হে বাবা কলি! তোমার মতন অঘটন ঘটাতে আর দুটি নাই। তোমার কৃপায় উপযুক্ত ছেলে বুড়ো বাপ-মার গলায় দড়ি দিয়ে স্ত্রী কাঁধে বহন করে, ভিখারি দ্বারে আসিলে ভিক্ষার পরিবর্তে প্রহার পেয়ে থাকে, তোমার কৃপায় হিঁদু হিঁদুয়ানী ছেড়ে তোমারই অনুগত হয়; আর ওর মধ্যে কোন ব্যক্তি মৃত মাতার মুখাগ্নি না করে বিপরীত স্থানে আগুন দিয়ে থাকে; তুমি যে মূর্তিতে হুতুমের সহায় হয়ে গুপ্ত কার্যে উৎসাহ দান করে থাক, আর তাকে লক্ষ্মীস্বরূপিণী স্ত্রীসুখে বঞ্চিত করে অট্টালিকা থাকতেও কোটরবাসী করিয়েছ, সেই মহাগুণপ্রভাবে আমার স্বামীকে চেয়ারম্যান করে দাও, যেন দেশের সব লোক আমার স্বামীকে ভোট দেয়! আমি উপবাসী থেকে তোমার নামে এক পালা ভোটমঙ্গল গান দিব।"

* * *

ইলেকশনের প্রতি সে-যুগের বাঙালির এই অভক্তি দেখিয়া কেহ কেহ যে এখনও উহাকে সেকেলে সংস্কার বা কুসংস্কার বলিবেন, তাহা আমি সম্ভব মনে করি। ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য শুধু এই, পুরাতনের প্রতি অবিচল আসক্তি যেমন সংস্কার, নূতন মাত্রেরই প্রতি চঞ্চল ভক্তিও তেমনই সংস্কার — দুইটা একই জিনিসেরই এ-পিঠ আর ও-পিঠ। সে যাহাই হউক, অনেকে যে ইহা হইতে আমোদ অনুভব করিবেন, তাহা সুনিশ্চিত। আমি করিয়াছি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসিয়া বাঙালির পুরাতন রসবোধের এই প্রমাণ যে পাইব, তাহা আশা করি নাই। সর্বোপরি আনন্দ পাইয়াছি, আজকালকার বিলাত-ফেরত বাংলার বদলে একেবারে নেটিভ বাংলা ভাষা পড়িয়া।

১. ইংরেজ শাসনের এই সংজ্ঞা উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ সব খায়, সেই জন্য 'সর্বভুক', আবার দেশের সকল সম্পদ গ্রাস করিতেছে, সেজন্যও 'সর্বভুক'।

২ 'খানকা' অর্থ মুসলমান ফকিব-দরবেশদেব থাকিবাব জায়গা : পবে সাধাবণ সবাই অর্থে ব্যবহৃত হইত, ইহা হইতেই 'খানকী' কথাটা আসিয়াছে।

□ *দেশ*, সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৮৩

দূরপ্রাচ্যে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব

প্রবোধচন্দ্র বাগচি

খ্রিস্টিয় প্রথম দ্বিতীয় শতকের মধ্যেই ভারতীয় সভ্যতার বিভিন্ন ধারা প্রাচ্য এশিয়ার নানা দেশে প্রসার লাভ করে। সমুদ্রপথে ভারতের বণিকসম্প্রদায় বহুপূর্ব থেকেই শ্যাম, ইন্দোচীন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত আরম্ভ করে। এ-সমস্ত অঞ্চলের সভ্যতা সেকালে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ছিল এবং সেখানে কোনো ক্ষমতাশালী রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে মনে হয় না। এই কারণেই ভারতীয়গণ অল্পকালের মধ্যেই সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও ইন্দোচীনে উপনিবেশ স্থাপন ও শক্তিশালী হিন্দুরাজ্য গঠন করতে সমর্থ হন। গুপ্তযুগের পূর্বেই যেসব হিন্দুরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যে ইন্দোচীনে কম্বুজ ও চম্পা এবং দ্বীপময় অঞ্চলে শ্রীবিজয়রাজ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কম্বুজরাষ্ট্র বর্তমান কাম্বোডিয়া ও শ্যাম নিয়ে গঠিত হয়। চম্পারাজ্য আনামপ্রদেশের দক্ষিণাংশে এবং শ্রীবিজয় সুমাত্রার পালেম্বাংপ্রদেশে অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে যবদ্বীপ ও মলয় উপদ্বীপের কতকাংশ শ্রীবিজয়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইসমস্ত রাজ্যে হিন্দু সংস্কৃতিই ছিল প্রাচীনকালে স্থানীয় সভ্যতার মূল উপাদান। যতদিন ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূত্র দৃঢ় ছিল, ততদিন ছিল এইসমস্ত রাজ্যের গৌরবময় যুগ। এই যুগের যে-সমস্ত শিল্পনিদর্শন আছে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় শিল্পের ধারা রক্ষা করেছে। চম্পা, কম্বুজ, শ্যাম ও যবদ্বীপের প্রাচীন হিন্দু মন্দিরগুলির মধ্যে শুধু যে হিন্দুধর্মের প্রভাবই পাওয়া যায় তা নয়। তাদের উপাদান, গঠন-পদ্ধতি, মন্দিরগাত্রে প্রস্তরে কারুকর্ম, ভাস্কর্য প্রভৃতিতেও সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় শিল্পের ধারাই অনুসৃত হয়েছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূত্র শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই শিল্পের অবনতি ঘটে। স্থানীয় সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত না হওয়ায় তা ভারতীয় সভ্যতাকে অঙ্গীভূত করে নিয়ে কোনো নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টিও করতে পারে নাই।

কিন্তু মধ্য এশিয়া ও চীনদেশে ভারতীয় কৃষ্টির যেসব ধারা পৌঁছায় তা স্থানীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত হয় এবং নতুন সংস্কৃতির গঠনে সহায়তা করে। তার কারণ চীনদেশের সভ্যতা ছিল অতি উন্নত ধরনের, খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের পূর্বেই সে-দেশের শিল্প ও সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সে-দেশের ধর্ম ও দর্শন সমস্ত দেশবাসীর মধ্যে প্রসার লাভ করে। খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে যখন ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনদেশের প্রথম যোগসূত্র স্থাপিত হয়, তখন চীনারা ভারতীয় সভ্যতার সেইসমস্ত ধারাই গ্রহণ করল যা তাদের অতি নতুন ও প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়েছিল।

খ্রিস্টিয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে চীনদেশে ভারতীয় সভ্যতার ধারা পৌঁছায় স্থলপথে। এ-পথ আফগানিস্তান, বাহ্লিক (বাল্‌খ), মধ্য এশিয়ার নানা জনপদ — কাশগর, খোটান, কুচি প্রভৃতি হয়ে চীনদেশের উত্তরাঞ্চলে শান্‌শি ও হোনান প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হতে ভারতীয় বণিকসম্প্রদায় খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের পূর্বেই মধ্য এশিয়ার নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। পরে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ক্রমশ সেসব দেশে যাতায়াত শুরু করেন। খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের শেষভাগে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে প্রচারিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও আচার্যদের চেষ্টায় আফগানিস্তান হতে চীন পর্যন্ত সমস্ত দেশেই বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গুপ্তযুগের পূর্বেই এইসমস্ত দেশে একটি বিরাট আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্কৃতির মূল উপাদান ছিল ভারতীয় সভ্যতা। স্থানীয় সভ্যতার ধারাও একে পরিপুষ্ট করে তুলেছিল।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের ধারাও মধ্য এশিয়ার পথে চীনদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকেই বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করে ভারতে একটি উন্নত ধরনের শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। এই শিল্পের দুটি প্রধান অবদান হচ্ছে স্তূপ ও চৈত্য-বিহার। চৈত্য-বিহারগুলি গুহা-মন্দির বললেও ভুল হয় না। কারণ এ-শিল্প পর্বতগাত্রের প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম গুহা অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। একটি প্রশস্ত গুহায় চৈত্য স্থাপিত হত এবং সেই গুহায় পর্বদিনে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সম্মিলিত হতেন। এই চৈত্যগুহার নিকটে পর্বতগাত্রে আরও অসংখ্য গুহা নির্মিত হত। সেই গুহাগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হত। তাঁরা সেখানে নির্জনে ধ্যান-ধারণা ও অধ্যয়নে কালাতিপাত করতেন। এই ধরনের গুহা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকেই নির্মিত হতে থাকে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গুহা দেখতে পাওয়া যায় বিহারপ্রদেশে বরাবর পর্বতে। এই গুহার নাম 'লোমশ ঋষির গুহা'। এখানেও ভিক্ষুরা বাস করতেন। পরবর্তী যুগে ভাজা, নাসিক, কার্লে, খণ্ডগিরি প্রভৃতি স্থানেও এই ধরনের গুহা-মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। এই শিল্পের চরম উন্নতি সাধিত হয় গুপ্তযুগে — তার প্রধান নিদর্শন পাওয়া যায় অজন্তায়। প্রথম যুগের গুহাগুলির মধ্যে কোনো লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য না থাকলেও পরবর্তীকালে এইগুলিকে অবলম্বন করে নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টি চলে — গুহার মধ্যে নানা কারুকার্য, গুহার গাত্রে চিত্রাঙ্কন, প্রস্তরে নানা মূর্তির কল্পনা। এই চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের চরম পরিণতি দেখতে পাওয়া যায় অজন্তার গুহায়। বৌদ্ধ শিল্পের এইসমস্ত ধারাই মধ্য এশিয়া ও চীনদেশ পর্যন্ত প্রসার লাভ করে।

মধ্য এশিয়ার পথে হিন্দুকুশ পর্বতের অন্তঃপাতী বামিয়েন নামক স্থানে এই বৌদ্ধ শিল্পের যেসব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা ভারতীয় শিল্পের ধারাই অনুসরণ করে। এই স্থানে প্রাচীন যুগের গুহা-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। গুহামন্দিরের প্রাচীরচিত্রের কতকাংশ এখনও সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় নাই। সেই চিত্রগুলি অজন্তার প্রাচীরচিত্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তার বিষয়বস্তু, পরিকল্পনা ও রচনাভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে অজন্তার অনুরূপ। এই সমস্ত গুহার নিকটে পর্বতগাত্রে কতকগুলি বিরাট বুদ্ধমূর্তি খোদিত হয়েছিল। এই মূর্তিগুলির মধ্যে কতকগুলির উর্ধ্বতা প্রায় ৯০ ফুট। এ ছাড়া আরও অনেক বুদ্ধমূর্তি এ-অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। এগুলিতে যে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভাস্কর্যের ধারা অনুসৃত

হয়েছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ভারতীয় শিল্পের এই বিশিষ্ট ধারাকে Indo-Greek Art এই আখ্যা দেওয়া হয়। কারণ এর মধ্যে একটি বিশিষ্ট গ্রিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পাঞ্জাবপ্রদেশে যে-সমস্ত গ্রিক স্থায়ীভাবে বসবাস করত তাদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। খুব সম্ভব তাদের হাতেই এই নতুন শিল্প-পদ্ধতি গড়ে ওঠে। এই শিল্প-পদ্ধতির চরম বিকাশ হয় কুষাণযুগে — খ্রিস্টিয় প্রথম দ্বিতীয় শতকে। এই কারণেই বামিয়েন এবং মধ্য এশিয়ার নানা স্থানে, এমনকী চীনের হোনান প্রদেশে ভাস্কর্যের এই বিশিষ্ট রচনাশৈলীর নিদর্শনই বেশি পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে, গুপ্তযুগে গ্রিকপ্রভাবমুক্ত বিশুদ্ধ ভারতীয় ধারাও যে এসব অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

খোটান ও কাশগরের নিকটবর্তী নানা স্থানে বৌদ্ধ যুগের ধ্বংসস্তূপ হতে প্রাচীন কালের নানা শিল্পনিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। নানা বৌদ্ধ মূর্তি, চিত্রিত পট, ভারতীয় লিপিতে লিখিত নানা পুঁথি প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ সংস্কৃতির সাক্ষ্য দেয়। বৌদ্ধ মূর্তি হতে ভারতীয় ভাস্কর্যের যে-বিশিষ্ট ধারার খোঁজ পাওয়া যায় তা ইন্দো-গ্রিক। অনেকস্থলে এরূপ অনুমানও করা হয়েছে যে, অনেক মূর্তির মূল উপাদান তক্ষশিলা হতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। খোটানের নিকটবর্তী দান্দান উইলিক্ নামক স্থানে প্রাচীন যুগের কতকগুলি বৌদ্ধ গুহা আছে। এই গুহাগুলির প্রাচীরচিত্রের মধ্যে বামিয়েনের প্রাচীরচিত্রের মতোই ভারতীয় ধারার খোঁজ পাওয়া যায়। চিত্রের পরিকল্পনায় দুই-এক স্থানে পারসিক প্রভাব চোখে পড়লেও মূল ভারতীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বিষয়বস্তু ও রচনানৈপুণ্য হতেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। এই গুহাগুলিও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নীরব সাধনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হত। প্রাচীন যুগের চীনা পরিব্রাজকেরা এ-অঞ্চলে আরও অনেক গুহা দেখেছিলেন। খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে চীনা পরিব্রাজক, হিউয়ান-সাং খোটানের পথে স্বদেশে ফিরে যান। তিনি বলেছেন — 'ইয়ারকন্দের দক্ষিণে যে উচ্চ পর্বতশ্রেণী আছে তা ঘন বনানীর দ্বারা আবৃত। এই পর্বতমালা হতে নানা স্রোতস্বতী জল বহন করে আনে। সেইসব পর্বতের ধারে বনানীর অন্তরালে কিংবা স্রোতস্বতীর নিকটবর্তী স্থানে অনেক গুহা আছে, আর সেইসব গুহা হচ্ছে বৌদ্ধ সাধকদের নির্জনে সাধনার স্থান।' এইসব গুহার সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি। এসব গুহাও যে মধ্য এশিয়ার অন্যান্য গুহা-মন্দিরের মতোই ছিল তাতে সন্দেহ নাই।

খোটান হতে যে-পথ চীনের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছে এই পথের উপরে দান্দান-উইলিক হতে আরও পূর্বদিকে মিয়ান নামক স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অনেক ধ্বংসস্তূপ আছে। এইসমস্ত স্তূপ হতে প্রাচীন যুগের যে-বৌদ্ধ শিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে তা খোটান অঞ্চলের প্রাচীন শিল্পের সঙ্গে তুলনীয়। এই নিদর্শনগুলি দুটি বিশিষ্ট যুগের। কতকগুলি হচ্ছে গুপ্তযুগের অন্যগুলি পরবর্তীকালের, খ্রিস্টিয় অষ্টম-নবম শতকের। প্রথম যুগের নিদর্শনগুলির মধ্যে ইন্দো-গ্রিক এবং বিশুদ্ধ ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতির প্রভাব বর্তমান। পরবর্তী যুগের শিল্প চীনা ও তিব্বতি প্রভাবেই অনুপ্রাণিত।

মধ্য এশিয়ার উত্তরাঞ্চলে কুচিপ্রদেশেও ভারতীয় শিল্পের প্রভাব দেখা যায়। কুচির নিকটবর্তী কিজিল নামক স্থানে বৌদ্ধ যুগের অনেক গুহা-মন্দির আছে। এই গুহামন্দিরগুলিকে তুর্কি ভাষায় 'মিং-উই' বলা হয়। এ-কথার অর্থ হচ্ছে 'হাজার মন্দির'।

স্থানে স্থানে এইসব গুহা-মন্দির যে সংখ্যায় ঠিক 'হাজার' না হলেও অনেক বেশি ছিল তাতে সন্দেহ নাই। কিজিলের গুহা-মন্দিরে প্রাচীরচিত্রের যে-নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে নানা দেশের প্রভাব বর্তমান। পারসিক, রোমক ও চীনা প্রভাব তাতে থাকলেও সে-শিল্পের প্রধান অনুপ্রেরণা যে ভারতবর্ষ থেকে এসেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এ-অঞ্চলে যে-ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায় তা ইন্দো-গ্রিক রীতির অনুবর্তী।

ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা মধ্য এশিয়ার পথ বেয়ে মিলিত হয়েছিল চীনসীমান্তে তুন-হোয়াং নামক স্থানে। মধ্য এশিয়া হতে যেসব পথ চীনদেশে গিয়েছে তুন হোয়াং তার সন্ধিস্থলে অবস্থিত। এ-স্থান চীনা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলেও চীনযাত্রী নানা বিদেশি এখানে বসবাস করত। চীনযাত্রী বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও এখানে সাময়িকভাবে থাকতেন এবং বৌদ্ধ শাস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলত। এইসব কারণে তুন-হোয়াং-এ নানা বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তুন-হোয়াং পল্লির নিকটে একটি ছোটোনদীর ধারে অনুচ্চ পর্বতমালা আছে। এই পর্বতের নানা গুহা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আকৃষ্ট করে। নিভৃত সাধনার এরূপ উপযুক্ত স্থান আর বেশি ছিল না। সেই কারণে গুহাগুলি ক্রমশ বৌদ্ধ মন্দিরে পরিণত হয়। খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকেই এই কাজ আরম্ভ হয় এবং সপ্তম-অষ্টম শতক পর্যন্ত চলে। অসংখ্য গুহা নির্মিত ও সুসজ্জিত হয়। প্রতি গুহা চিত্রে ও ভাস্কর্যে সুশোভিত হয় এবং সর্বসমেত এক হাজার বৌদ্ধ মূর্তি নির্মিত হয়। চীনদেশে এ-গুহাগুলি 'হাজার বুদ্ধের গুহা' (Caves of the thousand Buddhas) নামে পরিচিত। এত বড়ো বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান মধ্য এশিয়া বা চীনদেশের অন্যত্র ছিল না।

বৌদ্ধ শিল্পের ইতিহাসে এই গুহাগুলির স্থান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বহু বিভিন্ন ধারার সম্মেলনে যে কী চিত্তাকর্ষক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সৃষ্টি হতে পারে তার নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। গুহাগুলির প্রাচীরচিত্রে ভারতীয়, পারসিক, চীনা প্রভৃতি নানা ধারার সমন্বয় ধরা পড়ে। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তিগুলির বিচার করলে তার মধ্যে বিভিন্ন রচনাশৈলীর প্রভাব দেখা যায়। ইন্দো-গ্রিক ও গুপ্তযুগের বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে চীনা ও তিব্বতি প্রভাবে রচিত নানা বুদ্ধমূর্তি ও পটচিত্রও পাওয়া গিয়েছে।

এই বৌদ্ধশিল্পের ধারা উত্তর চীনে শান্‌শি ও হোনান প্রদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। শান্‌শি প্রদেশে ইউন-কাং ও হোনান প্রদেশে লুং-মেন নামক দুটি প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান আছে। খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকে এ-অঞ্চল বিদেশি রাজাদের হস্তগত হয়। তাঁদের প্রথম রাজধানী তা-তং-ফু নামক স্থানের অতি নিকটেই ইউন-কাং অবস্থিত। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নির্দেশমতো ইউন-কাং-এর পর্বতমালায় এই সময়ের বহু গুহা-মন্দির নির্মিত হয়। ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এ-কাজে সহায়তা করেন। পর্বতগাত্রে বিরাট আকারের বুদ্ধমূর্তি খোদিত হয়। অনেক মূর্তি প্রায় ৬০ হতে ৭০ ফুট।

লুং-মেন হোনান প্রদেশে চীনের প্রাচীন রাজধানী লো-য়াং নগরের নিকটে অবস্থিত। খ্রিস্টিয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে লুং-মেন-এর পর্বতমালায় নানা গুহা-মন্দির নির্মিত হয়। এ গুহাগুলিও ইউন-কাং-এর গুহার ধরনের এবং প্রায় একই যুগে নির্মিত। ইউন-কাং ও লুং-

মেনের ভাস্কর্যে দুটি বিশিষ্ট ভারতীয় ধারার প্রভাব দেখা যায়। একটি ইন্দো-গ্রিক পদ্ধতি, অন্যটি গুপ্তযুগের বিশুদ্ধ ভারতীয় পদ্ধতি। সুদূর চীন পর্যন্ত পৌঁছেও এই দুই শিল্প তাদের বিশিষ্ট রূপ হারায় নাই। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে, ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তত্ত্বাবধানে এইসব বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছিল। তা ছাড়া খুব সম্ভবত ভারতীয় শিল্পীরা প্রভূত লাভের আশায় এসব দেশে যাতায়াত করত, পরবর্তীকাল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পালযুগে বঙ্গদেশের অনেক শিল্পী বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণের জন্য তিব্বত পর্যন্ত যেত। খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে অনীক নামক একজন বিখ্যাত নেপালি শিল্পী তিব্বতে যান। পরে চীন সম্রাটের আদেশে তিনি চীনের রাজধানীতে যান এবং সরকারি শিল্প বিভাগের উচ্চতম পদে উন্নীত হন। তাঁর হাতের নানা কাজ চীনা শিল্পীদের চমৎকৃত করেছিল।

ইউন-কাং ও লুং-মেন-এ যে-বৌদ্ধ শিল্পের নিদর্শন আছে সে-শিল্প চীনারা অতি শীঘ্রই আপন করে নিয়েছিল। যদিও তাদের প্রাচীন জাতীয় শিল্প ছিল, কিন্তু এই নতুন ভারতীয় ধারা নিজস্ব করে নিয়ে তারা সেই শিল্পের পরিপুষ্টিসাধন করে। ফলে পরবর্তীকালের চীনা ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় নতুন নতুন সৃষ্টি সম্ভব হয়। বৌদ্ধধর্মকে চীনারা বিদেশি ধর্ম বলে অগ্রাহ্য মনে করে নাই। সে-ধর্ম হতে বহু প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে চীনা মনীষীরা অভিনব চিন্তাধাবার প্রবর্তন করেন। ভারতীয় শিল্পের ধারাকেও চীনা শিল্পীরা অগ্রাহ্য মনে করেনি। বরং সে-শিল্পের অনুপ্রেরণায় তারা যে নতুন সৃষ্টি করল তা সমস্ত জগৎকে আজও চমৎকৃত করে।

খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকে উত্তর চীন হতে ভারতীয় শিল্পের এই ধারা জাপানে পর্যন্ত পৌঁছায়। ওইসময়ে কোরিয়া হতে বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রথম প্রচারিত হয়। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গেই জাপানের রাজধানী নারার নিকটে প্রথম বৌদ্ধ বিহারের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বৌদ্ধ বিহারের নাম হোরিয়ুজি। এই বিহারেই জাপানি চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। এই মন্দিরে যে-চিত্রকলার নিদর্শন রয়েছে তা অজন্তার চিত্রকলার অনুরূপ। এই চিত্রকলার বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, যেসব শিল্পীদের হাতে এর সৃষ্টি হয়েছিল তারা নিখুঁত ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে পরিচিত ছিল। সেই আদর্শই হোরিয়ুজির চিত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সে-চিত্রকলায় জাপানি হাতের কোনো বিশিষ্ট ছাপ নাই। চিত্রবিদ্যার এই প্রথম দীক্ষা লাভ করবার অল্পকাল পরেই জাপানি শিল্পী চিত্রকলায় তার বিশিষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পেরেছিল। বিদেশি শিল্প-পদ্ধতি সে নিজস্ব করে নিয়েছিল।

□ *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, ২০০১

কবিতার কথা

জীবনানন্দ দাশ

সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি — কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য কবছে। সাহায্য করছে ; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্য প্রাপ্ত হয়; নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।

বলতে পারা যায় কি এই সম্যক কল্পনা-আভা কোথা থেকে আসে? কেউ কেউ বলেন আসে পরমেশ্বরের কাছ থেকে। সে কথা যদি স্বীকার করি তাহলে একটি সুন্দর জটিল পাককে যেন হিরের ছুরি দিয়ে কেটে ফেললাম। হয়তো সেই হিরের ছুরি পরিদেশের, কিংবা হয়তো সৃষ্টির রক্ত চলাচলের মতোই সত্য জিনিস। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের এবং কাব্য সমালোচনা-নমুনার নতুন-নতুন আবর্তনে বিশ্লেষকেরা এই আশ্চর্য গিটিকে — আমি যত দূর ধারণা করতে পারছি — মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খসাতে চেষ্টা করবেন। ব্যক্তিগত ভাবে এ সম্বন্ধে আমি কি বিশ্বাস করি — কিংবা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করবার মতো কোনো সুস্থিরতা খুঁজে পেয়েছি কি না — এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলব না আমি আর। কিন্তু যাঁরা বলেন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে — পৃথিবীর কিংবা স্বকীয় দেশের বিগত ও বর্তমান কাব্যবেষ্টনীর ভিতর চমৎকার রূপে দীক্ষিত হয়ে নিয়ে, কবিতা রচনা করতে হবে তাঁদের এ দাবির সম্পূর্ণ মর্ম আমি অন্তত উপলব্ধি করতে পারলাম না। কারণ আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে, খণ্ডবিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়, — একটি পৃথিবীর-অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, সে সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়, যার ভিতর সমাজশিক্ষা, লোক-শিক্ষা, নানা রকম চিন্তার ব্যায়াম ও মতবাদের প্রাচুর্যই পাঠকের চিত্তকে খোঁচা দেয় সব চেয়ে আগে এবং সব চেয়ে বেশি করে; কিন্তু তবুও যাদের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী, পাঠকের মন কোনো আনন্দ পায় না, কিংবা নিম্নস্তরের তৃপ্তি বোধ করে শুধু, এবং বৃথাই কাব্যশরীরের আভা খুঁজে বেড়ায়।

আমি বলতে চাই না যে কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যাখচিত — অভিব্যক্ত সৌন্দর্য হবে না। তা হতে বাধা নেই। অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই তা হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা,

ধারণা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাক্‌কল্পিত হয়ে কবিতার কঙ্কালকে যদি দেহ দিতে যায় কিংবা সেই দেহকে দিতে চায় যদি আভা তাহলে কবিতা সৃষ্টি হয় না — পদ্য লিখিত হয় মাত্র — ঠিক বলতে গেলে পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও চিন্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু। কিন্তু আমি আগেই বলেছি কবির প্রণালী অন্য রকম, কোনো প্রাক্‌নির্দিষ্ট চিন্তা বা মতবাদের জমাট দানা থাকে না কবির মনে — কিংবা থাকলেও সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করে থাকে কল্পনার আলো ও আবেগ;কাজেই চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকার মতো লুকিয়ে থাকে যেন। লুকিয়ে থাকে;কিন্তু নিবিষ্ট পাঠক তাদের সে সংস্থান অনুভব করে;বুঝতে পারে যে তারা সঙ্গতির ভিতর রয়েছে, অসংস্থিত পীড়া দিচ্ছে না;কবিতার ভিতর আনন্দ পাওয়া যায়;জীবনের সমস্যা ঘোলা জলের মুষিকাঞ্জলির ভিতর শালিকের মতো স্নান না করে বরং যেন করে আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের সাদা রৌদ্রের মতো;— সৌন্দর্য ও নিরাকরণের স্বাদ পায়।

এ না হলে আমরা জিজ্ঞাসা ও চিন্তার জন্যে কেন পতঞ্জলির কাছে যাব না, বেদান্তের কাছে যাব না, ষড়্‌দর্শনের কাছে যাব না, মাঘ ও ভারবির কাছে না গিয়ে? জীবনের ও সমাজের ও জাতির সমস্যার সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট আলোক চাই — অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন, মহাত্মা গান্ধি, পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর কাছে যাব না কেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কাছে না গিয়ে; দার্শনিক বার্গসঁর কাছে যাওয়া উচিত, ইংলন্ডের বা রুশিয়ার অর্থনীতি ও সমাজনীতিবিদ সুধী ও কর্মীদের কাছে যাওয়া উচিত — ইয়েট্‌সের কাব্যের কাছে, এমন কি এলিয়ট ইত্যাদির কাব্যপ্রচেষ্টার কাছেও নয়।

এখন আমি আর একটা কথা বলতে চাই খানিকটা অত্যুক্তি করেই যেন, অথচ যা অত্যুক্তি নয় — আমার কাছে অন্তত সত্য বলে মনে হয়;কাব্যের ভিতর লোকশিক্ষা ইত্যাদি অর্ধনারীশ্বরের মতো একাত্ম হয়ে থাকে না;ঘাস, ফুল বা মানবীর প্রকট সৌন্দর্যের মতো নয়;তাদের সৌন্দর্যকে সার্থক করে কিন্তু তবুও সেই সৌন্দর্যের ভিতর গোপন ভাবে বিধৃত রেখা উপরেখার মতো যে জিনিসগুলো মানবী বা ঘাসের সৌন্দর্যের আভার মতো রসগ্রাহীকে প্রথমে ও প্রধান ভাবে মুগ্ধ করে না — কিন্তু পরে বিবেচিত হয় — অবসরে তার বিচারকে তৃপ্ত করে। যাঁরা এ কথা স্বীকার করেন না, যাঁরা বলতে চান যে কবিতার ভিতর প্রথম প্রধান দর্শনীয় জিনিস কিংবা সৌন্দর্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সৌন্দর্যের মতোই প্রধান জিনিস, হচ্ছে লোকশিক্ষা বা দর্শন বা নানা রকম সমস্যার উদঘাটন তাঁদের আমি এই কথা বলতে চাই যে মানুষ — সে যে অনৈতিহাসিক শতাব্দীতেই প্রথম হোক না কেন — একটা বিশেষ রস সৃষ্টি করল যা দর্শন বা ধর্ম বা বিজ্ঞানের রস নয়, — যাকে বলা হল কাব্য (বা শিল্প) — যার কতগুলো ন্যায্য পদ্ধতি ও বিকাশ রয়েছে; যার আস্বাদে আমরা এমন একটা তৃপ্তি পাই, বিজ্ঞান বা দর্শন এমন কি ধর্মের আস্বাদেও যা পাই না — এবং ধর্ম বা দর্শনের ভিতরে যে তৃপ্তি পাই কাব্যের ভিতর অবিকল তা পাই না;পৃথিবীর শতাব্দী-স্রোতের ভিতর মানুষ যদি এমন একটা বিশেষ রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করল (কিংবা হয়তো অমানব কেউ মানুষের জন্যে সৃষ্টি করল) — কি করে সেই বিচিত্রতার নিকট তার

অনধিগত, অতিরিক্ত দাবি আমরা করতে পারি? কিংবা সেই সব দাবি কবিতা যদি মেটাচ্ছে বা মেটাতে পারে বলে মনে করি তাহলে তার ন্যায্য ধর্ম অভঙ্গুর নয় আর; তার বিশেষ স্থিতির কোনো প্রয়োজন নেই। সে যা দিতে পারে দর্শনও তা দিতে পারে, ধর্মও তা দিতে পারে; সমাজসংস্কারক, জাতিসংস্কারক মনীষীরা এমন কি কর্মীরাও তা দিতে পারে। তাহলে কাব্যের স্বকীয় সিদ্ধির কোনো প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু আমি জানি কাব্যের নিজের ইন্‌টিগ্রিটির প্রয়োজন রয়েছে। এবং এই প্রবন্ধের ভিতর আমার নিজের কথারই পুনরুক্তি করে আমি বলব : 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি — কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্যবিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।' দর্শন বা সমাজসংস্কার বা মানুষের কর্ম ও মননের জগতে অন্য কোনো বিকাশের ভিতর এই কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ঠিক এই ধরনের সারবত্তা নেই।

হতে পারে কবিতা জীবনের নানা রকম সমস্যার উদঘাটন; কিন্তু উদঘাটন দার্শনিকের মতো নয়; যা উদঘাটিত হল তা যে কোনো জঠরের থেকেই হোক আসবে সৌন্দর্যের রূপে, আমার কল্পনাকে তৃপ্তি দেবে; যদি তা না দেয় তাহলে উদঘাটিত সিদ্ধান্ত হয়তো পুরোনো চিন্তার নতুন আবৃত্তি, কিংবা হয়তো নতুন কোনো চিন্তাও (যা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে,) কিন্তু তবুও তা কবিতা হল না, হল কেবলমাত্র মনোবীজরাশি। কিন্তু সেই উদঘাটন — পুরোনোর ভিতরে সেই নতুন কিংবা সেই সজীব নতুন যদি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করতে পারে, আমার সৌন্দর্যবোধকে আনন্দ দিতে পারে, তাহলে তার কবিতাগত মূল্য পাওয়া গেল; আরও নানা রকম মূল্য — যে সবের কথা আগে আমি বলেছি — তার থাকতে পারে, আমার জীবনের ভিতর তা আরও খানিকটা জ্ঞান বীজের মতো ছড়াতে পারে, আমার অনুভূতির পরিধি বাড়িয়ে দিতে পারে, আমার দৃষ্টি-স্থূলতাকে উঁচু মঠের মতো যেন একটা মৌন সূক্ষ্মশীর্ষ আমোদের আস্বাদ দিতে পারে; এবং কল্পনার আভায় আলোকিত হয়ে এ সমস্ত জিনিস যত বিশাল ও গভীর ভাবে সে নিয়ে আসবে কবিতার প্রাচীন প্রদীপ — ততই নক্ষত্রের নূতনতম কক্ষ-পরিবর্তনের স্বীকৃতি-ও-আবেগের মতো জ্বলতে থাকবে!

প্রত্যেক মননীষীরই একটি বিশেষ প্রতিভা থাকে — নিজের রাজ্যেই সে সিদ্ধ। কবির সিদ্ধিও তার নিজের জগতে; কাব্যসৃষ্টির ভিতরে। আমরা হয়তো মনে করতে পারি যে যেহেতু সে মনীষী কাজেই অর্থনীতি সম্বন্ধে — সমাজনীতি, রাজনীতি সম্বন্ধে, মননরাজ্যের নানা বিভাগেই, কবির চিন্তার ধারা সিদ্ধ। আমাদের উপলব্ধি করে নিতে হবে যে তা নয়। উপকবির চিন্তার ধারা অবশ্য সব বিভাগেই সিদ্ধ — যেমন উপদার্শনিকের। কিন্তু প্রতিভা যাকে কবি বানিয়েছে কিংবা সঙ্গীত-বা-চিত্রশিল্পী বানিয়েছে — বুদ্ধির সমীচীনতা নয়, — শিল্পের দেশেই সে সিদ্ধ শুধু — অন্য কোথাও নয়। একজন প্রতিভাযুক্ত মানুষের কাছ থেকে আমরা যদি তার শ্রেষ্ঠ দান চাই, কোনো দ্বিতীয় স্তরের দান নয়, তাহলে তা পেতে পারি সেই রাজ্যের পরিধির ভিতরেই শুধু যেখানে তার প্রতিভার প্রণালী ও বিকাশ তর্কাতীত। শেক্সপীয়রের কথাই ধরা যাক — তাঁর এক-একটি নাটক পড়তে পড়তে বোঝা যায়,

মনোবৈজ্ঞানিকের কাছে যেমন করে পাই তেমন করে নয়, মানবচরিত্র ও মানুষের প্রদেশ সম্বন্ধে নানা রকম অর্থ ও প্রভূতসত্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেল কাব্যের সমুদ্রবীজনের গভীরে গভীরে মুক্তার মতো, কিংবা কাব্যের আকাশের ওপারে আকাশে স্বাদিত, অনাস্বাদিত নক্ষত্রের মতো সব খুঁজে পাওয়া গেল যেন। কারণ এখন আমরা প্রতিভার সঙ্গে বিহার করছি সেই রাজ্যে যেটি তাঁর নিজস্ব। কিন্তু শেক্সপীয়রকে যদি ইংলন্ডের কোনো জনসভায় দাঁড়িয়ে প্রবন্ধ পাঠ করতে হত এলিজাবেথীয় সমাজ সম্বন্ধে, আমি ধারণা করতে পারি না যে অন্য কোনো অভিজ্ঞ সমাজনীতিবিদের চেয়ে তা কোনো অংশে অসাধারণ কিছু হত (হয়তো হাসি তামাশা এবং যুক্তিহীন মুখর প্রশংসা থাকত সেই সমাজ ও সমাজপতিদের সম্বন্ধে) । কিংবা শেক্সপীয়বকে যদি ইংলন্ডের কোনো বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে ইংলন্ডের তখনকার রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হত, সে অভিভাষণের ভিতর কোনো বাগ্মিতা থাকত বলে মনে হয় না — তা নাই বা থাকল — কিন্তু তেমন কোনো সারবত্তাও থাকত না ইংলন্ডের তখনকার রাজনীতিজ্ঞদের আলোচনায়ও যেটুকু রয়েছে; কিংবা তার ঈষৎ প্রতিবিম্বও থাকত না শেক্সপীয়রের নিজের কাব্যে অন্যরকম সারবত্তায় যে আশ্চর্য ব্যাপক গভীরতা আমাদের বিস্মিত করে। বৈষ্ণব যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমাদের কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। শেক্সপীয়রের সম্বন্ধে যে কথা বললাম রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বলা চলে — সব কবির সম্বন্ধেই। অন্য সমস্ত প্রতিভার মতো কবি-প্রতিভার কাছেও শ্রেষ্ঠ জিনিস পেতে হলে যেখানে তার প্রতিভার স্বকীয় বিকাশ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সেই শিল্পের রাজ্যে তাকে খুঁজতে হবে; সেখানে দর্শন নেই, রাজনীতি নেই, সমাজনীতি নেই, ধর্মও নেই — কিংবা এই সবই রয়েছে কিন্তু তবুও এ সমস্ত জিনিস যেন এ সমস্ত জিনিস নয় আর; এ সমস্ত জিনিসের সম্পূর্ণ সারবত্তা ও ব্যবহারিক প্রচার অন্যান্য মনীষী ও কর্মীদের হাতে যেন — কবির হাতে আর নয়।

কেউ যেন মনে না করেন আমি কবিকে কাব্যসৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো কাজ করতে নিষেধ করছি। আমি তা মোটেই করছি না। কবি তার ব্যবহারিক জীবনে কর্ম-ও-মননরাজ্যে যেখানে যে অসঙ্গতি বা অন্ধকার রয়েছে বলে মনে করেন সব কিছুর সঙ্গেই সংগ্রাম করতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত; এই প্রবন্ধের আরম্ভেই আমি বলেছি যে তার কাব্যেও কল্পনার-ভিতর-চিন্তা-ও-অভিজ্ঞতার সারবত্তা থাকবে। আমি তার প্রতিভার স্বধর্মের কথা বলেছি; কাব্য সম্পর্কে যে জিনিসের বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে আমি করেছি; এবং ব্যবহারিক জীবনে যে স্বধর্ম অসাধারণ কিছু দিতে পারে না এমন কি কাব্যজীবনকে নষ্ট করেও দিতে পারে না বলে উল্লেখ করেছি। সে যদি বাস্তবিক কবি হয়, তাহলে তার কাব্যের মতো অসাধারণ কোনো দ্বিতীয় জিনিস ব্যবহারিক জীবনের পদ্ধতি ও প্রকাশের নিকট দান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিমান লোকের মতো কর্ম ও চিন্তা দান করতে পারে সে, — ব্যবহারিক মানুষ হিসেবে। সেখানে তার কাব্যজগতে কল্পনামনীষার মুক্তি নেই — এবং তার প্রয়োজনও নেই।

যাঁরা আমার প্রবন্ধ এই পর্যন্ত অনুসরণ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে আমি বলতে চাই না যে কাব্যের সঙ্গে জীবনের কোনো সম্বন্ধ নেই; সম্বন্ধ রয়েছে — কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রকট ভাবে নেই। কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুই রকম উৎসারণ; জীবন বলতে আমরা

সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণ ভাবে তৃপ্ত হয় না; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা-মনীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়। কিন্তু সাধারণত বাস্তব বলতে আমরা যা বুঝি তার সম্পূর্ণ পুনর্গঠন তবুও কাব্যের ভিতর থাকে না; আমরা এক নতুন প্রদেশে প্রবেশ করেছি। পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায় কিংবা পৃথিবীর সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে এক নতুন প্রদীপের কল্পনা করা যায় — তা হলে পৃথিবীর এই দিন, রাত্রি, মানুষ ও তার আকাঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টির সমস্ত ধুলো, সমস্ত কঙ্কাল ও সমস্ত নক্ষত্রকে ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ব্যবহারের কল্পনা করা যেতে পারে যা কাব্য; — অথচ জীবনের সঙ্গে যার গোপনীয় সুড়ঙ্গলালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ; সম্বন্ধের ধূসরতা ও নূতনতা। সৃষ্টির ভিতর মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন অমানবীয় সংঘাত লাভ করা যায় — কিংবা প্রভূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই সমস্ত জিনিসই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথায় যেন ছিল; এবং ভঙ্গুর হয়ে নয়, সংহত হয়ে, আরও অনেকদিন পর্যন্ত, হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রালোক পর্যন্ত, কোথাও যেন রয়ে যাবে; এই সবের অপরূপ উদগীরণের ভিতর এসে হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হয়, নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে তেমনি বস্তুসঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতর; এবং সেই প্রতিফলিত অনুচ্চারিত দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে ওঠে যেন, সুরের জন্ম হয়; এই বস্তু ও সুরের পরিণয় শুধু নয়, কোনো কোনো মানুষের কল্পনামনীষার ভিতর তাদের একাত্মতা ঘটে — কাব্য জন্ম লাভ করে।

কবিতা মুখ্যত লোকশিক্ষা নয়; কিংবা লোকশিক্ষাকে রসে মণ্ডিত করে পরিবেষণ — না, তাও নয়; কবির সে রকম কোনো উদ্দেশ্য নেই। 'কিঙ্‌লিয়ার' কিংবা 'বলাকা'র কবিতায় — এবং পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যেই কবির কল্পনা-প্রতিভার বিচ্ছুরণে, কিংবা তার সৃষ্ট কবিতার ভিতর সে রকম কোনো লক্ষ্যের প্রাধান্য নেই। কবিতাপাঠ হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র রসাস্বাদ : যার পরিচয় দিয়েছি ইতিপূর্বে। কিন্তু তবুও কবিতার সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ অন্তত দুই রকম। প্রথমত শ্রেষ্ঠ কবিতার ভিতর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে মানুষের তথাকথিত সমাজকে বা সভ্যতাকেই শুধু নয় এমন কি সমস্ত অমানবীয় সৃষ্টিকেও যেন তা ভাঙছে — এবং নতুন করে গড়তে চাচ্ছে; এবং এই সৃজন যেন সমস্ত অসঙ্গতির জট খসিয়ে কোনো একটা সুসীম আনন্দের দিকে। এই ইঙ্গিত এত মেঘধবলিমা গভীর ও বিরাট, অথচ এত সূক্ষ্ম, যে ব্যক্তি সমাজ ও সভ্যতা তাকে উপেক্ষা করলেও (সব সময় উপেক্ষা করে না যদিও) এই ইঙ্গিতের প্রভাবে তারা অতীতে উপকৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে উদ্ধার লাভ করতে পারে। এই জন্যেই সমস্ত অতীত ও বর্তমান শ্রেষ্ঠ কাব্য তাদের নিজের প্রণালীতে মানুষের চিত্তকে যত বেশি অধিকার করতে পারবে সভ্যতার তত বেশি উপকার। কিন্তু খ্রিস্টান পাদরিরা যেমন জনতার হাজার হাজার বর্গ-মাইলের দিকে তাকিয়ে বাইবেল বিতরণ করেন শ্রেষ্ঠ কাব্য সে রকম ভাবে বিতরিত হবার জিনিস নয়।

এই প্রসঙ্গেই ব্যক্তি সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে কবিতার দ্বিতীয় সম্বন্ধের কথা ওঠাতে পারি। কথাটা হয়তো স্বাদহীন শোনাবে, কিন্তু আমার মনে হয়, তা সত্য। কবিতা সকলের জন্যে নয়, এবং যে পর্যন্ত জনসাধারণের হৃদয় নতুন দিগ্‌বলয় অধিকার না করবে সে পর্যন্ত কয়েকটি তৃতীয় শ্রেণীর 'কবি'র স্থূল উদ্বোধন ছাড়া বাজারে ও বন্দরে — এবং মানবসমাজ ও সভ্যতার সমগ্রতার ভিতর কোনো প্রথম শ্রেণীর কাব্যের প্রবেশের পথ থাকবে না;এমন কি তা বিলাস, কল্পনাবিলাস পর্যন্ত বলে আখ্যাত হয় এবং হবে এই সব স্থূল উদগাতাদের কাছে — যদিও আমরা জানি তা কল্পনাবিলাস নয়, কিন্তু কল্পনা-মনীষার সাহায্যে যেন কোনো মহান — কোনো আদিম জননীর নিকট — যেন কোনো অদিতির নিকট প্রশ্ন, বারংবার প্রশ্নের বেদনা, প্রশ্নের তুচ্ছতা;বারংবার প্রতি যুগের স্তরে স্তরে যেন কোনো নতুন সৃষ্টির বেদনা ও আনন্দ;অবশেষে এক দিন সমস্ত চরাচরের ভিতর সকলের জন্যে কোনো সঙ্গতির সৌন্দর্য পাওয়া যাবে বলে।

কবিতা আমাদের জীবনের পক্ষে সত্যই কি প্রয়োজন? কেন প্রয়োজন? কবিতা যে এত অল্প লোকে ভালোবাসে সেটা কি প্রকৃতিরই নিয়ম, না কি অধিকাংশের বিকৃত কি দূষিত শিক্ষার ফল? যদি আরও বেশি লোকে কবিতা ভালোবাসতে ও বুঝতে শেখে তাহলে সেই অনুপাতে তারা ভালো করে বাঁচতে শিখবে কি না — অর্থাৎ সেই অনুপাতে সমাজের মঙ্গ ল হবে কি না? মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে সর্বাঙ্গীণ ও সুখের করে গড়বার সংগ্রামে ও সাধনায় কবিতার স্থান কোথায়? — এ প্রশ্নগুলো কোনো হিতসাধনমণ্ডলীর কর্মসচিবদের প্রশ্ন বলে মনে হয়, কিন্তু তবুও জিজ্ঞাসাগুলো নিটোল ও আন্তরিক, এবং বিশদ ভাবে নয়, সংক্ষেপে, হয়তো ইশারায়, এ সব জিজ্ঞাসার উত্তর আমার উপরের কয়েকটি লাইনের ভিতর নিহিত রয়েছে।

কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে ভিড়ের হৃদয় পরিবর্তিত হওয়া দরকার;কিন্তু সেই পরিবর্তন আনবে কে? সেই পরিবর্তন হবে কি কোনো দিন? যাতে তিন হাজার বছর আগের জনসাধারণ কিংবা আজকের এই বিলোল ভিড়ের মতো জনসাধারণ থাকবে না আর? যাতে এলিজাবেথের সময়ের ইংলন্ডে কিংবা ধরা যাক উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে যে সব শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হয়েছে গণ-পাঠক সে সবের গভীর বোদ্ধা হয়ে দাঁড়াবে? ভাবতে গেলেও হাসি পায়। কিন্তু তামাশার জিনিস নয় হয়তো। যখন দেখি শুধু তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পী ও চিত্রশিল্পীই শুধু নয়, এদিককার উচ্চতর শিল্পীরাও দিকে দিকে স্বীকৃত হচ্ছে তখন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় প্রথম শ্রেণীর কবি নির্বাসিত হয়ে রয়েছে কেন? কিন্তু যখন দেখি তথাকথিত সভ্যতা কোনো এক দারুণ হস্তীজননীর মতো যেন বুদ্ধিস্খলিত দাঁতাল সন্তানদের প্রসবে-প্রসবে পৃথিবীর ফুটপাথ ও ময়দান ভরে ফেলছে তখন মনে হয় যে কোনো সূক্ষ্মতা, পুরোনো মেদ ও ইন্দ্রলুপ্তির বিরুদ্ধে, যা পুরোনো প্রদীপকে যে অদৃশ্য হাত নতুন সংস্থানের ভিতর নিয়ে গিয়ে প্রদীপকেই যেন পরিবর্তন করে ফেলে;তার এই সাময়িকতা ও সময় হীনতার গভীর ব্যবহার যেন মুষ্টিমেয় দীক্ষিতের জন্যে শুধু — সকলের জন্যে নয় — অনেকের জন্যে নয়।

কিন্তু তবুও সকলের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে কি? কবে? কে আনবে? কবিকে কি শিক্ষার

অধিনায়ক সাজতে হবে? সৌন্দর্যপ্রবাদে স্পন্দিত করে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে হবে? প্রপ্যাগ্যান্ডা করতে হবে? ডিক্টেটর সাজতে হবে জীবনের সঙ্গতি ও সুষমার সাধনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে? যদি কোনো শেষ বৈকালিক ইন্দ্রজালে আজকের এই সভ্যতার মোড় ঘুরে যায় তাহলে কবিকে কিছুই করতে হবে না আর; তার নিজের প্রতিভার কাছে তাকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে শুধু কতিপয়ের হাতে তার কবিতার দান অর্পণ করে; যে কতিপয় হয়তো ক্রমে-ক্রমে বেড়েও যেতে পারে — মানুষের হৃদয় তার পুরোনো আপস অবলেপের ভিতর আর থাকতে পারছে না বলে। আর যদি সভ্যতার মোড় ঘুরে না যায় তাহলে কমরেডের দল এবং সাহিত্যের হব্‌গব্লিনেরা কাব্যের জন্যে একটা কিছু করবেনই নিশ্চয়। সাহিত্যজগতে গ্যয়টে বা ল্যাম, কিংবা তাঁর নিজের ভাবে পেটার, অথবা রবীন্দ্রনাথ অথবা ইয়েটস্, কিংবা স্বসৃষ্ট পরিধিবিশেষের ভিতর এলিয়ট ইত্যাদির মতো প্রকৃষ্ট রসবোদ্ধাদের কথা ছেড়ে দিলেও বিদেশে বুর্জোয়া শ্রেণীদের ভিতরেও এমন অজস্র খাঁটি রসবোদ্ধা আছে যার হীন ভগ্নাংশও আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সমাজে নেই; এ দেশে রসবোধ যে হৃদয়হীন ভাবে বিরল, কবির কোনো-কোনো শিথিল মুহূর্তের নিকট এর তিক্ততাও কম নয়।

কিন্তু সভ্যতার মেদ ও ইন্দ্রলুপ্তির যদি পুনর্যৌবন না ঘটে, যিনি তৃতীয় শ্রেণীর কবি নন, অতএব স্বখাত সলিলে ধাতস্থ আমাদের দেশের সাহিত্যকর্মীদের সহানুভূতি যাঁর জন্যে একটুও নেই, তিনি কি করবেন? তিনি প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর চলে যাবেন — শহরে বন্দরে ঘুরবেন — জনতার স্রোতের ভিতর ফিরবেন — নিরালম্ব অসঙ্গতিকে যেখানে কল্পনামনীষার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আঘাত করা দরকার নতুন করে সৃষ্টি করবার জন্যে সেই চেষ্টা করবেন; আবার চলে যাবেন, হয়তো উন্মুখ পঙ্গুদের সঙ্গে করে নিয়ে; প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর; সেই কোন আদিম জননীর কাছে যেন, নির্জন রৌদ্রে ও গাঢ় নীলিমায় নিস্তব্ধ কোনো অদিতির কাছে।

তার প্রতিভার কাছে কবিকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে; হয়তো কোনো একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে তার কবিতাবৃত্ত প্রয়োজন হবে সমস্ত চরাচরের সমস্ত জীবের হৃদয় মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ ফসলের খেতে বুননের জন্যে।

□ *কবিতার কথা*, ১৩৬২

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

সুশোভন সরকার

দেশে রাষ্ট্রিক চেতনার যে-নূতন ধারা আজ প্রবাহিত হয়েছে, তার চারটি মূল আদর্শের দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

এর মধ্যে প্রথমটি ফ্যাসিস্টবিরোধী মনোভাব। জগৎজোড়া মহাসংগ্রামে আমরা ফ্যাসিজমের সম্পূর্ণ পরাজয়, তার সমূল উচ্ছেদের কামনা করি। যুদ্ধের পরে পুনর্গঠিত পৃথিবীতে আমরা চাই ফ্যাসিজমের ছায়ামাত্রা থাকবে না, সমাজ-জীবনের মধ্য থেকে গত কুড়ি বৎসরের বিভীষিকা পরিপূর্ণভাবে লোপ পাবে। এদেশে অনেকে মনে করে ফ্যাসিজম একটা কথার কথা, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মনোভাব একটা চলতি ফ্যাশন মাত্র, একটি নেগেটিভ বুলি;ফ্যাসিজমের প্রতিরোধের সঙ্গে আমাদের নাকি কোনো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই। এই বিশ্বাস সারা দুনিয়ার ঘটনাস্রোত থেকে নিজেকে তফাত রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। আর্থিক-বাঁধনে আজ সমস্ত জগৎ এক হয়ে পড়েছে, সেকালের মতন পৃথিবীকে আজ আর টুকরো-টুকরোভাবে দেখা চলে না। সবলে প্রতিহত না হলে ফ্যাসিজম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য, তার বিরুদ্ধে জগৎজোড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে মানুষের স্বাভাবিক প্রগতির পথে প্রবল অন্তরায় মাথা তুলে দাঁড়াবে। ফ্যাসিজমের সাধারণরূপটি চোখে পড়া কি এতই শক্ত? এর প্রধান লক্ষ্য হল জনসাধারণকে সবলে দাবিয়ে অথবা ভুলিয়ে রেখে সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ করা। ফ্যাসিস্টরা তাই সমস্ত গণপ্রতিষ্ঠান ও স্বাধীন চিন্তাকে উচ্ছেদ করেছে মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থের খাতিরে। ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে আদর্শ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, জনমতের কণ্ঠরোধ করবার জন্য ফ্যাসিস্টরা চেয়েছে সেই আদর্শের ধ্বংসসাধন। দেশের লোককে ভুলিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে, সকল অসন্তোষ ঢেকে রাখবার জন্য, ফ্যাসিস্টরা চায় দিগ্বিজয়, প্রতিবেশী দুর্বল রাজ্য লুণ্ঠন করে সাম্রাজ্যবিস্তার ভিন্ন ফ্যাসিস্ট প্রভুত্ব স্বদেশেও টিকে থাকতে পারে না। ফ্যাসিস্ট মতবাদ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে দেশের নেতাদের অসীম প্রাধান্য, নিকৃষ্ট জাতিদের শ্রেষ্ঠ জাতির সেবা করবার ভগবদ্দত্ত বিধান। আমাদের রাষ্ট্রিক আদর্শে তাই ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধাচরণকে বাদ দেওয়া একেবারে অসম্ভব। ফ্যাসিস্ট আন্দোলন ও ঝোঁকের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগ বা সংযোগ, ফ্যাসিস্ট মতামতের সঙ্গে আপসের চেষ্টা, এমনকি সমস্যা এড়িয়ে যাবার কৌশল পর্যন্ত, আমাদের রাষ্ট্রচিন্তায় স্থান পেতে পারে না।

ফ্যাসিস্ট-শক্তি পশ্চিমে জার্মানি ও পূর্বে জাপানকে অবলম্বন করে পৃথিবীবিজয়ের অভিযানে উদ্যত হয়েছিল। দেশে দেশে জাগ্রত জনমত আজ তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের

প্রাচীর তুলেছে, সেই প্রচেষ্টা মূল প্রেরণা পেয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ানের অতুলনীয় সংগ্রামের ভিতর। যুদ্ধে ফ্যাসিস্ট-শক্তি জয়লাভ করলে সারা জগতে এই মতবাদ ছড়িয়ে পড়বে, এমনকি জার্মান ও জাপানি শাসকদের সম্পূর্ণ পরাজয় না এনে যদি যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় তাহলেও ফ্যাসিজমের বিষ দেশে দেশে থেকে যাবে। আত্মরক্ষা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় স্বার্থের খাতিরেই এই যুদ্ধে আমাদের নিরপেক্ষ থাকা চলে না। আদর্শের সংগ্রামে নিষ্ক্রিয় থাকা দুর্বল মনের পরিচয়। পৃথিবীর সকল দেশের প্রগতিশীল জনমত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন বাখা কূপমণ্ডুকতার চিহ্ন। জার্মানি ও জাপানের সামরিক পরাজয় হলেই যে স্বর্গরাজ্য আসবে একথা কেউ বলে না; মানুষের মঙ্গলসাধন এত সরল, এত সহজ নয়। কিন্তু আজকের দিনে অগ্রগতির পথে প্রধান কাঁটাটুকুকে প্রথমে সবলে সমূলে উৎপাটন করতেই হবে। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আদর্শের ন্যায়সংগত পরিণতি হল এই যুদ্ধকে আমাদের পক্ষেও জনযুদ্ধের পর্যায়ে নিয়ে আসার প্রয়াস।

নতুন রাষ্ট্রচিন্তায় দ্বিতীয় যে-আদর্শ চোখে পড়ে তার সাধারণ নাম সমাজবাদ বা সোস্যালিজম। আধুনিক ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি যে এইদিকে, সেকথা বোধহয় অস্বীকার করা চলে না। ইংরাজ বিপ্লবের উদারনীতি ফরাসি বিপ্লবের পর গণতন্ত্রে প্রসার লাভ করেছিল, কালক্রমে সেই ডিমোক্র্যাসি আজ সমাজবাদে সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছে। এদেশে অনেকে মনে করেন যে সমাজবাদ একটি বিদেশি অস্বাভাবিক কল্পনা, আমাদের মধ্যে একটা সাময়িক কলরব মাত্র। কিন্তু জাতীয়তাবাদও তো একদিন আমাদের কাছে বিদেশি বস্তু ছিল, তাকে নিজস্ব ব্যাপার করে নেওয়া এদেশে কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য হয় নি। নূতন সমাজ গড়বার আদর্শ মঙ্গলজনক মনে হলে তাকে বিদেশি বা বিধর্মী আখ্যা দেওয়া যুক্তিসংগত নয়। গত পঁচিশ বছরে চোখের সামনে রুশ দেশে যে বিশাল পরিবর্তন এসেছে, সেখানকার সমাজে যে আশ্চর্য পুনর্গঠন সম্ভব হয়েছে, মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় যে-সমাজের বিপুল সার্থকতা দেখা গেল, আমাদের রাষ্ট্রচিন্তা থেকে কোন্ যুক্তিতে তাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে? সমাজবাদের গোড়ার কথা হল দেশে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাদের সম্পূর্ণ আর্থিক মঙ্গলের সাধনা। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চিন্তাশীল লোকমাত্রই এ-আদর্শে আকৃষ্ট হবেন, তাঁদের পক্ষে এ-সম্বন্ধে উদাসীন থাকা সাজে না।

তৃতীয় আদর্শ, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা, সমস্ত ভারতীয় জনগণের স্বাধীনভাবে নিজেদের সংগঠিত করবার অধিকার। এই অধিকারের ব্যাপারে দেশে মতদ্বৈধ নেই; এমনকি বিদেশি শাসকেরা পর্যন্ত বার-বার আদর্শ হিসাবে আমাদের অধিকার স্বীকার করেছে। ভারতের স্বাধীনতা কবে, কোন্ উপায়ে আসতে পারে, তার রূপ কিভাবে প্রকাশ পাবে, সে-আলোচনা রাষ্ট্রনীতির কথা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রচিন্তার স্বাধীনতার আদর্শেরও একটা বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে, এই কথাটুকু শুধু মনে রাখা দরকার।

আজকের দিনের রাষ্ট্রচিন্তায় চতুর্থ যে-আদর্শ দেখা দিয়েছে, বিজ্ঞানের ভাষায় তার সাধারণ নাম আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। কোনো অঞ্চলে যদি একটি বিশিষ্ট জাতি গড়ে ওঠে, তাদের মধ্যে যদি এমন চেতনা বিকাশ পায় যে তারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকসমষ্টি থেকে জাতি হিসাবে স্বতন্ত্র, তাদের নিজেদের ভিতর যদি ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ধরনে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ঐক্য

দেখা যায়,— তবে তাদের নিজেদের ইচ্ছামতো স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়বার অধিকার স্বীকার করা এই আদর্শের মূল কথা। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে দেশে তুমুল বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে বলে এ-সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার করে নেবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি মূল নীতি হিসাবে বহুদিন থেকে সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছে। কথা উঠলেই তাই সকলেই বলে থাকে যে, এ-নীতি তো সর্বসম্মত। কিন্তু জাতিবিশেষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, তার পরিধি ও সীমা-নির্দেশ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলে অনেক সময় দেখা যায় মতভেদ। ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে গোড়া থেকে প্রায় আজ পর্যন্ত এই বিশ্বাস মজ্জাগত ছিল যে, নানা অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ভারতের সকল লোক একই জাতি বা নেশনের অন্তর্গত। সে-হিসাবে সমস্ত ভারতবর্ষ একরাষ্ট্রে সংগঠিত হলেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। এতদিন পর্যন্ত সকল দেশপ্রেমিকের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, ভারতের নানা অংশের লোকদের মধ্যে পার্থক্য ধীরে ধীরে লোপ পাবে, ভারতবর্ষ হবে ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের মতন একটি রাষ্ট্র, তার রাষ্ট্রভাষা হবে এক, তার রাষ্ট্রিক সত্তা থাকবে অখণ্ড। বিভিন্ন খণ্ডরাজ্য ও প্রদেশকে একত্র করে ইটালি ও জার্মানির ঐক্যসাধন আমাদের মুগ্ধ করেছিল, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে নানা দেশগত লোকের মিলনে মহাজাতির উদ্ভব হয়েছিল আমাদের আদর্শস্থল। বহুদিনের প্রচলিত এই বিশ্বাস কিন্তু আজ আর সকলকে তৃপ্তি দিতে পারছে না। ধীরভাবে ভেবে দেখতে গেলে স্বীকার করতেই হবে যে, এক-জাতীয়ত্বের আদর্শ আজ আর দেশভক্ত সকল লোককে সমানভাবে টানছে না। আত্মনিয়ন্ত্রণের সাধারণ অধিকার নিয়ে তাই তর্ক হয় না, মতভেদ আসে ভারতে এক-জাতীয়ত্বের প্রশ্ন সম্বন্ধে।

নিরাসক্ত দৃষ্টিতে আলোচনা করলে কিন্তু ভারতবর্ষে মাত্র একটি নেশনের অস্তিত্ব, এক অখণ্ড মহাজাতি গঠনের আদর্শ সম্বন্ধে মনে সন্দেহ আসে না কি? এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে অনেক দিকে সাদৃশ্য আছে নিশ্চয়। যে-কোনো লোকসমষ্টি প্রতিবেশীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে বাধ্য। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য কি বাস্তব সত্য নয়? বিশাল ভারতের নানা অংশে যে নানা জাতীয় লোক বাস করে তাদের মধ্যে যে-তফাত চোখে পড়ে, ইউরোপ অথবা দক্ষিণ আমেরিকার স্বতন্ত্র জাতিগুলির মধ্যে তফাত কি তার চাইতে বেশি? আধুনিক ইতিহাসে আমরা যাকে ন্যাশনালিটি নাম দিয়েছি, তার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি কি আমাদের দেশের নানা জাতির মধ্যে সুস্পষ্ট নয়? বাঙালি ও উড়িয়া, অন্ধ্র ও তামিল, মরাঠি ও গুজরাটি, সিন্ধি ও পাঠান, পঞ্জাবি ও বিহারি — এদের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ কি এতই সামান্য যে তাদের স্বাতন্ত্র্যের দাবি উঠলে তাকে অস্বাভাবিক বলে অগ্রাহ্য করতে হবে? ভারতের প্রত্যেকটি জাতির নির্দিষ্ট বাসভূমি আছে, আবহমান কাল থেকে প্রত্যেকে নিজস্ব ভূখণ্ডে পুরুষানুক্রমে থেকে এসেছে। তাদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট ভাষা রয়েছে, একের পক্ষে অন্যের কথা বোঝা পর্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। বিভিন্ন ভাষাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে স্বতন্ত্র সাহিত্য ও স্থানীয় ঐতিহ্য। প্রত্যেক অঞ্চলে জীবনযাত্রার ধরনের মধ্যে অনেকখানি তফাত অস্বীকার করা যায় না। এদেশের সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের মনের গড়নও যে ঠিক এক ছাঁচের নয় একথাও বলা চলে।

আমাদের রাষ্ট্রিক চেতনায় অবশ্য এতদিন পার্থক্যের চাইতে সাদৃশ্যের উপরই সমস্ত জোরটুকু দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রিক চেতনা একটা স্থির, অবিচল, সনাতন পদার্থ নয়। তার ভিতরেও ইতিহাসের সাধারণ নিয়ম, পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশ লক্ষ করা যেতে পারে। একথা সুবিদিত সত্য যে, রাষ্ট্রিক জাতি বা নেশনের ধারণা, ন্যাশনালিটির ভিত্তিতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়বার আকাঙ্ক্ষা চিরকাল ছিল না, সম্ভবত চিরদিন থাকবেও না। মানুষের অন্যান্য ধারণার মতোন জাতীয় চেতনাও সামাজিক অবস্থা ও আর্থিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে, তার মধ্যেও ক্রমবিকাশ চোখে পড়া স্বাভাবিক। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তার ধারণা দিকে দিকে মূর্তিগ্রহণ করেছে, অন্য জাতির প্রভুত্ব ও অত্যাচারের ফলে অথবা তারই আশঙ্কায় জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষে একজাতীয়ত্বের আদর্শ যে বহুজাতির আত্মচেতনায় রূপান্তরিত হবে না, একথা কি কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে? রাষ্ট্রিক আত্মপ্রত্যয় যত এদেশের সাধারণ লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, ততই বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠবার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। রাশিয়াতে এর অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে সকলেই জানে। তার আলোচনা প্রসঙ্গে বহু বৎসব আগে স্টালিন লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষেও একদিন বহু জাতির রাষ্ট্রিক চেতনা স্বতন্ত্র মূর্তিতে আবির্ভাব হতে পারে।

ভারতে বহুজাতীয়ত্বের আদর্শ গড়ে ওঠার অনুকূল বাস্তব উপাদানের অস্তিত্বের কথা আগেই বলেছি। এখন যদি আমাদের রাষ্ট্রিক চেতনা এইদিকে প্রবাহিত হয়, তাহলে এই প্রত্যেকটি জাতির সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি? অনেকে মনে করে যে, একজাতীয়ত্বের আদর্শ ছিল প্রগতির কথা; আর বহুজাতীয়ত্বের ধারণা হবে প্রতিক্রিয়ার বাহন। আমার মনে হয়, এই বিশ্বাসের মূলে আছে চারটি অমূলক ভয়।

প্রথম ভয় এই যে, ভারতবর্ষ এক নেশন বলে গণ্য না হলে স্বাধীনতা আসবে না। কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অর্থই হল স্বাধীন রাষ্ট্র গড়বার দাবি, সুতরাং ভারতবর্ষ এক নেশন হলেও তার স্বাধীন হবার যতটুকু অধিকার আছে, এদেশে বহু জাতি থাকলেও তাদের প্রত্যেকটির সেই একই দাবি থেকে যায়, অধিকার লোপ পায় না।

দ্বিতীয় ভয় এই যে, স্বাধীন ভারতবর্ষ খণ্ড খণ্ড হয়ে আর্থিক ও সামরিক শক্তিতে দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু বিভিন্ন জাতি বা ন্যাশনালিটিগুলি ইচ্ছা করলেই এক ফেডারেশন বা কন্‌ফেডারেশনের মধ্যে সমবেত হতে পারে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের এই প্রয়োগ তো কেউ হরণ করছে না। ভারতবর্ষে সংহত রাষ্ট্র বা ফেডারেশন গড়া নিশ্চয় বাঞ্ছনীয়, কারণ এতে বিশেষ সুবিধা আছে। কিন্তু বিভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য মেনে নিয়েও ভারতব্যাপী ঐক্য গড়া যেতে পারে, শুধু সে-ঐক্যের মূলে থাকবে একের উপর অন্যের জোর প্রয়োগ নয়, প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ হবে সে-ঐক্যের ভিত্তি। ভারতের প্রত্যেক জাতির মধ্য যোগসূত্র যথেষ্ট আছে, তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের স্বার্থের খাতিরে মিলিত হবে না কেন জানি না। আর কোনো জাতি যদি নিতান্তই পৃথক থাকতে চায়, তবে তেমন ক্ষেত্রে জোর প্রয়োগে কোন্ সুফল আসবে? সকল ফেডারেশনের গোড়ায় থাকে কতকগুলি সাধারণ স্বার্থ;আমাদের দেশে সে-স্বার্থ রয়েছে। কিন্তু ফেডারেশন গড়ে ওঠা উচিত বিভিন্ন অংশের স্বাধীন ইচ্ছার

প্রকাশ থেকে, জোর জবরদস্তি এখানে ঠিক চলে না। আর ফেডারেশন থাকলেই যে সে-দেশে একটি মাত্র জাতি বসবাস করবে, একথা নিরর্থক। বরং দেশে একজাতীয়ত্ব নিঃসন্দেহ হলে সেখানে একত্রীভূত ইউনিটারি রাষ্ট্রই স্বাভাবিক।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণ মেনে নেবার পথে এদেশে তৃতীয় ভয় এই যে, ভারতীয় ফেডারেশন স্থাপিত হলেও দুর্বল হয়ে পড়বে, কারণ তখন বিভিন্ন জাতির অধিকার থাকবে ইচ্ছামতো ফেডারেশনের বাইরে চলে যাবার। এই প্রসঙ্গে আমেরিকায় আশি বৎসর আগেকার গৃহযুদ্ধের উল্লেখ করা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে তখন ঐক্যের খাতিরে বিভিন্ন অংশগুলির ফেডারেশন ত্যাগ করার অধিকার অস্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যগুলি আসলে সম্পূর্ণ কৃত্রিম রাজ্য, তাদের উদ্ভব শুধু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সুবিধার জন্য, নিউ ইয়র্ক বা ম্যাসাচুসেটসের সঙ্গে ভার্জিনিয়া বা ক্যারোলিনার কোনো জাতিগত পার্থক্য নেই। এদেশের তুলনা আমরা আমেরিকায় পাই না, পাই নানা জাতির বাসস্থল রুশ দেশের মধ্যে। সেখানে রুশ-বিপ্লবের সময় সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণ স্বীকৃত হয়েছিল, কোথাও একেবারে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রও স্থাপিত হয়, তারপরও সোভিয়েট ফেডারেশন গড়া সম্ভব হয়েছে। সেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও লৌহদৃঢ় ঐক্য গড়ে উঠেছে।

চতুর্থ ভয় এই যে, দেশের কোনো কোনো অংশ বিদেশিদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে পারে, ভারতে আয়ার্ল্যান্ডের মতোন আলস্টার-সমস্যা দেখা দেবে। কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণ স্বীকৃত হলেই বরং বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষ ও সন্দেহের অবসান আসতে পারে। তখন পরস্পরের মধ্যে সমস্বার্থের বন্ধন আরও জোরালো হবার সুযোগ পাবে, অথচ ঐক্যের পথে প্রধান বাধা, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, লুপ্ত হয়ে আসাই তখন স্বাভাবিক। ঐক্যের নামে অখণ্ড ভারতের যে-দাবি, বাঞ্ছিত ঐক্যের পথে সেই দাবিই প্রধান অন্তরায় হয়ে ওঠা বিচিত্র নয়।

বস্তুত ভেবে দেখতে গেলে স্বীকার করতে হয় যে, অখণ্ড ভারতের সমর্থক যুক্তির মধ্যে অনেক ফাঁক আছে। ভারতের ভৌগোলিক ঐক্যের কথা সর্বদাই শোনা যায়, কিন্তু সমগ্র ইয়োরোপ অথবা ভূমধ্যসাগর ও সাহারা মরুভূমির মধ্যস্থিত উত্তর আফ্রিকার সুস্পষ্ট ভৌগোলিক ঐক্য তো একজাতীয়ত্বের আধার হিসাবে গণ্য হয় না। দক্ষিণ ভারত ভূগোলের হিসাবে অনেকাংশে উত্তর থেকে স্বতন্ত্র, তবুও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় নামক দুই জাতির কথা আমরা কখনও ভাবি না। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র মাত্রেই সাধ্যমতো প্রাকৃতিক সীমানার নির্দেশ খোঁজে, কিন্তু প্রাকৃতিক সীমানা সুস্পষ্ট থাকলেই কোনো দেশে মাত্র একটি জাতি গড়ে উঠবে এমন কথা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ভারতের অতীত ইতিহাস থেকেও একজাতীয়ত্ব প্রমাণিত হয় না। আমরা যাকে ভারতবর্ষ বলি, আমাদের প্রাচীন কোনো সাম্রাজ্য কখনও ঠিক তার সঙ্গে এক আকার ধারণ করে নি। তাছাড়া সেকালের সামন্ততন্ত্রী সাম্রাজ্যের মধ্যে কোনোদিন এ-যুগের নেশনের আত্মচেতনা প্রকাশ সম্ভব ছিল না, তখনকার রাষ্ট্রের প্রকৃতিই ছিল স্বতন্ত্র। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য নিশ্চয়ই অনেকখানি বাস্তব, কিন্তু যেহেতু সেকালের সকল সংস্কৃতিরই প্রাণ ছিল ধর্ম, সেইজন্য হিন্দু ও মুসলমান কখনই ঠিক সম্পূর্ণ মিলিত হতে

পারে নি, একটা সার্বভৌম ভারতীয় সংস্কৃতির অস্তিত্ব একেবারে নিশ্চিত সত্য নয়। ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে ইয়োরোপের সংস্কৃতির তুলনা চলে, সেখানে খিস্টান সভ্যতা ধনতন্ত্রের আমলে ভিন্ন ভিন্ন নেশনের অভিব্যক্তিকে চেপে বাখতে পারে নি। ভাবতবর্ষের একটা আর্থিক ঐক্যও নিশ্চয় আছে, কিন্তু সেটা হল স্বার্থ ও সুবিধার কথা, তা দিয়ে একজাতীয়ত্ব প্রমাণ হয় না। আত্মনিযন্ত্রণের অধিকার মেনে নেবার পরও যে ভারতীয় জাতিগুলি স্বেচ্ছায় ফেডারেশনে সংযুক্ত হতে পারে সমস্বার্থের খাতিরে, আমাদের দেশের আর্থিক ঐক্য শুধু তারই সূচনা করে, তার বেশি কিছু নয়।

ভাবতে বহু জাতির জাগরণ ও তাদের আত্মনিযন্ত্রণেব দাবির কথা আমি বার-বার বলেছি, কিন্তু অনেকে বলবে যে এদেশে আছে মাত্র দুইটি জাতি, তাদের পার্থক্য হল ধর্মে এবং ধর্মগত সংস্কৃতিতে। ঠিক আজকের দিনের সংঘর্ষে একথা সত্য মনে হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক থেকে ন্যাশনালিটির যে-বৈশিষ্ট্যগুলির নির্দেশ করা হয়, ধর্মবিশ্বাস তার অপরিহার্য রূপ নয়। একই ধর্ম দেশে প্রচলিত থাকলে জাতির ঐক্যবোধ দৃঢ়তর হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু ন্যাশনালিটির সংজ্ঞা ও ধর্মমত যে সবসময় অভিন্ন নয় তার প্রচুর প্রমাণ উদ্ধৃত করা সম্ভব। ধর্মের পার্থক্য জার্মানিতে একজাতীয়ত্বকে বাধা দেয় নি, আবার একধর্মের বন্ধন ফ্রান্স, স্পেন ও ইটালিকে একত্র করতে পারে নি। উত্তর আফ্রিকা কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমান জাতিগুলি কখনও একজাতীয়ত্বের আদর্শের মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে বাজি হবে কিনা সন্দেহ। রুশ দেশে একধর্মে লালিত উজবেক, তুর্ক্‌মান, তাজিক, খিরগিজ, কাজাক প্রভৃতি মুসলমান জাতি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রেই সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। সুতরাং একথা বলা চলে যে, ভারতবর্ষে এক অথবা দুই নয়, বহু জাতির বসবাস আছে, তার মধ্যে অনেকগুলি হিন্দুপ্রধান, কিন্তু মুসলমানপ্রধান জাতিও সংখ্যায় একাধিক। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে, কিন্তু ভারতের সকল জাতির সমানভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নিলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হয়ে আসবে, এ-বিশ্বাস দেশে নূতন রাষ্ট্রচিন্তার ধারায় ক্রমশই প্রবল হচ্ছে সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

অখণ্ড ভারতের যুক্তির দুর্বলতা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু একটির বদলে দুইটি অখণ্ডজাতির আদর্শ স্থাপিত হলে প্রকৃতপক্ষে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, পুরোনো সমস্যা আবার তখন নূতন রূপ নিতে বাধ্য হবে। প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক ইচ্ছাকে রোধ করা শক্ত। ভারতবর্ষে একটির বদলে দুইটি ফেডারেশন স্থাপিত হওয়া অসম্ভব মনে করি না, কিন্তু উভয়ের মধ্যেই একাধিক বিশিষ্ট জাতির সমাবেশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যে ফেডারেশনে প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার অস্বীকৃত হবে সেই ফেডারেশনই দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য। অখণ্ড ভারতের বিরুদ্ধে আজ যত যুক্তি প্রয়োগ করা যায়, তার সবগুলিই তখন প্রযোজ্য হবে সেই অখণ্ড ফেডারেশনের বিরুদ্ধে। ইতিহাসে প্রগতির হাত থেকে সহজে নিস্তার পাবার উপায় দেখি না।

অখণ্ড ভারতের যুক্তি যেমন অচল, খণ্ডিত ভারতের চিরন্তন অটল আদর্শও তেমনি দুর্বল। অর্থাৎ ভারতীয় জাতিগুলি তাদের স্ব-ইচ্ছায় যদি সংযুক্ত হতে চায়, তবে তাদের সে দাবিও মানতে হবে। আসলে আমাদের এমন মূল নীতির আশ্রয় খোঁজা উচিত যে-নীতি

বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়, যে-নীতি বর্তমান সমস্যা সমাধান করে অথচ ভবিষ্যতকে অযথা শৃঙ্খলিত করবার চেষ্টায় উদ্যত হয় না। জাতির বর্তমান কর্তব্যনির্ধারণ, ভবিষ্যতে তার পথনির্দেশ, জাতির স্বাধীন ইচ্ছা এবং তার নিজস্ব বিচারবুদ্ধির উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের মূল কথা হল এই।

অনেকে মনে করে যে, ব্রিটিশ আমলে রাজ্যশাসনের সুবিধার জন্য যে-সব প্রদেশ গঠিত হয়েছে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে সেইসব নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের। কিন্তু জাতি ও প্রদেশ ঠিক এক জিনিস নয়। একটা বিশিষ্ট আত্মবোধকে আশ্রয় করে জাতি গড়ে ওঠে, তার বাসভূমির সীমানা প্রদেশের সীমান্তের সঙ্গে নাও মিলতে পারে। একই প্রদেশে একাধিক জাতির বিকাশ আশ্চর্য কিছু নয়, সেখানে প্রত্যেক জাতিরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা প্রয়োজন। আর, একজাতির বাসভূমির অন্তস্তলে যদি কোনো অঞ্চলে অন্য কোনো জাতির স্থানীয় প্রাধান্য প্রকাশ পায়, তবে সেইসব অঞ্চলের অটোনমি অথবা স্বায়ত্ত-শাসনের আলাদা ব্যবস্থার দাবি গ্রাহ্য করতে হবে। রুশ দেশের অভ্যন্তরে এই রকম আত্মশাসিত ছোটো ছোটো অনেক অঞ্চলের কথা আমরা জানি।

বস্তুত জাতিবহুল রুশ দেশের সঙ্গে আমাদের স্বদেশের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। সেখানেও একদিন গ্রেট রাশিয়ান জাতির প্রভুত্বের খাতিরে রব উঠেছিল যে, রাশিয়া এক ও অখণ্ড। আমাদের একদল সমাজবাদীর মতোন সেখানেও মেনশেভিকেরা বলেছিল যে, জাতি-সমস্যার সমাধান হবে প্রত্যেক জাতির কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবিটুকু মেনে নিলেই। তখন বলশেভিক পার্টি ঘোষণা করে যে, প্রত্যেক জাতিকে দিতে হবে আত্মনিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার। এই অধিকারের প্রতিষ্ঠা সেদেশে জাতির সঙ্গে জাতির সদ্ভাব আনতে পেরেছে, অবনত জাতিদের আত্মবিকাশের পথ করেছে সুগম। তারই মধ্যে আবার জাতির সঙ্গে জাতির এমন ঐক্য গড়ে উঠল যার প্রতিরোধের প্রাচীর ফ্যাসিজমের সকল দম্ভকে চূর্ণ করে দিয়েছে। রুশ দেশে যেমন জাতি-সমস্যার এইভাবে সমাধান এসেছে, এদেশেও তেমন সমাধান সম্ভব মনে করা অসংগত নয়।

□ *ইতিহাসের কথা,* ১৯৮৫

গল্পের গাঁটছড়া

সুকুমার সেন

মানুষের যেমন স্মৃতি আছে মানুষের গোষ্ঠীরও তেমনি স্মৃতি আছে, তবে তা আর এক ধবনের স্মৃতি। আপাতত মনে হতে পারে যে সে স্মৃতি তো ইতিহাস অথবা ইতিহাস-পুরাণ কাহিনি। কিন্তু তা নয়, ইতিহাসই বলি আর পুরাণ-কাহিনিই বলি তা তো ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যক্তি-সমষ্টি-বিশেষের বুদ্ধি-প্রমার্জিত রচনা। তার মধ্যে যা আছে তা মানুষের স্মৃতির পর্যালোচনা অথবা সে পর্যালোচনার তলানি। তাতে মানবগোষ্ঠীর স্মৃতির যেটুকু রং বা রস আছে — যদি থাকে — তা ধরা যায় না। মানবগোষ্ঠীর স্মৃতি জমে আছে লোকসাহিত্যের মধ্যে, ছেলে-বুড়ো ভোলানো ছড়ার ও গল্পের মধ্যে। তবে তা এমনভাবে বিকীর্ণ হয়ে আছে যে টের পাওয়া খুবই দুর্ঘট।

মানুষের স্মৃতি মিশরের মমির মতো রক্ষিত হয়ে এসেছে তার লিখিত বচনায় — তার ধর্মকর্মের ব্যবস্থায়, তার পুরাণ-কাহিনিতে, তার জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থাবলিতে। আর মানবগোষ্ঠীর স্মৃতি রয়ে গেছে — যদি থাকে — তার, য়েমন প্রাচীনকালের পরিধেয় বসনের আঁচলের গিঁটে, সে গিঁট হল লৌকিক ছড়া ও গল্প। সে গিঁট খুলতে পারলে তার মধ্যে থেকে সেকালের স্মৃতির ক্ষীণ সৌরভ, নানা ফুলের, কর্পূরের, মৃগনাভিব, চন্দনের — যেন টের পাওয়া যায়।

বিদেশি পণ্ডিতেরা অনেক দিন থেকেই এইসব লৌকিক গল্প-ছড়ার গিঁট খুলে গাঁট ছাড়িয়ে ইতিহাসের নাগালের বাইরে যে প্রত্ন ও প্রাক্-ইতিহাস আর তারও অগোচর যে কালস্রোতের প্রতিধ্বনি তা কিছু কিছু যেন শুনতে পেরেছেন। আমাদের দেশি — ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করে আমাদের প্রদেশ বঙ্গভূমি লোকসাহিত্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সত্যকার বিদগ্ধ ও যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তির সামনে গবেষণার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে এই একটি।

আজ আমাদের এই আলোচনা তিনটি গল্প নিয়ে। একটি বাংলা ভাষার অপর দুটি জার্মান ভাষাব। গল্পগুলির মধ্যে বাইরের মিল নজরে পড়বে না চট করে, তবে গিঁট গাঁট ছাড়িয়ে দেখলে তলায় সমভূমি পাওয়া যাবে। তখন বোঝা যাবে যে গল্প তিনটি হয়তো একদা কোন্ এক সুদূরকালের থেকে একই মানবগোষ্ঠীর স্মৃতির টুকরো বহন করে এনেছে।

বাংলা গল্পটি সংগ্রহ করেছিলেন বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতা হ্যালেড (বা হ্যালডে) ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের আগে। তাঁর লেখা কাগজপত্র ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। সুতরাং ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে গল্পটি বাংলা লৌকিক গল্পের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রহণযোগ্য নিদর্শন। হ্যালেডের কাগজপত্র থেকে টুকে নিয়ে পুণ্যশ্লোক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছাপিয়ে

দিয়েছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩২৮ সাল)। গল্পটি হয়তো অনেকেরই পড়া আছে। তবুও বলতে হচ্ছে আলোচনায় সুবিধার জন্যে। গল্পটি ভোজ-বিক্রমাদিত্য গল্পমালার (saga) মতো গড়া। তাল-বেতাল থাকলেও বেতাল পঞ্চবিংশতির মতো আগাগোড়া নয়। সংস্কৃত অথবা অন্য কোনো ভারতীয় আর্য ভাষায় গল্পটি মিলেছে বলে আমার জানা নেই। তবে কাহিনির মধ্যে বিশিষ্ট বাঙালি অথবা বাংলা ঢং কিছু নেই।

ভোজপুরের রাজা ভোজের এক মেয়ে, অপূর্ব সুন্দরী, ষোলো বছর বয়স কিন্তু এখনও বিয়ে হয়নি। তার কারণ মেয়ে প্রতিজ্ঞা করে আছে, যে ব্যক্তি এক সারারাত্রি ধরে চেষ্টা করে তাকে কথা কওয়াতে পারবে তাকেই সে বিয়ে করবে। এই তার স্বয়ংবরে মৌনব্রত। দিগ্‌বিদিকে খবর দিয়ে রাজা ভোজ অনেক রাজা রাজপুত্রকে আমন্ত্রণ করে আনলেন, কিন্তু কেউই রাজকন্যার মুখ খোলাতে পারেনি, বিফল মনোরথ হয়ে চলে গেছে। বেশ কিছুকাল পরে অবন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্যের কানে ভোজ রাজার অপূর্ব সুন্দরী মৌনব্রতধারিণী রাজকন্যার ব্যাপার পৌঁছল। তাঁর কৌতূহল এবং আগ্রহ জাগল। তিনি কাউকে কিছু না বলে সটান ভোজপুরে চলে গেলেন।

রাজবাড়িতে গিয়ে তিনি অতিথি হলেন, কিন্তু আত্মপরিচয় দিলেন না। খবর পেয়ে রাজা তাঁকে ডাকলেন। বিক্রমাদিত্য পরিচয় না দিয়ে বললেন যে তিনি কন্যার মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়ে তাকে বিবাহ করতে এসেছেন।

রাত্রিতে একঘরে দুটি খাটে বিছানা পাতা হল। সে ঘরে রাজকন্যা ও বিক্রমাদিত্য শয়ন করলেন, আর কেউ রইল না। একটু রাত হতে বিক্রমাদিত্য হেঁকে বললেন, 'ঘরে কেউ আছে নাকি?' বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে সর্বদা দুটো পোষা ভূত থাকত। কেউ তাদের দেখতে পেতো না। তাদের নাম তাল-বেতাল। ঘরে ঢুকেই রাজা তাদের বলে দিয়েছিলেন রাজকন্যার খাট ও পরিধান আশ্রয় করতে। রাজার হাঁক শুনে তাল-বেতাল সাড়া দিলে, 'কেন মহারাজ?' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আর তো কেউ নেই। সাড়া দিলে কে তুমি?' তাল-বেতালের একজন বললে, 'মহারাজ আমি রাজকন্যার খাট।' রাজা বললেন, 'ভালো তোমার সঙ্গে গল্প করে রাত কাটাই। শোন তুমি।'

'এক দেশে এক সদাগর জাহাজ ভরতি জিনিসপত্র নিয়ে বাণিজ্যে গিয়েছিল। পথে তার জাহাজডুবি হয়। মরণাপন্ন হয়ে সে নদীর কিনারায় এসে পড়ে পাটা ধরে ভাসতে ভাসতে। এক মেয়ে জল আনতে এসে তাকে দেখে আর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে তাকে বাঁচায়। সদাগর সেইখানেই থেকে যায়। কিছুদিন পরে সে পড়ে এক ডাইনির নজরে। ডাইনি মন্ত্র পড়ে সদাগরকে ভেড়া বানিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। রাত্রিবেলায় তাকে মানুষ করে আবার দিনেরবেলায় ভেড়া করে দেয়। একদিন সে ভেড়া, দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গিয়ে রাজবাড়িতে ঢুকে পড়ে। রাজার লোকেরা তাকে কেটে মাংস খেয়ে ফেলে। এখন বল দেখি রাজকন্যার খাট, সদাগরের মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে?'

খাট থেকে উত্তর এল, 'দায়ী সেই মেয়েলোক যে তাকে জল থেকে তুলে বাঁচিয়েছিল।'

রাজকন্যা ওই উত্তর শুনে বিরক্ত হয়ে খাট ছেড়ে মাটিতে শয়ন করলে।

আরও খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর আবার বিক্রমাদিত্য মুখ খুললেন। আর কে

আছে হে ঘরে? রাজকন্যার কাছ থেকে কে যেন উত্তর দিলে, 'আজ্ঞে আমি মহারাজ!' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'তুমি কে বট?' উত্তর এল 'আজ্ঞে আমি রাজকন্যার পরিহিত বস্ত্র।' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'বেশ বেশ। একটা গল্প শোন।'

'এক দেশে এক সদাগরের মেয়ের বিয়ের জন্য একই দিনে চার জন বর হয়ে এল। চার জনেই বিয়ে করতে চায়। বিষম ব্যাপার দেখে কনে ভয়ে মরে গেল রাত্রিবেলায়। সকালে চারজন বর তাকে বাইরে নিয়ে এল। সকলে কান্নাকাটি করতে লাগল। একজন শোকে আত্মহত্যা করলে, একজন নিজের ঘরে ফিরে গেল, একজন ওষুধ খুঁজতে বেরল, আর একজন দেহ আগলে রইল। যে ওষুধ আনতে গিয়েছিল সে ওষুধ এনে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে তুললে।'

'এখন বল দেখি রাজকন্যার কাপড়, কার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হওয়া উচিত?'

রাজকন্যার কাপড়ের কাছ থেকে উত্তর এল, 'যে নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছিল, তার সঙ্গেই বিয়ে হওয়া উচিত।'

উত্তর শুনে রাজকন্যার খুব রাগ হল। কিন্তু গায়ের কাপড় তো খুলে ফেলা যায় না। তা ভাবতেই হাসি পেলে। রাজকন্যা খুব হেসে উঠল। আর অমনি বিক্রমাদিত্য তার হাত ধরে ফেললেন, 'এই তো মুখ খুলেছ।'

পরের দিন রাজকন্যাকে বিয়ে করে বিক্রমাদিত্য নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন।

এই গল্পটির সঙ্গে একটি জার্মান গল্পের গভীর ও অন্তরঙ্গ যোগ আছে। কিন্তু সে যোগ বাইরের থেকে সহজে ধরা পড়ে না। আগে গল্পটি শোনাই।

এক রাজদম্পতি অনেক সাধ্যসাধনা করে অবশেষে একটি কন্যা সন্তান লাভ করে। কিন্তু মেয়েটি প্রায় জন্মাবধিই ভূতগ্রস্ত ছিল। এই অবস্থায়ই যখন তার বয়স চোদ্দ তখন সে মারা যায়। তার দেহ কফিনে পুরে রাজবাড়ির সংলগ্ন গির্জা-ঘরে রাখা হয়। সেই ঘরে সৈনিক পাহারা থাকে। কিন্তু প্রতিদিনই রাত্রি বারোটা বাজলেই সেই ভূতগ্রস্ত মেয়েটি জেগে উঠে পাহারাদার সৈনিকের মুণ্ডপাত করে। পরের দিন নূতন পাহারাদার নিযুক্ত করতে হয়। এই ভাবে অনেকগুলি সৈনিক মারা গেল। রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কী করবেন ভেবে পান না। এত সৈনিক মারা পড়ল।

একদিন পাহারা দেবার ভার পড়ল এক তরুণ অথচ দক্ষ সৈনিকের উপর। তার অত্যন্ত ভয় হল। সে ডিউটিতে যোগ দেবার আগে বিকালে রাজার কাছে তিন চার ঘণ্টা ছুটি চেয়ে নিয়ে কী করবে ভেবে না পেয়ে বনের দিকে গেল। সেখানে এক বুড়োর দেখা পেলে। সে এক কাঠের গুঁড়ির উপর বসে আছে। তাকে দেখে বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমাকে অত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে?' সে বললে যে, তার উপর ভার পড়েছে রাত্রিতে রাজকন্যার মৃতদেহ পাহারা দেবার, কিন্তু যে পাহারা দেয় তারই মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়। শুনে বুড়ো তাকে সাহস দিয়ে বললে, 'ভাবনা নেই। তুমি এক কাজ কর। এই মন্ত্রপূত খড়ি নাও আর এই মন্ত্রপূত বস্ত্র নাও। গির্জাঘরে যেখানে বসে তুমি পাহারা দেবে তার চারদিকে এই খড়ি দিয়ে মণ্ডল এঁকে নিয়ো। আর তুমি রাত বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত মনকে কিছুতেই দমতে দিয়ো না। মৃতদেহ যখন কফিন থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসবে তখন সে চিৎকার

করবে বলবে, "আমি জানি তুমি এখানে রয়েছ, তবে আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।" তার পর সে ঘরময় ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তোমাকে দেখতে ও ছুঁতে পাবে না। এই ভাবে তোমার আজ রাত কাটবে।'

সকালে উঠে রাজা লোকজন নিয়ে গির্জাঘরে গেলেন। তিনি দেখে আশ্চর্য হলেন যে পাহারাদারের মাথা বিচ্ছিন্ন হয়নি, সে স্বচ্ছন্দে আছে। সে সৈনিককে রাজা আদেশ করলেন আরও দু-রাত পাহারা দেবার জন্যে। কী করে সে, অগত্যা রাজি হল।

সেদিনও সে বিকালে ছুটি নিয়ে বনে গেল। বুড়োর সঙ্গে তার দেখা হল। এবারে বুড়ো তাকে উপদেশ দিলে সে রাত্রিতে অর্গানের পিছনে লুকিয়ে থাকতে আগের দিনের মতো খড়ি দিয়ে মণ্ডল এঁকে। পাহারা দিতে এসে সৈনিক বুড়োর কথা মতো কাজ করল। মাঝ রাত্রি হতেই ভূতগ্রস্ত রাজকন্যা ঝাঁপ দিয়ে কফিন থেকে বেরিয়ে এল। আর ঘরময় দাপাদাপি করে ঘুরে বেড়াতে লাগল এই বলতে বলতে 'আমি জানি তুই আছিস্ কিন্তু তোকে আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।' রাত একটা অবধি সে এই রকম করতে লাগল। তারপর কফিনে ঢুকে পড়ল।

সকাল বেলা দলবল নিয়ে রাজা এলেন সৈনিকের মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু এসে দেখলেন, সে আগেকার দিনের মতোই সুস্থ বহালতবিয়ত। তখন রাজা তাকে বললেন যদি সে আর এক রাত এই ভাবে কাটাতে পারে তাহলে রাজকন্যা মানুষ হয়ে বেঁচে উঠবে এবং সে যদি চায় তবে তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিতে পারেন।

তৃতীয় দিনে সৈনিক বিকালে ছুটি নিয়ে বনে গেল। বুড়োর সঙ্গে যথারীতি দেখা হল। বুড়োর উপদেশ সে চাইলে। বুড়ো বললে, তুমি এবারে বেদির পিছনে লুকিয়ে থেকো। ভূত কিন্তু আরও বেশি গোলমাল করবে, চারদিকে ছুটোছুটি করবে। তার মধ্যে ফাঁক পেয়ে সৈনিককে কফিনের মধ্যে ঢুকে পড়ে শুয়ে থাকতে হবে। তার পর ভূত যখন কফিনের কাছে এসে তাকে বেরিয়ে যেতে বলবে তখনও সে যেন সাড়া-সুড়ি না দেয়। তারপর যখন তার হাত ধরে টানবে তখন সে যেন ভূতের তর্জনী ধরে ফেলে তাতে খুব জোরে কামড় দেয়।

সৈনিক উপদেশ মতো কাজ করলে পর রাজকন্যার ভূত ছেড়ে গেল, সে সুস্থ মানুষের মেয়ে হল। তখন দুজন বেদির কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল। লোকজনের সঙ্গে রাজা এসে তাদের দুজনকে এইভাবেই দেখতে পেলে। রাজা খুশি হয়ে সৈনিককে বললেন, 'তোমাকে জামাই করব।'

সকলে মহলে ফিরে এল। রাজকন্যার বিয়ে হল সৈনিকের সঙ্গে, প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হল।

গল্পটি গ্রিম্‌দের সংগ্রহে নেই। এটি সংগৃহীত হয় ১৯৩৫ সালে সাইলেসিয়ার হেড্‌উইগ সুরমান কর্তৃক। কুট রামান সংকলিত ও লটি বাউক্কে অনূদিত 'ফোকটেলস অফ জর্মনি' ২৩ সংখ্যক গল্প।

বিক্রমাদিত্যের গল্পের সঙ্গে সৈনিকের গল্পের গভীর মিল খুঁজে পাওয়া যাবে অমিলের মধ্যে দিয়ে। সে কেমন অমিলের মিল তা নীচে ছক্ বেঁধে দেখাতে চেষ্টা করছি। বাংলা ও জার্মান গল্পকে যথাক্রমে 'ক' ও 'খ' বলে চিহ্নিত করছি।

১. 'ক' রাজকন্যা মৌনী, অন্তত রাত্রিবেলায় শয়ন কক্ষে। 'খ' রাজকন্যা ভূতগ্রস্ত মৃত সুতরাং মৌনী। খাটে শুয়ে ক কন্যা মৃতবৎ থাকত। কেন না তা না হলে রাজা ডেকে বলতেন না, কে আছ এ-ঘরে। রাজকন্যা যখন খাটের উপর বিরক্ত হয়ে খাট ছেড়ে দিয়ে মাটিতে শুল তখন রাজা তা লক্ষ করেননি। তবে কি ক কন্যা অদৃশ্য ভূত হয়েছিল! সে প্রকট হয়েছিল হাসিতে। তখন রাজা তার হদিস পেয়ে তার হাত ধরেছিলেন।

'খ' রাজকন্যার কফিনের মতো কি 'ক' রাজকন্যার খাটও দুষ্টশক্তিসম্পন্ন (enchanted) ছিল! দুজনেই তাদের শয্যাধারের বাইরে এসেই তবে কাবু হয়েছিল। এবং সৈনিক তাতে ঢুকেই তবে ভূত তাড়াতে পেরেছিল। 'খ' কাহিনিতে দুষ্টশক্তি রাজকন্যাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছিল। 'ক' কাহিনিতে শক্তির উল্লেখ নেই বটে তবে ছিল বলে মনে হয়। বিক্রমাদিত্যের গল্প বলে সে শক্তি রাজার সহকারী হয়েছে।

২. 'ক' গল্পে কন্যা মৌনী, পাত্র (রাজা)মুখর। 'খ' গল্পে পাত্র সৈনিক মৌনী, কন্যা (বা ভূত) মুখর। এখানে দুটি গল্পে মৌলিক পার্থক্য আছে। 'ক' গল্পে তুক ভেঙে গেল কন্যা মুখ খুলতেই। 'খ' গল্পে তুক্ ভেঙে গেল পাত্র (সৈনিক) মুখ খুলে কামড় দিতেই। এ দুটি মোটিফের মধ্যে যে মিল তা ভাসা ভাসা।

৩. 'ক' গল্পে নায়ক বিক্রমাদিত্য প্রবীণ অসমসাহসী মন্ত্রবিদ্ গুণী। 'খ' গল্পের নায়ক সৈনিক তরুণ সাহসী এবং বশংবদ। তাকে শক্তি দিয়েছে বনবাসী বুড়ো। বিক্রমাদিত্যকে শক্তি দিয়েছে তাঁর বুদ্ধি ও দুটি পোষা ভূত।

গল্প দুটি সুদুর কালের কোনো একটি গল্প থেকে শাখায়িত হয়েছিল। জর্মান গল্পটিতে খ্রিস্টান ধর্মের ছাপ পড়েছে। তবুও এটি মূল গল্পের বেশি কাছাকাছি। অনুমান করা যেতে পারে গল্পটি সেকেলে ভূতের গল্প ছিল। রাজকন্যা ভূতের কবলে পড়ে জড়বৎ ছিল। সে ভূত প্রতি রাত্রিতে পাণিপ্রার্থী যুবককে গ্রাস করত। অথবা গল্পটিতে ভূত মোটেই ছিল না। রাজকন্যা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল। ব্যর্থ পাণিপ্রার্থীদের সে প্রাণদণ্ড দিত।

গ্রিমদের সংগৃহীত একটি গল্পে (এ গল্পটিকে 'গ' বলব) — নাম সোনার হাঁস — 'ক' গল্পের সঙ্গে মিল আছে শুধু হাসি-সমাধান মোটিফে। গল্পটি সংক্ষেপে বলি।

এক গৃহস্থের তিন ছেলে ছিল। বড়ো ছেলে দুটি বুদ্ধিমান ও সুরূপ। ছোটো ছেলেটি হাবাগোবা ভালো মানুষ। বড়ো ছেলে এক দিন বনে যায় কাঠ কাটতে। মা তার সঙ্গে ভালো ভালো খাবার ও পানীয় দেয়। বনে ঢোকবার পর একটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। লোকটি তার খাবারের কিছু ভাগ চায়। সে দেয় না। তার ফলে গাছ কাটতে গিয়ে সে পা কেটে ফেলে এবং শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে আসে। তার পরে চাষির মেজো ছেলে বনে গেল কাঠ কাটতে। তার মনোভাব দাদার মতো ছিল সেও তাই আহত হয়ে ফিরে এল। তারপর যখন ছোটো ছেলে বনে যেতে চাইলে তখন তার মা খুব অনিচ্ছা করে কিছু শুকনো রুটি আর বিস্বাদ পানীয় তার সঙ্গে দিল। বনে গেলে পরে সেই লোকটি তার কাছে খাবার চাইলে ছেলেটি খুশি হয়ে তার সঙ্গে বাঁটোয়ারা করে খেলে। তখন লোকটি তাকে একটা গাছ দেখিয়ে তার গোড়া কাটতে বললে। সে গাছটার গোড়া কাটলে আর তাব মধ্যে পেলে এক সোনার পালক হাঁস। হাঁসটি নিয়ে সে চলল শহর পানে। পথে রাত কাটালে সে এক

গৃহস্থের বাড়ি অতিথি হয়ে। ভোরবেলা, তখনও ছেলেটি ঘুমোচ্ছে, গৃহস্থের বড়ো মেয়ে এসে হাঁস দেখে তার একটা পালক খুলে নিতে গেল অমনি সে হাঁসের সঙ্গে এঁটে গেল। তারপর তার মেজো ও ছোটো বোন পর পর এসে বড়ো বোনের সঙ্গে আটকে গেল।

সকাল হতে কিছু না বলে ছেলেটি হাঁসকে বগলে ধরে শহর মুখে চলল। পথে পাদরি মশায় দেখলেন তিনটি মেয়ে এক হাঁসকে ছুঁয়ে এক ছোকরার পিছু পিছু চলছে। তিনি দূর থেকে তাদের চলে আসতে বললেন। কেউ এল না দেখে তিনি মেয়েগুলিকে জোর করে আনতে গেলেন, কিন্তু ছোঁয়া মাত্রই তিনিও আটকে গেলেন। তারপরে পাদরি মশায়ের কেরানি তাঁকে এইরকমভাবে তিনটি মেয়ের পিছু পিছু যেতে দেখে তাঁর কাছে ছুটে গেল এবং তাঁকে টেনে আনতে গিয়ে নিজেও আটকে গেল। এইভাবে চাষি ছোকরার বগলে ধরা হাঁস ও সেই হাঁসের পিছনে সেঁটে থাকা পর পর পাঁচজনের বিচিত্র শোভাযাত্রা শহরের রাজপথ দিয়ে চলল।

এখন সে দেশের রাজার মেয়ে অত্যন্ত গম্ভীর-মেজাজ ও বিষণ্নস্বভাব। সে হাসতে জানে না। রাজা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তাকে হাসাতে পারবে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। রাজকন্যা জানালা থেকে রাজপথে এই বিচিত্র প্রোসেশন দেখে হেসে ফেললে। রাজা খুসি হয়ে ছেলেটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।

হাসির মোটিফটুকু ছাড়া এ গল্পের সঙ্গে 'ক' গল্পের কোনো মিল নেই। 'গ' গল্পের সঙ্গে 'খ' গল্পেরও একটুখানি মিল আছে। দুটি গল্পেই পাত্রকে শক্তি দিয়েছে বনবাসী ব্যক্তি। অরণ্যচারী দেবতা অথবা তার অদৃষ্ট।

তিনটি গল্পের কিন্তু জাত আলাদা দাঁড়িয়েছে। 'ক' গল্প পড়েছে বুদ্ধিদীপ্ত হাসিখুশির শ্রেণীতে, 'খ' গল্প রয়ে গেছে ভয়ভক্তিদৈবশক্তির শ্রেণীতে আর 'গ' গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সরলচিত্তের দৈবপ্রসন্নতার শ্রেণীতে। এর মধ্যে যে হাসিখুশির মোটিফ আছে তা অলংকারের মতো, সমগ্র গল্পটিকে তা উদ্‌ভাসিত করেনি। 'ক' গল্পের যে হাসিখুশি মোটিফ তা গল্পটিকে উজ্জ্বল করেছে। এটা অবশ্য পরবর্তী কালে বুদ্ধি মার্জনার ফলেই হয়েছে।

'খ' গল্পের কফিন ও শবাচ্ছাদন বস্ত্র (shroud) 'ক' গল্পে হয়েছে যথাক্রমে রাজকন্যার খাট ও তার পরিহিত বস্ত্র। এই পরিবর্তন ভারতবর্ষের আচরণ ধারার অনুসরণেই সংঘটিত হয়েছে, আর এই শেষের পরিবর্তনটিকে ধরেই গল্পটিতে কৌতুকরসের ধারাটুকু উৎসারিত হয়েছে। গোড়াতে গল্পটি ভয় ভক্তি ভূত দৈবশক্তির শ্রেণীতেই ছিল। রাজকন্যাকে আশ্রয় করেছিল রক্তপায়ী ভূত (Vampire), সে পাহারাদারের মুণ্ড ছিঁড়ে রক্ত পান করত। কে জানে 'ক' গল্পে আসলে হয়তো অকৃতার্থ পাত্রকে রাত্রি অবসানে কোতল করা হত। গল্পে সে কথা উহ্য রয়ে গেছে। ভালোই হয়েছে।

☐ *গল্পের গাঁটছড়া*, ১৯৯৯ (প. ব. বাঙলা আকাদেমি সংস্করণ)

মহাত্মা গান্ধীর 'বর্ণাশ্রম' এবং কমিউনিজম

নির্মলকুমার বসু

হিন্দুসমাজের বর্ণধর্ম ও রাশিয়ার কমিউনিজমের আদর্শে গঠিত সোসিয়ালিস্ট রিপাব্লিকের মধ্যে দু'এক বিষয়ে মিল আছে, আবার কয়েক বিষয়ে দারুণ প্রভেদও আছে। মিলের মধ্যে দেখা যায় যে, বর্তমান ক্যাপিটালিস্ট সমাজে মানুষকে স্বাধীনভাবে বৃত্তি নির্ধারণ করিতে দিবার যে প্রথা আছে, তাহা প্রাচীন হিন্দুসমাজে ও রাশিয়াতে অস্বীকৃত হইত। প্রাচীন সমাজে জন্মের দ্বারা লোকের বৃত্তি নিরূপণ করা হইত এবং রাজার কাজ ছিল তিনি প্রজাগণের মধ্যে বৃত্তিভেদ ঘটিতে দিবেন না, অর্থাৎ কোনো রকমে বর্ণসঙ্কর হইতে দিবেন না। রাশিয়াতে বৃত্তিশাসনের নিয়মটি ভিন্ন প্রকারের বটে এবং তাহা আরও বাঁধাবাঁধির সঙ্গে পালন করা হইয়া থাকে। সেখানে রাষ্ট্রপতিরা দেশে মোটের উপর কত গম, লোহা, কলকব্জা, কাপড় প্রভৃতির চাহিদা আছে তাহা নির্ধারণ করিয়া দেন। ব্যক্তিবিশেষের এইটুকু স্বাধীনতা আছে যে, সে লোহার কারখানায় কাজ করিবে কি তুলার কলে করিবে, ইহাই সে বাছিয়া লইতে পারে, কিন্তু স্বেচ্ছায় বেশি লাভের আশায় যে-কোনো কলকারখানা স্থাপন করিয়া রাষ্ট্রপতিদের উৎপাদন ব্যবস্থার গোলযোগ ঘটাইতে পারে না। রাশিয়া এবং ভারতবর্ষ এইভাবে মানুষের আর্থিক কর্মচেষ্টার স্বাধীনতা স্বীকার না করিয়া এক বিষয়ে প্রজাগণের স্বাধীনতা স্বীকার করে। উভয় দেশেই সকল জাতিই স্বীয় ধর্ম, আচার অথবা মোটের উপর তাহাদের সংস্কৃতির বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করে। কেবল সেই সংস্কৃতির উপরে ভারতবর্ষে বেদান্ত সম্বন্ধে শেখানো হইত এবং রাশিয়াতে বর্তমান বিজ্ঞানমূলক সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে।

এই দুই বিষয়ে মিল থাকিলেও এক বিষয়ে দুইটি সমাজের মধ্যে খুব প্রভেদ দেখা যায়। ভারতবর্ষে কামার, কুমার, তাঁতি, স্বর্ণকার, চর্মকার প্রভৃতি সকলে শূদ্র বলিয়া গণ্য হয়। অধ্যাপক পুরোহিতেরা ব্রাহ্মণ এবং শাসক সম্প্রদায় সচরাচর ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। মনুসংহিতার আইন অনুসারে বিভিন্ন বর্ণকে দুইটি বা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের অধিকারের সহিত শূদ্রের অধিকার সমান একথাও স্বীকার করা হয় নাই; বরং দুই শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ভালো কি মন্দ ছিল, ইহার প্রয়োজন ছিল কি অপ্রয়োজন ছিল, তাহার বিচার না করিলেও আমরা একথা বলিতে পারি যে, দুই শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক প্রতিপত্তিতে ও মর্যাদায় এবং আইনের অধিকারে যথেষ্ট ভেদ ছিল।

কিন্তু এই সঙ্গে একটি কথা বলা দরকার, সমাজ ও রাষ্ট্রে উল্লিখিত ব্যবধানের সঙ্গে সঙ্গে

আয়ের বৈষম্য ছিল — আমরা ধরিয়া লইতে পারি ধনবৈষম্যের দোষ কাটাইবার জন্য প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে এবং ধর্মশাস্ত্রে কতকগুলি ব্যবস্থা দেখা যায়। তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রাহ্মণগণের পক্ষে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য গ্রহণ অতিশয় প্রশংসনীয় কীর্তি বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অপরাপর ধনী ব্যক্তিরা যাহাতে সাধারণের উপকারার্থে অর্থব্যয় করেন, এইজন্য মন্দির নির্মাণ, টোল সংস্থাপন, কূপ খনন, পথ নির্মাণ প্রভৃতিকে অতিশয় পুণ্যের কাজ বলা হইয়াছে। বর্তমান কালে খাজনা ও ট্যাক্সের দ্বারা ধনীর ভাণ্ডার হইতে অর্থ ছিনাইয়া সাধারণের উপকারার্থে তাহা ব্যয় করার প্রথা দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন কালে হয়তো রাষ্ট্রপতিরা মনে করিতেন ভয়ের চেয়ে পুণ্যের লোভে মানুষকে সৎকাজ করানো শ্রেয়;হয়তো সে সময়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল না যাহার দ্বারা ধনীর নিকট হইতে প্রয়োজনমতো ট্যাক্স বা খাজনা আদায় করা যাইতে পারে। যাহাই হউক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যের আদর্শের কোনো প্রমাণ না থাকিলেও প্রাচীন ভারতবর্ষে ধনবৈষম্যের দোষকে পুণ্যবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া খানিকটা উপশম করিবার ব্যবস্থা ছিল — ইহা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে দেখিতে পাই যে, ধনোৎপাদনের যাবতীয় সাধনের উপর, অর্থাৎ জমি, মূলধন প্রভৃতির উপর ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃত হইত, সাধারণের তাহার উপর কোনো অধিকার আছে ইহা আদর্শ হিসাবেও স্বীকৃত হইত না।

রাশিয়া কিন্তু এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, ব্যক্তিবিশেষের ভোগসামগ্রীর উপর মালিকানাস্বত্ব স্বীকার করিলেও ধনোৎপাদনের সাধনের উপর তাহার কোনো স্বত্ব স্বীকৃত হয় না। সেগুলি রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন আছে। কেবল রাষ্ট্র যে ক্ষেত্রে সকল জমির উপরে স্বীয় অধিকার ব্যবহার করিতে পারিতেছে না, সে-ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষকে সে স্বত্ব দিয়া রাষ্ট্রসভায় সেই ব্যক্তির অধিকারকে সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়া হইতেছে। যে চাষি জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার ভোগ করে, তাহার ভোট দিবার ক্ষমতাও কাড়িয়া লওয়া হয়, অথবা যে সাধারণ ক্ষেত্রে মজুরি করে তাহাকে অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া হয়। এইভাবে রাশিয়া ধনোৎপাদনের সকল সাধনের উপর একাধিপত্য প্রসারের ব্যবস্থা করিতেছে। দুই দেশের ব্যবস্থার মধ্যে ইহা একটি বড়ো প্রভেদ।

দ্বিতীয়ত রাশিয়াতে রাষ্ট্র একটি দলবিশেষের দ্বারা শাসিত হয়। ইহার নাম কমিউনিস্ট পার্টি। এই পার্টি এখন পর্যন্ত পার্টির সভ্যগণের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য দেশ শাসন করিতেছেন না। তাঁহারা দেশের সৈন্যদলের স্বার্থের উপরও লক্ষ্য রাখেন না, কেবলমাত্র শিক্ষিত জনগণ বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বণিক, কেরানি প্রভৃতির প্রতিনিধিও তাঁহারা নহেন; তাঁহারা আসলে দেশের যে শ্রেণী, ধনোৎপাদন করিতেছে, যাহাদের পরিশ্রমের দ্বারা কলকব্জা ও অন্নবস্ত্র প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে রাশিয়ার সৈন্যদলকে গোনা হইয়াছে, তাহাদের প্রতিনিধিবর্গও রাষ্ট্রশাসনের অধিকার লাভ করিয়াছে। চাষি, মজুর ও সৈনিকগণ সাক্ষাৎভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অক্ষম বলিয়া কমিউনিস্ট পার্টি তাহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ সেই কার্য চালাইতেছে এবং স্বীয় পার্টির মধ্যে মজুরদের মধ্য হইতে অনেক প্রতিনিধিও গ্রহণ করিয়াছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়গণই প্রধানত দেশ-শাসন করিতেন। তবে ক্ষত্রিয়গণের নিজে আইন রচনা করিবার ক্ষমতা ছিল না। ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন মুনি-ঋষিগণের দ্বারা প্রবর্তিত নীতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন, শাসক-সম্প্রদায় সেই আইন কার্যে প্রযোগ করিবার ভার গ্রহণ করিতেন মাত্র। অর্থাৎ দেশের শাসনকার্য প্রধানত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হস্তে অর্পিত ছিল। তাহার ফলে ভালো কিছু হইলেও মন্দ ফলও অনেকাংশে ফলিয়াছিল। শূদ্রগণকে সর্বদাই অনেক অধিকারে বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছিল এবং পরবর্তী কালের ইতিহাসে যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েবা অত্যধিক ভোগ বিলাসের ফলে পঙ্গু হইয়া পড়িলেন, তখন অনায়াসে বাহিরেব শত্রু আসিয়া ভারতবর্ষকে পরাধীন করিযা ফেলিল। শূদ্রশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আর একটু বেশি থাকিলে অথবা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরা একেবারে ঘুমাইয়া না পড়িলে — অর্থাৎ ভারতের বাহিরে যুদ্ধের যে-সকল নব নব কৌশল উদ্ভাবিত হইতেছিল, যেমন অশ্বের সমধিক ব্যবহার বা কামান-বন্দুকের প্রয়োগ, সেগুলির সম্বন্ধে সজাগ থাকিলে — হয়তো ভারতবর্ষের এই দশা হইত না। যাক্ সে কথা।

তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং বর্তমান রাশিয়ার মধ্যে ধনবন্টনের আদর্শের বিষয়ে যেমন প্রভেদ ছিল, রাষ্ট্রশাসনের অধিকাব বিষয়েও তেমনিই আছে। সেইজন্য রাশিয়াতে রাষ্ট্রের প্রকৃত অধিকার সংখ্যালঘিষ্ঠ ধনিক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর হাত হইতে ধনোৎপাদক শূদ্রশ্রেণীর হাতে পরোক্ষভাবে পর্যবসিত হইয়াছে।

এই কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া আমরা মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং তাঁহার সাধনোপায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। মহাত্মা গান্ধী প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, তিনি পুনবায বর্ণাশ্রমধর্ম প্রবর্তিত করিতে চান; তবে তাহার দোষগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে চান। আমাদের এখানে বুঝা দরকার তিনি ইহার মধ্যে কী কী দোষ দেখিয়াছেন এবং কোন্ কোন্ গুণের জন্যই বা ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধীর ধারণা — প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণধর্মের আদর্শের মধ্যে শ্রেণীভেদের ব্যবস্থা ছিল না, উহা পরবর্তী কালে লোকে স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া করিয়াছে, বর্ণধর্মের মূলকথা হইল — প্রতি মানুষের যে সহজাত প্রবৃত্তি আছে, তাহাকে তদনুসারে কর্মের সুযোগ দেওয়া। তিনি মনে করেন, মানুষের কর্মপ্রবৃত্তি কতকাংশে জন্মের দ্বারা নির্ধারিত হয়, অতএব জাতিগত বৃত্তি অনুসরণ করাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং বৃত্তি-নিরূপণে মানুষের কোনোরূপ স্বেচ্ছাচারিতা স্বীকার করা মানবসমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

মহাত্মা গান্ধী বলেন — "প্রতি মানুষের শরীরের গঠনের সঙ্গে যেমন তাহার পিতামাতার গঠনের খানিকটা মিল আছে আমার বিশ্বাস তাহার চরিত্রের ও মনোবৃত্তির মধ্যেও তেমনই কিছু মিল থাকে। মনোবৃত্তি বংশপরম্পরাগত বস্তু, ইহা স্বীকার করিয়া লইলে আমাদের জীবনের অনেক বৃথা পরিশ্রম বাঁচিয়া যায়। আমরা যদি খোলাখুলিভাবে একথা স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে আমাদের আর্থিক উন্নতির লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা গোড়া হইতেই সংযত হয় এবং তাহার পরিবর্তে আমাদের কর্ম চেষ্টাকে আমরা সাংসারিক ব্যাপারে নিয়োগ না করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োগ করিতে পারি। ইহাই হইল বর্ণাশ্রম ধর্মের মূলতত্ত্ব।" (ইয়ং ইন্ডিয়া, ২৯/৯/১৯২৭)।

"আমি হিন্দু ধর্মের যতটুকু বুঝি, তাহা হইতে মনে হইয়াছে যে, বর্ণধর্মের অর্থ অতিশয় সহজ ও সুস্পষ্ট। — প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় জীবিকা উপার্জনের জন্য নিজের বংশ অথবা জাতিগত বৃত্তি অনুসরণ করিবে, ইহাই বর্ণধর্ম পালনের সরল অর্থ;অবশ্য সে বৃত্তি ন্যায়ধর্মের বিরোধী হইলে তাহাকে পরিহার করিতে হইবে।" (ইয়ং ইন্ডিয়া, ২০/১০/১৯২৭)।

"মানুষে যদিও মনোবৃত্তিগুলি বংশানুসারে লাভ করে অর্থাৎ যদিও মানুষের বর্ণ জন্মের দ্বারা সূচিত হয়, তবু সেই বৃত্তিমূলক কার্য সম্পন্ন না করিলে মানুষের জন্মগত বর্ণ বজায় থাকে না। সে বর্ণ হইতে তাহার চ্যুতি ঘটে।" (হরিজন; ১৫/৪/১৯৩৩)।

১৯২১ সালে তিনি বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণকে জ্ঞানের দ্বারা, ক্ষত্রিয়কে শক্তির দ্বারা, বৈশ্যকে বাণিজ্য-কৌশলের দ্বারা এবং শূদ্রকে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা মানবের কল্যাণ সাধন করিতে হইবে। কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, ব্রাহ্মণ শারীরিক পরিশ্রমের দায় হইতে মুক্তি পাইবে — অথবা অপরকে বা নিজেকে ক্ষাত্রশক্তি প্রয়োগের দ্বারা রক্ষা করিবার ভার হইতে বাঁচিয়া যাইবে।" (ইয়ং ইন্ডিয়া, ১২/১০/১৯২১)।

"অন্নের জন্য শারীরিক পরিশ্রম করার মতো কল্যাণকর জিনিস কম আছে। সকল বর্ণের পক্ষেই এই শ্রম অপরিহার্য। যে কোনো প্রকার শ্রম করিলেই কিন্তু চলিবে না। ন্যায়ধর্মের দৃষ্টিতে আমরা বুঝিতে পারি যে চাষ বাস সংক্রান্ত কার্য করাই ইহার অর্থ, অবশ্য আজকাল সকলে চাষ বাসের সুযোগ লাভ করিবে না। সেইজন্য তাহারা সূতাকাটা বা কাপড় বোনার কাজও করিতে পারে, কিন্তু সর্বদা চাষের পরিশ্রমকে তাহাদের আদর্শ পরিশ্রম বলিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে।" (য়েরেভাদা মন্দির হইতে লিখিত পত্রাবলি)।

অর্থাৎ তাঁহার ধারণা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি যাহাই হউক না কেন মানুষে সেই প্রবৃত্তির অজুহাতে সমাজের বাকি লোকের কাছে নিজের জীবন ধারণের জন্য অন্নসংস্থান করিতে পারিবে না। অন্নসংস্থানের জন্য মানুষকে নিজে হাতে চাষের কাজ করিতে হইবে, নয়তো এমন কাজ করিতে হইবে যাহার সঙ্গে চাষ-বাসের বা বস্ত্র-উৎপাদনের সাক্ষাৎভাবে কোনো সম্বন্ধ আছে।

ইহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের প্রাচীন বর্ণাশ্রমের কথা বলিলেও তিনি মনুসংহিতার বর্ণাশ্রম হইতে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার কথা বোঝেন। ইউরোপীয় লেখকগণের মধ্যে টলস্টয় এবং রাস্কিন গান্ধীজির উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ধনের অসামঞ্জস্য হেতু সমাজে কিরূপ দারুণ অকল্যাণের সৃষ্টি হয়, তাহা উভয়ে দেখাইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে সাম্যতন্ত্রের প্রতি যে টান দেখা যায়, তাহার জন্য এই দুইজনের শিক্ষা অনেকাংশে দায়ী। কিন্তু সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধার সমান বন্টনে বিশ্বাস করিলেও চুলচেরাভাবে আয়ের সমতা বিধান করা সম্ভব হইবে না বলিয়া গান্ধীজি আয়ের কিছু অসমতাকে সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ১৯২৭ সালে তিনি বলিয়াছিলেন, "ধনের সমান বন্টন করাই আমার আদর্শ। কিন্তু আমি যতদূর দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে কার্যত তাহা সম্ভব নয় সেই জন্য আমাকে ধনের ন্যায়সঙ্গত বন্টনের চেষ্টা করিতে হইতেছে।" (ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৭/৩/১৯)।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আংশিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও গান্ধীজি অপর এক বিষয়ে কমিউনিস্টগণের আদর্শের সহিত কতকাংশে একমত। গান্ধীজি মনে করেন, রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক শিক্ষিত জনগণ বা বণিক সম্প্রদায় হইলে চলিবে না। ইহাকে "জনগণের" অধীন কবিতে হইবে। ধনীদের তিনি বাদ দিতেন না, তাহাদের রাষ্ট্রাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চান না বটে, তবে দেশে ধনী নির্ধন সকলকে এক সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রকৃত অধিপতি কবিতে চান।

"আমার মতে ভারতবর্ষের, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত, যেন অন্নবস্ত্রের অভাব না হয় অর্থাৎ প্রত্যেকে স্বীয় অন্নবস্ত্র উপার্জনের জন্য কাজ কবিবাব সুযোগ যেন লাভ করে। যদি অন্ন উৎপাদন করিবার সাধনগুলি জনগণের আয়ত্তাধীন থাকে, তবেই ইহা সম্ভব হইবে।" (And this ideal can be universally realised only if the means of production of the elementary necessaries of life remain in the control of the masses.) (Young India, 15.11.1928)

তবে রাশিযার সঙ্গে তফাত হইল এই যে "masses" বলিতে তিনি শুধু শূদ্রগণকে (Proletariate) বুঝেন না, দেশের ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই বুঝেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা, সমস্ত জনগণের সম্মিলিত স্বার্থ একটি মাত্র আছে, তাহাকে খণ্ড খণ্ড শ্রেণীস্বার্থে ভাগ করা উচিত নয়,যখনই কেহ স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থপুষ্টি করিবে তখনই সে মানবজাতিকে এক না করিয়া বহু করিয়া ভাবিতেছে;তাহা শেষ পর্যন্ত সেই শ্রেণীর কল্যাণেরও বিরোধী। অতএব সকলের সম্মিলিত কল্যাণই একমাত্র কল্যাণ। সেইজন্য রাষ্ট্রকে তিনি শুধু শূদ্রগণের কল্যাণের অভিভাবক কবিতে চান না, সকলের সম্মিলিত কল্যাণের অভিভাবক করিতে চান। ইহা কমিউনিজমের সঙ্গে মিলও বটে, তফাতও বটে।

"আমি যে স্বরাজ্যের কল্পনা কবি তাহা দরিদ্রজনগণের স্বরাজ্য। জীবন-মরণের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা রাজন্যবর্গ অথবা ধনী ব্যক্তিরা যেমনভাবে ভোগ করেন তোমরাও তেমনই ভাবে ভোগ করিবে। কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, রাজন্যবর্গের মতো তোমাদের রাজপ্রাসাদে বাস করিতে হইবে। সুখের জন্য প্রাসাদের কোনো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ধনীরা জীবনযাত্রার যে-সকল প্রয়োজনীয় বস্তু ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেগুলি তোমাদের থাকা চাই। আমার এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, যে স্বরাজ্যে সেগুলি সকলকে দেওয়া না যাইবে তাহা পূর্ণ-স্বরাজ্যই নহে।" (ইয়ং ইন্ডিয়া, ২৬/৪/১৯৩১)।

"আমার আদর্শ স্বরাজে ধর্মগত অথবা জাতিগত (racial) কোনো ভেদাভেদ থাকিবে না। ইহা শুধু ধনীদের অথবা কোনো জাতিবিশেষের আয়ত্তাধীন থাকিবে না। স্বরাজে সকলেই ক্ষমতা ভোগ করিবে। তাহাতে ধনীও থাকিবে, কিন্তু তাহার মধ্যে অতি অবশ্য অন্ধ, খঞ্জ, দরিদ্র, পরিশ্রমজীবী সমস্ত জনগণও থাকিবে। সকলে অধিকার লাভ করিবে।" (Selections from Gandhi, p.88)

"বস্তুত অহিংসাধর্মের প্রকৃত পালনকারী য়ুরোপের "greatest good of the greatest number" নীতিটা মানিতে পারে না। তাহার পক্ষে কাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না, তাহাকে পৃথিবীর সকলের ভালোর জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সমগ্র মানবের পক্ষে যাহা

ভালো তাহাই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর পক্ষেও শেষ পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা কল্যাণপ্রদ।" (ইয়ং ইন্ডিয়া, ৯/১২/১৯২৬)।

ইহা হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, গান্ধীজির বর্ণাশ্রম বলিতে প্রাচীন ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রমের একটি সোসিয়ালিস্ট সংস্করণ বুঝায়। গান্ধীজি নিজেও এ কথা ভাবেন বলিয়া একবার বর্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন, "য়ুরোপে কেহ কেহ আমাকে একরকম সোসিয়ালিস্ট বলিয়া মনে করে এবং তাহা ভুল নহে।" প্রাচীন ভারতীয় সমাজের প্রতি তিনি মমতা হারান নাই বলিয়া তিনি ইহাকে নূতন সাম্যবাদের আদর্শের বহ্নিতে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে চান। ১৯২১ সালে তিনি বলিয়াছিলেন, যে মুহূর্তে আমরা পাপ-পুণ্যের বিচার ছাড়িয়া দিয়া ক্রীতদাসের মতো প্রাচীন কালের সকল ব্যবহার অনুকরণ করিব সেই মুহূর্তে আমাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটিবে। প্রাচীনকালের বহু মূল্যবান সামগ্রী আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছি; কিন্তু প্রাচীনকালের ভ্রান্তিগুলির অনুকরণ করিয়া আমরা যেন আমাদের রাজগীর অবমাননা না করি।" (ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৫/৯/১৯২১)।

কমিউনিস্টগণের সহিত আদর্শ হিসাবে ধনসাম্যে বিশ্বাসী হইলেও গান্ধীজি শুধু শূদ্রগণের স্বার্থপুষ্টির চেষ্টাকে কল্যাণকর মনে করেন না। তিনি সর্বদাই সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণের দৃষ্টিতে কাজ করিতে চান। ইহা বলশেভিকগণের সহিত তাঁহার একটি বড়ো প্রভেদ। আরও একটি প্রভেদ আছে; তাহা সাধনোপায় লইয়া। ১৯২৮ সালে গান্ধীজিকে বলশেভিজম সম্বন্ধে এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল —

"বলশেভিকগণের অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনার মত কি? আমাদের দেশে তাহা কি পরিমাণে অনুকরণ করা কর্তব্য?"

ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন —

"আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমি বলশেভিজমের পুরাপুরি অর্থ বুঝিতে পারি নাই। ইহার সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি তাহাতে বুঝিয়াছি যে, ইহা সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার তুলিয়া দিতে চায়। অর্থাৎ বলশেভিকগণ অপরিগ্রহের আদর্শকে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কার্যত অঙ্গীভূত করিতে চান। যদি মানুষ স্বেচ্ছায় অপরিগ্রহী হইত অথবা অহিংস অসহযোগ প্রয়োগের দ্বারা শান্তির পথে তাহাদিগকে অপরিগ্রাহী করা যাইত, তাহা হইলে যে ফল হইত তাহার তুলনা হয় না। কিন্তু বলশেভিজম সম্বন্ধে আমি যাহা জানি তাহাতে মনে হয় ইহা বাহুবল প্রয়োগের দ্বারাই তাহা সাধন করিতে চায়, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য এবং তাহা রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন রাখিবার জন্য বলপ্রয়োগ করিয়া থাকে। আমার ধারণা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমার কোনো সন্দেহ নাই যে বলশেভিজম বর্তমান আকারে বেশি দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিংসাবাদের দ্বারা মানবের স্থায়ী কল্যাণকর কিছুই গড়া যাইতে পারে না। সে যাহাই হউক, বলশেভিজমের আদর্শের জন্য অসংখ্য পূতচরিত্র-নরনারী স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন ও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। যে আদর্শের পশ্চাতে এত স্বার্থত্যাগ আছে এবং যাহার জন্য লেনিনের মতো মহামানব (master spirits as Lenin) জীবনদান করিয়াছেন, তাহা কখনও বৃথা যাইবে না। তাঁহাদের ত্যাগের আদর্শ চিরদিন সংসারে জাজ্বল্যমান থাকিবে এবং সেই বহ্নিতে

বলশেভিজমের আদর্শ সময়কালে পরিশুদ্ধ ও পবিষ্কৃত হইয়া উঠিবে।" (ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৫/১১/১৯২৮)।

এইখানে গান্ধীজির সহিত কমিউনিস্টগণের গুরুতর প্রভেদ রহিয়াছে। তিনি যেমন সাম্যস্থাপনের জন্য রাষ্ট্রের উপর শুধু শূদ্রশ্রেণীর একাধিপত্য চান না এবং সর্বদা সমগ্র মানবের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলেন — কেননা তাহাই শেষ পর্যন্ত সকলের পক্ষে কল্যাণকর, শ্রেণীস্বার্থ আপাতত কল্যাণকর মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে কল্যাণকর নহে; তেমনই আবার তিনি কোনো রকমে হিংসার পন্থা অবলম্বন কবিতে চান না। হিংসার পরিবর্তে অহিংস সংগ্রামের দ্বারাই যে রাষ্ট্রকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র মানবের কল্যাণেব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যাইবে ইহা তিনি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন। উপরোল্লিখিত অংশে তিনি এই মর্মে বলিয়াছেন যে, হিংসার দ্বারা মানুষকে স্বার্থত্যাগ করাইলে, তাহা স্থায়ী হইবে না। তাহার পরিবর্তে স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, নয়তো peaceful persuasion অর্থাৎ সত্যাগ্রহের শক্তির দ্বারা তাহাদিগকে নত করিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত ধনীদের স্বেচ্ছাকৃত স্বার্থত্যাগ পর্যাপ্ত হইবে না তাহা জানিয়াই তিনি দেশের চাষি ও সাধারণ লোককে সত্যাগ্রহের শিক্ষা দান করিতে চান। ১৯৩১ সালে তিনি লিখিয়াছিলেন —

"আপনি ন্যাসীর মনোভাব কেমন করিয়া আনিবেন? শুধু অনুরোধ করিয়া?"

"না, শুধু অনুরোধের দ্বারা নয়। আমি উপায় বাহির করিবার জন্য সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করিব। কেহ কেহ আমাকে বর্তমান কালের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বিপ্লবী বলিয়াছেন। সে কথা ভুল হইতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি বিপ্লবী, কিন্তু অহিংস বিপ্লবী, আমার অস্ত্র অসহযোগ। কোনো লোক ধন সঞ্চয় করিতে পারে না যদি না জনগণ সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে, স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাহার সহিত সহযোগিতা না করে।" (ইয়ং ইন্ডিয়া, ২৬/১১/১৯৩১)।

সত্যাগ্রহকে গান্ধীজি যুদ্ধের ন্যায় ধর্মানুযায়ী বিকল্প বলিয়া মনে করেন, "the moral equivalent of war." (Young India. 5.11.31)।

গান্ধীজির সত্যাগ্রহের সঙ্গে কমিউনিস্টগণের যুদ্ধের একটি প্রভেদ হইল যে, সত্যাগ্রহ ক্রমবর্ধমান যন্ত্র (Progressive instrument of war)। একটি উদাহরণ লওয়া যাক্ — ভারতবর্ষে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য খাজনা বন্ধের আন্দোলন রাষ্ট্রনীতিতে অবলম্বনীয় নীতির পর্যায়ভুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রথা বলিয়া ইহা সমর্থন করিতে রাষ্ট্রনীতিবেত্তাদের মধ্যে কেহ কেহ সম্মত আছেন।

কিন্তু গান্ধীজি সেটি প্রয়োজন বুঝিলেও হঠাৎ সে যুদ্ধে নামিতে রাজি নহেন। দেশের লোকের শক্তির অতিরিক্ত কিছু করিতে তিনি সর্বদাই পশ্চাৎপদ হন। সেই জন্য প্রথমে মিটিং করিবার অধিকার লইয়া আইন অমান্য, পরে লবণ আইন, তাহার পর পিকেটিং করিয়া তিনি ধাপে ধাপে সংগ্রাম করিতে চাহিয়াছিলেন। যোদ্ধা হিসাবে তিনি অতিশয় সাবধানী। পরাজয়ের ফলে যাহাতে দেশে কাপুরুষতার সঞ্চার না হয় তাহার জন্য সর্বদাই তিনি জাগ্রত থাকেন। এবং সর্বতোভাবে তাহা নিরোধ করিবার জন্য চেষ্টিত থাকেন. এই জন্য তিনি অহিংস অসহযোগকে প্রোগ্রেসিভ অর্থাৎ বর্ধমান এই আখ্যা দিয়া থাকেন।

"মানুষের বিশ্বাস এমন বস্তু যে, মানুষ নিজের সম্বন্ধে যাহা বিশ্বাস করে তাহাই হইয়া দাঁড়ায়। যদি আমরা সত্যাগ্রহী হই এবং অন্তরে শক্তির বিশ্বাস কবি, তাহা হইলে দুইটি ফল স্পষ্টভাবে ফলিতে দেখা যায়। মনে শক্তির বিশ্বাস পোষণ করিতে কবিতে দিনের পর দিন আমাদের শক্তি সত্যসত্যই বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত আমাদের শক্তিও যেমন বাড়ে, আমাদের সত্যাগ্রহও তেমনই উত্তরোত্তর ফলপ্রদ হয়।" (দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ — ইংরাজি পৃ. ১৭৮)।

আরও একটি কথা আছে। গান্ধীজি মনে করেন সত্যাগ্রহের একটি গুণ হইল যদি বা সত্যাগ্রহে পরাজয় হয়, তাহা হইলে দেশেব যাহা ক্ষতি হয় তাহা অপরাপব যুদ্ধপ্রথা হইতে অনেক কম। সত্যাগ্রহীব মনে বিপক্ষের প্রতি ক্রোধ কম থাকে বলিয়া সত্যাগ্রহীর পরাজয়ের পর বিপক্ষের পীড়ন অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে। লোকসান যাহা হয় তাহা কেবল সত্যাগ্রহীকেই ভুগিতে হয়, দেশের অবশিষ্ট জনগণকে তত হয় না। আর যদি আমরা মৃত্যুর কথা ভাবি, তাহা হইলে সত্যাগ্রহের শুধু এক পক্ষকেই মরিতে হয় জগতে মোটের উপর কম রক্তপাত হয়।

গান্ধীজির বর্ণাশ্রমের আদর্শের সহিত মনুসংহিতার বর্ণাশ্রমের তুলনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি, প্রথমটি দ্বিতীয়ের সাম্যবাদানুযায়ী সংস্করণ। তাহার পর কমিউনিজমের সঙ্গে গান্ধীবাদের তুলনার ফলে আমরা দেখিয়াছি যে, উভয়ের শেষ লক্ষ্য এক হইলেও উপায় সম্বন্ধে দুইটির মধ্যে বহু প্রভেদ আছে সে প্রভেদ মূলত (ক) যুদ্ধের অস্ত্র লইয়া (খ) ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন্‌টির উপরে বেশি ঝোঁক থাকা দরকার তাহা লইয়া এবং (গ) সমগ্র মানবের কল্যাণের নিমিত্ত কিছুক্ষণের জন্য শুধু শূদ্রদের স্বার্থ দৃষ্টি করিতে হইবে না, সর্বদাই মানবজাতির সম্মিলিত স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে এই লইয়া। কমিউনিস্টগণ মনে করেন, শেষে মানুষের মধ্যে প্রেমভাব আনার জন্যই পথের কণ্টক দূর করার বিষয়ে একান্ত কঠোর পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। গান্ধীজি মনে করেন, অহিংসার মূলে প্রেম আছে বলিয়া ইহার যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালানো যাইতে পারে। কমিউনিস্টগণ মনে করেন, ব্যক্তিকে অবশেষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিবার জন্যই মধ্যপথে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে সমাজ বা রাষ্ট্রশাসনের অধীন করিতে হইবে; গান্ধীজি মনে করেন, অহিংসার পথ অনুসরণ করিলে কোনোদিনই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সমাজের শাসনের নিকট একান্ত পদানত করিবার প্রয়োজন নাই।

সাম্যের আদর্শ নূতন নহে। এবং তিনি আদর্শ অপেক্ষা উপায়ের কথা বেশি বলেন বলিয়া সাম্যবাদের সম্পর্কে কেহ গান্ধীজিকে বড়ো স্মরণ করিবেন না। কিন্তু তাঁহার মহত্ত্ব হইল এইখানে যে, তিনি প্রাচীন ভারতের নিকট অহিংসার যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, যাহা টলস্টয়ের শিক্ষায় এবং যিশু খ্রিস্টের ধর্মপাঠে আরও পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাহাকেই তিনি শাণ দিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া সাম্যসংস্থাপনের জন্য একটি নূতন অস্ত্রে পরিণত করিয়াছেন। এই অস্ত্রের মহত্ত্ব হইল এইখানে যে, ইহা প্রয়োগকারীর আন্তরিক বলের উপর নির্ভর করে। যাহার অন্তর দৃঢ়, সাহস অসীম, ধৈর্য অটুট, তাহার দ্বারা অহিংসা ব্যবহৃত

হইলে ফলও তদনুরূপ হয়; কিন্তু যাহার তত বল নাই সেও পরিমিতভাবে ইহা প্রয়োগ করিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য অতিরিক্ত সাহস এবং ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে। হারিয়া গেলেও তাহা ভিন্ন অপরেব মধ্যে ভয়ের সঞ্চার অপেক্ষাকৃত কম হয়। এই অস্ত্রের পুনরুদ্ধারের মধ্যেই মহাত্মা গান্ধীর প্রকৃত মহত্ত্ব নিহিত আছে এবং ইহার জন্যই ভবিষ্যতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

□ *দেশ*, সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৮৩

শিল্পদৃষ্টি

অমিয় চক্রবর্তী

মানুষের সমাজে যখন নানা উগ্র মতাবলম্বী দর্শনের প্রাদুর্ভাব হয় তখনই শিল্পদৃষ্টির প্রশস্ত কাল। রাষ্ট্রিক ও ধর্মতাত্ত্বিকের খণ্ডিত ব্যাখ্যায় যখন জীবনের সমগ্র ছবি চোখের ভিড়ে হারিয়ে যায়, সেই ছিন্নদর্শীর ভিড়ে এসে দাঁড়ান কবি, যিনি চক্ষুষ্মান্। সম্পূর্ণতার বোধ ফিরিয়ে আনেন তিনি। সৌমনস্যের একটি স্বচ্ছ পটে প্রাত্যহিকের যথাযথ রূপ নিরীক্ষণ করা শিল্পীর স্বধর্ম। তিনি দেখান ঘটনার আবর্ত, বিচিত্রের সংঘাত-সমন্বয় অথচ স্থায়ী ভূমিকার উপরে নীলাম্বর, দৃশ্যে অদৃশ্যে মিলিয়ে এই পার্থিব আশ্চর্যতা। কিছুকে বাদ দিয়ে নয়, সবকে নিয়ে এই শিল্পধারণা; ধ্যানের বিলীনতায় প্রত্যক্ষকে হারিয়ে যে-ধরনের আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতা তা নয়, অথচ কাছের অসংখ্যকে কেবলমাত্র স্বার্থের ও তথ্যের বন্দীশালা বানিয়ে যে-বাস্তব তাকেও দূরে রাখা। কথাটা শুনতে সহজ কিন্তু এই মিলিয়ে দেখার দৃষ্টিশক্তি শিল্পীর সহজাত, অন্যের পক্ষে দুরূহ। তাই সংসারে আজ একচক্ষুর বা দিব্যচক্ষুর অত্যাচারে মানবিক শুভদৃষ্টি আচ্ছন্ন, প্রীতির আলোকে যে-দৃষ্টির প্রকাশ তাকেই বেঁধেছে মানুষের অতিবুদ্ধি। শিল্পীর মুক্তি যে কত বড়ো, তার সর্বত্রচারিতা বহুদর্শিতা মানুষের পারস্পরিক সভ্যতার পক্ষে একান্ত কাম্য সেই কথা দলীয় মতদ্বন্দ্বিতার দিনে বারবার অনুভব করতে হয়।

কেবলমাত্র অর্থনৈতিক অথবা প্রচলিত সংজ্ঞায় যা পারমার্থিক তার সাহচর্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা, সংকট, পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে পথ-নির্ধারণের চেষ্টা ব্যর্থশ্রম। শিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে নোয়াখালি, বেহার, পঞ্জাবের প্রজ্বলিত দ্বিখণ্ডে, কাশ্মীরে ঘোরা যেতে পারে, তারই দৃষ্টিতে দৃশ্যের সত্য ধরা পড়বে। পক্ষ-প্রতিপক্ষকে উত্তীর্ণ হয়ে মানবিক সংস্থানে পৌঁছনো তার স্বভাবসিদ্ধ। কর্মকুশলতার প্রাক্-মন্ত্র আছে পূর্ণদর্শীর কাছে। অথচ ভাবুক, শিল্পী এদের বাদ দিয়েই লোকালয়ের চরম দুর্যোগে রাষ্ট্রিক নিজস্ব প্রত্যক্ষদর্শীর উপর নির্ভর করা হয়; কর্মচারী বুদ্ধির বিশেষ অজ্ঞতা এবং বিশেষ অভিজ্ঞতার নির্ধারিত প্রবণতার পিছনে যোগ করা হয় শক্তির অস্ত্র, সাংঘিক বাহিনী। আমরা বলি পোড়া বাড়ি, পাশের সোনালি ক্ষেত্র এবং অপেক্ষার মহাকাল যে একই সঙ্গে দেখতে পায় তারই প্রয়োজন সৌরাষ্ট্রে। বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যেও প্রতিকারের অপরাজেয় শক্তি জাগে বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে, যার পরিচয় পাই সাহিত্যে, চিত্রকলায়। সেই দৃষ্টির বেদনা কে বুঝবে? আহত বা মৃত যে পড়ে আছে তার পোশাকের রং, মুখের ভাব, মাথার টুপি থেকে আরম্ভ করে তার ব্যবসাগত সম্প্রদায়গত আকস্মিক এবং বিশিষ্ট চিরন্তনী পরিচয় সবই কবির নেত্রাঙ্কিত হয়, কিন্তু তথ্য ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ মানুষটিকে দেখা-ও সেই চিত্রদৃষ্টির অন্তর্গত। কোনো গণ্ডিতে বদ্ধ রেখে, বিদ্বেষের অবয়বে ঘটনার ব্যাখ্যান

শিল্পীর ধর্মবিরুদ্ধ। আক্রান্ত গ্রামের মাঝখানে ঐ প্রকাণ্ড বটগাছটার ঈষৎ দূরবর্তিতা কবির চোখে পড়ল, তার ডালে লাল ফল, হাটের ধ্বংসিত ভাঙা মেঝেতে ছোটো মেয়ে ভাঙা চুড়ি কুড়োচ্ছে, মেঘ উড়ে গেল ওপারের জলা মাঠ পেরিয়ে। হঠাৎ হুহু করে ওঠে চৈতন্যের হাওয়া। রাষ্ট্রিকেরা যখন কম্যুনিস্ট ফ্যাসিস্ট গুনছেন, ধার্মিকতার যাজক চিনছেন ধর্মচিহ্ন, এবং একান্ত আধ্যাত্মিক জানছেন সবটাই মায়া, তখন কবির চোখ-কান খোলা। তার কাছে সেখানে হিন্দু মুসলমান, বাঙালি পঞ্জাবি লক্ষণীয় কিন্তু, অবান্তর, রাষ্ট্রিক বা দলগত ভিন্নতার হীনার্থক তারতম্যগুলি অদৃশ্য। মনুষ্যত্বের বিশেষকে পুরো দাম দিয়েই সে মানুষকে বড়ো করে দেখে। মতামতের উষ্মা সেই পরিবেশে তার কাছে সমধিক ব্যর্থ। এমনতর উপলব্ধি যার সেই শিল্পীর পক্ষে বিপদকালে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সেবা করা শুধু সহজ নয়, অনিবার্য। প্রশ্ন উঠবে, শিল্পী না হয়েও কর্মীরা বিদ্বেষহীন আত্মপর-বোধাতীত শুশ্রূষা কি করেন না? যাঁরা করেন তাঁদের বলব জীবনশিল্পী। অর্থাৎ তাঁদের কর্মের মূলে আছে সর্বাঙ্গীণ বোধের শিল্পপ্রতিভা; কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক বিধি বা সভাসমিতির প্রবর্তনায় জাতি-বর্ণ-সাম্প্রদায়িকতার বিবিধ বিষকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আনুষ্ঠানিক ধর্মের পূজারিকে যদি বলি ধার্মিক তাহলে তার ব্যবহারেও বিশ্বাস নেই। কেননা অনুষ্ঠান বাহিরের, এবং বিষয়বুদ্ধির সংস্কারে বিজড়িত। মানুষের স্বভাবে যে-শিল্পবৃত্তি ছড়িয়ে আছে, যা নিঃস্বার্থ এবং মুক্ত তারই বিশেষ সাধকরূপেই শিল্পীর জোর, সেই বৃত্তিকে জনসাধারণের চিত্তে তিনি আনন্দের প্রকর্ষে জাগিয়ে তোলেন। সাক্ষী সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ কাব্য, বা সেই-জাতীয় ধর্মশাস্ত্র যার রচয়িতা একাধারে ঋষি এবং কবি এবং যিনি শুধু আলো দেখেননি আলো দিয়ে প্রাত্যহিক সংসারকে রূপে রসে দেখিয়েছেন। লোক ব্যবহারে যথার্থদর্শিতার এই প্রেরণা আসতে পারে নৈর্ব্যক্তিক ধর্মদর্শন হতে, কিন্তু তার ব্যবহার জানেন শিল্পী। আদর্শকে মানুষের মনোধর্মে বিবিধ কর্মে প্রতিফলিত করে উন্নীত করা, শিল্পিত করার দায়িত্ব সকল ধর্মসাধকের নয়। তার জন্যে চাই শিল্পীর সৃষ্টিকুশলতা এবং স্বাভাবিক প্রসাধনশক্তি।

মহাভারতের অর্জুন পাণ্ডববংশীয়দের মধ্যে আর্টিস্ট্‌স্বভাবাপন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিপদকালে নীতিবাচন অথবা তার লঙ্ঘন কোনটা প্রচার করবেন ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু ওরই মধ্যে শিল্পভাবুক অর্জুন সারথি কৃষ্ণের সামনে কবির দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়ালেন। বিশ্বদর্শনের বর্ণনার চেয়ে অর্জুনের চোখে দেখা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রথম দৃষ্টি আমাদের কাছে মূল্যবান। আজ অবধি অর্জুনের প্রশ্ন জেগে রইল, যুগে-যুগে তার উত্তর দেবার চেষ্টা চলেছে। মানবসাহিত্যের ইতিহাসে যুগ্মদৃষ্টির এই বোধহয় প্রাচীনতম শুভ্র দৃষ্টান্ত। একই কালে অর্জুন স্পষ্ট দেখছেন পুণ্যতার প্রয়োগ ও পরিণাম। দেখছেন স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের মধ্যে দোষী-নির্দোষীর অসংখ্য মিশ্রণ; রাজ্যসাম্রাজ্যস্পৃহায় দুই দলের বিশেষ ভেদ নেই। বংশরক্ষার সমরোদ্যত বিক্রম উভয় ক্ষেত্রেই সাংঘাতিক অস্ত্রশীল। এমন অবস্থায় যে-কবিমানস রক্তপ্লাবনে পরাঙ্মুখ হয়ে অন্য কোনো উপায়ে মীমাংসা খোঁজে সে আগে যোদ্ধা ছিল এখন দ্বিধাপন্ন, এতে তাকে ক্লীব বলা চলে না, চক্ষুসম্পন্ন বলতে হয়। তার প্রশ্নের জবাব কোথায়? ধর্মযুদ্ধের নামে স্ত্রীগণকে পাপলাঞ্ছনার হাতে সঁপে দিয়ে, কুল প্রদুষ্ট করে, অশুচি সংসারের "রুধিরবিদিগ্ধ" প্রলয়কলুষ রূপ বরণ করা আর যাই হোক

মানবোচিত নয়। শ্মশানরচনার সুকৌশল এবং নীতিবর্জিত বহু আচরণ-দ্বারা পৃথিবীতে জয়ের চিতা জ্বালিয়ে অবশেষে স্বর্গে প্রস্থানের ঘটনা ইতিহাসে প্রশংসা পেল, কিন্তু মানুষের মধ্যে যিনি শিল্পী যিনি দ্রষ্টা তাঁর কাছে এটা চিরন্তন করণীয় বলে গণ্য হতে পারে না। পাঁচটা গ্রাম বাঁচাবার জন্যে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের দাম দেওয়ার বিধি আজও চলেছে। কখনও দেখি তার সাম্রাজ্যিক রূপ কখনও বা সাম্প্রদায়িক, কিন্তু মহাকাব্য লেখকের মন শ্রেষ্ঠ দৃষ্টিতে উঠে তাতে সায় দেয়নি! হয়তো কুরুপাণ্ডুর সময়ে স্বয়ং কৃষ্ণের পক্ষেও কর্মগত ধর্মগত পথ নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না, আজও পুরো সম্ভব হয়নি, কিন্তু অর্জুনের চরিত্ররচয়িতা ও দৃষ্টিব্যাখ্যাতা মহাকবি ধন্য। মানুষের মুক্তদৃষ্টির এমন নির্ভীক অকুণ্ঠ প্রকাশ জগৎ-সাহিত্যে দুর্লভ। ভ্রাতৃহত্যা নরহত্যা শিশুহত্যাকে "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" অতএব মারো এই মন্ত্রব্যাখ্যায় চাপা দেবার চেষ্টাই আমাদের পক্ষে ক্লীবত্ব। অবশ্য মূল গীতায় এ-সব কোনোই সংসর্গ নেই। সেখানে না যুদ্ধ, না হন্যতা; নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়ে পরমার্থের সোপান সেখানে নির্ণীত। কিন্তু যদি মহাভারতের গৃহযুদ্ধ এবং বিবিধ পাপাচরণের সঙ্গে গীতার চিরন্তন শ্লোকের ঐরূপ অন্ধযোগ পরবর্তী কোনো নিকৃষ্ট কবির সাধিত না হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে, অর্জুনের দৃষ্টিই ধার্মিক প্রলেপের চেয়ে সত্য, প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুর দৃষ্টিতত্ত্ব তখনকার সামাজিক অসামর্থ্যে আচ্ছন্ন। অর্থাৎ শিল্পীর কাছে, যাকে বলা হয় ধার্মিক ব্যাখ্যা, তারই পরাজয়।

বলা বাহুল্য সমস্ত গীতার মূলদর্শন শঠতার হন্যতার কুরু-পাণ্ডবীয় আচরণকে সমূহ প্রত্যাখ্যান করে। "সমদর্শিতা"-ই ঐশীদৃষ্টির অর্থে সেখানে ব্যাখ্যাত। সেই দৃষ্টি পাপকে অগ্রাহ্য করে না, কিন্তু পাপের বিরুদ্ধে আচরণেও শ্রেষ্ঠ ধর্মকেই একমাত্র রক্ষণীয় বলে জানে। কেননা দৃষ্টিমানের পক্ষে জয়পরাজয়ের লৌকিক বিচার নেই। বাজসনেয় সংহিতায় যে "সমীক্ষা"-র কথা বলা হয়েছে তারই আবির্ভাব দেখেছি অর্জুনের চোখে :

মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে॥

মহাভারতের যুদ্ধকে অতিক্রম করে ধ্বনিত হয়েছে ঐ কাব্যেরই অন্তর্নিহিত মহাবাণী :

জীবিতুং যঃ স্বয়ং চেচ্ছেৎ কথং সোঽন্যং প্রঘাতয়েৎ।
যদ্ যদাত্মনি চেচ্ছেত তৎ পরস্যাপি চিন্তয়েৎ॥

"যে নিজে বেঁচে থাকতে চায় সে কেমন করে অন্যকে আঘাত বা হত্যা করে? নিজের জন্যে যা ইচ্ছা কর অন্যের জন্যেও তা-ই ইচ্ছা কোরো।" দুঃখের বিষয় সমাজে মানবধর্মের পতন ঘটে, এবং সেই ভ্রষ্টতারও যথাযথ রূপ দেওয়ার দায়িত্ব কবির। তা ছাড়া আদি রচনার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য প্রক্ষিপ্ত অংশের উগ্র সমর্থকেরও অভাব নেই। তৎসত্ত্বেও অর্জুনের চোখে দেখা শিল্পীর আদর্শ রয়েই গেল। সেই দৃষ্টির পরিণতি দেখি উত্তরকালের নানা দেশীয় কাব্যে শিল্পে কারুচিত্রে।

য়ুরোপীয় সাহিত্যে বোধহয় সেকস্‌পীয়রের কোরায়লনাস্ নাটকে এই যুগ্মদৃষ্টির পরিচয় সবচেয়ে আশ্চর্য উদ্ভাসিত হয়েছে। হননকারী বীর যখন ছদ্মবেশে বিধ্বস্ত শত্রু-শহরে প্রবেশ করেছেন তখন রক্তচক্ষুর দৃষ্টি অতিক্রম করে মানুষের দৃষ্টি তাঁর চোখে ভর করল :

A goodly city is this Antium. City,
'Tis I that made thy widows : many an heir
Of these fair edifices fore my wars
Have I heard groan and drop. Then know me not;
Lest that thy wives, with spits and boys with stones,
In puny battle slay me.

বলা বাহুল্য যোদ্ধা বীরের পক্ষে এইরূপ দুর্লভ ক্ষণবাক্য ক্লীবত্বের পরিচয় নয়, সাধু সন্ন্যাসী বিপক্ষে থাকলেও বলতে হবে এতে মানুষের ক্ষণদেবত্ব বা বিরল মানবত্বেরই উদ্বোধিত প্রকাশ। সেকস্‌পীয়র বা মিল্‌টন্‌ যেখানে জাতি ধর্ম মতবৈরতা বর্ণ সম্প্রদায় সকলের ঊর্ধ্বে উঠে শিল্পীর দৃষ্টি পেয়েছেন সেখানে বৃহত্তর অস্মিতার আলো এসে পড়েছে তাঁদের শিখরকাব্যে। সেইখানেই তাঁদের কবিদৃষ্টির স্বাভাবিকতা। দুঃখের বিষয় যে-কথা ধর্মবুদ্ধির পক্ষেই সবচেয়ে বলা সংগত মনে হয় তা ধর্মশাস্ত্রেও আখ্যান-কিংবদন্তি ও অশ্রেয় শ্লোকে নানা ভাবে ব্যর্থ হয়ে আছে। এতে সমাজের বহু ক্ষতি ঘটল। আজও যাঁরা নামের ছাপ মারা বিজড়িত ধর্মে একান্ত বিশ্বাসী তাঁদের পক্ষে বিশ্বাসের অবসর এবং ক্ষেত্র অবাধ অবারিত বলে যা আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ যা শ্রেষ্ঠ অর্থে শিল্পদৃষ্টি তাকে প্রচলিত ধর্মবোধ হতে তাঁরা দূরে রাখেন। তা না হলে আনুষ্ঠানিক এবং সাম্প্রদায়িক ধর্ম চলে না। এমনি করে দেয়াল-তোলা ধর্ম দূরে-দূরে সরে রইল, মানুষের আশ্রয় না হয়ে বিভেদের সহায়তা করল। কাব্যেও কবিদৃষ্টি বারবার স্তিমিত হয়েছে তার প্রমাণ সর্বত্র। উদাহরণ মিল্‌টনের নানা স্তরের রচনা। তাঁর মহাকাব্যে পরিকীর্ণ হয়ে আছে চিরাচরিত লৌকিক অসমদর্শিতার উদাহরণ; বলা বাহুল্য দলীয় অত্যাচারের সঙ্গে-সঙ্গে জড়ো করা হয়েছে ধার্মিক সমর্থন যুক্তি। কখনও প্রকাশ পেয়েছে বিদ্বেষের সংশয়িত দ্বিধা-বিভক্ত বিচার। কিন্তু প্যারাডাইস লস্ট্‌-এ মিল্‌টনের শিল্পাগ্নি যেখানে প্রজ্বলিত সেখানে দুর্ধর্ষ বীরের অক্লীব্য-মাহাত্ম্য-ঘোষণা আর রইল না। তখন দেখি পুরোপুরি আর্টিস্টের কথা, শুধু পূর্ণ মানবিক দর্শনের কথা নয়, দৃষ্টির। হনন-মন্ত্রদাতাকে বেনিফ্যাক্‌টার অর্থাৎ মঙ্গলদাতা বলে পূজার পরিহাস আর রক্ষা হল না। বিদ্রূপ-শাণিত বাক্যে কবি বলেছেন :

.... Conquerors, who leave behind
Nothing but ruin whereso'er they rove
And all the flourishing works of peace destroy.
.... must be titl'd Gods,
Great Benefactors of mankind, Deliverers.

কবি বা শিল্পীর পক্ষে যে-কোনো কারণেই অমানুষিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জয়ের কীর্তি ঘোষণা করা আত্মাবমাননা, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের অপমান। যেখানে নিকৃষ্ট পথই সামনে খোলা রয়েছে, অন্য পথ দেখা যায় না, সেখানে অর্জুনের মতো স্তব্ধ হয়ে যাওয়া দৃষ্টিতেই মানুষের পরিচয়। সেখানে ব্যথিত সংশয়ের তলে-তলে মানবিক উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টাই শিল্পীজনোচিত। অথচ রক্ত-চিহ্নিত মন্দিরের শক্তিপূজায়, জিহাদের ধার্মিক ব্যাখ্যানে, য়ুরোপীয় ঐশীশক্তিময় ধার্মিক যুদ্ধে মান্ধাতা আমলের অস্ত্রশস্ত্র এবং আণবিক বোমার সঙ্গে

-সঙ্গেই ব্যবহার হয়েছে পতিত শিল্পীর নরঘাত মন্ত্র, সাম্প্রদায়িক অথবা জাতীয় অন্ধ দেশভক্তির স্তব। মিল্‌টনের কাব্যে তারও উত্তর রয়েছে :

Worship't with Temple, Priest and Sacrifice;
One is Son of Jove, of Mars the other,
Till Conqueror Death discover them scarce men,
Rolling in brutish vice, and deform'd ......
But if there be in glory aught of good,
It may by means far different be attain'd
Without ambition war, or violence;
By deeds of peace, by wisdom eminent,
By patience, temperance .....

ঠিক এই প্রশ্নই ছিল অর্জুনের কথায়। "Means far different" সেই শ্রেয় পথের জীবন-সংসর্গিত অনুসন্ধানই শিল্পীর ঈপ্সিত। যে ধ্যানীরা শ্রেয় পথকে উত্তম প্রকোষ্ঠে বন্দী করে সংসারের ক্ষেত্রে হীন সংস্করণের প্রেয় পদ্ধতি অনুমোদন করেন তাঁদের দূরে রেখে আমরা শিল্পীকে আবাহন করি। কেননা সর্বত্রগামী শিল্পীর মন হয়তো সুন্দর উপায়ের প্রেরণা এবং প্রয়োগবিধি নানা পক্ষের কাছে সংগ্রহ করে নেবেন, এবং মায়িক সংসারের প্রতি মায়ামমত্ব আছে বলেই সামাজিক মানুষের পূর্ণ উপযোগী করে তুলবেন। বিশ্বের সাহিত্যে জীবন-শিল্পের সেই প্রবণতাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে।

আধুনিক সাহিত্যের দৃষ্টান্ত নিয়ে অনেকে বলেন, বিখ্যাত সোভিয়েট শিল্পীর রচনায়, চিখনভের কবিতা বা শলকভের গল্পে মানুষের দৃষ্টি হারানো সংকীর্ণতা কি সগর্বে প্রকাশ পায় নি? কিন্তু সেখানে শিল্পীর কাগজে কালি ঢালা, সেই কালি পরাভূত লেখকের মনোজাত। ঘটনা যতই ভয়ানক হোক, সংসারে সর্বত্র দেখা যায় উভয় পক্ষেই মনুষ্যত্বের পরিচয় থাকে, সেই সত্যকে বর্জন করে শিল্পের সত্যরক্ষা হয় না। যারা চিত্রিত হল, শিল্পদৃষ্টিতে তাদের সমগ্র রূপ দেখানোর দায়িত্ব কবির, স্বচ্ছ দৃষ্টির মূল্য দিয়ে দেখলে "ঘৃণা" নামক গল্পে শলকভের শিল্প মানবিক বেদনা অর্থাৎ সম্পূর্ণ জানার সততায় আরও একটি স্তরে গিয়ে পৌঁছত। তাহলে ঐ গল্পটি সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হত। কিন্তু মনে রাখতে হবে শিল্পীর পরাজয় তার পরিচয় নয়। দু-চারটে অগৌরবান্বিত সংঘাত-কাব্যের অন্তর্গত দলীয় যন্ত্রপূজা এবং চিৎকৃত ধ্বনি সংগ্রহ করে সাহিত্যের স্বরূপতা বর্ণিত হয় না। এইটেই ভাববার বিষয় যে অত্যুগ্র শিল্পীদলের মধ্যেও রাশিয়ায় কেউ ফিন্‌লন্ড আক্রমণের উপর উল্লাস-কাব্য রচনা করেননি। বর্মা লীবিয়া সংক্রান্ত ধ্বংসধ্বজ কবিতা এবং গল্প অন্যান্য সভ্য সাহিত্যে এই যুদ্ধের কালে সগর্বে দেখা দিয়েছে, কিপ্‌লিঙের মসি এবং কলমরূপ অসিকে যুগপৎ ব্যবহার করে বধকাব্য রচনার দৃষ্টান্ত এ দেশেও বিরল নয়, তবে তাতে অবশ্য বীরত্বের চেয়ে জনশ্রুতির প্রকোপই বেশি। দেশে-দেশে কত প্রখ্যাত শিল্পী স্বেচ্ছায় চক্ষু বেঁধেছেন, দলীয় স্বার্থবুদ্ধির দাসত্ব করিয়েছেন আপন তুলিকে, গানের সুরকে। কিন্তু এই কি সৃজনীদৃষ্টির নমুনা? বহু শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মিলবে যা সম্পূর্ণ

অন্য-জাতীয়। শেষ দুই যুদ্ধের কোনো সময়েই ইংলন্ডে শিল্পদৃষ্টির অভাব ঘটেনি, বহু কবিতায় গদ্যে তার প্রমাণ রয়ে গেল। যখন গির্জায় বিদ্বেষের ঘণ্টা বাজছে, কালীঘাটে জয়ের পূজা হচ্ছে প্রভুদের তোষণার্থে, সংবাদপত্র ভরে উঠেছে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের সমর্থনে তখনও শিল্পীর দৃষ্টি হারায়নি। সর্বজনের হয়ে কোথাও সে জেগেছে। শত্রুপক্ষকেও মহীয়ান্ করে দেখানোর যে প্রয়াস দেখি মহাভারতের কর্ণ দ্রোণ ইত্যাদি চরিত্রসৃজনে, ক্ষমা এবং আত্মবিশ্লেষণবুদ্ধির সেই মহান শিল্পবৃত্তি ভারতবর্ষে স্তিমিত হবে না। কিন্তু সাহিত্যিকদের নূতন প্রেরণার জন্যে ফিরে যেতে হবে সহজ দৃষ্টির কাছে। রবীন্দ্রনাথের গল্পসল্পে "দ্বন্দ্ব" বলে রচনাটিতে আছে সেই সৃষ্টির সুর;তাঁর রচনায় সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে দেখার চরম শিল্প। দেখব মানুষকে, স্বদেশের স্বদলের বিশেষ ধর্ম বা মতাবলম্বী মানুষকে নয়। শিল্পীর চক্ষু হারালে খণ্ডিত ভারতবর্ষের দৃষ্টি আরও দূরে সরে যাবে। সেদিন জর্মান লেখক Ernst Toller-এর রচনা পড়বার সময় মনে হচ্ছিল স্বজাতীয়ের উৎপীড়ন এবং সর্ববিধ হন্যতা-বিদ্বেষের মধ্যেও খাঁটি শিল্পীর মানবদর্শন কীভাবে জেগে ওঠে তা আশ্চর্য। যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন পক্ষের নিহত মানুষের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছেন :

> Suddenly, like in darkness, the real truth broke in upon me; the simple fact of Man, which I had forgotten, which had lain deep buried and out of sight ... A dead man. Not a dead German. A dead man.
>
> All these corpses had been men; all these corpses had breathed as I breathed; had had a father, a mother, a woman whom they loved, a piece of land which was theirs, a face which expressed their joys and their sufferings, eyes which had known the light of day and the colour of the sky. At that moment of realisation I knew that I had been blind because I had not wished to see; it was then only that I realised, at last, that all these dead men, Frenchmen and Germans were brothers, and I was brother of them all.

এই দৃষ্টি নিয়ে ভারত পরিভ্রমণে বেরোলে আজ অগণ্য আর্ত লোকের জীবনে যা ঘটছে তার মানবিক চিত্র আমরা দেখতে পাব। যাঁরা শিল্পী নন অথচ জীবনশিল্পী তাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রতীক পুরুষ ভারতবর্ষের চোখ খুলেছেন, তাঁর দৃষ্টি ধর্ম সম্প্রদায় রাষ্ট্র বা জাতির কোনো কক্ষে নিবদ্ধ নয়। যাঁর কথা বলছি তিনি অবশ্য অনেকের কাছে লেখকরূপেও উৎকৃষ্ট শিল্পী। কিন্তু আর্টিস্টের দায়িত্ব কি আজ একান্ত হয়ে ওঠে নি? দুই দিকে দেখা এক-দৃষ্টির কাব্য উপন্যাস চিত্র প্রকাশ না হলে লোকালয়ে দৃষ্টি চারিয়ে যাওয়া কঠিন হবে। এই দৃষ্টিগোচরতার প্রধান বাহন হল সাহিত্য, ভাষা দিয়ে জাগানো তার কাজ। শিল্পীর গতি সর্বত্র, হাটবাজারে তার বিহার, রাজদ্বারে শ্মশানে চ;অথচ তার মন একাকী দর্শক। তাকে আজ চাই পুনর্বসতির কেন্দ্রে, আর্তের হাসপাতালে, মন্দিরে গুরুদ্বারায় মস্‌জিদে। সংসারের মানুষকে সে চিনবে

রাষ্ট্রসীমানার দুই পারে এবং তাকে নিয়ে রচবে মহাকাব্য। প্রাচীন কাব্যের নায়ক হত রাজা, বহুহন্তারক যোদ্ধা, বা যাঁদের মনে করা হত অনন্যসাধারণ, আজ সেই মিথ্যা সংস্কারের দাসত্ব হতে মুক্তি পেয়েছে সাহিত্য। শিল্পীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে সাধারণের অনন্যতা। ট্রাম-কন্ডাক্টর, শিক্ষক রিক্‌শ-চালক, বিজ্ঞানকর্মী, পাটকলের মজুর বা হোটেলের দ্বার-রক্ষক কারও বাধা নেই নাটকের নায়ক হতে; যদি শিল্পী তাকে বেদনার মূল্য, মানুষের যথাযথ দাম দিয়ে দেখতে জানেন। উচ্চ আধ্যাত্মিকের কাছে যে সাধারণজনেরা বহু জন্মান্তর বিনা মনুষ্যত্বের অধিকারী নয়, অথবা যাদের জন্যে ধর্মের নিকৃষ্ট বিধান; তাথ্যিকের কাছে যারা রাষ্ট্রতথ্য অর্থনীতি বা জৈবতথ্যের সমষ্টি; সেই প্রতিবেশীদের চরম একটি মূল্য আছে শিল্পীর চোখে। তারই দৃষ্টিতে আমাদের সংসারের প্রধান নির্ভরস্থল। রবীন্দ্রনাথের যুগে আছি বলেই এ-কথা আরও স্পষ্ট করে বুঝেছি; তিনিই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের দৃষ্টিপথ খুলে দিয়েছেন। এখন নূতন অভিযানে বেরোতে বাধা নেই। শিল্পীর কাজ বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে।

☐ *সাম্প্রতিকী*, ১৩৮৪

শিল্প ও স্বাধীনতা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

স্বকীয় বিদ্যা-বুদ্ধির সম্বন্ধে অহৈতুক গৌরববোধ সকল মানুষের স্বভাবগত; এবং আমার আবাল্য অকর্মণ্যতা সত্ত্বেও গুরুজনেরা আমাকে যদিচ চিরকাল ধরে কোনো এক পরোপকারী পশুর সমপর্যায়ে ফেলে আসছেন, তবু অন্তত আকারে-প্রকারে সেই স্বনামধন্য জীবের বিজাতীয় হওয়ায় আমিও নিজের মেধা আর ব্যুৎপত্তির উপরে মানবোচিত আস্থা রাখি। কিন্তু বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক : তার কাছে আত্মপ্রসাদও প্রশ্রয় পায় না; এবং গণিতব্যবসায়ী বন্ধু-বান্ধবের মুখে যখন শুনি যে বস্তুবিশ্বের আদিম ও ক্ষুদ্রতম অধিবাসী পরমাণুর বিস্তার একেবারে অনন্ত, আর এ-কথা না মেনে উপায় থাকে না যে আমার মতো নির্বোধের পক্ষে পরাবিদ্যা আর পদার্থবিদ্যা, দুই-ই যেহেতু অনধিকার চর্চা, তাই নেতিবাদের স্থানে অনিশ্চয়বিধিকে বসিয়ে আমি ধীশক্তির পরিচয় দিচ্ছি না, আমার মর্মান্তিক অবিদ্যাই ফুটিয়ে তুলছি। অবশ্য আধুনিক অঙ্কশাস্ত্রে অনেকেরই প্রবেশ ব্যাহত; এবং আমাদের আত্মশ্লাঘা সচরাচর এত দুর্মর যে পারিভাষিকের ধাক্কায় তা শুধু মচকায়, ভাঙে না। তাহলেও সম্প্রতি সেই সহজ স্থিতিস্থাপকতাও আমি হারিয়েছি; এবং আপেক্ষিক বা বৈশেষিক তত্ত্ব দূরের কথা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাধারণ্যেও আমার দৃষ্টি প্রতিহত।

উদাহরণত পাশ্চাত্য জগতের সমরসজ্জা উল্লেখযোগ্য; এবং গত বিশ বছর যাবৎ সে অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা যেকালে আগামী প্রলয়ের নিরন্তর বিভীষিকা দেখছে, তখন সেই অমোঘ সর্বনাশের অভ্যর্থনায় তাদের প্রাণপাত প্রযত্ন আমার বিচারে নিছক পাগলামি। কিন্তু অর্ধেক পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত, এমন ধারণাও অন্যায়; এবং এ-রকম সিদ্ধান্ত আরও অমূলক যে আত্মম্ভরি সমাজপতিরা স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে স্বদেশীয়দের ক্ষেপিয়ে অহরহ নিজের আর পরের যথাসর্বস্ব খোয়াবার মতলব আঁটছেন। কারণ ধনিক শ্রেণী আর যাই হোক, একেবারে মূঢ় নয়; যে কুলি-মজুরদের তারা চরিয়ে খায়, তাদের সমান বিবেচনা বোধ হয় ফোর্ড্‌রকিফেলার-এরও আছে; এবং ধনকুবেররা নিশ্চয়ই ভোগের জন্যে টাকা জমায়, প্রভাব ও প্রতাপ-অর্জনের আশাতেই অনুগতদের পিষে মারে। সুতরাং পৃথিবীকে শ্মশানে পরিণত করায় শ্রেষ্ঠীদের বহুবিজ্ঞাপিত ষড়যন্ত্র আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগে; আমি বুঝতে পারি না যে নগর-গ্রাম উড়িয়ে-পুড়িয়ে, আত্মীয়-স্বজনের গলা কেটে, মানবসভ্যতার উচ্ছেদ সেধে, দু-চারজন অতিজীবিত শক্তিশালীর কী লাভ।

তবে এ-ধরনের প্রশ্নই হয়তো ছেলেমানুষি; হয়তো জীবন্মুক্তেরাই নির্বাচনক্ষম, এবং মানুষ ফ্রয়েডি মুমূর্ষার পদানত; হয়তো রাজনীতি কার্যকারণের ধার ধারে না বলেই, হাল আমলে তা রাষ্ট্রবিজ্ঞান-পদবাচ্য। অথবা হিতৈষীদের অনুমান ঠিক : কানের সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক সর্বত্র বিষমানুপাতিক নয়; এবং আমার মতো দ্বিপদ জন্তুর মধ্যেও চতুষ্পদী মস্তিষ্ক সুলভ। পক্ষান্তরে রাসভরাজ্যে সোহংবাদের প্রচলন নেই; এবং অস্থিলোভী কুক্কুরের গতিবিধি যদি গাধার সম্বন্ধেও খাটে, তবে সে নিশ্চয় আত্মধিক্কারের আক্রমণে আত্মহত্যার শরণ নেয় না — নিঃসঙ্গ শূন্যে আর কিছু না পেলে, নিজের প্রতিবিম্বে প্রতিপক্ষ দেখে জীবোচিত প্রতিযোগ বহাল রাখে। বোধহয় সেই জন্যে মানবচৈতন্যের রহস্য-কথনে নেমে হেগেল্ এক আর বহুর মধ্যে প্রভেদ করেননি; এবং ঘাত-প্রতিঘাতের চক্রবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী জেনে তাঁর শিষ্য মার্ক্স্ অরক্ষণীয় কৈবল্যকে প্রগতির চূড়ান্তে ঝুলিয়েছিলেন বটে, তবু লোকত স্বার্থ আর পরমার্থের অভিন্নতায় তাঁর বিন্দু-বিসর্গ সংশয় ছিল না। আমার বিশ্বাস আধুনিক মনোবিজ্ঞান মার্ক্স্-এর অনুগামী; এবং নৃতত্ত্ববিদেরা মানুষের ইতিহাসে পরিণামী প্রকর্ষের পদধ্বনি শুনুন বা না-শুনুন অন্তত এ-বিষয়ে তাঁদের মতান্তর নেই যে ব্যক্তি যেকালে সমাজব্যবস্থার দাস আর সমাজব্যবস্থা ভূতপ্রকৃতির মুখাপেক্ষী, তখন নিরঞ্জন বিবেক কবিকল্পনার পরাকাষ্ঠা, এবং নির্লিপ্ত বিবেচনা আবশ্যিক পক্ষপাতের নিমিত্ত-মাত্র।

বলা বাহুল্য যে উক্ত সিদ্ধান্তের আড়ালে সংসারযাত্রার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা নিহিত নেই; বরঞ্চ তার পরেই ঊর্ধ্বশ্বাস স্বর্ণমৃগের অনুধাবন ছেড়ে সনাতন সত্য-সমূহের ধ্যান-ধারণা আমাদের আদ্যকৃত্য; এবং অনেকে তাই উল্লিখিত বুদ্ধিবিভ্রাটের জন্যে আমার মতো দীর্ঘশ্বাস না ফেলে শিল্পের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে শান্ত, শিব, সুন্দরের আশাপথ চেয়ে থাকেন। কিন্তু কুৎসিতের অস্তিত্ব-সঙ্কোচে ক্রোচে-প্রমুখ হেগেল্-পন্থীদের নির্বন্ধ সত্ত্বেও তাঁদের প্রতীক্ষা প্রায়ই বিফলে যায়; অনির্বচনীয় উপাদানের তাঁরা যে "স্প্যানিশ্ দুর্গ" গড়েন, তার উপরে ক্বচিৎ-কদাচিৎ অনধিগম্য ভূমার ছায়া পড়ে বটে, তবু তার ভিতরে মনুষ্যধর্ম বাসা বাঁধে না, সংস্কৃতিবিনাশীরাই তাদের অস্ত্র-শস্ত্র লুকায়; এবং যখন সে-শত্রু তাড়াবার সময় আসে, তখন মায়াপুরী তো ধূলায় মেশেই, এমনকি স্থপতির জিজীবিষাও টিকে কিনা সন্দেহ। সুতরাং আমার তুল্য নির্বিবাদীর পক্ষেও শ্রেণীবিরোধের অঙ্গীকার অনিবার্য; এবং জন্মান্তরীণ জড়বাদের প্রকোপে আমি এক দিকে যেমন সকল মানুষের নির্বিকার সামান্যতায় আস্থাবান, তেমনই ন্যায়নিষ্ঠার খাতিরে আমি অন্য দিকে মানতে বাধ্য যে আজকের অস্বাভাবিক অধিকারভেদ যে-পর্যন্ত না ঘুচছে, তত দিন সে-মৌল সৌসাদৃশ্যের স্ফূর্তি অসম্ভব।

ফলত আজ ঐতিহ্যবিলাসী ই. এম্. ফর্স্টর সূদ্ধ সাধারণস্বত্বের দিকে ঝুঁকেছেন; এবং তিনি দলগত স্বার্থের সংঘর্ষকে কেবল উত্তরসামরিক য়ুরোপের আধিদৈবিক ট্র্যাজিডি বলে চেনেননি, সঙ্গে সঙ্গে এটাও হয়তো বুঝেছেন যে ট্র্যাজেডির উপসংহারে অ্যারিস্টটেলি চিত্তশুদ্ধি সুনিশ্চিত। ইতিমধ্যে কলাকুশলীর তথাকথিত স্বাতন্ত্র্যে তিনি বীতশ্রদ্ধ; কারণ রূপকারেরাও না খেয়ে বাঁচে না, এবং খাদ্যসংগ্রহ ব্যয়সাপেক্ষ, অর্থাৎ

পাকে-প্রকারে বিত্তবানেরই আয়ত্তে। তৎসত্ত্বেও তাঁর মধ্যে অবশ্য সাম্যবাদের সংস্পর্শ নেই; এবং এ-প্রসঙ্গে ফর্স্টর-এর নাম নিয়ে আমি যে-মনোভাবের পরিচয় দিয়েছি, হয়তো একদিন তারই সাক্ষ্যে বামাচারীরা আমাকে দণ্ডনীয় ভাববে। কিন্তু ভারত ও স্পেনের মধ্যে সাত সমুদ্র, তেরো নদীর অন্তরাল বর্তমান জেনেও আমি নিশ্চিত থাকতে অপারগ; আমি আজ মানতে অক্ষম যে পশ্চিমের শ্রেণীবিচার আর প্রাচ্যের বর্ণাশ্রমধর্ম বিষম ধাতুতে গঠিত; এবং প্রথমটার ভিত্তি যেমন অপ্রাকৃত বিসংবাদে, শেষোক্তের মূল তেমনই অতিপ্রাকৃত অধিকারভেদে।

পক্ষান্তরে শ্রমবিভাগের সুবিধা আমার কাছে সুপ্রকট; এ-কথাও আমি একাধিক বার শুনেছি যে বিশ্বের প্রাণ বৈচিত্র্য; এবং দেহাত্মবাদী পাভ্‌লোভ্‌ যে শেষ পর্যন্ত মনুষ্যেতর প্রাণীর ভিতরে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য দেখেছিলেন, তা সুদ্ধ আমার অবিদিত নয়। তবে সে-পার্থক্যের গুণে উকিলের ছেলে ডাক্তারি পড়ে, অথবা বৈজ্ঞানিকের ভাই কবিতা লেখে, মানবীর গর্ভে দেবতা জন্মায় না; এবং আসলে এ-রকম নানাত্ব আমাকে নিরবধি না টানলে, আমি নিশ্চয় মানতুম না যে রুষ-দেশি মধুচক্র হুলে ভরা। অন্তত পক্ষে সমাজব্যবস্থার ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় আমার অনভিপ্রেত; এবং সেই জন্যে আমি নিঃসংশয়ে বুঝি যে মানুষমাত্রেই যদি স্বকীয়তা-বিকাশের সমান সুযোগ না পায়, তাহলে অচির ভবিষ্যতে দেশে দেশে তো রক্তগঙ্গা বইবেই, এমনকি তার পরে হয়তো যোগ্য ব্যক্তির প্রাপ্য লুটে খাবার লোকও আর মিলবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এ-আশঙ্কাতেও শুদ্ধ শিল্পীরা বিচলিত নন : এখনও তাঁরা স্বার্থসংরক্ষণে বদ্ধপরিকর; এবং উপস্থিত নিগ্রহনীতি তাঁদের একটা প্রত্যাশাও মেটাতে না পারুক, অবস্থান্তরে পাছে আত্মরতিতে আঁচড় লাগে, এই ভয়ে তাঁরা শশকবৃত্তি অবলম্বন করেছেন।

অথচ লক্ষ্মীমন্তদের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা প্রায় অনন্ত : সেই অধমেরা নাকি নিছক টাকার লোভে খেটে মরে, পুত্রার্থে পত্নী খোঁজে, পরিবারবর্গকে দুর্নীতির সংক্রাম থেকে বাঁচাতে বররুচিদের অজ্ঞাতবাসে পাঠায়; এবং সেই সঙ্গে কলাকৈবল্যের প্রবক্তারা কেবলই ভুলে যান যে রূপকারী বিবেকে বিষয়বুদ্ধির নাম-গন্ধ নেই জেনেও লোকোত্তর প্লেটো তাঁর আদর্শ গণতন্ত্রে কবিদের স্থান দিতে চাননি। উপরন্তু তিন হাজার বছর ধরে অনেক ঠেকে লোকনায়কেরা সম্প্রতি শিখেছেন বটে যে প্লেটোনিক্‌ তিতিক্ষা অতিশয় অনাবশ্যক, তবু আধুনিকদের নিরাসক্ত সরস্বতীপূজা স্টালিন্‌-হিট্‌লার-এরও চক্ষুশূল; এবং উভয় পক্ষের চিরকালীন মনোমালিন্য বাণীসেবকদেরই সৃষ্টি। কারণ নিজেদের সম্বন্ধে যে-কিংবদন্তি তাঁদের নিতান্ত প্রিয়, তা এই যে কাগজ-কলম এক বার নজরে পড়লে, আত্মপ্রকাশের প্রলোভনে তাঁরা একেবারে আত্মহারা হন; এবং হয়তো তাঁদের কপালদোষে প্রবাদ ও প্রমিতির প্রভেদ শুধু সর্ববাদিসম্মত নয়, প্রমাদের সঙ্গেই কবিপ্রসিদ্ধির সম্পর্ক যেহেতু নিকট, তাই যদি এ-কথা মানি যে সাহিত্যিকেরা আত্মপ্রকাশের গরজেই বই লেখেন, তবে এ-অনুমানও অনস্বীকার্য যে টাকা সুদে খাটিয়ে মহাজন করে আত্মপ্রকাশের সুরাহা।

অবশ্য কর্তাব্যতিরেকে কর্ম দুর্ঘট; এবং এই জন্যে কর্মের উপরে কর্তার স্বাক্ষর যত

না স্পষ্ট, কর্মপ্রবর্তনা আর ব্যক্তি-বাদের সমীকরণ ততোধিক লোভনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে একদল লোক যখন একটা গোখরো সাপের তাড়ায় দিগ্বিদিকে ছোটে, তখন তাদের প্রত্যেকের চাল-চলন আপাতত আলাদা; কিন্তু দূর থেকে তাদের চাঞ্চল্য দেখে যিনি ভাববেন যে তারা ব্যক্তিত্ববিকাশের পরিশ্রমেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে, তিনি হয় অন্ধ, নয় ভাষাব্যবহারে অপটু। কারণ মানুষের আচার-ব্যবহারে ব্যক্তিগত শিক্ষা-দীক্ষার প্রাদুর্ভাব যেমন তর্কাতীত, তেমনই শ্রুতি-স্মৃতির বশবর্তিতা প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের প্রতিকূল; এবং ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য সত্য সত্যই থাকলে, সে নিশ্চয় এমন কোনো অতিমর্ত্য সত্তার অধীশ্বর যার হ্রাস-বৃদ্ধি পার্থিব প্রয়োজনের প্রভাব-মুক্ত। কিন্তু জন্মাবধি সেই রকম অদ্বয়, অব্যয় আত্মার মাহাত্ম্য-কীর্তন শুনে শুনে আমার কর্ণপটহই আজ বিদীর্ণপ্রায়, সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎ পরিচয়ে আমার দর্শনেন্দ্রিয় এখনও ধন্য হয়নি; এবং দৈনিক পত্রে পড়ি বটে, যে ভূতজগতের দিগ্বিজয় সেরে বিজ্ঞান ইদানীং প্রেতলোকে অভিযান পাঠাতে ব্যস্ত, তবু দু-একজন বিশ্বাসঘাতকের কাছ থেকে সে-দুর্ভেদ্য রাজ্যের যে-সংবাদ আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি, তাতে সে-দেশবাসীর অফুরন্ত আয়ুর প্রমাণ থাক বা না থাক, অন্তত এটুকু বোঝা গেছে যে সেখানে প্রতিভার চেয়ে মতিভ্রমের আদর বেশি।

অতএব সর্পাঘাত আসন্ন জেনে আর্তেরা অমর আত্মার আশ্বাসে বুক বাঁধতে পারে না; এবং অন্তর্যামীর আশীর্বাদে শাশ্বত সৌন্দর্য নখদর্পণে এলেও, সৎশিল্পী লোকরঞ্জনের অভিলাষেই আলস্য ভোলে। তবে সমষ্টিগণিতের মতে সঙ্কল্পসিদ্ধির অনুপাতে দৈবদুর্বিপাক সংখ্যাভূয়িষ্ঠ; এবং পলাতকেরাও যেমন কালে-ভদ্রে অপঘাতে মরে, তেমনই মন জোগাতে গিয়ে কেউ কেউ কেবল বিরাগ জাগায়। তখন হতভাগ্যেরা অগত্যা আত্মসমাহিতি সাধতে বসে, কিংবা উচ্চকিত ঐকতানে পানবৈরী শৃগালদেরও ছাপিয়ে তারা অহরহ রটায় যে স্বকীয়তার নিষ্পেষণ চিরপ্রথার মৌরসী অভ্যাস। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস এ-রূপকথার প্রতিবাদী; এবং মৌখিক পরিচয়ে মালার্মে-কে যতই স্বাবলম্বী লাগুক না কেন, যদি খোঁজা যায়, তবে তাঁর জীবনবৃত্তান্তেও প্রচুর বিষয়াসক্তি বেরোবে। নচেৎ আপন কাব্যকলার ব্যাখ্যায় তিনি দেশ-বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন না, নতুবা প্রতীকী কাব্যের সঙ্গে ভাগ্নারী সঙ্গীতের তুলনা হাস্যকর ঠেকত, নয়তো তাঁর জটিলতার আড়ালে হেগেলি উৎক্রান্তির কম্বুরেখা ধরা পড়ত না, ভালেরি-র স্বপ্নজীবী বাসুকিই উঁকি পাড়ত।

আসলে শিল্প আর অচৈতন্যের আদান-প্রদান বিংশ শতকি অপবিজ্ঞানের আবিষ্কার নয়, প্রাচীনেরাও বোধহয় তাকেই প্রেরণা বলতেন; এবং লেওনার্দো দা ভিঞ্চি-র সাত্ত্বিক ভাবচ্ছবির মধ্যে যৌন বিকারের সন্ধান আধুনিক কুরুচির নমুনা হোক বা না হোক, মনস্বী এলিয়ট্-ও মুক্ত কণ্ঠে মেনেছেন যে বিষয়নির্বাচন কবিদের অধিকার-বহির্ভূত। হয়তো এই জন্যে রসসৃষ্টির লক্ষণ-বিচারে তাঁর সঙ্গে অ্যারিস্টট্‌ল্-এর মতদ্বৈত নেই; এবং সৎসাহিত্যের মায়ামুকুরে তিনিও ম্যাথু আর্নল্ড্-এর মতো সাময়িক জীবনযাত্রার প্রতিবিম্ব দেখেন। কারণ অবচেতনার মূল তো সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে নিহিত বটেই,

তার অতিজটিল শাখা-প্রশাখা সুদ্ধ আহত আকাঙ্ক্ষার গুপ্তি; এবং আকাঙ্ক্ষা এমনই একনিষ্ঠ যে অনর্থেও সে অর্থকে চায়। আড্‌লার-প্রমুখ ভূয়োদর্শীরা আবার প্রাক্তন প্রবৃত্তিতে বীতশ্রদ্ধ: তাঁদের মতে মানুষমাত্রেই কোনো একটা দৈহিক অভাব নিয়ে জন্মায়, যার ক্ষতিপূরণে তার সারা জীবন কাটে; এবং সাধারণত কানা-খোঁড়াই যেহেতু এক গুণ বাড়া, তাই কবিসুলভ সংবেদশীলতা অনেক সময়ে নাকি অঙ্গহানির ফল। তবে সকল অভাব সমান লজ্জাকর নয়, এবং আগামী ক্লৈব্যের ভয়ে মালার্মে যেমন শূন্যবাদেব আশ্রয় নিয়েছিলেন, তেমনই বিধেয় হবির ভোক্তাকে আমরণ খুঁজেছিলেন বলে, বোদলেযব অশুচি কবিতা লিখেও অবশেষে পেয়েছেন ধর্মাত্মা-উপাধি।

মহাকবিদের চেতনা হয়তো স্বভাবগুণে বিস্তীর্ণ; এবং তাই অবদমিত কামনা-বাসনার অত্যাচাব তাঁদের ভাগ্যে সম্ভবত অপেক্ষাকৃত অল্প। তৎসত্ত্বেও তাঁরা পারিপার্শ্বিকের তোয়াক্কা বাখেন না, এরকম-দাবি পোষণীয় নয়; বরং শেক্‌স্‌পীয়র-এর লেখায় তদানীন্তন ঘটনাঘটনের উল্লেখ এত বেশি যে বিশেষজ্ঞের সাহায্য ব্যতীত পরিশ্রমী পাঠকও সেখানে দিশাহারা। উপরন্তু তাঁর সনেটসমূহে যে কবিত্বশক্তি প্রকট, তাব তুলনা না থাক, সেগুলির রচয়িতা একজন উমেদার, যিনি শুধু আশু অবস্থা-পরিবর্তনেব লোভে অল্প বয়সে লন্ডনে আসেননি, এমনকি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন, এবং বহু বৎসর ধবে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত দর্শকদের মন জুগিয়ে জুগিয়ে শেষ কালে যখন আশানুরূপ টাকা জমাতে পেরেছিলেন, তখন গ্রামে ফিরে তিনিই উইল বানিয়ে সহধর্মিণীকে সেরা খাটখানার ভোগ-দখল থেকে বঞ্চিত কবেছিলেন। দান্তে-র সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই; কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি যে প্রচলিত তত্ত্ববিদ্যাকে ছন্দে বাঁধতে বাঁধতে তিনিও ভূতপূর্ব বন্ধুদের পাঠিয়েছিলেন অক্ষয় নরকে; এবং সেই কপোলকল্পিত শোধবোধের ফলেই তাঁর অসংখ্য দৈন্যগ্রন্থির গেরো খুলেছিল।

সুতরাং নিরপেক্ষ শিল্প, তথা নিরাসক্ত সাহিত্য, আপাতত সোনার পাথরবাটি অথবা আকাশকুসুমের মতো নিরুপাখ্য সামগ্রী; এবং তাহলে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাদের আবেদন যুগে যুগান্তরেও ফুরায় না কেন? কিন্তু এ-ভাবে উত্থাপন করলে, প্রশ্নটার সদুত্তর পাওয়া যাবে না : তার আগে বরঞ্চ এই কথাই জিজ্ঞাস্য যে শেক্‌স্‌পীয়র-এর অনুপূর্ব গুণগ্রাহীদের মধ্যে মিল কোথায় ও কতখানি। আমার বিবেচনায় সে-মিল শুধু শেক্‌স্‌পীয়র-এর নামে আর অভিধানে যথাযোগ্য শব্দের অভাব-বশত প্রত্যেকের মানসিক প্রতিক্রিয়ার উপরে উপভোগ্য-আখ্যার আরোপে; এবং তাঁর সম্বন্ধে বেন্‌ জন্সন্-এর অবজ্ঞা বা স্যাম্যুয়েল্‌ জন্সন্-এর উন্নাসিকতাই আজ আমরা বর্জন করিনি, সুইন্‌বর্ন্‌-এর উচ্ছ্বাস বা সাইমন্স্‌-এর নার্সিসাস্‌-বৃত্তিও আমাদের কাছে সমান অসহ্য। আসলে এ-যুগ আজকালকার পরকলা পরেই শেক্‌স্‌পীয়র পড়ে, তাঁর উক্তি-প্রত্যুক্তির ভিতরে আধুনিক সুখ-দুঃখই খোঁজে, হয়তো বোঝে যে ট্যুডর রাজ্যের প্রজা ন্যায়ত এলিজাবেথি সভ্যতার মুখপাত্র, তবু ভাবে যে ষোড়শ শতাব্দী যেহেতু উপস্থিত স্মৃতিরই অংশভাক্‌, তাই সাম্প্রতিক বিশ্ববীক্ষা-ব্যতিরেকে প্রত্নতত্ত্বেরও মর্ম-গ্রহণ অসাধ্য।

আমার বিশ্বাস সাহিত্যিক অমরতার এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা নেই; এবং বোধহয় এই জন্যে উৎকৃষ্ট রসসৃষ্টি এক হিসাবে নৈর্ব্যক্তিক।

শিল্পীই নিশ্চয় শিল্পের জন্মদাতা; এবং শিল্পবিষয়ের নির্বাচন হেতুপ্রভব বটে, তবু মনোজগতের গতিবিধি আমাদের কাছে এখনও এত অস্পষ্ট যে সেখানে কার্য-কারণের সম্বন্ধ গোলকধাঁধার সঙ্গে তুলনীয়। তাহলেও উৎপত্তির পরে শিল্পসামগ্রী বস্তুজগতেরই অধীন; এবং অনেক দার্শনিকের মতে বস্তু যখন সকল সম্ভবপর প্রতিভাসের সমষ্টি-মাত্র, তখন কলাবিচারে বিষয় গৌণ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কলাবিদের সংঘটনীয় উপলব্ধিই মুখ্য। অর্থাৎ মহাকবিদেব বচনা জড়প্রকৃতির মতো; এবং আমাদেব নিসর্গনিরীক্ষার দ্রুত পরিবর্তন সত্ত্বেও পৃথিবী যেমন বদ্‌লায় না, তেমনই নানা পাঠকের হৃদয়ে বিবিধ প্রতিঘাত জাগালেও কাব্যবিশেষের স্বরূপ অবিকার থাকে। কিন্তু এ-প্রকারভেদের একটি সীমা আছে : সংসারের বৈচিত্র্য শুধুই অমেয়, একেবারে অনন্ত নয়; এবং যে-ক্ষেত্রে অনুরূপ শিক্ষা-দীক্ষার গুণে একাধিক পাঠকের মতিগতি মোটের উপরে এক রকম, সেখানে তাদের রসবোধও প্রায় অভিন্ন। সুতরাং প্রগতিসেবীরা সুদ্ধ ম'নবেন যে শেক্‌স্‌পীয়র-সম্পর্কে ল্যাম্ব্‌-এর ভাববিলাস আজও অভাবনীয় নয়; এবং সেই কেরানির জীবনব্যাপী ব্যর্থতা যদি ব্রাড্‌লি-কে সইতে হত, তবে তিনি হয়তো শেক্‌স্‌পীয়রী নায়ক-নায়িকার তথাকথিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মনে রাখতেন না, আপনাকে মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতেন।

উপরন্তু ধ্রুপদী কবিরাও নিজ গুণে ঐকান্তিক একদেশদর্শিতা কাটিয়ে ওঠেননি, অথবা নৈরাত্মরূপের প্রাণপণ ধ্যানে অমরতার বর পাননি। পুরাকালীন জীবন স্বল্পাঙ্গ ছিল বলেই, তার সমগ্র উপলব্ধি তাঁদের আয়ত্তে এসেছিল; এবং মার্ক্‌স্‌-এর ব্যাপক সিদ্ধান্ত অপ্রমাদ হোক বা না হোক, স্বয়ং ধর্মপুত্র যখন ধনুর্বেদের জোরেই দুর্বৃত্তদমন করেছিলেন, তখন সাধারণ সংসারযাত্রার সঙ্গে প্রবর্ধমান যন্ত্রশিল্পের সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধ। দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্রুনো আর আইনস্টাইন্ তুলনীয়; এবং আমার মতো অবৈজ্ঞানিকের কাছে তাঁদের মূল বক্তব্য যদিচ সমার্থবাচক, তবু এ-সত্য আমিও জানি যে প্রথমোক্তের নিষ্প্রমাণ জল্পনা-কল্পনা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আকার ধরেছে দূরবীক্ষণের গুণে, নব্য গণিতের প্রসাদে, আর বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপায় সাবকাশ মানুষের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে। অবশ্য সাহিত্যের উপকরণ স্বভাবত নাতিবহুল; এবং সেই জন্যে কণাদ ও প্লাঙ্ক্‌-এর মধ্যে যে-ব্যবধান দেখি, শেক্‌স্‌পীয়র-এর সনেট আর প্রুস্‌ৎ-এর "সদম্‌ এ গমর" তদ্দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত নয়। কিন্তু শার্ল্যুস-এর জন্ম যেহেতু অণুবীক্ষণ-আবিষ্কারের পরে, তাই তার আর মিস্টর ডব্ল্যু. এইচ্‌-এর পার্থক্য গ্র্যান্ড্‌ ক্যানিয়ন্ ও ফিফ্‌থ্‌ অ্যাভিন্যিউ-এর বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা অধিক।

অর্থাৎ মানবচৈতন্যের ধারা না বদ্‌লাক, তার জটিলতা নিরন্তর বাড়ছে; এর ফলে আজকালকার সমাজ শুধু শ্রমবিভাগে বাধ্য নয়, এমনকি এন্ট্রাপি-র প্রক্রিয়ায় পুরাতন স্থৈর্যটুকুও এখন অচিন্ত্য। সুতরাং শেক্‌স্‌পীয়র-এর যুগ দূরের কথা, টেনিসন্-এর আমলেও দেশভক্তি, প্রেম, ঈর্ষা, দম্ভ ইত্যাদি নির্বিশেষ বিষয়ে যত সহজে কবিতা

লেখা যেত, সাম্প্রতিকদের কলম আর তত অনায়াসে চলে না; এবং সাবেকি বিলাসবস্তু ইদানীং যেমন নিত্যব্যবহার্য আসবাবের কোঠায় নেমেছে, তেমনই প্রাচীন কাব্যের মুখ্য উপজীব্য আবেগ আর কারও মুখে রোচে না, পাঠকমাত্রেই খোঁজে অনুভূতিবৈচিত্র্য। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের মতে আবেগ অথবা ইমোশন্ অবিনশ্বর, এবং অনুভূতি অথবা ফীলিং ক্ষণভঙ্গুর; কারণ আবেগ দেহধর্মেরই নামান্তর, এবং দেহধর্মের পরিবর্তন এত মন্থর যে তাকে অমর না বললেও দুর্মর বলতে আপত্তি নেই। কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিক আবার এখানে থামতে অনিচ্ছুক; এবং তাঁদের বিবেচনায় আবেগের শ্রীক্ষেত্রে জাতিবিচার নেই, একই আবেগ বহিরাশ্রয়ের তারতম্যে কদাচিৎ প্রণয়-নামে আত্মপরিচয় দেয়, কখনও বা ভয়ের আকার ধরে।

উক্ত অনুমানে যাঁদের আস্থা আছে, শেক্স্পীয়র-এর প্রবহমান প্রতিপত্তি, তাঁদের কাছে বিস্ময়কর ঠেকবে না : বরং তাঁরাই বুঝবেন যে মনুষ্যপ্রকৃতির আমূল পরিবর্তন পর্যন্ত শেক্স্পীয়র-এর মর্যাদাক্ষয় অসম্ভব; এবং তার পরেও হয়তো হৃদয়বীণার সব তার বদ্‌লাবে না, তিনি তখনও দু-একটাতে সনাতন ঝঙ্কার জাগাবেন। কিন্তু সব কটাতে নয়; কারণ আমার প্রগতিক বন্ধুদের কাছে শুনেছি যে তাঁরা নাকি ষড়্‌রিপুর মধ্যে অন্তত অসূয়া-জয় করেছেন। সুতরাং ওথেলো দেখে তাঁদের বোধহয় আর চিত্তশুদ্ধি ঘটে না; তাঁরা হাসতে হাসতে ট্র্যাজেডিখানাকে প্রহসনের পঙ্‌ক্তিতে ফেলেন। দুঃখের বিষয় আমি এখনও সাধনার অত ঊর্ধ্বে উঠিনি; এবং তাই আমার পক্ষে অমন দাবি অমার্জনীয়। তবে আমিও হেন্‌রি জেম্স্-এর অনবদ্য উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে প্রায়ই ভেবেছি যে কথকের "স্নবারি", তাঁর আভিজাতিক অহংকার, একটু কমলে, আমার উপভোগ নিশ্চয়ই অনেকখানি বাড়ত। জেম্স্ নিজে টুর্গেনিভ্-এর বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ এনেছিলেন; এবং কলাকৈবল্যের অন্যান্য পুরোধারা এ-প্রসঙ্গে কখনও একমত নন বটে, তথাচ আমার একাধিক পরিচিত "স্মোক্"-এর পাতা পালটাতে পালটাতে মেনেছেন যে এখানে লেখকের তথাকথিত নিরপেক্ষতা একটা ছদ্মবেশ-মাত্র, আসলে উদারনীতির প্রকাশ্য অবমাননা নিন্দনীয় জেনেই তিনি চাতুরীর দ্বারা তাঁর রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতা ঢাকতে চেয়েছিলেন।

বিপরীত পথে চলেন বলেই, বর্নার্ড্ শ-এর নামে লোকে ইতিমধ্যে যেমন নাক সিঁটকায়, তেমনই সুপ্রকট হিতৈষণা সত্ত্বেও ইব্সেন্ এখনও নাট্যকারদের শীর্ষস্থানীয়; এবং কিপ্লিং-এর নিঃসন্দেহ প্রতিভা যদিচ সাম্রাজ্যবাদীদেরই আবিষ্কার, তবু অলৌকিক গজদন্তমিনারে থেকেও ফ্লোবেয়র বুভার ও পেক্যুশে-র সংক্রাম এড়াতে পারেননি। অর্থাৎ লোকরঞ্জন ও লোকশিক্ষার সীমাসন্ধি অত্যন্ত অনিশ্চিত; এবং সাম্প্রতিক রুচিতে সংস্কারক যতই অনাচরণীয় ঠেকুক না কেন, স্বকীয়তা যেহেতু সকল রূপকারের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাই অল্প-বিস্তর বিজ্ঞাপন-ব্যতিরেকে কোনো উদীয়মান শিল্পী অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠা পাননি। বুঝি-বা এই জন্যে প্রথিতযশা কবিরা সমসাময়িকদের সমালোচনায় নেমে সাধারণত শোকাবহ অবিচারের প্রশ্রয় দেন। এক রকম সিদ্ধির সাধনায় জীবন কাটিয়ে তাঁরা সচরাচর ভুলে যান যে সৌন্দর্য যখন বহুরূপী, সত্য বহুভাষী ও কল্যাণ

বহুব্যবসায়ী, সেকালে মহাজনের পদানুসরণ কীর্তিকামীর প্রকৃষ্ট পন্থা নয়, গতানুগতিক রসধারার প্রণালী-পরিবর্তনেই সে সফলমনোরথ। কেননা আজকের প্রচারসাহিত্য কালকের রসসামগ্রী; এবং মানুষ অভ্যাসের দাস হলেও, অবিকার উত্তেজনা এমনই নিদ্রাজনক যে নিছক আত্মরক্ষার খাতিরে ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্‌-এর মতো রক্ষণশীলও জ্ঞানত পিতৃ-পিতামহের ছিদ্রান্বেষে বাধ্য।

কিন্তু বাঁচার জন্যেও হাসিমুখে শয্যাত্যাগ আমাদের ধাতে নেই; তাই ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্‌-আদির আবশ্যিক বিদ্রোহ প্রথম প্রথম ভয়াবহ লাগে; এবং তখন আর পোপ্‌-ড্রাইডেন্‌-কে ডেকেও কাব্যবিবেচকদের ঘুম আসে না, তাঁরা সারা রাত জেগে বজ্রকণ্ঠ প্রোপ্যাগ্যাণ্ডিস্ট্‌-দের যমালয় পাঠাবার মতলব আঁটেন। সে-সময় কেউ মনে রাখে না যে একদা ঠিক উল্‌টো অপরাধেই ড্রাইডেন্‌-এর ভাগ্যে অশেষ লাঞ্ছনা জুটেছিল; এবং সে-দিনে যে-এলিজাবেথি নাট্যকারেরা উক্ত নিগ্রহের উপলক্ষ জুগিয়েছিলেন, তাঁরাও সাহিত্যসেবার প্রারম্ভে স্বাধিকারপ্রমত্তদের সাধুবাদ কুড়াননি, ধ্রুবপদী আদর্শের মানহানি-ব্যাপদেশে রসিকদের সহানুভূতি হারিয়েছিলেন। অবশ্য আত্মপ্রচার আর প্রতিধ্বনিপরায়ণতা এক নয়; এবং স্বপ্রাধান্যের গুণ-গান যদিও বৈদগ্ধ্যসম্মত, তবু শ্রুতিধরের শিল্পসৃষ্টি নাকি অনাসৃষ্টির নামান্তর। তবে কলাবিদ্যার ইতিহাসে এ-ধারণার সমর্থন নেই; এবং বড়ো চিত্রকর যেমন রাজন্যবর্গের ছবি এঁকেও স্বাধীনতা খোয়ান না, তেমনই বড়ো কবি অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গে আটকে পড়েই মুক্তিমন্ত্রের সাড়া পান। আসলে এখানেই কলাকৌশলের সার্থকতা; এবং অনাত্মীয়কে অঙ্গীকার করার প্রকরণ কেবল ইস্কিলাস্‌, সফোক্লিস্‌, মলিয়ের, রাসীন্‌-প্রমুখ ধ্রুপদী লেখকদের একচেটে নয়, ডান্‌-এর মতো উৎকেন্দ্রিক কবিও তন্ময় ব্যঞ্জনাপদ্ধতিকে ততখানি আয়ত্তে এনেই কাব্য ও ধর্মযাজনার দোটানায় অবৈকল্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

কারণ পুরাতন প্রবচনের অনুসারে রচনারীতিই ব্যক্তিস্বরূপের অভিজ্ঞানপত্র; এবং মানুষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে জন্মায় বটে, কিন্তু সে-বৈশিষ্ট্য এতই ভৌতিক, এ-রকম গা-সওয়া যে তার অনুভব নিজের পক্ষেও প্রায় অসম্ভব, অন্যের তো কথাই নেই। আত্মবেদ জাগে অসম্পৃক্ত সংসারের সংঘর্ষে; এবং যখন ঘাত-প্রতিঘাত ফুরায়, তখন ব্যক্তিত্ব মজুদ থাকলেও, শুধুই আত্মবিস্মরণ ঘটে না, এমনকি অনুকূল আবেষ্টন অনুগতকে একেবারে ভুলে যায়। সুতরাং স্বনির্বাচিত বিষয় আত্মোপলব্ধির অন্তরায় বই সহায় নয়; এবং সেই জন্যে যে-কবি প্রতিনিয়ত অন্তঃপ্রেরণার মুখাপেক্ষী, শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিস্বরূপ হারিয়ে তিনি চারিত্র্যকেই আঁকড়ে ধরেন, আর ফলে তৎপ্রণীত সাহিত্যের স্বয়ংসিদ্ধি তো ঘোচেই, মনুষ্যোচিত স্বায়ত্তশাসনের দাবিও টিঁকে কিনা সন্দেহ। প্রকৃতপক্ষে কর্মক্ষম মানুষ অব্যাহত বিচারবুদ্ধির ধার ধারে না; সে যেহেতু জানে যে নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রায়োপবেশনের প্রকারভেদ, তাই সে হয় প্রবৃত্তির পরামর্শ শোনে, নয় অভিজ্ঞতার উপদেশ মানে; এবং আশ্চর্য এই যে এতেই যেমন তার স্বকীয়তা ফুটে ওঠে, তেমনই সে যদি স্বৈরতন্ত্রের দিকে ঝোঁকে, তবে প্রতিকূল প্রতিবেশ পদে পদে তার বাধ সাধে।

আমার বিশ্বাস প্রাগ্‌বিপ্লব রুশ সাহিত্যই এ-সত্যের একমাত্র সাক্ষ্য নয়, বিনিদ্র সরকারের অগণ্য বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও ভারতীয় লেখকসম্প্রদায়ের রাজনৈতিক পক্ষপাত আজ দেশবাসীর সুবিদিত; এবং সেই সমস্ত আইন-কানুনের আগে কলম চালিয়েও বঙ্কিম রাজদ্রোহের উদ্‌গাতা হননি, রাজভক্তিরই পরিচয় দিয়েছিলেন। অগত্যা আমরা না মেনে পারি না যে নিপট নিরাসক্তি নিতান্ত নিরর্থক; যে-সকল প্রত্যয় আমাদের ভাববিলাসের ভরণ-পোষণ ছাড়া অপর কোনো কাজে লাগে না, বোধহয় সেগুলোর সম্বন্ধেই বিবেক-বিবেচনা খাটে; এবং অন্যত্র যদি রাবণে না মারে, তাহলে আমরা নিশ্চয় রামের হাতে মরি। তবে নিজেকে অতটা পরজীবী ভাবলে, শুধু মানুষের আত্মসম্মানেই ঘা লাগে না, হয়তো লোকযাত্রাও থেমে যায়; এবং সেই জন্যে প্রাকৃতিক বিবর্তনে মনের মৌল অখণ্ডতা হারিয়ে আমরা এখন চৈতন্যকে মোহমুগ্ধ মমত্ববোধের আধার বানিয়েছি। কিন্তু তাতেও আপদ চোকেনি : অনিকাম প্রতিবন্ধকের বৃদ্ধি-বশত ব্যাপার সম্প্রতি এত দূর গড়িয়েছে যে আধুনিক জড়বিজ্ঞান আর কাকতালীয়-ন্যায় ঝেড়ে ফেলে সন্তুষ্ট নয়, পদার্থবিদেরা ইদানীং এই সত্যপ্রচারে শতমুখ যে নিউটনি আপেলও মাধ্যাকর্ষণের অবশ।

তথাচ সাধ আর সাধ্যের বিবাদ এ-যাবৎ ঘোচেনি : সভ্য সমাজে আমার মতো চিরবিফল ব্যক্তি এখনও সুলভ; এবং আমরা যেহেতু কার্যোদ্ধারেই অক্ষম, আত্মধিক্কৃত মুমূর্ষার উপাসক নই, তাই আমাদের পক্ষে কৃতী পুরুষের বিদূষণই অগতির একমাত্র গতি। অবশ্য প্রথম প্রথম যোগ্যের অবমাননায় আমার লজ্জা লাগত; এবং বয়সে আমি তখনও চল্লিশের উপান্তে পৌঁছাইনি বলে, ভবিষ্যতের স্তোকবাক্যে আপনাকে সহজে ভোলাতে পারতুম, নিজেকে সে-দিন বোঝাতে পারতুম যে মনোবিকলনেই য়িহুদি অদৃষ্টবাদের ছায়া পড়েনি, এমনকি মার্ক্‌স্‌-ও জন্মের গুণে অন্ধ নিয়তির অঞ্চলধারী। কিন্তু আমার অপদার্থতা এখন আর নিজের কাছেও চাপা নেই; এবং নষ্ট সুযোগের তেরিজ কষে আজ আমি মানতে বাধ্য যে আমার সাহিত্যজীবন আমারই সঙ্কল্পপ্রসূত বটে, তবু সেই অনুপকারী সঙ্কল্পের পিছনে কোনো চিন্ময় প্রেরণা ছিল না — নৈমিত্তিক সংসারের নিষ্ঠুর প্রতিযোগে দুর্বলের উচ্ছেদ অনিবার্য জেনেই আমি শিল্পশুদ্ধির আওতায় আত্মরক্ষা করেছিলুম। অতএব আজ মার্ক্‌স্‌-ও আমার বিবেচনায় যথেষ্ট জড়বাদী নন; আমি এখন এই সিদ্ধান্তে থেমে রয়েছি যে সংস্কারমুক্তি যদিচ বুদ্ধিজীবীর ইষ্টমন্ত্র, তবু মনীষা আর অনুকম্পা অভিন্নহৃদয় এবং সর্বগ্রাহ্য সমবেদনা অমানুষিক ও স্বতোবিরোধী।

সম্প্রতি আর আমার তিলার্ধ সন্দেহ নেই যে রূপকার সমাজভুক্ত জীব, তার ব্যবসায় সমাজসেবার অঙ্গীভূত, যে-শক্তি সামাজিক পরিস্থিতির নিয়ন্তা, তাই সাহিত্যের প্রাণবস্তু, এবং নিরালম্ব কল্পনা নির্গুণ ব্রহ্মের চেয়েও নঙর্থক। তাহলেও আমি প্রগতিক বা সাম্যবাদী নই, একেবারে বুর্জোয়া; এবং সেই জন্যে শ্রেণীবিরোধে আমি সকল কর্মপ্রবর্তনার উৎস খুঁজে পাই না, বুঝি যে মানুষী অভিজ্ঞতার উৎপত্তি আরও নিম্নে, স্থূলতার সর্বশেষ স্তরে। উপরন্তু গত পঞ্চ সহস্র বৎসরে এমন সিদ্ধান্তের অনুমোদন নেই

যে মনুষ্যজাতির মৌলিক স্বার্থ-সমূহ যুগে যুগে বদ্‌লায় : বরঞ্চ তার পরে এই আশাই স্বাভাবিক যে যখন বর্তমান সমাজের ডায়ালেক্‌টিক্‌ পরিবর্তন ঘটবে, তখনও মানুষ মানুষই থাকবে; আজ যা তার মর্মে আলোড়ন জাগায়, কালও তা তাকে মাতিয়ে তুলবে। তবে তার নির্বিকার চিত্তবৃত্তিতে সত্য, শিব, সুন্দরের নির্বিকল্প নির্দেশ নেই : বিশ্বামানবিকতার চিরন্তন আশ্রয় জাতিগত অচৈতন্যের অতলে; এবং সেখানে ডুব দিলে, কৈবল্যের সন্ধান মেলে না, পাশবিক প্রতীক, প্রাক্তন উৎকণ্ঠা, নিমজ্জিত অভিজ্ঞতার কঙ্কাল ইত্যাদির বিভীষিকা দেখে অসমসাহসিক কৌতূহলীরা সুদ্ধ চোখ বুজে দূরে পলায়, অন্যে পরে কা কথা।

□ *কুলায় ও কালপুরুষ*, ১৩৬৪

ভারতীয় মুসলমানের উপর হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব

রেজাউল করীম

ভারত বিভাগের পূর্বে মুসলিম সমাজের একটা বিরাট অংশ এই দাবি করিয়াছিলেন যে তাঁহারা একটা স্বতন্ত্র জাতি, ভারতের হিন্দু ও অপরাপর সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের কোনো জাতীয় সম্পর্ক নাই। শত শত বৎসর ধরিয়া একই দেশে পাশাপাশি একই সঙ্গে বাস করা সত্ত্বেও মুসলিম সম্প্রদায় এদেশের মাটির সহিত মিশিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সংস্কৃতি, আচার, বিচার, ভাষা, চালচলন, সবই স্বতন্ত্র ও পৃথক। সুতরাং স্বতন্ত্র জাতি হিসাবেই তাঁহারা এদেশে থাকিবেন, আর সেজন্যই একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তাঁহারা চাহিয়া বসিলেন। যাঁহারা এই ধরনের কথা বলিয়াছেন তাঁহারা ইতিহাসকে একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সত্য বটে, ধর্ম ও আচার বিচার ইত্যাদি ব্যাপারে এদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু পার্থক্য বিদ্যমান আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করা চলে না যে, কালের অমোঘ প্রভাবে ক্রমবিবর্তনের পথে ধীরে ধীরে কখনও জ্ঞাতসারে কখনও অজ্ঞাতসারে ভারতের মুসলমান সমাজের মধ্যে ভারতীয় তথা হিন্দু ভাবধারা প্রবেশ করিয়াছে। এই বিষয়টা লক্ষ করা হয় নাই বলিয়াই স্বতন্ত্র জাতিত্বের দাবি উঠিয়াছিল। একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতে দুই জাতিত্বের থিওরি অচল। ভারতীয় বহু মুসলমান ভাবিয়া থাকেন যে, তাঁহারা আরব, ইরান, তুরান, মিশরের মুসলমানের সঙ্গে সব বিষয়েই এক। কিন্তু তাঁহাদের এ ধারণা ভুল। এক তো নহেই, বরং বহুবিষয়েই বহু পার্থক্য বিদ্যমান আছে। ধর্মের দিক দিয়া সব মুসলমানই এক। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরিয়া বিভিন্ন দেশে বসবাস করার জন্যে আরব, ইরানের মুসলমান এবং এদেশের মুসলমান সমাজের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতির স্পর্শে থাকার ফলে মুসলমান সমাজ আরবের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিচ্ছেদ কেবলমাত্র ভৌগোলিক নহে — মনের বিচ্ছেদও হইয়াছে। পৃথিবীর যেখানেই সে গিয়াছে সেইখানকার জলবায়ুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে সংস্কৃতিগত সমন্বয়ও হইয়াছে। ভারতেও এই সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। পাঠান আমলে যে সমন্বয় আরম্ভ হইয়াছিল, দাদু, কবির, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ সাধকগণ যে সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন মোগল আমলে তাহা আরও পুষ্টিলাভ করে। পাঠান আমলে শাসকদের পক্ষ হইতে সমন্বয়ের জন্য বিশেষ কিছু করা হয় নাই, কিন্তু মোগল আমলে শাসকগণ ভারত-আরব সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের বহু প্রকার চেষ্টার ফলে হিন্দুদের মধ্যে যেমন ইসলামিক প্রভাব প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপ অনায়াসে মুসলমান সমাজের মধ্যেও হিন্দু প্রভাব প্রবেশ

করিয়াছে। আকবর, জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের রাজত্বকালে অব্যাহত ভাবে চলিয়াছিল সমন্বয় সাধনের ধারা। আওরঙ্গজেব অত্যধিক ইসলাম-প্রীতির জন্য সেই ধারাকে বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ো বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। যখন মুসলমান সমাজের পরতে পরতে ভারতীয় তথ্য হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব প্রবেশ করিয়া ভারতীয় মুসলমানকে আরবীয় মুসলমান হইতে বহুদিক দিয়া পৃথক করিয়াছে, তখন কোনো অনুদার শাসকের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি বা অনুশাসন সমন্বয়ের গতিরোধ করিতে পারে না। আওরঙ্গজেব তাহা পারেন নাই। বরং ফল হইয়াছে উলটা। রাজনীতির দিক দিয়া তিনি মোগল-গরিমার সমাধি রচনা করিলেন। কিন্তু যে "খাঁটি" ইসলাম রক্ষার জন্য তিনি এতসব অনুদার পন্থা অবলম্বন করিলেন, তাহা একটুও সফলতা লাভ করিল না। আওরঙ্গজেবের পরে তাঁহার ধর্মান্ধতার কীর্তিকলাপ দুঃস্বপ্নের মতো অল্পদিনের মধ্যে কোথায় বিলীন হইয়া গেল। আওরঙ্গজেবের পরেই মোগল শক্তির পতন আরম্ভ হইল। এই পতন-যুগে বহু অঞ্চলে বিদ্রোহ বিপ্লব দেখা দিল। আশ্চর্যের কথা এই যে, এইসব বিদ্রোহ বিপ্লব কোনোরূপ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে হয় নাই। তাই দেখা যায় যে, কোথাও কোথাও হিন্দু রাজা মুসলমানের সহযোগিতা লইয়া মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। আবার অনেক স্থলে মুসলমান শাসক হিন্দুর সাহায্যে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাইয়াছে। ভারতবর্ষ যদি ইউরোপীয় শক্তির দ্বারা অধিকৃত না হইত, তবে দেশের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা পূর্ণ সমন্বয় সাধিত হইয়া যাইত। একই দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় বসবাস করিলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। ইতিহাসে ইহার বহু প্রমাণ আছে। রোমকগণ যখন খ্রিস্টান ধর্ম অবলম্বন করিল, তখন কিছুদিন তাহাদের মধ্যে দুইটি আদর্শ সমানভাবে ক্রিয়া করিতে লাগিল। সত্য বটে, পৌত্তলিক রোমকগণ খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাবে বাহিরের দিক দিয়া অ-পৌত্তলিক হইয়া গেল; কিন্তু তাহারাও এমনভাবে খ্রিস্টানগণকে প্রভাবিত করিল যে, চিন্তায়, ভাবে, আচরণে তাহারা মূলত রোমকই হইয়া রহিল। এমনকী বহু আচার ও অনুষ্ঠান রোমান সভ্যতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে আজিও ইউরোপের বহু ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে রোমান প্রভাব পাওয়া যাইবে। প্রোটেস্টান্ট বিপ্লবের সময় পিউরিটান সম্প্রদায় সেই প্রাচীন হিব্রুযুগে প্রত্যাবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। শেক্স্‌পিয়ার, মিলটন, শেলি, কিটস, বায়রন প্রভৃতি কবিদের মধ্যে গ্রিক ও রোমান প্রভাব এত বেশি আছে যে মনে হয় তাঁহারা যেন প্রাচীন কালচারের মধ্যেই পুষ্ট হইয়াছেন। সেইজন্য একজন সমালোচক গর্ব করিয়া বলিয়াছেন, 'উই আর দি চিলড্রেন অব দি গ্রিকস্‌।' সেইরূপ ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে এত বেশি হিন্দু প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে যে, আমরাও বলিতে পারি, 'উই আর দি চিলড্রেন অব দি হিন্দু এরিয়ান্স।" আমরাও আর্য হিন্দুদেরই সন্তান।

আমার কথা শুনিয়া যাঁহারা চমকিয়া উঠিবেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ভারতের মুসলমানের কয়জন আরব, ইরান, তুর্কি, তাতার হইতে আসিয়াছেন? নির্দিষ্ট কতিপয় পরিবার, কিছু সংখ্যক সৈন্য সামন্তদের বংশধর, আর কতক কতক শাসক শ্রেণীর আত্মীয় স্বজনের অধস্তন পুরুষ ব্যতীত ভারতের কোটি কোটি মুসলমানের অধিকাংশই এদেশের

সন্তান। অতীতকালে তাঁহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেও হিন্দু ভাবধারা ও হিন্দু সংস্কৃতি একেবারেই বর্জন করিতে পারেন নাই। আজ ভারতীয় মুসলমানদের জীবনযাত্রার মধ্যে হিন্দু প্রভাবের বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে আরব, ইরান প্রভৃতি দেশের প্রভাবের অল্প চিহ্নই অবশিষ্ট আছে। সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরি, মহম্মদ তুঘলক প্রমুখ জাঁদরেল শাসকগণ, যাঁহারা কোন অতীতে মধ্য এশিয়া আফগানিস্তান প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এদেশের কোথাও তাঁহাদের চিহ্নমাত্র নাই, মুসলিম বিজেতাগণ সম্পূর্ণভাবে ভারতের জনগণের সঙ্গে একাঙ্গ হইয়া মিশিয়া গিয়াছেন। মুসলিম প্রভুত্বের যুগে যেসব জাতি, উপজাতি, বংশ প্রভৃতির নাম আমরা শুনিতে পাই, তাহাদের কথা মানুষের মন হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। এদেশের বহু লোক ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া মুসলিম সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন এবং এইভাবে মুসলমানগণের আরবি ও ইরানীয় রূপ ও সংস্কৃতিকেই প্রভাবিত করিয়াছেন। বিদেশের মুসলমানগণ এদেশের ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন, এদেশে বিবাহ করিয়াছেন, এদেশের জনগণের সহিত জীবন সংগ্রাম করিয়াছেন। একই প্রকার জীবিকার পথ গ্রহণ করিয়াছেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে ভারতের একটা সমজাতীয় ভাব গড়িয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আর তাঁহাদের পুরাতন ভূমিতে ফিরিয়া যান নাই।

ভারতের মুসলমানগণ যে সমাজ-ব্যবস্থা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দু সমাজব্যবস্থা হইতে বেশি পৃথক নহে। ভারতের বাহিরের মুসলমানের সহিত তুলনা করিলেই এই পার্থক্যটা ধরা পড়িবে। সাম্য ইসলামের একটি প্রধান আদর্শ। এই 'সাম্যবোধ' ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। এখানে রীতিমতো উচ্চবংশ ও নিম্নবংশের মধ্যে বেশ একটা সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই যে উচ্চবংশ ও নিম্নবংশের পার্থক্য তাহা অর্থনৈতিক ও বৃত্তিগত নহে। বংশ পরম্পরাগতভাবে অভিজাত শ্রেণী মুসলমান সমাজে সৃষ্ট হইয়াছে। মধ্যযুগে ধর্মান্তর আরম্ভ হইয়াছিল প্রবলভাবে। উচ্চবংশ আজ মুসলমান সমাজে একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এইরূপ হইবার প্রধান কারণ মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু প্রভাবের অনুপ্রবেশ। প্রত্যেক সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড ও প্রথার মধ্যে নারীসমাজ একটা বিশিষ্টস্থান অধিকার করে। আরব ইরানের মুসলিম নারীদের মধ্যে প্রচলিত বহু প্রথা ভারতের মুসলিম নারীসমাজের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। আবার ভারতের মুসলিম নারীসমাজের বহু প্রথা আরব, ইরানে অজ্ঞাত। এখানকার মুসলিম নারী সাধারণত ভারতীয় নারীদের প্রথাই গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ শাড়ি অলঙ্কার, সিন্দুর ব্যবহার, সামাজিক মেলামেশার ধরন এইসবই হিন্দুদের অনুরূপ। এখনও বহু অঞ্চলের সধবা নারী কপালে সিন্দুরের ফোঁটা দেয়। আর বিধবা হইলে সাদা শাড়ি পরিধান করে। নিকট প্রাচ্যের মুসলিম নারীদের প্রথা এরূপ নহে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যাপারেও ভারতের মুসলিম নারী এদেশের হিন্দুদের মতোই চলিয়া থাকে। তবে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। যেমন হিন্দুদের মতো মুসলিম সধবা নারীরা শাঁখা ব্যবহার করে না। মুসলিম বিধবাগণ হিন্দু বিধবাদের মতো খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে না। মুসলিম বিবাহের বহু বহিরানুষ্ঠান হিন্দুদেরই অনুরূপ। গায়ে হলুদ, তেল মাখা, মাথায় তেল দেওয়া, বিবাহ

বাসরের নিয়মপদ্ধতি, বরপণ প্রথা এইসব ব্যাপারে মুসলিম প্রথা হিন্দু প্রথার উপর ভিত্তি করিয়াই যেন রচিত। সামান্য একটু এদিক ওদিক হইতে পারে — কিন্তু মূলত অধিকাংশ প্রথাই এদেশের অনুকরণে গৃহীত হইয়াছে, বিবাহের নীতিগত পার্থক্য অবশ্য অক্ষুণ্ণ আছে। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে বিবাহ একটা Sacrament বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। মুসলিম বিবাহ হইতেছে একটা চুক্তি বিশেষ। কিন্তু ভারতের মুসলিম বিবাহের এই ধারণারও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছে। বিবাহটা অনেকটা Sacrament-এর মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহে অশ্রদ্ধা, মেয়েদের স্বামীনির্ভরতা এই সব বিষয়ে এদেশের মুসলমানগণ ভারতীয় প্রথাই গ্রহণ করিয়াছে। মোটের উপর হিন্দু মুসলমানেব বিবাহ-প্রথা অনেকটা একই প্রকার।

আপাত দৃষ্টিতে ইসলাম ধর্ম ও হিন্দুধর্ম স্বতন্ত্র আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রাক্-ইসলামিক যুগে আরবদের মধ্যে যে পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল, ভারতের হিন্দুদের পৌত্তলিকতা সে প্রকার নহে। প্রাচীন বেদ উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র একেশ্বরবাদের আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে। ইসলামের একেশ্বরবাদ হইতে উপনিষদের একেশ্বরবাদ পৃথক নহে। বোধহয় সেইজন্যই মুসলিমগণ হিন্দুধর্মের মূলনীতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আর সেইজন্য সমাজের উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে সহজেই হিন্দু প্রভাব প্রবেশ করিতে দিয়াছিল। কতকগুলি সামাজিক অনুষ্ঠান প্রায় একইরূপ। মহরমের সময় এমন কতকগুলি প্রথা ও ক্রিয়াকাণ্ড হইয়া থাকে, যাহা আরবের কোথাও প্রচলিত নাই। এগুলি ভারতবর্ষেই বিকশিত হইয়াছে। শবেবরাতের সহিত শিবরাত্রির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। নবান্ন উৎসব হিন্দু-মুসলমান সকলেই পালন করিয়া থাকে। মহরমের মাতমে যেমন বহু হিন্দু যোগদান করেন, সেইরূপ হোলি উৎসবে মুসলমানকেও রঙ খেলিতে দেখা যায়। মৃত্যুর পরের অনুষ্ঠানে মূল বিষয়ে পার্থক্য আছে। হিন্দুরা শব দাহ করে, আর মুসলমানরা সমাধিস্থ করে। কিন্তু তবুও লক্ষ করিলে দেখা যাইবে যে মৃত্যুর পরে যেসব অনুষ্ঠানাদি হয়, তাহা যেন কতকটা একইরূপ। মৃতের আত্মার সদ্গতির জন্য উভয় সম্প্রদায় প্রায় একইরূপ অনুষ্ঠান পালন করে। মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট দিনে দরিদ্র-ভোজন মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, বা তাহার আত্মার মুক্তির জন্য বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় সমাবেশে শাস্ত্রপাঠ এইসব অনুষ্ঠানে বিশেষ পার্থক্য নাই। গৃহে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে অনেক ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায় প্রায় একইরূপ অনুষ্ঠান পালন করে। সন্তানের নামকরণ উৎসব, ক্ষীর খাওয়ানো বা অন্নপ্রাশন, সন্তানের মস্তক মুণ্ডন এইসবও প্রায় একইরূপ।

পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি লক্ষ করিলেও দেখা যাইবে যে, সেখানেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কেমন একটা সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। প্রদেশে প্রদেশে পোশাক-পরিচ্ছদের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে স্বতন্ত্র পোশাক খুব কম ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাংলাদেশের সাধারণ পোশাক হইতেছে ধুতি। আর পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ পোশাক পাজামা। বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু-মুসলমান সেই প্রদেশে প্রচলিত পোশাকই ব্যবহার করে। পোশাক দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই কে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত। বাংলার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খায় না বলিয়া সাধারণত বাংলার হিন্দু-মুসলমান কেহই টুপি ব্যবহার করে না। আর

পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে টুপি ব্যবহার করে। ভারতের মুসলমানগণ কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই আরব ও ইরানের পোশাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া এদেশের পোশাকই গ্রহণ করিয়াছে। আরবি পাগড়ি, আমামা, জুব্বা, রিদা আর বড়ো একটা চলে না। মধ্য এশিয়ার মোগল পোশাকও অচল হইয়া গিয়াছে। খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীতেই পোশাকের পরিবর্তন লক্ষ করিয়া ঐতিহাসিক মসুদি বলিয়াছেন :

"The mode of life of both the Hindus and the Moslems was so similar that it was difficult to distinguish one from the other."

ইহার বহুদিন পরে একজন ফরাসি পর্যটক বলেন যে, "দাক্ষিণাত্যে যেসব মুসলমান উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহারা অবিকল হিন্দু প্রথায় পোশাক পরিত।" মুসলিম বাদশাহ ও নওযাবগণ দেওয়ালি, শিবরাত্রি, হোলি প্রভৃতি উৎসব পালন করিতেন। আর অনেকেই সেই সময় এদেশীয় পোশাক পরিধান করিতে লজ্জিত হইতেন না। আজিও দিল্লিব বহু উচ্চ বংশের মুসলমান আড়ম্বরের সহিত বসন্ত উৎসব পালন করিয়া থাকেন। সেই সময় তাঁহাদের পরিধানে থাকে বাসন্তী রঙের বস্ত্র। দিল্লির ফুলের মেলা 'নওরোজ' প্রভৃতি উৎসব ইতিহাস বিখ্যাত। ইহা হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ উৎসবে পরিণত হইয়াছিল। বাহাদুর শাহের সময় পর্যন্ত এই সব উৎসব আড়ম্বরের সহিত প্রতিপালিত হইত।

ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। একই ভাষা যখন সকল সম্প্রদায়ের ভাব প্রকাশের বাহন হয়, তখন আরও নানাপ্রকার বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই ভাষাবিভেদের মধ্যেও ঐক্য ও মিত্রতা স্থাপনে সহায়তা করে। ভারতের মুসলমানগণ আরবি ও ফারসি ভাষা এদেশে চালাইতে পারেন নাই। তাঁহারা এদেশের ভাষাকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্বে উর্দু ও হিন্দি ভাষা লইয়া বহু বিতর্ক হইয়াছে, অনেকের বিশ্বাস উর্দু মুসলমানের ভাষা আর হিন্দি হিন্দুদের ভাষা। কিন্তু এ ধারণা ভুল। উর্দু ও হিন্দি উভয় ভাষাই দেশের মাটিতেই জন্মিয়াছে — এদেশের ভাষা। প্রথম যুগের মুসলিম শাসকগণ তুর্কি ভাষায় কথা বলিতেন আর শাসনকার্য চলিত ফারসি ভাষার সাহায্যে। আজ তুর্কি অথবা ফারসির কোনোটাই সচল নহে। শাসকগণ এদেশের প্রচলিত ভাষার মধ্যে ফারসি ও আরবি শব্দ যোগ করিয়া তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার ফলে ভাষাটা আরও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। উর্দু ভারতের বাহিরে কোথাও চলে না। উর্দুর উৎস হইতেছে সংস্কৃত ও হিন্দি। ইহার বাক্যগঠন ও ব্যাকরণ-প্রণালী হিন্দিরই অনুরূপ। সাধারণত দিল্লি অঞ্চলে উর্দু ভাষা প্রচলিত ছিল। যখন প্রথমযুগে মুসলিমগণ দিল্লিতে বসবাস আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা এই ভাষাকেই গ্রহণ করেন। ইহাই কালক্রমে তাহাদের কথ্যভাষা হইয়া পড়িল। ইহার অনেক পরে কথ্যভাষা লিখিত ভাষাতে পরিণত হইল। বর্তমানে উর্দু ভাষাতে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার শব্দ আছে। ইহার মধ্যে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার শব্দ হিন্দিভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। বাকি তেরো হাজার শব্দের জন্য আরবি ফারসি ও তুর্কিভাষা দাবি করিতে পারে। তাই দেখা যায় যে, বহুযুগ ধরিয়া বহু হিন্দু-মুসলমান স্বচ্ছন্দভাবে উর্দুভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া করিয়া আসিয়াছে।

আবার একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, হিন্দি ভাষাও কেবল হিন্দুর নহে। বহু অঞ্চলের মুসলমান স্বচ্ছন্দে হিন্দি ভাষাকে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছে। শুধু হিন্দি নহে — এদেশের আরও অনেক প্রাদেশিক ভাষা মুসলমানের মাতৃভাষায় পরিণত হইয়াছে। আসামি, ওড়িয়া ভাষা, পাঞ্জাবি ভাষা, গুজরাটি ভাষা, বাংলা ভাষা — তামিল ও তেলেগু (তেলুগু) ভাষাও সেই সেই অঞ্চলের মুসলমানগণ গ্রহণ করিয়াছে এবং সাধ্যমতো সেগুলির পৃষ্ঠপোষকতাও করিয়াছে। মনীষী অলবেরুনি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগের সৈয়দ আলি বেলগ্রামি পর্যন্ত এই দীর্ঘযুগে বহু মুসলিম সুধী সংস্কৃত ভাষার প্রতি যথার্থ আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। কবি আমির খুসরু, মালিক মহম্মদ জয়সি, খান খানান, কুতুবান, মোল্লাদাউদ, রাইসখান, মহম্মদ ইয়াকুব, ইনশাল্লাহ খান, নাজির আহমদ এইসব কবি ও সাহিত্যিক হিন্দি ভাষার সেবা ও চর্চা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের লিখিত কাজের নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে। আরব ও পারস্যের মুসলিম লেখকগণের লিখিবার বিষয়বস্তু ও ভঙ্গিমার প্রতি লক্ষ করিলে দেখা যাইবে যে, এ দেশের মুসলিম লেখকগণের লিখিবার বিষয়বস্তু ও ধরন অনেকটা পৃথক। মুসলিম লেখকগণের হিন্দি, গুজরাটি, বাংলা রচনা এ দেশের হিন্দু লেখকগণের অনুরূপ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া আরব পারস্যের কোনো লেখক কবিতা লেখেন নাই। অথচ এ দেশের মুসলিম লেখকগণ এ সম্বন্ধে ভুরি ভুরি কবিতা লিখিয়াছেন।

ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা Common Culture সৃষ্টি করিবার প্রয়াস বরাবরই হইয়া আসিয়াছে। প্রথমে ভাষার মাধ্যমে এই চেষ্টা হইয়াছিল। আজ যেমন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন, মধ্যযুগেও সেইরূপ হিন্দু-মুসলমান লেখক ও কবিগণ সর্বত্র সমানভাবে আদৃত ও সম্মানিত হইতেন। এই সাধারণ সংস্কৃতি সৃষ্টি করিবার প্রয়াস কেবল ভাষার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প স্থাপত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়াছিল। গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, চিকিৎসা, দর্শন, নীতিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একটা Common Culture গড়িয়া উঠিয়াছিল। মধ্যযুগের স্থাপত্যের যেসব নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা সমন্বয়ের কথাই প্রমাণ করে। ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্বে মুসলিম শিল্পীগণ একটা বিশেষ ধরনের আর্ট আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভারতের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের সেই আর্টের ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। এ দেশের আর্টকে বিসর্জন দিতে পারেন নাই, অথবা অপরিবর্তিত অবস্থায় আরব ইরানের আর্টকেও চালাইয়া দিতে পারেন নাই। দুই দেশীয় আর্টের মধ্যে একটা সুন্দর সমন্বয় হইয়াছিল। দামেস্ক, জেরুজালেম, কার্ডোভা (স্পেন) প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিম স্থাপত্যের যে সব নিদর্শন আছে ভারতের মুসলিম স্থাপত্য তাহা হইতে পৃথক। ভারতের মুসলিম স্থাপত্যের মধ্যে আছে হিন্দু ও মুসলিম আদর্শের মধ্যে একটা সমন্বয়ের নিদর্শন।

চিত্রাঙ্কন ও সংগীতচর্চার মধ্যেও সমন্বয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতের প্রাচীন চিত্রকেই মোগল শিল্পীগণ আদর্শরূপে গ্রহণ করেন এবং তাহার উন্নতিসাধন করেন। মধ্য এশিয়া ও পারস্য হইতে বহু শিল্পী ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এদেশের উন্নত ধরনের শিল্পকার্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। সুতরাং অনায়াসে এ দেশের শিল্পের মডেল গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এবং হিন্দু শিল্পীদের সহযোগিতায় নূতন পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করিলেন। হিন্দু

শিল্পীগণও নবাগত শিল্পীকে অগ্রাহ্য করিলেন না। একটা বিশেষ চিত্রের প্রতি লক্ষ করিলে ইহার শিল্পী হিন্দু না মুসলমান তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। সংগীত চর্চার মধ্যেও সহজে সমন্বয় হইয়াছে। মুসলিম সংগীতজ্ঞগণ এদেশের নিকট নূতন জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। আবার তাঁহারাও নূতন নূতন সংগীতযন্ত্র ও নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়া এদেশের সংগীতের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজ হিন্দুসংগীত ও মুসলিম সংগীত বলিয়া সংগীত-ক্ষেত্রে কোনো রূপ সাম্প্রদায়িকতা নাই। সংগীতে পূর্ণ সমন্বয় হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, কাব্য সাহিত্য শিল্পস্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ে সমন্বয় হইতে পারে, কিন্তু ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে কি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনো সমন্বয় হইয়াছিল? ভারতের সাত শত বৎসরের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এরূপ সমন্বয়ও কিছু কিছু হইয়াছিল। একথা সত্য যে একদল উলেমা বরাবরই প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন যে, ইসলাম ও হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক। ইসলাম একেবারে পূর্ণধর্ম — অপর ধর্মের নিকট মুসলমানের শিখিবার কিছুই নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অলবেরুনির আদর্শ অনুসারে বহু মুসলমান পণ্ডিত হিন্দু ধর্মকে সঠিকভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, এই প্রাচীন ধর্মের মধ্যে সারবস্তু আছে তখন তাঁহারা হিন্দুধর্মের আদর্শ প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মনীষী অলবেরুনির কথা অনেকেই জানেন। তাঁহার পরেও তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া বহু পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। মধ্যযুগে মুসলিম সুধীগণ হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় বহু মূল্যবান পুস্তক ফারসি ও আরবিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের অনুবাদ হইতে বাগদাদের পণ্ডিতগণ নানাভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন। দর্শনের দিক দিয়া আরবগণের প্রধান 'অথরিটি' ছিল গ্রিকদর্শন। কিন্তু চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদের প্রধান অথরিটি ছিল ভারতবর্ষ।

ইসলামে প্রতিমা-পূজা নাই। আর হিন্দু সমাজে প্রতিমা-পূজা প্রচলিত। প্রথম প্রথম মুসলিম সুধীগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নাই। কিন্তু পরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, হিন্দুদের প্রতিমা-পূজা প্রাক্-ইসলামিক যুগের আরবদের প্রতিমা-পূজা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু, তখন তাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিতে লগিলেন। কয়েকজন মুসলিম পণ্ডিত হিন্দু সমাজের প্রচলিত প্রতিমা ব্যবহারের যে মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। মির্জা মাজহার জান জানান বলেন যে, "প্রতিমা পূজা সুফিদের জিকির পদ্ধতির অনুরূপ। আরবের পৌত্তলিকগণ যে প্রতিমা পূজা করিত, ইহা তাহা নহে। আরবগণ বিশ্বাস করিত যে, প্রতিমা নিজেই ঈশ্বর এবং তাহার অনন্ত শক্তি আছে। সুতরাং প্রতিমাই তাহাদের প্রভু। কিন্তু হিন্দুদের প্রতিমা তাহা নহে। তাহারা প্রতিমাকে ঐশ্বরিক শক্তির যন্ত্র বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রতিমাকেই ঈশ্বর বলে না।" মির্জা মাজহার এ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করেন এবং এই কথাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, হিন্দুদের পন্থায় আছে ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়। তাঁহার মতে সুফি মতবাদেও এই তিনের সমন্বয় সাধিত হয়।

ভারতবর্ষে বহুদিন বাস করার ফলে হিন্দুদের পূজা-পদ্ধতির বহু অনুষ্ঠান বেমালুম সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। জপমালা (তসবি), বিশেষ ধরনের সাধনার জন্য নিশ্বাস

নিয়ন্ত্রণ, নানাপ্রকার যৌগিক ক্রিয়া, যোগীর মতো ধ্যানাসন, মাছ মাংসে অশ্রদ্ধা এইসব আচার ও প্রক্রিয়া বহু মুসলিম পির মুর্শেদ ও সাধক অনুমোদন করিয়াছেন। ইহাদের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, বেদান্তের বহু বিশ্বাস ও আচার পদ্ধতিকে তাঁহারা ইসলাম জ্ঞানেই অবলম্বন করিয়াছেন। মূল ইসলামের মধ্যে এইসব বস্তুর কোনো প্রমাণ নাই। বস্তুত ভারতের সমস্ত সুফি মতবাদটাই বেদান্ত দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। এই ধরনের সমন্বয় অজ্ঞাতসারে হয় নাই। দেশ ও কালের অনুরূপ করিবার জন্য জ্ঞাতসারেই বেদান্ত দর্শনের বহু আদর্শ মুসলিম সমাজের মধ্যে সুফিগণ প্রবর্তন করিয়াছেন। সম্রাট আকবরের "দীনে এলাহি" এইরূপ একটা সজ্ঞান প্রচেষ্টা। রাজকুমার দারা শিকোহ হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সর্বসাধারণ লোকের সহজ পন্থায় ধর্মকে ঐক্য ও প্রেমের ভিত্তিতে গড়িবার চেষ্টা নানা সাধকের দ্বারা হইয়াছিল। তাঁহারা আচার অনুষ্ঠান অপেক্ষা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। কবির, নানক, দাদু, শ্রীচৈতন্য ও তুকারাম প্রভৃতি সাধকগণ যে নূতন ধর্মবোধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আচার অনুষ্ঠানের গণ্ডি ভেদ করিয়া সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। মহাত্মা দাদু সর্বজনীন ধর্মের বাণীই প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি উক্তি হইতে বুঝা যাইবে, তিনি ধর্ম বিষয়ে কীরূপ উদারনীতি প্রচার করিতেন —

পাখা পাখী সংসার সব
নির্পখ বিরলা কোই
সেই নির্পখ হোয়েগা জোকৈ
নাও নিরঞ্জন হোই।

অর্থাৎ জগৎ জুড়িয়া দলাদলি চলিতেছে। এমন লোক অল্পই আছেন যিনি দলাদলির ঊর্ধ্বে। যিনি জীবনে নিরঞ্জন লাভ করিয়াছেন তিনি দলাদলি মুক্ত হইতে পারেন।

দাদুর আর একটি উক্তি লক্ষণীয় —

যহ সব খেল খালিক হরি
তেরা তৈ হি এক করলিলা
দাদু জপতি জানি কর ঐসী তব
যহ প্রাণ পঁতীলা।

অর্থাৎ হে খালিক ও হরি, এসবই তোমার খেলা, তুমিই নিজেকে সর্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সকলকে ঐক্যবন্ধনে যুক্ত করিয়া লইয়াছ। দাদু বলেন যে, জগতে তোমার এই লীলা উপলব্ধি করিয়া প্রাণে বিশ্বাস লাভ হইয়াছে।

কবিরের উক্তি অনেকটা এইরূপ —

এক সমানা সকল মে
সকল সমানা তাহি
কবির সমানা বুঝি মে
জাঁহা দোসরা নাহি

অর্থাৎ — সেই এক সমানভাবে বহুরূপে প্রকট হইয়াছেন। আবার সকল সত্তা তাঁহাতে লয় পাইয়া সমান হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় নাই বলিয়া কবিরের কাছে এখন সবাই সমান।

খ্রিস্টিয় চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বরাবর ভারতে হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বাংলাদেশে এই সমন্বয়-প্রচেষ্টা কীরূপভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহার একটি উদাহরণ দিব। সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলিম লেখক সৈয়দ আকবর "জেবলমুলক শামারবখ" কাব্যে লিখিয়াছেন—

বিন এ করিয়া বন্দি ফিরিস্তার পদ
ছুন্নিকুলে ফিরিস্তা যে হিন্দুকুলে নারদ।
তক্ত সিংহাসন বন্দি আল্লার দরবার।
হিন্দুকুলে ঈশ্বর হেন জগতে প্রচার।
পএগম্বর সকলে বন্দি করিঅ ভকতি
হিন্দুকুলে দেবতা হেন হইলা প্রকৃতি।
হজরত আদম বন্দি জগতের বাপ
হিন্দুকুলে অনাদি নর প্রচার প্রতাপ।
মা হাওবা জগত বন্দম জগত জননী
হিন্দুকুলে কালী নাম প্রচার মোহিনী।
হজরত রসুলে বন্দি প্রভু নিজ সখা
হিন্দুকুলে অবতারি চৈতন্যরূপে দেখা।
খোআজ খিজির বন্দম জলেতে বসতি
হিন্দুকুলে বাসুদেব শূন্যে যে প্রকৃতি।
আছাববা সকলে বন্দি নবীর সভাএ
হিন্দুকুলে দোওয়াদশ গোপালে ধেয়াএ।
আউলিয়া আম্বিয়া বন্দি রব্বানি কোরান
হিন্দুকুলে মুনিভাব আজ এ পুরান।
পির মুর্শিদ বন্দম ওস্তাদ চরণ
হিন্দুকুলে গুরু যেন কর এ পূজন।

একদিকে সাধক ও সুফি শ্রেণীর মহান ব্যক্তিগণ, আর অপরদিকে কবি শিল্পীগণ সকলেই বিভিন্ন দিক দিয়া ধর্মকে উদার দৃষ্টিতে দেখিবার ও দেখাইবার এবং বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধর্মকে কেবল বহিরাচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখিতে শিখিলে ধর্ম সম্বন্ধে উদার ভাব জাগিতে পারে না। যে আদর্শ সে যুগের সাধক ও কবিদের প্রাণকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা হইতেছে ভক্তির আদর্শ। তাঁহারা ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধনের কথা ভাবিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য দেখা যায় যে, হিন্দু সাধকের নিকট মুসলমান দীক্ষা লইয়াছে। আবার অনেক হিন্দু মুসলমান সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা যখন নিজ নিজ সমাজের সহিত মেলামেশা করিয়াছে, তখন নিজেদের ধর্মবোধ দ্বারা সমাজকে অনেকটা প্রভাবিত করিয়াছে। ইহা সর্বজনবিদিত কথা যে, শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট কয়েকজন মুসলমান দীক্ষা লইয়াছিলেন। আবার কবিরের শিষ্যের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা কম ছিল না। আজমিরের হোসেনি পণ্ডিতগণের অস্তিত্ব আজিও বিদ্যমান আছে। লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের কতকগুলি

নীতির সহিত ইসলামের সাদৃশ্য আছে। রামানন্দ, দাদু, নানক, তুকারাম ইহারা হিন্দুমুসলমানের আধ্যাত্মিক গুরুর মর্যাদা পাইয়াছিলেন। এইসব সাধক একটা কথা দ্বিধাহীনভাবে প্রচার করিতেন যে, আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের বড়ো কথা নহে। তাঁহারা ন্যায়, সততা, ভক্তি, সাম্য ও সৎজীবনের উপর গুরুত্ব প্রদান করিতেন। মনের সৌন্দর্য সাধন ছিল তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। ধর্ম সম্বন্ধে এই উদার মতবাদের কারণেই উভয় সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধরিয়া পাশাপাশি শান্তির সহিত বসবাস করিতে পারিয়াছেন। অতীতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোথাও কোনো রূপ ঝগড়া বিবাদ হয় নাই, একথা বলি না। কিন্তু সে যুগে ব্রিটিশ যুগের মতো জঘন্য ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি জাগ্রত হয় নাই অথবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হয় নাই।

মধ্যযুগের মুসলমানদের আদি বাসভূমি যেখানেই থাকুক না কেন, তাঁহারা ভারতবর্ষকেই নিজেদের মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভারতের জীবন-ধারার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। ভারতের সুখ-দুঃখের সহিত নিজেদের জীবনকে জড়িত করিয়াছিলেন। ভারতের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ভাস্কর্য সবই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমনকী ধর্মের মধ্যে যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই। ফলে সমস্ত জীবন-দর্শনের মধ্যে একটা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া উঠিয়াছে। জীবনযাত্রার পদ্ধতিও অনেকটা একই রূপ হইয়াছে। বিগত কয়েক শতাব্দীর সংযোগ, সহযোগিতা ও মিলনের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাহিরের আকারগত চালচলনগত সমন্বয় সাধন হইয়াছে। দুই-চারটি পারিবারিক শব্দ ব্যতীত কথ্যভাষার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে। দুইজনের পরস্পরের কথাবার্তার মধ্যে ধর্মের পার্থক্য কেহ সহজে ধরিতে পারিবে না যাহাকে আমরা বলি কুসংস্কার (supersition) তাহা সাধারণত আদিম সংস্কারের ক্রমবিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত বহু কুসংস্কার একই রূপ। এইসব কুসংস্কার হইতে বুঝা যাইবে যে কত গভীরভাবে সমন্বয়ের কাজ সফলতা অর্জন করিয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "দিবে আর নিবে, ... যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে" ইহাই হইতেছে ভারতের শাশ্বত নীতি। বহুর মধ্যে একের বিকাশ, আবার একের মধ্যে বহুর প্রকাশ, এই নীতি কেবল ভারতবর্ষে সম্ভব হইয়াছে। ভারতের হিন্দু নবাগত মুসলমানকে ফিরাইয়া দেয় নাই। তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। সেজন্য হিন্দুকে বহু জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে। তবুও সে ভারতের শাশ্বত নীতি বিসর্জন দেয় নাই। আবার মুসলমান যখন এদেশে আসিয়াছে, তখন সেও তাহার বহুকিছু খাইবার গিরিপথের অপর পার্শ্বে রাখিয়া দিয়া ভারতের বহুকিছুকে বেমালুম গ্রহণ করিয়াছে। আজ যদি সে বলে, তাহারা স্বতন্ত্র জাতি, তবে সাতশত বৎসরের সমগ্র ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হইবে। ভারতবর্ষ মুসলমানকে অঙ্গীভূত করিয়াছে আর মুসলমানও ভারতকে তাহার সর্বস্ব দান করিয়াছে। এই নেওয়া দেওয়ার মধ্যে ইতিহাসের জয়যাত্রা অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। ভবিষ্যতেও চলিতে থাকিবে। রাজনৈতিক কারণে ভারত বিভক্ত হইলেও এ সমন্বয়ের ধারা কোথাও থামিবে না।

❑ *সংস্কৃতি সমন্বয় : কিছু ভাবনা*, ১৯৮৩

দ্রৌপদীর বিচার

গোপাল হালদার

একবার দক্ষিণ ভারতে যাবার পথে ট্রেনে অধ্যাপক সুনীতিকুমারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল — পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কি? তিনিই জিজ্ঞাসা করেছিলেন প্রথম। আমার মাথায় তখনও ইংরেজিতে এম-এ পড়ার ঘূর্ণি হাওয়া বেশ কিছুটা বইছে; বললাম — 'শেক্‌স্‌পীয়ার'। জানি না ভিক্‌তর্‌ য়ুগোর নামে যে উত্তরটা প্রচলিত (সম্ভবত সত্য উত্তরই) তাও তখন বা তৎপূর্বে মস্তিষ্কের কোষে কোনো স্পষ্ট রেখাপাত করে রেখেছিল কিনা।

স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে কী করে দিন কাটাবেন, বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে য়ুগো নাকি উত্তর করেছিলেন — 'অসীমের সাহচর্যে' — আর সে 'অসীম' তাঁর মতে "সমুদ্র আর শেক্‌স্‌পীয়ার।"

১৯২৯-৩০-এর পরে অনেক অনেক বৎসর তো হয়ে গিয়েছে। ভিক্‌তর য়ুগোর অবস্থা যা হোক, আমিও তো, এখন বার্ধক্যের দ্বীপান্তরে। কিছু দৃষ্টিশক্তি আছে। য়ুগোর কথাটার মর্মরক্ষা করে আজ বলতাম — "সমুদ্র — শেক্‌স্‌পীয়র — হিমালয় নিয়ে দিন কাটাতে চাই।" কিন্তু সত্য তা বলতে পারতাম কি? সেদিনের ভ্রমণপথে অধ্যাপক আমার উত্তর শুনে এক মুহূর্ত পরে বললেন, — "শেক্‌স্‌পীয়র — হ্যাঁ। তবে সে ত' একখানা গ্রন্থ নয়, গ্রন্থাবলী। একখানা বই নিতে হলে কি নিতেন?" পরে তাঁর — নিজের মনের কথা বললেন, 'মহাভারত'। আমার তো তখনও সম্পূর্ণ মহাভারত পড়া বিশেষ হয় নি, — তখনও কেন, আজও সম্পূর্ণ পড়া হয় নি — বাংলা অনুবাদ ছাড়া।

কিন্তু এখন মনে হয়, মহাভারত জীবনের চিত্রশালা — সেদিনের কালধর্মের বৈশিষ্ট্য অনুমান করে নিলে, বলা যায় — যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে — এককথায়, চিরদিনের মানব-চিত্রশালা।

মাত্র একখানা বই যদি নির্বাসনে আমাকে পড়তে সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে মহাভারতই সঙ্গে নেব — তবে ঝুলিতে বোধ হয় এই সঙ্গে চারশত জন্ম দিবসে প্রকাশিত শেষ সংস্করণ একখণ্ড শেক্‌স্‌পীয়ারও পুরে নিতাম।

শেক্‌স্‌পীয়ার কিন্তু এখন আমার বিশেষ গোলমাল হয় না। দেশকালের হাওয়া মনে রাখলে আমার অন্তত ভাবতে অসুবিধা হয় না — "All the world is a stage — the myriad-minded Shakespears — and the million tongued too" —কী বলতেন? কার সাধ্য তা বোঝে। একবার যেন সে মুখে শুনি — "Ah! what a wonderful creature is man," আবার একালের এই বিশেষ শতাব্দীর দিকে তাকিয়ে

"Time's out of joint, time's out of joint." O cursed time! না তারপরে শুনতাম আবার 'Oh brave new world' —চন্দ্রসূর্য ভরা আকাশজয়ী। Myriad minded লোকটা আবার million tongued, এই প্রাণলীলার রঙ্গশালায় শেষ পর্যন্ত কী বুঝেছিলেন কে জানে? যাদৃশী ভাবনা যস্য তাদৃশী ধারণা তার শেক্স্পীয়ারের মতামত সম্বন্ধে।

কেউ বলেন ফ্যাসিস্ত-গুরু (কোরিওলেনাস), কেউ বলেন রেনেসাঁসীয় দৃষ্টির মানব-বন্ধু, কেউ বা ঝানু ব্যবসায়ী (কারবারি)। আধ পয়সা পকেটে না নিয়ে শহরে পালিয়ে এসে হলেন গ্লোব থিয়েটারের মালিক, আর কিছু গুছিয়ে নিয়ে গিয়ে বসলেন বাড়ি। তিনি আর ওসব হাতাতে চান নি — চেয়েছেন স্বস্তি, সচ্ছল জীবনের সুস্থ শান্তি। একে যে যা হয় বলুন, — আমিও শুনি এবং খুঁজি। তবে ওই অত যার মনে ফোটে আর অত যার মুখে ফোটে কথা তাঁর অভিজ্ঞতা ও উপমায় রঙ্গশালায় সবাই অভিনেতা। নিজের পার্ট অভিনয় করছি। অভিনয় শেষ, রঙ্গক্ষেত্র অন্ধকার।

পার যদি রেস্ত পকেটে নিয়ে হও হাওয়া বুঝে কংগ্রেসই কিম্বা সি.পি.আই.এম। দূর, ওসব পলিটিক্স-এর কাছেও যেও না। তার চেয়ে সম্মান বাঁচিয়ে 'মুখিয়া' হয়ে থাকাই ভালো। হয়তো ভালো। কিন্তু আমি ইদানীং মহাভারতেরই পাতা ওলটাই। হাজার হাজার কথা বলছেন, যাকে বলে Situation (বিশেষ পরিস্থিতি) বুঝে।

প্রশ্নটা তবে কি? প্রশ্নটা উঠে আসছে দুটি নারীর নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা থেকে। দুজন পদস্থ শিক্ষিতা সঙ্গীর হালকা আলাপের সে রিপোর্ট শোনাচ্ছি।

তাঁদের নাতি-অপরিচিতা একটি শিক্ষিতা মহিলা ডিভোর্স নিয়েছেন কিছুদিন আগে, — দুটি সন্তানের মা, সম্প্রতি আবার একটি নূতন করে বিবাহ করেছেন। দুই সখী (একটু আলগা মুখে অবশ্য) নিজেদের মধ্যে তা নিয়ে বলছেন, "মাগো মা! মাগির সাহস দ্যাখ্। বলি একবার বিয়েতেই আমরা হিমসিম খাচ্ছি। ছেলেগুলো না থাকলে বলতাম, ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি। আর — দ্যাখ্ ওর কাণ্ড! তোর একটাতে হল না, নতুন একটাতে যে হবে, কে বলে? না হলে? তারপর? তৃতীয় একটা? ন্যাড়া, করাব যাবি বেলতলা?"

দ্বিতীয়া যোগ করলেন, "যতক্ষণ গাছে বেল আছে — কোঁচড়ে যত ধরবে।"

দুজনে হাসতে হাসতে বললেন "কোচড় ভরে নিবি? পারবি? তুই কি দ্রৌপদী?"

হাসির মধ্যেই একজনা বলল, "তা হলেও ভাই, দ্রৌপদীরও পাঁচবার বেলতলায় যেতে সাহস হত কি? একবারই ছাঁদনাতলায় গিয়েছেন, একসঙ্গে পাঁচটি স্বামীকে আঁচলে বেঁধে নিয়েছেন।"

"তা হল। কিন্তু একটাকেই সামলাতে প্রাণ যায়। পাঁচটাকে দ্রৌপদী সামলায় কি করে?"

সখীদ্বয়ের রহস্যালাপটা অন্য দিকে চলল — একালের কোন কোন চিত্রাভিনেত্রীর কথা 'না তারাও পারে না একসঙ্গে দ্রৌপদীর মতো। ছেড়ে ছেড়ে তারা নতুন ধরে। আবার ছেড়ে দিয়ে তেড়েও ধরে — পুরোনোটাকে নতুন করে — তাতে বুঝি সোয়াদ বাড়ে।'

একটু হেসে একজন বলল — "তা এরাই বা নতুন কি করলে? নিত্য নতুন সোয়াদ খোঁজা মানুষ তো সেকালেও কম ছিল না — আর তাদের গুণ থাকলে রাজসভায়ও মান

কম ছিল না। উর্বশী, মেনকা না থাকলে দেবতাদের স্বর্গ মরুভূমি হয়ে যেত — শুনেছি বেহেস্ত্-এও ব্যবস্থা ভালো। সেখানে বিবিরা কী করে? তালাকেও তো দেনমোহরের টাকাও মিলবে না — ?"

"দ্যাখো, দ্রৌপদীও বুঝতেন — পাঁচ জনে পাঁচ সোয়াদ।" আর শোনা দরকার হল না। দ্রৌপদীর সমস্যা বুঝতে পারলাম।

মহাভারতকার দ্রৌপদীকে নিস্তার দেন নি। পাঁচ পতিকে সমান ভালোবাসতে হবে। তা না করে দ্রৌপদী ছিলেন অর্জুনের প্রতি বেশি আসক্তা। ফল হল, ধর্মের পথে প্রথমেই যম তাঁকে ধবলেন। ধরে নিতে পারি, দ্রৌপদী তখন অন্ত প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে। কিন্তু স্বর্গের পথে অযোগ্য বিবেচিতা হলেন কেন? অপরাধ যে আরও ভয়ঙ্কর, মহাভারতকার বিচার করেছেন — দ্রৌপদীর মহাপাপ, মহা অপরাধ, পঞ্চপতিকে পতিত্বে গ্রহণ করেও তিনি অর্জুনকে অন্য চারজনের থেকে বেশি ভালোবাসতেন। আমি কিন্তু বুঝতেই পারি নি, এইটা তাঁর অপরাধ, না, দ্রৌপদীর হৃদয় সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত গুণ। স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্যভেদ করে অর্জুনই তাঁকে লাভ করেন।

আর নিশ্চয়ই বীরকন্যা পাঞ্চালী ভ্রাতৃপ্রতিশ্রুতি-অনুযায়ী ও নিজের স্বয়ংবর স্বীকৃতি-অনুযায়ী লক্ষ্যভেদ সিদ্ধকাম অর্জুনকে তখনই পতিত্বে বরণ করতে বাধ্য? অবশ্য সে মুহূর্তে অগ্নিসাক্ষ্য বিবাহ হয় নি — সম্ভবও ছিল না। সদ্যপরাজিত ক্ষত্রিয় বীররা ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকদের (ছদ্মবেশী) থেকে যুবতী মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিতে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করেছেন। সুস্থ-সাহসিকা হিসাবে ব্রীড়ানুরাগিনীও বীরত্বের সাফল্যে অন্তরে-অন্তরে তৎক্ষণাৎ অর্জুনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁকেই প্রথম পতি হিসেবে মনে মনে গ্রহণও করেছিলেন। অন্য পাণ্ডুরাও বীর্যশুল্কে দ্রৌপদীকে কেউ লাভ করেন নি, — তাঁরা লাভ করেছেন 'ফাউ' হিসাবে। মায়ের মুখের কথার জোরে।

অর্জুনের প্রতি এই দ্রৌপদীর অধিকতর আসক্তি হবে না, হবে কার প্রতি? যুধিষ্ঠিরের প্রতি, না সহদেবের প্রতি? মেনে নিলাম, একই সময়ে একই অনুষ্ঠানে পঞ্চপাণ্ডবকে দ্রৌপদী বিবাহ করেছিলেন। তা বলে কি একই সমান মাত্রায় প্রতি পাণ্ডবকে ভালোবাসা সম্ভব? না স্বাভাবিক? এ-তো হাস্যকর কথা। প্রত্যেকে তাঁরা স্বতন্ত্র। মানুষও বিভিন্ন, একত্র শুধু কুল পরিচয়ে। দ্রৌপদী স্ত্রী বলে এসব কি চোখে দেখেন না? তবু জীবনের শেষ বিচারক্ষণে এই অর্জুনের প্রতি অধিকতর আকর্ষণের জন্য দ্রৌপদী স্বর্গারোহণ চেষ্টায় সর্বাধিক অযোগ্য — স্বার্থার্থী স্বামীদের (অর্জুনও তার মধ্যে গণ্য) দ্বারা প্রথম বিবর্জিতা।

যমদূত দ্রৌপদীকে যেখানে চায় টেনে নিক, আমরা একালের মানুষের দূত — এই বলব, দ্রৌপদী, তুমিই সত্যবতী, পবিত্রতা, সত্যব্রতী। দেহ দিয়ে সত্য পালন করেছ পাতিব্রত্যে, সেই সঙ্গে মন দিয়ে সত্য রক্ষা করেছ।

একালের মানুষের দূত না হই, একালের মানুষ নিশ্চয় আমি। একালের বুদ্ধিবিবেচনা দিয়ে একবার মহাভারত বন্ধ করে ভাবি না কেন — কী হয়ে থাকবে কাণ্ডটা? মনে মনে খুঁজি — পাই না পাই ঠিক উত্তর।

১. একটি অসামান্য ব্যক্তিত্বময়ী নারী সকলের সম্মুখে প্রতিশ্রুতিমতো বীর্যশুল্কে একজন অসাধারণ বীরের প্রাপ্যা হলেন, নানা বাধা-বিপদের মধ্য দিয়ে সেই বরণীয় যোদ্ধা ও

তাঁর ভ্রাতাদের অনুগামী হয়ে চললেন — পতি গৃহবাসে। এ-তো স্বাভাবিক, অর্জুনই হবেন তাঁর পতি, তাঁর প্রেমারাধ্য।

২. অবস্থাটা বদলে গেল — ভাবী শ্বশ্রূমাতা কুন্তীর একটি উক্তিতে — কথাটার সম্পূর্ণ অর্থবিপর্যয় ঘটল, কিছুই না দেখে না জেনে নাকি যা তিনি বলেছেন কিছুমাত্র তা বিবেচনা না করে, যা বক্তব্য নয়, তা অলঙ্ঘনীয় আদেশ হল। এ আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য।

৩. তবু গ্রহণযোগ্য হল কেন এই বিকৃতার্থ কথা? নিজের মনেই যুক্তি খুঁজি;

ক) শ্রীকৃষ্ণ থেকে আরম্ভ করে জ্ঞানী মানুষরা বিবাহে বাধা দিলেন না কেন? দ্রৌপদীই বা আপত্তি করলেন না কেন?

খ) বহু পতিগ্রহণ আর্যসমাজে তখন অপ্রচলিত হলেও একেবারে কি অজ্ঞাত বা অশ্রুত ছিল?

গ) পাণ্ডুরা কতটা সত্যই আর্যসমাজস্থ ছিল তা সন্দেহজনক। হয়তো হিমাদ্রি অঞ্চলের, হিমাচল প্রদেশের জাতি তাঁরা ও অন্তত তদনুরূপ পলিয়েন্ড্রি এখনও তাঁদের সে অঞ্চলে গ্রাহ্য, জানি।

ঘ) অনেক আদিমসমাজে (বিশেষ রাজকুলে?) কুলসংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অগ্রগণ্য পত্নীকে হতে হত প্রধান কুলবধূ। ভ্রাতাদের অর্ধপত্নী — প্রধানা এ-সম্মান দ্রৌপদীর প্রাপ্য ছিল। তিনি এ কুলপ্রথাও অস্বীকার করা জানতেন সম্ভব নয় স্বয়ংবরে পতিত্বে অর্জুনকে গ্রহণ করবার পর।

ঙ) ভারতীয় আর্যসমাজে কনিষ্ঠ ভ্রাতারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীর দ্বিতীয় বর, স্বামীর অবর্তমানে (?) ভ্রাতাদের বরণীয়া। বলা বাহুল্য, এ প্রথা অনেক সমাজে আছে।

কিন্তু যুক্তি দিয়েই কিছুতেই স্বর্গারোহণ পর্বের বিচার মানা যায় না — অর্জুনকে ভালোবাসা দ্রৌপদীর অপরাধ, দ্রৌপদী অতিপাপিষ্ঠা, চারটি পাণ্ডুপুত্রের থেকে মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনকে তিনি বেশি ভালোবাসতেন। কাকে কী মাত্রায় দ্রৌপদী ভালোবাসতেন তা মহাভারতকার জানতেন কী করে? ডকুমেন্টারি প্রমাণ কোথায়? মহাভারতে তাও তো একথা আগে শুনি নি। দ্রৌপদীর পাস্ট স্বভাবচরিত্র কেমন ছিল, মতিগতি, তাও। ফ্যাক্ট যা পাই তাতে তো এ কথাটা স্পষ্ট।

১. — ব্যক্তিত্বময়ী উজ্জ্বলা যাজ্ঞসেনী এবং যুবতী যখন, তখনি স্বয়ংবর সভায় হলেন প্রথম প্রকাশিতা। এই এক নং ফ্যাক্ট। সর্বস্বীকৃত।

২. সবাই তাঁর হাতের বরমাল্য পাবার জন্য লাফাচ্ছে। স্বয়ং কর্ণ নামলেন, পরীক্ষাক্ষেত্রে দুর্যোধনের বেনামদার হয়ে। এ হয় নাকি? সবার দাবি বিবাহ। দর্পিতা দ্রুপদকন্যা প্রকাশ্যে জাতের খুঁত ধরে তাঁকে অপমান করে তাড়ালেন। ওভাবে তাড়ানো ছাড়া হয়তো দ্রৌপদীর উপায় ছিল না। কিন্তু পরক্ষণেই বোধ হয় দ্রৌপদী কর্ণের বীর সমুজ্জ্বল দর্শনে ও আচরণে আকৃষ্ট হয়ে নিজের অন্যায় উক্তি এবং সমস্ত ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। শোধও কর্ণ নিয়েছিলেন পরের কুরুরাজসভায় — কুৎসিত ভাষায় ও আচরণে। তাও অন্যায় গর্হিততর অন্যায়।

অর্জুনই একমাত্র ধনুর্ধারণ করেছিলেন একথা সর্বজনস্বীকৃত এবং এও নিশ্চয় গ্রাহ্য দ্রৌপদী আপন সত্য অনুযায়ী অর্জুনকে মাল্যচন্দনাদি দিয়ে বররূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। অবশ্য, বলা যেতে পারে স্বীকারই যথেষ্ট নয়। এ শুধু বাগ্‌দানের মতো ব্যাপার। বৈদিক প্রথামতো বিবাহ কুশণ্ডিকা না হতে সিদ্ধ নয়। হ্যাঁ, মানলাম আনুষ্ঠানিক বিবাহ তখন সম্পন্ন নয়। তবে নিশ্চয় বাগ্‌দানের থেকেও কিছু বেশি। লক্ষণীয়, যথারীতি বিবাহের সুযোগ ও সময় তখন ঘটল না। মিলনও ঘটল না। না হলে তাতে তখন বিবাহ পূর্ণ হত।

আসল কথা, অর্জুনের বীর্যশুল্কে লব্ধ (ভাবী) পত্নীরূপে যখন দ্রৌপদী পতিগৃহে চললেন, তখন পর্যন্ত অন্য কারও সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথা ওঠে না। দ্রৌপদীর পক্ষে অর্জুনকে পতিরূপে মনে মনে বরণ করা আর বীর্যশুল্ক-যুবতী হিসাবে মনে মনে অর্জুনের প্রতি আসক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। ঐ আসক্তিকে অন্যায় বলবার নয়। বরং বলা যায় বিবাহের পরেই অন্যদের প্রতি পতিব্রতানুযায়ী দ্রৌপদীর যে আসক্তি, তাই ছিল অসাধ্যসাধন।

আরও এক দফা ফ্যাক্ট এ দফায় বিশ্লেষণ করা গেল। এবার দ্বিতীয় দফার বিবাহঘটিত ব্যাপার। কুন্তীর একটি সাধারণ কথা, — চোখে না দেখে, কিছুই না জেনে বলা — ভিক্ষালব্ধ বস্তু সবাই সমান ভাগ করে খাও। ('সবাই'-এর মধ্যে কি কুন্তী নিজেও পড়েন না?) এ কথাটার যে মিথ্যা অর্থ করা হয়েছে তা হাস্যকর — পরম মূঢ়ও এমন অর্থ করবে না। অবশ্য আমাদের ধারণা এই যে, কুন্তীর এই কথাটা গুরুত্ব পাচ্ছিল অন্যবিধ কারণে।

ক) তা প্রমাণ করছে, বহুপতি গ্রহণ প্রথা তখনও একেবারে বিস্মৃত নয় এবং অপ্রচলিত হলেও মেনে নেওয়া চলত।

খ) হয়তো পাণ্ডুবংশে চলিতও ছিল হিমাচল প্রদেশস্থ কোনো কোনো গোষ্ঠীর মতো পলিয়েন্ড্রি যাদের মধ্যে এখনও একেবারে উঠে যায় নি — অবশ্য এতটা অনুমান। তৎসঙ্গে একেকটি বৈজ্ঞানিক অনুমানও যুক্তিসঙ্গত।

গ) বিবাহ সেকালে অবশ্য ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে হত না। গোত্রান্তরিত কন্যা প্রথমদিকে নতুন গোত্রের সকলেরই বধূস্বরূপা — বিশেষ পরিবারের সকলেই বর পর্যায়ের। বধূ শুধু সেই পরিবার জ্যেষ্ঠদের পত্নীবৎ গ্রাহ্যা। পরে দেবরদের সঙ্গেই এরূপ সম্পর্কের প্রচলন। নৃবিজ্ঞানের পাতা থেকে দৃষ্টান্ত নিয়েও এ অনুমানগুলির গুরুত্ব স্বীকার্য। এই সঙ্গে প্রায় প্রমাণবৎ অনুমান বৈষয়িক আচরণে ভ্রাতাদের মধ্যে পারিবারিক ঐক্য। বিশেষত রাজকুলের ভ্রাতাদের মধ্যে রাজনৈতিক (রাজসিংহাসন) স্বার্থে ঐক্য রক্ষার্থে অগ্রগণ্য কুলবধূকে যেমন প্রধান কুলবধূর মর্যাদা দেয়া আবশ্যিক তেমনি সকল ভ্রাতাদের পত্নী হিসাবে প্রতিষ্ঠা দানও প্রয়োজন। এসব বৈষয়িক ও পারিবারিক গোষ্ঠীধারার বিশেষ নিয়মাদির জন্যই পলিয়েন্ড্রি অচল হয় নি।

সে কারণেই কুন্তীর কথাটাও পরিবারে সর্বগ্রাহ্য হল। এমন কী তৎকালীন আর্যসমাজেও তার বিরুদ্ধে কিছুমাত্র আপত্তি হয় নি। পঞ্চপতিকে একই ক্ষণে একটি মন্ত্রপাঠে বিবাহজাত সমপতিত্বের অধিকারে দ্রৌপদীবরণ সমাজ-বিহিত হয়। অর্জুনের প্রতি পূর্ব আসক্তি স্বাভাবিক হলে বিবাহের নিয়মে তাকে অন্যায় বলবার কোনো হেতু নেই। বরং তা

স্বাভাবিক, এমন কী, মানবধর্ম সম্মত। সারা জীবন তা মেনে নিয়ে মরার পর তাঁকে অপরাধী করা মিথ্যাচার।

তৃতীয় দফার কথা :

ক) লক্ষ্যভেদ করেছেন অর্জুন। তিনিই পতি হিসাবে সর্বাগ্রগ্রাহ্য। অন্যরাও তো অর্জুনের বীরত্ব ও কুলপ্রথার জোরে (যদি তেমন কোনো প্রথা থাকে) দ্রৌপদীর স্বামী হয়ে বসল — মৎফরাক্কা স্বামী। এ ফ্যাক্‌ট মোক্ষম ফ্যাক্‌ট। — সকলকে সমান অনুরাগে গ্রহণ করতে হবে — এ আদর্শ হতে পারে কিন্তু ultra vires.

খ) বিবাহের দ্বারা পতিত্ব লাভ করলেই সব পাণ্ডুপুত্র সমান হয়ে যায় কি? কেউ জ্যেষ্ঠ কেউ অনুজ আর থাকে না? হাতের পাঁচটি আঙুল সমান হয় না। দেহে পঞ্চভ্রাতা সমান ছিল না, এতো মহাভারতে পূর্বাপর স্বীকৃত ফ্যাক্‌ট। ঢালাই করে দেহে-মনে সমগুণান্বিত করার যন্ত্র তখনও ছিল না, এখনও নেই। কোনো সাম্যবাদও তা করতে পারে না। আর প্রত্যেকেরই যে বিশেষত্ব ছিল, প্রত্যেকেই দেহে-মনে বিভিন্ন ছিলেন, নিশ্চই দ্রৌপদী তা দেখতেন, বুঝতেন, মানতেন। এই মূল পাতিব্রত্য পালন করে নিজেও প্রত্যেককেই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাঁদের প্রাপ্য সম্মানে গ্রহণও করতেন। এই ব্যক্তিগত মাত্রায় দ্রৌপদীর পক্ষে নিশ্চয় স্বাভাবিক অর্জুনকে প্রথম ও প্রিয়তম স্বামীরূপে গ্রহণ করা।

প্রথমত অর্জুনই তাঁকে সত্যবদ্ধ করেছেন। দ্বিতীয়ত, অর্জুনের মতো বীর এবং তৎসঙ্গে এমন নৃত্যগীতাদি শিক্ষকের প্রতি অনুরক্ত হওয়াই স্বাভাবিক না হলে তাই হত অস্বাভাবিক। অর্ধাঙ্গিনী বলেই বিদগ্ধ লীলাসঙ্গিনী হয় নি। আর চারটি পাণ্ডুপুত্রের প্রতিও সমভাবে প্রণয়-অনুভবের দাবি বিবাহের জোরে বর্তে না।

কী তবে বর্তে? একটু নিরপেক্ষের দৃষ্টিতে (খুব সংক্ষেপে, পারলে সুসংযত ভাষায়) বিষয়টা একটু বিবেচনা করা যাক। ধর্মরাজ ও যমদূতেরা ক্ষমা করবেন (ম্যাজিস্ট্রেট অপেক্ষাও আমরা দারোয়ান-কনেস্টবলকে বেশি মান্য করি তাই যমদূতদের প্রথমেই উল্লেখ করছি)। স্বাভাবিক মানবিক বিচারে একবার কি ভেবে দেখতে পারি, কোন পাণ্ডবকে দ্রৌপদীর কেমন দৃষ্টিতে দেখবার ও পাতিব্রত্যের মাত্রা রেখে গ্রহণ করবার কথা? সমভাবেই দেখা উচিত, দ্রৌপদী তাঁর জীবনের সমস্যার কীভাবে সমাধান করেছেন — মহাভারতেই তার উল্লেখ আছে। পাতিব্রত্য ছাড়াও হিসাবের পক্ষে দুটি প্রকাশিত ঘটনা আমাদের উল্লেখ না করা ঠিক হবে না।

১. দ্রৌপদীর স্বামীসখা শ্রীকৃষ্ণ। প্রথামত অর্জুনের সখা বলেই তিনি দ্রৌপদীরও সখা। সখা আর স্বামী সমার্থব্যঞ্জক শব্দ নয়। Extra-marital relation তবে অবস্থার চক্রে অনেক সময়ে মাঝখানের ভেদরেখা মুছে যায় — বিশেষ করে একালে। কমরেডশিপ, লাভ-রিলেশন হল গুণ। বন্ধু-বান্ধবী কথাগুলি সৃষ্টি হয়েছে নানা রূপের ও মাত্রার সখ্য বোঝাতে।

কিন্তু সেকালের সখাসখীর মধ্যে মাত্রাটা মুছে যেত না। কোনোখানে তার ব্যত্যয় দেখি নি। Extra-marital comradely relation আর কোনোখানে সখ্যের মধ্যে অনাবিল

মাধুর্যের রসটান নষ্ট হতে দিত না। অন্তত কৃষ্ণের পত্নীগ্রহণে উদারতা প্রসিদ্ধ, রমণী-বিলাসেও দ্বারকায় তাঁর খ্যাতি ছিল সর্বাধিক — আমি ব্রজধামের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। পাণ্ডবপরিবারের সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্কটা নিবিড় ঘনিষ্ঠতার, তার মধ্যেও অর্জুনের সঙ্গেই অবশ্য সর্বাধিক — সুভদ্রাকে অর্জুনের সঙ্গে পালাতে তিনি সাহায্য না করলে কি হত কে জানে! অবশ্য অর্জুন তাঁর সখার সাহায্য ছাড়াও ক্ষত্রিয়বালে ডন জুয়ান — অভিমন্যু-জননী সাহসিকা সুভদ্রা অর্জুনের অন্তরের নিকটতম প্রেমিকা। দ্রৌপদীজয়ী অর্জুনের নিকটতম প্রেমিকা সেই বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বময়ী দ্রৌপদী?

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে ('অজ্ঞাতবাস' কালে) রাষ্ট্র বিপ্লবে দ্রৌপদী ত উজাড় করেই নিজেকে দিয়েছিলেন। সুভদ্রাও দিতেন — সেরূপ প্রয়োজন হলে কে না দিত — চিত্রাঙ্গদা বা সেই মণিপুর কুমারী? অর্জুনের জন্য উর্বশীও পাগল হল, এই একক্ষেত্রে দেখি সব্যসাচী সর্বজয়ী হয়েও ভোগে বিমুখ। যাই হোক ক্ষত্রিয় সমাজে অর্জুন বীরত্বে, রূপে, রসে, বিদগ্ধতায় ডন জুয়ান। তাঁর মনের কথা জানা সম্ভব ছিল সখা কৃষ্ণের — সখার ওই একটি নিগূঢ় কাজ বা function।

কিন্তু দ্রৌপদীর সঙ্গে অর্জুনের সম্পর্ক নিয়ে কৃষ্ণের কোনো উক্তি না থাকলেও অর্জুনের ব্যাপারে দ্রৌপদী সুভদ্রার সহাবস্থান মেনে নিয়েছিলেন, সকল পক্ষ — পতি, পত্নী, সখা সবাই।

কৃষ্ণও সখার আর একটি আচরণ যা করেছিলেন তা সখাই করতে পারে — 'আনকমিটেড লাভ'-এই সম্ভব। যেমন দুষ্টু, তেমনি সহৃদয় রসিক।

দ্রৌপদীর সর্বাধিক প্রিয়তম অর্জুন, সবাই জানে। কিন্তু পাঁচজনের প্রতি তাঁর যে পতি হিসেবে আন্তরিক সম্পর্ক তা ছাড়াও যদি কারও প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ, যা সখার সখ্য নয়, সখ্য তো প্রকাশ্য কিন্তু অপ্রকাশ্য আন্তরিক বেদনা বা আকর্ষণ থাকে, তাকে 'গুপ্তপ্রেম' বলি। পৃথিবীতে কে জানত দ্রৌপদীর মধ্যে তেমন একটি গুপ্তপ্রেমের বীজ ছিল? সখা-সখীরই তা জানা সম্ভব।

এই সখার সুনিপুণ ব্যাপারটি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কে করতে পারতেন? যখন দ্রৌপদীকে তিনি চতুরতায় বিব্রত করে (এবং মনে মনে মাধুর্যে শিহরিত করে) বলতে বাধ্য করলেন তাঁর মনের একটি গোপন বাসনা প্রকাশ করতে — সত্য না বললে বৃন্তচ্যুত আম্রফলটি পুনরায় বৃন্তস্থ হবে না। সখা ছাড়া কার সাধ্য এমন করে আঁতের কথা টেনে বার করে? আর সখা ছাড়া (স্বামী নিশ্চয়ই নয়) কাকে সেই আঁতের কথা বলা যায়?

কর্ণের আচরণ আমাদের কাছেই মনে হয় — কাপুরুষোচিত — মহারথী বীরের এমন আচরণ আমাদের কাছে ক্ষমার অযোগ্য মনে হয়। তাহলে দ্রৌপদীর মনে হতে পারে তখন কিংবা কুরুবীর সভায় কর্ণের কুৎসিত আচরণের পরে। দ্রৌপদীর হৃদয়কে গুপ্তপ্রেমের বীজ (একটু অপরাধও) বিদ্ধ করছিল মেনে নিলেও কুরুসভার সেই ইতর মুহূর্ত কি শুধু দ্রৌপদীকে ঘৃণায় ভরে তোলে? বরং সে 'গুপ্তপ্রেম' আরও শতগুণ বেশি ঘৃণায় দ্রৌপদীর মনকে জ্বালিয়ে তোলবার কথা। "হায়। হতভাগিনী তুই এমন কাপুরুষের জন্য অন্তরে পোষণ করেছিলি প্রেম?"

আমার দৃঢ় ধারণা ওই কুরুসভার অভিজ্ঞতার ফলে কর্ণের প্রেমের অনিবার্য ফল দুর্বিষহ বিষ হয়ে ওঠা; — তাই একসঙ্গে দ্রৌপদীর নিজের প্রতি নিজের গঞ্জনা — মূঢ়া এবং পাপিষ্ঠাও; পঞ্চপাণ্ডব আর স্বয়ং ধনঞ্জয় যাঁর প্রাণবল্লভ, তাঁর একি পাপচিন্তা, — ষষ্ঠের জন্য গোপন আকর্ষণ। সে ষষ্ঠ আবার অর্জুনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। আর কুরুসভায় এক ঘৃণ্যমনা সে কুরুবীর।

মজা ছিল, তবু মহাভারতকার হাস্য গোপন করে মনে মনে বলছেন — অপূর্ব বুদ্ধিমতী, সর্বংসহা, সম্পদবিপদে সুস্থিরমতী পাঞ্চালী। কিন্তু প্রেমের এমনি মজা! প্রেম বহুরূপী — সে হৃদয়ের অনুতাপ থেকে অনুরাগ হয়, অনুরাগ থেকে গুপ্তপ্রেম, আবার সখার friendly intimacy-তে গূঢ় জীবনবাসনার উন্মোচনে একটু সলজ্জ মাধুর্য। নিজেকে উন্মোচিত করে। সখার সখ্যকে শুভ্রতায় নিকটতর করে নিজের কক্ষে ফিরে, আবার স্বপ্নভঙ্গে সে প্রেম হয় বিষ, ঘৃণায় নিকৃষ্ট হলাহল, অন্তর-বাহির সব ভরে দেওয়া আত্মাধিকারের অসহনীয় কালকূট। কিন্তু তখনও কি উবে যায় সে? রাজসভার পরে কর্ণের প্রতি ঘৃণায় ক্রোধে? না, সর্বজনজ্ঞাত যন্ত্রণায় আবার এক অসতর্ক মুহূর্তে গ্লানিময় লজ্জায় রমণীর অন্তরে জাগায় এক সহনীয় শিহরণ?

পাঞ্চালীর প্রেমের কত রূপ, তার ঠিকানা জানতে কি? তুমিই বল অন্যসব রূপ ছেড়ে দিয়ে — নিশ্চয়ই সখ্য-রূপ — সে পর্যায়ের হতে চাও নি — শুধু পতিপ্রেমের কত রূপ তুমিও দেখেছ। ছেড়ে দাও ওই ষষ্ঠ রূপটিও কল্পিত কর্ণ-কথা, পশুপ্রকৃতি কীচক-কথা তো ওঠেই না। শুধু বল, পঞ্চপতির মধ্যে তুমি পঞ্চপতির অর্ধাঙ্গিনীকে কত রূপে দেখেছ।

হ্যাঁ। দেখেছ অর্জুনেরও কত দাম্পত্য লক্ষণ থাকে। তুমি স্বয়ংবর সভাতেই তাঁকে প্রাণ দিয়ে বসে আছ। কিন্তু তিনি যদি প্রাণ দিয়ে থাকেন দিয়েছেন কাকে? স্বয়ং মিলন উদ্যোগিনী সুভদ্রাকে? না, চিত্রাঙ্গদাকে? না হয়তো তোমাকে নয়, সুভদ্রাই ভাগ্যবতী। তবু আর্য অর্জুনের সে পক্ষপাত লজ্জা ভয়ের কথা নয়, পাপের তো নিশ্চয়ই নয়। তবে অপরাধ, অর্জুনের প্রতি তোমার অধিকতর আসক্তির স্বাভাবিকতা, যা বিবাহরীতিতে অন্যায়। বস্তুত পঞ্চপতির প্রতি তোমার পাতিব্রত্যে ওটি কলুষ নয় — ওটি মানবিক অনুরাগে রঞ্জিত মনোভাব।

আচ্ছা, আমি বলি, মহাভারতে যা স্থান পায় নি — মানুষের চক্ষুতে তা কিন্তু এড়াবে না। মানুষ শুধু শোনে না, অন্তর দিয়ে দেখে। তাহলে দ্রৌপদী তোমার পাতিব্রত্যের সঙ্গে প্রেমে কত রঙ চড়িয়েছেন কত ভাবে, একটু বুঝতে চাই। জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ধরে বিচার নয়, এটা তোমার অন্তর অনুরাগও ধরে বিচার নয়, এটা তোমার অন্তর অনুরাগ ও অন্তর উপলব্ধির — কথা। হিসাব —

১. অর্জুন — মধ্যম পাণ্ডবের কথা প্রথম। অনেকগুলি plus point তাঁর প্রাপ্য। সব্যসাচী প্রেমে+আর, স্পষ্টই আর সব স্বামী lover husband par excellence, না husband lover, প্রধানত lover, তৎসঙ্গে husband আচ্ছা — এ হল নম্বর ওয়ান। হ্যাঁ তবে নম্বর ওয়ান এখন থাক। এবার সব সমপতি। তাহলে প্রথম পাণ্ডব থেকে শুরু করা যাক।

২. প্রথম পাণ্ডব — হ্যাঁ, প্রথম অপ্রধান নয়, অর্জুনের পরে 2nd best? প্রেমের গণনায়? দূর , তাও হয় না। তবে, ধর্মাত্মা, সদাচারী, পত্নী-বিষয়ে ধার্মিক, — বেশি ধার্মিক, কর্তব্যানুরাগী। সংযত করেন চাপল্যে, আবার চাপল্যগ্রস্ত হন সংযমে। তাই বলে দুয়ের মধ্যে টানাটানি নেই। অবিচলিতমনা, বেশ পরিমিত পরিমাণে মিতাচারী। না, তাই কি সম্পূর্ণ ঠিক? দ্যূত-ক্রীড়ায় পাকা জুয়াড়ি — সব খোয়ানো বাকি ভাইগুলোকে আর আমাকেও। না, সে আমি ভুলি নি।

সত্য কথা, ধর্মাত্মা — আমি প্রেম দিয়ে তাঁর পূজা করেছি। এমন প্রেম-পূজা কাকে করব? তাহলে নম্বর, না নম্বর পরে হবে।

৩. দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন। নামেই ত্রাস, দেখে হৃৎকম্প, শত্রুদের পক্ষে যুদ্ধে। বিপুল বিরাট দেহ, অসুর-দুর্দমন্ত-বীর, আবার মাকুন্দ-মুখো। দ্রৌপদী ভয় পাবেন, না হয় হাসবেন, এই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু দ্রৌপদী প্রথমে হলেন বিস্মিত। পরে, সকলের প্রতি মমতায়, কুন্তী, যুধিষ্ঠিরের তো কথাই নেই। প্রসন্ন-দণ্ডবৎ দ্রৌপদীকে পদবন্দনা করে এবং করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে আর গৃহে প্রবেশ করেন না — জ্যেষ্ঠের পত্নী, নিজের সহধর্মিণী হলেও সম্মাননীয়া বধূ জ্যেষ্ঠা মহিষী।

ক্রমে দ্রৌপদী দেখেন, বলবান মানুষটির ঘোর-প্যাঁচ নেই অন্তরে-বাহিরে। তবু, যত হোক সরল, মানুষটি আবার স্বামী। তথাপি আবার অতিরিক্ত সংকুচিত। বুঝি বা গৃহে কারও প্রতি গোঁয়ারের মতো বল প্রকাশ করে ফেলেন — তাই বিশেষ সাবধান। আবার দ্রৌপদী সম্পর্কেও মাননীয়া ভার্যা, গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ভার্যার আদরের সম্ভাষণেও থাকে সঙ্কুচিত প্রীতি। আর দাম্পত্যে কর্তব্যপরায়ণ ও সাবধানী হলেও প্রকৃতিগত সরলতা ও সেই সঙ্গে ভয় — বুঝি অবিদগ্ধ অন্যায় ঘটে কোথাও। বোঝা যায়, বীর বাহুবলে দ্রৌপদীকে তিনি রক্ষা করবেন। এই সহজ মানুষের মতো সবল সরল স্পর্শের অনুভূতিকে বুঝি স্বচ্ছন্দে।

প্রমাণ পাওয়া গেল কুরুসভায় সেই লাঞ্ছনার সময়। সভাসুদ্ধ গুরুজনেরা, বীরজ্যেষ্ঠেরা সকলে কেবল 'কী হচ্ছে কী হচ্ছে' করছে নুলো মানুষের মতো। পুরুষের মতো স্বাভাবিক ক্রোধে, নরশার্দূলের মতো বজ্রকণ্ঠে উদ্দীপ্ত কঠিন শপথ নিলেন ভীমসেন। দ্রৌপদীর চিরজীবনের মতো মনে থাকা ভীমের সেই মূর্তি — স্বামী, যে স্বামী স্ত্রীর মর্যাদা বোঝেন। কুরুক্ষেত্রে দুঃশাসনের রক্ত পান করে তাঁর বেণী বেঁধে দেন ভীমসেন — সত্যই তখন দুই চোখে দ্রৌপদীর অশ্রু বইছিল। আবার, ভয়ংকর রাক্ষসী-দৃশ্যে বুক কাঁপছিল।

তবু একটা প্লাস চিহ্ন অবশ্য দিতেই হবে। বেশি দিতে হত কিন্তু তা হয় না। দ্রৌপদী এই অসুর-সুলভ দেহমন পুরুষের কাজকর্মে মনে মনে হেসেছেন। রন্ধনকর্মে এমন পুরুষের অনায়াস সহকারিতায় ও অভাবনীয় পটুতায় কৌতুকবোধ করেছেন, মুগ্ধ হয়েছেন। শিকারে ও যুদ্ধে দুর্ধর্ষ নির্মমতায় কেমন বেদনা-কুণ্ঠাও বোধ করেছেন বহুবার।

পারস্পরিক যোগাযোগে এক সম্মানভরা অকৃত্রিম প্রবলতায় তৃপ্ত হয়েছে। সবসুদ্ধ রয়েছে সম্পদে বিপদে এক নিশ্চিত সহায়। কিন্তু তার থেকেও বেশি, — স্বামী বা ভর্তা

কিংবা সবল রক্ষক শুধু নয়, ভীম যেন নিজ জ্যেষ্ঠাগ্রজ, যাঁর ওপর আপনা থেকেই নির্ভর করা চলে।

৪. মধ্যমপাণ্ডবকে বাদ দিয়ে এসে গেল মাদ্রিসুতদ্বয়ের কথা — দুইই অর্জুন এবং দ্রৌপদীরও বয়সে অনুজ। নকুল তো প্রথম যৌবনের যুবক — নিজের দৈহিক সৌন্দর্য সম্পর্কে সর্বদা সচেতন। জানে, কন্যা বয়োমিচ্ছতি। মিথ্যা নয়, তা দ্রৌপদীও মানতেন। কিন্তু দ্রৌপদী অভিজ্ঞ যৌবনা — তিনিও হয়তো দেবতাদের মনে মনে চাইতে পারতেন; — কারণ কার্তিকেয় নাগর হতে ব্যস্ত নন, তিনি অদ্বিতীয় দেবসেনাপতি, যেন স্বর্গের

কিন্তু নকুল কার্তিকেয় নয়, শ্রেষ্ঠ রূপবান। ক্ষত্রিয়কুমার শুধু গোঁফে তা দেবেন, সখের পাথরবাটির মতো তা সম্ভব নয়। ক্ষত্রিয় রাজকুলের রীতি অনুযায়ী সে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেছে। তার ওপর যুদ্ধের প্রধান বাহন অশ্বের সে প্রধান চিকিৎসক — দুর্লভ গুণ। তবু দ্রৌপদীর কাছে সে ক্ষত্রিয়কুমার মাত্র। হ্যাঁ কুমার, যেমন গৌরীর কাছে কুমার সুন্দর পুত্রটি, — দ্রৌপদীরও মনে হয় — তাকে কোলে নিয়ে বসেন — হ্যাঁ, কোলে নেন। স্বামী আলিঙ্গন পাতিব্রত্যের অঙ্গ। তবু নকুলকে আলিঙ্গন করতে করতে কোমল মাতৃস্নেহও মনে বোধ করেন, ভালো লাগে। যত হাসুন মনে মনে নকুলের রূপযৌবনপুষ্ট প্রসাধনে, তবু সে স্বামিত্বে তাঁর আকাঙ্ক্ষা জাগে, পাতিব্রত্য জাগে।

৫. কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব — যৌবনের প্রথম আশীর্বাদ তার কোমল মুখের কোমলতা আর জন্মগত বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যকে দিয়েছে আরও ঔজ্জ্বল্য — মায়ের কোলের শিশু শুধু নয়, মায়ের বুকের সব শিশুর লাবণ্য আর বুদ্ধির ক্ষিপ্রদীপ্তি দুই-ই দ্রৌপদীর কাছে স্নেহমমতায় সুখকর হয়। সহদেবকে নিয়ে পাতিব্রত্যের ব্রতপালনে একটু লজ্জাই হত। কিন্তু তাতো নয়, তা যেন আরও পুষ্ট হয়, মধুর একটি শ্রী জোগায় মাতৃস্নেহের মতো মমতায়। কুমারীহৃদয় দ্রৌপদীকে সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষা জোগায় যেন কনিষ্ঠ পাণ্ডবের শিশুসৌরভ আর বুদ্ধির গৌরব। একটা গ্রাস দিতেই হয় মাতৃমমতায়, স্নেহে।

তাহলে এবার কি মধ্যমপাণ্ডবের কথারই প্রয়োজন আছে? অর্জুন, সে তো প্রথম থেকেই পতিত্বের প্রকৃত অধিকারী — আর দ্রৌপদীর শুধু কর্মনিষ্ঠতায় নয়, ব্যক্তিত্বের অনির্বচনীয় শ্রী ও শক্তিতে নয়, নাচে-গানে হাসি-গল্পে, সকল কলা-বৈদগ্ধ্যে লাস্যেরই যোগ্যা — পাতিব্রত্য তাঁর কর্মায়ত্ত — আর লীলাবৈদগ্ধ্যে দ্রৌপদীর কোন পাণ্ডব বা কোন দেবতা হতেন নর্মসহচর? যোগ্যার যোগ্যকে অঙ্গীকার এই তো শাশ্বত বিধি।

তা বলে এখন পাতিব্রত্যের মাপকাঠিতে দেখছেন বলে সব পাতিব্রত্য মাপা যায় না — মাপকাঠি ঠিক আছে, তা খর্ব না করে বা স্থির রেখেও কোনো পাতিব্রত্যের মাপকাঠিতে তাঁর নিজের কামনা বা সত্যের নাগাল পাওয়া যায় না। কারও অন্তর তা ছাড়িয়ে যায়, কারও কারও পিছিয়ে থাকে। কিন্তু সে মাপকাঠি সত্য হয়ে থাকে — শ্রদ্ধার মাত্রার বলে, ভার্যার নির্ভরতার মাত্রা মিশিয়ে, আর কারও মায়ের স্নেহাশীর্বাদ, এবং মায়ের অপত্যস্নেহের মমতায়।

আর, এ মনে রেখে, ব্যাসদেব যাই বলুন, স্বর্গারোহণ পর্বসুদ্ধ অষ্টাদশপর্ব মহাভারতে আমরা দ্রৌপদীর প্রতি অবিচার খণ্ডন করতে গিয়ে কলিকালের প্রেম-পরিণয়-প্রণয়ের কোর্টে দেখছি যে, তিনি দ্রৌপদীর নানারূপের পাতিব্রত্যকে বিচিত্র-মোহন করেছেন।

সে বিচারে দেখা যাচ্ছে —

১. অর্জুন (নিজে ডন জুয়ান) হচ্ছেন দ্রৌপদীর হৃদয়ে lover-husband per excellence! নম্বর ওয়ান।
২. ভীমসেন — elder brotherly-husband! নম্বর টু।
৩. সহদেব — Filial husband-per excellence! নম্বর থ্রি।
৪. নকুল — Filial husband! নম্বর ফোর।
৫. যুধিষ্ঠির — Ceremonial husband! নম্বর ফাইভ্।

তবে, একালে পঞ্চপতিবর্তী ভাগ্যবতীদের আমরা কী বলব? একজনকে ছেড়ে শতজনকে যেমন খুশি পাতিব্রত্যে বরণ করুন, আইন এড়িয়ে অবশ্যই — ওই নম্বরের কাল আসবার নয়। কারণ, কাল পরিবর্তনশীল... এখন Permissive Age ও বিবাহ অপেক্ষা না-বিবাহ, temporary দাম্পত্যই অধিকতর কাম্য। কাল বদলালে কী হবে কে জানে?

তবে, আসক্তির মাত্রা দিয়ে নম্বর হয় না। কালানুক্রমিক নম্বর হলেও হতে পারে। দ্রৌপদীর কালটা অবশ্য একালের না। তাতেও নম্বর ওয়ানের সুভদ্রা চিত্রাঙ্গদার প্রতি বেশি আগ্রহের বিচারে দ্রৌপদীকে নম্বর টু নম্বর থ্রি যা খুশি করে নেবেন। আবার অন্যদিকে সব মিঞাই একালের দ্রৌপদীর কৃপায় আজ এবং কাল এরকম নানা নম্বর পাবেন।

অপ্রবাসী-প্রবাসী

প্রমথনাথ বিশী

কোনো একবার প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে আমি লিখিয়াছিলাম যে, বঙ্গের বাহিরে বাঙালি কথাটা আমার ভালো লাগে না। বঙ্গের বাহিরে বাঙালিদের অবশ্যই ভালোবাসি। বঙ্গের বাহিরে বাঙালি এই কথাটার মধ্যে যেন একটা প্রচ্ছন্ন বিরাগ ও অসন্তোষ আছে। যতদিন বাংলার বাহিরে তাঁহাদের স্থান সুখের ও সম্মানের ছিল ততদিন বঙ্গের বাহিরে ভাবটা এমন উগ্র অসন্তুষ্ট মূর্তিতে দেখা দেয় নাই। এখন নানা কারণে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাঙালির স্থান আগেকার মতো আর তেমন সম্মানের নয়, সুখেরও নয়। এ-হেন অবস্থায় প্রবাসীত্ব অবস্থাটা হঠাৎ বাঙালির মনে পড়িয়া গিয়াছে। দুঃখের দিনেই মানুষের স্বদেশ ও আত্মীয়স্বজনকে মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু দুঃখের দিন যদি আসিয়া থাকে, তবে দুঃখের কারণও আছে। এই দুঃখের কারণ কি? সাহিত্য-সম্মেলন সে সব কারণ বিশ্লেষণের স্থান নয়, ইহার মধ্যে রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রশ্ন জড়িত আছে, বিশেষ বঙ্গের বাহিরে বাঙালিদের সমস্যার সমগ্র রূপটির সঙ্গে আমি পরিচিত নই।

দুঃখের কারণ যাই হোক, এ কথা নিশ্চিত যে বহু বাঙালিকে স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক বাংলার বাহিরে থাকিতে হইবে। বাংলাদেশে তাহাদের আর ফিরিবার উপায় নাই, ফিরিয়া গেলেও দেখিবেন সেখানে তাহাদের স্থানাভাব। দূরত্বের জন্য যাহাকে মনোরম মাতৃক্রোড় বলিয়া মনে হইতেছে, কাছে গেলে সে মোহ ভাঙিয়া যাইবে। ইহার প্রধান প্রমাণ এই যে, বঙ্গের ভিতরে যে সমস্ত বাঙালি আছেন তাঁহারা বঙ্গের বাহিরে বাঙালিদের জীবনকে অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন এবং প্রথম সুযোগেই বঙ্গের বাহিরে বাঙালি হইবার আশা মনে মনে পোষণ করেন। আপনাদের যেমন, ঠিক তেমনি শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বাঙালির স্থান বাংলা দেশেও আজ আর সুখের নয় — ইহা জানিয়া দুঃখের দিনে হয়তো কথঞ্চিত পরিমাণে আপনারা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন।

এখন এ কথা যদি সত্য হয় যে, বহু বাঙালিকে চিরদিন বাংলাদেশের বাহিরেই থাকিতে হইবে, তবে আরও একটা কথা সমানভাবে সত্য যে, আপনারা বাংলা দেশকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন না, বাংলাদেশও সর্বদা আপনাদের মনে রাখিয়াছে। এখন বঙ্গের বাহিরে বাঙালি ও বঙ্গের ভিতরে বাঙালিদের মধ্যে যোগ রক্ষা করিবার উপায় কি? কেবল তো স্মৃতির উপরে নির্ভর করা যায় না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোনো উপায় আছে কিনা জানিনা, থাকিলেও ও দুটা বস্তুর উপরে খুব বেশি নির্ভর করিতে নাই — কারণ এখন যাহা সোনার শিকল বলিয়া মনে হইতেছে, স্বার্থের এনামেল চটিয়া গেলেই দেখা যাইবে তাহা কঠিন লোহায় প্রস্তুত।

তাহা হইলে একমাত্র নির্ভরযোগ্য, অপরিবর্তনীয় যোগসূত্র যাহা রহিল তাহা সাহিত্য। বাঙালি যেখানেই থাকুক, বাংলাদেশের ভিতরে কিংবা বাহিরে, বাংলা সাহিত্য অদৃশ্য স্নায়ুতন্ত্ররূপে তাহাদিগকে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে দূরে ও নিকটে তাহাদের দেহের মধ্যে ভাব ও প্রীতির রক্তধারা সঞ্চালিত করিয়া দিয়া প্রতি মুহূর্তে তাহাদিগকে জীবনধনে ধন্য করিয়া তুলিতেছে। বাংলা সাহিত্য বাঙালির পক্ষে, সে বাঙালি যেখানেই থাকুক, জীবনানুভূতির ঐক্য বোধের অক্ষয়, অমোঘ, একমাত্র যোগসূত্র।

কিন্তু বঙ্গের বাহিরের বাঙালিদের উপরে একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে — সে এই সাহিত্যের দায়িত্ব। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু স্থানে অনেক শিক্ষিত বাঙালি স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন; তাঁহারা সে সব অঞ্চলের ভাষা নিশ্চয় শিখিয়া লইয়াছেন, সে দেশের লোকের সঙ্গে এক প্রকার সামাজিক ও ব্যবহারিক যোগ স্থাপিত হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের দুটি মাতৃভূমি বলিলেও চলে, প্রথম, বাংলাদেশ, দ্বিতীয়, যেখানে স্থায়ীভাবে বসতি। বাংলা দেশের বাঙালির সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ঘনিষ্ঠ যোগসাধনের ভার ইঁহাদের উপরে রহিয়াছে, আর সে যোগসাধনের পথ সাহিত্য।

বাঙালির নামে অপবাদ আছে যে, সে একান্তভাবে গৃহাশ্রয়ী। জাতি হিসাবে আমবা নাকি অত্যন্ত ঘরকুনো। ইহা অংশত সত্য। একমাত্র সংবাদপত্রে যাহা মর্মরিত হয় তাহা ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের অল্প খবরই আমরা রাখি। বিদেশের সাহিত্যের তুচ্ছ খবরেও আমাদের কত আগ্রহ, কিন্তু প্রাদেশিক সাহিত্যের স্থূল খবরও আমরা রাখি না। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে অহঙ্কার ও অন্ধ অনুরাগই ইহার অন্যতম অন্তরায়। আমার বিশ্বাস বাঙালির এই জাতীয় স্বভাব, এই গৃহকোনাশ্রয়ী ভাব বাংলার বাহিরেও বর্তমান; তাই সেখানকার বাঙালি চিরদিনই স্বতন্ত্র হইয়া বঙ্গের বাহিরে বাঙালিরূপে বিচিত্র 'নিরালম্ব' বায়ুভূত শূন্যাশ্রয়ী এক সমাজ হইয়া রহিলেন, দেশের লোকের সঙ্গে মিশিতে পারিলেন না। তাঁহাদের চারিদিকে ভারতবর্ষের জীবন ধারা প্রবাহিত, সে জলে না তাহাদের অভিষেক ঘটিল, না তাঁহাদের তৃষ্ণা নিবারিত হইল, মাঝখানে স্বতন্ত্র, ক্ষুদ্র মরুভূমির দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ত্রিশঙ্কুর মতো না স্বর্গের, না মর্তের না ভারতবর্ষের, না বঙ্গদেশের।

শুনিয়াছি যে-সব বাঙালি ছাত্র বিলাতে যায় তাহারা সেখানকার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রদের সঙ্গে মিশিতে পারে না। ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যখন অন্যান্য প্রদেশের ছাত্ররা অবাধে অনায়াসে মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ, আলাপ আলোচনা করিতেছে, তখন বাঙালিরা স্বতন্ত্র হইয়া নিজেদের মধ্যে উপগোষ্ঠী রচনা করে।

সত্য কি না জানি না, কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে এই উপগোষ্ঠী রচনার মনোভাব বঙ্গের বাহিরে বাঙালিদের মধ্যে কাজ করিতেছে — আর সেই জন্যই তাঁহারা বহু পুরুষ একস্থানে বাস করিয়াও তাহাকে মাতৃভূমি মনে করিতে পারিতেছেন না।

তাঁহারা যদি দুটি মাতৃভূমি বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বাঙালি জাতির প্রকাণ্ড একটা সমস্যা মীমাংসার ভার লইতে পারেন। প্রাদেশিক ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠরূপটি, ইতিহাসের পংক্তিভোজনে যাহা অপাংক্তেয়, সংবাদপত্রের পত্র যাহার

প্রতিধ্বনি করে না, বীরকর্মের পাতায় যাহা কোনোকালে গ্রথিত হইবে না, জীবনের সেই তুচ্ছতম অথচ সত্যতম কথাটি সাহিত্যিকের দৃষ্টির অপেক্ষায় আছে। ইংরাজ লেখক পৃথিবীর যেখানেই যাক, সেখানকার মানুষ ও জীবনযাত্রাকে অবলম্বন করিয়া গল্প রচনা করিতে পারে। বাঙালি লেখক যেখানেই যাক, বাংলাদেশের স্মৃতি বহন করিয়া যায় — ফলে আমরা ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে সেই পুরাতন, নিরীহ, সর্বংসহ, গৃহাশ্রয়ী জাতির দেখা পাই। বাঙালির চরিত্রে এমন কিছু আছে যাহা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খায় না — খাপছাড়া হইয়া থাকে। রাজপুতানায়, ব্রহ্মে, সিংহলে, কাশ্মীরে অপরিবর্তনীয় বাঙালি চরিত্র! আর পরিতাপের বিষয় এই যে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমন্বয়ের শক্তির এই অভাবকেই আমরা গৌরবের বস্তু বলিয়া মনে করি! পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করি, বাঙালি চরিত্রের কি দৃঢ়তা! অবশ্য জাতীয় চরিত্র জলের মতো নয় যে, পাত্রভেদে নব নব আকার ধারণ করিবে, আবার তাহা পাথরের মতোও নয় যে পারিপার্শ্বিকভেদে কোনোরকমে পরিবর্তিত হইবে না। জাতীয় চরিত্রে একাধারে জলের বর্ণগ্রাহিতা ও পাথরের অনমনীয়তা থাকে, তাহা স্ফটিকখণ্ডের মতো; মৌলিকত দৃঢ়, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের বর্ণ গ্রহণে তাহার বাধা নাই।

প্রবাসী বাঙালির তিনটি মূর্তি কল্পনা করিতে পারা যায়।

প্রথমত যাঁহারা বহু পুরুষ হইতে অন্যত্র বাস করিতেছেন; বাংলাভাষা ভুলিয়া গিয়া প্রাদেশিক ভাষাকে গ্রহণ করিয়াছেন; বিবাহাদি সম্বন্ধের দ্বারা ভিন্ন জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়া বাঙালিত্ব হারাইয়া প্রায় অবাঙালি হইয়া গিয়াছেন। ইহাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। কতক বা ইচ্ছায় কতক বা অবস্থাচক্রে ইহারা নূতন পন্থা বাছিয়া লইয়াছেন। হয়তো ইঁহারা বাংলাদেশের কাছেও কিছু আর প্রত্যাশা করেন না — বাংলাদেশেরও ইঁহাদের কাছে কিছু প্রত্যাশার নাই। ইহাতে একদিকে যেমন বাঙালি সমাজের ক্ষতি হইল, অপর দিকে তেমনি ভারতীয় সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মূর্তি, যাঁহারা স্থায়ীভাবে বাংলাদেশের বাহিরে থাকিতে বাধ্য হইতেছেন অথচ কিছুতেই সেই প্রদেশের লোকের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বাংলাভাষা ভোলেন নাই বটে, কিন্তু তেমনি আবার সে প্রদেশের ভাষা ও সংস্কৃতিকেও প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইঁহাদেরই প্রবাস দুঃখ নিদারুণ — ইঁহারাই প্রকৃতপক্ষে প্রবাসী বাঙালি। ইহাদের দ্বারা বাংলাদেশের কোনো লাভ হইতেছে না, আবার ভারতীয় সমাজেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছে না।

তৃতীয় মূর্তি, যাঁহারা বাংলাদেশের বাহিরে থাকিতে বাধ্য হইলেও বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টিতে পারিপার্শ্বিকের অনিবার্যতাকে গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহারা বাংলাভাষা ভোলেন নাই বটে, তেমনি প্রাদেশিক ভাষাকেও গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদেরই সহায়তায় বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মিলন ঘটিতেছে। একদিকে তাঁহারা যেমন বাঙালির সম্পদ, অন্যদিকে তাঁহারা ভারতীয় সমাজেরও অলঙ্কার। ইঁহারা বাংলাদেশের কাছে হয়তো প্রত্যাশা করেন, আবার বাংলাদেশও তাঁহাদের কাছে ততোধিক প্রত্যাশা রাখে।

সেই প্রত্যাশাটি কি? বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের আন্তরিক যোগসাধনের ভার ইঁহাদের উপরে রহিয়াছে।

ইঁহারা প্রাদেশিক ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্পদগুলিকে বাংলায় রূপান্তরিত করিতে পারেন, আবার বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলিও প্রাদেশিক ভাষায় ইঁহাদের দ্বারা অনূদিত হইতে পারে।

যেমন, এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যত গ্রন্থ প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই অবাঙালির দ্বারা; কিন্তু দ্বিভাষী বাঙালি যেমন সহজে, যেমন মূলানুগ অনুবাদ করিতে পারিবেন, এমন অন্য প্রদেশের লোকের দ্বারা অসম্ভব।

যে প্রদেশে ইঁহারা আছেন, সেখানকার স্থানীয় ইতিহাস, রূপকথা, লোকচরিত প্রভৃতি বাংলা ভাষায় লিখিয়া বাংলা সাহিত্যেব শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের মৌলিক বচনার ক্ষমতা আছে তাঁহারা প্রাদেশিক জীবনকে উপন্যাসে, কাহিনিতে, কাব্যে সজীব করিয়া তুলিয়া বাঙালিকে নূতন দিগ্‌দর্শন দান করিতে সমর্থ। আর এইরূপ প্রক্রিয়া কিছুকাল চলিলে ইঁহাদের কৃপায় বাঙালি ভারতবর্ষকে নূতনভাবে গভীরভাবে জানিতে সমর্থ হইবে।

বঙ্গের বাহিরে বাঙালিদের একটি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠান বাঙালিদের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে, সেজন্য বাঙালি মাত্রই তাহার কাছে ঋণী। প্রবাসী বাঙালির মুখপত্র হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান উপরিউক্ত কার্যসূচিকে গ্রহণ করিয়া প্রবাসী বাঙালি গ্রন্থমালা নামে বইগুলি প্রকাশ করিতে পারেন। ইহাতে প্রত্যক্ষত বাঙালির ও পরোক্ষত ভারতীয় সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে এবং এই প্রক্রিয়ার ফলে বাংলা দেশ ও বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে গভীরতম জ্ঞান ও প্রেমের আত্মীয়তা স্থাপিত হইলে আশা করা যায় প্রবাসী বাঙালিও আর তেমন করিয়া দুঃসহ প্রবাস বেদনা অনুভব করিবেন না।

বাঙালির প্রবাস বেদনা যে প্রতিদিন দুঃসহতর হইয়া উঠিতেছে তাহার কারণ ভারতবর্ষকে আমরা মাতৃভূমি বলিয়া জানি না। বোধ করি কোনো প্রদেশের লোকই গভীরভাবে এই সত্যটি অনুভব করিতে পারে নাই। কিন্তু এ বিষয়ে বাঙালির অপরাধ বোধ করি সব চেয়ে বেশি। অপরের দোষ যদি থাকে থাকুক, সে বিষয়ে এখানে আলোচনায় কোনো লাভ নাই, কিন্তু নিজেদের মধ্যে নিজেদের দোষ আলোচনা কেন করিব না?

বাঙালির প্রথম জন্ম বাংলা দেশে। কিন্তু সাধনা দ্বারা পুনরায় ভারতবর্ষের উদার ক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে দ্বিজত্ব লাভ করিতে হইবে — এই সমস্যাই আজ বাঙালির সম্মুখে সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা। কেবল বাঙালি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিয়া কোনো সার্থকতা আছে বলিয়া মনে করি না — ভারতবোধ যতক্ষণ মনে সত্য না হইয়া উঠিতেছে, ততক্ষণ আমরা বাঙালি মাত্র, পরিপূর্ণ মানুষ নই।

অনেকে তর্ক তুলিবেন, আমরা পরিপূর্ণ ভাবে বাঙালি — তাহাই কি আমাদের গৌরবের নয়? পরিপূর্ণ বাঙালি হওয়ার অর্থ মনুষ্যত্বের ভগ্নাংশ; এমন খণ্ডিত মানুষ্যরূপে কোনো সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না; পরিপূর্ণ ভারতীয়ত্ব-ই হইতেছে ভারতীয়দের পক্ষে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব।

অতি শৈশব হইতে বাঙালির কানে বিকৃত, সঙ্কীর্ণ স্বাজাত্যভিমান ঢালিয়া দেওয়া

হইতেছে — আমরা কোনো এক সময়ে এক হাতে মগকে রুখিয়াছি, আর এক হাত তখন মোগলকে ঠেকাইতেছিল। আমাদের চাঁদ, প্রতাপ এবং বিজয়সিংহ অলৌকিক বীর্য প্রকাশ করিয়াছে, এমন কি এদেশের তরুলতা তৃণদল পৃথিবীর মধ্যে নাকি সবচেয়ে কোমল এবং শ্যামল। আবার সম্প্রতি বাঙালি সংস্কৃতি শব্দটা অত্যন্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালিরা বেশভূষা, আচারব্যবহার, সাহিত্য শিল্পের মোড়ে মোড়ে নাকি বাঙালি সংস্কৃতি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অতর্কিত ভারতবাসীর স্কন্ধে রত্নাকরের মতো লাফাইয়া পড়িয়া বেচারিকে ধরাশায়ী করিয়া দিতেছে। তার সঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছে, রাজনীতির ক্ষুব্ধ মনস্তাপ, ফলে প্রত্যেক বাঙালির গৃহ-দুর্গে এখন এই সঙ্কীর্ণতার বিজয় নিশান উড্ডীয়মান। দেখিতে দেখিতে জ্যামিতিক অসাধ্য সাধন করিয়া ফেলিয়াছে, অংশ সমগ্রের চেয়ে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে; বাংলাদেশ ভারতবর্ষের চেয়ে বৃহত্তর বলিয়া প্রচারিত হইতেছে।

রাজনীতির কথা তুলিয়া ফল নাই — কারণ যত সহজে বাঙালিত্ব উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক তেমনি সহজে আবার যে কোনো দিন রাজনীতিক ভার-বোধ বাঙালির মনে জাগিয়া উঠিতে পারে। কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতি শব্দটা সবচেয়ে বিস্মিত করিয়া দেয়। বাঙালির সংস্কৃতি বলিতে কী বুঝায় জানি না! ইহার অর্ধেক ভারতীয়, বাকি খানিকটা ইউরোপ হইতে ধার করা, বাঙালির নিজস্ব যেটুকু আছে তাহা বাদ পড়িলেই বোধ হয় মঙ্গল ছিল।

দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশেই প্রথম ইংরাজ রাজত্ব কায়েম হইয়াছিল, ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার হইয়াছিল, তাহার ফলে বাঙালিই সর্বপ্রথমে উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার হইয়া টাকা পয়সা উপার্জন করিয়া একটা নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া তুলিয়াছিল।

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আচার ব্যবহারই কি বাঙালি সংস্কৃতি! তবে তাহার আয়ু তো শেষ হইয়া আসিয়াছে।

গত যুদ্ধের পর হইতে এবং বর্তমান যুদ্ধের ফলে অতি দ্রুত এক নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠিতেছে, যাহারা প্রধানত ব্যবসায়ী ও যান্ত্রিক। তাহাদের দ্বারা যে সংস্কৃতির সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে — তাহা কত ভিন্ন! তাহারাও হয়তো এমনি জয়ধ্বনিতে তাহার জয় ঘোষণা করিবে। ভবিষ্যতে বাঙালি সংস্কৃতি বলিয়া যদি কিছু সৃষ্টি হয়, ভবিষ্যৎ তাহার বিচার করিবে।

বর্তমানে যে দুটি বস্তুর গৌরব বাঙালি করিতে পারে তাহা প্রধানত বাঙালির সৃষ্টি হইলেও মূলত ভারতীয় সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত। বাঙালির সাহিত্য ও চিত্রশিল্প। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু তাহার মূল রহিয়াছে ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত যুক্ত; কালিদাস ও উপনিষদকে বাদ দিয়া রবীন্দ্রসাহিত্যের অস্তিত্ব কি কল্পনা করা যায়! রবীন্দ্রসাহিত্যে বিদেশীয় প্রভাব ও উপাদান যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহার ভিত্তিটা ভারতীয় মানসিকতার। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কাঠামোটা আগাগোড়াই তো বিদেশীয়, কিন্তু তিনি দাঁড়াইবার জন্য একটা ভারতীয় ভিত্তি পাইয়াছিলেন, গীতা ও মহাভারত।

মাইকেল মধুসূদন অন্তর্নিহিত প্রতিভায় ইঁহাদের চেয়ে ন্যূন ছিলেন না, তৎসত্ত্বেও তাঁহার সৃষ্টির পরিধি সঙ্কীর্ণতর ও অগভীর হইয়া রহিল। তাহার কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতো দাঁড়াইবার ভারতীয় ভিত্তিটা পান নাই; তাঁহার না ছিল কালিদাস ও

উপনিষদ, না ছিল গীতা ও মহাভারত; তিনি শূন্যে ত্রিশঙ্কুর অলৌকিক মেঘজগৎ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, অপূর্ব তাহার কারুকার্য, অনিন্দ্য তাহার বর্ণচাতুরী, অপরিসীম তাহার পরিধি এবং অনির্দিষ্ট তাহার লক্ষ্য। তবু তাহা মেঘ জগতের চেয়ে বেশি কিছু নয়, না আছে তার ছায়াদানেব, কিংবা জলদানের ক্ষমতা!

আর বাঙালি চিত্রশিল্পের মূলে প্রত্যক্ষত ভারতীয় প্রাচীন ও মধ্যযুগের চিত্রকলা! আধুনিক বাঙালি মনের সৃষ্টি তো এই দুটি বস্তু; বাঙালি সংস্কৃতির এইতো দুইটি মাত্র রূপের কথা আমি অবগত। এবং এ দুটিরই সার্থকতার হেতু, ভারতীয় সংস্কৃতির মনঃপ্রবেগ ধমনী প্রবাহে ইহাদের মধ্যে সঞ্চালিত হইতে পারিয়াছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাকে লঙ্ঘন করিয়া কোনো ক্ষেত্রেই বাঙালি সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে না। প্রতিভা বাঙালির আছে, বিশিষ্টতারও অভাব নাই; কিন্তু প্রতিভা ও বিশিষ্টতার সঙ্গে tradition এর কোনো বিরোধ নাই; বরঞ্চ tradition প্রতিভা ও বিশিষ্টতার সঙ্গে মিলিয়া যে অপূর্ব বস্তুর সৃষ্টি করে তাহা হীরক-খণ্ড-বসানো সোনার অঙ্গুরীয়েব মতো সুন্দর।

Tradition তো অতীতকালের পুষ্পিত প্রতিভা ছাড়া আর কিছু নয় — এখন অতীতকালের এই নির্বিশেষ প্রতিভার সঙ্গে যখন পরবর্তীকালের বিশেষ প্রতিভার সমন্বয় ঘটে — তখনই সেই সমুদ্রের নদীসঙ্গমে নূতন সৃষ্টির শ্যামল, কোমল দ্বীপমালা জাগিয়া ওঠে। কেবল ক্ষুদ্রচেতা, স্বল্পশক্তি, সঙ্কীর্ণদৃষ্টি ব্যক্তিই tradition-এর বিরুদ্ধে আস্ফালন করে, কারণ সে বেশ জানে ওই সমুদ্রসঙ্গমে তাহার গণ্ডুষ জল মিলিয়া মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে — কোনো সৃষ্টির চিহ্নমাত্র রাখিয়া যাইবে না।

এ সব কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের প্রধান কর্তব্য ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে, ভারতবর্ষের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় সাধন করা। ভারতবর্ষকে জানিলে ভারতবর্ষকে ভালোবাসিতে পারিবে — জ্ঞান হইতে প্রেমের উৎপত্তি।

এখন বাঙালির পক্ষে ভারতবর্ষকে জানিবার যেমন সুযোগ আছে, তেমন বোধ হয় অন্য কোনো জাতির নাই। শিক্ষিত, সম্পন্ন, স্বদেশানুরাগী বাঙালি ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেই আছেন; সৎকার্যে তাঁহাদের উৎসাহের অন্ত নাই; বাংলা দেশের ভবিষ্যতের জন্য সর্বদাই তাঁহারা চিন্তিত; ভারতবর্ষেরও তাঁহারা যোগ্য অধিবাসী। তাঁহারা কি এই কাজের ভার লইতে পারেন না? ভারতীয় মনের, ভারতীয় জীবনের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালির মিলন সাধনের কাজ। ইহাতে বাঙালির সার্থকতা; ভারতবর্ষের মঙ্গল, আর তাঁহাদেরও মানসিক শান্তি। ভারতবর্ষকে জানিলে, তাহাকে মাতৃভূমি মনে করিতে পারিলে প্রবাসীরূপে তাঁহারা অহরহ যে বিরহ বেদনা অনুভব করিতেছেন, তাহার অবসান হইবে আশা করা যায়। তখন তাঁহারা বাংলা দেশ হইতে দূরে থাকিয়াও বাংলা দেশেই যেন বাস করিবেন, কারণ তখন বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ একাত্ম হইয়া অর্ধনারীশ্বরের মতো নূতন মহিমা লাভ করিবে।

আমার আশঙ্কা হইতেছে এ সব কথা সকলের ভালো লাগিবে না কিন্তু কী করিব? সাহিত্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমি দেখিতে অভ্যস্ত নই। জীবন হইতে রস টানিয়াই সাহিত্য বাঁচে, জীবন শুকাইয়া আসিলে সাহিত্যও নির্বীর্য হইয়া পড়ে। আধুনিক

বাংলা সাহিত্যের দৈন্যের মূলে আধুনিক বাঙালির জীবনের রিক্ততা। আর আমার বিশ্বাস বাঙালির পুনরুজ্জীবনের রসায়ন ভারতীয়তা-বোধের মধ্যে নিহিত আছে। আর সেই ভারতীয়তা-বোধ বাঙালির চিত্তে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া বাঙালির জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিবার উপায় বঙ্গের বাহিরে বাঙালি সমাজের হাতেই যেন আছে। প্রবাসী বাঙালিরা এই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়া যাহাতে এই ভার গ্রহণ করেন — সেই আশায় এত কথা লিখিলাম ইহাতে পরোক্ষভাবে বঙ্গ-সাহিত্যেরও আনুকূল্য করা হইবে।

□ *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য,* ১৯৪৫

সাহিত্যের আড্ডা

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, মধুসূদন যখন বলেছিলেন — 'রচিব মধুচক্র', তখন তিনি একান্তভাবে আপন প্রয়াস, আপন সাধনা এবং আপন প্রতিভাবলেই মধুচক্র রচনার কথা ভেবেছিলেন। অথচ সাধারণভাবে আমরা সকলেই জানি যে, একটিমাত্র মক্ষিকা দ্বারা মৌচাক রচনা সম্ভব নয়। বহু মক্ষিকা মিলে মধু সংগ্রহ করলে তবেই মৌচাকটি পূর্ণ হয়। অনেকেই অবশ্য জানেন যে, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও মধুসূদনের উক্তিটি উল্লেখ করে বলেছিলেন, সাহিত্যের মধুচক্রটি বড়ো নির্জন, সেখানে একটিমাত্র মক্ষিকার আনাগোনা। অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলতে চেয়েছেন যে, দল বেঁধে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। সেটি শুধু একলার সাধনাতেই সম্ভব।

কাব্য-সাহিত্য তো বটেই, যে কোনো সৃষ্টিমূলক কাজই যে একান্তভাবে স্রষ্টার নিজস্ব প্রতিভাজাত এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু মৌচাকের মধু যেমন আপনি এসে সঞ্চিত হয় না, তাকে ফুলে ফুলে আহরণ করতে হয়, তেমনি শিল্প-সাহিত্যের বেলায়ও প্রত্যক্ষভাবে সৃজনকার্যে না হলেও সঞ্চয়নকার্যে অপরের সাহায্য সাহিত্যশিল্পীরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেক সময়েই গ্রহণ করে থাকেন। আসল কথা, সাহিত্যিকের মনটিই একটি মৌচাক। যাঁদের নিত্য সাহচর্যে তিনি বাস করেন, যাঁদের সঙ্গে তাঁর রসালাপ, ভাবের আদানপ্রদান, এমন কি যাঁদের সঙ্গে নিতান্ত হাসি-মস্করা, গল্প গুজবের সম্পর্ক তাঁরাও সকলেই ঐ মৌচাকটিতে মধুর জোগান দিচ্ছেন। মৌচাকের মালিকটিরও খেয়াল থাকে না, মক্ষিকাদের তো থাকেই না কিন্তু মধুটুকু ঠিক জায়গায় গিয়ে সঞ্চিত হয় এবং ভবিষ্যতে একদিন সাহিত্যের ভোজে লেগে যায়। এছাড়া সৃষ্টিকার্যে প্রেরণা বলে একটা জিনিস আছে। সেটা সবসময় যে উর্ণনাভের উর্ণার মতো একটা আত্মজ বা স্বয়ংসৃষ্ট বস্তু এমন নয়। অনেক সময় প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করেন অপর কোনো মানুষ। সে মানুষ সাহিত্যিক হলে তো কথাই নেই, না হলেও কোনো ক্ষতি নেই। সাহিত্যের সমজদার হলেই হল।

নির্জন সাধনার কথা রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন না কেন, সঙ্গ-সাহচর্য উৎসাহ উদ্দীপনা যে কতখানি প্রেরণা জোগায় তা রবীন্দ্রনাথ যেমন জানেন এমন আর কে? ভাগ্যক্রমে কবিজীবনের সূচনা থেকেই এ জিনিসটি তিনি প্রচুর পরিমাণে পেয়েছেন। এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, কাব্যের স্বভাবটা লাজুক, একটু মুখ-চোরা ভাব আছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রচার-লোভী। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন — "গুণদাদা আমার ভাবগতিক দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেন যে, আমার পকেটের মধ্যে একটা খাতা লুকানো

আছে। একটুখানি প্রশ্রয় পাইবামাত্র খাতাটি তাহার আবরণ হইতে নির্লজ্জভাবে বাহির হইয়া আসিত।" বালক কবির সবচাইতে বড়ো পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দাদা সোমেন্দ্রনাথ। কাছারি বাড়িতে প্রবেশ করে সোমেন্দ্রনাথ সকলকে ডেকে বলতেন, শুনুন, শুনুন, রবি একটি কবিতা লিখেছে। কবিত্ব ঘোষণার এরূপ উৎপাত কাছারি বাড়িতে প্রায়ই ঘটত। এ সব ছেড়ে দিলেও কবি-জীবনের প্রারম্ভে প্রকৃত প্রেরণা জুগিয়েছেন নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবী। 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁকেই বলেছেন সাহিত্যের সঙ্গী। তাঁর সঙ্গেই কাব্যালোচনা, তাঁর জন্যেই কাব্য রচনা। গোড়ার দিকের পাঁচখানা কাব্যগ্রন্থ তাঁকেই উৎসর্গ করা। মধুচক্র এ যাবৎ নির্জনই বলা যেতে পারে, তা হলেও কাদম্বরী দেবী সে মধুচক্রের মক্ষিরানি। নতুন বউঠানের মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম পর্ব সমাপ্ত। ক্রমে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, গুণগ্রাহীর সংখ্যা বেড়েছে, কবিকে ঘিরে প্রকৃত রসিকজনের একটি রসচক্র গড়ে উঠেছে। এঁরা হলেন প্রিয়নাথ সেন, মোহিত সেন, লোকেন পালিত, প্রমথ চৌধুরী, জগদীশ বসু, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ। এঁরা ছিলেন তাঁর নিত্য প্রেরণার উৎস। প্রিয়নাথ সেন সম্পর্কে কবি যা বলেছেন তাতেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। বলেছেন, "তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত .... তাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মতো আমার কাব্য রচনার বিকাশ চেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল।"

প্রিয়নাথ সেন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন সকল কবির গুণগ্রাহীদের সম্পর্কেই তা বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বসে লিখেছেন কিন্তু বড়ো কিছু লেখা হলেই কলকাতায় ছুটে এসেছেন, বন্ধুদের শোনাবার জন্যে। মধুলোভেই ছুটে এসেছেন, কারণ এরূপ একটি আড্ডাচক্রকে মধুচক্র বলতে কোনোই বাধা নেই। আসল কথা, কাব্য জিনিসটা সৃষ্টির মুহূর্তেই বিজন কিন্তু আগে-পরে সজন। সজন অর্থাৎ স্বজন-পরিবৃত। সমধর্মী সহমর্মী অর্থে স্বজন — ইংরেজিতে যাকে বলে Kindred Spirits।

কবি-সাহিত্যিক মাত্রেরই আড্ডার প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। অনেকেই বোধ করি জানেন না যে, রবীন্দ্রনাথ একজন মস্ত বড়ো আড্ডাধারী ব্যক্তি ছিলেন। জোড়াসাঁকো বাড়িটিই ছিল একটি সুবৃহৎ আড্ডা। গানবাজনা, অভিনয়, সাহিত্যালোচনা তাঁদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকাণ্ডের অন্তর্গত ছিল। পরে যখন খামখেয়ালি সভার প্রতিষ্ঠা হয় তখন পরিবারের বন্ধুবর্গও এসে যোগ দিলেন। খামখেয়ালির বৈঠক বেশির ভাগ জোড়াসাঁকো বাড়িতেই বসত, মাঝে মাঝে অন্যান্য সভ্যরাও নিজ নিজ বাড়িতে সভা ডাকতেন। বাহিরাগত সভ্যদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সাহিত্যিক কিংবা সাহিত্যরসিক — প্রধানদের মধ্যে কয়েকজনের নাম করা যেতে পারে — চিত্তরঞ্জন দাশ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, মনমোহন ঘোষ, মহিমচন্দ্র বর্মা প্রভৃতি। প্রত্যেক বৈঠকেই গল্প কবিতাদি পাঠ হত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ক্ষুধিত পাষাণ', ইত্যাদি গল্প খামখেয়ালির বৈঠকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকটিও খামখেয়ালিতে পড়ে শোনানো হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ির কনিষ্ঠদের মধ্যে — বলেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাঁরা

সাহিত্য রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের উপরে এই খামখেয়ালি সভার প্রভাব বিশেষভাবে ক্রিয়া করেছে, কারণ এঁরা তার বিশেষ উৎসাহী সভ্য ছিলেন। এর বেশ কিছুদিন পরে বিচিত্রা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা। এখানে সংগীত, সাহিত্য চিত্র — তিনটি শিল্পেরই সমান সমাদর ছিল। অধিবেশন বসত জোড়াসাঁকোর লাল বাড়িতে। গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্রের নেতৃত্বে ব্যবস্থাপনার ভার ছিল কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথের উপরে। প্রত্যেক অধিবেশনেই রবীন্দ্রনাথ কিছু-না-কিছু লেখা পাঠ করে শোনাতেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক অধিবেশনে যোগদান করতেন। বলা আবশ্যক যে, এই বিচিত্রা ক্লাব-এর সঙ্গে বিশ্বভারতীর একটি গৌণ সম্পর্ক আছে। বিচিত্রার উদ্যোগে জোড়াসাঁকোয় একটি চিত্রবিদ্যা শিক্ষার ক্লাস খোলা হয়েছিল। শেখাতেন অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর। প্রথম যিনি ছাত্রী হিসাবে ভরতি হলেন তিনি রথীন্দ্রনাথের পত্নী প্রতিমা দেবী; বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকরা একে একে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন। বিচিত্রার কলাভবন কার্যত শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত হল। বিচিত্রার উদ্যোগে বাংলা দেশের পল্লি অঞ্চল থেকে কারুশিল্পের নানা নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছিল; সে-সব এখন বিশ্বভারতী কলাভবনে স্থান পেল। বিচিত্রার প্রধান উদ্যোক্তা রথীন্দ্রনাথও অবশেষে শান্তিনিকেতনে এসে বিশ্বভারতীর কর্মসচিব পদে অধিষ্ঠিত হলেন। বিচিত্রার আড্ডা ভেঙে গেল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিচিত্রার প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন আচার্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা দিবসেও পৌরোহিত্য করেছেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ। বিচিত্রার আড্ডা যতদিন স্থায়ী ছিল কলকাতার জ্ঞানী-গুণী সমাজের অনেকেই তার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর নানা দেশের জ্ঞানী-গুণীকে শান্তিনিকেতনের আড্ডায় এনে জড়ো করেছিলেন।

খামখেয়ালি সভা এবং বিচিত্রা ক্লাবে বহিরাগতদের আনাগোনা থাকলেও এর মধ্যে একটা ঘরোয়া ভাব ছিল। একে ঠিক মুক্ত-দ্বার বা পাবলিক ক্লাব বলা চলে না। ইয়ুরোপীয় প্রথামতো ক্লাব-লাইফ তখনও আমাদের সমাজে চালু হয় নি। পারিবারিক বেষ্টনী ছাড়িয়ে দিশি মতে রুচিপূর্ণ আবহাওয়ায় পাবলিক ক্লাব স্থাপনের চেষ্টা সে যুগে যাঁরা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে সংগীত সমাজ নামে একটি মিলনকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল — বলা বাহুল্য, এ-সব বিচিত্রা ক্লাবের ঢের আগের কথা। সংগীত সমাজের বৈঠক বসত কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট-এ — সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সন্নিকটস্থ কোনো গৃহে। গান, বাজনা, এবং নাটক অভিনয়ই ছিল সংগীতসমাজের প্রধান কর্মকাণ্ড। 'গোড়ায় গলদ' নাটকখানা এঁদের জন্যেই লেখা হয়েছিল এবং এঁরাই প্রথম এটি অভিনয় করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানেই নাটকের রিহার্সেল হত। মহড়া শেষ করে বাড়ি ফিরতে রোজই রাত বারোটা একটা বেজে যেত। এই সূত্রেই বন্ধুদের কাছে রসিকতা করে বলেছিলেন, রোজ বাড়ি ফিরে দেখি ভাত ঠাণ্ডা, গিন্নি গরম। পরে এটি সংগীত সমাজের একটি স্থায়ী রসিকতায় দাঁড়িয়েছিল।

এত কথার পর সন্দেহ থাকে না যে, রবীন্দ্রনাথ মানুষটি ছিলেন আড্ডাপ্রিয়। সৃজনধর্মী মানুষ মাত্রই আড্ডাধর্মী। মননক্রিয়াকে সজীব এবং সচল রাখতে হলে সমধর্মী মানুষের সঙ্গে

সংযোগ চাই। রাজনীতিতে যেমন গণসংযোগ, সাহিত্যে তেমনি গুণীসংযোগ। এজন্যে সকল দেশের সকল সাহিত্যের ইতিহাস খুঁজলেই সাহিত্যিক আড্ডার সন্ধান মেলে। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সকলেরই অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। ইংরেজ চরিত্র আমরা যতটুকু দেখেছি তাতে ওদের খুব একটা মিশুকে স্বভাবের বা আড্ডা-বিলাসী বলে মনে হয় নি। কিন্তু ইংরেজ সাহিত্যিকরা এর ব্যতিক্রম। এঁরা প্রচুর পরিমাণে আড্ডা দিয়েছেন, অর্থাৎ এঁরা ইংরেজ ধর্ম পালন না করে সাহিত্যের ধর্ম পালন করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে কবি-সাহিত্যিকদের আড্ডা একটি অতি চিত্তাকর্ষক অধ্যায়। অতি প্রাচীন দিনের কথা বলতে পারিনে, কিন্তু এলিজাবেথ-এর যুগ থেকেই দেখা যায় আড্ডা দিব্যি জমে উঠেছে। শেক্সপীয়ার, বেন জনসন এবং তাঁদের সমগোত্রীয়রা — 'other choice spirits of the age', আড্ডা জমিয়েছেন Mermaid Tavern-এ। কীট্‌স্‌-এর কবিতায় মারমেড ট্যাভার্ন অমর হয়ে আছে। বলেছেন, মর্ত্যধাম ছেড়ে স্বর্গধাম গিয়ে তোমরা কি এর চাইতে লোভনীয় স্থান খুঁজে পেয়েছ? নন্দনকানন কি এতখানি আনন্দ দিতে পারছে? মারমেড ট্যাভার্ন যে পানীয় পরিবেশন করেছে স্বর্গের অমৃত কি সে তৃপ্তি দিতে পেরেছে? অষ্টাদশ শতকে ডক্টর জনসনকে ঘিরে লন্ডনে যে আড্ডা জমে উঠেছিল সে যে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসেই স্মরণীয় এমন নয়, সমগ্র ইংরেজ জাতির ইতিহাসেই স্মরণীয় ঘটনা। সে যুগের ইংলন্ডে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরাই ছিলেন খ্যাতনামা তাঁরা সকলেই সে আড্ডায় এসে জুটেছিলেন — প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ এডমান্ড বার্ক, শিল্পীশ্রেষ্ঠ স্যার জসুয়া রেনলডস্‌, কবি গোলডস্মিথ, শেক্সপীয়ার অভিনেতা গ্যারিক এবং আরও অনেকে। তাঁর আড্ডার চেয়ারটিতে বসে তিনি ইংলন্ডের সমগ্র জীবনটিকে মন্থন করেছেন। দেশে এমন কিছু ঘটেনি যার সম্বন্ধে তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন নি, এমন কোনো চিন্তা জাতির জীবনকে আন্দোলিত করেনি যার সঙ্গে ডক্টর জনসন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না। আড্ডায় বসে নানাবিধ আলোচনা প্রসঙ্গে যে সব মতামত ব্যক্ত করেছেন বসওয়েল-এর কল্যাণে তাও সাহিত্যে সামগ্রী হয়ে রয়েছে। 'র‍্যামলার' এবং 'আইডলার' নামে দুটি প্রবন্ধ সাময়িকী তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হত। সে পত্রিকার লেখক তিনি একক। কিন্তু লক্ষ করবার বিষয় যে, দুটি নামই আড্ডাগন্ধি। আড্ডায় বসে যেমন সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে আলোচনা হত, এ সব প্রবন্ধাবলিতেও তাই। সে যুগের নাগরিক জীবনের উপরে এ-সব প্রবন্ধ প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ইংরেজিতে Blue stocking বলে একটা কথা আছে। সাধারণত ব্লু স্টকিং বলতে আমরা বুঝি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহিলা — বিশেষ করে যাঁদের একটু সাহিত্যাভিমান আছে, অর্থাৎ যাঁরা নিজেদের সাহিত্যানুরাগী বলে পরিচয় দেন। এ কথাটিরও উদ্ভব হয়েছে অষ্টাদশ শতকে। লন্ডনের একদল শিক্ষিতা মহিলা এক জায়গায় মিলিত হয়ে কাব্যসাহিত্যের আলোচনা করতেন। সে যুগের বিদুষী মহিলা মিসেস মন্টেগুর গৃহে বেশিরভাগ সময়ে তাঁদের আড্ডা বসত। সে আড্ডায় পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না; তাঁরাও যোগদান করতেন। এঁরা সকলেই নীল রঙ-এর মোজা পরতেন। তাই থেকে আড্ডাটির নাম হয়েছিল — 'ব্লু স্টকিং ক্লাব'।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, সাদে — এই তিন কবি লেক-পয়েট্‌স্ নামে খ্যাত। একসময় এঁরা তিনজনে ইংলন্ডের লেক অঞ্চলে বাস করতেন। পরস্পর কাছাকাছি থেকে আলাপ-আলোচনায় মত বিনিময় এবং কাব্য রচনা চলত। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ — দু'জনের যেমন অনেক বিষয় মতের মিল ছিল তেমনি আবার অমিলও ছিল প্রচুর। দু'জনের কাব্যরচনার ধারা দুই ভিন্ন খাতে প্রবাহিত অথচ দু'জনেই একে অন্যের গুণগ্রাহী এবং একজন অপরজনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। দু'জনের মিলিত প্রয়াসে ক্ষীণ কলেবর যে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল তারই উদ্দীপনায় ইংলন্ডের কাব্যজগতে এক বিপ্লব ঘটে গেল। ওযার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ যখন লন্ডনে থাকতেন তখন সেখানেও তাঁদের ঘিরে আড্ডা জমে উঠত। সে আড্ডার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন চার্লস ল্যাম এবং হ্যাজলিট।

আমাদের এই ব্যস্তসমস্ত যুগেও সাহিত্যিকদের আড্ডায় ভাঁটা পড়ে নি। গত শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বর্তমান শতাব্দীতে ইংলন্ডের দুটি সাহিত্যিক আড্ডা — রাইমার্স ক্লাব এবং ব্লুম্‌স্‌বারী গ্রুপ — সাহিত্যজগতে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা এবং চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি করেছিল। লন্ডনের ফ্লীট স্ট্রিট অঞ্চলে চেশায়ার চীজ্ নামে একটি রেস্তরাঁ আছে। এটি একটি অতি পুরাতন আড্ডাস্থল। দেখা যায় এলিজাবেথ-এর যুগেও এটির অস্তিত্ব ছিল, বেন জনসন্-এর নাম এর সঙ্গে জড়িত। তিনি মাঝে মাঝে এখানে এসে খানাপিনা করতেন। আড্ডা এখানে বরাবরই চলে এসেছে। মাঝে একবার প্রাচীন জীর্ণ গৃহটির সংস্কারসাধন করতে হয়েছে। ডাবলিয়ু. বি. ইয়েটস্ এবং আর্নেস্ট রীজ্ — দুই বন্ধুতে মিলে চেশায়ার চীজ্-এ একটি আড্ডার পত্তন করলেন। উৎসাহী সভ্যদের মধ্যে লায়নেল জনসন্, আর্নস্ট ডাওসন, জন ডেভিডসন, আর্থার সাইমনস্ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ উৎসাহীরা প্রতি সন্ধ্যাতেই মিলিত হতেন, বাকিরা মাঝে মাঝে। কখনো-সখনো কোনো সভ্যের গৃহে যখন মিলিত হয়েছেন তখন ওসকার ওয়াইল্ডও এসে যোগ দিয়েছেন। তিনি রাইমার্স ক্লাব-এর নিয়মিত সভ্য ছিলেন না। রাইমার্স ক্লাব বলতে গেলে কবি সম্মেলন, নামেই তার প্রমাণ। সেদিক থেকে ব্লুমস্‌বারী গ্রুপ ছিল মুক্ত অঙ্গন, এটিকে বলা যেতে পারে গুণী সম্মেলন। কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী বিজ্ঞানী সকল ক্ষেত্রের খ্যাতনামারাই সেখানে মিলিত হতেন। সংখ্যায় অবশ্য সাহিত্যিকদেরই প্রাধান্য ছিল। প্রধানদের মধ্যে ছিলেন ই. এম. ফরস্টার, লিটন স্ট্র্যাচি, ক্লাইভ বেল, বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ কীন্‌স্, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ এবং তাঁর স্বামী লেনার্ড উল্‌ফ। এ ছাড়া বারট্রান্ড রাসেল, অলডাস হাক্সলি এবং টি. এস. এলিয়টও মাঝে মাঝে এঁদের আড্ডায় যোগদান করেছেন।

ইংরেজদের চাইতে ফরাসিরা আড্ডাচর্চায় অধিকতর পারদর্শী বলে আমার ধারণা। তবে ফরাসি সাহিত্যিকদের আড্ডার বৃত্তান্ত খুব একটা আমার জানা নেই। অবশ্য সাহিত্যের ছাত্ররা সকলেই জানেন যে, কবি মালার্মের গৃহে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি জমাট আড্ডা বসত। এও আজ প্রায় শতবর্ষ পূর্বের কথা — গত শতাব্দীর' ৮০-র দশকে শুরু হয়ে বেশ কিছুকাল চলেছিল। নিয়মিতভাবে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আঁদ্রে জীদ, পল ক্লদেল এবং পল ভালেরী। এ ছাড়া সিম্বলিস্ট কবিদের মধ্যে গুস্তাভ কান্ সমেত আরও কয়েকজন নিয়মিত আসতেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মালার্মের 'টিউজডে ইভনিংস'-

এর অনুকরণে একসময়ে ইয়েটস্ লন্ডনে 'মানডে ইভনিংস' নাম দিয়ে একটি আড্ডা বসিয়েছিলেন। সরোজিনী নাইডু ইংলন্ডে বাসকালে এ আড্ডায় মাঝে মাঝে গিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইয়েটস্ তাঁর স্মৃতিকথায় তাঁকে 'লিটল সরোজিনী অব হায়দরাবাদ' বলে উল্লেখ করেছেন।

সরোজিনী নাইডুর নামটি উল্লেখ করা মাত্র খেয়াল হল যে, আড্ডার খোঁজে কখন আমি দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছি। বাংলা দেশে থাকতে আড্ডার জন্য অন্যত্র যাবার প্রয়োজন কি? আড্ডার ব্যাপারে পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি বাঙালির সমকক্ষ বলে আমি মনে করি না। আর সাহিত্যের আড্ডার কথাই যদি বলেন তাতেও বাঙালি কারও তুলনায় পিছিয়ে নেই।

ইংরেজিয়ানার যুগ ছিল বলে মধুসূদন তাঁর সাহিত্যসাধনায় সঙ্গী সাথি তেমন পান নি। তাঁর মধুচক্রে মক্ষিকা বলতে তিনি ছিলেন এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু অনতিকাল পরে বঙ্কিমের যুগেই দেখা যায় সাহিত্যের অঙ্গনে ভিড় জমতে শুরু করেছে! বঙ্কিমের কাঁঠালপাড়ার বাড়িতেই মাঝে মাঝে বড়ো রকমের আড্ডা বসত। সে আড্ডার প্রাণপুরুষ ছিলেন সঞ্জীববাবু; তিনি মজলিশি স্বভাবের মানুষ ছিলেন। যৌবনকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সে মজলিশে যাতায়াত ছিল। সাহিত্যকে তখনও কেউ পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন নি, নেশা হিসাবেই নিয়েছেন। নেশা যে জিনিসেরই হোক, একা একা ঠিক জমে না। নেশাখোরদের সঙ্গী চাই, চেলা চাই, দল চাই। ক্রমে এখানে-ওখানে দল বা আড্ডা গড়ে উঠতে লাগল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে কোনো সাহিত্যপত্রিকাকে ঘিরে এ সব আড্ডা গড়ে উঠেছে। বাস্তবিক পক্ষে সাহিত্যিক আড্ডা বলতে যা বোঝায় এদেশে তার জন্ম 'ভারতী' পত্রিকাকে ঘিরে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে অনেক হাত ঘুরে 'ভারতী' এল অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্ক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে। অল্প দিনের মধ্যেই মণিলালকে ঘিরে জমে উঠল তাঁর কান্তিক প্রেসে এক জমাট আড্ডা। এ আড্ডার প্রধান প্রধান পাণ্ডারা ছিলেন সত্যেন দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু রায় (আর্টিস্ট), অমল হোম, সৌরীন মুখার্জি (অন্যতম সম্পাদক), হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি। পুরোনো দিনের 'প্রবাসী'র সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তাঁদের স্মরণ থাকতে পারে যে, 'প্রবাসী'তে বেতালের বৈঠক নামে একটি বিভাগ ছিল; উপরে একটি ছবি থাকত — জনকয়েক ব্যক্তি বসে আড্ডা দিচ্ছেন। একটু অনুধাবন করে দেখলে আড্ডাধারীদের চেনাও যেত। ছবিটি এঁকে দিয়েছিলেন 'ভারতী' আড্ডার আর্টিস্ট চারু রায়। ফলে ভারতীর বৈঠকটিই 'প্রবাসী'র পাতায় বেতালের বৈঠক হয়ে দেখা দিয়েছিল। 'ভারতী' একদিন উঠে গেল। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সত্যেন দত্ত উভয়েরই অকাল মৃত্যুতে আড্ডাও গেল ভেঙে। ইতিপূর্বে 'সবুজপত্রের' জন্ম হয়েছে। রবীন্দ্রনাথই প্রধান সহায়, সত্যেন দত্তও আছেন উৎসাহী সভ্য হিসাবে। তা হলেও প্রমথ চৌধুরী কিছু নতুন প্রতিভা আবিষ্কার করেছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সুলেখক সুপণ্ডিত অতুল গুপ্ত, নবীন যুবক প্রতিভাধর সত্যেন বসু এবং বহু অধ্যয়নে সমৃদ্ধ ধূর্জটি মুখোপাধ্যায়। ওমর খৈয়াম-এর অনুবাদক কান্তি ঘোষকেও তিনি পাঠক সমাজে পরিচিত করিয়েছিলেন। আর ছিলেন হারীতকৃষ্ণ দেব।

কিরণশঙ্কর রায়কে যাঁরা কেবল রাজনৈতিক নেতা হিসাবেই জানেন তাঁরা শুনে অবাক হবেন যে, এক সময় তিনি সবুজপত্রের বৈঠকে একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন, গল্প লিখতেন। তাঁর একটি গল্পগ্রন্থ পরে প্রকাশিত হয়েছিল। সকলেই জানেন স্বয়ং ইন্দিরা দেবী 'সবুজপত্র' লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

সাহিত্যের আসরে লোক সমাগম শুরু হয়েছে কিন্তু আসর তখনও সরগরম হয় নি। 'সবুজপত্রের' দল মনে-প্রাণে সবুজ এবং সজীব হলেও তাঁরা বয়সে অপেক্ষাকৃত পরিণত, বুদ্ধিতে শাণিত, বাক্যে সংযত। এজন্যে তাঁরা দলে তেমন ভারী হতে পারেন নি। 'সবুজপত্রের' পরে যাঁরা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন তাঁরা বয়সে নিতান্তই নবীন — অধিকাংশই কুড়ির কোঠায়। এঁরা সব জমায়েত হলেন 'কল্লোল', 'কালি কলম'-এর আসরে। নবীনের স্বভাবে উত্তাপ উত্তেজনা একটু বেশিই থাকে। এঁরা যখন সরবে সদর্পে যৌবন ঘোষণা করেছেন সেদিনের প্রবীণেরা অনেকেই তখন হেসেছেন। নবীনকে যৌবনকে সহজে আমরা মেনে নিই না। কিন্তু যৌবনের শক্তি মানা না মানার ধার ধারে না, নিজের জয়ধ্বনি নিজেই করতে থাকে। কাজেই 'কল্লোলে'র কলরোল সেদিনের অন্য সব সাহিত্যিক কণ্ঠকে ছাপিয়ে উঠল। আতিশয্য অবশ্যই ছিল; কিন্তু এ-কথা মানতেই হবে যে, 'কল্লোল' একটা প্রচণ্ড শক্তিকে release করে দিয়েছিলেন। সে শক্তি সেদিনের পাঠকসমাজে ছিল অচেনা, অজানা। লেখকেরা প্রায় সকলেই অজ্ঞাতকুলশীল; তখনকার পরিচিত প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকায় সহজে এঁদের ঠাঁই হত না, বহুদিন বহির্দ্বারে অপেক্ষা করতে হত। 'কল্লোল' সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ এবং তাঁর সহযোগীরাও সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা নেই। এর প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে চল্লিশের দশকে দেখা গেল তখন যাঁরা আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁরা অধিকাংশই 'কল্লোল' ঘরানার লেখক। তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, নজরুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, মনীশ ঘটক — এঁরা সকলেই 'কল্লোল' গোষ্ঠীভুক্ত। অমিট রায়ে একটি মাত্র নিবারণ চক্রবর্তীকে লোকসমক্ষে এনে হাজির করেছিলেন। দীনেশরঞ্জন বহু প্রতিভাকে পাঠকসমাজে পরিচিত করেছেন এবং কেউ নিবারণ চক্রবর্তীর ন্যায় অলীক নয়। প্রকৃতপক্ষে দীনেশরঞ্জনের ন্যায় সম্পাদককেই বলা চলে অনাগত বিধাতা, তাঁর মুখেই শোভা পায় — আনিলাম অপরিচিতের নাম ধরণীতে/পরিচিত জনতার সরণীতে। এ যাবৎ যত আড্ডা জমেছে তার মধ্যে কল্লোলের আড্ডাটিই ছিল সর্ববৃহৎ। সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে এঁরা সত্যি সত্যি প্রাণ ভরে আড্ডা দিয়েছেন। হইচই করেছেন, অপরপক্ষে লোকগঞ্জনা সয়েছেন; কিন্তু আনন্দে ছিলেন সে আনন্দই সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে। আগেই বলেছি, আতিশয্য ছিল। তাতে কিছু এসে যায় না, যা ঝরবার তা আপনি ঝরে যায়, যা খাঁটি সেটুকুই টিকে থাকে। আজ পর্যন্ত যা টিকে আছে তারও পরিমাণ — কিছু কম নয়।

ঐ যে আতিশয্য বলেছি তারই জন্যে একটা বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। বিষয়বস্তু তো বটেই, লেখার ঠাটঠমকও অনেকের পছন্দ হয় নি। এঁরা কয়েকজন মিলে 'শনিবারের চিঠি' নামে একটি ক্ষুদ্রকায় পত্রিকা প্রকাশ করলেন। তাতে রঙ্গব্যঙ্গ করে নব্য লেখকদের লেখা নিয়ে নানা মন্তব্য করা হত। লেখায় ধার ছিল, 'শনিবারের চিঠি'ও জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

ওদিকে 'কল্লোল'-এর কলরব যত বাড়তে লাগল 'শনিবারের চিঠি'র কলেবর সে পরিমাণে বৃদ্ধি পেল। শনি-মণ্ডলের প্রধান ছিলেন সজনীকান্ত দাস। সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন যোগানন্দ দাশ, অশোক চট্টোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি, প্রায় সকলেই ছদ্মনামে লিখতেন। কিছুকাল পরে এসেছেন প্রমথনাথ বিশী। বনফুল দূরে থেকেও এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বেশ বড়ো রকমের একটি আড্ডা জমে উঠেছিল। আড্ডাধারীরা কেবল যে সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের নিয়ে রঙ্গরসিকতাই করতেন এমন নয়, এঁদের মধ্যে অনেকে নিজেরাই সুসাহিত্যিক ছিলেন। লোকে বলে কাকে কাকের মাংস খায় না; কিন্তু সাহিত্যিকরা একে অন্যকে ছিঁড়ে খেতে পারেন। দুই বিরুদ্ধ শিবিরে সাহিত্যিক লড়াই খুব জমে উঠল। এতে ক্ষতি কিছুই হয় নি — 'কল্লোল' গোষ্ঠীও তাঁদের স্বধর্ম ত্যাগ করেননি, 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণাত্মক লেখনীও নিষ্ফল হয়নি। বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ বা স্যাটায়ার রচনার শক্তি এর ফলে অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে।'শনিবারের চিঠি'র কোনো কোনো রচনা সাহিত্যিক প্রসাদগুণে অতিশয় উপভোগ্য হত। সুখের বিষয়, পরে দেখেছি উভয় পক্ষের প্রধানরা যখন স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তখন পুরোনো দিনের তিক্ততা খুব একটা তাঁরা মনে রাখেননি।

এর পর উল্লেখযোগ্য সমাবেশ 'পরিচয়'-এর আড্ডায়। সকলেই সাহিত্যিক এমন নয়, কিন্তু প্রত্যেকে সাহিত্যরসিক। একটি অতি বিদগ্ধ বন্ধুমণ্ডলী, 'সবুজপত্রে'র আড্ডাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'পরিচয়' নামের মধ্যেই পত্রিকার পরিচয়। উদ্দেশ্য ছিল পাঠক সমাজের দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করা, বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে তাকে পরিচিত করা। শুধু সাহিত্য নয় — সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি সকল ক্ষেত্রে পৃথিবীর যেখানে যে নতুন চিন্তার উদ্ভব হচ্ছে তারই সঙ্গে বাঙালি মনের যোগসাধনের অভিপ্রায় ছিল। কেন্দ্রব্যক্তিটি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত — বিশ্বসাহিত্যে তার অবাধ সঞ্চরণ। সুযোগ্য সহচর ছিলেন — গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, প্রবোধচন্দ্র বাগচি, নীরেন রায়, হিরণ সান্যাল, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, সুশোভন সরকার, বসন্তকুমার মল্লিক, তুলসী গোস্বামী, অপূর্ব চন্দ এবং আরও অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। শুনেছি সাহেদ সুরাবর্দী মাঝে মাঝে আসতেন। এঁরা সকলেই বিদ্বান, বিদগ্ধ ব্যক্তি। সকলেরই অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধিৎসা সুবিস্তীর্ণ। আমার এক বন্ধু-মুখে শুনে রোমাঞ্চিত বোধ করেছি যে, সরোজিনী নাইডু কখনো-সখনো এ আড্ডায় এসে যোগ দিয়েছেন। নাইডু প্রথম শ্রেণীর আড্ডাধারী, রাজনীতিতে আকণ্ঠ নিমগ্ন, কিন্তু সাহিত্যিক আড্ডার আহ্বান পেলে লোভ সংবরণ করতে পারতেন না আর উপস্থিত হলে তিনি একাই একশো। বাক্যচ্ছটায় সভাকক্ষ চমকিত, আলোকিত, উদ্ভাসিত হত।

'দেশ' পত্রিকার অনুরোধে আড্ডাকাহিনি লিখতে বসেছি। ভাবছি, 'দেশ' পত্রিকার জন্মাবধি ওখানেই তো অবিশ্রান্ত একটি আড্ডা চলে আসছে। আমি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সে আড্ডার সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের অনেকের সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎপরিচয় নেই, কিন্তু লেখক হিসাবে তাঁরা সকলেই আমার জ্ঞাতিভ্রাতা। আমি নিজেকে 'দেশ' ব্রাদারহুড-এর অন্যতম সভ্য বলে গর্ব অনুভব করি। ইদানীং দেখছি সাহিত্যপত্র ছাড়াও আমাদের সবকটি সংবাদপত্র জাল পেতে সাহিত্যিক ধরছেন। আজকের সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই

সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত। এর ফলে সাংবাদিকতার যদি শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহলে সুখের কথা। কিন্তু একটু আশঙ্কাও আছে। সংবাদপত্র স্নায়ু উত্তেজক রোমাঞ্চ এবং চাঞ্চল্যের কারবারি। খবর মাত্রই তার কাছে জবর খবর। চঞ্চলা যদি দিনের পর দিন চোখ ধাঁধাতে থাকেন তাহলে সাহিত্যিকেরও মতিভ্রম হতে পারে;মুনিদেরই মতিভ্রম হয়। তবে সংবাদপত্রের সঙ্গে একটি করে যে সাহিত্যপত্র যুক্ত হয়েছে, এটা একটা বাঁচোয়া। তাঁদের পক্ষে এটি একটি স্বচ্ছন্দ বিচরণভূমি। যাক, কথায় কথায় অবান্তর কথা এসে গেল। তা আড্ডার কথা বলতে গেলে এমন এক-আধটু হবেই।

পত্র-পত্রিকার আড্ডা সম্বন্ধে আমি প্রধান প্রধান কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করেছি। এছাড়াও আরও কত ছোটো বড়ো পত্রিকার দপ্তরে হয়তো কত আড্ডা জমেছে আমি যার খবর রাখি না। আমি না জানলেও এ-সব আড্ডা যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ভবনে একসময়ে নব্য কবিরা অনেকেই জমায়েত হতেন এবং সে আড্ডা কতখানি উপভোগ্য হত তা অনুমান করা কঠিন নয়।

পত্রপত্রিকার আস্তানা ছাড়াও কিছু কিছু আড্ডা হয়েছে যা একসময়ে বাঙালি জীবনকে বহুল পরিমাণে শ্রীমণ্ডিত করেছে। বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে এদের স্থান অবিস্মরণীয়। দু-একটির কথা বলছি। সুকুমার রায়, বিলেত থেকে ফিরে এসে একটি ক্লাব স্থাপন করেছিলেন — নাম 'মানডে ক্লাব'। সভ্যবৃন্দ সকলেই সুপরিচিত — সত্যেন দত্ত, অজিত চক্রবর্তী, অতুলপ্রসাদ সেন, কালিদাস নাগ, প্রশান্ত মহলানবিশ, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, অমল হোম, সুবিনয় রায়, শিশিরকুমার দত্ত প্রভৃতি। মাঝে মাঝে আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথও মানডে ক্লাবের বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন। একবার সদ্যলেখা 'পয়লা নম্বর' গল্পটি ক্লাবের বৈঠকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। আমি পূর্বে যে ডাবলিউ. বি. ইয়েট্স্-এর 'মানডে ইভনিংস'-এর কথা বলেছি, জানি না সে নামের সঙ্গে সুকুমার রায়-এর 'মানডে ক্লাব'-এর কোনো যোগ আছে কি না। সুকুমার রায় অবশ্য রগড় করে বলতেন মণ্ডা ক্লাব। সত্যেন দত্ত কবিতা লিখেছিলেন — আমাদের এই মণ্ডা সম্মিলন। বেশ বোঝা যায় আড্ডা যতখানি উপভোগ্য ছিল, আহারের ব্যবস্থা ততখানি। এ জাতীয় আরেকটি আড্ডাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আড্ডাটি বসত পার্শিবাগানে গিরীন্দ্রশেখর বসুর বাড়িতে। এটির নাম ছিল উৎকেন্দ্র সমিতি। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন রাজশেখর বসু, গিরীন্দ্রশেখর বসু, যতীন্দ্রকুমার সেন, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা ছাড়াও হয়তো অনেকে ছিলেন। সকলের কথা আমার জানা নেই। বিরিঞ্চি বাবার কাহিনিতে রাজশেখরবাবু পরোক্ষভাবে এ আড্ডাটির উল্লেখ করেছেন। শুধু ১৪ নম্বর পার্শিবাগান বদলে ১৪ নম্বর হালসিবাগান করে দিয়েছেন।

এম. সি. সরকারের দোকানে সুধীর সরকারের আড্ডায় অনেকে আসতেন। এক সময়ে শরৎ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এবং তখনকার দিনের অন্যান্য সাহিত্যিকরা সেখানে আড্ডা জমাতেন। শুনেছি সেখানকার আড্ডা এখনও অব্যাহত আছে। প্রবাসীর কেদার চট্টোপাধ্যায় জীবনের শেষ পর্বেও আসা-যাওয়া করেছেন। যাক্, অনেক আড্ডার কথা বলা হল, কিন্তু আরেকটি আড্ডার কথা না বললে আমার ঠিক তৃপ্তি হবে না, সেটি

শান্তিনিকেতনের আড্ডা। রবীন্দ্রনাথ যখন কলকাতা এবং শিলাইদহ ছেড়ে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন তখন সঙ্গে পার্থিব উপকরণ বিশেষ কিছুই আনেন নি। খড়ের ঘরে গাছের তলায় বিদ্যালয় বসালেন। কিন্তু একটি জিনিস সঙ্গে আনতে ভোলেন নি, সেটি তাঁর স্বভাবগত আড্ডাপ্রিয়তা। তরুণ অধ্যাপকদের নিয়ে আড্ডা জমালেন। নিজে যে রসসৃষ্টির কাজে লিপ্ত ছিলেন, সেই রসের ভোজে তরুণদের নিত্য ডেকে নিতেন। রসবোধ জিনিসটা ছোঁয়াচে, একবার জাগিয়ে দিতে পারলে ভেতরে ভেতরে ক্রিয়া করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এরা অনেকেই নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী লেখার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। সতীশ রায়, অজিত চক্রবর্তী, জগদানন্দ রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমার রায় — কম বেশি সকলেই কিছু করেছেন এবং খ্যাতিলাভও হয়েছে। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার যুগে আড্ডা আরও বেশিই জমেছিল। সে আড্ডা বিদ্যাবুদ্ধির চর্চায় যেমন সমুজ্জ্বল, রঙে রসে, সুরে তালে তেমনি ঝলমলে এবং সে কারণে রসসৃষ্টির সহায়ক। শান্তিনিকেতন ঠিক এ সময়েই খাঁটি সাহিত্যিকদের জন্ম দিয়েছে। এঁরা হলেন সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রমথনাথ বিশী এবং রাণী চন্দ। তিনজনেরই সাহিত্যকৃতি শান্তিনিকেতনের আড্ডাজাত। তিনজনই বাংলা সাহিত্যে নিজ নিজ আসন পাকা করে নিয়েছেন। এর কিছু পরেই অধ্যাপনার কাজে এসেছেন লীলা মজুমদার। তাঁর সাহিত্যকর্মেও একটি আড্ডার আমেজ আছে; এর খানিকটা তিনি নিঃসন্দেহে শান্তিনিকেতন থেকে পেয়েছেন। আজ তিনিও বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কয়েকটি সুবিখ্যাত সাহিত্যিক আড্ডার কথা বলা হল। আমি অতি সংক্ষেপে রূপরেখাটুকু মাত্র বর্ণনা করেছি। পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবই নয়। যাঁরা এসব আড্ডার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন আদ্যন্ত ইতিবৃত্ত তাঁরাই লিখেছেন। এটুকু বলতে পারি এ-সব আড্ডার পূর্ণ বৃত্তান্ত পরপর জুড়ে দিলে রবীন্দ্রযুগ থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বহু সুখ-স্মৃতি-বিজড়িত একটি অতি আনন্দোজ্জ্বল প্রতিকৃতি পাওয়া যাবে। ছাত্রপাঠ্য সাহিত্য-ইতিহাসের তুলনায় এটি ঢের বেশি উপভোগ্য হবে। আমি যে অতি সংক্ষেপে বলতে গিয়েছি তার অসুবিধা হল বহু নামজাদা নাম হয়তো বাদ পড়ে গিয়েছে, পূর্ণ বিবরণে সকলকে পাবেন। এমনও হতে পারে এক আড্ডার মানুষকে আমি অপর আড্ডায় জুড়ে দিয়েছি;তাতে তথ্যের ত্রুটি থাকলেও তত্ত্বের হিসাবে কোনো ভুল হবে না, এঁরা সকলের আড্ডাধারী সাহিত্যিক। এ প্রবন্ধের সেটিই আসল প্রতিপাদ্য বিষয়। আর এক-আধটু ভুল হলই বা, নইলে আর আড্ডা কি? আড্ডার স্বভাবই ঐ; সে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাবে, উল্টো পাল্টা, আবোল-তাবোল বকবে তবে আড্ডা জমবে, রসসৃষ্টি তাই থেকেই হবে। আড্ডার কাহিনি আমি আড্ডার মেজাজেই বলেছি।

সাহিত্যের আড্ডাকে ঠিক বুঝতে হলে সাহিত্যের স্বভাবটিকে বুঝতে হবে। শিল্প-সাহিত্যের স্বভাবটা মিশুকে ধরনের। সাহিত্য কথাটির উৎপত্তি থেকেই বুঝতে হবে যে, অপরের ‘সহিত’ সে মিলনপ্রত্যাশী। প্রকাশের ব্যগ্রতা সকল শিল্পের স্বভাবগত। চিত্রশিল্প নিজেকে প্রকাশ করে রেখায়, রঙে; সংগীত আপনাকে প্রকাশ করে সুরের আলাপে,

সাহিত্য কথার আলাপে। চিত্রশিল্প চায় দর্শক, সংগীত সাহিত্য চায় শ্রোতা। তিনজনেরই সঙ্গ চাই, সংসর্গ চাই। নইলে কাকে দেখাবে, কাকে শোনাবে? শিল্প-সাহিত্যের প্রাণবস্তু বলতে আমাদের রস কথাটি যেমন অর্থবহ, অন্য কোনো ভাষায় ঠিক এমনটি আছে কি না আমি জানি না। রস বলতে আমরা এমন কিছু বুঝি যার মধ্যে একটা টলটলে তরলতার ভাব আছে। যে জিনিস তরল সে জিনিস স্বভাবতই সচল। এক জায়গায় স্থির থাকে না। সে চলতে থাকে একের কাছ থেকে অপরের কাছে। যিনি সুর সৃষ্টি করেন, তিনি সুরটি অপরের গলায় তুলে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। যিনি কবিতা রচনা করেন কিংবা কোনো প্রকারের রসরচনা — সেটি অপরের কানে তুলে দিতে পারলে তবে তাঁর তৃপ্তি। একই বলে রসের সচলতা। এক মন থেকে অপর মনে তার গতি এবং এটিই তার সদ্‌গতি।

অনেক আড্ডার কাহিনি বললেও আমি আড্ডার ইতিহাস লিখতে বসিনি, আমি বলতে চেয়েছি আড্ডার ফিলজফি, অর্থাৎ আড্ডার প্রকৃত ধর্ম এবং মহিমা বর্ণনাই আমার উদ্দেশ্য। মানুষ ঘর-সংসার করে — আপিস-আদালত, হাট-বাজার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে দিন কাটে। এ হল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, এর মধ্যে কোনো নতুনত্ব নেই। দিনের পর দিন একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি। সেখানে মানুষটা আটপৌরে। কিন্তু যে মানুষ শৌখিন, সে নিত্যকার আবেষ্টন থেকে মুক্তির অবকাশ খোঁজে। সে গল্প-গুজব করে, তাস-পাশা খেলে গান-বাজনা করে, নাটকের মহড়া দেয়। শুধু প্রয়োজন সাধনের দ্বারা তার মনের খিদে মেটে না। মানুষটার মধ্যে কিছু একটু উদ্বৃত্ত আছে, সেই উদ্বৃত্তটুকু প্রকাশের জন্যে সে ব্যাকুল। আমরা যাকে মানুষের গুণ হিসাবে গণনা করি, তার সবটুকুই সেই উদ্বৃত্তের প্রকাশ। কাব্য-সাহিত্য, শিল্প-সংগীত সমস্তই মানুষের উদ্বৃত্তের সাধনা। সকল মানুষ শিল্পী-সাহিত্যিক হয় না। কিন্তু আড্ডা মানুষের নিজ নিজ গুণপনা প্রকাশের একটা ক্ষেত্র। সেজন্য উন্নত এবং বিদগ্ধ সমাজে আড্ডার মস্তবড় স্থান।

আড্ডা জিনিসটা grease-এর কাজ করে। মনের চাকাটা ঘোরে সহজে, স্বচ্ছন্দে। যে-কোনো সৃজনশীল কাজে মনের flexibility চাই, মনটাকে যেমন ইচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা ঘোরানো ফেরানো চাই, নইলে ক্যাঁচম্যাচ শব্দ যতখানি হবে, চাকা ততখানি ঘুরবে না। মনের মধ্যে মরচে ধরে যায়, সে মন নিয়ে সৃষ্টির কাজ চলে না। আড্ডার আসরে যে আলোচনা সেটা শিল্পসাহিত্যের হোক, রাজনীতির হোক, তার মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত সহজের আমেজ আছে। সে জিনিসই যখন অধ্যাপনার আওতায় আসে তখন তার কি গলদঘর্ম মূর্তি। তাকে তখন বাংলা মতে বলা যায় হয়রানি আর ইংরেজি মতে অদৃষ্টের আয়রনি। সাহিত্যের আড্ডা এবং সাহিত্যের অধ্যাপনা দুটির সঙ্গেই আমার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। একটির পরিবেশ যতখানি সরস, অপরটি ততখানি নীরস। একটি বলে, আরও পাই তো আরও শুনি, অপরটি বলে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

সাহিত্যের আড্ডাকে আমি বলি সাহিত্যের লেবরেটরি। কত রকমের গল্প গুজব, হাসিতামাশা, আবোল-তাবোল আলোচনা হয়। কিন্তু এরই মধ্যে একটা আচমকা বলা কথা হয়তো কোনো কবিতার ভ্রূণ হিসাবে কাজ করে কিংবা কোনো গল্পের খেই ধরিয়ে দেয়।

বিদগ্ধজনের আড্ডায় লঘুগুরু কত বিষয়ের আলোচনা হয়। পরে কোনো রসিকজনের হাতে সেটিই সুলিখিত প্রবন্ধের আকার ধারণ করে। আড্ডা বহু লেখককেই কাঁচা মালের জোগান দিয়েছে। আড্ডায় বসে প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক নানা কথাই চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে গিয়েই বলেছেন, "প্রাপ্য জিনিসের চেয়ে 'ফাউ' যেমন বেশি ভালো লাগে তেমনি অধিকাংশ সময়েই অপ্রাসঙ্গিক কথাটায় বেশি আমোদ পাওয়া যায়।" তবেই দেখুন, আড্ডার ধন কিছুই যাবে না ফেলা। অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলো বুনো হরিণের মতো চঞ্চল, দেখা দিতে না দিতেই প্রসঙ্গের তাড়নায় চকিতে পালিয়ে যায়। ওদিকে আবার প্রসঙ্গত ভব্য-শান্ত কথাগুলির মধ্যে বন্য হরিণের সৌন্দর্য এবং স্বাভাবিকতা থাকে না। কাজেই সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে ঐ চঞ্চলা বন্য হরিণীকেই ধরতে হয়।

সাহিত্যের ইতিহাস ঘেঁটেঘুঁটে যেটুকু দেখেছি তাতে মনে হয় যে সমাজ আড্ডা দিতে শিখেছে সে সমাজেই উঁচুদরের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। বাঙালি যে সাহিত্যে কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে তার মূল কারণ আড্ডায় তার স্বাভাবিক প্রবণতা। শুধু প্রবণতা বললে ছোটো করে বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে আড্ডার মধ্য দিয়েই বাঙালি প্রতিভা বিশেষভাবে বিকাশলাভ করেছে। সকল জাতির মধ্যে এ প্রতিভা নেই, এ গুণের চর্চাও নেই। প্রাচীন গ্রিস-এ এর চর্চা যথেষ্ট হয়েছিল। সক্রেটিসকে বলা হয় এর আদিগুরু। একদা এথেন্স নগরে সক্রেটিসকে ঘিরে যে আড্ডা জমেছিল প্লেটোর সাহিত্য সে আড্ডাজাত। সভ্যতার ইতিহাসে প্লেটো লিখিত সুসমাচার মথী লিখিত সুসমাচারের চাইতেও ঢের বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে।

বাঙালির বহু দোষ থাকতে পারে কিন্তু তার মহৎ গুণ সে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে এ গুণটির চর্চা করে এসেছে। বাঙালিকে লোকে বলে চাকুরিজীবী — শুনে আমার হাসি পায়। দেশের কটি লোক চাকুরি করে? বেশির ভাগই তো বেকার। তারা কী করে? তারা আড্ডা দেয়, ভাগ্যিস দেয়। চোখ মেলে ভালো করে একটু তাকালেই দেখবেন বাঙালি চাকুরিজীবীও নয়, কৃষিজীবীও নয়, শ্রমজীবীও নয় — সে আড্ডাজীবী। আড্ডা বিহনে জীবনধারণ তার পক্ষে সম্ভবই নয়। আজ কত শতাব্দী ধরে সে তার চণ্ডীমণ্ডপে আড্ডা জমিয়েছে। মনে পড়ছে আগে কখনও একটি প্রবন্ধে বলেছিলাম যে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চাইতে ঢের বড়ো বাঙালির চণ্ডীমণ্ডপ কাব্য। এখন গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ ক্রমে নীরব হয়ে আসছে, এটি ভালো লক্ষণ নয়। পল্লি মঙ্গল আসর যদি বেতারে হয় তাহলে তাল রক্ষা হবে কেন, চণ্ডীমণ্ডপই বা বাঁচবে কেমন করে? গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপের স্থান গ্রহণ করছে আজ নাগরিক জীবনের চা-এর দোকান এবং কফি হাউস। চণ্ডীমণ্ডপে আর কফি হাউস-এ যে তফাৎ পূর্বতন সাহিত্যে আর আধুনিক সাহিত্যে সেই তফাৎ। চণ্ডীমণ্ডপে দুনিয়াদারি ছিল কিন্তু দুনিয়ার আয়তন ছিল ক্ষুদ্র। কফি-হাউস-এর দুনিয়া বিশ্বব্যাপী কিন্তু দুনিয়াদারি শিথিল, আলোচনা বেশির ভাগ অনভিজ্ঞ উচ্ছ্বাস। চণ্ডীমণ্ডপ নারীবর্জিত; কিন্তু নারী ঘটিত ব্যাপারে বিচার নিষ্পত্তির দায় তার। কফি-হাউস-এ নরনারীর অবাধ গতিবিধি। সেখানে কেউ কারও বিচার করে না; কিন্তু একে অন্যের আচার আচরণকে প্রভাবিত করে। সমাজে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সাহিত্যে তা প্রতিফলিত হয়।

যাক্ আড্ডাতত্ত্ব এখানেই শেষ করছি। বাঙালি-জীবন আজ নানা অভাবে পীড়িত। দিয়েথুয়ে বেশি কিছু আর অবশিষ্ট নেই। এই একটি জিনিসই এখনও আছে। আড্ডার মন মেজাজ এখনও অক্ষুণ্ণ আছে; কিন্তু নিষ্ঠার অভাব দেখা দিয়েছে। অতিরিক্ত রাজনীতি আমাদের আড্ডা-অন্ত চিত্তকে নিরন্তর বিক্ষিপ্ত করছে। তাতেই নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। পূর্ববৎ আড্ডার প্রতি একাগ্রচিত্ত হতে পারলে আমাদের বহু সমস্যার সমাধান আপনিই হয়ে যাবে। অতএব আমি বলি কি, সর্বধর্মান্ (রাজনীতিও) পরিত্যাজ্য, আসুন আমরা একমাত্র আড্ডার আশ্রয় গ্রহণ করি। যা দেবী সর্বভূতেষু আড্ডারূপেন সংস্থিতা — একমাত্র সেই দেবতাই আমাদের উপাস্য দেবতা হউক।

☐ *প্রবন্ধ সংকলন*, ১৩৯৫

মানবতন্ত্র

আবুল ফজল

জাতীয় আদর্শের ধারণা সকলের এক নয়। সাহিত্যিকের কাছে সত্যই বড়ো কথা। সত্যের সঙ্গে যদি জাতীয় আদর্শ, ধর্ম বা শাস্ত্রের বিরোধ ঘটে নিঃসন্দেহে বিনা দ্বিধায় সাহিত্যিক সত্যের পক্ষাবলম্বন করবে। সাহিত্যিকের যদি কোনো আল্লাহকে মানতে হয় তা হলে সে আল্লাহ হচ্ছেন — 'আল হক্কুন' অর্থাৎ যিনি হক বা সত্য। প্রচলিত অর্থে আল্লাহর গুণাবলি নিরানব্বই হোক কি তেত্রিশ কোটি হোক তাতে কিছু এসে যায় না — তা যে হক্ বা সত্যের রকমফের, এ উপলব্ধি যার নেই তার পক্ষে মুখে আল্লাহর নাম নেওয়া শয়তানের ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তিরই সমতুল্য। সত্যের এ বোধটুকু না থাকলে সাহিত্যিক যেমন হওয়া যায় না তেমনি হওয়া যায় না সাহিত্যের বিচারক বা সমজদার। প্রসঙ্গত বলতেই হচ্ছে আমার *রাঙ্গা প্রভাত* নামক উপন্যাস পড়ে জনৈক অধ্যাপক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে জাতীয় আদর্শবিরোধী, পাকিস্তানবিরোধী, ইসলামবিরোধী ইত্যাকার বহু সাংঘাতিক অভিযোগে বইটাকে সংবাদপত্রের পাতায় অভিযুক্ত করেও ক্ষান্ত হতে পারেন নি। শুনেছি, এ বিষয়ে তিনি প্রদেশের স্বরাষ্ট্র বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করবারও চেষ্টা করেছেন। জাতীয় আদর্শ খুব একটা মস্ত বড়ো বস্তু যদি হয়, তা হলেও জিজ্ঞাসা করা যায় তা রক্ষা ও ব্যাখার দায়িত্ব কি স্বরাষ্ট্র বিভাগের? ওই বিভাগের কর্মচারীদের ওই সম্পর্কে জ্ঞানের বা মূল্যায়নের দৌড়ই বা কতটুকু? সাহিত্যবিচারের ভার শেষ পর্যন্ত যদি স্বরাষ্ট্র বিভাগের ওপরই ন্যস্ত হয় তা হলে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হওয়ার কারণ ঘটে না কি? আশ্চর্য, সাহিত্য-শিল্পের ওপর স্বরাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় বলে, এরাই আবার সোভিয়েট রাশিয়ার নিন্দায় পঞ্চমুখ। এদের মতে, বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের যে ধর্ম মানবতার চেয়ে তা বড়ো। এ মত আমি বিশ্বাস করি না, মানিও না। কথাটা হয়তো *রাঙ্গা প্রভাত*-এ কিছুটা সোচ্চার হয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি জায়গায় যে অমানুষিক কাণ্ড ঘটে গেল তাতে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে। এ সবে যারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধার্মিকের অভাব ছিল না — এদের অনেকে হাতের ধারালো ছোরাটা উদ্যত করেছে ঈশ্বর ও আল্লাহর নাম নিয়েই। ঈশ্বর ও আল্লাহর পরিবর্তে এদের দিলে যদি কণামাত্রও মানবতার ছোঁয়া লাগত তা হলে এমন কাজ তাদের দ্বারা কখনও সম্ভব হত না। এদের সম্বন্ধেই বার্নার্ড শ'র বিখ্যাত উক্তি Beware of that man whose God is in heaven একটু বদলিয়ে বললে কথাটা আরও প্রত্যক্ষ হয়; যাদের আল্লাহ শুধু ঠোঁটে আর তসবিতে তাদের থেকে সাবধান।

ধর্ম আর সেক্যুলারিজম আজ স্রেফ মুখের বুলিতে পর্যবসিত। ধার্মিক না হয়েও ধর্মের নামে গদগদ হওয়া আর মনে সেক্যুলার না হয়েও সেক্যুলারিজমের নামে মুক্তকচ্ছ হওয়া তেমন কোনো বিরল দৃশ্য নয়। আজকের দিনে যদিও সেক্যুলারিজমের অর্থ করা হয় 'ধর্মনিরপেক্ষতা' — আসলে ওটাও একটা পোশাকি ধর্ম — সাম্প্রদায়িকতার আর একটি নতুন নাম। এও এক রকম 'মিটিংকা কাপড়া'। রাজনৈতিক বদলের বেশি এর কোনো মূল্য নেই। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ কি খুলনায় যারা অশান্তি ঘটিয়েছে তারাও তো ইসলাম ধর্মাবলম্বী, যে ইসলামের অর্থ শান্তি। ধর্মকে এ স্ববিরোধিতার হাত থেকে বাঁচাতে হলে মানুষের দৃষ্টি ধর্মেব দিক থেকে মনুষ্যত্বেব দিকে ফেরাতে হবে। কোনোরকম ধর্মতন্ত্র নয়, মানবতন্ত্রকেই করতে হবে আজ সব দেশের ও সব রাষ্ট্রের আদর্শ। ব্যক্তি বা সমাজজীবনেও এর থেকে বড়ো আদর্শ আমার মনের দিগন্তে আমি খুঁজে পাই না।

খাঁটি অর্থে কোনো ধর্মের পক্ষেই আজ তার নিষ্কলুষ আদি স্বরূপ রক্ষা করা সম্ভব নয় — সম্ভব নয় সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া — বিশেষ করে পাকিস্তান হিন্দুস্থানে। না পাওয়ার একটা বড়ো কারণ রাজনীতি আর ধর্ম আমাদের দুই দেশে আজ এক। বাজনীতিবিদের মুখে এখন ধর্মের যত বুলি শোনা যায় স্বয়ং ধর্মপ্রবর্তকদের মুখেও কোনো দিন তত ধর্ম বুলি শোনা যায় নি। কারণ, তাঁরা বুলির চেয়ে ধর্ম পালনে ছিলেন অধিকতর বিশ্বাসী। এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। বিজ্ঞানের অগ্রগতিও হয়তো অন্যতম কারণ। ধর্মের অনেক বিশ্বাস, যার সঙ্গে নৈতিক বোধ ও সামাজিক ন্যায়-চেতনা জড়িত তা আজ এক রকম ধূলিসাৎ। যা সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ নয়, তা আর মানুষকে প্রভাবিত করতে পারছে না। তাই সব রকম ধর্মীয় নীতিবোধ আজ শিথিল — ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন থেকে বিযুক্ত। ফলে যে-কোনো শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোক এখন দোজখের জল্লাদ থেকে তাঁর এলাকার থানার দারোগাকে অনেক বেশি ভয় করে থাকেন।

সাম্প্রতিক ইতিহাসে এটা খুব ভালোভাবেই দেখা গেছে যে, ধর্ম বা সেক্যুলারিজম কোনোটাই মানুষকে বাঁচাতে পারে না, পারে নি। কাজেই ধর্ম নয়, সেক্যুলারিজমও নয়, একমাত্র মানবতার ওপরই দিতে হবে জোর। ধর্মের কথা বললেই অনিবার্যভাবে অন্য ধর্মের কথা এসে পড়ে। সেক্যুলারিজমের সঙ্গেও বৈপরীত্যের কল্পনা অবিচ্ছিন্ন। যারা সেক্যুলার নয় তাদের শত্রু ভাবতে সেক্যুলারিজম বিশ্বাসীর মোটেও বাধে না। বামপন্থীদের কণ্ঠস্বরও আজ কিছুমাত্র আশাপ্রদ নয়। সম্প্রতি ভারতীয় লোকসভা ও পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় যে বিতর্ক দেখা গেল তা রীতিমতো আতঙ্কজনক।

কাজেই মানুষকে অমানুষিকতার হাত থেকে বাঁচাতে হলে মানবতাকেই করতে হবে একমাত্র অবলম্বন। কথা আছে, বাঘ বাঘের মাংস খায় না — কথাটা সত্য। বাঘও বাঘের বেলায় নিজেদেব সাধারণ ব্যাঘ্রত্ব সম্বন্ধে সচেতন। ব্যাঘ্রত্বে পরস্পর অভিন্ন। অতএব অবধ্য। মানুষকেও সচেতন করে তুলতে হবে সাধারণ মানবতা সম্বন্ধে। এখন ধর্ম আর সেক্যুলারিজমের ওপর জোর দিতে গিয়ে আমরা সাধারণ মানবতাকে শুধু খাটো নয়, প্রায় মুছে ফেলেছি আমাদের জীবন থেকে। আমরা নির্ভেজাল মুসলমান বা নির্ভেজাল হিন্দু কি না এ দাবিই আজ সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ। পাশাপাশি দুই দেশের দুই বৃহত্তর সমাজে আজ এ

দাবিই সবচেয়ে উদগ্র। নির্ভেজাল মানুষ হোক — এ স্বাভাবিক দাবি কোথাও শোনা যায় না — পরিবারে, সমাজে রাষ্ট্র সর্বত্র এ দাবি অনুপস্থিতিতেই বিশিষ্ট।

অন্য মানুষটাও আমার মতোই মানুষ — এ বোধ ও চেতনাকে ব্যাপক ও ব্যবহারিক করে তুলতে না পারলে মানুষের রক্ষা নেই। ধর্ম বা সেক্যুলারিজম মানবতার স্থান নিতে পারে না। প্রাণপণে দুই বিপরীত ধর্ম পালন করে কোথাও মিল হয়েছে — এমন নজির আমার জানা নেই। দুই ধর্মের দুই ধার্মিকের সত্যকার সখ্য বা আন্তরিকতাও বিরল ঘটনা — আত্মীয়তা তো অবিশ্বাস্য। হিন্দু মহাসভা আর জমা'আতে ইসলাম একই মঞ্চে মিলিত হয়ে একই কর্মসূচিতে হাত মেলাবে এ কল্পনার বাইরে। শুভবুদ্ধিওয়ালা কেউ কেউ যে বলে থাকেন, মুসলমান খাঁটি মুসলমান আর হিন্দু খাঁটি হিন্দু হলেই মিলন সহজ হবে — একথা আমার কাছে সোনার পাথরবাটি; বরং মানুষ যখন এবং যেখানে প্রচলিত মুসলমানিত্ব ও হিন্দুয়ানিকে ছাড়িয়ে গেছে সেখানে মিলন সহজ ও অবাধ হয়েছে। হিন্দু মুসলমানে যে কয়টা বৈবাহিক সম্পর্ক হয়েছে তাও এ দৃষ্টিভঙ্গির ফল। এটা মানবতার দিকেরই ইঙ্গিত। এ মনোভাব বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত হলে মিলন ও সহযোগিতার দিগন্ত বেড়ে যাবে। সযত্নে নিজের মুসলমানিত্ব কি হিন্দুয়ানিও রক্ষা করব এবং সঙ্গে সঙ্গে 'মানুষ' হিসেবেও বড়ো ও মহৎ হব — এ হয় না, যেমন হয় না নিজ নিজ পুকুরে গোসল করে সমুদ্র স্নানের স্বাদ পাওয়া। সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক ধর্মে আনুষ্ঠানিকতার বহর অনেক বেশি। ধর্মে ধর্মে বিরোধও সবচেয়ে বেশি এ আনুষ্ঠানিকতায়। অথচ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া ধর্মের স্বরূপ জনসাধারণের কাছে অবোধ্য। নিরাকার ঈশ্বরের মতো ধর্মের বৃহত্তর আদর্শ বা আবেদনও থেকে যায় ওদের কাছে তাই অনুপলব্ধ। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাই কে হিন্দু আর কে মুসলমান এ বোধটাকে খুব বড়ো করে তোলে। এর ফলে দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মৃত্যু ঘটে নি এবং সব রকম আনুকূল্য সত্ত্বেও কোনো রাষ্ট্রেই একটা সুসংহত জাতীয়তা গড়ে ওঠে নি। বলা বাহুল্য সাধারণ মানুষের কাছে অনুষ্ঠানই ধর্ম। ফলে যে-কোনো অজুহাতে এরা যখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে বা এদের উত্তেজিত করে তোলা হয় তখন ধর্মের নামে মানুষ হত্যায়ও এরা মনের দিক থেকে আর কোনো বাধা পায় না।

একবার এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : ধার্মিক আর সাহিত্যিকের পার্থক্যটা কোথায়?

উত্তরে বলেছিলাম, ধর্মগ্রন্থে যদি নির্দেশ দেওয়া থাকে যে, বিধর্মীকে কতল করলে তোমার জন্য বেহেস্তে সর্বোত্তম কামরাটি খাস রাখা হবে আর দেওয়া হবে তোমাকে সত্তর হাজার হুর (সংখ্যাটা কাল্পনিক নয়, এক ওয়াজের মজলিশে শুনেছিলাম), তাহলে ধার্মিকজন সুযোগ পেলে এ নির্দেশ পালন করতে কিছুমাত্র ইতস্তত করবে না। ইতস্তত করার বা পালন না করতে পারার একমাত্র অন্তরায় পার্থিব আইন — অধিকতর ও প্রত্যক্ষ পুলিশ। কিন্তু সাহিত্যিক এমন নির্দেশ শুধু যে পালন করবেন না তা নয়, বরং অবিশ্বাস্য বলে এমন নির্দেশকে তিনি তুড়ি মেড়ে উড়িয়ে দেবেন। মানুষ মেরে বেহেস্তে যাওয়ার কল্পনাই তাঁর চিন্তার বাইরে। স্বয়ং ঈশ্বর নেমে এসেও যদি তাঁকে এমন নির্দেশ দেন, সাহিত্যিক তেমন ঈশ্বরকেও নিজের লেখন-কক্ষ থেকে বের করে দিতে দ্বিধা করবেন না। ঈশ্বর নামধেয় কারও

পক্ষে এমন নির্দেশ দেওয়া সম্ভব — এ কথাটাই সাহিত্যিকের কাছে অবিশ্বাস্য। কিন্তু ধার্মিক তো সম্ভব-অসম্ভবের বিচার করে না। কারণ, ধর্ম আর শাস্ত্রীয় ব্যাপার নিয়ে বিচার করাটাই তার কাছে অধর্ম। তার একমাত্র অবলম্বন অন্ধ বিশ্বাস আর অন্ধ অনুসরণ। একজনের জন্য সত্তর হাজার হুর সম্ভব কি অসম্ভব, সম্ভব হলেও একত্রে অতগুলি হুর দিয়ে সে কী করবে এ সব অতি স্বাভাবিক ও সঙ্গত প্রশ্নও তার মনে উদয় হয় না — হলেও উত্তর সন্ধানে সে নিস্পৃহ অথবা শঙ্কিত। সে উত্তর যতই লজিক্যাল বা যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন, তার কাল্পনিক পরিণাম ভেবে সে আরও বেশি ভীত। যে মানুষ লজিক বা যুক্তির সম্মুখীন হতে ভয় পায়, তার কাছে মননশীলতা বা মুক্তবুদ্ধির চর্চা এক নিষিদ্ধ ব্যাপার। এমন মানুষকে সত্তর হাজারের পরিবর্তে সত্তর লক্ষ বললেও সে বিশ্বাস করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। হয়তো ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে আরও বেশি উৎফুল্ল, আরও বেশি বেপরোয়া ধার্মিক হয়ে উঠবে। যে মানুষ জীবনে একটা হুর সামলাতেই গলদঘর্ম, মৃত্যুর পর সে সত্তর হাজার সামলাবার অলৌকিক শক্তির অধিকারী হবে — এমনতর অদ্ভুত বিশ্বাসই সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ ও সম্মোহিত করে রাখে।

বলা বাহুল্য, সংসারে বা সমাজে অর্থাৎ জীবিতলোকে অলৌকিকতার বিন্দু-বিসর্গ মূল্যও নেই — এখানে যা কিছু মূল্য তা বাস্তব আর প্রত্যক্ষের। তাই যে অলৌকিকতার ওপর ধর্ম আর তার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলি দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে মানুষের মন ফিরিয়ে তাকে মানবতার দিকে — যে মানবতা বাস্তব, প্রত্যক্ষ, সামাজিক, ব্যবহারিক ও যুক্তিনির্ভর সে দিকে ফেরাতে হবে। মানবজাতির শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করছে এ সাধনা আর এর সাফল্যের ওপর। ব্যক্তি জীবনে মানুষ ইচ্ছা মতো নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠান পালন করুক তাতে কারও লাভ-লোকসান ঘটে না। কিন্তু বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাকে বড়ো করে তুললেই ঘটে মুশকিল, তখন এমন সব সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যার সমাধান এক কথায় 'বন্যহংস'। আজ পাকিস্তান আর হিন্দুস্থান-এ 'বন্যহংস' ধরার প্রতিযোগিতাই চলেছে। স্বাধীনতার পর এ দুই দেশে ধর্মানুষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি মশার বংশবৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে। অথচ এ দুই দেশে নৈতিক মান সব রকম পূর্বতন রেকর্ড ভঙ্গ করে অধঃপতনের পাতালপুরীর দিকেই আজ দ্রুতগতিতে ধাবমান। জীবনবিচ্ছিন্ন ধর্মচর্চার এ এক শোচনীয় পরিণতি। আমার বিশ্বাস ধর্ম সম্বন্ধে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। ধর্ম আজ অনেকের জীবনে অন্য পাঁচটা বৈষয়িক বস্তুর সামিল — পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার। অথচ এরা বাস্তব ও পার্থিব যুক্তি বিচারের কষ্টিপাথরে ধর্মকে যাচাই করতে নারাজ। ধর্ম আর ঈশ্বর সম্বন্ধীয় শব্দ ও নানা উক্তি বহু ব্যবহারে আজ এমন একটা নির্জীব অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তা মনে আর কোনো আবেদন বা উপলব্ধিরই চমক লাগায় না। চরিত্র ও নীতিবোধের পরিবর্তে তসবির জনপ্রিয়তা, মসজিদে মুসল্লির সংখ্যা বৃদ্ধি বা হরি সংকীর্তনে কণ্ঠস্বরের প্রতিযোগিতা মোটেও সামাজিক অগ্রগতির দিগ্‌দর্শন নয়। বরং এ যুগে ওটাও এক রকম Playing to the gallery. ওতে খেলায় জেতা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, মন্ত্রের আসল উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। আজ মন্ত্র পাঠ বা তস্‌বিহ্‌ তেলাওয়াত মননশীলতার সঙ্গে সম্পর্কহীন এক জড় ব্যাপারে পরিণত।

মুখে আরবি বা সংস্কৃত বুলি যতই উচ্চারিত হোক তার অর্থ কী, জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কতটুকু (জীবন মানে শুধু ব্যক্তিগত জীবন নয়, অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে যে জীবন) এ সব জিজ্ঞাসা যদি মনে কোনো ভাবনার সৃষ্টি না করে, ভেতরটা যদি কোনো নতুন তরঙ্গে সাড়া না দেয় তাহলে অমন উচ্চারণ অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও নির্ভুল হলেও নিষ্ফল শ্রম ছাড়া কিছুই না।

পৃথিবীর এখন বয়স হয়েছে, সভ্যতা সংস্কৃতিরও বয়স কম নয়, লিপিবদ্ধ ধর্মের আয়ুও কয়েক হাজার বছর। প্রাথমিক স্তরে জীবনধারণ বা সভ্যতার জন্য যেসব উপকরণ অত্যাবশ্যক বিবেচিত হত, আজ তার অনেক কিছু অকেজো বলে পরিত্যক্ত। সভ্য জীবনযাপনের জন্য তা আর অপরিহার্য মনে করা হয় না। তেমনি ধর্মেরও প্রাথমিক স্তরের অনেক কিছুই আজ জীবনের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে। ধর্ম জীবনও যে সামাজিক জীবন, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই তার যা কিছু মূল্য — এ বোধ না থাকলে ধর্ম জীবনবিমুখ হয়ে পড়তে বাধ্য। যেমন এখন হয়েছে। ব্যক্তিবিশেষ মৃত্যুর পর স্বর্গে গেল কি নরকে গেল তা মানবজাতির কিছুমাত্র দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। কিন্তু মৃত্যুর আগে লোকটা সৎ ও সামাজিক ছিল কিনা তা সব মানুষেরই ভাবনার বিষয়। কারণ, তার এ জীবনের সঙ্গে বহু মানুষের সুখ-দুঃখ জড়িত — জড়িত সামাজিক স্বাস্থ্য, শান্তি, নিরাপত্তা ও ভারসাম্য। স্বর্গের বা নরকের জীবন ব্যক্তিগত ও একক — ওই দুজায়গায় কোনো সামাজিক জীবন আছে বা থাকবে তেমন কথা কোনো ধর্মগ্রন্থেই উল্লেখিত হয় নি। কিন্তু এখানকার যে জীবন তা পুরোপুরি সামাজিক ও সমষ্টিগত। এ সামাজিক বা সমষ্টিগত জীবনের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই তেমন অশরীরী ব্যাপারকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিলে, আদর্শ ও লক্ষ্য করে তুললে বিভ্রান্তি ঘটাই স্বাভাবিক। জীবনে যারা জীবনকে ভালোবাসে না, ভালোবাসে মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবনকে, বলা বাহুল্য, এ হুর-পরিবর্জিত, দুধের নদ-নদীশূন্য পৃথিবী তাদের জন্য খুব উপযুক্ত বাসস্থান নয়। এ জন্যেই বলছি — যা পরকালের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ ধর্ম, তার ওপর জোর না দিয়ে যা এ জীবনের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ মানবতার ওপর জোর দেওয়া উচিত। মানুষের কল্যাণ এ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে জড়িত।

ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সামাজিকভাবে ধার্মিক হওয়ার যে আমি বিরুদ্ধে তা নয়। ধর্ম যদি মনুষ্যত্বের পরিপূরক বা নামান্তর না হয় তাহলে ধর্মে আর মনুষ্যত্বে পদে পদে সংঘর্ষ অনিবার্য। আমার বিশ্বাস, খাঁটি অর্থে যারা ধার্মিক তারা কখনও নিজের কি অপরের মনুষ্যত্বকে আঘাত হানতে পারে না — পারে না মানবতাকে কিছুমাত্র খাটো করতে। আমার বক্তব্য, নিছক আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের দ্বারা কেউ ধার্মিক হতে পারে না। যেমন, হতে পারে খাঁটি সাহিত্যিক স্রেফ পেশাদারি অধ্যাপনা করে। জীবনের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিটাই আলাদা হওয়া চাই — আর তা হওয়া চাই ব্যক্তির সমস্ত সত্তার সঙ্গে জড়িত। ভেতরে ধর্মবোধ না থাকলে আর বহু সাধনায় তাকে অন্তরঙ্গ করে তুলতে না পারলে সত্যিকার ধার্মিক হওয়া অসম্ভব বলেই আমার বিশ্বাস। ধর্মজীবনের ব্যাপ্তি সামাজিক জীবনে ছড়িয়ে না পড়লে তার মূল্যই বা কতটুকু? ব্যক্তিগতভাবে কোনো মানুষের কাছে যদি কোটি টাকাও থাকে তাতে সমাজের কী এসে যায়, যদি তার এক ভগ্নাংশও সমাজদেহে স্বাস্থ্য সঞ্চারে সহায়তা না করে? সমাজের দিক থেকে এর চেয়ে স্তূপীকৃত মৃত্তিকাখণ্ডের মূল্য অনেক বেশি। ঘরে বসে কোটিবার তসবিহ্ জপা আর কোটি টাকা সিন্দুকে

বন্ধ করে রাখা ব্যবহারিক দিক থেকে একই ব্যাপার — এ দুয়ের কিছুমাত্র সামাজিক মূল্য নেই। কোটি টাকা বা কোটি পুণ্যও তাই — সামাজিক মূল্যই এ দুয়ের মূল্য। আগেই একবার বলেছি, ব্যক্তিবিশেষ স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে তার আগাম দুশ্চিন্তায় কারও পক্ষে ব্লাড প্রেসার বাড়ানোর কোনো মানে হয় না।

মন্দিরে মসজিদে গির্জায় কে কী রকম আচরণ করে, সেজদায় গিয়ে কে দীর্ঘতর সময় কাটায় তা মোটেও বড়ো কথা নয়। কোনো মানুষ বত্রিশ আনা হিন্দু বা চৌষট্টি আনা মুসলমান কি খ্রিস্টান হলেও পৃথিবীর কোনো লাভ-লোকসান ঘটে না। কিন্তু বাইরে, অর্থাৎ সমাজে এবং পরিবারেরও যদি আট আনা মানুষও হয় তাহলেই পৃথিবী বেঁচে যায়। আজ পৃথিবী এমন মানুষের প্রতীক্ষায় — যে মানুষের একমাত্র অভীপ্সা মানুষ হওয়ার — মানুষের মতো আচরণ করার।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর তাবত পৃথিবীর মালিক। এসব কথা সামাজিক দিক থেকে স্রেফ হাওয়ায় বেলুন ওড়ানো। এর কোনো সামাজিক মূল্যই নেই। এতে কোনো সামাজিক তথা মানবীয় সমস্যারই সমাধান হয় না। এসব ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের অঙ্গ হতে পারে। কিন্তু কোনো বিশ্বাসই সামাজিক শান্তি বা শৃঙ্খলা আনতে সক্ষম নয়। তার এক বড়ো প্রমাণ, কোথাও শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিলে লোকে পুলিশ ডাকে, আল্লাহ্ বা ভগবান ডাকে না।

ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে আইনের শাসনে শৃঙ্খলাবদ্ধ না করলে তা সহজে পরস্বাপহরণের অজুহাত হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

একটা গল্প শুনেছিলাম।

এক ব্যক্তি প্রায়ই মসজিদ থেকে কোরান শরিফ চুরি করত আর চুরি করার সময় এভাবে সাফাই দিত আল্লাহর কাছে : আল্ আব্দু আবদুল্লাহ্, আল্ বায়তু বায়তুল্লাহ আল্ কালামু কালামুল্লাহ্ অর্থাৎ এ বান্দাও আল্লার বান্দা, এ ঘরও আল্লার ঘর, এ কোরানও আল্লার কালাম। অতএব (তার মতে) এতে কোনো অন্যায় বা পাপ নেই। অধিকতর সেয়ানা আর এক ব্যক্তি এটা টের পেয়ে একদিন লাঠি হাতে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখে শুনে ক্ষমা আজদ্যরবো জরবোল্লাহ্ অর্থাৎ মারটাও আল্লার মার বলে চোরটাকে বেদম লাঠি পেটা করে ছাড়ল।

মনে হচ্ছে, এ চোর এবং দণ্ডদাতা উভয়ে আল্লার সার্বভৌমত্বেই বিশ্বাসী। একই বিশ্বাসের লজিক বা যুক্তি দুজন মানুষকে কেমন পরস্পরবিরোধী কার্যকলাপে অনুপ্রাণিত করেছে তা দেখে রীতিমতো অবাক হতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লার সার্বভৌমত্বের এমন ধারা ধারণা যদি সামাজিক ও নাগরিক জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে, তাহলে অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? জগৎ সংসারের ওপর আল্লার সার্বভৌমত্বে যদি ভাবলোকে অর্থাৎ থিওরেটিকেলি স্বীকার করা হয় আর ব্যবহারিক জীবনে করা হয় সম্পূর্ণ অস্বীকার, তাহলে পদে পদে আত্মপ্রবঞ্চনা করাই হবে মানুষের নিয়তি। ব্যবহারিক জীবনে স্বীকার করা হলে কী দশা ঘটে তার নজির ওপরে উল্লেখিত চোর ও তার দণ্ডদাতা। মসজিদ বা কোরানের সংকীর্ণগণ্ডি ছাড়িয়ে অথবা একটা চোর ও একজন দণ্ডদাতার সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে এ ধারণা ও বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করলে আমায়

বিশ্বাস, সামাজিক জীবন আর জঙ্গলজীবনে কোনো পার্থক্যই থাকবে না। গৃহস্থ ও চোর উভয়েই যদি অন্তরের সঙ্গে পার্থিব ব্যাপারেও আল্লার সার্বভৌমত্ব মেনে নেয় আর তা প্রাত্যহিক জীবনে পরীক্ষা করতে শুরু করে, তাহলে অবস্থাটা যা দাঁড়াবে তা কল্পনা করতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন আইন বলে যদি কিছু থাকে তা একই সঙ্গে গৃহস্থ এবং চোর উভয়ে নিজ নিজ স্বার্থানুসারে নিজ নিজ হাতে তুলে নিতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করবে না। যেমন ওপরে বর্ণিত চোর ও দণ্ডদাতা করে নি। পার্থিব ব্যাপারে আল্লাহ ও ধর্মকে টেনে আনলে তা এমনি দুধারী করাত হয়ে উঠবে।

আমার বক্তব্য : যা অপার্থিব তাকে অপার্থিব থাকতে দিন — যা পার্থিব তাকে সর্বতোভাবে পার্থিবের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ রাখুন। অপার্থিবের তথা আধ্যাত্মিকের প্রেরণা ও তৃষ্ণা মানুষ যে একেবারে অনুভব করে না বা তার কোনো প্রয়োজন নেই তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, তা ব্যক্তিগত সাধনা ও উপলব্ধির ব্যাপার। তাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে টেনে আনায় আমার আপত্তি, টেনে আনলে শুধু সামাজিক জীবন নয়, আধ্যাত্মিক জীবনও নাজেহাল হয়। সামাজিক জীবন সম্পূর্ণ পার্থিব ব্যাপার — যে মানুষ নিয়ে সমাজ সে মানুষও আগাগোড়া পার্থিব। কাজেই অপার্থিবের দোহাই দিয়ে এমন সমাজকে শাসন পরিচালনা করতে গেলে তা ব্যর্থ হবেই। এ ব্যর্থতার নজির আজ সর্বত্র। কেতাবের ইসলাম আর জীবনের ইসলামের মাঝখানে আজ বিরাজ করছে এক প্রশান্ত মহাসাগর। সব ধর্মের বেলায় এ কথা সত্য।

মানুষের মধ্যে একটা সনাতন মেষ-বৃত্তি আছে। জিজ্ঞাসা ও মননশীলতার অভাব ঘটলে মনের সে মেষ প্রবৃত্তিটাই একক হয়ে ওঠে। তখন গতানুগতিকতা আর অন্ধ অনুসরণই চরম মোক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। গত কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণ করেছে, ধর্ম মানুষকে মানুষের হাত থেকে বাঁচাতে পারে নি। ধর্মযুদ্ধ কথাটাই একটা স্ববিরোধী উক্তি। ধর্মকে মানবতার ওপর স্থান দিতে গিয়েই মানুষ এ ধরনের বহু স্ববিরোধিতার শিকার হয়েছে। যার ফলে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে অপরিমেয় ধ্বংস নেমে এসেছে। আর এ ধ্বংসের পেছনে এক বড়ো ভূমিকা নিয়েছে পরকাল — সে পরকাল অদৃশ্য, অপ্রামাণ্য ও সম্পূর্ণ অপার্থিবকে পার্থিবের এলাকায় টেনে আনলে বিভ্রান্তি অনিবার্য। আল্লার সার্বভৌমত্বকে জাগতিক ব্যাপারে টেনে আনলে যে গোলকধাঁধার সৃষ্টি হয় তাতে প্রবেশের পথ পাওয়া গেলেও বের হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিজ্ঞান বা বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করে বিশ্ব ও মানবসৃষ্টি সম্বন্ধে যদি ধর্মীয় মতবাদও মেনে নেওয়া যায়, তাহলেও জাগতিক ব্যাপারে আল্লার সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ার বিপদ অনেক, যেমন অনেক বিপদ সন্তানের ওপর পিতা-মাতার সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ার। তাই কোনো ইসলামি রাষ্ট্রেও শেষোক্ত সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি পায় নি। স্বয়ং ইসলামের নবিও ওই ধরনের সার্বভৌমত্ব নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন তাঁর নবি জীবনের শুরুতে। অথচ আল্লার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের চেয়ে পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক অধিকতর প্রত্যক্ষ ও অধিকতর বাস্তব।

যে ধর্ম ইহকালে মানুষকে রক্ষা করতে পারে নি, পারছে না — সে ধর্ম পরকালে মানুষকে রক্ষা করবে এমন অলৌকিক বিশ্বাসে কেউ যদি স্বস্তিবোধ করেন তাতে আপত্তি

করার কোনো কারণ নেই; কিন্তু আমার আপত্তি হচ্ছে অলৌকিককে লৌকিক ব্যাপারে টেনে আনায়। বলা বাহুল্য, দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র — এ সবই লৌকিক ব্যাপার।

আর পরলোকে যদি কোনো 'প্রবেশিকা' পরীক্ষা হয় তা হলে মানুষের জন্য মনুষ্যত্বের পরীক্ষা না হয়ে ধর্মের তথা ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের পরীক্ষা হবে, তেমন বিশ্বাস মানববুদ্ধির অপমান। ঈশ্বরের অপমান আরও বেশি — কারণ তখন তাঁকে খাটো করে টেনে এনে বসানো হয় সুপরিচিত গুরুমশায়ের আসনে।

পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের আয় দায় অর্থাৎ assets and liabilities ভাগ-বাটোয়ারার সময় আল্লাহ নাকি পাকিস্তানেব ভাগেই পড়েছেন। তবে তখন তা আয় না দায় ভালো করে বোঝা যায় নি। এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে, পাকিস্তানের এ এক মস্ত বড়ো দায়। দোহাই — কথাটি আমার নয়, আমি মরহুম জাস্টিস কায়ানীর ভাষণ থেকেই চুরি করেছি। প্রমাণ হিসাবে এ প্রসঙ্গে তাঁর শেষ মন্তব্যটাও উদ্ধৃত করছি :

> Undoubtedly the Lord God is an asset when the nation is going to run, but in the name of the Lord God, the Beneficent, the Merciful, some of us are apt to develop a narrow pseudo-reli-gious outlook as though the Lord God belonged to us only and were not the Lord of the Universe, which is the true meaning of Rabbul Alamin. And that is how He is made a liability.
>
> –*Vide : Not the Whole Truth,* p.186.

বলা বাহুল্য, এ বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন স্বয়ং পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট। শুধু ভূমিকা নয় — কায়ানীর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন তিনি। এ liability বা দায় আমাদের শাসনতন্ত্রে শুধু নয়, সমাজের প্রতিস্তরেও অনুপ্রবেশ করে কী রকম আত্মপ্রবঞ্চনা ও বিড়ম্বনার কারণ হয়ে উঠেছে, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি: মাত্র কয়েক বছর আগেকার ঘটনা। পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির বার্ষিক সভা। ওই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সভাপতি চট্টগ্রামের প্রাক্তন কমিশনার মি. এন. এম. খান আই. সি. এস। কী কারণে সেবার তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি। সভাপতিত্ব করছেন সহ-সভাপতি পূর্ব পাকিস্তানের জনৈক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। সভার কাজ যথারীতি শুরু হয়েছে — কিছুদূর এগিয়েও গেছে। হঠাৎ একজন মুসল্লি মোত্তকি সদস্য বলে উঠলেন: স্যার, কোরান তেলাওয়াত হয় নি, কোরান তেলাওয়াতের পর সভার কাজ শুরু হওয়া উচিত।

সভাপতি বেকায়দায় পড়ে ইতস্তত করতে লাগলেন। সভার কাজ শুরু হয়ে গেছে, এখন হাঁ করা মানে কেঁচে গণ্ডূষ করা, না করা তো এক রকম অসম্ভব। কায়ানী সাহেব যে দায়ের কথা বলেছেন সে দায় রক্ষা না করে উপায় নেই। অগত্যা সভাপতি আমতা আমতা করে বললেন : আচ্ছা তেলাওয়াত করুন, আপনিই করুন। কয়েক মিনিটের জন্য কর্মসূচি মুলতবি রেখে তাই করা হল।

পরের বৎসর আবার সে একই প্রতিষ্ঠানের একই বার্ষিক সভা — একই স্থানে উপস্থিত

সদস্য — শ্রোতারাও, একই মুসল্লি মোত্তকি সদস্যরাও সদলবলে হাজির। কিন্তু ঘটনাচক্রে এবার স্থায়ী সভাপতি স্বয়ং এন. এম. খান উপস্থিত — তিনিই সভাপতিত্ব করছেন। এন. এম. খান দুর্দান্ত অফিসার — এ খবর সবারই জানা। পরিচিতদের সঙ্গে কুশল জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করে তিনি সভার কাজ শুরু করে দিলেন বিনা তেলাওয়াতে, বিনা ভূমিকায়। কেউ টুঁ শব্দটিও করলেন না। সে মুসল্লি মোত্তকি সদস্যটিও কোরান তেলাওয়াতের কথা এবার ভুলে রইলেন বেমালুম। নাচ গানে ভরপুর বিচিত্রানুষ্ঠানও কোরান তেলাওয়াত করে শুরু হতে দেখেছি। অকারণে ধর্মকে কোথায় টেনে আনা হচ্ছে এসব তারই দৃষ্টান্ত।

পাকিস্তানের অন্যতম চিন্তাবিদ মি. এ. কে. ব্রোহী তাঁর 'Religion and Freedom' প্রবন্ধটি শেষ করেছেন রবীন্দ্রনাথের এ বিখ্যাত উক্তি দিয়ে : 'I love God, because he has given me freedom to deny him' যে ঈশ্বর বা আল্লাহ্ গুরুমশায়ের প্রতীক সে ঈশ্বর থেকে এ ঈশ্বরের ধারণা ও উপলব্ধি কি অনেক বড়ো ও মহত্তর নয়? আল্লাহর এ মহত্ত্বের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত কম্যুনিস্ট দেশগুলি। ওরা তো ঈশ্বর, আল্লাহ্, গড কিছুই মানে না। তবুও আল্লাহ্ তাদের ক্রমোন্নতি আর সুখ সমৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করেছেন অথবা ওই সব দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের দেশ থেকে বেশি তেমন কথা এ যাবত শোনা যায় নি। যদি বলেন ওরা মজাটা টের পাবে পরকালে গিয়ে তাহলে অবশ্যই নিরুত্তর থাকতে হয়।

সব রকম অলৌকিকতার অস্তিত্ব মানুষের ধারণা ও উপলব্ধির ওপর নির্ভরশীল — ঈশ্বর এবং পরকালও। যা কিছু মানুষের ধারণা ও উপলব্ধির বাইরে তা শুধু অস্তিত্বহীন তা নয়, মানুষের জীবনে তার কোনো দামও নেই। যে-ঈশ্বর তাকে সুদ্ধ না মানবার স্বাধীনতা মানুষকে দিয়েছেন, সে ঈশ্বরের conception বা উপলব্ধি মানুষের প্রত্যয় ও আত্মমর্যাদার দিগন্তরেখা যে শুধু অবারিত করে দেয় তা নয়, মানুষকে নবতর চেতনা আর জিজ্ঞাসায়ও করে তোলে উদ্বুদ্ধ। এভাবে নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে এলেই মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্বের শাসন তথা মানবতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে সহজ। ধর্মের ওপর জোর দিতে গেলেই ঈশ্বরের আবির্ভাব অনিবার্য। আর ঈশ্বর মানে সাম্প্রদায়িক ঈশ্বর — পশ্চিমের বেলায় জাতীয় ঈশ্বর। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এক হলেও আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলের মতো আল্লাহ্, ঈশ্বর এবং গড নিয়েও কারও সঙ্গে কারও মিল নেই, মিল হবেও না। মুসলমানের আল্লাহ্ আর হিন্দুর ঈশ্বর এক নয়, তেমনি হিন্দুর ঈশ্বর আর খ্রিস্টানের গডও এক নয় — বুদ্ধ মানুষ হয়েও কোটি কোটি মানুষের আরাধ্য। এভাবে যেখানে মূলের পার্থক্য, সেখানে ব্যাখ্যা আর উপলব্ধিতে তারতম্য ঘটবেই। ফলে আচার-অনুষ্ঠানেও শুধু তারতম্য নয় — বিরোধও অনিবার্য। আর দেখা গেছে, অতি সহজে এ বিরোধ হয়ে ওঠে বারুদ। নীতিহীন, মনুষ্যত্বহীন রাজনীতি এ বারুদে অগ্নিসংযোগ করতে এক মুহূর্তও ইতস্তত করে না। ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের এটাই তো পটভূমি। কিন্তু মনুষ্যত্বের ব্যাপারে এ বিরোধ ও উপলব্ধির দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্য নেই বলে সহজে ওটাকে মানুষের স্থির মিলন-কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এ করে তোলার দায়িত্ব আমাদের দু'দেশের শুধু নয় — পৃথিবীর তাবৎ বুদ্ধিজীবীদের বলেই আমার বিশ্বাস।

☐ *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, (মহবুল হক সম্পাদিত) সময় প্রকাশন, ঢাকা ২০০১

কাল্‌চার, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অর্থসন্ধান

নীহাররঞ্জন রায়

কাল্‌চার কথাটার সঙ্গে কাল্‌টিভেশন কথাটার আত্মীয়তা যে খুব ঘনিষ্ঠ তা বুঝবার জন্য কিছু পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদ যে হিসেবেই হোক কাল্‌চারের প্রথম আভিধানিক অর্থই হচ্ছে, কাল্‌টিভেশন্, কর্ষণ, কৃষি; আর কাল্‌টিভেশন্‌ও যে কৃষিকর্ম তা তো বিদ্যালয়ের বালকও জানে। শব্দ দু'টির মধ্যে ধাতুগত যোগও একটা আছে। কৃষ্টি কথাটি কৃষ্ — (= কর্ষণ, কৃষিকর্ম) ধাতু থেকে নিষ্পন্ন তাও কিছু অজানা নয়। কাল্‌চার, কাল্‌টিভেশন ও কৃষ্টি এই তিনটি শব্দের ভেতর শব্দতাত্ত্বিক ও ব্যুৎপত্তিগত মিল কি আছে বা নেই তা নিয়ে আলোচনা হয়তো চলতে পারে, তবে অর্থগত মিল যে আছে তা নিয়ে সন্দেহ করবার কারণ নেই, এবং সে-অর্থ কর্ষণক্রিয়া বা কৃষিকর্ম এবং তার ফল ও ফসল সম্পর্কিত। সঙ্গে সঙ্গে এ-তথ্যও লক্ষণীয় যে, তিনটি শব্দই ইন্দো-য়ুরোপীয় আর্যভাষার উত্তরাধিকার। এ-প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক, অর্থের এতটা মিল কি একান্তই আকস্মিক, না ইতিহাসগত কারণ কিছু আছে?

মানব-সভ্যতা বিকাশের একটা পর্বে মানুষ জীবনধারণের প্রয়োজনে শিকার ইত্যাদি উপায়ে খাদ্যসংগ্রহের পর্যায় থেকে ভূমি-চাষের উপায় আশ্রয় করে খাদ্য-উৎপাদনের স্তরে উন্নীত হয়। বস্তুত খাদ্যোৎপাদনের স্তরের সূচনাই হয় কৃষিকর্মের সাহায্যে। সুতরাং এই সূচনার আগে কর্ষণ, কৃষি, কাল্‌টিভেশন ইত্যাদি শব্দের মূল ধাতুগুলির সৃষ্টি সম্ভবই নয়। কর্ষণ, কৃষি ইত্যাদি যখন কর্ম, তখন সেই কর্মের কর্মফলও আছে, যে-ফলে মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটে। কর্ম ও কর্মফলকে তো একান্ত পৃথক করা যায় না। যাই হোক, এ-অনুমান বোধ হয় করা চলে যে একই বাস্তবাবস্থা ও বাস্তবাভিজ্ঞতা এবং সামাজিক ও মানসিক আবহ থেকে ইন্দো-য়ুরোপীয় আর্যভাষার এই শব্দ ক'টির সৃষ্টি এবং তাদের অর্থের উন্মোচন প্রথম স্তরে বিশুদ্ধ ক্রিয়ায় বা ক্রিয়াপদে, দ্বিতীয় স্তরে ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত ফসলে অর্থাৎ বিশেষ্যপদ হিসেবে, অন্যার্থে কাল্‌চার-ক্রিয়া থেকে কাল্‌চার-ফলে, কর্ষণ কৃষ্টি বা কৃষিকার্য থেকে কৃষির ফসল কৃষ্টিতে, এমন অনুমান হয়তো অসঙ্গত নয়। য়ুরোপীয় আর্যভাষায় কাল্‌চার-এর বেলায় যা হয়েছিল, ভারতীয় আর্যভাষার কৃষ্টির বেলায় তা হয়নি, একথা কি জোর করে বলা যায়?

কৃষ্টি বৈদিক শব্দ, যার মূল অর্থ কর্ষণক্রিয়া, কর্ষিত ক্ষেত্র বা ভূমি, যা থেকে ক্রমশ দেশ, দেশের মানুষ, জাতি। আমার ধারণায় সেই দেশ, সেই মানুষ, সেই জাতির কথাই বলা হচ্ছে যে-দেশ, যে-মানুষ, যে-জাতি কৃষিকর্ম জানে, যারা একান্ত কৃষিনির্ভর। একথা স্বীকার

না করলে মূল কৃষ্‌-ধাতু ব্যবহারের কোনো অর্থই হয় না। "বৈদিক ভাষায় 'কৃষ্টি' মানে 'জাতি', যেমন, "পঞ্চ কৃষ্টয়" : মানে 'পাঁচ জাতি' — প্রথম প্রথম আর্যজাতির পাঁচটি প্রধান শাখা — অনু, দ্রুহ্য, তুর্বশ, যদু আর পুরু বংশের লোকেদের সম্বন্ধে এই 'পঞ্চ কৃষ্টয়' শব্দ প্রযুক্ত হত...", একথা বলেছেন সুনীতিকুমার।* এ-উক্তির সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই। আমার শুধু বক্তব্য, যে-স্তরে কৃষ্টি অর্থে দেশ, দেশের মানুষ বা জাতি বোঝানো হচ্ছে সে-স্তরে কৃষ্‌-ধাতুর অর্থপ্রসার ঘটেছে, এবং যাঁরা কৃষিকেই প্রধান জীবনোপায় বলে মেনে নিয়েছেন তাঁদেরকেই শুধু বোঝানো হচ্ছে, কারণ তাঁরাই তখন তদানীন্তন সভ্যতার উচ্চতম স্তরে। 'অনু-দ্রুহ্য-তুর্বশ-যদু-পুরু' এই পাঁচটি আর্যভাষী জনেরাই বোধ হয় প্রথম কৃষিসভ্যতার পত্তন করে থাকবেন সপ্তসিন্ধুর দেশে, এবং এইজন্যই তাঁরা পঞ্চকৃষ্টয়ঃ।

যে-যুক্তি আমি উপস্থিত করছি, শব্দতত্ত্বের দিক থেকে তার কতটা সমর্থন আছে, বলতে পারিনে। কিন্তু সমাজতত্ত্বের ও জীবতত্ত্বের ইতিহাসের দিক থেকে একটা বড়ো সমর্থন বোধ হয় আছে, এবং সে সমর্থনের মধ্যেই কাল্‌চার, কালটিভেশন, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রসারিত অর্থের সন্ধান পাওয়া যাবে।

মানুষ কৃষিকর্ম করে কেন, কর্ষণক্রিয়ার উদ্দেশ্য কি? এককথায় এর উত্তর শস্য, ফল ও ফসল উৎপাদন করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে জীবনধারণ ও বৃদ্ধি করবার জন্য। সেই উদ্দেশ্যে মানুষ ভূমি চাষ করে এবং চাষ করা ভূমিতে একটি একটি করে অনেকগুলি বীজ বপন করে। এক-একটি বীজ থেকে ছোটো-বড়ো এক-একটি উদ্ভিদ্‌ হয়, এবং এক-একটি উদ্ভিদে উৎপন্ন হয় অসংখ্য শস্য বা ফসল প্রত্যেকটিই যার এক-একটি বীজ। অর্থাৎ কর্ষণক্রিয়ার ফলে জীব-বিজ্ঞানের নিয়মে এক-একটি বীজ থেকে উৎপন্ন হয় অসংখ্য অগণিত বীজ। সুতরাং কৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে, এক থেকে বহুর সৃষ্টি, বীজের পরিমাণগত বৃদ্ধি, multiplication of the species। কাল্‌চার-ক্রিয়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্যও ঠিক একই। Agriculture, sericulture, pisciculture প্রভৃতি শব্দে কালচার-পদটি যখন যোগ করা হচ্ছে, তখন তারও প্রাথমিক অর্থ হচ্ছে, একটি বীজ থেকে অগণিত বীজের সৃষ্টি, অর্থাৎ পরিমাণগত বৃদ্ধি, quantitative increase। কালটিভেশনের উদ্দেশ্যও তো তাই।

কিন্তু কৃষি, কাল্‌চার, কাল্‌টিভেশন এই শব্দত্রয়ীর একটি গভীরতর প্রসারিত অর্থও আছে, যেহেতু এই তিনটি ক্রিয়ার সামাজিক উদ্দেশ্য শুধু multiplication বা পরিমাণগত বৃদ্ধি নয়, গুণগত বৃদ্ধিও বটে এবং সে-বৃদ্ধিও জীবধর্মের নিয়মানুগ। আমাদের এই আধা-আধুনিক আধা-উন্নত দেশেও বেশ কিছুদিন যাবৎ দেখতে পাচ্ছি, চাষ করে, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে সেই কৃষিকর্মকে চালনা করে করে আমরা এমন ধান ও গমের বীজ উৎপাদন করতে পেরেছি যে-বীজ থেকে এখন যে পরিমাণ ধান বা গম উৎপন্ন হয় তার পরিমাণ প্রায় চতুর্গুণিত, তার জীবনীশক্তি দ্বিগুণিত, অর্থাৎ চাষক্রিয়ার ফলে আমরা বীজের গুণগত পরিবর্তন (qualitative transformation) সাধন করতে পেরেছি, বীজের শক্তি (potency) বাড়িয়ে দিতে পেরেছি। এ-জিনিস সম্ভব হয়েছে সমাজবদ্ধ মানুষের সজ্ঞান

* সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস'। জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬, পৃ. ৭।

(সচেতন) প্রচেষ্টায়। কৃষিকর্ম ব্যাপারটাই তো সামাজিক কর্ম। আপেক্ষিক পরিমাণগত বৃদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়মে হওয়া সম্ভব;কিন্তু গুণগত বৃদ্ধি সমাজবদ্ধ মানুষের সচেতন সজ্ঞান চেষ্টার অপেক্ষা রাখে বলে মনে হয়।

বাংলাদেশের পল্লিসমাজের সঙ্গে, অথবা পঞ্চাশ বছরের আগেকার শহুরে সমাজের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা অনেকেই হয়তো জানেন যে, যে-সব সব্‌জি-তরকারি ইত্যাদি আমরা প্রতিদিন খাই, একসময় তার অনেকগুলিই ছিল কিছুটা বিষাক্ত, যার ফলে তাদের স্বাদ ছিল তিক্ত বা কষায়, যাকে রান্না করে খেলেও গলা চুলকাতো, যেমন, কিছু কিছু লাউ, কচু, বেগুন, টম্যাটো ইত্যাদি। কিন্তু এই অঞ্চলেরই মানুষ বছরের পর বছর তাদের চাষ করে করে, সজ্ঞানে ও সচেতনে, এইসব শাক-সব্‌জিকে সুস্বাদু ভক্ষ্য বস্তুতে রূপান্তরিত করেছে। এই রূপান্তরের নাম গুণগত পরিবর্তন, qualitative transformation, এবং এই পরিবর্তনের মূলেও আছে কর্ষণক্রিয়া, কাল্‌চার, কাল্‌টিভেশন। ফল-ফুলের শাক-সব্‌জির এই ধরনের গুণগত পরিবর্তন মানুষ বহুকাল থেকেই করে আসছে, কৃষিকার্যের সাহায্যে, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে। আজ আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের সহায়ক হয়েছে এবং তার ফলে এ ধরনের গুণগত পরিবর্তন অনেক বেশি পরিমাণে হচ্ছে, অনেক দ্রুত হচ্ছে।

কিন্তু এ-ধরনের গুণগত পরিবর্তন তো শুধু কৃষিকর্ম বা কাল্‌টিভেশন ও এগ্রিকাল্‌চারের কাল্‌চারে সীমাবদ্ধ নেই। সে-পরিবর্তন pisciculture, blood-culture-এও আছে। কৃত্রিম উপায়ে যে মাছের চাষ হয় তাতেও এই গুণগত পরিবর্তন ঘটানো হয়। Blood-culture-এও তাই;প্যাথলজিস্ট তাঁর গবেষণাগারে রোগীর কয়েকটি রক্তবিন্দু কাল্‌চার বা চাষ করে সেই রক্তবিন্দুর শক্তি বা potency বহুগুণ বাড়িয়ে দেন এবং বহুগুণ বর্ধিত সেই রক্ত রোগীর দেহে সঞ্চারিত করে দিয়ে তাকে রোগমুক্ত করেন, বিষ দিয়ে বিষক্ষয় করেন।

স্পষ্টতই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কাল্‌চার কথার অন্য আর একটি প্রসারিততর ও গভীরতর অর্থ ও উদ্দেশ্য আছে, এবং তা হচ্ছে বীজের উন্নতি সাধন করা, সংস্কারসাধন করা, তার শক্তিবৃদ্ধি করা। সেজন্যই কাল্‌চার কথার অন্য আভিধানিক অর্থ হচ্ছে to improve। কর্ষণ, কৃষিকর্মেরও অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বীজের সংস্কারসাধন, তার গুণগত পরিবর্তন ঘটানো। বুদ্ধিমান চাষিরা বরাবর যা করে এসেছেন। এ-পরিবর্তন কৃষিকর্ম বা চাষ ছাড়া সম্ভব নয়।

এই গুণগত পরিবর্তনই সংস্কৃতি, অর্থাৎ চাষের যে অন্যতম উদ্দেশ্য সংস্কার সেই সংস্কারক্রিয়ার ফল হচ্ছে সংস্কৃতি, যেমন কৃষির ফল হচ্ছে কৃষ্টি। সংস্কার কথাটির ধাতুগত অর্থ সম্যক্‌ভাবে করা, সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করে করা। কিন্তু কথাটির একটি রূঢ়ি অর্থ আছে যা ধাতুগত অর্থ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। হিন্দুসমাজে দ্বিজবর্ণের লোকদের চল্লিশটি সংস্কার আছে যা সংক্ষিপ্ত হয়ে আচরিত হয় দশটি সংস্কারে, গর্ভাধান থেকে শুরু করে পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া পর্যন্ত। প্রত্যেকটি সংস্কার জীবনের এক-একটি স্তর বা পর্যায়; প্রত্যেকটি স্তর বা পর্যায়ের সমাজনির্দিষ্ট কতকগুলি নীতি-নিয়ম আছে, কতকগুলি কর্তব্য আছে। সেগুলি সম্যক্ পালন করলে পরবর্তী স্তর বা পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা বা অধিকার জন্মায়। উত্তীর্ণ হবার পূর্বাহ্নে প্রার্থীকে মস্তক মুণ্ডন করে স্নান করে নববস্ত্র পরিধান

করতে হয়, শুদ্ধ সংস্কারপূত হয়ে পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করবার জন্য। এক কথায় এই সংস্কারের অর্থ হচ্ছে, দ্বিজবর্ণের প্রত্যেকটি মানুষকে জীবনের প্রতি স্তরে স্তরে নির্দিষ্ট নিয়ম, কর্তব্য পালন করে জীবনকে সংস্কার করে করে চলতে হয়, এক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া পর্যন্ত এই সংস্কার-কর্তব্য থেকে মানুষের মুক্তি নেই। সুতরাং যত রূঢ়িই হোক সংস্কারের সঙ্গে সংস্কৃতির, অর্থাৎ জীবনের উন্নতি সাধনের একটি সম্বন্ধ আছেই। তবে, প্রশ্ন স্বভাবতই করা যায়, এই ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন তো সকলেরই আছে, শুধু দ্বিজবর্ণের লোকদের কেন? এর উত্তর হিন্দু সমাজের গড়নের মধ্যে; বর্তমান প্রসঙ্গে তা উত্থাপন করে লাভ নেই।

হিন্দুসমাজে দ্বিজবর্ণের সংস্কারের পূর্বাপর বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়, প্রত্যেক পর্যায়ের নীতি-নিয়ম-কর্তব্যের তালিকা ও আচার আচরণ ইত্যাদির যুক্তি-পদ্ধতি নিয়ে নানা মতানৈক্য আগেও ছিল, আজও আছে; প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্মৃতিকারেরাও একমত ছিলেন না। কিন্তু সে যাই হোক, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনে বিরামহীন একটা সংস্কারক্রিয়া যে করে যেতে হয়, মানুষের জীবনেরই প্রয়োজনে, অর্থাৎ জীবনকে পরিশ্রুত, শুদ্ধ ও নির্মল রাখবার জন্য, সুস্থ-সবল ও কর্মঠ রাখবার জন্য, সকল প্রকার কর্মে সদাজাগ্রত রাখবার জন্য, এ-ধরনের একটি যুক্তির স্বীকৃতি যেন স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত সংস্কার-বিধানের পশ্চাতে ছিল।

কিন্তু সে তখন থাক বা না থাক্ সংস্কার-সংস্কৃতি শব্দের অন্তরে যে যুক্তি নিহিত, তার একটু সন্ধান করা যেতে পারে। মানুষ যখন মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সেই মানবশিশুর সঙ্গে একটি পশুশাবকের কোনো পার্থক্য বড়ো একটা থাকে না। কিন্তু তার পর থেকেই মা-এর ও পরিবারের কোলে সে যখন বাড়তে থাকে, তখন খাওয়া-দাওয়া, কথা বলা, শোয়া, বসা, চলা থেকে পদে পদে স্তরে স্তরে তার সংস্কারসাধন চলতেই থাকে; বাল্য-কৈশোর-যৌবনের শিক্ষাদীক্ষাও সেই সংস্কারক্রিয়ারই অন্তর্গত। শরীরচর্চা, জ্ঞানচর্চা, শিল্পসাহিত্যচর্চা, গোষ্ঠী-সমাজ-রাষ্ট্রের সঙ্গে তার আদান-প্রদানক্রিয়া ইত্যাদিও তার নিজকে ক্রমশ উন্নততর, ক্রমশ বেশি সংস্কৃত করবার অবিরাম প্রয়াস। যে-জীবন ছিল প্রাকৃত অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মশাসিত মাত্র তাকে সজ্ঞান সচেতন চেষ্টায় বিচিত্র কর্মের বিচিত্রতর নিয়ম-সংযমের শাসনে ক্রমশ সংস্কৃত করে তোলা। তাছাড়া, জীবনের পথে চলতে চলতে সংসারের দৈনন্দিন কর্মের রথচক্রে নানা মালিন্য, নানা আবর্জনা জমতেই থাকে। মালিন্য ও আবর্জনা শুধু ধুলোবালি-কালি নয়, শুধু মৃত খড়কুটো নয়, অভ্যাসেরও মালিন্য আছে, অর্থবোধহীন আবৃত্তিরও আবর্জনা আছে, ব্যবহারে-ব্যবহারেও ক্ষয় আছে। সেজন্য প্রতিনিয়তই সজ্ঞান সচেতন চেষ্টা রাখতে হয় জীবনকে ক্ষয়, মালিন্য ও আবর্জনামুক্ত রাখবার জন্যে; এই সচেতন সজ্ঞান ক্রিয়াও সংস্কারক্রিয়া, এবং এই ক্রিয়ায় যে ফললাভ ঘটে তাকেই তো আমরা বলি সংস্কৃতি। ইংরেজি refinement, যা কাল্চার-এর অন্যতম আভিধানিক অর্থ, সে কথায় সংস্কৃতি কথার অর্থের দ্যোতনা ও ব্যাপ্তি নেই, গভীরতাও নয়।

সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলেই কাল্চার-কৃষ্টি-সংস্কৃতির অর্থসন্ধানে যবনিকা টানবো।

একটু আগে দেখেছি, কর্ষণ বা কৃষিকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, বীজের উন্নতি বা

সংস্কারসাধন করা, তার শক্তিবৃদ্ধি ঘটানো। এই প্রসারিত অর্থে যে-কথাটা ব্যবহার করা হত, সে-কথাটা কিন্তু সংস্কৃতি নয়; আমার অনুমান, সে-কথাটি কৃষ্টি। অনুমানের কারণও একটু আগে বলেছি, ইন্দো-য়ুরোপীয় আর্যভাষাভাষী লোকদের সম-বাস্তবাভিজ্ঞতা এবং সম-সামাজিক ও মানসিক আবহ। তা না হলে কাল্‌চার ও কাল্‌টিভেশন শব্দ দুটির যে প্রসারিত অর্থ, অর্থাৎ improvement, উন্নতি, সংস্কার, এ-অর্থে শব্দ দু'টির ব্যবহার ব্যাখ্যা করা কঠিন। বীজের উন্নতি বা সংস্কারের একতম উপায়ই তো হচ্ছে চাষ, কর্ষণ, কৃষি;এ-ছাড়া দ্বিতীয় উপায় তো নেই।

য়ুরোপীয় আর্যভাষার বিকাশ ও প্রসারের কোনো একটি পর্বে বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই য়ুরোপের মানুষ দেখতে ও বুঝতে শিখল যে, ভূমিকর্ষণ করে যেমন মানুষ বীজের উন্নতি বা সংস্কার সাধন ঘটাতে পারে, ঠিক তেমনই সামাজিক মানুষের দেহ-মন চিত্তভূমি চাষ করেও সে-জীবনের উন্নতি বা সংস্কার ঘটানো যায়, এবং তা ঘটানোই মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্তব্য। এই জীবনকর্ষণ-ক্রিয়াকে বুঝাবার জন্য য়ুয়োপের মানুষ যে শব্দ দুটি ব্যবহার করলো তা সরাসরি ভূমিকর্ষণ-ক্রিয়া-নির্দেশক দুটি শব্দ, অর্থাৎ কাল্‌টিভেশন ও কাল্‌চার। এই প্রসারিত ব্যবহার কখন থেকে শুরু হয়েছিল তা বলা। কঠিন, তবে আমার ধারণা, খ্রিস্টধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ তৃতীয় চতুর্থ খ্রিস্ট শতক থেকে।

ভারতীয় আর্যভাষায়ও কৃষ্‌-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন কোনো শব্দ (আমার ধারণায় কৃষ্টি), কোনো এক প্রাচীনকালে, এই একই অর্থে, অর্থাৎ মানুষের দেহ-মন-চিত্তভূমি চাষ, জীবনকর্ষণক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত হত। বৌদ্ধরা তো তা করতেনই; অর্বাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্টি শব্দের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে তো নিশ্চয়ই হতো, তা না হলে ধাঁ করে রামপ্রসাদ এই অর্থে চাষ বা আবাদের বাক্‌প্রতিমা বা শব্দরূপমূর্তি ব্যবহার করবেন কি করে? অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়পাদ তখন সদ্য অতিক্রান্ত; বাংলার মসনদে সিরাজোদ্দৌল্লা আসীন। দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দুর্দশা চরমে; চারদিকে ঘনায়মান অন্ধকার। জীবনের লক্ষণ কোথাও কিছু নেই। পলাশীর মাঠের পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্তায়মান। অদূরে কোনো দোকানের সেরেস্তায় বসে রামপ্রসাদ হিসাবের খাতায় লিখছেন নিজের জীবন-নিঙড়ানো যন্ত্রণার গান। মানুষ জীবনের ভূমিচাষ ভুলে গেছে বহু বৎসর বহুযুগ; তার জীবনের জমি সে বহুকাল অনাবাদী ফেলে রেখে দিয়েছে; আজ তাই জীবন বিস্তৃত এক মরুভূমি, চারিদিকে হাহাকার। হায় রে দেশের মানুষ! 'মন, তুমি কৃষিকাজ জানো না। এমন মানবজমিন রইলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা।' কৃষি বা কর্ষণের যে প্রসারিত অর্থের দিকে আমি বারবার ইঙ্গিত করছি, ভারতীয় পরম্পরায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই কল্পমূর্তি বা বাক্‌প্রতিমার প্রচলন না থাকলে রামপ্রসাদ কোথা থেকে পেলেন চাষ আবাদের এই প্রসারিত অর্থ? এর সঙ্গে তো কোথাও ইংরেজি কাল্‌চার-কাল্‌টিভেশনের প্রসারিত অর্থের কোনো অমিল নেই।

জীবনের উন্নতি বা সংস্কার সাধন অর্থে আর একটি প্রাচীন শব্দও সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত ছিল; শব্দটি সংস্কৃতি। কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, সংস্কারের সঙ্গে তার সম্বন্ধ, ইত্যাদি কথা আগেই বলেছি। শব্দটি সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ মেলে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, তাও বলেছি।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচনার মোটামুটি তারিখ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৮০০। সংস্কৃতি কথাটির সঙ্গে কৃষি বা কর্ষণ কথার অর্থের সরাসরি প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কিছু নেই; কিন্তু সংস্কারক্রিয়ার প্রকৃতি এবং প্রসারিত অর্থে কর্ষণক্রিয়ার প্রকৃতির মধ্যে একটা পরোক্ষ মিল যে আছে তা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। জীবন-বনভূমির যত ময়লা আগাছা-আবর্জনা দূর করতে না পারলে সে ভূমি চাষ করা যায় না; সে জমি চাষের যোগ্য হলে তখন তাতে নূতন কর্ম ও ভাবনার, নূতন ধ্যান ও মননের, নূতন স্বপ্ন ও সাধনার বীজ বপন করতে হয়, যত্ন করে বর্ধন করতে হয়। তবেই ফলে সংস্কৃতির ফসল। কৃষিকর্মে বীজের সংস্কার বা গুণগত পরিবর্তন-সাধনের প্রক্রিয়াও একই প্রকার। দু-এরই উদ্দেশ্য সংস্কারসাধন, দু-এরই প্রক্রিয়াও এক।

□ *কৃষ্টি কাল্‌চার সংস্কৃতি*, ১৯৭৯

রবীন্দ্র-সমস্যা

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

['আজি হ'তে শত বর্ষ পরে' এই প্রবন্ধটি পঠনীয়]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামাঙ্কিত যে বিপুল সাহিত্য আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তাহা বাস্তবিক একই লেখকেব রচনা কি না, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কোনো একজন কৃতী পুরুষের নামে সব কিছু চালাইয়া দেওয়া আমাদের দেশের একটি পুরাতন প্রথা। বেদব্যাসের নামে পুরাণ, উপপুরাণ, মহাভারত ইত্যাদি কি না চলিয়া গিয়াছে, অথচ সে সমস্তই যে কোনো একজন ব্যক্তির রচনা হইতে পারে না, তাহা সকলেই জানেন ও স্বীকার করেন। মেঘদূত-রচয়িতা কালিদাসের নামে নলোদয়, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা ইত্যাদি তুচ্ছ রচনা চলিয়া গিয়াছে। পরবর্তীকালে এই গৌড় দেশেই অন্তত তিনজন বিভিন্ন কবির রচনা চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। এমন কি অতি অর্বাচীন যুগেও একই নামের দুই দুইজন করিয়া কয়েকজন লেখক প্রায় একই সময়ে গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন, তাহাও পাঠকগণ অবগত আছেন। সুতরাং একাধিক ব্যক্তির রচনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই একই নামে চলিত হইয়া থাকিলে তাহাতে বাস্তবিক অসম্ভব কিছু নাই।

বরং একথা বলা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে সমস্ত জনশ্রুতি আছে, তাহা যদি একই ব্যক্তির সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া ধরা হয়, তবে অনেক কিছু অসম্ভব তাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে যুগের এক প্রভূত বিত্তশালী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন — এইরূপ প্রবাদ আছে, কলিকাতা শহরে তাঁহাদের প্রাসাদোপম গৃহ ও অঙ্গনের অবশেষ এখনও ভক্তবৃন্দ দর্শন করিতে গিয়া থাকেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃন্ময় কুটীরে বাস কবিতেন, এবং সেই কুটীরের নাম দিয়াছিলেন 'শ্যামলী',—এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়; বর্তমান বোলপুর শহরের ক্রোশখানেক উত্তরপশ্চিমে সেই কুটীরের ভগ্নাবশেষ আজও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। দূর পল্লিগ্রামের কুটীরবাসী রবীন্দ্রনাথ এবং রাজধানী কলিকাতার প্রাসাদবিলাসী ধনীর দুলাল রবীন্দ্রনাথ যে একই ব্যক্তি হইতে পারে না, একথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই যুগের বিদেশি শাসকবৃন্দের নিকট খেলাৎ পাইয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণও যেমন আছে, আবার সেই শাসকদের উচ্ছেদ করিবার জন্য তুমুল আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন এবং গানে বক্তৃতায় ও গদ্যে পদ্যে বিদেশি শাসনের বিপক্ষে বিদ্রোহের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, সেরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নামে একাধিক ব্যক্তি যে ছিলেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া যে বিশাল গ্রন্থাবলি চলিতেছে, তাহা একজন লোকের পক্ষে রচনা করা শুধু যে দুঃসাধ্য তাহা নহে, একটু বিশ্লেষণ করিয়া পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাহার মধ্যে এত বিভিন্ন আদর্শ, রীতি ইত্যাদি রহিয়াছে যে তাহা এক হাতের লেখা হইতেই পারে না।

এই বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

আমাদের ধারণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উহা ব্যাস ইত্যাদি নামের মতো একটা ছদ্মনাম বা গৌরবাত্মক অভিধা মাত্র। ঠাকুর যে সেকালে একটা গৌরবাত্মক সংজ্ঞা ছিল, তাহা সকলেই জানেন। দেব-দেবীদের ঠাকুর বা ঠাকুরাণী বলা হইত; প্রেমের ঠাকুর, কাঙালের ঠাকুর, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, ঠাকুর-ঘর, ঠাকুর-সেবা ইত্যাদি পদে এই অর্থের প্রয়োগ দেখা যায়। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও ঠাকুর বলা হইত, পাচক ব্রাহ্মণও এই উপাধি হইতে বঞ্চিত হইত না। শুধু শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্যেও ঠাকুর বা ঠাকুরাণী শব্দের প্রয়োগ ছিল; ঠাকুরদাদা, মা-ঠাকুরাণী ইত্যাদি শব্দে এইরূপ অর্থের প্রয়োগ আছে। এই জন্য ছদ্মনাম হিসাবে ঠাকুর পদবী কোনো কোনো গৌড়ীয় গ্রন্থকার পূর্বেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাগন ঠাকুর, টেকচাঁদ ঠাকুর ইত্যাদি যেমন ছদ্মনাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তেমনই ছদ্মনাম বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ঠাকুর পদবীর ন্যায় রবীন্দ্রনাথ নামটাও একটা গৌরবাত্মক সংজ্ঞা বলিয়া আমরা মনে করি। কোনো লেখকের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার জন্য তাঁহাকে সূর্যের ন্যায় বা ততোধিক দীপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি প্রাচীন সামরিক উপাধির অনুকরণে 'রবীন্দ্রনাথ' এই গৌরবাত্মক পদবী সেকালে দেওয়া হইত বলিয়া মনে হয়। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে কয়েকজন লেখক ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আমাদের বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন অন্তত তিনজন লেখক। প্রথম রবীন্দ্রনাথের নিবাস ছিল কলিকাতা নগরে। তিনি ধনীর দুলাল, ভোগবিলাসী, বিদেশি সভ্যতা ও শিক্ষার পক্ষপাতী; তিনি কয়েকবার য়ুরোপে যাওয়া-আসা করিয়াছিলেন, ইংরেজদিগের তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কবিতা ছাড়া অনেক নাটক রচনাও করিয়াছিলেন। চিত্রকলা, অভিনয় ও নৃত্যে ইঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল। ইঁহাকে আমরা 'নাগর' রবীন্দ্রনাথ বলিতে পারি।

দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বীরভূম অঞ্চলের লোক, সম্ভবত বোলপুরের নিকটেই তিনি বাস করিতেন। ইনি ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, মরমী কবি; বাউল প্রভৃতি সাধকগণের ধারা ইনি অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইনি ভারতীয় সনাতন আদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির অনুরাগী ছিলেন, এবং একটি ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিয়া শিষ্য ও শিষ্যাদের শিক্ষাদান করিতেন। ইঁহার জীবনযাত্রার প্রণালী ছিল নিরাড়ম্বর; ইনি কুটীরে বাস করিতেন ও আম্রকুঞ্জে শিক্ষাদান করিতেন। ইঁহার গান বাঁধিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সেই সমস্ত গানের অধিকাংশই ভগবদ্বিষয়ক। একটা পুত স্নিগ্ধ ভাবধারায় সেই সমস্ত গান পরিপূর্ণ। ইঁহারই নামের সহিত ভারতীয় সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট শাখা (রবীন্দ্র-সঙ্গীত) বিজড়িত। ইঁহার সহিত

শাসক সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না। তবে ইঁহার সাধনতত্ত্বের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, বিভিন্ন স্থান হইতে অনেকে ইঁহার আশ্রমপদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য বোলপুরে যাইতেন। ইঁহাকে আমরা বাউল রবীন্দ্রনাথ বা মরমী রবীন্দ্রনাথ বলিতে পারি।

তৃতীয় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলের অধিবাসী। পদ্মাতীরে কোনো স্থলে — সম্ভবত শিলাইদহ বা সাহাজাদপুর গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। ইঁহার ভূসম্পত্তি যথেষ্ট ছিল বলিয়া মনে হয়; কৃষির ও কুটীরশিল্পের উন্নতি কিসে হয়, সে বিষয়ে ইনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। মধ্যবঙ্গেব গ্রামবাসীদের বাস্তব জীবনেব সহিত ইঁহাব সাক্ষাৎ পরিচয় ও যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। এই রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় স্বদেশি আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। ইনি গল্প ও উপন্যাস-রচনায় নিপুণ ছিলেন। কিছু কিছু কবিতা রচনা করিয়া থাকিলেও গদ্য রচনাতেই ইঁহার কৃতিত্ব সমধিক। গল্প উপন্যাস ছাড়া প্রবন্ধাদিও ইনি রচনা করিয়াছেন, সুবক্তা বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল। ইঁহার রচনার প্রবীন গুণ — সাধারণ মানবের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সহৃদয়তা। ইনি 'নাগর' রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ললিতকলাবিলাসী বা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মুমুক্ষু তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন না। কিন্তু বাস্তব জীবনের সত্য সম্বন্ধে ইনি সচেতন ছিলেন এবং সাধারণ মানব-হৃদয়ের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ সম্পর্কে ইঁহার যথার্থ দরদ ছিল। ইঁহাকে আমরা দরদী রবীন্দ্রনাথ কিংবা বাঙাল রবীন্দ্রনাথ বলিতে পারি।

প্রথম রবীন্দ্রনাথ যে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইনি হিন্দু সমাজের জাতিভেদ ও অন্যান্য অনেক প্রথার তীব্র বিরোধী ছিলেন এবং হিন্দু ধর্মের বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, গুরুবাদ, এমন কি মুক্তিসাধনা ইত্যাদি আদর্শের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। "বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়", — ইত্যাদি ইঁহারই উক্তি। এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচারিত হিন্দু আদর্শের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন শিল্পী ও সুন্দরের উপাসক, সৌন্দর্যানুভবের দিক দিয়াই তিনি জীবনের মূল্য বিচার করিতেন।

দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন হিন্দু। সম্ভবত ইনি প্রথমে বৈষ্ণব ছিলেন, পরে শৈবমতাবলম্বী হন। পূর্ব কালের বৈষ্ণব মহাজনদিগের প্রভাব ইঁহার উপরে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ভগবানকে ইনি বঁধু বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন এবং ভগবানের সহিত মিলনের সাধনাকে অভিসার বলিয়াছেন। বৈষ্ণব মহাজনদের ন্যায় ইনি গীত-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য' ইত্যাদি সংগ্রহের অধিকাংশ গানই ইঁহার লেখা। মনে হয়, পরে তিনি শৈব মতানুবর্তী হন। কারণ শেষ বয়সের রচনায় ভোলানাথ, নটরাজ, রুদ্র ইত্যাদি ধারণাই তাঁহার রচনায় বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। জীবন্মুক্তিই ছিল ইঁহার লক্ষ্য ও আদর্শ — একথা ইনি স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন। ইঁহার কবিতা হইতে মনে হয়, ইনি সাধনায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি 'গুরুদেব' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। অপর দুই রবীন্দ্রনাথের আসল নাম * কি ছিল, তাহা আমাদের জানিবার

---

* কেহ কেহ মনে করেন যে প্রথম রবীন্দ্রনাথের আসল নাম ছিল — নিবারণ চক্রবর্তী

কোনো উপায় এখন না থাকিলেও এই রবীন্দ্রনাথের নাম সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করা যাইতে পারে। লোক-প্রবাদ আছে যে, ভানু সিংহের পদাবলী রবীন্দ্রনাথেরই রচিত এবং রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলির মধ্যে ইহাকে প্রায়শ স্থান দেওয়া হয়। আমাদের মনে হয়, ভানু সিংহ এই দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথেরই আসল নাম। প্রথম বয়সে তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, তখনও তিনি রবীন্দ্রনাথ উপাধি পান নাই, সেইজন্য তাঁহার এই সমস্ত পদ ভানু সিংহ নামাঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। বোলপুর হইতে কিছু দূরে রায়পুরে যে সিংহ-পরিবার এখনও আছে, তাঁহাদের সহিত এই ভানু সিংহের সম্পর্ক ছিল এইরূপ কল্পনা একেবারে অযৌক্তিক না হইতেও পারে।

তৃতীয় রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত সম্বন্ধে কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। অনেক সময় ইঁহাকে শুদ্ধ যুক্তিবাদী বলিয়া মনে হয়, তবে তিনি আসলে যে আস্তিক ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তিনি কোনো মতকেই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতেন না, অভিজ্ঞতা ও যুক্তির কষ্টিপাথরে সমস্ত মতই যাচাই করিয়া দেখিতেন এবং সব মতেরই দোষ গুণ উদঘাটন করিতে পারিতেন। ইঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা'তে হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় সমাজেরই গোঁড়ামি ও ভণ্ডামির মুখোশ খুলিয়া দেখানো হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি জাতীয় আন্দোলনের সহিত জড়িত ছিলেন এবং ধর্মমত অপেক্ষা জাতীয়তাবাদই ইঁহাকে বেশি প্রভাবিত করিয়াছিল। মুসলমান প্রজা ও কৃষকদের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় থাকার জন্য ইহাদের জীবনের দুঃখ কষ্ট ইত্যাদির প্রতি ইনি অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, কোনো কোনো মুসলমানকে ইনি নিজস্ব পরিচর হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময়ই মুসলমানি পোশাক, আল্‌খাল্লা ও টুপি পরিধান করিতেন এবং এক সময়ে তিনি প্রাচীন মুসলমান রাজ্য পারস্যে আমন্ত্রিত এবং সেখানে সংবর্ধিত হইয়াছিলেন। সম্ভবত ইনি পীরালি বংশোদ্ভুত ছিলেন। কেহ কেহ এইজন্য ইঁহাকে পীরালি রবীন্দ্রনাথ বলিয়া ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ ও শৈব রবীন্দ্রনাথ হইতে পৃথক্‌ ভাবে নির্দেশ করিতেন।

রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী বলিয়া পরিচিত দুই একখানি গ্রন্থ আছে। 'জীবনস্মৃতি' 'ছেলেবেলা' ইত্যাদি শিরোনাম তাহাতে দেওয়া হইয়াছে। এই সব গ্রন্থ অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত, হয়তো ইহাতে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত বিষয়ও আছে। কোনো গ্রন্থেই প্রথম জীবনের কুড়ি-বাইশ বৎসরের অতিরিক্ত কোনো অভিজ্ঞতার বিবরণ দেওয়া হয় নাই। ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে সেখানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সমস্তই প্রায় ভাসা ভাসা, এমনকি তাহাতে লেখকের পিতার নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না। সুতরাং ঐ সব গ্রন্থ কতটা নির্ভরযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। যাহা হউক, যদি ইহাতে কিছু কিছু সত্য আছে ধরিয়া লওয়া যায়, তবে ইহাতে প্রথম রবীন্দ্রনাথেরই পরিচয় পাই। এই রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে নগরবাসী, কদাচ পাণিহাটি, চন্দননগর পর্যন্ত ইনি গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বা তৃতীয় রবীন্দ্রনাথ হইতে ইনি যে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ব্যক্তি তাহা সহজেই বুঝা যায়, কারণ বীরভূম বা কুষ্টিয়া-পাবনা অঞ্চলের কোনো অভিজ্ঞতাই সেখানে বর্ণিত হয় নাই। গ্রন্থ-মধ্যে দুই-এক স্থলে বোলপুরের উল্লেখ থাকিলেও তাহা যে প্রক্ষিপ্ত ও পরবর্তী

কালের কোনো অতি-উৎসাহী সমন্বয়বাদী সম্পাদকের স্থূলহস্তাবলেপ, তাহা বুঝিতে কোনো কষ্ট হয় না। প্রথম রবীন্দ্রনাথ অতি চমৎকার শব্দশিল্পী ছিলেন, কলিকাতা জীবনের তিনি অতি মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু বোলপুর সম্বন্ধে সে রকম কোনো চিত্রই 'জীবনস্মৃতি' ইত্যাদিতে পাওয়া যায় না। এইটুকু প্রমাণই যথেষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যে সমস্ত ধারণা প্রচলিত আছে, তজ্জন্য রবীন্দ্রসাহিত্যের সম্পাদক ও জীবনীকারগণ দায়ী। বোধ করি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামমাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য ইঁহারা তিন রবীন্দ্রনাথের রচনাই একজনের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহারা সুবিশ্বাস্য ও সুসংলগ্ন একটা জীবনচরিত রচনা করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ ইস্কুল পলাতক ছাত্র ছিলেন, আবার রবীন্দ্রনাথ সর্বশাস্ত্রে জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত ছিলেন — এই ধরনের পরস্পর-বিরোধী হাস্যকর সিদ্ধান্ত তাঁহাদের রচিত রবীন্দ্র-জীবনীতে পাওয়া যায়। তাঁহারা যদি একটু সাবধানে তাঁহাদের উপাদান নাড়াচাড়া করিতেন, তবে এতাদৃশ প্রমাদে পতিত হইতেন না। পৈতৃক নামের বদলে একটা উপাধির দ্বারা অনেক বিখ্যাত লোকই পূর্বকালে পরিচিত হইতেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা বাঙলা দেশেরই ঊনবিংশ শতকের বিদ্যাসাগর নামধেয় লেখকের কথা বলিতে পারি। বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলি, বিদ্যাসাগর-জীবনী ইত্যাদি চলিত থাকিলেও, বিদ্যাসাগর বাস্তবিক নাম নহে, তাহা যে গৌরবাত্মক উপাধি মাত্র তাহা আমরা জানি। প্রায় একই যুগে তিনজন বিদ্যাসাগর — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর — বঙ্গদেশে ছিলেন। ইঁহারা তিনজনেই পণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইঁহাদের সকলের রচনা একজনের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা যেমন হাস্যকর হইবে, তিনজন রবীন্দ্রনাথের রচনাও একজনের বলিয়া চালাইবার প্রয়াসও তেমনই হইয়াছে।

অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণাদি বাদ দিলেও শুধু যদি রবীন্দ্র-রচনাবলির সাহিত্যিক লক্ষণাদি বিচার করা যায়, তাহাতেও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। একই কাহিনি লইয়া রচিত দুইখানি নাটক — 'রাজা ও রাণী' ও 'তপতী' — রবীন্দ্রনাথের নামে চলিত আছে। কিন্তু এই দুইখানি নাটক কি একই লেখকের রচনা হইতে পারে? ভাব, ভাষা, রস, আদর্শ, প্রয়োগ-পদ্ধতি — সমস্ত দিক্ দিয়াই কি ইহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বর্তমান নহে? প্রাচীন গ্রিক্ সাহিত্যে Electra-র কাহিনি লইয়া Sophocles ও Euripides একই যুগে নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাই বলিয়া Sophocles ও Euripides কি এক ব্যক্তি? Sophocles-এর Electra এবং Euripide এর Electra — এই দুয়ের মধ্যে যতটা পার্থক্য, 'রাজা ও রাণী' এবং 'তপতী'র মধ্যে পার্থক্য তাহা হইতে অধিক ছাড়া কম নহে।

রবীন্দ্র-রচনাবলি যাঁহারা সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত রচনাই একজন রবীন্দ্রনাথের লেখা ধারণা করিয়া প্রকাশনের কালানুক্রমে সেগুলিকে সাজাইয়াছেন। ফলে অনেক সময় একই গ্রন্থের মধ্যে সমসাময়িক তিনজন রবীন্দ্রনাথের লেখা স্থান পাইয়াছে। একটু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলেই কিন্তু অনেক গ্রন্থেই তিনটি বিভিন্ন রীতি ও আদর্শের

সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে এবং তিনজন বিভিন্ন লেখকের ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট ধরা পড়িবে।

উদাহরণস্বরূপ সুপরিচিত 'সোনার তরী' নামক কবিতাগুচ্ছ বিবেচনা করা যাউক। ইহার মধ্যে সুস্পষ্ট তিনটি বিভিন্ন মানসের ও রচনাভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। একজন রবীন্দ্রনাথ যে নাগরিক, তাহা ত 'বর্ষাযাপন' কবিতায় "রাজধানী কলিকাতা; তেতলার ছাতে" ইত্যাদি চরণে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। ইনি প্রথম রবীন্দ্রনাথ। আর একজন রবীন্দ্রনাথ যে মধ্যবঙ্গের সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা প্রকৃতির সহিত সুপরিচিত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইনি যে পদ্মা বা অপর কোনো বিশাল নদীর তীরে বাস করিতেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। ইনিই 'সোনার তরী', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'পরশ-পাথর', 'হৃদয় যমুনা', 'ভরা ভাদরে', 'নদী পথে' ইত্যাদি কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইনি হইতেছেন তৃতীয় রবীন্দ্রনাথ বা শিলাইদহ অঞ্চলের রবীন্দ্রনাথ। আর একজন রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছেন 'বৈষ্ণব কবিতা', 'যেতে নাহি দিব', 'অক্ষমা', 'দরিদ্রা', 'বসুন্ধরা', 'শৈশব সন্ধ্যা', 'সমুদ্রের প্রতি', 'প্রতীক্ষা' ইত্যাদি কবিতা। ইনি যে দি ান্তবিস্তৃত সুস্তব্ধ পল্লিদৃশ্য হইতে প্রেরণা পাইতেন, বৈষ্ণব ভাবধারা ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ এইসব কবিতাগুলিতে পাওয়া যায়। প্রথম রবীন্দ্রনাথ 'বর্ষাযাপন' ছাড়া 'বিম্ববতী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা', 'তোমরা ও আমরা', 'হিং টিং ছট্', 'গানভঙ্গ', 'পুরস্কার', 'প্রত্যাখ্যান', 'মায়াবাদ', 'বন্ধন', 'মুক্তি' প্রভৃতি কবিতা রচনা করিয়াছেন। কেবল বিষয়বস্তু নহে, কবিতাগুলির রচনাকৌশল ও ভাব পরীক্ষা করিলেও তিনটি বিভিন্ন কবিপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। যে কবিতাগুলি প্রথম বা নাগর রবীন্দ্রনাথের রচিত, তাহাতে একপ্রকার অতিচটুল তারুণ্যের লক্ষণ আছে; তাহার ভাষা লঘুগতি, জীবনাদর্শ স্বপ্ন-জড়িমায় রঙিন; তাহার ছন্দ অনেক সময়ই বিষমগতি ও চপল, পাঁচ মাত্রা ও সাত মাত্রার পর্বের প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। যে কবিতাগুলি দ্বিতীয় বা মরমী রবীন্দ্রনাথের রচিত, তাহাতে একটা দার্শনিক মনের পরিচয় আছে। ধূলির ধরণীর প্রতি মমতা, অনাড়ম্বর সরল জীবনের মাহাত্ম্যবোধ, মানবজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরতম রহস্যবোধের প্রয়াস — এই সমস্ত কবিতাগুলির উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। এই কবিতাগুলির ভাষা মোটামুটি গম্ভীর; ছন্দও তদ্রূপ, প্রায়শ দীর্ঘগতি ও তানপ্রধান। আর যে কবিতাগুলি তৃতীয় বা দরদী রবীন্দ্রনাথের রচিত, তাহার মধ্যে একটা অতিবাস্তব কল্পনার অতিরেক দেখিতে পাওয়া যায়। রচয়িতা যেন পৃথিবীর মানুষই নহেন, একটা অসম্ভব কল্পনা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে এবং সর্বদা তাঁহাকে আহ্বান ও আকর্ষণ করিতেছে এবং উদ্ভ্রান্তির পথে লইয়া যাইতেছে। প্রথম রবীন্দ্রনাথ জীবনরসের আস্বাদনে বিচিত্র মাধুর্য অনুভব করেন; দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির ও প্রকৃতির সহিত নিগূঢ়ভাবে বিজড়িত অনুভূতির মধ্যে একটা বিরাট্ রহস্যের সন্ধান পান; তৃতীয় রবীন্দ্রনাথ সাধারণ জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির অতিরিক্ত একটা অজানা সত্তার আহ্বানে চঞ্চল, নিরুদ্দেশের যাত্রী। 'সোনার তরী', হইতে পরবর্তী তিনটি উদ্ধৃতি পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলেই তিনটি বিভিন্ন কবি-চিত্তের পরিচয় পাওয়া যাইবে :

১. জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি,
যুগল মিলিয়াছে আগে।
যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা,
সেখানে গান নাহি জাগে॥
(গান-ভঙ্গ)

২. আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তান তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চল তলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমায় মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;
(বসুন্ধরা)

৩. শ্রাবণ গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি —
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।
(সোনার তরী)

শুধু পদ্য-রচনা নহে, গদ্য রচনাগুলি বিশ্লেষণ করিলেও আমরা বিভিন্ন রুচি, আদর্শ ও রচনাভঙ্গির পরিচয় পাইব। তৃতীয় রবীন্দ্রনাথই অধিকাংশ গদ্য গ্রন্থের রচয়িত এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। ইঁহার লেখা 'গোরা' উপন্যাসের কথা আগে বলা হইয়াছে। 'নৌকাডুবি'ও যে ইঁহার রচনা, তাহা গ্রন্থের নাম হইতেই বুঝা যায়। 'গল্পগুচ্ছের' মধ্যে যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পটভূমিকা ও সাধারণ নরনারীর সুখ-দুঃখের প্রতি দরদের পরিচয় পাই, তাহাতে মনে হয় যে, এই তৃতীয় রবীন্দ্রনাথই ঐ পর্যায়ের অধিকাংশ গল্প রচনা করিয়াছিলেন। 'স্বদেশ', 'সমূহ', 'সমাজ' ইত্যাদিও ইঁহারই রচনা। পক্ষান্তরে 'শেষের কবিতা', 'চার অধ্যায়', 'চোখের বালি' ইত্যাদি উপন্যাস প্রথম রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়াই মনে হয়। দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি বিশেষ লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তবে তিনি আচার্য ও প্রচারকের উপযুক্ত ভাবময়ী বক্তৃতায় পটু ছিলেন। 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন' শীর্ষক বক্তৃতা ও প্রবন্ধগুলি তাঁহারই রচিত বলিয়া মনে হয়।

এই তিনজনের গদ্য-রচনার রীতি তিন রকমের ছিল। দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গি সহজেই ধরিতে পারা যায়, তাঁহার ভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশি, বাক্য-রচনা দীর্ঘায়িত, সুর উদাত্ত। উদাহরণস্বরূপ তাঁহার 'প্রাচীন সাহিত্য' হইতে আমরা একটু উদাহরণ দিলাম :

"*রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মতো আমরা নির্বাসিত হইয়াছি।*"

ইহার পর 'লিপিকা'র 'মেঘদূত' হইতে একটু নমুনা দিতেছি, পাঠকগণ দেখিবেন যে, দুই উদ্ধৃতির মধ্যে ভাষার ও রীতির কত পার্থক্য।

"*তার পাশেই আছি তবু নির্বাসন। বড়ো কাছে থাকার এই বিরহ, এত কাছে একজন আরেক জনকে সবটা দেখতে পায় না।*

মিলনের প্রথম দিনে বাঁশি কী বলেছিল? সে বলেছিল, 'সেই মানুষ আমার কাছে এল, যে মানুষ আমার দূরের'।"

এই রচনারীতি প্রথম রবীন্দ্রনাথের বলিয়াই মনে হয়। তৎসম শব্দের ব্যবহার কম, বাক্যের প্রসার স্বল্প, কথাগুলি যেন কাটাকাটা। চলনটা হাল্কা, চাল লঘু। ইঁহার রচিত 'য়ুরোপ যাত্রী', 'ছেলেবেলা' ইত্যাদিতেও এই ভঙ্গির দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

তৃতীয় রবীন্দ্রনাথের গদ্যের চাল এই দুইয়ের মাঝামাঝি। প্রথম রবীন্দ্রনাথের লঘুতা ও দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের গাম্ভীর্য — উভয়েরই যেন সমাবেশ হইয়াছে তৃতীয় রবীন্দ্রনাথের রচনারীতিতে। জনপ্রিয় বক্তৃতার পক্ষে এই রীতিই যে প্রশস্ত, তাহা বলা বাহুল্য। এক একটি বাক্য এখানে দীর্ঘ না হইলেও অনেকগুলিকে সুসম্বদ্ধ করিয়া অনুচ্ছেদ রচনায় একটা বিশেষ কৌশল দেখা যায়। তৎসম শব্দ যথেষ্ট ব্যবহৃত হইলেও তদ্ভব ও দেশজ শব্দের সহিত তাহাদের এমনভাবে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, একটা সহজ সুর, স্বচ্ছন্দ গতি যেন স্পষ্টই অনুভব করা যায়। অথচ সূক্ষ্ম অলঙ্কারের ব্যবহার করিয়া রচনাকে চমৎকার করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁহার রচিত 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি :

"*আমাদেরও সেই প্রার্থনা। আমাদের হেরফের ঘুচিলেই আমরা চরিতার্থ হই। শীতের সহিত শীতবস্ত্র, গ্রীষ্মের সহিত গ্রীষ্মবস্ত্র কেবল একত্র করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমাদের এত দৈন্য, নহিলে আছে সকলই। এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাই, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও। আমরা আছি যেন—*

পানী মেঁ মীন পিয়াসী
শুনত শুনত লাগে হাসি।

আমাদের পানীও আছে, পিয়াসও আছে, দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসিতেছে এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।"

এইভাবে আলোচনা করিলে তিনজন ভিন্ন ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের রচনা পৃথক্ ভাবে সঙ্কলন করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বিপুল পরিশ্রম ও গবেষণাসাপেক্ষ। বিশ্বভারতী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা বিভাগ কি এই বিষয়ে অগ্রণী হইবেন?

□ *আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা*, ১৩৬৭, রীডার্স কর্নার

বই কেনা

সৈয়দ মুজতবা আলী

মাছি-মারা কেরানি নিয়ে যত ঠাট্টা-বসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যে-দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময়ে উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, দু'টো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায়, আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো, তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি, সে-কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায়। এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপশোশ ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাত। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক-একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য-উপন্যাসের এক-চোখা দৈত্যের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটা কি? প্রথমত — বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আরও একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রান্ড রাসেল বলেছেন, 'সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশি হয়।'

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল — আরও কত কি।

কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মতো সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবেই হয়তো ওমর খৈয়াম বলেছিলেন —

Here with a loaf of bread
beneath the bough
A flask of wine, a book of
verse and thou,
Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow.

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা — যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশতের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহম্মদ সাহেব শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে 'আল্লামা বিল কলমি' অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই — বই par excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক — The Book.

যে-দেবকে সর্ব মঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনিই তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে, তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালি নাগর ধর্মের কাহিনি শোনে না। তার মুখে ঐ এক কথা 'অত কাঁচা পয়হা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব?'

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য — কনিষ্ঠাপরিমাণ — লুকনো রয়েছে। সেইটুকু এই যে, বই কিনতে পয়সা লাগে — ব্যস্। এর বেশি আর কিছু নয়।

বইয়ের দাম যদি আরও কমানো যায়, তবে আরও অনেক বেশি বই বিক্রি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও', তবে সে বলে 'বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কী করে?'

'কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঙলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসি ভাষা। এ-ভাষায় বাঙলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচ সিকে দিয়ে যে কোনো ভালো বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন?'

'আজ্ঞে, ফরাসি প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোনো ভালো বই এক ঝট্‌কায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই। বেশি ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি?'

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত জোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ — দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনও দেউলে হয় নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মতো অনেকগুলি চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মতো এক গাদা নূতন-ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে, এবং সর্বশেষে সে কেনে ক্ষ্যাপার মতো এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা যার দরুন সকালবেলা চোখের সামনে সারে সার গোলাপি হাতি দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কী করি? আমি একাধারে producer এবং consumer — তামাকের মিকশ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই consumer : আরও বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি একখানা বই produce করেছি — কেউ কেনে না বলে আমিই consumer, অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মতো ছিল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত — পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেলফ জোগাড় করছ না কেন?'

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই, বলছো ঠিকই — কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় জোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে, আর কিছু বই বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে। যে-মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না সেই লোকই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক বিবর্জিত। তার কারণটা কি?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, 'ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর? আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করাতে চাই। ধনীর মেহন্নতের ফল হল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে, ঢের উত্তম

পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সেই ফল ধনীদের হাতে গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না— বই পড়তে পারে না।'

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ. ই. ডি দিয়ে 'অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।'

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক জোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করে। একমাত্র বাঙলা দেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করাতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপূত হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে, 'তবে একখানা ভালো বই দিলে হয় না?' গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।'

যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি ভালোবাসা দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জৎ করতে চায়;তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়তো মনে মনে পঞ্চাশ গুণে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদ্রে জিদে'র মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন — অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্তালিনীয়রা তখন লাগল জিদের পিছনে — গালিগালাজ কটুকাটব্য করে জিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলল। কিন্তু আশ্চর্য, জিদের লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ করে সব কিছু শুনে গেলেন, জিদের হয়ে লড়লেন না। জিদের জিগরে জোর চোট লাগল — তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল। জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মূর্ছা গেল, কিন্তু সম্বিতে ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটল নিলাম-খানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

যে-সব লেখক জিদের হয়ে লড়েন নি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষর সহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জালই বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের মধ্যিখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলুম — কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন — জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন — যত কম লোকে কেনা-কাটাব খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গল। (বাঙলা দেশে নাকি একবার এরকম টিকি বিক্রি হয়েছিল।)

শুনতে পাই, এঁরা নাকি জিদকে কখনও ক্ষমা করেন নি।

আর কত বলব? বাঙালির কি চেতনা হবে?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকতো। আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালি যদি হটেনটট হত, তবে কোনো দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখি নি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, 'বাঙালির পয়সার অভাব।' বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ' থেকে।

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালির বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

□ *রচনাবলী,* ১৩৮১ (মিত্র ও ঘোষ)

মূলধনের বাজারের স্বরূপ

অতুল সুর

মূলধনের বাজার বলতে আমরা সেই বাজারকে বুঝি, যে বাজারের সহায়তায় শিল্পপতিরা তাঁদের উদ্যোগসমূহকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন। মাত্র শিল্পপতিরাই যে এ বাজারের সাহায্য নিয়ে টাকা সংগ্রহ করেন, তা নয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ ও বিবিধ স্বায়ত্তশাসনাধীন সংস্থাসমূহও (যেমন — পৌরসংস্থা, শহর-উন্নয়ন-সংস্থা, বন্দর-সংস্থা, রাজ্য বিদ্যুৎ-সরবরাহ অধিকর্তাসমূহ ইত্যাদি) এই বাজারের মাধ্যমেই তাঁদের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন। মূলধনের বাজার দেশের টাকার বাজারেরই অংশবিশেষ। তবে মূল টাকার বাজারের কাজ হচ্ছে স্বল্পমেয়াদি ঋণের সংস্থান করা, আর মূলধনের বাজারের কাজ হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি সংগ্রহ করে দেওয়া। যে উপায়ে মূলধনের বাজার থেকে টাকা সংগ্রহ করা হয় তা হচ্ছে কতগুলো অর্থপত্র বিক্রয় করে। সরকারি মহল থেকে যে অর্থপত্রসমূহ বাজারে উপস্থাপিত করা হয় সেগুলি ঋণপত্র; আর বে-সরকারি মহল থেকে যেগুলি আনা হয় সেগুলি হচ্ছে প্রধানত যৌথ মূলধনি কারবারের শেয়ার বা অংশপত্রসমূহ ও কিছু পরিমাণ ঋণপত্র। এই সকল ঋণপত্র ও অংশপত্রসমূহে কেনা-বেচার সাহায্য করাই মূলধনের বাজারের মূল কাজ। বলা বাহুল্য যে, মূলধনের বাজার সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে, কেন না দেশের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মনিযুক্ততা সৃষ্টি করবার জন্য যে মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, তা বহুলাংশে এই বাজারের মাধ্যমেই সংগৃহীত হয়। বস্তুত, এই বাজারের কর্মিষ্ঠতা ও কর্মতৎপরতার উপর দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের প্রসার নির্ভর করে।

২

মূলধনের বাজার দুই অংশে বিভক্ত। এক অংশে মাত্র সদ্য-সৃষ্ট ঋণপত্র ও শেয়ারসমূহ বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করা হয়; আর অপর অংশে আগে থেকে প্রচলিত বিদ্যমান ঋণপত্র ও শেয়ারসমূহের কেনা-বেচা হয়। প্রথম অংশকে নূতন অর্থপত্রের বাজার (New issue market) বলা হয়, আর দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় শেয়ার বাজার (Stock exchange)। সদ্য-সৃষ্ট ঋণপত্র ও অংশপত্রসমূহের বিক্রয়ে সাহায্য করবার জন্য যেমন নূতন অর্থপত্রের বাজারের প্রয়োজন আছে, সেরূপ পুরাতন ঋণপত্র ও শেয়ারসমূহ বিক্রয়ের জন্য শেয়ার বাজারেরও প্রয়োজন আছে। কেননা, যাদের কাছে নূতন অর্থপত্রের বাজারে ঋণপত্র ও

অংশপত্রসমূহ বিক্রয় করা হয়, তারা হচ্ছে দেশের সাধারণ সঞ্চয়কারী ব্যক্তিগণ। এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সাধারণ ব্যক্তি যখন আয় অপেক্ষা ব্যয় কম করে অর্থসঞ্চয় করে, তখন সেরূপ করবার তার একটা উদ্দেশ্য থাকে। সে উদ্দেশ্য, ঋণপত্র বা শেয়ার কেনা নয়। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যতের সংস্থান করা — হয় মেয়ের বিয়ের জন্য, আর তা নয়তো ছেলের লেখাপড়ার জন্য, বা বসবাসের জন্য একটা বাড়ি তৈরি করবার জন্য, বা বৃদ্ধবয়সে জীবিকা নির্বাহ করবার জন্য। সেই কারণে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে তারা টাকা সঞ্চয় করে, সেই উদ্দেশ্যমূলক ঘটনা যখন আসে, তখন টাকাটা তাদের হাতে পাওয়া চাই-ই। অথচ, টাকাটা একবার ঋণপত্র বা শেয়ার কেনায় আবদ্ধ হয়ে গেলে, সে টাকাটা ফেরত পাওয়া তাদের পক্ষে মুশকিল হয়। কেননা, ঋণপত্রসমূহের নির্দিষ্ট মেয়াদের তারিখ উত্তীর্ণ না হলে টাকাটা ফেরত দেওয়া হয় না, আর ইকুইটি শেয়ারের টাকা তো কখনই ফেরত দেওয়া হয় না। সেজন্য দাদনকারী সবসময় চায় যে, যে-উদ্দেশ্য নিয়ে সে ঐ বিনিযুক্ত টাকাটা সঞ্চয় করেছিল সেই উদ্দেশ্যমূলক ঘটনা উপস্থিত হলে, টাকাটা যেন তার হাতে আবার ফিরে আসে। এরূপ ক্রীত ঋণপত্র ও অংশপত্রসমূহকে রোক টাকায় পরিবর্তিত করে দেবার জন্যই শেয়ার বাজারের সৃষ্টি হয়েছে। শেয়ার বাজারের মাধ্যমেই, দাদনকারী যখন খুশি তখনই তার ক্রীত ঋণপত্র ও শেয়ারসমূহ রোক টাকায় পরিবর্তিত করতে পারে।

মূলধনের বাজার যে সমাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে, সে কথা তো আগেই বলা হয়েছে। কেননা, এই বাজার অর্থসংগ্রহে সহায়তা না করলে, দেশের শিল্পপতিদের পক্ষে তাদের শিল্প প্রকল্পসমূহকে রূপায়িত করা সম্ভবপর হত না। বলা বাহুল্য যে এগুলির রূপায়ণের উপরই দেশে উৎপাদনের প্রগতি ও কর্মনিযুক্ততার প্রসার নির্ভর করে। সুতরাং মূলধনের বাজার যে দেশের এক মহৎ কল্যাণ সাধন করে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যেহেতু বে-সরকারি মহল ছাড়া, সরকারি মহলেও শিল্প-উদ্যোগ প্রসারিত হচ্ছে, সেহেতু মূলধনের বাজারের গুরুত্ব আজ এক নূতন রূপ ধারণ করেছে। দেখুন না কেন, দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য সরকারি মহল গত ২৫ বছরের মধ্যে প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকা মূলধনের বাজার থেকে তুলেছেন। অনুরূপভাবে গত পনেরো বছরের মধ্যে বে-সরকারি মহলও মূলধনের বাজার থেকে ৭৬০ কোটি টাকা তুলেছেন।

মূলধনের বাজারের কার্যকারিতা নির্ভর করে দেশের লোকের মধ্যে সঞ্চয় অভ্যাস ও সঞ্চিত অর্থ পুঞ্জীকরণের উপর। সঞ্চিত অর্থ পুঞ্জীকরণে দেশের ব্যাঙ্কসমূহ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। সেদিক দিয়ে ব্যাঙ্কসমূহ মূলধনের বাজারের প্রধান সহায়ক। তাহলে বলতে হবে যে, ব্যাঙ্কসমূহের আবির্ভাবের সময় থেকেই মূলধনের বাজারের পথ তৈরি হয়েছে। এই সময়টা হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ। এই সময় থেকেই এদেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসা শুরু হয়। তবে ওই সময়ের ব্যাঙ্কসমূহ যে টাকা পুঞ্জীভূত করত, তা সাহায্য করত মূলধনের বাজারে মাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঋণপত্রসমূহ ক্রয় করতে। মূলধনের বাজারে শিল্পপতিদের আবির্ভাব তখনও হয় নি। কেননা, শিল্পপতিদের উত্থান হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝখান থেকে।

যদিও মূলধনের বাজার সমাজে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে, তথাপি এ দেশে

মূলধনের বাজারের অভ্যুত্থান হয়েছে অত্যন্ত মন্থরগতিতে। সত্য কথা কি, ১০-১৫ বৎসর আগে পর্যন্ত এ দেশে, পাশ্চাত্য দেশের অনুরূপ কোনো মূলধনের বাজার ছিল না। বর্তমানে এ বাজারের যা-কিছু সংগঠন ঘটেছে, তা মাত্র সাম্প্রতিককালেই ঘটেছে। তা সত্ত্বেও, এখনও এ দেশে মূলধনের বাজার পাশ্চাত্য দেশের মূলধনের বাজারের স্বরূপ বা পূর্ণতা পায় নি। আগেই বলা হয়েছে যে ব্যাঙ্কসমূহ জনসাধারণের সঞ্চয়লব্ধ অর্থের পুঞ্জীকরণ দ্বারা মূলধনের বাজার গঠনে সাহায্য করে। যদিও ব্যাঙ্কসমূহ এদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু হয়েছিল, তা সত্ত্বেও সেগুলি বিলাতে অবস্থিত আমানতি ব্যাঙ্কের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন, সেগুলির প্রধান কাজ ছিল দেশের বাণিজ্য ও শিল্পের জন্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেওয়া। এই কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানে এ দেশে শিল্প গঠনের সুবিধার জন্য যখন কোম্পানি আইন প্রণীত হল, তখন শিল্পপ্রবর্তকরা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে দেশের মধ্যে এক শূন্যময় পরিস্থিতি লক্ষ করলেন। এজন্য প্রবর্তকদের নিজেদেরই উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। সে সময় দেশের মধ্যে দাদনকারীর অভাবও তাদের দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারটাকে আরও দুরূহ করে তুলেছিল। অবশ্য, দাদনকারীর অপ্রতুলতার বহু কারণ ছিল। এটা তো সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার যে দাদনকারী সব সময় তার অর্থের নিরাপত্তা চায়। নূতন শিল্পসমূহের পক্ষে এই নিরাপত্তা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। তাছাড়া, তখনও কোনো সুসংবদ্ধ শেয়ার বাজারের অভ্যুত্থান হয় নি, যেখানে তারা শিল্পের শেয়ার ক্রয়ে নিযুক্ত অর্থ পুনরায় রোক টাকায় পরিণত করতে পারত। এই সকল কারণে সে যুগের সাধারণ দাদনকারী, সরকারি ঋণপত্রসমূহকেই নিরাপদ বিনিয়োগ বলে মনে করত। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এদেশে যখন শিল্পপতিদের আবির্ভাব হল, তখন তাদের বিশেষ বেগ পেতে হল তাঁদের উদ্যোগসমূহ রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে। এ সম্বন্ধে তাঁরা যে প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন সেটা সংক্ষেপে এখানে বলা যেতে পারে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের শরণাপন্ন হয়ে তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিসমূহের শেয়ার তাঁদের কাছে বেচে অর্থ সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। নিজেদের যা কিছু সঞ্চয়লব্ধ অর্থ হাতে ছিল, তাও তারা নিজেদের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ার কেনাতে নিযুক্ত করলেন। সুতরাং তাঁদের প্রধান চিন্তার বিষয় হয়েছিল, নিজেদের এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক নিয়োজিত অর্থের নিরাপত্তা রক্ষা করা। এই নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই তাঁরা এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ভার নিজেদের হাতে নিয়েছিলেন। এইভাবে জন্মগ্রহণ করল এদেশে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রণালী। কিন্তু শীঘ্রই তাঁদের এক সংকটের সম্মুখীন হতে হল। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের উপর চাপ দিয়ে শেয়ার বেচা এক জিনিস, আর তাদের সেই শেয়ার বরাবরের জন্য নিজেদের হাতে রাখতে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে আর এক জিনিস, বিশেষ করে সে যুগে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সাফল্য বা মুনাফা-অর্জন ছিল সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চয়তার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। এদিকে ম্যানেজিং এজেন্টগণ নিজেরাও যে শেয়ার ক্রয় করতেন, তাও তাঁদের নিজেদের হাতে চিরকালের জন্য রাখা অসম্ভব হল। কেননা গোড়ার দিকের এই সমস্ত শিল্পপ্রবর্তকরা ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী কল্পনাবিশিষ্ট ব্যক্তি। একটা উদ্যোগ স্থাপনের পরই তারা আর একটা উদ্যোগ স্থাপনে ব্রতী হতেন। এরূপ করবার

যথেষ্ট কারণ ছিল। কেননা যখন কোনো শিল্পপ্রবর্তক একটা চটকল স্থাপন করতেন, তখন তিনি দেখতেন যে ঐ চটকলকে অপরের কাছ থেকে বহু টাকার কয়লা কিনতে হয়। সুতরাং তিনি নিজেই একটা কয়লা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে প্রবৃত্ত হতেন। আবার দেখতেন যে কাঁচা ও পাকা মাল পরিবহণের জন্য বহু টাকা পরিবহণ কোম্পানিকে দিতে হয়। তখন তিনি একটা পরিবহণ কোম্পানি গঠন করতেও প্রয়াসী হতেন। আবার দেখতেন যে মালপত্র বীমা করবার জন্য বীমা কোম্পানিকে অনেক টাকা দিতে হয়। সুতরাং একটা বীমা কোম্পানি কায়েম করবারও মতলব করতেন। এইভাবে তাঁদের অধীনস্থ কোম্পানিগুলি একটার পর একটা বেড়েই যেতে লাগল। কিন্তু টাকা কোথা থেকে আসবে? টাকা তো সব প্রতিষ্ঠানেই বিনিযুক্ত হয়ে গেছে। সেজন্য প্রথম কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে তাঁরা যে অর্থ নিযুক্ত করেছিলেন, সেটা খালাস করে নেবার প্রয়োজন হল। ঐ শেয়ারগুলি অপরকে না বিক্রয় করতে পারলে, দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এখানেই শেয়ার বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রয়োজন উপলব্ধ হল।

আগেই বলা হয়েছে যে সংগঠিত শেয়ার বাজার বলতে সে যুগে কিছু ছিল না। ছিল মাত্র মুষ্টিমেয় শেয়ারের দালাল। তাও আবার তাঁদের কেনা-বেচার কাজ করতে হত হয় কোনো গাছতলায় দাঁড়িয়ে, আর তা নয়তো মুক্ত রাজপথে। ভিড় করবার জন্য পুলিশ তাঁদের প্রায় তাড়া করত, এবং তাঁদের নিকটস্থ কোনো অফিসভবনে আশ্রয় নিতে হত। এরূপ অসংবদ্ধভাবে এবং অসুবিধার মধ্য দিয়েও তাঁরা দাদনকারীদের সাহায্য করতেন মধ্যগ হিসাবে শেয়ারের কেনাবেচায়। গোড়ার দিকে তাঁরা মাত্র সরকারি ঋণপত্রসমূহেরই কাজ করতেন, কিন্তু পরে যখন সীমিত মূলধনি যৌথ কোম্পানিসমূহের সৃষ্টি হয়েছিল, তখন তাঁরা শেয়ারের কাজও করতে আরম্ভ করেছিলেন। আগেকার দিনের এই সব শেয়ারের দালালগণ, যদি এইভাবে শেয়ার কেনা-বেচায় সাহায্য না করতেন, তাহলে এটা সম্পূর্ণভাবে সন্দেহের বিষয়, শিল্প-উদ্যোগের আদি পর্বে প্রবর্তকদের পক্ষে শিল্প গঠন করা সম্ভবপর হত কি না। এই সকল দালালগণই পরে সংগঠিত শেয়ার বাজার স্থাপন করেছিলেন। বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজার সংগঠিত হয় ১৮৭৫ সালে;আহমেদাবাদের শেয়ার বাজারের জন্ম হয় ১৮৯৪ সালে; আর কলিকাতার শেয়ার বাজার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৮ সালে।

৩

আজকের দিনে শেয়ার বাজার মূলধনের বাজারের এক অপবিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা কালান্তরে ক্রীত শেয়ারসমূহকে রোক টাকায় পরিণত করবার সুবিধা শেয়ার বাজারের মাধ্যমে না পাওয়া গেলে, নূতন অর্থপত্রের বাজারে দাদনকারীরা কোনো শেয়ার কিনতে উৎসাহিত হতেন না।

পাশ্চাত্য দেশের মূলধনের বাজারের এক বৈশিষ্ট্যমূলক কাজ হচ্ছে, উপস্থাপিত নূতন শেয়ারের বীমাকরণ। ইংরাজিতে একে আন্ডার-রাইটিং বলা হয়। দাদনকারীরা উপস্থাপিত নূতন শেয়ার কিনুন, আর নাই কিনুন, এই বীমাকারীরাই সেই শেয়ারগুলি কিনে নিয়ে শিল্পপ্রবর্তকদের সমস্ত টাকাটা দিয়ে দেন। তার ফলে শিল্পপ্রবর্তকদের পক্ষে সম্ভবপর হয়

প্রস্তাবিত শিল্প রূপায়ণ করা। এই বীমাকারীদের আন্ডার-রাইটার বলা হয়। আজ শেয়ার বাজারের অনেক দালালও আন্ডার-রাইটার হিসাবে কাজ করছেন। এছাড়া, সাম্প্রতিককালে এ দেশে অনেক নূতন প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে, যাদের অন্যতম কাজ হচ্ছে শেয়ারের বীমাকরণ করা। এই সকল প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন, লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন, ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন এবং রাজ্য ফিনান্স ও ডেভলপমেন্ট করর্পোরেশনগুলি। বলা বাহুল্য যে; এই সকল বীমাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলধনের বাজারকে বলিষ্ঠভাবে গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এক কথায়, মূলধনের বাজারের ইতিহাসে এটা একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হবে যে, এ দেশে মূলধনের বাজার এখনও পাশ্চাত্য দেশের মূলধনের বাজারের কার্যকারিতা ও পূর্ণতা লাভ করে নি।

নূতন মূলধনের বাজারের সাফল্য যে মাত্র শেয়ার বিক্রয়ে সহায়তা করবার জন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের উপরেই নির্ভর করে, তা নয়। এটা নির্ভর করে দেশের মধ্যে অসংখ্য দাদনকারীর বিদ্যমানতার উপর — যারা সব সময় প্রস্তুত ও ইচ্ছুক থাকে বাজারে উপস্থাপিত শেয়ারগুলি ক্রয় করতে। মনে রাখতে হবে যে, মাত্র সঞ্চয় করলেই লোক দাদনকারী হয় না, সেই লোকের মধ্যে ঐ সঞ্চয়লব্ধ অর্থ বিনিয়োগ করবার প্রবৃত্তি ও ঈপ্সা থাকা চাই। অবশ্য এ সম্পর্কে অনেক অন্তরায় আছে। প্রথম অন্তরায় হচ্ছে, দেশের জনতার দারিদ্র। দেশের অধিকাংশ লোকই এমনভাবে দারিদ্র-জর্জরিত যে, সঞ্চয় করা তো দূরে থাকুক, দুবেলা দুমুষ্টি অন্ন সংস্থান করাও তাদের পক্ষে দুষ্কর। একমাত্র যাঁরা চাকুরি বা পেশা গ্রহণ করেছেন বা যাঁরা দেশের মধ্যে ধনাঢ্য ব্যক্তি, মাত্র তাঁদের পক্ষেই সম্ভবপর হয় অর্থ সঞ্চয় করা, এবং একমাত্র তাঁদেরই সঞ্চয় দেশের জাতীয় সঞ্চয়ভাণ্ডারকে পুষ্ট করে। এঁরাই হচ্ছেন দেশের দাদনকারী। স্বাধীনতালাভের আগে পর্যন্ত এঁদের মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন দেশের জমিদারশ্রেণী ও দেশীয় রাজন্যবৃন্দ। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর তাঁদের বিলোপের সঙ্গে, ভারতের মূলধনের বাজার থেকে তাঁদের তিরোভাব ঘটেছে, এবং এখন তাঁরা মাত্র ঐতিহাসিক জীবাশ্মে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু আগেকার দিনে এঁরাই ছিলেন শিল্প বিনিয়োগ ক্ষেত্রের স্তম্ভস্বরূপ। কেননা, তখনকার দিনে সাধারণ সঞ্চয়কারীরা শিল্প-বিনিয়োগ ক্ষেত্রে আসতে শঙ্কিত হতেন। সাম্প্রতিককালে এ বিষয়ে অবশ্য একটা শুভজনক পরিবর্তন ঘটেছে। সাধারণ সঞ্চয়কারীরা আজ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ার কিনতে আর সংকোচ বোধ করছেন না। এটা মূলধনের বাজারের প্রগতির দিক থেকে একটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন।

৪

অন্যান্য বাজারের মতো মূলধনের বাজারেরও আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে চাহিদা ও জোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। আমরা আগেই বলেছি যে মূলধনের বাজারে টাকার চাহিদা আসে সরকারি ও বেসরকারি, উভয় মহল থেকে। নূতন মূলধনের বাজারে সবচেয়ে বেশি টাকার

চাহিদা আসে সরকারি মহল থেকে। সাম্প্রতিককালে এই চাহিদার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে বাৎসরিক ৯০০ হতে ১,০০০ কোটি টাকা। সরকারি মহলের চাহিদা নির্ভর করে সরকারি নীতির উপর। আজ সমস্ত সরকারি নীতির লক্ষ্য হচ্ছে সাম্যবাদী সমাজ গঠন করা। এই কারণে দেশের উৎপাদন প্রণালীর মধ্যে সবকারি মহলের অনুপ্রবেশ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দশ-পনেরো বছর আগে যখন উৎপাদন প্রণালীর মধ্যে সরকার এত বেশি পবিমাণে প্রবেশ করেন নি, তখন মূলধনের বাজারে সরকারি সূত্রে উপস্থাপিত চাহিদার পরিমাণ বাৎসরিক ১০০ কোটি থেকে ১৫৫ কোটি টাকা ছিল। সুতবাং আগামী কালে, মূলধনের বাজারে সরকারি মহল থেকে উপস্থাপিত চাহিদাব পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধিই পাবে। অপবপক্ষে, বে-সবকারি মহল, মূলধনের বাজারে যে চাহিদা উপস্থাপিত করে, তা প্রভাবান্বিত হয় সুদের হাব, মূলধনের পার্যন্তিক কার্যকারিতা, শিল্প-ও কর নীতির দ্বারা। সাধারণত দেখা গেছে যে, বর্ধমান শিল্প বা যে সকল শিল্পের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ সেই সব শিল্পের তরফ থেকেই চাহিদা বেশি পরিমাণ আসে। সাম্প্রতিককালে বে-সরকারি মহল কর্তৃক উপস্থাপিত চাহিদার পরিমাণ ৩৭ কোটি টাকা থেকে ৯৮ কোটি টাকা পর্যন্ত হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে বে-সরকারি মহলের চাহিদার পরিমাণ নানারকম কারণের উপর নির্ভর করে। ঐ সকল কারণের মধ্যে প্রধানত আছে দেশের শিল্পনীতি ও করনীতি, বিনিয়োগের জন্য দাদনকারীদের আগ্রহ, ও বিনিয়োগ বাজারের অবস্থা ও পরিস্থিতি। টাকা সংগ্রহের বিকল্প সূত্রও এ সম্পর্কে অনেক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে। আগেকার দিনে শিল্পকাঠামোতে অর্থ জোগানের একটা স্বয়ংক্রিয় সূত্র ছিল। মুনাফার উপর করহারের স্বল্পতার দরুন শিল্পসমূহের পক্ষে সম্ভবপর হত মুনাফার একটা বেশ কিছু অংশ সংরক্ষিত ভাণ্ডারে অন্তরিত করা। ফলে ঐ টাকাটাই তারা কর্মবিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার কাজে নিযুক্ত করতে পারত। কিন্তু আজকের দিনে মুনাফার উপর উচ্চ করহারের জন্য এই স্বয়ংক্রিয় সূত্রের কার্যকারিতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। তা ছাড়া, আগেকার দিনে মূলধন সংগ্রহের আর এক সূত্র ছিল। একই পরিচালকবর্গের অধীনস্থ এক প্রতিষ্ঠানের 'অলস' অর্থ ভাণ্ডার অন্য প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগানো হত। এ সূত্রও আজ অনেক পরিমাণে সীমিত হয়ে গেছে, কোম্পানি আইনের নূতন বিধিসমূহদ্বারা। পরিস্থিতির এই পরিবর্তন ঘটায়, শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে আজ বেশি পরিমাণ দীর্ঘমেয়াদি অর্থের জন্য, শিল্পে অর্থ সরবরাহকারী আর্থিক সংস্থাসমূহের কিংবা নূতন মূলধনের বাজারের দ্বারস্থ হতে হয়। এছাড়া ইনফ্লেশন-জনিত কারণেও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির দাম অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার দরুনও চাহিদার পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মূলধনের বাজারে বে-সরকারি শিল্প কর্তৃক উপস্থাপিত অর্থের চাহিদা প্রধানত নির্ভর করে দুটি ঘটনার উপর — সংরক্ষিত মুনাফার পরিমাণ ও শিল্পে অর্থসরবরাহকারী সংস্থার কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণের উপর। তবে এ সম্পর্কে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় আছে। তার মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, যন্ত্রপাতি কেনার জন্য সংরক্ষিত ভাণ্ডার থেকে যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তার উপর কোনো সুদ প্রদানের দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু শিল্পে অর্থসরবরাহকারী সংস্থার কাছ থেকে যে টাকা

ধার করে যন্ত্রপাতি কেনা হয়, তার উপর নির্দিষ্ট হারে নিয়মিত তারিখে সুদ দিতে হয়। তাছাড়া নির্দিষ্ট তারিখে ওই টাকা প্রত্যর্পণেরও শর্ত থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একক্ষেত্রে টাকাটা দায়মুক্ত, আর অপরক্ষেত্রে টাকাটা দায়যুক্ত এবং এই কারণে নীট মুনাফা অর্জনের উপর ওর প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। অনুরূপভাবে নূতন মূলধনের বাজার থেকে যে টাকাটা তোলা হয়, তার দ্বারা কোম্পানির ইকুইটির বোঝা বেড়ে যায়, এবং তার ফলে অংশীদারদের ডিভিডেন্ড দেবার ক্ষমতার উপর চাপ পড়ে। নূতন সংগৃহীত মূলধনের পার্যন্তিক কার্যকারিতা যদি আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি না পায়, তাহলে ডিভিডেন্ডের হার কমে যায় এবং তার প্রতিক্রিয়া শেয়ার বাজারে ঐ কোম্পানির শেয়ারমূল্যের উপর প্রতিফলিত হয়।

বাজারের কার্যপ্রণালীর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন যে মূলধনের বাজারে মাত্র মূলধনের চাহিদা এলে পরেই, আর দাদনকারীদের হাতে সঞ্চয় ভাণ্ডার থাকলেই, উভয়ের মধ্যে মিলনের সমন্বয় ঘটে না। এক্ষেত্রেও অনেক রকম ঘটনা দ্বারা এই মিলন নিয়ন্ত্রিত হয়। যাঁরা মূলধনের বাজারের কর্মপ্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হতে চান, তাঁদের সর্বাগ্রে যে কথা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে, অর্থনীতির জোগান-চাহিদা বিধি অন্যান্য পণ্যের বাজারে যেভাবে কার্য করে, মূলধনের বাজারে সেভাবে কার্য করে না। তার কারণ হচ্ছে এই যে অন্যান্য বাজারে যে সকল পণ্যের কেনা-বেচা হয় তাদের বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণ হচ্ছে নশ্বরতা ও পচনশীলতা। কিন্তু মূলধনের বাজারে যে সকল অর্থপত্রের কেনা-বেচা হয়, সেগুলি এই বৈশিষ্ট্য থেকে বিমুক্ত। কেননা, অতীতকালে সৃষ্ট অর্থপত্র বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নূতন অর্থপত্র প্রবর্তিত হয়। তার ফলে আগে থেকে প্রচলিত অর্থপত্র ও নূতন সৃষ্ট অর্থপত্র, এই উভয়কে নিয়েই মূলধনের বাজারে বিক্রয়যোগ্য পণ্য রচিত হয়। এ বিষয়ে, দাদনকারীদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে যে, তারা পুরানো অর্থপত্র কিনবে, কি নূতন অর্থপত্র কিনবে। চাহিদা জোগানের এই প্রতিযোগিতায় পুরাতন অর্থপত্রসমূহ অনুকূল স্থান অধিকার করে। কেননা সেগুলির পিছনে থাকে সম্পাদিত কৃতিত্বের ছাপ, আর নতুন অর্থপত্রগুলি বহন করে মাত্র ভবিষ্যৎ কৃতিত্বের প্রতিশ্রুতি। এই কারণে শিল্পপতিরা বাধ্য হয় নূতন অর্থপত্রগুলিকে এমনভাবে আকর্ষণীয় করে দাদনকারীদের সামনে ধরতে, যে তারা সেগুলির প্রতি সহজে আকৃষ্ট হবে। সাধারণত এটা করা হয় মূল্যের সুবিধা দিয়ে। নূতন অর্থপত্রসমূহ বাজারে ছাড়া হয়, দামের দামে কিংবা সামান্য কিছু উঁচু দামে; আর পুরাতন অর্থপত্রসমূহ তাদের শেষ প্রদত্ত ডিভিডেন্ড হারের ভিত্তিতে শেয়ার বাজারে যথাযথ সর্বোচ্চ দামে বিক্রয় হয়। এই দামের ব্যবধানই দাদনকারীদের প্রলুব্ধ করে নূতন মূলধনের বাজারে নূতন অর্থপত্র কিনতে। কিন্তু এছাড়া আর একটা কারণ আছে। সেটা হচ্ছে, নূতন কোনো অর্থপত্র বাজারে যে মুহূর্তে উপস্থাপিত করা হয়, সেই মুহূর্তে দাদনকারীদের হাতে কী পরিমাণ মজুত টাকার জোগান আছে তার উপর। এই সম্পর্কে মনে রাখবার বিষয় হচ্ছে এই যে, বাজারে মূলধনের চাহিদা অসমগতিতে প্রকাশ পায়; আর দাদনকারীদের হাতে টাকা সঞ্চিত হয় ধীরে ধীরে এবং কালের গতির সঙ্গে সমতা রেখে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সঞ্চয়ের ছন্দের সঙ্গে, নূতন অর্থপত্র প্রবর্তনের ছন্দের কোনো মিল নেই। কোনো বিশেষ সময়ে দাদনকারীদের হাতে যে

রোক টাকা থাকে তার দ্বারাই নির্ণীত হয় এই বৈষম্যপূর্ণ ছন্দের মধ্যে মিল ঘটবে কি না। অবশ্য একথাও এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে, যে-কোনো দাদনকারী যে-কোনো সময় তার হাতের রোক টাকার পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে তার হাতে পুরাতন যে সকল অর্থপত্র আছে, সেগুলি বিক্রয় করে। কিন্তু সেরূপভাবে সে হাতের রোক টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করবে কি না, সে সিদ্ধান্ত নির্ভর করে অনেক রকম ঘটনার উপর। নূতন মূলধনের বাজারে উপস্থাপিত নূতন অর্থপত্র প্রবর্তন যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তার কৌশল রচনার সময় প্রবর্তকরা উপরোক্ত ঘটনাবলী যথাযথভাবে বিবেচনা করেন। নূতন অর্থপত্র বিক্রয়ের সাফল্য, অবশ্য আরও দুটি ঘটনার উপর নির্ভর করে। তার প্রথমটা হচ্ছে অর্থপত্রসমূহকে অনুকূল মুহূর্তে উপস্থাপন করা, আর দ্বিতীয় হচ্ছে উপস্থাপন করবার যথাযথ প্রণালী অবলম্বন করা। বিক্রয় করবার কৌশল এ সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সাম্প্রতিককালে আন্ডার-রাইটিং-এর অভ্যুত্থানের সঙ্গে এই কৌশলের যে পরিবর্তন ঘটেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৫

আমরা আগেই দেখেছি যে নূতন মূলধনের বাজারে চাহিদার দিকে অবস্থান করছে দেশের সরকারি এবং বে-সরকারি মহল ও জোগানের দিকে অবস্থান করছে দেশের অসংখ্য দাদনকারী ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহ, এবং এই উভয়ের মধ্যে মিলন সাধন করানোই হচ্ছে মূলধনের বাজারের আসল কাজ। এই মিলন সাধন করবার জন্য উভয়বর্গের মধ্যভাগে মধ্যগ হিসাবে বহু ব্যক্তি ও সংস্থা আছে। এই সকল ব্যক্তি ও সংস্থার প্রধান কাজ হচ্ছে, দাদনকারীদের হাতে ধীরগতিতে যে অর্থ সঞ্চিত হয়, তার পুঞ্জীকরণ করা এবং ওই পুঞ্জীভূত অর্থ যাতে মূলধনের বাজারে গৌণ বা মুখ্যভাবে অর্থপত্র কেনার কাজে বিনিযুক্ত হয়, তার ব্যবস্থা করা। এই সকল মধ্যগের মধ্যে আছে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন, ইউনিট ট্রাস্ট অব্ ইন্ডিয়া, ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, প্রভিডেন্ট ফান্ড সংস্থা, পেনশন ফান্ড, স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহকারী সংস্থা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, এরা সকলেই মূলধনের বাজারের অন্যতম অংশস্বরূপ।

এখানে বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে টাকার বাজারের মতো দেশের নূতন মূলধনের বাজারও কোনো বিশেষ জায়গায় বা ভবনে অবস্থিত নয়। মূলধনের বাজারের কার্যকর সংস্থা ছড়িয়ে আছে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত। তার মানে এই যে, মূলধনের বাজারের কোনো কেন্দ্রীয় মিলনস্থান নেই, যেখানে ক্রেতাবিক্রেতার দল পরস্পর মিলিত হয়ে তাদের কার্য সমাধা করতে পারে। এ বিষয়ে আসল টাকার বাজারের (স্বল্পমেয়াদি ঋণের বাজার) সঙ্গে এর একটা সাদৃশ্য আছে। কেন না টাকার বাজারও এরূপ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। এরূপ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকলেও মূলধনের বাজারে যাঁরা জোগান ও চাহিদার মধ্যে মিলন ঘটাবার জন্য উপস্থিত আছেন, তাঁরা সকলেই একান্তভাবে চেষ্টা করেন উপস্থাপিত কোনো বিশেষ চাহিদা যাতে সাফল্যমণ্ডিতভাবে উপযোজিত হয়। এই সকল সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে দেশের টাকার বাজার, শেয়ার বাজার, আন্ডার-রাইটিং সংস্থা ও আরও অনেক পরিস্ফুট ও

অপরিস্ফুট ব্যক্তি, সংস্থা ও ব্যবস্থাসমূহ, যাদের সকলেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলধনের জোগান ও চাহিদার মধ্যে সমন্বয় ঘটানো। এই সকল ব্যক্তি ও সংস্থা নিজেদের সর্বদা নিযুক্ত রাখেন এমন সব সুযোগ ও সুবিধার ব্যবস্থা করতে, যাতে দেশের মধ্যে সঞ্চয়লব্ধ পুঞ্জীভূত অর্থ অবিশ্রান্তভাবে এক শ্রেণীর (দাদনকারীর) হাত থেকে আর এক শ্রেণীর (শিল্পপতিদের) হাতে গিয়ে পৌঁছায়। আমরা পরে দেখব যে জিনিসটা এখানে যত সহজভাবে বলা হচ্ছে, আসলে সেটা তত সহজ নয়। কেননা যে প্রণালীর মাধ্যমে মূলধনের জোগান ও চাহিদার সমন্বয় ঘটে, তার কর্মধারা হচ্ছে অত্যন্ত জটিলতাপূর্ণ। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে মাত্র এই কথাই বলা যেতে পাবে যে, এই প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলধনেব বাজারে চাহিদার সক্রিয়তা রক্ষা করা, এবং দাদনকারীদের এমনভাবে আকৃষ্ট করা, যাতে তারা তাদের সঞ্চয়লব্ধ অর্থ সেই চাহিদা মেটাতে নিয়োগ করে।

যেসকল ব্যক্তি ও সংস্থা, মধ্যগ হিসাবে মূলধনের বাজারে ক্রিয়াশীল থাকে, তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি অর্থপত্রসমূহ দাদনকাবীদের কাছে বিক্রয় করা। এই সকল অর্থপত্র যে মাত্র শিল্পপতিরাই সৃষ্টি করেন, তা নয়; দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ দ্বারাও সেগুলি সৃষ্ট হয়। বস্তুত কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ কর্তৃক উপস্থাপিত অর্থপত্রগুলি মূল্য পরিমাণের দিক থেকে শিল্পপতিদের দ্বারা আনীত অর্থপত্রগুলির মূল্য পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশি। পাছে উভয়ের মধ্যে কোনোরূপ প্রতিযোগিতা ঘটে, তা এড়াবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

বলা বাহুল্য যে যাঁরা এই সকল অর্থপত্র বাজারে উপস্থাপন করেন তাঁরাই হচ্ছেন এ বাজারের বিক্রেতা, আর দেশের দাদনকারী ব্যক্তি ও সংস্থাগুলি হচ্ছেন এ বাজারের ক্রেতা। যদিও কখনও কখনও দাদনকাবীবা এই সমস্ত অর্থপত্র সরাসরি উপস্থাপকদের কাছ থেকে কেনেন, তা হলেও অর্থপত্রের কেনা-বেচার কাজ বহুলাংশে বাজারের মাধ্যমে এবং এই সকল মধ্যগের সাহায্যেই হয়।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত এ দেশে এ সকল মধ্যগের অভাবই মূলধনের বাজারের প্রধান ত্রুটি ছিল। বস্তুত এই সকল মধ্যগের অভাবের জন্য এ দেশে দীর্ঘমেয়াদি অর্থপত্রসমূহের কেনা-বেচার কাজ শেয়ার বাজারের দালালগণের স্কন্ধেই চেপে ছিল। কিন্তু শেয়ার বাজারের দালালগণের মাধ্যমে এই সকল অর্থপত্রের বিক্রয়প্রণালী অত্যন্ত মন্থর ও কঠিন ছিল। সেজন্য শিল্পপতিদের পক্ষে মূলধন সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ছিল। এক কথায়, কিছুকাল আগে পর্যন্ত এ দেশে দীর্ঘমেয়াদি অর্থপত্রগুলির কেনা-বেচার বাজার (মূলধনের বাজার) অত্যন্ত অনুন্নত অবস্থায় ছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে দেশের শেয়ার বাজার, শিল্পপতি ও দাদনকারী এই উভয়েরই প্রভূত উপকার সাধন করেছে। বিশেষ করে দাদনকারীদের সাহায্য করেছে, ক্রীত দীর্ঘমেয়াদি অর্থপত্রগুলি রোক টাকায় যাতে পরিণত করা যায়, তার সুবিধার ব্যবস্থা করে। এই সুবিধা একমাত্র শেয়ার বাজারই দেয়। বস্তুত শেয়ার বাজার না থাকলে, আগেকার দিনে শিল্পপতিদের পক্ষে মূলধন তোলবার জন্য অর্থপত্র বিক্রয় করা একেবারেই অসম্ভব হত।

একটু চিন্তা করেই দেখুন না কেন, যদি শেয়ার বাজার না থাকত, তা হলে দাদনকারীদের কি না মুশকিলের সম্মুখীন হতে হত। যদি ক্রীত অর্থপত্রগুলি রোক টাকায় পরিণত করবার দরকার হত, তাহলে দাদকারীদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে হত, নূতন ক্রেতার সন্ধানে, শুধু তাই নয়, যে-কোনো দামে তাকে ওই অর্থপত্রগুলি বেচতে হত। বলা বাহুল্য এরূপ পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে কখনও সম্ভবপর হত না যথাযথ দাম উদ্ধার করা। এটা যে মাত্র ব্যক্তিবিশেষ দাদনকারীরই সমস্যা ছিল, তা নয়। দাদনকারী সংস্থাগুলির পক্ষেও সমস্যা ওই একই ছিল। কেননা, যে কোনো দাদনকারী, তা সে ব্যক্তিবিশেষই হউক, আর কোনো সংস্থাই হউক, সকলেরই পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, প্রয়োজনের সময় ক্রীত অর্থপত্রগুলিকে রোক টাকায় পরিণত করা। সেইজন্য, মূলধনের বাজারে অর্থপত্রসমূহকে আকর্ষণীয় করতে হলে, সেগুলিকে 'তরলতা' (liquidity বা রোক টাকায় পরিণত করবার ক্ষমতা) দিতে হবে। একমাত্র শেয়ার বাজারই এই 'তরলতা' এনে দেয়। সেদিক থেকে, শেয়ার বাজার হচ্ছে নূতন অর্থপত্রসমূহের বাজারের পরিপূরক।

মূলধন সরবরাহ করবার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত কয়েকটি সংস্থার আজ দেশের মধ্যে উদ্ভব হয়েছে। তার ফলে পাশ্চাত্য দেশের অনুরূপ মূলধনের বাজার এদেশেও গঠিত হতে আরম্ভ হয়েছে। তবে এজন্য শেয়ার বাজারের গুরুত্ব কিছু পরিমাণে কমে নি, পরিপূরক বাজার হিসাবে এর তো গুরুত্ব আছেই। তাছাড়া বর্তমানে নূতন অর্থপত্রসমূহের বিক্রয় ব্যাপারে শেয়ার বাজারের দালালগণ বিশেষভাবে সহায়তা করছেন। তাঁরা মধ্যগ হিসাবে এসকল অর্থপত্র নিজেদের তালিকাভুক্ত খরিদ্দারগণকে শুধু যে কেনবার জন্য উৎসাহিত করেন তা নয়, অনেকক্ষেত্রে তাঁরা আন্ডার-রাইটিং দ্বারা শিল্পপতিদেরও মূলধন আহরণে সাহায্য করছেন।

এই সকল অর্থপত্রসমূহের কেনা বেচায় শেয়ার বাজারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই, ১৯৫৬ সালে ভারতীয় সংসদ নূতন কোম্পানি আইন রচনার সময়, ওর মধ্যে ৭৩ নং ধারা নিবদ্ধ করেছেন। ঐ ধারায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোনো অর্থপত্র নূতন মূলধনের বাজারে উপস্থাপিত করবার সময়, সম্পর্কিত ঘোষণাপত্রে একথা লেখা থাকে যে ঐ অর্থপত্র কোনো অনুমোদিত শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত করা হবে, তা হলে উপস্থাপক কোম্পানিকে উপস্থাপনের দশ দিনের মধ্যে তালিকাভুক্ত করণের জন্য শেয়ার বাজারের পরিচালকবর্গের কাছে আবেদন করতে হবে এবং শেয়ার বাজারের পরিচালকবর্গ যদি আটাশ দিনের মধ্যে (ক্ষেত্র বিশেষে এই সময় ৪৯ দিন পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়) উক্ত অর্থপত্র নিজেদের তালিকাভুক্ত না করেন, তা হলে যেসকল দাদনকারী উক্ত অর্থপত্র কেনার জন্য আবেদন করেছেন, তাঁদের সকলকে বিনা বাক্যব্যয়ে ঐ টাকা ফেরত দিতে হবে।

নূতন মূলধনের বাজারের সঙ্গে যে মাত্র শেয়ার বাজারেরই প্রগাঢ় সম্পর্ক আছে তা নয়, দেশের টাকার বাজারের সঙ্গে এর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। কেননা, টাকার বাজারই দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়লব্ধ অর্থ পুঞ্জীভূত করে। টাকার বাজার প্রধানত গঠিত হয় দেশের ব্যাঙ্কসমূহকে নিয়ে। ব্যাঙ্কসমূহ অসংখ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে জাতীয় সঞ্চয়কে পুঞ্জীভূত করে, এবং নূতন মূলধনের বাজারে চাহিদার জোগান

মেটাবার জন্য প্রস্তুত রাখে। শুধু তাই নয়। যখন নূতন মূলধনের বাজারে, কোনো নূতন অর্থপত্র উপস্থাপিত করা হয়, তখন ব্যাঙ্ক সমূহের উপরই ন্যস্ত হয় দাদনকারীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র ও দাম গ্রহণ করবার দায়িত্ব। যদি আমরা একথা স্মরণ করি যে নূতন মূলধনের বাজারের প্রধান কাজ হচ্ছে চাহিদা ও জোগানের মিলন সাধন করা, তা হলে ব্যাঙ্কসমূহ মধ্যগ হিসাবে যে কাজ করে, তার গুরুত্ব আমরা সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করতে পারব। এছাড়া ব্যাঙ্কসমূহ শেয়ার বাজারের কেনা-বেচাতেও অর্থসরবরাহ করে মূলধনের বাজারের পুষ্টিসাধন করে।

নূতন অর্থপত্রের বাজারে আন্ডার-রাইটারগণের কাজও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, উপস্থাপিত অর্থপত্রসমূহ যদি দাদনকারীরা না কেনে, তাহলে আন্ডার-রাইটারগণই অবিক্রীত অর্থপত্রসমূহ নিজেদের কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে উপস্থাপক কোম্পানিকে তার দাম দিয়ে দেন। তার ফলে উপস্থাপক কোম্পানির পক্ষে সম্ভবপর হয় তার প্রকল্পসমূহ সঙ্গে সঙ্গে রূপায়িত করা। ২০।৩০ বৎসর পূর্বে এদেশে আন্ডার-রাইটিং প্রথা ছিল না বললেই হয়। তখন বহু ভালো ভালো শিল্পপ্রকল্প মূলধনের অভাবে সূতিকাগারেই মারা যেত। আজ দেশের মধ্যে আন্ডাররাইটিং সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ সে উৎকট অবস্থার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের পরে এদেশের বিনিয়োগ বাজারে এক অত্যন্ত হাতাশাব্যঞ্জক মন্দা প্রকাশ পায়। তার ফলে নূতন অর্থপত্র কেনার বিষয়ে দাদনকারীদের মধ্যে আর কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। ঐ সময় যেসকল শিল্পপ্রকল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলি কোনোদিনই সাফল্যমণ্ডিত হত না, যদি না আন্ডার-রাইটারগণ উপস্থাপিত অর্থপত্রসমূহ নিজেরাই কিনে নিতেন। বর্তমানে যে সকল বিশেষ সংস্থা আন্ডার-রাইটিং-এর কাজে লিপ্ত আছেন, তাদের মধ্যে আছেন — লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন, স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনসমূহ ইত্যাদি। এছাড়া, শেয়ার বাজারের দালালগণ, ব্যাঙ্কসমূহ, সাধারণ ইনসিওরেন্স কোম্পানি, ব্যক্তিবিশেষ প্রভৃতি, এঁরাও আজ আন্ডার-রাইটিং-এর কাজ গ্রহণ করছেন। যদিও এইভাবে উন্নত প্রণালীর মূলধনের বাজার আজ এদেশে গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে, তবু বলতে হবে যে পাশ্চাত্য দেশের অনুরূপ সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত মূলধনের বাজার এখনও এদেশে স্থাপিত হয় নি।

☐ *ভারতে মূলধনের বাজার*, ১৯৭৭

সবার নীচে সবার পিছে

অন্নদাশঙ্কর রায়

সকাল বেলা আমার ট্রেন। আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন আমার বন্ধু ও বন্ধুপত্নী। যাঁদের আমি অতিথি। বন্ধুর মা থাকতেন আলাদা একটি ঘরে। আমাকে বিদায় দেবার জন্যে ঘব থেকে বেরিযে আসেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে টিপ করে প্রণাম করি। তিনি আঁতকে বলেন, "আমি এইমাত্র স্নান করে উঠেছি। শুদ্দুর আমাকে ছুঁয়ে দিল!"

বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে সেই সকালে আরও একবার স্নান করতে হবে। আমারই তো ক্ষমা প্রার্থনা কবার কথা। লাথি খেয়ে যেমন সাহেবকে বলতে হয়, "সার, পায়ে লাগেনি তো!" আমি আর বাক্যব্যয় না করে গাড়িতে গিয়ে বসি। কী হয়েছে কাউকে জানতে দিইনে। বন্ধু ও বন্ধুপত্নী শুনলে ব্যথা পেতেন। তাঁরা দুজনেই উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত। ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। তাঁদের কী দোষ! না, বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণীকেও আমি দোষ দিইনে। বুদ্ধিমতী হলে তিনি মুখ ফুটে ওকথা বলতেন না। আমার প্রস্থানের পর দ্বিতীয়বার স্নান করে শুদ্ধ হতেন। না করে তাঁর স্বস্তি ছিল না। হাজার হাজার বছরের সংস্কার।

ঘটনাটা ঘটে স্বাধীনতার পাঁচ বছর পরে। ততদিনে নতুন সংবিধান তৈরি হয়ে গেছে। অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ হয়েছে। তার জন্য শাস্তির বিধান আছে। মনুর বিধান উল্টে দিয়েছে নব্য মনুসংহিতা। কিন্তু সেসব তো শুধু কাগজে কলমে। সংবিধানের একটা বাংলা অনুবাদ হয়েছিল শুনেছি। সেটা নাকি ছাপা হয়েছিল দেবনাগরী লিপিতে। যাদের জন্য সংবিধান তারা জানতেই পায়নি সংবিধান তাদের কী কী অধিকার দিয়েছে। কী কী তাদের জন্মস্বত্ব। দেশে সংবাদপত্রের অভাব ছিল না। কোথাও জনগণের স্বার্থে তাদের জ্ঞাতব্য ধারাগুলি পরিবেশিত হতে দেখি নি।

এমন যে দেশ সে দেশে জনগণের একটি বৃহৎ অংশ ত্রিশবছর পরেও সংস্কারবদ্ধ সংরক্ষণশীল উচ্চতর বর্ণের দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়া বিচিত্র নয়। তা বলে এটা কি কেউ কখনও কল্পনা করতে পেরেছে যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত মানুষদের পাইকারিভাবে পুড়িয়ে মারা হবে? এখন পর্যন্ত আমরা শুনতে পাইনি যে নিহতদের মধ্যে স্পৃশ্যরাও ছিল। তা যদি হত তবে বলতে পারা যেত ওটা বর্ণভেদমূলক নয়, ওর মূলে অর্থনীতি।

সব অনর্থের মূলেই অর্থ, এটা একটা অত্যাধুনিক আবিষ্কার নয়। শাস্ত্রেই তো লিখেছে

অর্থমনর্থম্। সুতরাং অস্পৃশ্যদেরও নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আর্থিক দাবিদাওয়া থাকতে পারে, যেটা শুনলে স্পৃশ্য জোতদার বা মহাজনদের পিত্ত জ্বলে যায়। তা বলে পুড়িয়ে মারা। সেটা কি সম্ভবপর, যদি তারা অস্পৃশ্য না হয়ে স্পৃশ্য হয়? অর্থনীতির আলোয় অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ আমাকে বোঝাতে পারেননি বিত্তহীন ভূমিহীন হিন্দুদেরও কেন পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তু ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে হয়। এখানে অর্থনীতি পরাস্ত। এই ধাঁধার উত্তর অর্থনীতিশাস্ত্রে নেই। এর উত্তর হিন্দুদেরও ভোট আছে আর সে ভোট তারা গোঁড়া মুসলমানদের না দিয়ে উদার মুসলমানদের দেবে, ফলে গোঁড়ার দল হেরে যাবে ও ক্ষমতা খোয়াবে। হিন্দুরা পালিয়ে এলে গোঁড়াদেরই জয়জয়কার। গোঁড়ারা যেদিন বুঝবে যে হিন্দুদের ভোট নেই কিংবা থাকলেও সে ভোট তাদের বিপক্ষে পড়বে না সেদিন তারা হয়তো বিত্তহীন ভূমিহীন হিন্দুকে টিকতে দেবে।

উপরে যেটা দিলুম সেটা একটা উদাহরণ। এক্ষেত্রে হয়তো সেটা প্রযোজ্য নয়। পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের তাড়িয়ে দিলে জমি চাষ করবার জন্যে মুসলমান পাওয়া যায়, এতই তাদের সংখ্যাধিক্য। কিন্তু ভারত থেকে অস্পৃশ্যদের তাড়িয়ে দিলে জমি হবে পোড়ো জমি। স্পৃশ্যদের যদি চষতে বলা হয় ওরা হাঁকবে চড়া মজুরি। তা হলে ঘুরে ফিরে আবার অর্থনীতিতেই এর ব্যাখ্যা খুঁজতে হল। স্পৃশ্যরা সস্তা নয়, অস্পৃশ্যরা সস্তা। অস্পৃশ্যতা দূর হলে ওরাও স্পৃশ্য হবে, সুতরাং ওরাও আক্রা হবে। কলোনিয়াল ইকনমিতে চিপ লেবারের যে স্থান ফিউডাল ইকনমিতেও চিপ লেবারের সেই স্থান। তফাতটা এইখানে যে গ্রাম-দেশে চিপ লেবার বলতে বোঝায় ভূমিহীন চাষি আর তাদের মধ্যে একেবারেই নিঃস্ব অস্পৃশ্য দিনমজুর। অস্পৃশ্য বলেই তারা নিঃস্ব, না নিঃস্ব বলেই তারা অস্পৃশ্য, এটা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। আমি বৈজ্ঞানিক বা অর্থনীতিবিদ্ নই। আমার পক্ষে এটা অনধিকারচর্চা। তবু বলে রাখি যে আমার মতো অস্পৃশ্যরা হচ্ছে তাদের বংশধর আর্য আগন্তুকরা যাদের বলতেন দস্যু বা দাস। তাদের কতক অবশ্য প্রমোশন পেয়ে আর্যদের সমাজ সংগঠনে শূদ্র ও আবার প্রমোশন পেয়ে সৎ শূদ্র হয়েছে। তারা স্পৃশ্য। তারা জল-চল। তা হলেও তারা "শুদ্দুর"। তারা "টা"।

বিয়ের সময় বা শ্রাদ্ধের সময় উচ্চারণ করতে হয় "অমুকচন্দ্র ঘোসিদাসস্য পুত্রঃ"। মহিলা হলে "শ্রীমতী অমুকা দাসী"। এর একটা ক্লাসিকাল দৃষ্টান্ত "রানি হর্ষমুখী দাসী"। পাইকপাড়া রাজবংশ। রানি হলেও দাসী। অভিজাত কায়স্থ পরিবারের মহিলারাও সরকারি কাগজপত্রে "দাসী" বলে পরিচিত ছিলেন। পরে কেউ কেউ সাহস করে "দেবী" হন। যেমন শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। কিন্তু অধিকাংশই ব্রাহ্মসমাজের ধারা অনুসরণ করে "রায়" "চৌধুরী", "ঘোষ", "বসু" ইত্যাদি পদবি ব্যবহার করেন। এটা একটা সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন। আজকাল গ্রাম অঞ্চল থেকে যারা কলকাতায় গৃহস্থালীর কাজ করতে আসে তাদের নাম ও পদবি "রতনবালা বৈদ্য" বা "পূর্ণিমা মালী"। যার স্বামীর পদবি "দাস" সেও বলবে তার নাম "সুভদ্রা দাস"। পতির পদবিতে সতীর পদবী, এটা বিলিতি কেতা। প্রথমে এটা আসে দেশীয় খ্রিস্টান সমাজে, তারপরে ব্রাহ্মসমাজে,

তারপরে হিন্দু সমাজে। এখন তো মুসলমান সমাজেও দেখছি। যেমন "বেগম বদরুন্নিসা আহমদ।" সবচেয়ে চমৎকার "মণিকা রহমান বন্দ্যোপাধ্যায়।" ইংরেজরা পরোক্ষভাবে নারীকে মুক্তি দিয়ে গেছে, বিশেষত শূদ্রাণীকে। নইলে এখনও সেই "গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী"র অনুবৃত্তি চলত।

মানবিক মর্যাদাকে পদদলিত করে সামাজিক প্রগতি হতে পারে না। যে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত না হয়ে বর্ণবিভক্ত বা জাতিবিভক্ত তাকে সর্বপ্রথমে শ্রেণীশূন্য না করে বর্ণশূন্য বা জাতিশূন্য করতে হবে। তার পরের অধ্যায় শ্রেণীশূন্যতা। প্রথম কাজটি প্রথমে। তাতে কিন্তু বিপ্লবের উন্মাদনা নেই। ইতিহাসে লেখা হবে না যে অমুক সালেব অমুক মাসে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। অথচ এটাও কি একপ্রকার বিপ্লব নয়? চার পাঁচ হাজার বছরের 'দাস' বংশীয়দের দাস্যতা বিমোচন। যারা এতদূর এগিয়েছে তারা আরও অনেকদূর এগোবে। চারশো বছর আগে ইংলন্ডের প্রোটেসটান্টদেরও তো পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। যে আগুনে তাদের পুড়িয়ে মারা হয় সেই আগুনই পুড়িয়ে খাক্ করে দেয় সে দেশের সনাতন ব্যবস্থা। আজকের ভারতে যারা আগুনে পুড়ে মরছে কালকের ভারতে তাদেরই বংশধররা সমাজের চূড়ায় বসবে। এই পরিবর্তনটা যেন শান্তিপূর্ণভাবে হয়। নয়তো কী হবে তার ইঙ্গিত রয়েছে ইংলন্ডের, ফ্রান্সের, জার্মানির ইতিহাসে।

আমার বরাবর আশঙ্কা ছিল যে স্বাধীনতার পর সতীদাহ আবার ফিরে আসবে। সেটা যে এখনও ফিরে আসে নি এর জন্যে ইতিহাস বিধাতাকে ধন্যবাদ। কিন্তু এটাও তো একপ্রকার দাহ। আইন আদালতের সাহায্যে একে দমন করতে হবে। কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। একে নিবারণ করতে হবে, প্রতিরোধ করতে হবে। সমস্ত শক্তি দিয়ে। যারা সবার নীচে তাদের টেনে তুলতে হবে, যারা সবার পিছে তাদের এগিয়ে দিতে হবে।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের মুখে শুনেছিলুম মহাত্মা গান্ধী নাকি বলেছিলেন যে 'হরিজন'দের প্রতি যদি সুবিচার না হয় তবে আর পঁচিশ বছরের মধ্যেই হিন্দুসমাজ ভেঙে যাবে। তিনি ছিলেন হিন্দুসমাজের অকৃত্রিম হিতৈষী। তাই 'হরিজন'দের প্রতি সুবিচারের জন্যে আবেদন-নিবেদন করেছিলেন। আবেদন-নিবেদনে ফল হচ্ছে না দেখে শেষের দিকে তিনি 'হরিজন'দের প্রতি সুবিচারের ইস্যুতে অনশন করার কথাও ভাবছিলেন। সেটাই হত তাঁর জীবনের শেষ অনশন। তার আগেই বেধে যায় দিল্লির মুসলমানদের উপর সশস্ত্র হিন্দুদের হামলা। সেটা বন্ধ করতে নতুন সরকারের অক্ষমতা ও কারও কারও অনিচ্ছা উপলব্ধি করে তিনি সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি সুবিচারের ইস্যুতেই তাঁর জীবনের শেষ অনশন আরম্ভ করেন। অনশনভঙ্গের অল্পদিনের মধ্যেই সশস্ত্র হিন্দুর হাতে নিধন। তাই 'হরিজন'দের প্রতি সুবিচারের ইস্যুতে শেষ অনশন আর সম্ভব হল না। কিন্তু কথাটা ঘুরছিল তাঁর মাথায়। আন্দোলনটাকে আবেদন নিবেদনের স্তর থেকে আরও এক ধাপ উপরে তোলার প্রয়োজন ছিল। ত্রিশ বছর আগে।

আজ ত্রিশ বছর বাদে একথা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণও চিন্তা করছেন। সবকারের কর্তব্য যদি সরকার না করতে পারেন, অক্ষমতার আড়ালে যদি কারও কারও অনিচ্ছা থাকে, তা হলে আবেদন নিবেদন করেই ক্ষান্ত হলে চলবে না। কারণ এই ইস্যুতে হিন্দুসমাজে

ভাঙন ধরবে। আর এ দেশের শতকরা পঁচাশিজনই তো হিন্দু। তবে আমার মতো লোকের বেদনাটা হিন্দুসমাজের মুখ চেয়ে নয়। মানবজাতির মুখ চেয়ে। একদল মানুষ আরেকদল মানুষকে জার্মানিতে ও পোলাণ্ডে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গ্যাস চেম্বারে দগ্ধ করে হত্যা করেছিল এটা মানবমাত্রেরই মুখে কালি। এখানে ইহুদি খ্রিস্টান হিন্দুসমাজের প্রশ্ন ওঠে না। দক্ষিণ ভারতে নরমেধযজ্ঞ ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে এমন ভাবে অভিভূত করে যে তিনি কলম হাতে নিয়ে নাটক লিখে ফেলেন, সে নাটক অভিনয়ও করান। আমিও ছিলুম নাটকের একজন দর্শক। ধীরেন্দ্রনাথ গান্ধীপন্থী নন, মার্কসপন্থী। অথচ তিনিই হলেন অগ্রণী। গান্ধীপন্থীরা তখন কোথায়? বিনোবাজি অনশন করতেন গো-হত্যা নিবারণের জন্যে, হরিজন হত্যার প্রতিকারের জন্য নয়।

কিন্তু কেউ যেন এর মধ্যে রাজনীতি নিয়ে না আসেন। আনলে আন্দোলনটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। বর্ণযুদ্ধ বা শ্রেণীসংগ্রাম আমরা চাইনে। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণও সেটাকে অহিংস রাখতে পারবেন না। অনশনের শক্তি বিধাতা সবাইকে দেননি। আর অনশনও যে একটা শক্তি এটা ব্যক্তির বেলা সত্য হলেও সমষ্টির বেলা নয়। তাতে দশকোটি হরিজনের শক্তি বৃদ্ধি হবে না। তাদের আত্মরক্ষা ও স্বাধিকার রক্ষা করতে শেখানো হোক।

◻ *পরিচয়*. শারদীয় ১৩৮৪

সমালোচনার সূত্র

সরোজ আচার্য

যুগে যুগে বারম্বার লিখে লিখে
বারম্বার মুছে ফেলো, তাই দিকে দিকে
সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হয়ে থাকে,

. . .

তার পরে আর বার বসে বসে
নূতন আগ্রহে লেখো নূতন ভাষায়।
যুগ যুগান্তর চলে যায়।

সাহিত্য সমালোচনার সূত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই ক-লাইন কবিতার সম্পর্ক কী, সে প্রশ্ন অনেকের মনে উঠতে পারে। সম্পর্ক যে কী তা বুঝিয়ে বলা সহজ নয়। তবু সাহিত্যের কথা, তার মূল্য বিচারের কথা ভাবতে গেলেই মনের মধ্যে ঐ কটি লাইন গুন্-গুনিয়ে উঠছে; অনেক বিচার এবং ব্যাখ্যা, তত্ত্ব আর তর্ক যুগে যুগে বারবার লিখে লিখে বারবার মুছে ফেলা হল। এখনও হচ্ছে। আর বিস্ময়ে, সংশয়ে, অসন্তোষে, আত্মজিজ্ঞাসায় জর্জর হয়ে তাই বারবার প্রশ্ন উঠছে,

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড়ো ফিরে ফিরে?

এ বড়ো কঠিন প্রশ্ন। সাহিত্য সমালোচনার সূত্র সন্ধান করতে গিয়ে যুগে যুগে অনেকই তো লেখা হল, আরও অনেক হবে। তবু তৃপ্তি নেই; সৃজন রহস্যের সব কিছু জানা হয়েছে, বেশ সাজানো-গোছানো ছক তৈরি করা গেছে এমন কথা বলবার মতো মূঢ় দুঃসাহস নেই। নেই যে তাই বা বলি কী করে?

সাহিত্য সমালোচনার সূত্র সাহিত্যের বাইরে, না ভেতরে, এ নিয়ে তর্কের লড়াই কম হয়নি; সে লড়াইএ রাজনৈতিক এবং ভাবনৈতিক বিরোধের রং-ও কম চড়ানো হয়নি। প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়া নামে দুটি মোটা দাগ টেনে সাহিত্যিক মূল্য যাচাই এর চেষ্টা চলছে এখনও; সাহিত্যস্রষ্টার রাজনৈতিক মতামত, সামাজিক শ্রেণীসংস্থান ইত্যাদিকে সমালোচনার সূত্র হিসেবে নেওয়া হয়েছে। অনেক সময়ে গৌণ হয়েছে রসের আস্বাদন এবং উপলব্ধি। প্রাধান্য পেয়েছে সাহিত্যের বিষয় অথবা তত্ত্বের সামাজিক মূল্য-বিচার। এ অবশ্য নতুন নয়, প্লেটোর আমল থেকেই সাহিত্যকে বিশেষ কোনো একটি দর্শন, ধর্ম কিংবা নীতির মানদণ্ডে বিচার করার চেষ্টা চলে আসছে। প্রগতিবাদের নামে মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনাও অনেকটা এই

তত্ত্বাশ্রয়ী ধারাকে অনুসরণ করেছে। তাতে সাহিত্যবিচারে অনেক নতুন, অর্থপূর্ণ উপাদান সংগৃহীত হয়েছে বটে, কিন্তু সমালোচনার সূত্র নানা মতবাদের চোরাগলিতে পথ হারিয়েছে। অবস্থা হতবুদ্ধিকর হয়েছে বিশেষ করে কতকগুলি প্রগতিবাদী দেশের সাহিত্য বিচারপদ্ধতির হাকিমি কায়দার ফলে।

সাহিত্যবিচারে হাকিমি কায়দা অবশ্য একেবারে নতুন নয়। ধর্ম অথবা সুনীতির শাস্ত্রবচনের দোহাই দিয়ে চোখ রাঙানি আগের অনেক যুগেও ছিল, এখনও আছে। বিলেতে জেফ্রিস্ এবং জন্‌সন আর এদেশের সাহিত্যিক সমাজপতিদের জবরদস্ত মতামতের কথা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট। তবে এইসব বনেদি সাহিত্য শাসকদের পেছনে রাষ্ট্রশক্তির কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলের জোর ছিল না। এঁরা যা বলতেন নিজেদের জোরেই বলতেন এবং এঁদের অভিমত যতই সংকীর্ণ হোক না কেন, কোনো সাহিত্যিকের উদ্যমকে এঁরা দম বন্ধ করে মারতে পারেননি, সেরকম কোনো উদ্দেশ্যও এঁরা পোষণ করতেন না। 'কোয়ার্টার্লি'র সমালোচকের আক্রমণে কীট্‌স মারা যাননি, লেখাও বন্ধ করেন নি। চরম বিদ্বেষপূর্ণ বিদ্রূপ সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের অথবা কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যিক স্বকীয়তাকে, উদ্যমকে বিনষ্ট করতে পারে নি। প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়ার মোটা দাগ-কাটা সাহিত্য বিচারপদ্ধতির নতুন যে ছক আমাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করছে, রসোপলব্ধি ব্যাহত করছে, মূল্য বিচারে বিপর্যয় আনছে তার জুড়ি নেই আগের কোনো যুগে।

কথাটা এবার আরও স্পষ্ট করে বলা দরকার। সামাজিক তত্ত্বই কি সাহিত্য বিচারের প্রথম এবং শেষ কথা? জানি, একথার জবাবে ক্রুশ্চেভ, মাও সে তুং, নেহেরু এবং বিধানচন্দ্র রায় সকলেই একবাক্যে বলবেন, না, না, শিল্পকৌশল সাহিত্যে থাকাই চাই। কিন্তু এ হল যাকে বলা যায়, 'কন্‌সেশন', কিছুটা ঢিল দেওয়া, তবে অনিচ্ছার সঙ্গে ঢিল দেওয়া অর্থাৎ 'গ্রাজিং কন্‌সেশন' (grudging concession)। সোভিয়েট দেশে গত চল্লিশ বছরে সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় উদ্দেশ্য এবং উপকরণ নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে তার মোদ্দা কথা হল বিষয়বস্তুর সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্ব মানতেই হবে। মাঝে মাঝে যখন এই গুরুত্ব মানতে গিয়ে সাহিত্যের জীবনীশক্তি একেবারে শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তখন দেওয়া হয়েছে 'কন্‌সেশন'। আমরা যারা সোভিয়েট সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আগ্রহের সঙ্গে, ধৈর্য এবং সহানুভূতির সঙ্গে অনেক আশা নিয়ে, মনোযোগ নিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি, সাহিত্য বিচার ও সমালোচনার নতুন সূত্র আবিষ্কার করতে পারা যাবে ভেবেছি তারা শেষ পর্যন্ত প্রায় সকলেই চুপ করে গেছি। কী যে হচ্ছে তার তাৎপর্য বার করতে পারা যেন আমাদের সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। একমাত্র যা সাধ্যের মধ্যে সে হল ক্রুশ্চেভের অথবা মাও সে তুং-এর সর্বশেষতম সাহিত্যিক নির্দেশ প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নেওয়া অথবা না-মেনে নেওয়া। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সাহিত্যিক আদর্শ এবং উদ্যমের এই কঠিন বন্ধন কখনও কখনও অনিবার্য হতে পারে, তার সাময়িক ফল ভালো বা মন্দ হতে পারে। সে বিচার পরে হবে। এরকম কঠিন বন্ধন আমাদের সাহিত্যিক রুচি এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলানো কঠিন, অসম্ভবপ্রায় — সম্ভব কেবল অনুশাসনে অন্ধ বিশ্বাসী হতে পারলে। তা পারা সম্ভব নয়;মার্ক্স-এঙ্গেল্‌সও সহজে পারতেন মনে হয় না। এই হল আপাতত আমাদের হতবুদ্ধিকর চিন্তাসংকটের কারণ।

সাহিত্য সমালোচনার যে প্রগতিবাদী সূত্র ত্রিশ দশক থেকে আমরা সন্ধান করছি তার প্রথম রচনাকার হিসেবে মার্ক্স-এঙ্গেল্‌সকে স্মরণ না করে উপায় নেই। সাহিত্যের সামাজিক উৎস এবং ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্বন্ধে মার্ক্স-এঙ্গেল্‌সের অভিমত সুস্পষ্ট। কিন্তু তাঁরা কখনও সাহিত্যিককে অর্থনীতি কিংবা রাজনীতির বশংবদ ভৃত্য মনে করেননি। সাহিত্য-সৃজন প্রতিভাকে রাজনীতি অর্থনীতির উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্ররূপে তাঁরা দেখেননি। জর্মান সাহিত্যের একটি বিপুল ঐশ্বর্যময় যুগের অবসানকাল মার্ক্স-এঙ্গেল্‌সের মানসিক পরিমণ্ডল রচনা করেছিল। তাঁদের বৈপ্লবিক চেতনায় রসবোধের অভাব ছিল না। গ্যয়টের অসাধারণ সৃজনশক্তি ও স্বকীয়তাকে তাঁরা অনায়াসে গ্রহণ করেছিলেন শিল্পগত উৎকর্ষ বিচার করে। প্রচারধর্মী লেখার প্রতি তাঁদের অবজ্ঞাও ছিল সুস্পষ্ট। রাজনীতির বিচারে কবি হাইনের উপর মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স প্রসন্ন ছিলেন না, তবু তাঁর সাহিত্য-কৃতির মূল্য তাঁরা অস্বীকার করেন নি। শেক্সপীয়র মার্ক্সের কণ্ঠস্থ ছিল; মার্ক্সের লেখায়ও দেখা যায় শেক্সপীয়র থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি। তা বলে শেক্সপীয়রকে অথবা গ্যয়টেকে কোনো আঁটোসাঁটো সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ছকে ফেলবার চেষ্টা করেননি। এক কথায় বলতে গেলে, সাহিত্য-শিল্পকে রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করতেই হবে, এমন কোনো ইঙ্গিত মার্ক্স-এঙ্গেল্‌সের লেখায় পাওয়া যায় না।

তবে মানুষের অথবা সমাজের জীবনে কখনও কখনও এমন একটা অবস্থা আসতে পারে যখন একটিমাত্র চিন্তা, একটিমাত্র সংকল্প সবকিছু ভাবনা ধারণা উদ্যম এবং উদ্‌যোগকে কেন্দ্রীভূত করে। সে হল সংকটের বা আপৎকালের দাবি। ধরা যেতে পারে সে রকম সময়ে সাহিত্যের ধর্মও সেই একমাত্র লক্ষ্যে সমর্পিত হয়। তবে এরকম অবস্থা স্বাভাবিক নয়; সমস্ত মানবিক অনুভূতিকে একটিমাত্র লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত করলে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ-বৈচিত্র্যের পথ রুদ্ধ করা হয়। সাহিত্যকে রাজনীতির অথবা বিপ্লবের হাতিয়ার করতে হবে এরকম দাবি কোনো কোনো সময়ে এবং অবস্থায় কিছুটা সঙ্গত হতে পারে। কিন্তু এই দাবিকে সাহিত্যধর্মের পরম ও চরম সত্য বলে মেনে নেওয়া মানে সাহিত্যের অপঘাত মৃত্যু। মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স এমন কিছু চাননি তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এমনকি লেনিনও রাষ্ট্রবিপ্লবে অনন্যচিত্ত হয়েও ভুলতে পারেননি যে, সাহিত্য সৃজনের মানবিক সত্য রাষ্ট্রবিপ্লবের চেয়ে কম মূল্যবান নয়। মার্ক্স-এঙ্গেলস দেখেছিলেন ধনতান্ত্রিক শোষণ ও শ্রেণী আধিপত্যের ফলে মানুষের জীবন খণ্ডিত হচ্ছে, টুকরো টুকরো যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। তাঁরা মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিই কল্পনা করেছিলেন। রেনেসাঁর পূর্ণাঙ্গ মানুষ ও তার নানা বিষয়ে কৌতূহল, কল্পনা এবং প্রয়াসের স্বচ্ছন্দ বিহার — লেনার্ডো ডাভিঞ্চির মতো মানুষের জীবনসাধনা ছিল মার্ক্স-এঙ্গেল্‌সের আদর্শ। বেটোফেনের সোনাটা শুনে লেনিন একদিন বলেছিলেন, "রোজ এই সঙ্গীত শুনতে পারলে আমি খুশি হতাম। অপূর্ব অতিমানবীয় সঙ্গীত এ; সব সময়ে গর্বের সঙ্গে আমি ভাবি মানুষ কত পরমাশ্চর্য কাজই না করতে পারে।" সাহিত্য শিল্পে এই পরমাশ্চর্য কল্পনাশক্তির অবাধ বিকাশকে 'বুর্জোয়া বিকার' মনে করেননি, মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স-লেনিন। তবে অবস্থাক্রমে লেনিন বোধহয় নিছক সাহিত্যিক আবেগকে চিত্তবিক্ষেপকারী দুর্বলতা মনে করে সরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু সে হল আপৎকালের নিরুপায় সমাধান, সংকটের দাবি পূরণ। যার জন্য লেনিন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বিপন্ন সুরে

বলেছিলেন, "এসব সঙ্গীত বেশি শুনলে মনকে অভিভূত করে, নির্বোধের মতো অনেক মিষ্টি কথা বলতে ইচ্ছে করে, যারা এই জঘন্য, নরকে বাস করেও এমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তাদের আদর করতে ইচ্ছে করে।"

প্লেটোর দর্শনেও কবি, সৌন্দর্যস্রষ্টার প্রতি বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদীর এই রকম ভয়; কবিরা মন ভোলায়, উন্মাদনা সৃষ্টি করে, বিশুদ্ধ তত্ত্ব-চিন্তায় একাগ্রতা নষ্ট করে। ব্রহ্মবাদী প্লেটো এবং মার্ক্সীয় বস্তুবাদী লেনিনের মনোভঙ্গির মধ্যে এখানে বিশেষ তফাত নেই দেখা যায়। দু-পক্ষই সৌন্দর্যের বিস্ময়কর ক্ষমতায় মুগ্ধ, এবং সেইজন্যই সাহিত্য শিল্পের মনোহারিণী প্রভাবকে এড়িয়ে যাবার, সংযত করবার পক্ষপাতী। লেনিনের সময় থেকেই সোভিয়েট ইউনিয়নে সাহিত্য এবং শিল্পকলাকে একটা সুনির্দিষ্ট প্রলেটেরিয়ান ছকে ফেলার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। তবে লেনিন নিজে একে খুব উৎসাহ দেননি। পুস্কিন বুর্জোয়া কবি অতএব অপাঠ্য, এবং তার চেয়ে মায়াকভ্‌স্কি অনেক ভালো, এ রকম উদ্ভট্ সাহিত্যিক মূল্যবিচারে লেনিন সায় দেননি। তবু ধীরে ধীরে সোভিয়েট ইউনিয়নে সাহিত্যিক মূল্য-বিচারের পদ্ধতিকে দলগত এবং শ্রেণীগত রাজনীতির নির্দেশে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হল। কেন এরকম হল তা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

আমাদের দেশে যেমন পরাধীনতার যুগে, তেমনি রাশিয়ার জারের আমলে সাহিত্যিক আবেগ কল্পনা ও সৃজনের একটা বৃহৎ ও মহৎ অংশের সঙ্গে রাজনীতির যোগ ছিল। সাহিত্যই ছিল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ আশা আকাঙক্ষা প্রকাশের প্রধান বাহন। তার অজস্র অপূর্ব নিদর্শন উনিশ শতকের বিপুল সৃজনশীল রাশিয়ান সাহিত্যে, পুস্কিনের, টুর্গেনেভের, টলস্টয়ের, গর্কির এবং আরও অনেকের লেখায়। কাজেই রাশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কখনও একেবারে অস্বাভাবিক মনে হয় নি। তফাত এই যে, বিপ্লবের আগে জনজীবনের উপাদান নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি যাঁরা করেছিলেন তাঁরা তা করেছিলেন স্বেচ্ছায়, জীবনের নিবিড় অনুভব থেকে প্রেরণা নিয়ে। এই সাহিত্য সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাবে সমাজনির্ভর, জনমনের রূপকার। মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স সাহিত্যকে এই স্বাভাবিক অর্থেই সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত দেখেছিলেন। 'ডিক্টেটারশিপ অব্ দি প্রলেটেরিয়েট' অর্থাৎ সর্বহারার একনায়কত্বে সাহিত্যকে সর্বগ্রাসী একনায়কত্বের কাছে সর্ব সমর্পণ করতে হবে, মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স এতদূর পর্যন্ত বোধহয় কল্পনা করেন নি। সোভিয়েট বিপ্লবের পর রাশিয়ায় এরকম ঘটল তার কারণ মনে হয় প্রধানত দুটি। এক হল, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, জারের আমলেও সৃজনশীল সাহিত্য রাজনীতিকে সহজভাবে আত্মস্থ করেছিল। বিপ্লবের পর নতুন সমাজ গঠনে সাহিত্যের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে তাই একনিষ্ঠ বলশেভিকদের মনে কোনো দ্বিধা ঘটেনি। সহজেই মার্ক্সবাদী সূত্রকে সরাসরি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত হল সাহিত্য তথা আর্ট একেবারে পুরোপুরি রাজনৈতিক হাতিয়ার। এর ফলে অতীতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির সমালোচনায় দেখা দিল নানারকম উগ্র বিকার যার অনেকখানি হাস্যকর, অর্থহীন। এরই মধ্যে দু-চারটি আলোচনায় কালেভদ্রে নতুন বিচারপদ্ধতির কিছু ভাববার মতো ইঙ্গিত পাওয়া গেল; সাহিত্যের পটভূমির সামাজিক তত্ত্ব এবং তথ্য আবিষ্কার করে সমালোচনার নতুন মূল্যবান একটি সূত্র সন্ধান করতে পারল।

সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা অবশ্য নতুন নয়; প্রখ্যাত ফরাসি সমালোচক টেনও এই ধরনের সমালোচনার একটি ধারা প্রবর্তন করেন। সে ধারাটির আংশিক মূল্য এখনও মানতে হয়। তবে যেমন টেনের সূত্র তেমনি মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বাস্তববাদী সূত্র, দুই-ই সাহিত্যের বিচিত্র রূপ ও প্রকরণের সব নয়, কয়েকটি মাত্র দিকের উপর আলোকপাত করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কোন্ সমাজে, কি অবস্থায় বর্ধিত, বিকশিত হয়েছে তা আবিষ্কার করলেই সব কিছু জানা যা বলা হয় না। সমালোচনার সূত্র তাই এক এবং অদ্বিতীয় নয়। এঙ্গেল্‌সও তার ইঙ্গিত করেছিলেন। সামাজিক প্রতিবেশ, দেশ ও কালের সমালোচনার ভিত্তিভূমি হলেও সাহিত্যের স্বরাজ্য, প্রতিভার স্বকীয়তা এবং শিল্পকর্মের নিজস্ব বহুমুখী রীতিনীতি, এসবই সমালোচনার সূত্র রচনা ও প্রয়োগে একটা প্রধান অংশ দাবি করতে পারে।

গোড়ায় যে প্রশ্নের উল্লেখ করেছি — সাহিত্যের রসোপলব্ধি এবং মূল্যবিচারের ক্ষেত্র কি সাহিত্যের বাইরে না ভেতরে? এক কথায় এর উত্তর দিতে হলে বলতে হয়, বাইরে এবং ভেতরে উভয়ত, তবে দুটোই পরস্পর-নির্ভর, একটি অন্যটিকে ডিঙিয়ে যেতে পারে না। টি. এস. এলিয়ট এক জায়গায় বলেছেন, সাহিত্য সমালোচনার দুই প্রান্তে দু-রকম ভ্রান্তির ঝোঁক রয়েছে। একটি ঝোঁক হল লেবরেটোরিতে বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে সাহিত্যের সব কিছুকে খণ্ড খণ্ড করে সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি অথবা ধর্মের মালমশলা আবিষ্কার করা। আর একটি, যাকে বলা যায় লেবু নিংড়ে সবখানি রস বার করার চেষ্টা অর্থাৎ কোনো লেখার ভাবানুবাদ করে, রকমারি ব্যাখ্যা এবং ভাষ্যে ভারাক্রান্ত করে সাহিত্যকে জীবনসম্পর্কচ্যুত তত্ত্বসর্বস্ব অথবা ভঙ্গিসর্বস্ব করা। প্রথম ঝোঁকটি হল সাহিত্যকে ষোলো-আনা বাইরে থেকে বিচার করবার, যার বিষম পরিণতি দেখা যায় সর্বগ্রাসী সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনায়। দ্বিতীয় ঝোঁকটি হল সাহিত্যকে ষোলো-আনা ভেতর থেকে দেখা, যার পরিচয় মেলে শৌখিন অন্তঃসারহীন ভাববিলাসে। লেবুর রস-নিংড়ানো সাহিত্য বিচারে অবশ্য মাস্টারি উৎসাহও কম যায় না।

একথা প্রত্যেক রসপিপাসু মানলে ভালো হয় যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নিগূঢ় তাৎপর্য এবং আবেদন কেবল বাইরে থেকে সমাজতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ করে বোঝা যায় না। আবার কেবল ভেতর থেকে মামুলি ব্যাখ্যার পদ্ধতি দিয়েও নয়। কোনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতিই কতকগুলি উপাদানের সুদ্ধমাত্র যোগফল নয়। তার রূপ এবং মর্মগত রহস্য এমন জটিল যে উপাদানগুলো ভেঙে ভেঙে বার করলেই সমালোচনার উদ্দেশ্য সফল হয় না। কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে ভালো ভাবে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কিংবা শেলীর 'ওড টু দি ওয়েস্ট উইন্ড'কে ভেঙে ভেঙে ব্যাখ্যা করলে কিংবা সারার্থের সমাজতাত্ত্বিক মূল্য বিচার করলে ওই অপূর্ব কবিতা দুটির সৌন্দর্য এবং শক্তির বিন্দুমাত্র স্পর্শ পাওয়া যায় না।

এখন আবার সাহিত্যকে রাজনীতি কিংবা বিচিত্র কোনো মতবাদের হাতিয়ার গণ্য করার প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। আগেই বলা হয়েছে, জারের আমল থেকেই রাশিয়ার সাহিত্যের একটা প্রবল রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। বিপ্লবের পর সাহিত্যের রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি প্রবলভাবে অনুভূত হল। সাহিত্যের যে মনোহর ক্ষমতা প্লেটো এবং লেনিন উভয়েই অনুভব করেছিলেন তাকে নতুন সমাজগঠনে প্রচারধর্মী কাজে লাগানোর তাগিদ

না এসে পারে না। এরপর একদলীয় একনায়কত্বের অধীনে সাহিত্য সৃষ্টির হুকুমত বেশ করে এঁটে বসল 'সমাজবাদী বাস্তবতা'র নামে। ত্রিশ দশকে 'সমাজবাদী বাস্তবতা'র ফরমায়েশ বা ফরমান কী রকম ছিল তার ২।১টি সূত্র উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নীতি নির্দেশে বলা হল, আদর্শ মার্ক্সবাদী সাহিত্যের কর্তব্য হবে — প্রলেটেরীয় পাঠককে শ্রেণীসংগ্রামে তার ভূমিকাটি বুঝতে সাহায্য করা। অতএব আদর্শ মার্ক্সবাদী সাহিত্য ১. প্রত্যক্ষ ভাবে অথবা প্রকারান্তরে শ্রেণীসংগ্রামের বাস্তব ফলাফল দেখিয়ে দেবে; ২. লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি হবে সর্বহারা শ্রেণীর পুরোধার উপযুক্ত। এরকম নির্দেশের একাগ্র আদর্শনিষ্ঠা প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই। তবে মুশকিল এই যে, এমন কঠিন ছাঁচে ঢালা সাহিত্য দিয়ে জীবনের বিচিত্র জটিল ও বিপুল প্রবাহকে ধরা যায় না। সাহিত্যের দাবি এবং আবেগ সমগ্র জীবনের সমান্তরাল। সাহিত্যিকের সৃজন-কর্ম জীবনের সঙ্গে সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাবে সংযুক্ত হোক কেবল বাস্তব প্রয়োজনে নয়; মানবিক কল্পনার অবাধ সঞ্চরণের তাগিদও একটা বড়ো প্রয়োজন, এ অস্বীকার করলে সাহিত্য প্রাণহীন বিকলাঙ্গ না হয়ে পারে না। ফর্মুলার এবং ফরমায়েশের সাহিত্যকর্ম আজকের একদিনের ছোটোবড়ো প্রয়োজনের দাবি হয়তো পূরণ করতে পারে। কিন্তু তার স্থায়ী মূল্য সামান্যই। তার একটি প্রমাণ ফর্মুলা এবং সরকারি ফরমায়েশের সাহিত্যের চাইতে 'ক্লাসিক' অর্থাৎ চিরায়ত সাহিত্য এবং বিদেশি লেখকদের লেখার জনপ্রিয়তা বেশি সোভিয়েট পাঠক মহলে। পেশাদার লেখা, প্রচারধর্মী লেখা, এর দরকার আছে, এরও ভালো-মন্দ বিচার আছে। কিন্তু এর দরকার এবং বিচার দিয়ে সমালোচনার সেই সূত্র পাওয়া যাবে না, যা দ্বারা সামগ্রিক জীবনের পটভূমিতে সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব।

প্রয়োজনের সাহিত্য এবং অপ্রয়োজনের সাহিত্য — এ ভাবে কখনও কখনও সাহিত্যকে ভাগ করা হয়। তার চেয়ে স্বীকার করা ভালো মানুষের জীবনে প্রয়োজনের বিচিত্র সমারোহে কোনো কিছুই অপ্রয়োজনীয় নয়; প্রয়োজনের গুণ এবং পরিমাণের মাত্রাভেদ থাকতেও পারে; সময় এবং অবস্থা-বিশেষে কোনো প্রয়োজন-বিশেষ প্রাধান্য পেতে পারে। অনেক আকাঙ্ক্ষা এবং আবেগ কল্পনার প্রত্যক্ষ প্রয়োজন জমাখরচের হিসাবে হয়তো কোনোদিনই ধরা যায় না। মানুষ যন্ত্রও নয়, আবার দেহহীন আইডিয়া মাত্রও নয়। তাই মানবিক সত্তার স্থূল সূক্ষ্ম সব প্রয়োজন মিলিয়েই জীবন-প্রবাহ। এই প্রবাহ থেকে যে কোনো একটিমাত্র ধারাকে পৃথক করে নিয়ে বাঁধ দিলে মানবধর্মকে বিকৃত করা হয়। এককালে শাস্ত্র ও ধর্মের অনুশাসন এরকম কঠিন বাঁধনে বাঁধতে চেষ্টা করেছিল মানুষের ভাবনা ধারণা, কল্পনা ও আচরণকে। তার প্রতিবাদেই পূর্ণাঙ্গ মানববাদের স্বপক্ষে লোকায়ত চিন্তা ও কর্মধারা গড়ে উঠেছিল দেশে দেশে রেনেসাঁ ও রেফরমেশনের যুগ থেকে। কমিউনিজম বা মার্ক্সবাদ সেই সুদূরপ্রসারী বলিষ্ঠ-মানববাদের ঐতিহ্যবাহী বলেই জেনেছিলাম। শ্রেণী সমাজের অন্তর্নিহিত বিরোধ দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মানবধর্মের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সহজ হবে, স্বচ্ছন্দ হবে, মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্ এই কথাই বার বার নানা ভাবে বলেছেন। নতুন সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রশক্তির কঠিন বন্ধন ও অনুশাসন মানুষের সহস্র ধার সৃজনী আবেগকে একটিমাত্র কাটা খালে ঠেলে দেবে, এ যেমন অসহনীয় তেমনি অস্বাভাবিক।

সাহিত্যশিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবেশের প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ, স্ফুট কিংবা অস্ফুট প্রভাব সব যুগেই থাকে এবং থাকবে। তা স্বাভাবিক এবং অপ্রতিরোধ্য। 'ডিসিপ্লিন' বা অনুশাসন কিন্তু তা নয়। রসসৃষ্টি এবং রসতৃপ্তির সঙ্গে বাইরে ফর্মুলা বানানো 'ডিসিপ্লিন' স্বাভাবিক ভাবে খাপ খায় না। 'ডিসিপ্লিন' আইনের মতো এককাট্টা, ব্যতিক্রম মানে সেখানে ব্যভিচার। 'ডিসিপ্লিনের' কড়া ব্যবস্থায় চমৎকারিত্বের কোনো স্বাভাবিক স্বীকৃতি নেই। রসসৃষ্টি ও রসতৃপ্তির অন্য পাঁচটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্গে সর্বদা সামঞ্জস্য রেখে চলবে এমন কোনো কথা নেই। ফ্রান্সিস টম্‌সন লন্ডন ব্রিজের তলায় শীতে অনাহারে জীবন্মৃত অবস্থায় যে কাব্য রচনা করেছিলেন তাতে তাঁর ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়নি।

তবু কে বলতে পারবে যে ক্ষুধার নিবৃত্তিটাই সব সময়ে সব চেয়ে বড়ো প্রয়োজন? কোনো আদর্শনিষ্ঠ মার্ক্সবাদীই এমন কথা বলতে পারে না; মালয়ের যে স্কুলমাস্টার ফাঁসির মঞ্চে উঠে "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক" ধ্বনি দিয়েছিল সে তার নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তির কথা ভাবে নি। সাহিত্য সৃজনের স্বচ্ছন্দ আবেগকেও তেমনি কোনো কঠোর একদেশদর্শী অনুশাসনের অধীনে ভাবা চলে না। একথা ঠিক যে জীবনবিমুখতা, ভঙ্গিসর্বস্ব শৌখিন কলাকৌশল সাহিত্যের বিস্তৃতি ও গভীরতাকে নষ্ট করে। কিন্তু আবার অক্ষরে অক্ষরে সমাজ-সচেতন হয়েও সাহিত্য তার প্রাণশক্তি হারিয়ে নিতান্ত সাময়িক বক্তব্যের বাহন হয়ে পড়তে পারে।

কথা হল এই যে, সাহিত্য সামাজিক, রাষ্ট্রিক নয়। সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হলেও তার সামগ্রিক মানবিক সত্তা সব শ্রেণীর মানুষই অন্তরবিস্তর অনুভব করে। 'শেষের কবিতা'র কল্পনাময় রসোচ্ছল ভাবানুষঙ্গ অথবা 'হ্যামলেটের' চিন্তাদ্বন্দ্ব শ্রেণীগত গণ্ডি ছাড়িয়ে মনকে অভিভূত করতে পারে, দল বা দর্শন বা রাষ্ট্রীয় নেতা তা ঠেকাতে পারে না। এর একটি কারণ কতকগুলি মৌলিক মানবীয় অনুভূতি সর্বজনীন, শ্রেণীবিভক্ত সমাজেও সেগুলি একেবারে আলাদা আলাদা শ্রেণীর গণ্ডিতে বাঁধা নয়। তেমনি ভাষাও সামাজিক। তাকে কঠিন ভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না, যেমন যায় না প্রকৃতিকে, নিসর্গ সৌন্দর্যকে। সাহিত্য যেহেতু সমাজনির্ভর এবং অনেক বিকৃতি ও শ্রেণীসংকীর্ণতা সত্ত্বেও কতকগুলি মৌলিক মানবীয় অনুভূতি থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে, তাই সাহিত্যকে শেষ পর্যন্ত সমাজ-সত্তার সঙ্গে সর্বজনীন সম্বন্ধ রাখতেই হয়। রাষ্ট্র লুপ্ত হলে, পরিবর্তিত হলেও ব্যক্তি বা সমাজ লুপ্ত হয় না। তেমনি শ্রেণী বা দল বা মত লুপ্ত কিংবা পরিবর্তিত হলেও সাহিত্য লুপ্ত হয় না। রাষ্ট্রবিচারে যে নায়ক, সাহিত্যবিচারে সে নায়ক না হওয়াই সম্ভব। রাষ্ট্রের কাছে সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ গান হচ্ছে "জনগণমন"। ব্যক্তির কাছে, সে ব্যক্তি সে কোনো শ্রেণীরই হোক না কেন, বিশেষ একটি ক্ষণে সবচেয়ে মধুর, গভীর, অর্থপূর্ণ হৃদয়ের ভাষা হল,

ভালবাসি,
এই কথাটি জলে স্থলে কাছে দূরে
বাজায় বাঁশী।

☐ *সরোজ রচনাবলী*, পার্ল পাবলিশার্স ১৯৮৮

সুন্দর ও বাস্তব

আবু সয়ীদ আইয়ুব

সুন্দর কথাটা এখানে সেই উন্নীত অর্থে ব্যবহার করা হবে যে অর্থে বেটোফেনের নবম সিম্‌ফনি সুন্দর, রবীন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশ-গামী বলাকা সুন্দর, আশ্বিনের বৃষ্টিরিক্ত মেঘের উপর সূর্যাস্তের অন্তিম বর্ণচ্ছটা সুন্দর। এই অর্থ করার পক্ষে সাহিত্যিক প্রচলন ও আভিধানিক গবেষণার কতখানি সমর্থন পাওয়া যাবে সে প্রশ্ন আপাতত অনাবশ্যক। মণিমুক্তা-খচিত সুগঠিত অলঙ্কারের সৌন্দর্যের যখন চমক লাগে, জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রক্লান্ত সন্ধ্যার গুমোট ভেঙে স্নিগ্ধ দখিন হওয়া বইলে যখন বলি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে, ধ্যানচাঁদের স্টিক চালানোর নিখুঁত কৌশলে মুগ্ধ হয়ে যখন বলে উঠি কী সুন্দর, — তখন সুন্দরের সঙ্গে প্রীতিকর ও তুষ্টিকরের অযথা গোলপাকানো হয়। সুন্দর যে সে প্রীতিকর হতেও পারে, কিন্তু প্রীতিকরতা তার মর্মকথা নয়, অপরিহার্য অঙ্গও নয়। 'ম্যাক্‌বেথ'কে প্রীতিকর বলা শক্ত হবে, যদিও সৌন্দর্যের দাবি তার অবিসংবাদিত। অবশ্য সৌন্দর্য উপলব্ধি মাত্রই আনন্দময়; সে আনন্দের স্ফুরণ কিন্তু চিত্তের উর্ধ্বতম অন্তরীক্ষে, সন্দেশভক্ষণজাত প্রীতির সমপর্যায়ে তাকে ফেলা যায় না।

তত্ত্বান্বেষী মনে স্বতই প্রশ্ন জাগে, সৌন্দর্যের অবস্থিতি কোথায়, সে কি দৃশ্যবস্তুর ধর্ম, না দ্রষ্টার মনোগত প্রতিক্রিয়া মাত্র। প্রাচীনেরা যতো সহজে যতো নির্ভয়ে এই সমস্যার নিরাকরণে এগুতেন, দর্শনের বর্তমান জটিলতায় — বাস্তব ও অবাস্তব, সত্য ও অসত্য, প্রত্যক্ষ ও কল্পনার সীমারেখা নিয়ে যখন বাদ প্রতিবাদের অন্ত নেই, — আমরা স্বভাবতই তাতে বঞ্চিত। যাঁরা বলতেন সৌন্দর্য বস্তুগত, আমাদের দেখা-না-দেখার উপর নির্ভর করে না, তাঁদের প্রমাণের ভিত্তি ছিল সুন্দর বস্তুর কোনো একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব গুণের সঙ্গে তার সৌন্দর্যের সমীকরণ। প্রতিসাম্য অর্থাৎ symmetry গুণটাই বিশেষরূপে তাঁদের চোখে পড়েছিল। ঐ শব্দের একটা সুবিদিত সংজ্ঞা গণিতশাস্ত্রে দেওয়া হয়ে থাকে, সে সংজ্ঞা অনুসারে অল্পবিস্তর প্রতিসাম্য শতদল পদ্মে কিংবা তাজমহলে পরিলক্ষিত হয় সন্দেহ নেই। কিন্তু গহন অরণ্যকে, নিঃশব্দ অন্ধকার রাত্রির তারকা-খচিত ছায়াপথ প্রজ্বলিত আকাশকে, অথবা মানবজীবনেরই মতো প্রকাশবৈচিত্র্যবান 'ফর্সাইট সাগা'কে প্রতিসাম্যিক বলতে গেলে ঐ নিরীহ শব্দের উপর বড়ো বেশি অত্যাচার করা হয়। তাছাড়া সৌন্দর্য আর প্রতিসাম্য যদি সমার্থবাচক হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি সযত্নঅঙ্কিত নিখুঁত বৃত্তের মূল্য মোনালিসার ছবির চেয়ে বহুগুণে বেশি। প্লটাইনস্‌ বস্তুর সারল্যের মধ্যে তার সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, বর্ক্‌ আয়তনের স্বল্পতায়।

পক্ষান্তরে যাঁরা সৌন্দর্যের অবস্থিতি দ্রষ্টার মনের মধ্যে নির্দেশ করতেন, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁদের সম্বল ছিল একটি অব্যর্থ যুক্তি। সৌন্দর্য যদি বস্তুরই ধর্ম হয় তাহলে সুন্দরের বিচারে এমন অসীম বৈষম্য দেখা যায় কেন। যে তাজমহলের শুভ্র সমুজ্জ্বল মূর্তি রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভাকে উদ্‌ভাসিত করে দিয়েছিল, অলডস হক্সলির বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তা স্থাপত্যশিল্পের অজস্র দোষে দুষ্ট। টল্‌স্টয় শেক্সপীয়রের বিপুল বিধাতৃতুল্য সৃষ্টির কোনোই মূল্য দিতে প্রস্তুত নন। চৈনিক বা রাজপুত দ্বিরায়তনিক চিত্রের সমাদর বিশেষজ্ঞের কাছে কম নয়, কিন্তু আমরা কজন তাতে রস পাই। বিচারের বৈপরীত্য প্রমাণ করছে যে, তাজমহল স্বয়ং সুন্দরও নয় অসুন্দরও নয়;রবীন্দ্রনাথের মনে ঐ বস্তুর সাক্ষাতে যে অনুভূতি জাগে সৌন্দর্য তার ধর্ম, এবং হক্সলির মনে যে ভাবের উদ্রেক হয় তাকেই অসুন্দর বলা সমীচীন। তাজমহল একই কালে সুন্দর এবং অসুন্দর হতে পারে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি যদি সুন্দর হয় এবং হক্সলির অনুভূতি অসুন্দর — তাতে কোনো নৈয়ায়িক বিসংবাদ নেই।

এ যুক্তির প্রামাণ্যতায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা হয়তো ভেবে দেখেননি যে, এর সার্থকতা সৌন্দর্যগুণেই নিঃশেষ হয়ে যায় না, এর সাহায্যে বস্তুর সমস্ত গুণকে নির্বিশেষে মনোগত বলে প্রমাণ করে দেওয়া যায়। ম্যালেরিয়াজ্বরাক্রান্ত রোগী যখন শীতে কাঁপছে তখন হয়তো আপনি পাশে বসে ঘেমে অস্থির হচ্ছেন। অতএব কক্ষস্থ বায়ুমণ্ডল শীতলও নয় উষ্ণও নয়, ও-দুটো বিশেষণ আপনাদের বিভিন্ন অনুভূতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই চিন্তাধারা অনুসরণ করে লক্ বস্তুর গুণসমূহকে দুই পর্যায়ে ভাগ করেন। প্রথম পর্যায়ের গুণ হল আকৃতি, অভেদ্যতা প্রভৃতি বস্তুর নিজস্ব ও নিরপেক্ষ ধর্ম। দ্বিতীয় পর্যায়ের গুণ হল বর্ণ গন্ধ উষ্ণতা ইত্যাদি, এদের উৎপত্তি বিষয় ও বিষয়ীর সংঘাতে, অবস্থিতি, প্রত্যক্ষকারীর চৈতন্যে। বস্তু অর্থাৎ দ্রব্য নামক এক অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত প্রথম পর্যায়ের গুণসমষ্টি, দ্বিতীয় পর্যায়ের গুণের অনুভূতি প্রত্যক্ষীর মনে উদ্রেক করতে পারে মাত্র, তাদের সঙ্গে এর চেয়ে ঘনিষ্ঠতর কোনো সম্বন্ধ নেই তার। পদার্থবিদ্যা তার অধুনাতন ভীতিপ্রদ গাণিতিক ঊর্ণাজালে জড়িত হওয়ার আগে পর্যন্ত মোটামুটি এই মতেরই সমর্থন করে এসেছে। এ-যুক্তিধারার অব্যর্থ নৈয়ায়িক পর্যবসান যে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবাদে, বর্কলীকে সে সিদ্ধান্তে পৌছুতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় নি। একটি পয়সাকে সামনে থেকে দেখলে বৃত্তাকার দেখায়, পাশ থেকে বৃত্তাভাসিক, দূর থেকে বিন্দুবৎ। এর মধ্যে বৃত্তটাকে পয়সার নিজস্ব ধর্ম এবং অন্যগুলোকে মনোগত বলা অন্যায় পক্ষপাত। নৈয়ায়িক সঙ্গতির দাবি মানলে স্বীকার করতে হবে যে, আকৃতিও মনোগত, প্রত্যক্ষকারীর বেদনামাত্র। তেমনি অভেদ্যতাও আমাদের ত্বাচ ও গতিবেদনী (kinaesthetic) প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। যে যুক্তিপ্রয়োগে লক্ দ্বিতীয় পর্যায়ের গুণগুলিকে মনোগত প্রমাণ করেছিলেন, অবিকল সেই যুক্তিই প্রথম পর্যায়ের বেলাতেও কার্যকর। সুতরাং বস্তুর নিজস্ব কোনো গুণ আর অবশিষ্ট থাকে না, সমস্তই প্রত্যক্ষীর চৈতন্যভুক্ত হয়ে পড়ে;এবং এ-অবস্থায় নির্গুণ, কাজেকাজেই সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়, বস্তুর বাস্তবতায় বিশ্বাস ধার্মিকসুলভ গোঁড়ামি। এরপরে স্বপ্নে কল্পনায় প্রতিভাসে ও প্রত্যক্ষে তফাত করতে যাওয়া বিড়ম্বনা, এর সবগুলিই এখন সমানভাবে মনোগত। এই অপ্রত্যাশিত ও অসহ্য সিদ্ধান্তে দর্শনশাস্ত্রে একটা সাড়া পড়ে গেল, কান্ট্ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত

অনেক ছোটো-বড়ো দার্শনিককে এর খণ্ডনের চেষ্টায় প্রাণপাত করতে হয়েছে। উপরিউক্ত মতগ্রহণে জ্ঞানতান্ত্রিক ও বস্তুতান্ত্রিক উভয় দলই সমান পরাঙ্মুখ হলেও, জ্ঞানতান্ত্রিক সে-সমস্যার পাশ কাটিয়ে চলতেই অভ্যস্ত। গুণের প্রতীয়মান বৈষম্যের সঙ্গে তার জ্ঞান-নিরপেক্ষতার সামঞ্জস্য বিধানে অধুনাতন বস্তুতান্ত্রিকদের গবেষণা সর্ববাদিস্বীকৃত না হলেও প্রণিধানযোগ্য। তাঁরাও কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ের গুণ অর্থাৎ সৌন্দর্য, শ্রেয়তা ও সত্যের অবস্থিতি নির্ণয় নিয়ে দিশেহারা হয়েছেন। সে যাই হোক, এ সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তে যে কথাটা বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক সেটা এই যে, কোনো ক্ষেত্রে দ্রষ্টার বিচারের বৈষম্য বিচার্য বিষয়ের মনোগত হবার অকাট্য প্রমাণ — এ কথা মতবাদ নির্বিশেষে কোনো দার্শনিকই আজ মানতে প্রস্তুত নন।

সৌন্দর্যানুভূতির যে লক্ষণটা সবচাইতে সুবিদিত ও অপ্রতর্কিত সে হচ্ছে তার তন্ময়তা। সুন্দরের ধ্যানে অপরাপর সকল বিষয়ের অবগতি হতে মন আকুঞ্চিত হয়ে নিবিড় একাগ্রতায় অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় তার মধ্যে, আমাদের চিত্তপটভূমিতে তারই চিত্র অপ্রতিহত অকাধিপত্যে বিরাজ করে, অন্য সমস্ত তুলির আঁচড় মিলিয়ে যায় অচৈতন্যের ঘনান্ধকারে। একাধিপত্য কিন্তু বাস্তবতার পরিপন্থী; কারণ কান্টের দোহাই না পেড়েও আজ আমরা নির্বিবাদে বলতে পারি যে, কোনো বস্তুর বাস্তবতার মানেই হচ্ছে অপরাপর সকল বস্তুর সঙ্গে তাকে কতকগুলো নিত্য ও সার্বভৌম নিয়মের সূত্রে গ্রথিত করা। এই নিয়মসূত্রগ্রন্থনে যে বস্তু বাধা দেয়, যার ব্যবহারে ব্যত্যয় ঘটে তাকেই আমরা বলি অলীক, অধ্যাস, অবাস্তব। যেমন রজ্জুদর্শনে সর্পভ্রম। সে-সর্প আপন জৈবধর্ম পালন করে না, কাছে গেলে ফণা উদ্যত করে ছোব্‌লাতে আসে না, তাড়া করলে বঙ্কিম গতিতে পালায় না, — কাজেই তাকে আমরা বলি অবাস্তব। সুন্দর বস্তু আপনার অস্তিত্বের নিবিড়তায় সমগ্র চৈতন্যকে এমনভাবে আপ্লুত করে দেয় যে, সেখানে আর কোনো কিছুর অবকাশমাত্র থাকে না। সুতরাং অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ বন্ধনের কথাই ওঠে না। বাস্তব তাকে বলতে পারি না যেহেতু বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ তন্তুজাল বুনে আমরা যে বাস্তবজগৎ রচনা করেছি সেখানে তার স্থান নেই। অবাস্তবও তাকে বলা চলে না, কারণ অবাস্তবতার মানেই নিয়মকে লঙঘন করা, সম্বন্ধকে অস্বীকার করা; সম্বন্ধ যেখানে আরোপিত হয়নি অবাস্তবতা সেখানে অর্থহীন। অতএব সুন্দর যে সে বাস্তব অবাস্তব বহির্ভূত, বাস্তবতা অসম্পৃক্ত, দর্শনের পরিভাষায় সদসৎ অবিলক্ষণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক্ গোলাপ ফুলের কথা। সাধারণ দৃষ্টিতে যখন তাকে দেখি তখন সে পুষ্পপাত্রে সুবিন্যস্ত, গৃহসজ্জার অঙ্গ, চিত্ত-বিনোদনের উপাদান। অথবা সে উদ্যানবৃক্ষে বৃন্ত-সংলগ্ন, সজীব; মাটি থেকে আহরণ করছে খাদ্য, সূর্যালোক থেকে সঞ্চয় করছে শক্তি। সেই পুষ্পটি যখন সৌন্দর্যধ্যানে প্রস্ফুটিত হয় তখন বাইরের সঙ্গে তার সম্বন্ধ গেছে ঘুচে, সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। তখন তাকে বাস্তব বলব কোন অধিকারে? এমন মনে করলে অন্যায় হবে যে, গোলাপ ফুলের বর্ণ গন্ধ ওজন আকৃতি বাস্তব, শুধু তার সৌন্দর্য নামধারী অলৌকিক গুণটাই বাস্তবতা অসম্পৃক্ত। ব্যবহারিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গোলাপের বাস্তবতা নিঃসন্দেহ, কিন্তু রূপদ্রষ্টার ধ্যানদৃষ্টিতে সমগ্র ফুলটাই বাস্তব সত্তার বৃন্তচ্যুত হয়ে খসে পড়ে কল্পনার শূন্যমার্গে। সুন্দরের এই বন্ধন-মুক্তি ও অন্তরীক্ষ প্রয়াণ সাধনা ব্যতীত সম্ভব নয়। আমাদের চিত্ত আপন সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নে সবকিছুকে কোনো-না-কোনো উপায়ে বাস্তবের জালে ফেলতে সর্বদা তৎপর। সে — প্রবৃত্তিনিরোধ ও

নিরালম্ব ধ্যানে সক্ষম — যে তাকেই বলা যায় রূপদক্ষ। আরও অধিক ক্ষমতা চাই শিল্পীর, যে এই তপস্যালভ্য দৃষ্টিকে অভিব্যক্ত করতে পারে। এমন শব্দ বিন্যাসে বা বর্ণ সংস্থানে যার মারফতে রূপদক্ষতা বঞ্চিত সাধারণ মানুষও সুন্দরের ত্রিদিব সীমানাতে অনায়াসে উপনীত হয়।

সুন্দরকে নিরালম্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলার মানে এ নয় যে তার জীবনের ইতিহাসের সভ্যতার ক্রমবিবর্তনধারার কোনো যোগাযোগ নেই। সৌন্দর্য, তা সে প্রাকৃতই হোক্ আর শিল্পপ্রসূতই হোক, মানবমনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে বাধ্য, তাতে জীবনের চিত্রল ছায়া পড়বেই। এ যুগের শিল্পীদের চিত্রকল্প (imagery) ও মানসপ্রতীক বিশ্লেষণ করে ফ্রয়েড তাতে অবলুপ্ত মিশরি সভ্যতার আভাস পেয়েছেন — সে কথার উল্লেখ করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। জ্ঞানত অজ্ঞানত বর্তমান ও অতীত সমাজ পরিবেষ্টনীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা আমাদের সাধ্যের বাইরে। এ সত্যের গুরুত্ব অতি বড়ো মূর্খও অস্বীকার করবে না, কিন্তু এ কথা ভুললেও অন্যায় হবে যে, এই পরম সত্যটির অবগতি আমাদের শিল্প সমালোচনী এবং ইতিহাস সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গিতেই আবদ্ধ। যখন আমরা একাগ্র স্তিমিত চিত্তে সুন্দরের ধ্যানে নিমগ্ন, তখন জীবনের সমাজের বহিঃসংসারের কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ তখন সেই সুন্দরের ধ্যানলব্ধ মূর্তিতে অন্তর্লীন হয়ে তাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বিত সত্তাগৌরবে গরীয়ান করে তোলে। বাস্তব তথ্যের আছে বহিঃসঙ্গতির বিস্তৃত জাল, বাস্তব-সম্পর্কবিহীন সুন্দরের আছে অন্তঃসঙ্গতির বিপুল ঐশ্বর্য। এই অন্তঃসঙ্গতিকে এলেক্জ্যান্ডার সুন্দরের কেবল কল্পনামূর্তি নয়, তার যে প্রত্যক্ষগোচর বাস্তব ভিত্তি, তারও বৈশিষ্ট্য জ্ঞান করেন। কিন্তু রূপদ্রষ্টার সৌন্দর্য স্বপ্নপ্রয়াণের যে-পাথুরে ভূমিতে যাত্রারম্ভ, তার কি কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে, কিংবা থাকবার প্রয়োজন্ আছে? সে হতে পারে ফুল, পাখি, নারিকেলকুঞ্জের ছায়া, আড়-চোখের বাঁকা চাউনি, নির্বোধ শিশুর অহেতুক কান্না। এই অতি সাধারণ অকিঞ্চিৎকর বাস্তবের টুক্‌রোকে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থিত করে সমগ্র জীবনের সমস্ত ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় তাকে সমৃদ্ধ করে যে তপস্যালভ্য ধ্যানগম্য মূর্তি গঠন করা হয়, তার মধ্যেই আমরা পাই ঐক্য, সঙ্গতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্নিগ্ধ সমাবেশ। — প্রশ্ন উঠতে পারে, মৃণাল বাহু সম্বন্ধে গানের কাব্যের চিত্রের ইয়ত্তা নেই, কিন্তু ড্রেন-পাইপ শিল্পীমাত্রেরই অবজ্ঞাভাজন — এর হেতু কী? এর হেতু মৃণাল বাহু ও ড্রেন পাইপের কোনো বস্তুগত পার্থক্যে খুঁজলে চলবে না। এর জন্য দায়ী আমাদের সুকুমার কলাপদ্ধতির যুগযুগান্তর ব্যাপী প্রথা। বংশানুক্রমে আমরা প্রীতিকরের মর্মরবেদিতে সুন্দরের উপাসনা করে এসেছি। অপ্রীতিকরের মধ্যে রূপসাধনা বিংশ শতাব্দীর নবধর্ম। এ ধর্মের ঐতিহ্য গড়ে উঠুক, এর প্রভাব শোণিতে প্রবেশ করুক, এর মন্ত্র ধ্বনিত হোক দেশে দেশান্তরে, — তখন যাচাই করবার সময় আসবে ড্রেন পাইপ আর ডাঁটাচচ্চড়ি কাব্যের বর্ণাশ্রমে সত্যিই অস্পৃশ্য কিনা।

এতক্ষণ সৌন্দর্যের অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য ও অনন্যযোগিতার কথাই বলা হল। কিন্তু তার স্বাতিক্রমের (self-transcendence) যে একটা দিক আছে সে-কথাও আলোচনার যোগ্য। সত্য বটে, তার কল্পনা-দৃষ্টির অখণ্ডতায় বহির্জগতের যাবতীয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্তুসমারোহ অবলুপ্ত; কিন্তু দ্রষ্টা স্বয়ং তখন অবলুপ্তও নয়, সুন্দরের ব্যক্তিস্বরূপে বিলীনও নয়। বরং সেই মুহূর্তেই সে আপনার গভীরতম সত্তার নাগাল পায়। বলা যেতে পারে যে,

সুন্দরের অভিজ্ঞতায় বিষয় ও বিষয়ীর সমস্ত বিভেদ সমস্ত ব্যবধান ঘুচে যায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাদের সাহিত্য অর্থাৎ সম্মিলন ঘটে, সেই সম্মিলনের ফলে এমন এক অভিনব অখণ্ড সত্তা জন্মলাভ করে যার মধ্যে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের খণ্ডিত অস্তিত্বের পরম পর্যবসান। এলেক্‌জ্যান্ডার মনে করেন যে, সৌন্দর্যের অবস্থিতি বস্তুতেও নয় মনেও নয়, তাদের এই সম্মিলিত সত্তাই সুন্দর উপাধির প্রকৃত অধিকারী। ক্রোচের সৌন্দর্যতত্ত্বের মর্মকথা, উপলব্ধি ও অভিব্যক্তির অভিন্নতাতেও এই সম্মিলনের ইঙ্গিত রয়েছে। অভিব্যক্তির অর্থ তাঁর লেখায় যে খুব পরিস্ফুট হয়েছে তা বলা যায় না। তবে এটা নিশ্চিত যে অভিব্যক্তির মানে অন্যের কাছে প্রকাশ নয়। তাঁর মতে অন্তঃপ্রকাশ ও বহিঃপ্রকাশের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, ও-দুটো সম্পূর্ণ অসমজাতিক ক্রিয়া — প্রথমটা তত্ত্বগত এবং দ্বিতীয়টা ব্যবহারগত। অন্তঃপ্রকাশের সঙ্গেই অভিব্যক্তির তাদাত্ম্য, বহিঃপ্রকাশকে তো তিনি সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচ্য প্রসঙ্গই মনে করেন না। অভিব্যক্তির অর্থ-বিভ্রাট ঘটেছে অন্যদিক দিয়ে। একস্থলে তিনি লিখেছেন, যারা নিজেকে সমাদর-বঞ্চিত গুণী মনে করে, ভাবে যে তাদেরও শেক্সপীয়রের মতো উপলব্ধির গভীরতা ও ব্যাপ্তি আছে কেবল টেক্‌নিকের অভাবে তা অব্যক্ত ও অনাদৃত, তারা আত্মপ্রবঞ্চক, তারা জানে না যে তাদের উপলব্ধিই অঙ্কুরিত হয়ে ওঠেনি। অপ্রকাশিত উপলব্ধি আকাশকুসমের মতন অলীক, চতুষ্কোণ বৃত্তের মতন স্বতোবিরুদ্ধ। এই প্রকাশের মূল্য অন্যের কাছে কী সে-কথা অবান্তর, এর বাহন যে-শব্দবর্ণসংকলন তারও সাধারণের প্রত্যক্ষগোচর হবার কোনো দরকার নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা কাল্পনিকই হয়ে থাকে। তবে কিছু-একটা ফুটে ওঠা চাই, নইলে উপলব্ধির দাবি বৃথা। এখানে তো মনে হয় প্রকাশ করার অর্থ সুস্পষ্ট করা, সুনির্দিষ্ট করা। আবার অন্যত্র তিনি লিখেছেন যে, সুন্দরের মধ্যে অভিব্যক্ত হচ্ছে রূপদ্রষ্টার অনুভূতি, তার অন্তরাত্মা। সেই উপলব্ধিই সার্থক উপলব্ধি, প্রকাশ-জ্যোতিষ্মান উপলব্ধি, যাতে সম্ভব হয়েছে বিষয় ও বিষয়ীর সাযুজ্য, আত্মা ও অনাত্মের সেতুবন্ধন। মন যখন ব্যবধান লঙ্ঘন করে নিজেকে প্রকাশ করে বস্তুর মধ্যে, তখন তার অনাত্মীয় নিছক প্রাকৃতিক রূপকে মানসিকতার আস্তরণে আবৃত করে তার সঙ্গে মিলনের পথ সহজ করে নেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই সাহিত্য-সাধনাই সাহিত্যের তাৎপর্য। সৌন্দর্য-উপলব্ধিতে বস্তু যেমন মনোগত হয়ে ওঠে, মনও তেমনি বস্তুগত হয়, তন্ময় হয়, এ-কথাটা অতি সুবিদিত ও সনাতন বলেই বোধহয় কবি উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ক্রোচের কাছে উপলব্ধি ও অন্তঃপ্রকাশ অভিন্ন। এই অন্তঃপ্রকাশের মধ্যে টেক্‌নিক্ অবর্তমান, সাধারণ মানুষও এতে বঞ্চিত নয়;তবে প্রকাশের গভীরতা ও ব্যাপকতার তারতম্য অবশ্য অনিবার্য। এ-ক্ষমতা না থাকলে শুধু যে রসসৃষ্টি অসম্ভব তা-ই নয়, রসসম্ভোগও অসাধ্য। টেক্‌নিকের আবশ্যকতা বহিঃপ্রকাশের বেলা। তার সাহায্যে শিল্পী আপন উপলব্ধিকে এমন-সব সাধারণের প্রত্যক্ষগোচর বাস্তব সামগ্রীতে পরিণত করে যা দর্শক বা শ্রোতার মনে অনুরূপ উপলব্ধি জাগাতে সক্ষম। এই বাস্তব শিল্প-সামগ্রীকে সুন্দর বলতে ক্রোচে একান্তই অনিচ্ছুক;তাঁর বিবেচনায় সৌন্দর্যের দাবি একমাত্র সেই ধ্যানমূর্তির, শিল্পীর অন্তরাত্মা যার সঙ্গে সম্মিলিত, এবং যাকে সে অন্যের মনে উদ্দীপ্ত করে তার আত্মপ্রকাশকে পূর্ণতর করে তোলে। শিল্প-সামগ্রী — পটের উপর বর্ণ-বিন্যাস,

খোদাই-করা মর্মর-প্রস্তর, ধ্বনিতরঙ্গ, ছাপার অক্ষর — এ-সমস্তই সেই উদ্দীপনার ভৌতিক উপকরণমাত্র। যাকে বলি প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্য সে-ও তাই। চিত্র ও সঙ্গীত যে-অর্থে উদ্দীপক, ছাপার অক্ষরে কবিতা সে-অর্থে উদ্দীপক নয়, তাকে বরঞ্চ উদ্দীপকের উদ্দীপক বলা যেতে পারে। প্রথমত সে উদ্দীপ্ত করে শুধু ধ্বনি-হিল্লোল ও চিত্রকল্প : পরে, এদের উদ্দীপনায় পাঠকের মনে জাগে শিল্পীর উপলব্ধ ভাবরূপ। সে-উপলব্ধি অবশ্য পাঠকেরই, তার সঙ্গে শিল্পীর উপলব্ধির কোনো রহস্য-নিগূঢ় তাদাত্ম্য নেই, আছে অতিশয় পার্থিব আনুরূপ্য ও সাদৃশ্যমাত্র।

কলিংউড্ অভিব্যক্তির এমনতরো অন্তর্মুখী অর্থ করতে নারাজ। তাঁর কাছে সুন্দরের দ্যোতনায় দৃশ্য ও দ্রষ্টা দুয়েরই অতীত একটা বৃহত্তর সত্তার ইঙ্গিত নিহিত। সৌন্দর্যের একটি স্বতোবিরুদ্ধতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন; সুন্দর বস্তু একদিকে বাস্তব-বিশ্বের সঙ্গে অসম্পৃক্ত, তাঁর ভাষায় বিশুদ্ধ কল্পনা;অন্যদিকে সে দাবি করে উত্তর-প্রপঞ্চ পরম সত্তারই অভিব্যক্তি। এ-অভিব্যক্তি অনুভবগত, চিত্তগত নয়। কী অভিব্যক্তি হচ্ছে তার সুনির্দিষ্ট সম্যক্-বোধগম্য পরিচয়ে আমরা বঞ্চিত, কিন্তু কিছু-একটা ইঙ্গিত যে সুন্দরকে অর্থজ্যোতির্ময় করে তোলে, রূপদ্রষ্টার মনে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সে-অনির্দিষ্ট ইঙ্গিতের অর্থ কী তা শিল্পী জানে না, জানতে চায়ও না — তাকে সুনির্দিষ্ট করবার সমস্যা দার্শনিকের। যে মনোবৃত্তির প্রণোদনায় কলিংউড্ অভিব্যক্তির এই বহিরাশ্রয়ী বিশাল অর্থ করেছেন তার জন্য নিশ্চয়ই তিনি হেগেল-প্রবর্তিত ব্রহ্মবাদের কাছে ঋণী। সে-মতবাদের সৌন্দর্যতত্ত্ব বেদমন্ত্রের মতো একটি সংক্ষিপ্ত অর্থঘন বাক্যে সর্বত্রই ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকে — ইন্দ্রিয়গম্যের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীতের আবির্ভাব। কথাটা কিন্তু এতই ব্যাপক যে, সমস্ত বিজ্ঞানকেও অনায়াসে এর পরিধির মধ্যে টেনে আনা যায়। নিউটন-জীবনীর সেই সুবিখ্যাত, যদিও কল্পনা-প্রসূত, বৃত্তান্তের কথাই ধরা যাক্। আপেল-পতনে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন কি ইন্দ্রিয়গম্যের ভিতরে ইন্দ্রিয়াতীতের প্রকাশ নয়? অবশ্য বিজ্ঞানের ইন্দ্রিয়াতীতের প্রকৃতি আলাদা, সে হচ্ছে গাণিতিক-সঙ্গতি-প্রতিষ্ঠিত সর্বজনীন তত্ত্বশৃঙ্খলা, সমস্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত তথ্য যার মধ্যে দানা বেঁধেছে যুক্তির অটুট সূত্রে। আর্টের ইন্দ্রিয়াতীত কী? হেগেল্-বাদীরা বলবেন তাঁদের সেই ব্রহ্ম, যার শতাব্দীব্যাপী ব্যাখ্যার পর আজও সন্দেহ দূর হয় না যে, তার পরিগ্রহণে যুক্তির চেয়ে নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাই অধিক। আস্তিককেও এর উত্তর দিতে দিশেহারা হতে হবে না, সকল সমস্যার চরম নিষ্পত্তিরূপে রয়েছেন তার ভগবান। রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে লিখতে পেরেছিলেন : "ফুলও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে। সংসারের সোনার লঙ্কায় রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্বাসিত হয়ে আছি; রাক্ষস আমাদের কেবলি বলছে, আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজন করো। কিন্তু সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ঐ ফুল। সে চুপি চুপি আমাদের কানে এসে বলে, আমি এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন, আমি সেই সুন্দরের দূত।" কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরবাদে আস্থা হারিয়েছেন, এই সোনার লঙ্কাকেই সর্বস্ব জ্ঞান করেছেন, সৌন্দর্যধ্যান-স্তিমিত নয়নে কোন কোন নভোপ্রান্তচারিণীর সুদূর ছায়াঞ্চল দেখবেন তাঁরা?

□ *পথের শেষ কোথায়*, ১৩৮৪

ভারতবর্ষ ও সমাজতন্ত্রবাদ

হুমায়ুন কবির

সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমস্ত পৃথিবী সংগঠিত না হলে যে মানুষের কল্যাণের কোনও সম্ভাবনা নাই, এ বিষয়ে বর্তমানে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বোধ হয় সকলেই এক মত। বর্তমানে পৃথিবীতে যে রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক নৈরাজ্য, তার ফলে মানুষের জীবন পদে পদে ব্যাহত ও বঞ্চিত। সাম্রাজ্যবাদীর নির্লজ্জ লোভ মানুষকে পণ্যে রূপান্তরিত করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের ক্রমবর্ধমান জ্ঞানকে ভিত্তি না করে বরং মানুষকে শোষণের ভিত্তিতেই ইউরামেরিকার তথাকথিত সভ্যতা গড়ে উঠেছে। তার ফলে দেশের সঙ্গে দেশের সংঘর্ষ, জাতির প্রতি জাতির বিদ্বেষ এবং রাষ্ট্রের মধ্যেও শ্রেণী-শাসন ও শোষণের বীভৎস প্রকাশ। যতদিন মানুষ মানুষকে শোষণ করবে, ততদিন আন্তর্জাতিক ও অন্তর্জাতিক শোষণের শেষ নেই। যতদিন মানুষ মানুষকে দাস করে রাখবে, ততদিন মানুষের দুঃখ ও দৈন্যের অবসান হতে পারে না। বর্তমানে জ্ঞানবিজ্ঞানের যে শ্রীবৃদ্ধি, তার ফলে এ সংঘর্ষ আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশ বৎসর না পেরোতেই যে দুটি মহাযুদ্ধে পৃথিবী আন্দোলিত হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি ঘটলে সভ্যতার ধ্বংসে যে অনিবার্য সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। অথচ বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি না বদলালে যুদ্ধ বন্ধ করাও অসম্ভব। গত মহাযুদ্ধের পরে জার্মানিকে নিরস্ত্র করা হয়েছিল, কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। নেপোলিয়নের যুগেও একবার জার্মানিকে নির্বল করবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও নেপোলিয়নের পরাজয় সাধন জার্মান সাহায্যেই সম্ভব হয়েছিল। বর্তমান যুদ্ধের পরেও জার্মানিকে নিরস্ত্র করবার চেষ্টা যে পূর্বের চেয়ে বেশি সার্থক হবে, তা মনে করবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

বস্তুতপক্ষে কোনও দেশবিশেষকে এ রকম ভাবে নিরস্ত্র বা নির্বল করবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। পৃথিবীর কোনও দেশ যে স্বভাবত শ্রেষ্ঠ অথবা কোনও দেশ স্বভাবত অপ্রকৃষ্ট, তা মনে করবার কোনও কারণ নেই। ইতিহাসও আমাদের শেখায় যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশ পৃথিবীর নেতৃত্ব করেছে, এবং যে যুগে যে দেশে নেতৃত্ব এসেছে, তখন সর্ব বিষয়েই সে দেশ শ্রেষ্ঠতার দাবি করেছে। অনেকেই ভাবেন যে ইউরোপের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এশিয়া বুঝি স্থান পায় না — তাঁরা ভুলে যান যে ইউরোপের নেতৃত্ব অত্যন্ত সাম্প্রতিক। গত দু-তিন শো বছর হয়তো সমরনীতি, বাণিজ্য, শিল্প ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ইউরোপীয়েরা এশিয়াবাসীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলা চলে কিন্তু ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন যে চতুর্দশ শতাব্দীতেও এই সমস্ত ক্ষেত্রেই ইউরোপবাসী বিনা প্রশ্নে আরব বা মুরদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছে। হয়তো কেউ সন্দেহ করতে পারেন যে আফ্রিকার নিগ্রো ইয়োরোপ বা এশিয়াবাসীর তুলনায় স্বভাবতই নিকৃষ্ট —

আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সভ্যতায় তাদের তেমন উল্লেখযোগ্য দান নাই। এক হাজার বছর আগে বর্তমানের সভ্যতাভিমানী ইংরেজ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলত — সে সময় পর্যন্ত পৃথিবীর সভ্যতাভাণ্ডারে তাদের উল্লেখযোগ্য দান কিছুই ছিল না বললে বোধ হয় বিশেষ অত্যুক্তি হয় না।

কোনও বিশেষ জাতিকে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট মনে করবার কোনও কারণ নাই, এবং কোনও বিশেষ জাতির দোষে অথবা অপরাধের জন্যই যে যুদ্ধ বাধে একথা মনে করা সমানই ভুল। যুদ্ধ কোনও একটা কারণে বাধে না — সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে সমস্ত ত্রুটি ও গ্লানি সঞ্চিত রয়েছে, সেগুলি যখন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠে, তখন যুদ্ধ বা বিপ্লব ভিন্ন তাদের নিরশনের অন্য কোনও উপায় থাকে না। ব্যক্তি বা জাতি যুদ্ধ অথবা বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে না — বড়ো জোর বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। তাই বর্তমান যুদ্ধান্তে জার্মানি ও জাপানকে নিরস্ত্র করতে পারলেই যে পৃথিবীর সমস্যার সমাধান হবে একথা মনে করার মতন ভুল আর দ্বিতীয় নাই।

প্রতি দেশেই আমরা দেখি যে একদিকে বিলাসের প্রাচুর্য ও প্লাবন এবং অন্যদিকে অভাব যন্ত্রণার নিদারুণ নিপীড়ন। সমাজের এ অসুস্থ অবস্থায় সমাজে শান্তি থাকতে পারে না, এবং সমাজের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত অশান্তি, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংঘর্ষে তাই আত্মপ্রকাশ করে। এ অস্বাভাবিক অব্যবস্থার ফলে সমাজে কল্যাণের আদর্শ নিষ্ক্রিয় ও অর্থহীন মুনাফার লোভ সবল ও সক্রিয়। গত ১৯৩০-৩২ সালে যখন পৃথিবীময় অর্থসঙ্কট এসেছিল, তখন দেখা গিয়েছে যে সে দুর্দিনেও ব্যসনের ব্যবসায়ে মুনাফার মাত্রা কমে নি। বিলেতে কাপড়ের কল বন্ধ হয়েছে কিন্তু মদের ভাঁটি এবং ফোটোগ্রাফির কারখানা পুরোদমে চলেছে। বর্তমানে আমরা দেখি যে ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে অত্যাচারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, অথচ অস্ট্রেলিয়ার খাদ্যশস্য রাখবার জায়গা নেই বলে গম পুড়িয়ে অথবা সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র জাহাজের অভাবে যে এ অবস্থা ঘটেছে, তাও বলবার উপায় নাই। জাহাজ অথবা যানবাহনের প্রশ্নই যদি একমাত্র প্রশ্ন হত, তবে বিলেতে খাদ্যশস্যের অবস্থা ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক বেশি সঙ্গীন হতে বাধ্য। বিলেতের খোরাকের চার আনাও দেশে উৎপন্ন হয় না, এবং বাকি বারো আনা যে পথ দিয়ে আনা হয়, ডুবোজাহাজ ও উড়োজাহাজের উৎপাতে সে রকম বিপদসঙ্কুল বাণিজ্য-পথ পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করে বাংলা তার খোরাকের প্রায় চৌদ্দ আনা নিজে উৎপন্ন করে, এবং বাইরে থেকে খোরাক আনতে হলে যে পথে আনতে হবে, সে পথে শত্রুর দৌরাত্ম্য সে তুলনায় তুচ্ছ, একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। অথচ বিলেতে খোরাকির খরচ টাকায় চার আনাও বাড়ে নি, আর বাংলাদেশে ধানচালের দাম বেড়েছে সাত আট গুণ।

দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় তাই আমরা দেখি যে সমাজের কল্যাণ বা প্রয়োজন দিয়ে সমাজ ব্যবস্থায় সংগঠন হয় নি, বরং ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের হিসাবেই সমাজ চালিত হচ্ছে। তার ফলে যে কেবল রাষ্ট্র বা সমাজের অভ্যন্তরে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ জমে উঠে তা নয়, এই অব্যবস্থা আন্তর্জাতিক বা আন্তরাষ্ট্রিক ব্যবস্থাকেও বিষাক্ত করে তুলেছে। যে সমস্ত ব্যক্তি বা শ্রেণী নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য স্বজাতি বা স্বদেশবাসীকে বিসর্জন দিতে ইতস্তত

করে না, তারা যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিদেশি বা ভিন্ন জাতিকে শোষণ করবে, তাতে বিচিত্র কি? ব্যক্তিগত লাভের লোভ সমাজের অভ্যন্তরে যে লালসার সৃষ্টি করে, সাম্রাজ্যবাদ বা পরদেশ লুণ্ঠন যে তারই স্বাভাবিক অভিব্যক্তি এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বস্তুতপক্ষে শোষণের ইচ্ছাই বিদেশ জয় ও শাসনের ভিত্তি, এমন কি দেশের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায়ও এ শোষণ-মনোবৃত্তির আভাস মেলে।

বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করলেও একথা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। কখনও জাতির লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়, কখনও বা সামরিক মর্যাদার লোভে, কখনও বা ধর্মপ্রেরণার প্রাবল্যে নতুন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে মনে হতে পারে, কিন্তু এ সমস্ত দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রেও যদি আমরা নব নব সাম্রাজ্য সৃষ্টির প্রকৃত কারণ খুঁজতে চেষ্টা করি, তবে দেখব যে সর্বত্রই অর্থনৈতিক প্রয়োজন প্রকাশ্য বা পরোক্ষভাবে জনগণকে উত্তেজিত ও উদ্বেলিত করেছে। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি অর্থনৈতিক, একথা তাই অত্যুক্তি নয়, এবং সমাজের আর্থিক সংগঠন, প্রকৃতি ও রূপ না বদলালে যে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটতে পারে না একথাও নিঃসন্দেহ। সাম্রাজ্যবাদের অবসান না হলে যে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন হতে পারে না, সে কথাও কি আজ বোঝাবার প্রয়োজন আছে? এটা স্বাভাবিক মানবধর্ম যে যদি অত্যাচারেব ফলে অত্যাচারীর শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায়, তবে অত্যাচারী মনোবৃত্তি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। সাম্রাজ্যবাদের সুবিধা যারা পুরোপুরি ভোগ করেছে, সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিতে নিজেদের জাতির জীবনের উৎকর্ষ সাধন করেছে, তারা যদি অন্যকে সাম্রাজ্যবাদ বর্জন করতে বলে তা হলে তা উপহাসের মতো শোনায়। কাজেই যতদিন পৃথিবীতে একটি দেশও পরাধীন থাকবে, ততদিন সাম্রাজ্যবাদের স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হিসাব যুদ্ধবিগ্রহের অবসান হওয়াও অসম্ভব। সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা, সাম্রাজ্যবাদী পৃথিবীতে গণতন্ত্রেরও স্থান নাই।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টান্ত দেখলেই একথা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। ইংল্যান্ডের লোকসংখ্যা গত দুইশো বছরে যে ভাবে বেড়েছে পৃথিবীর কোথাও তার তুলনা মেলে কিনা সন্দেহ। ১৭০০ সালে ইংল্যান্ডের লোকসংখ্যা ছিল ষাট লক্ষের সামান্য কম এবং ১৯০০ সালে সেই লোকসংখ্যা প্রায় চার কোটি পার হয়ে গেছে। দুইশো বছরে কেবল লোকসংখ্যা যে ছসাতগুণ বেড়েছে, তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডের সামাজিক সম্পদ ও ব্যক্তিগত আয়ও অসম্ভব ভাবে বেড়ে গেছে। বিলেতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের আলোচনা করলে দেখা যায় যে উনিশ শতকের গোড়াতেও গ্রামে শতকরা দুয়েক জনের বেশি লোকের ভাগ্যে সপ্তাহে একদিন মাংস জুটত কিনা সন্দেহ, অথচ একশো বৎসরের মধ্যে অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়ে গেল যে বর্তমান মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বেকারের ভাগ্যেও সপ্তাহে প্রায় চোদ্দ টাকা অর্থাৎ মাসিক ৬০ টাকা সরকারি ভাতা জুটেছে। এটা লক্ষণীয় যে পলাশির যুদ্ধের কিছুদিন আগে থেকেই সৌভাগ্যোদয়ের সূচনা দেখা দিলেও পলাশির যুদ্ধের পরেই ইংরেজের সৌভাগ্যের জোয়ার প্রবল হয়ে উঠল। যে বস্ত্রশিল্পের দৌলতে ইংরেজের সাম্প্রতিক প্রতিষ্ঠার সূচনা, তারও ভিত্তিতে রয়েছে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অবনতি। যে ভাবে আইন করে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রসার কেবলমাত্র ইংল্যান্ডে নয়, সমস্ত ইউরোপে কমানো হয়েছিল — তার ইতিহাস স্মরণ করলে ইংরেজ অর্থনৈতিকের তথাকথিত স্বাধীন শিল্পবাণিজ্য বা ফ্রি-

ট্রেডের কথা উপহাস মনে হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে দক্ষিণ আমেরিকার স্বর্ণ ভাণ্ডার ইংরেজের অর্থনৈতিক সংগঠনে সহায়তা করে থাকলেও অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ইংরেজের যে অকস্মাৎ এবং অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি, তার মূলে ভারতীয় সম্পদের ব্যবহার ও শোষণ। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ এবং ১৭৬৭ সাল থেকেই ইংরেজের বস্ত্রশিল্পের অগ্রগতির শুরু, যন্ত্রশিল্পে নিত্য নব আবিষ্কারের আরম্ভ। এ যোগাযোগকে আকস্মিক মনে করার কোনও কারণ নাই এবং ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের কার্যকলাপের যে তদন্ত ও বিচার সে সময় হয়েছিল, তাতে একথা নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে যে ভারতীয় অর্থ সম্পদই ইংরেজ রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন জুগিয়েছে। আমেরিকার সোনার খনির চেয়েও ভারতবর্ষ ইংরেজের পক্ষে অধিক লাভজনক সোনার খনি হয়ে দাঁড়াল।

সে অবস্থার আজও পুরোপুরি পরিবর্তন হয় নি। এখনও ইংরেজের জাতীয় সম্পদের চার আনা ভারতবর্ষ থেকে সংগৃহীত — এখনও ভারতীয় কাঁচা মাল ইংরেজেব জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির ভিত্তি এবং সেই সোনার খনি রক্ষার উদ্দেশ্যে সমস্ত যোগাযোগের পথ নিরাপদ করবার জন্যই মিশরে ইংরেজের আধিপত্য, প্যালেস্টাইনে ইহুদি আরবে বিবাদ সৃষ্টি এবং এডেন অধিকার — এক কথায় সমগ্র প্রাচ্যের উপর ইংরেজের প্রভুত্ব ও আধিপত্যের প্রয়োজন। শুধু তাই নয়। ইংরেজ ভারত সাম্রাজ্যের বলে পৃথিবীতে যে রাষ্ট্রক্ষমতা ও নিজের দেশে যে আর্থিক সম্পদের অধিকারী, তার দৃষ্টান্তে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও সাম্রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি, কলহ। একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে সাম্রাজ্য, উপনিবেশ এবং তার ফলে যে প্রতিপত্তি, তারই আশঙ্কা অথবা ঈর্ষা গত দেড়শো দুইশো বছরের সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ ও সংগ্রামের মূল। সাম্রাজ্য অধিকার নিয়েই বিপ্লবী ফরাসির সঙ্গে ইংরেজের সংঘর্ষ। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যই ইংরাজের সঙ্গে গত শতকে রুশদেশের এবং বর্তমান শতকে জার্মানির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাত। সেই সাম্রাজ্যের লোভেই আফ্রিকা ভাগাভাগি নিয়ে ইউরোপীয় শক্তিদের নির্লজ্জ ও উলঙ্গ কলহ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোভে দেশ ও রাষ্ট্রের মধ্যে শ্রেণীর দ্বারা শ্রেণীর অত্যাচার এবং তারই বৃহত্তর অভিব্যক্তি হিসাবে জাতি ও দেশের দ্বারা ভিন্ন জাতি ও দেশের স্বাধীনতা হরণ ও শোষণ। কালে সাম্রাজ্যবাদী দেশের শোষিত শ্রেণীও নিজের দুরবস্থার কথা ভুলে যায়, কারণ শাসক শ্রেণী দেখে যে সাম্রাজ্য থেকে আহরিত ধনসম্পদের খানিকটা অংশ দেশের শোষিত শ্রেণীর মধ্যে না ছড়ালে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিপ্লবের ফলে কেবল যে সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে, তা নয়, দেশের অভ্যন্তরেও সামাজিক সংস্থিতি রূপান্তরিত হয়ে ব্যক্তিসম্পত্তি বিলুপ্ত হবে।

ব্যক্তিসম্পত্তি ও মুনাফার লোভ তাই বর্তমান পৃথিবীর দুর্গতির প্রধান কারণ অথচ বর্তমান পৃথিবীতে এ দুর্গতির কোনও সার্থকতা বা প্রয়োজন নাই। মানুষ যখন প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করতে পারে নি, সেদিন ব্যক্তিসম্পত্তি বা মুনাফার হয়তো প্রয়োজন ছিল, কারণ তা নইলে তখন মানুষের সমাজে উন্নতি বা অগ্রগতির সম্ভাবনা থাকত না। বর্তমানে প্রাকৃতিক শক্তির শৃঙ্খলনে সমস্ত মানুষের জন্যই প্রাচুর্যের সম্ভাবনা রয়েছে। আধুনিক যুগে ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য বা মুক্তির জন্য অন্যকে পদানত রাখবার কোনও প্রয়োজন নাই। প্রাচীন যুগে মানুষের যে অর্থনৈতিক দাসত্ব, তার সমর্থন না করলেও তা বোঝা যায়, কিন্তু বর্তমান জগতে

দাসত্বের অস্তিত্ব কেবল নিরর্থক নয়, তা মানুষের বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রাকৃতিক শক্তিকে শৃঙ্খলিত করার ফলে আজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হল। একমাত্র ব্যক্তিসম্পত্তি ও তারই অর্থনৈতিক প্রকাশ ধনতন্ত্র ও রাজনৈতিক অভিব্যক্তি সাম্রাজ্যবাদ সেই পরিণতির পরিপন্থী। পৃথিবীর যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তির মূলও এইখানে।

পৃথিবীতে যাঁরা শান্তি স্বাধীনতা ও উন্নতির যুগ আনতে চান, তাঁদের প্রথম কর্তব্য ব্যক্তিসম্পত্তি ও সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস। ব্যক্তিসম্পত্তি ধ্বংসের জন্য প্রয়োজন দেশে দেশে বিপ্লব কিন্তু সেই বিপ্লবী মনোবৃত্তি গড়তে হলে তার পূর্বে প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা অপরিহার্য। তাই বর্তমান পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের যাঁরা সমর্থক, সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটানো তাঁদের প্রথম কর্তব্য। পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ লোকের ভারতবর্ষে বাস, চীনদেশের লোকসংখ্যা বোধ হয় আরও বেশি, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের বাসভূমি বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদের কবলে। কেবল লোকসংখ্যার দিক দিয়ে নয়, প্রাকৃতিক সম্পদেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম অংশগুলি বর্তমানে পরপদানত বলে স্বভাবতই বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে তারা দ্বন্দ্ব ও কলহের লক্ষ্য। পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ যতদিন পরাধীন হয়ে থাকবে, ততদিন সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র আকাশ কুসুম থাকতে বাধ্য।

২

এ কথা যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁরা অনেকে বলে থাকেন যে বর্তমানে পৃথিবীতে যে মহাযুদ্ধ চলছে, তার ফলে যে সমস্ত শক্তি কার্যকরী, তাদের প্রভাবে বিশ্বমানুষের মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের জয় অনিবার্য। তাঁরা একথাও বলে থাকেন যে বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রকৃতি পূর্বেকার সমস্ত যুদ্ধ থেকে স্বতন্ত্র — তাঁদের মতে বর্তমানের যুদ্ধ জনযুদ্ধ, এবং জনযুদ্ধের অবসানে জনগণের জয় অনিবার্য। জনযুদ্ধ বলতে যদি বোঝায় যে জনসাধারণের সে যুদ্ধে যোগ রয়েছে, তবে পৃথিবীতে যত যুদ্ধ হয়েছে, সেগুলি সবই জনযুদ্ধ — জনগণ যোগ না দিলে কোনওদিন কোনও যুদ্ধ চলতে পারে না। জনযুদ্ধের অর্থ যদি হয় যে জনগণ নতুন অধিকার লাভের জন্য যুদ্ধে ব্রতী, তবে কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ জনযুদ্ধ নয়। জনগণের কোনও নতুন স্বার্থ বা অধিকার লাভের জন্য ইংরেজ এ যুদ্ধ ঘোষণা করে নি — নিজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের খাতিরেই তার যুদ্ধে যোগদান। যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধেও একথা অনেক পরিমাণে সত্য — যুক্তরাষ্ট্র আক্রান্ত হওয়াতেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, এবং সেখানেও পৃথিবীর জনগণের মুক্তি অথবা নতুন কোনও অধিকার অর্জনের আদর্শ নাই। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার অনেক কথা অবশ্য ইংরেজ ও আমেরিকান রাষ্ট্রনেতারা বলেছেন, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের দৃষ্টিতেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিচার হয়েছে। ইউরোপীয় ভূখণ্ডে একক কোনও শক্তির প্রভুত্ব ইংরেজ ও মার্কিন উভয় রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক — তাই ইউরোপীয় ভূখণ্ডে বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। চীন দেশে জাপান সাম্রাজ্যবাদের সংঘাতের যে আশঙ্কা, তারই প্রত্যুত্তর হিসাবে চীনের স্বাধীনতাও মিত্রপক্ষের সমরলক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু যে সমস্ত দেশ মিত্রপক্ষের পদানত, তাদের স্বাধীনতার ঘোষণা মিত্রপক্ষের

সমরলক্ষ্যের মধ্যে স্থান পায় নাই। চার্চিল সাহেব তো স্পষ্টতই বলেছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের উদ্দেশ্যে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদগ্রহণ করেন নাই।

এমন কি রুশ দেশের ক্ষেত্রেও বর্তমান যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলা চলে কিনা সন্দেহ। স্ট্যালিন নিজে বহুবার বলেছেন যে বর্তমান যুদ্ধ সোভিয়েত রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার যুদ্ধ — বারংবার তিনি শ্লাভজাতিদের সংহত করে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন। হিটলারের সঙ্গে তিনি যে অনাক্রমণচুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন, হিটলার সে চুক্তি লঙ্ঘন করাতেই রুশ ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ। যদি হিটলার সে চুক্তি রক্ষা করে চলতেন, তবে স্ট্যালিনের মতে রুশ দেশের দিক থেকে জার্মানিকে আক্রমণের কোনও প্রশ্ন উঠত না। অর্থাৎ স্ট্যালিন প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন যে নাৎসি জার্মানির স্বরূপ যাই হোক না কেন, নাৎসি জার্মানির আক্রমণে অন্যত্র মানুষের অধিকার যতই ক্ষুণ্ণ হোক না কেন, তা সত্ত্বেও রুশ দেশকে আক্রমণ না করলে নাৎসি জার্মানির প্রতি সোভিয়েত রাষ্ট্রের কোনও আক্রোশ অথবা প্রতিকূল ভাব থাকত না। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কেউ কেউ বলে থাকেন যে সাম্রাজ্যবাদ যতই অবাঞ্ছনীয় হোক না, নাৎসিবাদ তার চেয়েও মারাত্মক, কাজেই সাম্রাজ্যবাদ ও নাৎসিবাদের সংঘর্ষে সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করা প্রত্যেক সমাজতন্ত্রীর কর্তব্য। স্ট্যালিন কিন্তু সে কথা বলেন নাই জাপানকেও আক্রমণ করেন নাই — বরং তাঁর কথায় ও কাজে এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সাম্রাজ্যবাদ ও নাৎসিবাদের সংঘর্ষে সোভিয়েত রাষ্ট্র নিরপেক্ষ, সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে এক পা অগ্রসর হতেও সোভিয়েত রাষ্ট্র অনিচ্ছুক। জার্মানি আক্রমণ না করলে সোভিয়েত তাই যুদ্ধে নিরপেক্ষই থাকত। কাজেই সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধকেও বিশ্বমানবের মুক্তির যুদ্ধ অথবা জনগণের অধিকার সম্প্রসারণের যুদ্ধ বলা চলে না — সে যুদ্ধও একান্তভাবে সোভিয়েতের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা ও আত্মরক্ষার যুদ্ধ।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের বর্তমান যুদ্ধ যে জনযুদ্ধ নয়, তার আরও কতগুলি লক্ষণ মেলে। সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়ক স্ট্যালিন অনেকবার ঘোষণা করেছেন যে স্বদেশ রক্ষা করাই প্রত্যেক সোভিয়েত নাগরিকের কর্তব্য, এবং সে ব্রত উদ্‌যাপন হলে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বাহিরে পৃথিবীময়, কিংবা অন্ততপক্ষে ইউরোপময় বিপ্লবসাধনও সোভিয়েতের সমরলক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। সোভিয়েতের সমস্ত কর্মরীতিরই যাঁরা সমর্থক, যাঁরা মনে করেন যে স্ট্যালিন ভুল করতে পারেন না, সে রকম গুরুবাদী না হয়েও সোভিয়েতের পক্ষ থেকে হয়তো বলা চলে যে স্ট্যালিনের এ সমস্ত ঘোষণাই কূটনৈতিক চাল। এমনিতেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইংরেজ সাম্রাজ্য সোভিয়েত সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ এবং সোভিয়েত প্রভাবের প্রসারের আশঙ্কায় আতঙ্কিত, কাজেই সেক্ষেত্রে যদি স্ট্যালিন ঘোষণা না করেন যে সোভিয়েত বহির্ভূত কোনও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সোভিয়েত হাত দেবে না, তবে রুজভেল্ট বা চার্চিল তাকে সাহায্য করবেন কোন ভরসায়? এবং বর্তমানে সোভিয়েত রাষ্ট্রের যে সঙ্কট, সে বিপদের দিনে রুজভেল্ট চার্চিলের সাহায্য ভিন্ন সোভিয়েতের অস্তিত্ব রক্ষাও সম্ভব নয়।

এ কথার মূলে হয়তো যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু একটা প্রশ্নের তবু মীমাংসা হয় না। স্ট্যালিনের মনে যাই থাক না কেন, যে প্রকাশ্য উদ্দেশ্যের জন্য বর্তমানে সোভিয়েতের যুদ্ধ, সে উদ্দেশ্যের মধ্যে পৃথিবীর নিপীড়িত জনগণের স্থান নাই। কেবল তাই নয়, স্ট্যালিন ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিশ বৎসরের জন্য যে সন্ধি করেছেন, তার অন্যতম প্রধান শর্ত যে সন্ধিকামী শক্তি দুইটির মধ্যে কেউ অন্যের কোনও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। ভারতের এবং অন্যান্য উপনিবেশের রাষ্ট্রিক মুক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেব অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মধ্যে অন্যতম প্রশ্ন। কাজেই সোভিয়েত রাষ্ট্র নিজেব স্বীকৃতি অনুসারেই অন্তত কুড়ি বৎসরের জন্য পৃথিবীর নিপীড়িত জনগণের প্রায় এক চতুর্থাংশের অধিকার বা স্বাধীনতার জন্য কোনও উদ্যোগ করতে পারবে না। সে সঙ্গে একথা বলাও প্রয়োজন যে স্ট্যালিন সোভিয়েত বহির্ভূত জার্মান অধ্যুষিত যে সমস্ত দেশ বা জাতির সহায়তা বর্তমানে কামনা করেন, তাদের মধ্যে অনেকের কাছেই তাঁর আবেদনের ভিত্তি শ্লাভ জাতীয়তা বোধ। অর্থাৎ শ্রমিকবিপ্লবের আহ্বান, অথবা নিপীড়িত জনগণের মুক্তি সংগ্রামের পরিবর্তে বিভিন্ন শ্লাভ জাতির মধ্যে আত্মীয়তা ও রক্তের যোগকেই তিনি আত্মরক্ষার প্রবলতব অস্ত্র মনে করেছেন। বাস্তব দৃষ্টিতে এ সমস্তেরই সমর্থন থাকতে পারে — বর্তমানে হয়তো দুনিয়াব মজদুরের ঐক্যবোধের চেয়ে জাতীয়তার আহ্বানই অধিক কার্যকরী, কিন্তু এ স্বীকৃতির প্রকৃত তাৎপর্য এই যে বর্তমানের যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ারও কোনও বিপ্লবী বা জনস্বার্থ সম্প্রসারণের ভূমিকা নাই। সম্প্রতি তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অবসানে সেই কথাই আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে, এবং এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না যে যুক্তরাষ্ট্রের এবং বিলাতের পুঁজিপতিদের বাস্তব অথবা কল্পিত আশঙ্কা দূর করবার জন্যই তৃতীয় আন্তর্জাতিকের এ ইচ্ছামৃত্যু।

কেউ কেউ বলেন যে সোভিয়েত রাষ্ট্রে অগ্রগতির সঙ্গে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক মনোবৃত্তি ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য, এবং তার ফলে যুদ্ধান্তে সমস্ত দেশেই সাম্যবাদী বা অন্ততপক্ষে প্রগতিশীল রাষ্ট্রের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। তাঁরা আরও বলেন যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিজয়ের সম্ভাবনা স্পষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানি এবং অধিকৃত ইউরোপে সাম্যবাদী বিপ্লবের সম্ভাবনাও দেখা দেবে। যদি জার্মানিতে সোভিয়েত রাষ্ট্র স্থাপিত হয়, তার ফলে ইউরোপের সর্বত্র সাম্যবাদের জয় অবশ্যম্ভাবী, এবং বিলেত ও আমেরিকাতেও সাম্যবাদী বিপ্লব সম্ভব হয়ে উঠবে। সে সময়ে যদি এ দুটি দেশের ধনতান্ত্রিক নেতৃত্ব এরকম রূপান্তরে বাধা দিতে চেষ্টা করে, তবে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য — জাগ্রত জনমতের সামনে প্রতিক্রিয়াশীল পুরাতন নেতৃত্ব বন্যাস্রোতে তৃণখণ্ডের মতন ভেসে যাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁরা বলেন যে বিলেতেও ধনতান্ত্রিকদের মনোনীত চেম্বারলেনকে সরে দাঁড়াতে হল — তাঁর স্থলে যুদ্ধকালীন নেতা হিসাবে চার্চিলের আবির্ভাব বিপ্লবী জনমতের সার্থকতার সাক্ষী।

এ ধরনের যুক্তি আপাতদৃষ্টিতে ত্রুটিহীন মনে হয়, কিন্তু ধীর ভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে যুক্তিগুলির প্রত্যেকটিই ভ্রান্ত এবং অগ্রহণীয়। একথা সত্য যে যুদ্ধে সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রকৃত জয় হলে ইউরোপে সাম্যবাদের বিজয় প্রায় অনিবার্য হয়ে দাঁড়াত, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধে সোভিয়েতই প্রকৃত বিজয়ী হতে পারে কিনা, সে সম্বন্ধে আশঙ্কা ও সন্দেহ রয়েছে। বর্তমান যুদ্ধে জার্মান রণযন্ত্রের প্রধান আঘাত সোভিয়েত বাহিনীকেই সহ্য করতে হয়েছে, এবং এখনও সোভিয়েত শক্তিক্ষয়ের ভিত্তিতেই জার্মানির পরাজয় পরিকল্পনা। এ ব্যবস্থায় সোভিয়েত যে দুর্বল হয়ে পড়ছে, সে সম্বন্ধে কি কোনও সন্দেহ করা চলে? সে তুলনায়

আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের কি পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয়েছে? আমেরিকার তো কথাই নাই, সমস্ত বকম বাইরের আক্রমণমুক্ত ও বাধাবিহীন অবস্থায় আমেরিকা নিজের শক্তি বাড়িয়ে চলেছে, এবং দিন দিন আমেরিকার শক্তি বাড়ছে বই কমছে না। ইংল্যান্ডেও ১৯৪০-৪১ সাল পর্যন্ত যে আঘাত সহ্য করেছে, গত দু তিন বছরে ধীরে ধীরে তা কাটিয়ে উঠে নতুন ভাবে নিজের শক্তি গঠনে মন দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে এটাও বিবেচনার বিষয় যে ডানকার্কের পরে ইংরেজের প্রায় ৪০ লক্ষ নতুন সৈন্য শিক্ষিত ও সুসজ্জিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও খাস বিলেত রক্ষার জন্য মার্কিন সৈন্যের আমদানি কেন? বিভিন্ন রণক্ষেত্রে ভারতীয় এবং ঔপনিবেশিক সৈন্যের ব্যবহারই বেশি হয়েছে — এই ৪০।৪৫ লক্ষ সৈন্য আজ পর্যন্ত কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে বলে শোনা যায় নি। পশ্চিম থেকে ইউরোপ আক্রমণ এবং যুদ্ধান্ত ব্যবস্থার কথা স্মরণ রেখেই যে ইংরেজ নিজের শক্তি সংরক্ষণ করে চলেছে, এ বিষয়ে কি সন্দেহ করা চলে? সোভিয়েতের জনবল, ধনবল, শিল্পশক্তি, কৃষিসম্পদ সমস্তই যে ভাবে ধ্বংস হচ্ছে, তাতে সামরিক শক্তিতে যুদ্ধান্তে সোভিয়েত রাষ্ট্র মার্কিন বা ইংরেজের চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে, এ কথা প্রায় নিঃসন্দেহ এবং সে ক্ষেত্রে সোভিয়েতের ইচ্ছা বা পরিকল্পনা কতখানি সার্থক হবে, তা-ও সন্দেহের বিষয়। সে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে সোভিয়েত রাষ্ট্র ঘোষণা করেছে যে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সোভিয়েতের কোনও বক্তব্য থাকবে না এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অবসান সোভিয়েতের সেই ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছুক সিদ্ধান্তেরই বহিঃপ্রকাশ।

এ সমস্ত কথা স্বীকার করে নিয়েও অনেকে বলেন — বর্তমান সংগ্রাম যদি জনযুদ্ধ না-ও হয়, সোভিয়েত রাষ্ট্র যদি পৃথিবীর নির্যাতিত জনগণের মুক্তির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা না-ও করে থাকে, তবু বর্তমান যুদ্ধের ফলে সোভিয়েতের জয়ে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রগতিশীল শক্তির বিজয় অনিবার্য। যুদ্ধান্তের শান্তি সম্মেলনে বিজয়ী সোভিয়েত রাষ্ট্র ভবিষ্যৎ পৃথিবীর রূপ নির্ণয় করবে, এবং কাজেই সোভিয়েত বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মুক্তিও অনিবার্য।

এ যুক্তি বিচারে টেকে না। কারণ রাষ্ট্রশক্তিতে দুর্বল দেশ সবলতর দেশকে প্রভাবান্বিত করবে, এ স্বপ্ন সফল হওয়া দুরূহ। মিত্রশক্তির বিজয়ে যুদ্ধান্তে চার্চিল যে মর্যাদা ও সম্ভ্রমলাভ করবেন, কোনওদিন কোনও ইংরেজ রাজনৈতিকের ভাগ্যে বোধহয় তা জোটে নি। কাজেই ইংরেজ রাষ্ট্রশক্তির নির্দেশ যে যুদ্ধের শেষেও তাঁর হাতেই থাকবে, এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বিগত মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে লয়েড জর্জ নেতৃত্ব হারান, কিন্তু তার পূর্বেই সন্ধি এবং বর্তমান যুদ্ধের বীজ রোপণ করা হয়ে গিয়েছিল। তেমনি এবারও হয়তো সন্ধির কয়েক বৎসর পরে চার্চিল আসনচ্যুত হতে পারেন, কিন্তু তার পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী সন্ধি এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ভিত্তি তিনি যে স্থাপন করে যাবেন, তাও সমান নিঃসন্দেহ। দেশে অন্তর্বিপ্লবের ফলে তাঁর নেতৃত্ব কেউ কেড়ে নেবে, এটা স্বপ্নবিলাসীর কথা, কারণ বিজয়ী দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে না, এবং ঘটাবার যদি কোনও সম্ভাবনা আসেও, সে সম্ভাবনাকে কার্যে পরিণত করবার মতন নেতৃত্ব আমেরিকা বা ইংল্যান্ডে কোথায়? জনমতের পরিবর্তনে বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত নেতৃত্ব সে পরিস্থিতির সুযোগ না নিলে কোনও ফল হয় না। কেবলমাত্র নিজের শক্তিতে নেতৃত্ব যেমন সিদ্ধিলাভ করতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে

নেতৃত্বের অভাবে সুবর্ণ সুযোগও অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে পরিস্থিতির সুবিধা গ্রহণের শক্তি নেতৃত্বের অর্থ। যিনি অপেক্ষাকৃত অসুবিধার মধ্যেও নিজের লক্ষ্য সাধন করতে পারেন, তিনিই নেতৃত্বের অধিকারী। যিনি তা পারেন না, তাঁকেই আমরা অযোগ্য নেতা বলি। বিলাত বা আমেরিকার বেলায় কিন্তু এ সব যোগ্যতা ও অযোগ্যতার প্রশ্ন উঠেই না, চার্চিল অথবা রুজভেল্ট-বিরোধী বিপ্লবী নেতৃত্বের কোনও নিদর্শনই সে দেশে মেলে না। মহাযুদ্ধের বর্তমানে যে পরিস্থিতি, তাতে মিত্রপক্ষের পরাজয় অসম্ভব মনে হয় — অক্ষশক্তিও বোধ হয় অসমাপ্তি বা স্টেলমেটের বেশি কিছু আশা করতে পারে না — কিন্তু তাতেও মোটের উপর মিত্রপক্ষেরই সুবিধা থাকবে বেশি। এ অবস্থায় বিলাত বা আমেরিকায় যাঁরা যুদ্ধান্তে বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখেন, তাঁদের আশাবাদে বিস্মিত হওয়া চলে কিন্তু তাঁদের বুদ্ধি বা বিচারের প্রশংসা করা যায় না।

এ সঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে। একেই তো সোভিয়েতের ধনবল জনবল অস্ত্রবলের প্রতিদানই সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি বিজয়ের মূল্য — তার উপর একথাও নিঃসন্দেহ যে বিলেত এবং আমেরিকা কোনও অবস্থাতেই স্বেচ্ছায় ইউরোপে সর্বত্র এবং বিশেষ করে জার্মানিতে সোভিয়েতের প্রসার হতে দেবে না। সেজন্য প্রথমেই সোভিয়েতের কাছে থেকে চুক্তি আদায় হয়েছে যে ইউরোপের অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সোভিয়েতের হাত থাকবে না — এমন কি পূর্ব ইউরোপের যে সমস্ত দেশ সোভিয়েতের প্রতিবেশী, সে সমস্ত সোভিয়েত সীমান্তদেশের বেলায়ও মিত্রপক্ষ নিজের পরিকল্পনা তৈরি করেছে, এবং সে পরিকল্পনা যে সোভিয়েত-বিরোধী, সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিবাদেই তা প্রকাশ পেয়েছে। এ কথাও বোধ হয় নিঃসন্দেহ যে সোভিয়েতের সে রকম বিজয়ের সম্ভাবনা দেখলে ইউরোপে ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য আমেরিকা যা প্রয়োজন তা সবই করবে। মিত্রশক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও যে সে ক্ষেত্রে ইউরোপে সর্বত্র সোভিয়েত রাষ্ট্র গড়ে উঠবে, সে আশাও দুরাশা, কারণ অনুকূল পরিস্থিতি ভিন্ন জনমতের প্রকাশও অসম্ভব। চেম্বারলেনের পরিবর্তে চার্চিলের অভ্যুদয়ে যাঁরা জনমতের বিজয় দেখেন, তাঁরা ভুলে যান যে সে সময়ে বিলাতের ধনিক বণিকও জনগণের সঙ্গে এক সাথেই চেম্বারলেনকে সরাতে চেয়েছে বলেই চার্চিলের বিজয়। তা নইলে যতদিন বিলাতের ধনিক সম্প্রদায় চেম্বারলেনকে সমর্থন করেছে, ততদিন জনমতের বিক্ষোভ সত্ত্বেও তাঁর শক্তি হ্রাস হয় নি। মিউনিক চুক্তি, চেকোশ্লোভাকিয়ার অবসান, আবিসিনিয়ার যুদ্ধ—প্রভৃতি ঘটনায় বারবার জনমতের শোচনীয় অপারগতা দেখা গিয়েছে। একথা হয়তো নৈরাশ্যজনক এবং দুঃখের কথা, কিন্তু তাই বলে এ বাস্তব পরিস্থিতিকে অস্বীকার করলে রাজনৈতিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এ কথা সত্য যে বিগত মহাযুদ্ধের পরে বিভিন্ন দেশের রণক্লান্তি ও শ্রমিক-বিরোধিতার ফলেই মিত্রশক্তি সোভিয়েত রাষ্ট্র ধ্বংস করতে পারেনি, কিন্তু তার প্রধান কারণ যে সোভিয়েত রাষ্ট্র যেদিন স্থাপিত হল, সেদিনও জার্মানির রণশক্তি অটুট। কেবল অটুট নয়, তখনও জার্মানি বিজয়-স্বপ্ন দেখেছে। সে সময়ে প্রতিপক্ষ যে কোনও একটি শক্তির সত্বর বিজয় হলে সোভিয়েত রাষ্ট্র সংগঠনও শক্তিসঞ্চয়ের অবকাশ পেত না। বর্তমানের পরিস্থিতি

সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কারণ এ মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের মধ্যে সোভিয়েতের শক্তি ক্ষয় হয়েছে বেশি। তার চেয়েও বেশি ক্ষতি হয়েছে এই যে দেশরক্ষার প্রয়োজনে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সোভিয়েত যে সূত্রে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছে, তার ফলে পৃথিবীর সকল দেশেই সংগ্রামশীল শ্রমিক-শক্তি বিশ্বসমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শচ্যুত হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা অধিকারের ও সম্প্রদায়ের আহ্বান আজ প্রবল নয় — যে অধিকার রয়েছে তার সংরক্ষণের দাবিই আজ জনমানসকে আচ্ছন্ন করেছে। বাস্তব ঘটনার বিচারে এ ব্যবস্থার হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার ফলে বিশ্বময় শ্রমিক কৃষকরাজের সম্ভাবনা যে পিছিয়ে গিয়েছে, সে কথাও অস্বীকার করা চলে না।

এ আলোচনার ফলে এই কথাই পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয় যে বর্তমান যুদ্ধের ফলাফলেই পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বিশেষ কোনও সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধকালের মধ্যেই যদি পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হয়, বিজিত ও পশ্চাৎপদ জাতিগুলি স্বরাষ্ট্র স্থাপন করে পৃথিবীর ধনসম্পদ বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি না দেয়, তবে যুদ্ধান্তে পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব অনিবার্য। হয়তো সাম্রাজ্যবাদের আকৃতি বদলাবে, কিন্তু তার প্রকৃতি বদলাবে না, বরং সেই পরিস্থিতিতে আরও আশঙ্কার কারণ জমে উঠবে। একে তো যুদ্ধের ফলে সোভিয়েত রাষ্ট্রের দুর্বলতা অবশ্যম্ভাবী, এবং গত কুড়ি বৎসরের সমাজতান্ত্রিক সাধনায় কৃষিশিল্প যন্ত্রবিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারে ও মানবিক উৎকর্ষে যে উন্নতি লাভ করেছিল, তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় আবার নতুন করে সব কিছু গড়ে তুলতে হবে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ পুরাতন ভুল ভ্রান্তি শুধরে আবার নবজন্ম লাভ করবে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রয়োজন ভারতবর্ষ ও অন্যান্য পরাধীন দেশের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি।

স্বাধীন ভারতবর্ষ তাই কেবলমাত্র ভারতবাসীব জন্য নয়, বরং সমস্ত পৃথিবীর কৃষকশ্রমিকের মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয়। প্রাকৃতিক শক্তির উপর, বর্তমানে মানুষের যে দখল, তাতে পৃথিবীর সকল মানুষ সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। সেই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পথে একমাত্র বাধা ব্যক্তিগত ও জাতিগত লোভ ও শোষণমনোবৃত্তি, অর্থাৎ ব্যক্তিসম্পত্তি ও সাম্রাজ্যবাদ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং তার ফলে মানুষ সর্বত্র আপনার মুক্তি ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সম্ভাবনা খুঁজে পাবে। সেই স্বাধীনতা অর্জন তাই আজ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রত্যেক মানুষের প্রথম কর্তব্য। ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্থিতি, ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন — এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে বর্তমান পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপ নির্ণয় করতে হবে, কারণ সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতবর্ষই হবে ভবিষ্যৎ বিশ্বসমাজতন্ত্রের ভিত্তি।

☐ *চতুরঙ্গ*, আশ্বিন ১৩৫০

বিপ্লব, আবেগ ও প্রজ্ঞা

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"রাজর্ষি" লেখার আগে রবীন্দ্রনাথ রেলগাড়িতে শুয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন, শিশুকণ্ঠে শুনেছিলেন, "এত রক্ত কেন?" আমরা যখন "রাজর্ষি" পড়েছি, তখনও হাসি ও তাতা-র কথা ভুলতে পারি নি। আজও যেন কানে শোনা যায় শিশুর সরল মনের চকিত আর্তি — "এত রক্ত কেন?"

মানুষের এতদিনকার ইতিহাসও ঐ প্রশ্ন তুলে ধরেছে — যুগযুগান্তের অজস্র বিড়ম্বনা, শুধু রক্তপাত নয়, আরও কত দুঃখ কত ব্যথা জীবনকে জর্জর করে রেখেছে। আকাশচারী কল্পনায় মানুষ সান্ত্বনা খুঁজেছে;ধর্মবিশ্বাস আর অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্ববিধ ক্লেশহরণের প্রয়াস পেয়েছে, মোহাঞ্জন প্রলেপের অন্বেষণ করেছে, যেখানে উদ্দীপ্ত চেতনা সেখানে বুদ্ধের ন্যায় বলেছে, নিজের কাছে প্রদীপের মতো হও ("আত্ম-দীপো ভব")। জীবের দুঃখ দূর করার প্রেরণা ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে সিদ্ধার্থ রাজগৃহ ত্যাগ করেছিলেন, সাধনাবলে সম্বুদ্ধিও অর্জন করেছিলেন কিন্তু মূল প্রশ্নের সমাধান আজও হয় নি — ব্যক্তিবিশেষ জীবন্মুক্তির অনুভূতি কতটা পেয়েছেন তা ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে আসে না। তবে এটা ঠিক যে জীবনকে জয় করতে আজও মানুষ পারে নি। শিল্পের কল্পলোকে কিংবা মানসিকতার অন্য ক্ষেত্রে হয় তো তুরীয় মার্গে স্বল্প বিচরণ সম্ভব। কিন্তু জীবনের সামান্য অর্থাৎ সর্বগ্রাহ্য স্তরে তার সম্ভাবনা নেই। আজও তাই "অমাবস্যার কারা" কবির "ভুবন" "লুপ্ত" করে রেখেছে, "অমানুষতা"র অভিযান আজও সম্পূর্ণ ব্যাহত নয়। মানবসত্তা আজও শীর্ণ, সঙ্কীর্ণ, বহুল পরিমাণে ব্যর্থ।

এই দুঃসহ অবস্থিতি থেকে পরিত্রাণের সংগ্রাম ইতিহাসকে দিয়েছে তার পৌনঃপুনিক দীপ্তি। স্তর থেকে স্তরান্তরে সমাজের উত্তরণ তাই ঘটেছে, মানুষ চলেছে এগিয়ে, মন্ত্র নিয়েছে "চরৈবেতি, চরৈবেতি"। সতত সঞ্চরমাণ এই বিশ্বে জীবন হয়েছে জঙ্গম, নিয়ত গতিশীল, স্তব্ধতার পরিপন্থী। মাঝেমাঝে যখন বিশেষ এক যুগের ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে তখন এসেছে যুগান্তর, ঘটেছে বিপ্লব। জন্ম নিয়েছে নূতন সমাজ। এ বিপ্লব স্বয়ম্ভু নয়;'আপনাতে আপনি বিকশি' এর আবির্ভাব ঘটে না;স্বতঃস্ফূর্ত নয় এর উপস্থিতি। এ বিপ্লবকে ঘটায় মানুষ, এর সাধকতম শক্তি হল বহুজনের সংহত কর্মকাণ্ড, এর অভ্যুদয় হয় তখনই যখন সমষ্টির প্রয়োজনে ও প্রযত্নে জীবনের বহু রুদ্ধ দ্বার ভেঙে যায়, সাক্ষাৎ মেলে জ্যোতির্ময় নবযুগের। সহজে এ ব্যাপার অবশ্য ঘটে না। সাধনা বিনা যেমন সিদ্ধি সম্ভব নয়, মূল্য দান বিনা প্রাপ্তি যোগও তেমনই সম্ভব নয়। পূর্বতন সমাজব্যবস্থাকে অসহনীয় ভেবে এবং জেনে মানুষকে তাই বারবার লড়তে হয়েছে। লড়বার জন্যই ভাবতে হয়েছে। পথের সন্ধান করতে হয়েছে,

নানাবিধ কাজে নামতে হয়েছে। কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মোৎসর্গ, বহুজনের সংহতি সাধনে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে চিন্তা ও কর্ম ব্যাপারে নেতৃত্ব অবশ্যই এসেছে। কিন্তু ইতিহাসের নায়ক ব্যক্তি নয়। নায়ক হল জনতা। রথের রশি জনতার হাতে না থাকলে ইতিহাসের চাকা নড়তে পারেনি; অচলায়তনকে সচল করতে পেরেছে মানুষের সমবেত, সংগঠিত সুসংহত শক্তি। এই শক্তির পরিমাণ ও গুণ বিস্তার ও চরিত্র স্বভাবতই বিপ্লবকে চিহ্নিত করে, জায়মান সমাজের গতিপ্রকৃতিকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। ইতিহাস তাই চলেছে পতনঅভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায়। তাই যুগসন্ধিক্ষণে একান্ত প্রয়োজন প্রখর ও গভীর সমাজচেতনা, প্রয়োজন নবকালের পদধ্বনি শুনতে পাবার ক্ষমতা, প্রয়োজন বাস্তববোধ, প্রয়োজন প্রকৃত সামাজিক সদিচ্ছা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার প্রতি অনুরাগ। কোনো বিপ্লবই অবশ্য চূড়ান্ত নয়; ইতিহাসে পূর্ণচ্ছেদ ঘটলে তো পূর্ণচন্দ্র স্তব্ধ হয়ে থাকবার মতোই বিপর্যয় ও বিলুপ্তি। তবে বিপ্লবের আপেক্ষিক যুগানুগ সার্থকতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে উপরোক্ত শর্ত পূরণের উপর।

বিপ্লবের মূল্য অবশ্য দিতেই হয় — মানুষ চা'ক্ বা না চা'ক ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ের উত্তরণের মূল্য দিতে হয়েছে। একেবারে আদিম যুগে প্রাণ রাখতেই মানুষ প্রাণান্ত হত, জীবনধারণের পক্ষে মাত্র ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাবার মতো উৎপাদনক্ষমতা তার ছিল বলে সমাজে শান্তি না থাকুক, একটা স্থাণু ভাব ছিল। কিন্তু কালের গতি এবং দৈনন্দিন কাজের অভিজ্ঞতার ফলে ঐ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল, কিঞ্চিৎ হলেও উদ্বৃত্ত কিছু উৎপন্ন হতে লাগল, উদ্ভব হল শ্রেণীবিভক্তির, সমাজের উদ্বৃত্ত সম্পত্তি স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির হস্তগত হতে লাগল। ক্রমশ দেখা গেল জাদুকর আর পুরোহিত আর গণক আর সপারিষদ রাজা এসে হাজির হচ্ছে, মানুষে মানুষে তারতম্য সমাজের রীতিনীতি নির্ধারণ করছে, শ্রেণীবৈষম্য প্রকট হচ্ছে, মুষ্টিমেয় সমাজপতির শাসন ও শোষণের পত্তন হচ্ছে। আদিম মানুষের ইতিবৃত্তকে স্বর্ণযুগের কাহিনি বলে বহু বর্ণনা আছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাসের অস্পষ্ট প্রত্যুষেই জীবনের যন্ত্রণা মানুষকে ভোগ করতে হয়েছে। "লেভায়াথান্"-প্রণেতা হব্‌স-এর রচনায় আছে যে মানুষের জীবন তখন ছিল "একক, শ্রীহীন, পশুতুল্য এবং সংক্ষিপ্ত" ("Solitary, nasty, brutish and short")। একেবারে আদিযুগে শ্রেণীভেদ ছিল না কিন্তু জীবন ছিল দুঃসাধ্য; কবিকল্পনায় তৎকালীন সারল্য মোহনীয় প্রতিভাত হওয়া সত্ত্বেও এ-কথা ভুললে চলে না। তারপর বহুবর্ষব্যাপী পরিবর্তনের ফলে এল শ্রেণীশাসন — যার হেরফের দেখা গেছে গোলামি ব্যবস্থায়, ভূমিদাসপ্রথায়, সামন্ততন্ত্রে, ধনবাদী কর্তৃত্বে। যুগ যুগ ধরে মানুষের ইতিহাসেরই অঙ্গীভূত এই ধারাকে পাল্‌টে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথায় সমাজদেহের পাঁজর থেকে লোভ নামক মৃত্যুশেলকে উৎপাটিত করে, নূতন শ্রেণীবিহীন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নভেম্বর বিপ্লব (১৯১৭) থেকে দুনিয়া জুড়ে চলেছে। এ কাজ সহজ নয়। সস্তায় কিস্তি মাৎ হয় না, চালাকি দ্বারা মহৎ কাজ সম্ভব নয় — সুতরাং আশ্চর্য হবার কথা নয় যে এখনও সকল অন্ধকারের অবসান হয় নি, সকল বাধা অপসৃত হয় নি। কিন্তু এ কাজের মূলগত গরিমাই আজ পৃথিবীর ইতিহাসকে ভাস্বর করে রেখেছে — "নতশির মূক সবে ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী"। এ ছবি আজ সত্য নয়,

দেশে দেশে বহু বর্ণ বহু জাতি বহু ধারার মানুষ আজ জেগেছে। নবজীবনে উত্তরণের জন্য মূল্য দিতে পরাঙ্‌মুখ তারা নয়, ইতিহাসের নায়ক আজ তারা।

মার্ক্সীয় বিচার বলে যে প্রাচীন সমাজদেহের অভ্যন্তরেই নূতন সমাজ জন্মের জন্য অপেক্ষা করছে, সমাজব্যবস্থারই অন্তর্ভূত বহু বৈপরীত্য পরিপক্ব হয়ে ওঠার ফলে নবজাতকের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব থেকে বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করে এবং সংগঠিত সংহতি শক্তি ব্যবহার করে সমাজের অনিবার্য নবজন্মকে মানুষ যদি অভ্যর্থনা করতে পারে, তাহলে জন্মকালীন যে অকাট্য কষ্ট ও ক্লেদ তার অনেকাংশ নিবারিত হওয়া সম্ভব। চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োগে প্রগতির ফলে যেমন বিনা যন্ত্রণায় গর্ভধারিণীর দেহ থেকে প্রসবের ব্যবস্থার কথা শোনা যায়, তেমনই বহুজনের সমাজচেতনার প্রকৃত উদ্রেক ঘটলে পূর্বতন বিপ্লবের তুলনায় রক্তক্ষয় এবং অন্যান্য মূল্য কিছু কম হওয়ার সম্ভাবনা। এ কথা মনে রেখেই স্বকীয় সরস ভঙ্গিতে বার্ণার্ড শ প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে এক ভাষণে বলেন: "বিপ্লবের জন্য আমি অধীর। কাল যদি বিপ্লব হয় তো আমি আহ্লাদে আটখানা হব। তবে গড়ের হিসাবে সাধারণ মানুষের মতো আমিও কাপুরুষ। তাই চাই আপনারা যথাসম্ভব ভদ্রভাবে বিপ্লব ঘটিয়ে দিন!" এটাও মনে রাখতে হবে যে ইতিমধ্যে দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। রুশ বিপ্লব ইতিহাসের বনিয়াদকে নাড়া দিয়েছে, চীন বিপ্লব (১৯৪৯) প্রাচ্য ভূখণ্ডে নূতন জীবন ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে, ভিয়েৎনাম, কোরিয়া, কিউবা প্রভৃতি নূতন বৈভবের সূচনা করেছে। এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকায় জাতীয় মুক্তি এবং তার সার্থকতা সাধনের অবিরাম অভিযান চলেছে, সাম্রাজ্যবাদ পরাজয়ের ধাক্কায় ভোল্ বদলাতে বাধ্য হচ্ছে, তার কলাকৌশল ফন্দি-ফিকির ক্রমশ ব্যর্থ হতে থাকছে, সমাজবাদের শক্তিই যে তার অভ্যন্তরীণ অথচ সাময়িক বৈষম্য সত্ত্বেও ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করতে চলেছে তাই আজ ইতিহাসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এমন পরিস্থিতিতে বিপ্লবের রক্তমূল্য পূর্বাপেক্ষা স্বল্প হওয়ার প্রকৃত সম্ভাবনায় আস্থা রাখায় ভ্রান্তি নেই।

ভ্রান্তি ঘটে যদি মার্ক্সবাদ এ-বিষয়ে প্রখর সতর্কতার যে শিক্ষা দেয় তা ভুলে যাই। যদি ভাবি যে ভদ্র, শিষ্ট, শান্ত, মন্থর গতিতে এগিয়ে যাওয়া চলে, যদি ভাবি ভোট কিংবা অনুরূপ উপায়ে অধিকাংশের অভিমত মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাটে সংগ্রহ করে বিপ্লবের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো যায়, যদি শ্রেণীশত্রুর শক্তি ও স্বার্থসাধনে অপরিসীম ক্রূরতা অবলম্বনের সঙ্কল্প সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ি। বামপন্থার নামে অকারণ, অশোভন এবং অসার্থক হঠকারিতার আতিশয্য লক্ষ্য করে তাকে লেনিনের অনুসরণে "শৈশবের ব্যারাম" অভিহিত করা অবশ্যই ভুল নয়। কিন্তু ভ্রান্তি ঘটে যদি বিস্মৃত হই মার্কসীয় নীতির শিক্ষা যে, বিপ্লবের সময় যখন নিকট তখন বিপ্লব থেকে পরাঙ্‌মুখ থাকা হল সময় হওয়ার পূর্বেই বৈপ্লবিক আতিশয্যে মত্ত হওয়ার চেয়ে বড়ো অপরাধ। বিপ্লব পরাঙ্‌মুখিতার উদাহরণ মার্ক্স তাঁর জীবদ্দশাতেই দেখে বলেছিলেন তাদের সম্বন্ধে: "বীজ পুঁতেছিলাম দানবের, আর ফসল তুলছি পতঙ্গের।" সমাজে আজ যারা মালিক তারা বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী ছাড়তে রাজি নয়। জমির লড়াইয়ে এই মুহূর্তেই তো তার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত মিলছে। ভালোমানুষের মতো হার মানবে না তারা, এবং তাই সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়ত প্রয়োজন। যুগের হাওয়া শুভবুদ্ধি মানুষের পক্ষে

বলে সংগ্রামের তীব্রতা হ্রাস করতে পারা নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু সংগ্রাম এড়িয়ে যেতে পারব ভাবা বাতুলতা।

এজন্যই আজ যুবমনের মধ্যে কিছুটা বেপরোয়া কায়দায় প্রাণ দেওয়া নেওয়ার জন্য তৈরি থাকার মনোভাবকে তাচ্ছিল্য করা অন্যায়। ভীরু অপবাদে আহত বোধ করে বাঙালি তরুণ একদা যেমন বোমা পিস্তল হাতে নিয়ে অকুতোভয় যাত্রা শুরু করেছিল, তেমনই মান্ধাতাগন্ধী এই দেশে মানুষের দুর্ভোগ কাটছে না অথচ বিপ্লব ব্যাপারীদের মধ্যেই বিবাদ বিভেদ এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বিপ্লব বিমুখিতা আর নির্বাচনী রাজনীতির সুরক্ষিত পথে বিচরণপ্রবণতা দেখে সেই তরুণদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলে আশ্চর্য হবার কথা আছে কি? আর যদি সত্যই পরিস্থিতি বিশ্লেষণে ভরসা রাখি তো এ ঘটনায় অতিরিক্ত বিচলিত হওয়ারও কোনো হেতু থাকে কি?

অস্বীকার করা চলে না যে আমাদের বর্তমান রাজনীতিতে শুধু তত্ত্বের স্পর্শরহিত উষরতা আসে নি। সঙ্গে সঙ্গে যেন এসেছে একপ্রকার ক্লীবতা, যার বিপক্ষে অস্ত্রধারণের প্রয়োজন সজীব মন আজ বেশি অনুভব করছে। মহাত্মা কবিরের সাধনা ছিল 'বিনা খড়্গের সংগ্রাম' কিন্তু সকলে তো মানসিকতার ঐ স্তরে অবস্থান করে না। দেশের চারদিকে তাকিয়ে চেতন অবচেতন মনে অর্জুনকে সম্বোধন করে কৃষ্ণের উক্তি স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক; "ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ"। বিপ্লবী বাক্য ব্যবহারে পারঙ্গম হলেও বিপ্লবী কর্ম বিনা সবই ব্যর্থ। যেমন "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ"। তেমনই বিপ্লব তো কয়েকটা ধ্বনির কল্যাণে আসবে না। বিপ্লবের জয় আপনা থেকে আসবে না। সংগ্রামী মানুষকে একত্র হয়ে এগিয়ে গিয়ে তাকে হাতে ধরে টেনে আনতে হবে। রেশমের দস্তানা পরে এ লড়াই নয়, গোলাপজল ছড়িয়ে এ যুদ্ধ নয়। তাই উচ্চৈঃস্বরে অনেকে আজ বলছেন, রক্ত দেখলে যারা মূর্ছা যায়, বিশেষত নিজের গায়ের রক্ত, তারা অন্দর মহলে চলে যাক।

অতি বিপ্লবীদের বিভ্রান্তি যাই হোক না কেন, তাদের সমালোচনায় মুখর হয়ে সাম্রাজ্যবাদী এবং তার অনুচরদের পাশবিকতার সম্বন্ধে গা-সওয়া ভাব দেখানো একটা বড়ো দরের অপরাধ। সর্ব দেশে, বিশেষত আফ্রিকার মতো ভূভাগে, সাম্রাজ্যবাদের কীর্তিকলাপ দেখে ফরাসি মনীষী সার্ত্র্ (Sartre) কিছুকাল আগে বলেন যে "অপ্রত্যাশিত এক দৃশ্য চোখের সামনে খুলে গিয়েছে যা হল পাশ্চাত্য মানবিকতার আবরণমুক্ত নগ্নতার দৃশ্য।" ফ্রানৎস্ ফান-র মতো মহাজন বলেছেন, শুধু হিংসার পথকে নিন্দা করলে তো চলবে না, এতকালের জমানো অন্যায়ের প্রতিকারে অস্ত্রধারণ একান্ত সঙ্গত, নইলে মানুষের মুক্তি আসবে, নবজন্ম ঘটবে কেমন করে? নজরুলের গানে "মরণ ভীত মানুষ-মেষের ভীতি" "হরণ" করার ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো মানুষের অভাব হলে তো সমাজ পঙ্গু বিকল, ব্যর্থ। "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন", এমন বোধ ব্যাপক না হলে কি বলা যায়, দিন আগত ঐ? মৃত্যু যদি না ঘটে তো পুনর্জন্ম হবে কোথা থেকে?

"দ্বিজেন্দ্র দীপালি" গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় শ্রীদিলীপ কুমার রায় তাঁর পিতৃদেবের "আমার দেশ" গানটির রচনা সম্বন্ধে লিখেছেন যে সাবধানী বন্ধুদের পরামর্শে (এবং রাজপুরুষ হিসাবে কবিকে রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কার কথা তোলার ফলে) "আমরা ঘুচাব মা তোর

কালিমা, হৃদয়রক্ত করিয়া শেষ" পংক্তিটি বদলে বসাতে হয়, "আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহি তো মেষ"। এতে কবির মনে বেদনার অন্ত ছিল না, কিন্তু তৎকালীন অবস্থায় তিনি ছিলেন নিরুপায়। দেশে যারা নূতন প্রভাত আনতে চায় "হৃদয় রক্ত শেষ" করার প্রতিজ্ঞা না নিয়ে তো উপায়ান্তর নেই।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন — এ হল এ দেশের বহুদিনের কথা। কিন্তু বিপ্লবের যে মন্ত্র এনেছে মার্কস্‌বাদ, তাতে আবেগের আতিশয্যে লক্ষ্যভ্রংশ সম্বন্ধে অবহিতি একটা প্রধান কথা। প্রচুর সদ্বুদ্ধি সত্ত্বেও উচ্ছ্বাসপ্রবণতা প্রায়ই বিপ্লবের উদ্দেশ্য এবং অগ্রগতিকে বিপন্ন করার কারণ হয়। মার্কস্‌-এর জীবৎকালেই নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তারা এই আতিশয্যকে ব্যবহার করতে গিয়ে বহু অনর্থের সৃষ্টি করেছিলেন। বিশ শতকের আদিতে ফরাসি চিন্তানায়ক Sorel সমাজবাদী ঐক্যে কথঞ্চিৎ ফাটল ঘটিয়েছিলেন;তাঁর প্রচারিত তত্ত্বে হিংসাকে একটা বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছিল — হিংসাই বুঝি জীবনের মলিনতা দূর করতে পারে, জগতে নবজীবন সঞ্চার করতে পারে, প্রাক্তন দাস ও প্রভু উভয়কেই প্রকৃত মনুষ্যে রূপান্তর করার শক্তি রাখে। বৈপ্লবিক কর্মের বাস্তব পরীক্ষায় কিন্তু এ ধরনের চিত্তবৃত্তি যে বিপদ এবং ব্যর্থতা টেনে আনে তা দেখা গেছে। সেজন্যই বিশেষভাবে কর্তব্য সমসাময়িক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং গভীর পর্যালোচনার ভিত্তিতে কার্যক্রম নির্ধারণ। কাউট্‌স্কির মতো বিদ্বানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিপ্লব বিষয়ে অগাধ তাঁর জ্ঞান কিন্তু বিপ্লবের আসর যখন পাতার আয়োজন চলছে তখন তিনি বিমুখ। অপর দিকে সদাসতর্ক থাকতে হবে যে বিপ্লবের আবেগে আপ্লুত হয়ে স্থানকালপাত্র বিস্মৃত হয়ে চমকপ্রদ একটা কিছু করার মধ্যে সত্তাকে ডুবিয়ে রেখে চিন্তারহিত কর্মের পথে এগিয়ে যাওয়া মারাত্মক ভুল। বিপ্লবের প্রথম বা দ্বিতীয় অঙ্ক যখন চলছে, তখন পঞ্চম অঙ্কের কল্পনা করে তদনুযায়ী ব্যবহার হল বিপ্লবী চিন্তা, কর্ম ও আন্দোলনের একান্ত অপরিণতিরই পরিচায়ক। মার্কস্‌বাদের শিক্ষা এই উভয় বিপদ থেকে আন্দোলন ও সংগ্রামকে মুক্ত রাখার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এবং সেজন্যই দেখা যায় যে মার্কস্‌বাদকে মূলত অগ্রাহ্য করে কোথাও কোথাও যে অভ্যুত্থানের আভাস দেখা যায় তা কিছুকাল দপ্‌ করে জ্বলে উঠে নিভে যেতে থাকে। বিপ্লবের ফুল ফোটার আগেই ঝরে যায়।

ভারতবর্ষের জনতার মনে যেন আজ অনেকদিনের জমে থাকা "রাগের আঙুর" ("grapes of wrath") পেকে উঠছে। এ থেকে আমরা পাব সুরা না সুধা, তা নির্ভর করছে আমাদেরই উপর। আবেগবিধুর হলে আমাদের চলবে না, হতে হবে স্থিতপ্রজ্ঞ।

□ *পরিচয়,* শারদীয় ১৩৭৭

সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতা

বুদ্ধদেব বসু

মানুষের বয়স বছর বছর বেড়েই চলে, কিন্তু তার প্রথম ভাগটাকেই বলে বৃদ্ধি, শেষেরটাকে অবক্ষয়। আমি যে এখন দ্বিতীয় দশায় উপনীত, সেটা কিছুদিন ধরে পরিষ্কার টের পাওয়া যাচ্ছে। দৈহিক এবং মানসিক শক্তিগুলো এমনভাবে ক্ষীয়মাণ যে সেটাকে প্রায় ঠাট্টার মতো বোধ হয় — ঠিক রুচিসংগত ঠাট্টাও বলা যায় না। এই সেদিনও যে-কোনো আলোয় যে-কোনো বই অক্লেশে পড়ে গিয়েছি;আর এরই মধ্যে চোখ দুটো এমন অভদ্র হয়ে উঠল যে চশমা ছাড়া বিশ্বসাহিত্য অদৃশ্য, এবং চশমা সহ বিশ্বপ্রকৃতি ঝাপসা। স্মৃতিশক্তির কথা আর কী বলব — তার ব্যবহার পাগলামির প্রান্তে গিয়ে ঠেকছে। এক-এক সময় এমন দুর্দশাও হয় যে 'ন্যাকড়া' কথাটার বানানের জন্যেও অভিধান খুলি, আবার খুব ছোট্ট একটা মন খারাপ করা ঘটনা, যেটা ভুলে যাওয়াই দরকার, সেটা ঠিক আঁকড়ে থাকবে মগজে, অনেকগুলো ঘণ্টাকে কুরে কুরে ঝাঁঝরা করে না দেয়া পর্যন্ত বিদায় নেবে না। আর এই সঙ্গে জুটেছে একটা অদ্ভুত অনিশ্চয়তার অস্বস্তি; যাবো কি যাবো না, করবো কি করবো না — দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এই রকম সহস্র সংশয়ে শরাচ্ছন্ন হয়ে আছি। শোবার আগে দরজা বন্ধ করেছিলাম কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্য বার বার বিছানা ছেড়ে উঠে পড়া — এই দুঃখের অভিজ্ঞতাটি অনেকের জীবনেই ঘটে থাকবে, কিন্তু আমার স্নায়বিক বিপর্যয় এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর যে ডাকবাক্সে চিঠি ফেলার আগে দশবার করে ঠিকানা পড়ি — বাড়ির নম্বর, রাস্তার নাম, কিংবা শহরের নামটাতেই যে ভুল করে বসিনি তা স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না। আর, কিছু লিখতে বসলে তো কথাই নেই — তখনই এই সংশয়ের বীজাণুদল যেন সবচেয়ে অনুকূল আবহাওয়া পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে। কথাগুলো, ভাবনাগুলো এমন বেয়াড়া গোছের লুকোচুরি খেলা শুরু করে দেয়, আর ফাঁকে ফাঁকে এমন অসম্ভবের লোভ দেখায় যে আমার এই লেখার কাজটি ক্রমশই আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। কুড়ি বছর, দশ বছর, এমনকি হয়তো পাঁচ বছর আগেও যেটা তিন ঘণ্টায় তরতর করে লেখা হয়ে যেতো, এখন সেটুকু শেষ করে উঠতে আমাকে তিরিশ ঘণ্টাব্যাপী ক্রসকান্ট্রিরেস দৌড়োতে হয়; তার মধ্যে কতবার যে ঝোপে ঝাড়ে হোঁচট খেয়েছি, কতবার যে নালা ডোবায় চুবুনি, তার প্রমাণ থেকে যায় কাগজের গায়ে আগাছার মতো গজিয়ে-ওঠা কাটাকুটিতে, আর টেবিলের তলায় বেতের ঝুড়িটাতে আমার প্রয়াসের ছিন্নভিন্ন প্রত্যঙ্গগুলিতে।

অবশ্য এরকম ঘটনা আমার জীবনেই প্রথম ঘটল না, আর আমার পরবর্তী কারও

জীবনেই যে শেষ বার ঘটবে, এখন পর্যন্ত পশ্চিমি বিজ্ঞান সেরকম কোনো আশ্বাস দিচ্ছে না। অতএব যথাসম্ভব ভদ্রতা বাঁচিয়ে ব্যাপারটাকে মেনে নেবারই চেষ্টা করছি;ধরে নিচ্ছি ধর্মঘটের ধুম কেবলই বেড়ে চলবে, যতদিন না কারখানাতেই লাল বাতি জ্বলে। তা ছাড়া আর উপায়ই বা কী, যখন শত্রুকে তাড়াতে হলে নিজের ঘর পোড়াতে হয় তখন আর যুদ্ধ চলে না। প্রকৃতি যখন নিজের হাতে মারে, তখন নালিশ চলবে কার কাছে? জীবনের যে অনুচ্চারণীয় উল্টো পিঠটি জীবনের মধ্যেই বাসা বেঁধে থাকে, তার সঙ্গে আপোশের একটা খসড়াও তৈরি করেছিলাম মনে মনে, এমনকি সেটাকে পাকা দলিলে পরিণত করার কথাও ভাবিনি তা নয়। কিন্তু ঠিক তখনই বাধা পড়ল। সন্ধিপত্রের শর্তগুলো যখন একে একে ঠিক করছি, হঠাৎ অন্য একটা উপসর্গ লক্ষ করে চমকে উঠলাম। আমার সন্দেহ হল — সন্দেহ কেন, বিশ্বাস না করে উপায় রইল না — যে আমার চরিত্র ক্রমশ ভালো হচ্ছে।

জাঁক করে বলছি না কথাটা, নিরতিশয় দুঃখের সঙ্গেই বলছি। কেননা কথাটার মানে এরকম নয় যে আমি হঠাৎ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেছি;কথাটার মানে এই যে সৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অনাসৃষ্টির শক্তিও কমে আসছে। আমাদের মতো সাধারণ ধুলোকাদায় গড়া মানুষের মধ্যে ও-দুটো বস্তু জড়িয়ে মিশে একসঙ্গে বিরাজ করে, অনাসৃষ্টির ভাগে কমতি পড়লে বুঝতে হবে আমাদের সত্তায় মরচে পড়ে এলো। চরিত্র ভালো হচ্ছে — তার মানে, আমার সত্যিকার চরিত্র আমি খুইয়ে ফেলছি, নিজেকে আর বিশেষভাবে প্রকাশ করতে পারছি না, সামান্যের মধ্যে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছি। আগের চেয়ে সহিষ্ণু হয়েছি, মতবিরোধ ঘটলেই রেগে উঠি না, আমার ইচ্ছা কোথাও বাধা পেলে অভিশাপ দিই না বিশ্বজগৎকে, যেখানে আমার অন্তরাত্মা দশ মিনিটেই হাঁপিয়ে ওঠে, সে রকম স্থলেও ঘণ্টা দু-তিন লক্ষণীয় মুখমালিন্য প্রকাশ না করে বসে থাকতে পারি। অর্থাৎ, আমার ব্যক্তিত্বের ধারগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে আসছে; যেগুলোকে লোকে বলবে আমার দোষ আর আমি বলব আমার অস্তিত্বের অভিজ্ঞান, সেগুলো একে একে ত্যাগ করছে আমাকে;আস্তে আস্তে আমি নির্বিশেষ, নিঃস্বাদ লৌকিক ভালোমানুষির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি — মানে, তলিয়ে যাচ্ছি। এর চেয়ে আশঙ্কার কথা আমার কিছু জানা নেই। সময়ের অন্যান্য মার যদি বা হজম করে উঠতে পারি, এই অপমানটিকে সহ্য করা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না — অন্তত এখন পর্যন্ত না। নিজের জন্য উদ্বিগ্ন বোধ করছি, আমার কোনো কথায় বা ব্যবহারে উদ্দামতার কোনো লক্ষণ দেখার জন্য হাৎড়ে বেড়াচ্ছি চারদিকে, দেখতে না-পেয়ে বিরাট নৈরাশ্যে অভিভূত হয়ে পড়ছি। এইভাবে আমি যদি চলতে থাকি, তাহলে বুঝি কোনো এক অনিবার্য তারিখে খবরকাগজের সম্পাদকেরা আমাকে 'উত্তম বন্ধু, স্নেহশীল পিতা এবং আদর্শ স্বামী' বলে অভিহিত করবেন, এই কথা চিন্তা করে আমার মৃত্যুভয় বেড়ে যাচ্ছে।

মনের এই অবস্থা নিয়ে কলকাতা ছেড়ে দূরে আসতে হল। নতুন দেশ, কাউকে চিনি না, এবং অল্প সময়ের জন্য দায়ে পড়া কাজ চালানো গোছের বন্ধুতা স্থাপন করার ক্ষমতাও আমার নেই। যে কর্মসূত্রে আসতে হয়েছে তার দাবিও তেমন বেশি নয়, প্রায় সারা দিন নিজের পুঁজি ভাঙিয়েই চালাতে হবে। বাসা পেলাম নির্জন পল্লিতে, কিংবা কোনো পল্লিতেই নয়, শহর ছাড়িয়ে প্রান্তরের প্রান্তে, এমনতরই প্রতিবেশীবর্জিত যে 'কাল খুব বৃষ্টি হল' বা

'এখানে কি তালশাঁস পাওয়া যায়?' এই ধরনের বাক্যালাপেরও সম্ভাবনা নেই। যাকে বলে কথোপকথন, যেটা টোমাস মান্-এর মতে সভ্যতারই নামান্তর, সেটা সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গেল, বাক্‌যন্ত্রের মামুলিতম ব্যবহারেরও অবকাশ বেশি থাকল না। সম্প্রতি আমি এমন দিন একাধিক কাটিয়েছি যেদিন আমার ইংরেজিভাষী নিঃশব্দ পরিচারকটিকে দু-চার বার নির্দেশ অথবা ধন্যবাদ জানানো ছাড়া একটা কথাও বলতে হয় নি আমাকে। জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যের মধ্যে এ-ঘর ছেড়ে ও-ঘর, কিংবা ঘর ছেড়ে বারান্দা, কিংবা সন্ধের আগে সামনের ঘাসের জমিতে একটু পাইচারি। কোথাও যাই না, কেউ আসে না, বাইরে ঘাস, গাছ, আকাশ, আর ভিতরে আমার নিজের মন — এ ছাড়া কোনো সঙ্গী নেই। তবু দিনগুলি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে না, পানা-পড়া খালের মতো আটকে যাচ্ছে না মাঝে মাঝে, এমন সহজ, সাবলীল গতিতে ক্যালেন্ডারের এক পাতা থেকে আর এক পাতায় বয়ে চলেছে যে আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি। এ থেকে আমার নিজের বিষয়ে নতুন একটা আবিষ্কার করা গেল যাতে আমার মনে হচ্ছে যে বিলকুল সবই লোকসান হয় নি, এক ফোঁটা মুনাফাও কোথাও জমা হয়েছে হয়তো। সে আবিষ্কার এই যে আমার একা থাকার শক্তি আজকাল বেড়েছে;নিঃসঙ্গতাকে শুধু সহ্য করা নয়, উপভোগ করাও আমার পক্ষে আর অসাধ্য নেই।

যৌবনে এই শক্তি আমার ছিল না। মানুষের যত রকম অবস্থা আছে, তার মধ্যে নিঃসঙ্গ তাকেই তখন সবচেয়ে ভয় করতুম। বলা বহুল্য, শুধু সঙ্গীহীনতাকেই নিঃসঙ্গতা বলে না, মনকে নিবিষ্ট করার উপায়ের অভাবকেই বলে নিঃসঙ্গতা। অল্প বয়সে এই উপায়গুলো আমার কাছে খুব স্পষ্ট, স্পর্শসহ কয়েকটা বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। মানুষ, যতক্ষণ সে জেগে আছে, ততক্ষণ সক্রিয় থাকবে, এই আমার মত ছিল তখন। হয় কাজ করবে, নয় প্রিয়জনের সঙ্গসুখ ভোগ করবে, নয় বই পড়বে বা সিনেমা দেখবে, আর তা নয় তো স্থান থেকে স্থানান্তরে চলমান অবস্থায় সময় কাটবে তার। এর বাইরে আমি কিছু ভাবতে পারতাম না। হাতে কোনো কাজ নেই, বইও নেই, চুপচাপ একা বসে আছি — নিজের সম্বন্ধে এই বকম একটা ছবি আমার কল্পনার পরপারে ছিল। কোনো-কোনো মানুষ দেখেছি, যারা কিছু না করে একলা বসেবসে, অথবা শুয়েশুয়ে, সুখী হতে পারে;আমি তাদের করুণা করেছি, আবার ঈর্ষাও করেছি, কেননা ঐ সুখ বিধাতা আমাকে মঞ্জুর করেননি। হয়তো আমার মধ্যে উদ্যমের ছটফটানি কিছু প্রবল, তাই নিষ্ক্রিয়তাকে মানবসত্তার পরাভব বলে জ্ঞান করতুম, কিন্তু এ কথা আমি অল্প বয়সেই বুঝেছিলাম যে এর পিছনে আমার একলা থাকার অক্ষমতাটাই আসল কথা। তখন আমি মনে মনে এই রকমের একটা তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলুম যে মানুষের যদিও আত্মপ্রেমিক বলে বদনাম আছে, আসলে সে নিজেকেই ভালোবাসে সবচেয়ে কম, কেননা একান্তরূপে নিজের সঙ্গ তার অসহ্য। অন্তত আমার নিজের ব্যবহারে এই তত্ত্বের সমর্থন পাওয়া যেতো। ছাত্রজীবনে সকালে উঠেই কাজে আর আড্ডায় বোনা চঞ্চলতার যে পর্যায় আরম্ভ হত, রাত্তির বারোটা-একটায় শুতে গিয়েও তার অবসান হত না, একখানা বই হাতে নিয়ে মশারির ভিতর যাওয়া চাই, ঘুমিয়ে পড়ার সর্বশেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত বিষয়ান্তরে ন্যস্ত রাখা চাই মনকে। যখন রাত বেশি হলে কোনো এক সময়ে নেহাৎই আমাকে একা হতে হত, তখন এই কথাটা ভাবতে আমার ভালো লাগত যে ঘরে ফিরে

কোনো-না-কোনো বইয়ের সঙ্গে মিলন হবে;— কতদিন সকালে প্রথম চোখ মেলে শুয়ে-শুয়েই রাত্রে-পড়া বইটা আবার খুলেছি। পরবর্তী কালে এই অভ্যাসে উপকরণগত বৈচিত্র্য ঘটে থাকবে, কিন্তু মূল সুরের বদল হয় নি। দৈবাৎ যদি এমন কোনো সন্ধ্যা এসেছে — কালে ভদ্রে সেরকমও ঘটেছে কখনও — যখন বাড়িতে কোনো বন্ধুসমাগম হল না, আমি বোতলবঞ্চিত মদ্যপের মতো ছটফট করে ঘণ্টাগুলো কাটিয়েছি। একলা বসে কোনো নাটক অথবা সিনেমা দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল — অভিনয়ের স্বকীয় গৌরব যতই থাক না — এবং মনের মতো সঙ্গী যতক্ষণ না জুটেছে, ততক্ষণ দেশভ্রমণের কোনো পরিকল্পনা আমার মনে স্থান পায় নি। আমার সেই মন এখন থাকলে বর্তমান অবস্থার মধ্যে টিকতে পারতুম না। অতএব দুয়ের সঙ্গে দুই যোগ করে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় আমি অন্তত কিছু স্বাবলম্বী হতে পেরেছি;আমার জীবনের এঞ্জিনে সারাক্ষণ আর বাইরে থেকে ইস্টিম জোগাতে হয় না। এটা খানিকটা লাভ বইকি; কেননা মানুষের অবস্থার উপর সব সময় তার হাত থাকে না, সময়ের চক্রান্তে সঙ্গীদের আর আমার মধ্যে ভৌগোলিক বা মানসিক ব্যবধান দেখা দেয়, বই অথবা কাজ নামক উপকরণগুলোরও স্থিরতা নেই;— কিন্তু নিরন্তর নিজেকে নিয়েই ঘর করতে হয় মানুষকে, প্রয়োজনমতো অনন্যভাবে নিজেরই উপর নির্ভর করতে পারলে তার প্রাণের ভাণ্ডারে অপব্যয় ঘটে না। আমি যে আমার নিজের পক্ষে অনেকটা নির্ভরযোগ্য হয়েছি, এই একটি সুখবর এখানে এসে পাওয়া গেল।

কিন্তু এমন কথা বলতে চাই না যে এটা নিছক আমারই কৃতিত্ব, বা আমারই মনের ভিতরকার ঘটনা;আমি জানি সময়ের হাত আমাকে যেটুকু বদলে দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বল দিয়েছে এখানকার পরিবেশ। এই জায়গাটা যদি এক মহানগর হত, তাহলে, কপালগুণে মনোমতো বন্ধু না-জুটলে, আমি হয়তো তেমন আরাম পেতুম না, কেননা নিঃসঙ্গ আগন্তুকের পক্ষে পৃথিবীর নগরগুলো নিষ্ঠুর হতে পারে। আবার যদি কোনো গ্রামে এসে পড়তুম, কিংবা মফস্‌সলের ছোটো শহরে, যেখানে বাথরুম নেই, বিজলিবাতি নেই, টক আর ঝাল ছাড়া খাদ্য নেই, এমনকি হয়তো চা পর্যন্ত নেই, তাহলে — তাহলে আমার দশাটা কীরকম দাঁড়াত, তা কল্পনা করাও আমার পক্ষে কষ্টকর। জীবন থেকে কিছু ভালো আহরণ করতে হলে তার প্রথম শর্ত শারীরিক আরাম, কেননা শরীরের চাহিদাগুলোকে ভুলে থাকতে পারলে তবে আমাদের মনের বৃত্তি জেগে ওঠার অবকাশ পায়।

এখন আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা এই যে আমি যেগুলোকে সুলক্ষণ বলে গণ্য করি তার প্রায় সব কটাই এখানকার সঙ্গে মিলে গেছে। জনপদটিকে নগর বলা যায় না, অথচ গ্রাম কিংবা মফস্‌সল বললেও নিতান্ত ভুল হবে। শহরের যান্ত্রিক সুবিধে সবই পাওয়া গেছে, কিন্তু ভিড় নেই, কলরোল নেই, জনতার সমুদ্রের মধ্যে নিঃসঙ্গতাবোধের অবসাদ নেই। দৈহিক অর্থে প্রাণধারণের জন্য অনুকূল ব্যবস্থা সবই জুটেছে, আর সেই সঙ্গে আছে স্তব্ধতা, সৌম্যতা, অবসর। এই অবসর মানে কাজের অভাব নয়, যাকে বলে সময় হাতে থাকা তাও নয়, এর মানে পরিবেশের মধ্যে একটি সংগতি, যাতে মন তার নিজেকে ঠিক খুঁজে পায়, মেলাতে পারে আপন সুর বাইরের সঙ্গে, যখন কিছু না করাটাকেই সময়ের অপব্যয় বলে

মন হয় না, আর কাজ থেকেও উৎকণ্ঠার চাপ সরে যায়। যখন কাজের সঙ্গে বিশ্রাম মিলেমিশে থাকে, যখন তাড়াহুড়ো নেই সচলতা আছে, আন্দোলন আছে কিন্তু অস্থিরতা নেই, মনের সেই ভারসাম্যেরই নাম সত্যিকার অবসর। মহাপুরুষেরা এটাকে নিজেরই মধ্যে সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে এটা দৈবাধীন — আমরা হঠাৎ কোনো-কোনো শুভক্ষণে এর স্বাদ পাই, কখনও বা ভাগ্যের অযাচিত এবং অপ্রত্যাশিত উপহার স্বরূপ, কখনও বা স্থান কালের যোগাযোগের প্রভাবে। এই অচেনা দেশের অস্থায়ী আবাসে আমি যদি সেই অবসরের সুখ এক ফোঁটাও পান করে থাকি, সেটা আমি যোগ্যতার দ্বারা অর্জন করেছি বলে বিশ্বাস হয় না, তার জন্য আমার অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের কাছেই কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা উচিত।

অন্য কারো কেমন লাগত বলতে পারি না, কিন্তু এখানকার জীবনযাত্রার বিন্যাস আমার দেহ মনের প্রকৃতির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে বরণীয় হয়েছে। বন্ধুতার সান্নিধ্য যেমন নেই, তেমনি অপ্রিয় সংসর্গের দৌরাত্ম্য থেকেও বেঁচে গিয়েছি, সামাজিকতার পরিশ্রমেও হাঁপিয়ে উঠতে হচ্ছে না। চারিদিকে নির্জনতার মধ্যে আমার আনন্দের অনুভূতির জন্য আমন্ত্রণ আছে, অভ্যর্থনাও আছে। দৃশ্য ভালো, আবহাওয়াটি উপভোগ্য। গরম কম, হাওয়া শুকনো, বৃষ্টিও বিরল নয়। যে গ্রীষ্ম ঋতু আমার প্রিয়, এখানে তার মেজাজ কখনও সপ্তমে বা পঞ্চমেও চড়ে না বলে তার উষ্ণতাটুকু পুরোপুরি উপভোগ করা যাচ্ছে। উষ্ণতা না বলে স্নিগ্ধতাও বলা যায়, গ্রীষ্ম না বলে বসন্ত, বর্ষা বা হেমন্ত বললেই বা দোষ কী। কেননা বিধাতা এখানকার প্রকৃতিকে এমন করে গড়েছেন যে এর ঋতুচক্রে প্রতিতুলনার বিস্ময় যদিও নেই, তবু এক একটি দিনের মধ্যে সূক্ষ্মতর বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা সেতারের মীড়ের মতোই প্রচুর। রাত হলেই ঠাণ্ডা, বৃষ্টি হলেই সুখজনক স্বল্প শীত, আর ভোরবেলাটি ঈষৎ মেঘলা, ঈষৎ কনকনে, যেন পড়ি পড়ি শীত, বা উঁকিঝুঁকি ফাল্গুন। ভোর এখানে তলোয়ারের মতো লাফিয়ে ওঠে না দিগন্ত ছিঁড়ে, আবছা হয়ে জড়িয়ে থাকে আকাশে, এইমাত্র ছেড়ে-ওঠা স্বপ্নের স্মৃতির মতো। দিনের বেলায় চৈত্রমাস ছড়িয়ে সান্ধ্য ঝড়ে আষাঢ় নামল কোনোদিন, টালির ছাদের ফুটো বেয়ে বেয়ে ঘরের মেঝে পুকুর হয়ে গেল, আবার দু-দিন পরেই সকালবেলার চায়ের টেবিলে উত্তুরে হাওয়ার কাঁপন দিলে, বাংলাদেশের কার্তিক মাসের মতো। অথচ এর একটা ভাবও মেয়াদি নয়, পালা বদলে দেরি হয় না বেশিক্ষণ, তাই কখনও কখনও এমনও হয় যে একটা দিন রাত্রির পরিসরের মধ্যেই প্রায় ছয়টা ঋতুর আভাস দিয়ে যায়। সকালে চোখ মেলে দেখলুম কুয়াশা, মুড়ি দিয়ে নতুন করে শুয়ে থাকার আমেজ দিল, কিন্তু স্নান সেরে বেরিয়ে এসেই দেখি সুন্দর রোদে ঘর হেসে উঠেছে। দুপুরবেলাটা আতপ্ত, বিকেল নামলো শরতের মতো সোনালি, সন্ধের আগে মেঘ করে বৃষ্টি এলো ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটে, বর্ষার তানপুরো বাজল ঘরের ছাতে, গাছের পাতায়। আর ঋতুর এই প্রসাধনের বৈচিত্র্যকে ইন্দ্রিয় মনের গোচর করার জন্যে যেটুকু আয়োজন দরকার, তাতেও কোনো কার্পণ্য ঘটে নি; চারদিকের অবাধ মাঠ কৃষ্ণচূড়ায় উজ্জ্বল হয়ে আছে, পাশাপাশি দুটো বেঁটে গাছ তাদের বসন্তদিন বিলিয়ে দিচ্ছে তীব্র লাল অজস্র মঞ্জরীতে, দক্ষিণ দিকে সবুজ পাহাড়ের ধাপে ধাপে সারাদিন চলছে আলোছায়ার খেলা, আর পশ্চিমে লম্বা একটা

ঝিল সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিটিকে একটুখানি ধরে রাখার জন্য বুক পেতে পড়ে আছে। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই মাঠ, আর মাঠের শেষে গাছপালার রেখা; যেকোনো জানলা দিয়ে তাকাই, বড়োবড়ো চওড়া আকাশ চোখে পড়ে। আর এই সব উপকরণগুলো শুধু বিচ্ছিন্নভাবে তালিকাভুক্ত হয়ে নেই, একটা সামঞ্জস্য রচনা করেছে — আর সামঞ্জস্য মানেই সম্পূর্ণতা, তৃপ্তি। অতএব কাছাকাছি যেসব বিখ্যাত স্থান দেখব বলে মনস্থ করে বেরিয়েছিলুম তার একটিতেও যাওয়া হচ্ছে না আমার, স্থানীয় আকর্ষণও অনেকগুলো বাদ পড়ল, বসে আছি একলা চুপচাপ এই জীবন্ত নির্জনতার মধ্যে। দুপুরবেলা কোকিল ডাকে, রাত্রে আমার ঘুমের আগে কঁকিয়ে ওঠে মানুষের মতো গলার আওয়াজে কোন পাখি জানি না, বৃষ্টিপড়া অন্ধকারের ফাঁকে-ফাঁকে ইলেকট্রিকের আলোর তলায় কৃষ্ণচূড়া অদ্ভুত হয়ে দুলে ওঠে। আমি সারাদিন ভরে কখনও একটু লিখছি, কখনও একটু পড়ছি, কিন্তু বেশির ভাগ সময় কিছুই করছি না — শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছি। দেখতেই ভালো লাগছে।

সত্যি বলতে, এই দেখা ব্যাপারটাও আমার জীবনে নতুন। যৌবনে বিশ্বপ্রকৃতির যেটুকু দেখেছিলাম, সবই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে চোখ তুলে, লেখার ফাঁকে ফাঁকে চোখ তুলে, নয়তো পথ চলতে চলতে আকস্মিকভাবে। সে দেখায় তীব্রতা ছিল সন্দেহ নেই — কেননা হঠাৎ দেখার অভিঘাতই প্রবল — কিন্তু পূর্ণতা ছিল না, অর্থাৎ দেখার মধ্যেই নিবিষ্ট হতে পারি নি। ট্রেনে স্টিমারে বই ছিল আমার পক্ষে অপরিহার্য, আস্ত-আস্ত নভেল থার্ড ক্লাশের ভিড়ের মধ্যে শোষণ করে নিয়েছি। অপরিহার্য এখনও আছে, অন্তত দু-খানা বই হাতে না নিয়ে রেলগাড়িতে আসীন হতে ভরসা পাই না, কিন্তু সেগুলো অনেক সময় পাশেই পড়ে থাকে, কিংবা শুধু মাঝে মাঝে খোলা হয়। চলতি পথে আমি আজকাল দেখছি বেশি পড়ছি কম। অবশ্য ট্রেনের জানলায় শিক বসিয়ে দেখার সুখ অর্ধেক করে দিয়েছে, উল্লেখযোগ্য দৃশ্যও কিছু সব সময় পথে পড়ে না, তবু অনেক সময় সাধারণটাকেই দ্রষ্টব্য বলে বোধ হয়, এবার ন্যূনতম বইয়ের সাহায্যে, দেখে দেখেই তিন দিনের পথ কেটে গেল — আর এখানে আসার পর থেকে আমার মনে হচ্ছে যে এই দেখাটাও একটা কাজ, তার নিজেরই জন্য মূল্যবান। আমি নতুন এক রকমের আনন্দ নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছি : আকাশে রঙের বদল, মাটিতে আলো-ছায়ার বদল, নীল শাড়িপরা পাতা-কুড়ুনি দুপুর রোদে বেতের ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে চলে গেল, বিকেলবেলা কী সুখে ঐ কালো কুকুরটা ঘাসের উপর গড়াতে শুরু করে দিলে, সূর্যাস্তের আগে পাহাড়ের গায়ে অর্ধেক আলো হয়ে উঠল, আর অর্ধেকে পড়ল গাঢ় রঙের বেগনি ছায়া। এসব দেখে শুধু যে আমার চোখ দুটো সুখী হচ্ছে তা নয়, আমার মনের মধ্যেও অস্পষ্ট একটা বেগ জেগে উঠেছে। অর্থাৎ, এটা শুধু দেখা নয়, দেখার সঙ্গে ভাবাও আছে। ভাবা মানে নির্দিষ্ট প্রণালীতে চিন্তা করছি তা বলা যায় না, আবার এটাকে দিবাস্বপ্ন বললেও অন্যায় হবে। এটা শুধু মনের একটা উৎসুক ভাব, একটা সজীবতার বোধ, যখন মনে হয় বিশ্বজগতে যা কিছু আছে তার কিছুই অনর্থক নয়, আর তার মধ্যে আমার অস্তিত্বটাও মূল্যবান, আর সেই অস্তিত্বের কোনোরকম জানান দেবার জন্য মন কিছু বলে উঠতে চায়, যদিও সব সময় বলতে পারে না। তার মানে — এর মধ্যে একটা প্রতীক্ষাও আছে; কিছু ঘটবে, কেউ আসবে, কেউ আসছে, এই রকমের একটা ইঙ্গিত

চরাচরের ভিতর থেকে নিশ্বসিত হচ্ছে যেন : আমি নিঃশব্দে সেটাকে অনুভব করছি, গ্রহণ করছি, প্রস্তুত হয়ে উঠছি কিসের জন্য জানি না। 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ' : এই কথাটার অর্থ এতদিনে বুঝতে পারলাম এইটুকুতেই আমার এখানকার নিঃসঙ্গবাস সার্থক হল।

অবশ্য যেটাকে নিঃসঙ্গতা বলছি আসলে সেটা নিঃসঙ্গতাই নয়, কেননা আমার প্রিয়জনের সঙ্গে এবং আপন কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে, দূরে বসেও অনবরত সংশ্লিষ্ট হয়ে আছি — চিঠিপত্রের মানসিক বিনিময়ের সূত্রে। এই সংযোগ থেকে যে বঞ্চিত হয়, যাকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে মানবসমাজের সকল সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল, সেই নিঃসঙ্গ বন্দী যদি পাগল হয়ে না যায় তো অনেক ভাগ্য বলতে হবে। আর এই সংস্রবে যে আর আকাঙ্ক্ষাও করে না, সে হয় পাগল হয়ে গেছে, নয়তো তিনি তথাগত হবেন। সংসারে শুধু উন্মাদেরাই সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ হয়ে বেঁচে থাকে, তার অলীক জগতের অংশীদার কেউ নেই বলেই সে পাগল, আর শুধু মহর্ষিরাই মহাশূন্য সহ্য করতে পারেন। আমরা সাধারণ অর্থে যাকে নিঃসঙ্গতা বলে থাকি, আমাদের পক্ষে তার তুল্য অভিশাপ কিছু নেই, আবার কোনো-কোনো অবস্থায় তার আনন্দেরও তুলনা হয় না।

সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা : বোদলেয়ার বলেছেন ও-দুটো একই কথা — অন্তত কবির পক্ষে, কেননা কবিরা তাঁদের নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গময় করে তুলতে পারেন, আবার মহানগরীর জনতার মধ্যে নির্জন হয়ে চলাফেরা করার কৌশলও তাঁদের জানা আছে। বোদলেয়ারের একথা যে সত্য তার প্রমাণ আমি আগেই পেয়েছিলাম, কিন্তু কবিকর্মের এই ভূমিকার মধ্যে আমি এখন আর একটা কথা যোগ করতে চাই : সেটা নিষ্ক্রিয়তা। বাংলা 'নিষ্ক্রিয়' কথাটা এখানে অসংগত হল, ওর মধ্যে মস্ত একটা 'না' ছাড়া কিছু নেই, কিন্তু ইংরেজিতে যাকে 'প্যাসিভ' বলে তার মধ্যে কিছু সদর্থকতাও আছে : যে শক্তির নিজের ক্রিয়া নেই কিন্তু অন্যের ক্রিয়া গ্রহণের জন্য উন্মুখ, ঐ বিশেষণ তারও প্রতি প্রযোজ্য। এবং এই অবস্থাটা কবিদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কেননা তাঁরা সৃষ্টিতত্ত্বে নারীর অংশ নিয়ে থাকেন, ভাব সত্তাকে গ্রহণ করেন, ধারণ করেন, জন্ম দেন — তার বীজ কোথা থেকে পড়ে কেউ জানে না। এইজন্য মেয়েদের পক্ষে যেমন অন্তঃপুরের আড়াল, কবিদের পক্ষেও নিঃসঙ্গতার একটা আব্রু দরকার — দৃশ্যত সেটা সজনেই হোক বা বিজনেই হোক। আমি অনেকদিন আমার অন্তঃপুরের বাইরে পড়ে ছিলাম, কিন্তু এখানকার প্রসন্ন ঋতুর নির্জনতার মধ্যে আমার ভিতরকার নারী প্রকৃতি জেগে উঠেছে, আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমি অপেক্ষা করে আছি, আমার অন্তর প্রসারিত হয়ে নিজেকে মেলে দিচ্ছে, আকাঙ্ক্ষায়, মনে হচ্ছে আমার এই চুপ করে চেয়ে থাকার অর্থ আর কিছু নয়, শুধু একটা 'এসো এসো' ডাক, একটা অবিরল আহ্বান। কখনও আসবে কিনা জানি না, কিন্তু আমি যে অপেক্ষা করেছিলাম, এইটুকুতেই আমার পরিচয় লেখা হয়ে থাক — যতদিন না সব লেখা ধুলোয় মিশে যায়।

☐ *সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৬৩

বাংলা সাহিত্যে প্রগতি

বিষ্ণু দে

একটা কারণ অবশ্যই মনের আবহাওয়ায় কয়েক বছর যে প্রত্যক্ষের দিকে বৈজ্ঞানিকমন্য ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টির প্রসার। তাছাড়া লেখকেরা যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন, তার থেকেও লেখার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বলা যেতে পারে যে আমাদের সাহিত্যের শৈশব অতিক্রান্ত এবং সাহিত্যিকরা আজ বিষয় ও কলাকৌশল, ভাব ও রূপের অভিন্নতায় সন্দেহহীন। কলাকৌশল বা টেক্‌নিকের প্রগতি নির্ভর করে মানসের ব্যাপ্তি বা রূপান্তরে। আর এই মনের মানচিত্রে সৃষ্টির আবেগ থাকবে কী করে যদি সে জীবনের দিকে না তাকায়? সাধারণের জীবনেই তো এ মানসসরোবরের উৎস, যদিচ তার নীল জলে আকাশের ছবি প্রতিফলিত। এই উৎসের সন্ধান কেউ হয়তো জীবনযাত্রার কর্মধারায় পান, কেউ জনগণমন অধিনায়কদের খুঁজে পান ইতিহাসের দ্বন্দ্বময় প্রগতিতে।

সমস্যা ওঠে জ্ঞান ও সৃষ্টিক্রিয়ার হ্রস্বদীর্ঘে। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে প্রত্যক্ষ জীবন থেকে মন সরে যায় জ্ঞাত পরোক্ষের স্বকীয় ধর্মে। শিল্পসাহিত্যে কিঞ্চিৎ স্থায়ী বন্দোবস্তের কারণ মানবচৈতন্যেরই vested interests বা সম্পত্তির স্থাবরতার দিকে ঝোঁক। ভাষার একটা স্বাভাবিক স্থিতিপ্রবণতার জন্য রচনার গতিতে আসে দ্বিধা। গতিতে গা ভাসালে অবশ্য খুঁটিতে বাঁধা মনের দ্বিধাও নিষ্প্রয়োজন। সজীব রচনাতে তাই শিল্পী ও শিল্পবস্তু, বিষয় ও টেক্‌নিকে টান পড়ে জ্যাবদ্ধ ধনুকের টঙ্কারে ধনু ও ছিলার টানের মতো। লক্ষ্যভেদের লক্ষ্য হয়তো অনেকসময়ে সরাসরি চেনা যায় না, ধনুর্ভঙ্গও হতে পারে। তবু প্রগতিশীল সাহিত্যের চিরকালীন লক্ষণ হল এই চৈতন্যজ্যাবদ্ধ টান। অভ্যাসিক শিল্প উপাদেয় পণ্য শিল্প হতে পারে, চমৎকার কুটিরশিল্প হতে পারে, প্রগতির প্রশ্নক্ষেপ সে অভ্যাসের যন্ত্রে অবাস্তব।

নেতিতে আরম্ভ হতে পারে এই মানসের প্রগতি। তারপরে মিনারবাসীর ভূতলে অবতরণ। মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে ঐ-চৈতন্য, ঐ-বোধ। ঐ-বোধের পেশীবহুল ছাপ আসে স্বভাবজড় পাথরে, রং-রেখায়, শব্দে, ভাষার বনেদি রীতিতে, বাক্যের গোঁড়ামিতে। জীবনের প্রত্যক্ষে আর সর্ব-সংস্কৃতিগত পরোক্ষের দ্বন্দ্ব থেকে থেকে মাটিতে এসে মেশে প্রচণ্ড পালোয়ানিতে। তাই প্রয়োজন শিল্পীর অপক্ষপাত, পিকাসোর মতো নৈর্ব্যক্তিকতার সিদ্ধান্তে যাতে দ্বন্দ্বটা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। ব্যক্তিগত বিষয়ীমাহাত্ম্যের ভঙ্গিটা অভ্যাসে সহজ, কিন্তু সেখানে ধনুকের বন্ধন না থাকলেও, তীরের মুক্তিও নেই। অবশ্য একাকিত্বের শানে মাথাকুটেও মর্মান্তিক রোমাঞ্চকর গান রচনা করা যায়। বহির্জগতের পরিবর্তনকে মানসে

না-মেনে। অরণ্যে রোদনেরও সাময়িক সার্থকতা স্বীকার্য। আর নেতি নেতি ধ্বনিতে প্রত্যক্ষের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়, হিরণ্যকশিপুর ঈশ্বরপ্রমাণের মতো।

টেক্‌নিকের সাধনাই শিল্পীকে জিজ্ঞাসার সীমান্তে টেক্‌নিকের উৎসে নিয়ে যেতে পারে। রচনার পদ্ধতি চৈতন্যমার্গ বা বিশ্বাসের বিরোধী, এ-কথা শুধু অতিবামপন্থীদের অপ্রাকৃত মনেই ওঠে। কারণ বিজ্ঞানপদ্ধতির সত্যের মতো শিল্পপদ্ধতির উপার্জনও শ্রেণীহীন। মায়াকভস্কির প্রতীকচর্চার পরিণতিতে তাই গন্তব্য ছিল বিপ্লব। একমাত্র ন্যায়সঙ্গত পরিণতি ছিল সেইখানে, না হলে থাকে র‍্যাঁবোর মরুভূমিতে মৃত্যু। লুই আরাগঁর অবচেতনবাদের খেলা থেকে ইউ আর আর্ এস্-এর গানের পরিণতিতেও তাই দেখি। অতএব লেখককে লেখা ছাড়তে কেউ বলছে না, বলছে শুধু লেখকধর্মী প্রস্তুতির কথা। আপন সমস্যাকে শুধু নিজের মনের গহ্বরনিষ্ক্রান্ত স্বয়ম্ভূ জীব না ভেবে, সে যে ইতিহাসব্যাপী সমস্যারও অংশ, এই উপলব্ধির নিয়ত চর্চা লেখকের প্রস্তুতির সহায়। এ চর্চায় বিষয়বস্তুর ও আধারের বিস্তার ঘটে, অধিকন্তু জীবনের ধারা বহুমিশ্রিত সমগ্রতা পায়। আর সমগ্রের বিকাশের অসীম সম্ভাবনায় শিল্পীর শিল্পী হিসাবে পরিণতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বিষয়বস্তুর সন্ধানে বা ব্যক্তিগত বিশেষত্বের মৃগতৃষ্ণিকায় ঘোরায় লাভ আখেরে কমই। কারণ নিছক শিল্পগত বিবেচনাতেও এই সমাজভঙ্গের দিনে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সুস্থ পরিণতি ও ভারসাম্য আনা কঠিন। কারণ সমাজের সমে তাল কাটলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বোধও কেটে যায়। আর ঐ স্বাধীনতার বোধ ছাড়া মনের বিকাশ সম্ভব নয়। স্বাধীনতা তাই শুধু সীমা ও পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বীকারে। নিঃসঙ্গতার abstraction-এ — পরোক্ষ নিদানে স্বাধীনতা কোথায়?

কাব্যের উৎস যতই রহস্যময় হোক, কাব্য কিছু গোপন তন্ত্রমন্ত্র নয়। কাব্য সম্বোধন, সম্বোধনে শ্রোতার সম্বন্ধ গ্রাহ্য। সোঽহমে সম্ভাষণ সম্বোধনের সুযোগ বেশি নয়। আমাদের লেখকেরা জানেন যে দৃষ্ট ও জ্ঞেয় দ্রষ্টার জ্ঞানে জারিয়ে যায় এবং তার পরিবর্তনে তাঁদের পরিণতির ক্রান্তি। Interpretation তাই change-এ সম্পূর্ণ। সেইজন্যই তাঁরা যন্ত্রবৎ নূতন অভ্যাসের কলে পা দেন না, কোনো দর্শন থেকে টুকরো কুড়িয়ে জোড়া লাগাতেও চায় না। বিশেষ মার্ক্সিয় দর্শনে এই চিরকালের জন্য একবার অর্জিত অভ্যাসের যান্ত্রিকতা অচল। সে দর্শনের ভিত্তিই হচ্ছে চিরদ্বৈতাদ্বৈতের গতিশীল জীবন্ত পরিণতিতে, প্রথাসিদ্ধ দার্শনিকতার জড় অবসর মার্ক্সিজমে নেই। সে পরগাছা চালাকির চেয়ে জিজ্ঞাসুমাত্র বিষায়ানুরাগ সার্থক।

বিষয়ের বা বস্তুসত্তার অনুরাগে অন্তত সেই নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি আসে, যাতে জীবনের বহুব্যাপ্ত সমগ্রতার আভাস পায়, যাতে শিল্পরূপ ও শিল্পবস্তু একটি সক্রিয়তার দুটি দিক বলে বুঝি। ইংরেজি সাহিত্যে এলিঅট প্রায় পেয়েছিলেন এই বিষয়-সমাধি। কিন্তু তার আশ্চর্য পরিণতি তির্যক হয়ে রইল বর্তমান অবাস্তব এক ধর্মসমাজঘটিত দর্শনের হস্তক্ষেপে। তবু বলতে হবে যে এলিঅটের এই বিষয়শ্রদ্ধাই তাঁকে ইংরেজদের শ্রেষ্ঠ কবি করেছে এবং ঐ নৈর্ব্যক্তিক প্রয়াসের জন্যই তাঁর প্রভাব হয়েছে মুক্তিবহ। কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদের কুশীলকবৃত্তিতে যে মুক্তি নেই, সেটা আবার স্মরণ করি। দার্শনিক চয়নিকা

প্রয়োগে বামপন্থীর মনোবিকার যে ঘটে, তার প্রমাণ অডেন্-স্পেন্ডর-লুইসের দল। তাছাড়া, একটা মতবাদের জ্ঞানের দিক যখন গভীর হয় — এবং আমরা কড্ওএলের *Illusion and Reality* বা জ্যাক্ লিন্ডসের *Short History of Culture* ও *The Anatomy of the Spirit*-এর কাছে একান্ত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি — তখনও শিল্পসাহিত্যের উৎসে চৈতন্যের গভীরে সে মত চারিয়ে যেতে সময় লাগে। কড্ওএলের বা লিন্ডসের কবিতায় প্রাক্ মার্ক্সিয় মামুলিত্ব কথাটার প্রমাণ। তবু ত কড্ওএল জীবন দিয়েছিলেন এই মতে নিজেকে মেলাবার জন্য। আর যাঁরা এই জীবনে বুদ্ধিতে এক সাধনা ধরেননি, যাঁরা এক দাগ ওষুধের মতো বা পাঁজির বর্ষফলের মতো মার্ক্সিজমের চটক ব্যবহার করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের নিজেদের মনগড়া ছক থেকে দূরে যাবার প্রতিবিপ্লবী ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। এলিঅটের নৈর্ব্যক্তিকতার তীব্র চেষ্টা এর চেয়ে প্রগতিবান্। তাঁর ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ব্যক্তিগত বিশৃঙ্খলা বিষয়ের নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষে দানা বাঁধতে পারে। সে কৈলাসভাবনা থেকে তবু ঐতিহাসিক দৃষ্টির বিস্তার আনা সম্ভব, দৃশ্যটা অন্তত আয়ত্তে আসতে পারে। চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কার্য সাধিত হয় না, এই কথার জের টেনেই বলা যায় যে খণ্ডিত মনের হঠকারিতায় প্রতিক্রিয়ার চোরাবালিই পরিণাম, ব্যক্তিস্বরূপের মুক্তি নয়। ভালেরির আত্মভুক সর্পে নয়, আমাদের লেখকেরা জানেন যে বিশ্বরূপদর্শনেই ব্যক্তির ঐশ্বর্য।

ব্যাপারটা, বলাই বাহুল্য, মোটেই সরল নয়। তার উপরে আছে বাংলা সাহিত্যের অপরিসর কিন্তু বিশিষ্ট ঐতিহ্যের চাপ। এবং সংস্কৃতিগত রচনায় প্রত্যক্ষ ইমারতকে অস্বীকার করে অর্থনীতিগত কাঠামোতে কাজ করা যায় না। আমাদের লেখকেরা চেষ্টা অবশ্য করছেন (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ স্থানমাহাত্ম্য local colour-এ কথাটার প্রমাণ) প্রত্যক্ষ জীবনযাত্রা ও মানসকে সেতুবন্ধে মেলাতে, কিন্তু চৈতন্যের স্রোত গভীর ও প্রবল। সেই গভীরেই শিল্পসাহিত্যের কারবার। হয়তো যদি কিছু প্রচণ্ড আলোড়নে সারা দেশের জনমানস পাশ ফেরে, তাহলে এই দ্বিধা দ্রুত সমাধান পেতে পারে। ইতিহাসের সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে আর তাতে জনসাধারণের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধিতে কল্পনারাজ্যেও লাগছে হাওয়া। তাই জনসাধারণের জীবনে ও আন্দোলনে লেখকদের দৃষ্টি যেমন বেশি যাচ্ছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যে ও টেক্নিকের প্রশ্নেও লেখকরা মন দিচ্ছেন।

২

এই সাহিত্যিক ঐতিহ্য মোটামুটিভাবে স্যাক্সনোত্তর ইংরেজি সাহিত্যের সমবয়সী হলেও এর ক্ষীণধারা শুধু থেকে থেকে কয়েকবার ঝল্সিয়ে উঠেছে। সংস্কৃত ঐতিহ্যের অতি নিকট হলেও বাংলার প্রাকৃত ঐতিহ্যের স্বভাব ভিন্ন। এমনকি 'কৃষ্ণকীর্তনে'র মতো প্রাচীন ও কাঁচা রচনাতেও আমরা সংস্কৃতের রাজসভাশোভন প্রথাসিদ্ধ মানস ও দেশজ লৌকিক মানসের অস্পষ্ট কিন্তু সুস্থ প্রাকৃতধর্মের বিরোধ দেখতে পাই। লোকমানসের এই স্বাতন্ত্র্য শুধু গ্রাম্যতা বা স্থূলতা ভাবলে ভুল হবে। এ-মানস জীবনধর্মী, জীবনভোগী, প্রত্যক্ষযোদ্ধা মন, যা জনসভ্যতারই প্রাণময় লক্ষণ। এ জীবনকে পরিগ্রহণের ভঙ্গি,

প্রাত্যহিককে স্বীকারের দর্শন, তাই এতে পাই হাসিকান্নার মধ্যে একটা বাস্তববিলাসের কর্মঠতা, সময়ে-সময়ে অপরাজেয় জীবনীশক্তির হাস্যোজ্জ্বল আভাস। এতে বিরুদ্ধ মেলে মানিয়ে নেবার স্বাস্থ্যে, দেবদেবী হয়ে ওঠে ঘরোয়া মানুষ, মানুষ হয়ে ওঠে বিস্ময়কর। এ-মানসে অশ্লীলতার সন্ধান অন্ধ রুচির খেয়াল, কারণ এর মূল্যজ্ঞান এসেছিল সমাজের একটি বিশেষ সাময়িক অখণ্ডতায়, শ্রেণীগত ধর্মব্যবস্থার মধ্যেই এক জীবনব্যাপী ছকে। সে-ছকের পৌরাণিক মহলে-মহলে ছিল লোকের যাতায়াত, উপরে-নীচে ছিল সম্বন্ধ, নীচের লোক গোপন প্রতিশোধে টেনে আনত উপরের জবরদস্তদের। অনার্য শিব তো এইভাবেই গ্রিক পুরাণে ডায়োনিসসের মতোই আর্যজগতে প্রবেশ করেন। আবার সেই নব্য-আর্য শিব যখন ব্রহ্মণ্যবিলাসী হয়ে উঠলেন, তখন সে রুদ্র মহাদেবকে টেনে আনতে হল নেশাখোর বেকার স্বামীর প্রাপ্য গঞ্জনার মধ্যে। ব্রহ্মণ্যের অন্নদাতা সদাগরকে তাই মানতে হল মনসার লৌকিক শক্তি। অবশ্যই সংস্কৃতের বৈদগ্ধ্য অনেকখানি আমার নিলুম, যেমন নিলুম অলঙ্কার আর রীতির নির্বিশেষ অভ্যাসের সামান্যতা। উপনিষদ্ ও মহাভারতোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যের ছদ্ম-ধ্রুপদী ভাব যে তবু বাংলা সাহিত্যের গতিরুদ্ধ করতে পারেনি, সে শুধু দেশি কবিরা মৃত্তিকার সন্তান ছিলেন বলেই। জনমনের বিশ্বাস ও দৃষ্টি এবং তাদের জীবনের রূপের প্রভাবেই কন্‌ভেন্‌শন্সের ঈষৎ ভিন্ন চেহারা আমাদের প্রতিবাদী প্রাকৃত সাহিত্যে।

বলার দরকার নেই যে সেকালে আমাদের স্বাধীনতার মাত্রা ইচ্ছাধীন ছিল না, না-ছিল আত্মসচেতনতার সুযোগ বা প্রয়োজন। দুটি মোটা পথ ছিল — এক দেবদেবী ভাঙাগড়া, আরেক নরনারীর সম্বন্ধের বিদগ্ধচর্চা। সে চর্চার sophistication আজও আমরা গ্রাম্যসাধারণেরও প্রেমালাপে শুনতে পাই।

মধ্যযুগের পরিধিতেই এই একটা মানবিকতার পথে লোকে নিষ্পত্তি ও ক্ষতিপূরণ আদায় করে এসেছে। চণ্ডীকাব্যে, নানা মঙ্গলকাব্যে, শিবদুর্গায়, পাঁচালী ও যাত্রা প্রভৃতি জননাট্যে এ-ক্ষতিপূরণটা বেশ বোঝা যায়। চিত্রশিল্পেও এই মন কাজ করেছিল; পটে, পাটায়, মেলার পুতুলে, আল্পনায়, ব্রতকথায়, ছড়ায় গ্রাম্যগানে এ-মন রূপ পেয়েছিল। (অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত' এদিকে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে।) পূর্ববঙ্গগাথায় এই জীবনেরই প্রত্যক্ষতা। লোকমনের দিগ্বিজয় প্রাদেশিক বাংলা দেশে মহাকাব্যদুটিতেও পৌঁছেছিল, বৈষ্ণব তত্ত্বকথাতেও তাই প্রেমের সরস আবেদন। মানি 'পদকল্পতরু'র কন্‌ভেন্‌শন্স প্রাণহীন, — কেননা বৈষ্ণব কবিদের মন ছিল জনবোধ্য বিষয়ের আবেদনে, সংস্কৃত রীতিবাদীদের মতো কন্‌ভেন্‌শন্সের চর্চায় নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষণে-ক্ষণে সূক্ষ্ম বাস্তবিকতার তীব্রতায় আমাদের মধ্যবিত্ত অভ্যাসের মধ্যে চমক লাগে। হঠাৎ এমন লাইন আসে যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যেই মেলে, যা আমাদের ডুবিয়ে দেয় মানুষের অভিজ্ঞতার গভীর সমুদ্রে। অন্তর্দৃষ্টি ও আবেগের পরিধি বেড়ে যায়। প্রেমের বেদনা যে দুই চলিষ্ণু ব্যক্তির চলিষ্ণু সম্বন্ধের দোটানার যন্ত্রণা ও আনন্দ, বৈষ্ণবকবি এটা আমাদের বিস্ময়করভাবে জানিয়ে দেন। খানিকটা অস্পষ্ট অবশ্য এই মানস। তবু এই মানসের ছাপ আমাদের য়ুরোপীয় যুগ অবধি মোটামুটি একভাবে দেখা যায়।

তারপরে এল তাতে পরিবর্তনের ঝড়। ঈশ্বর গুপ্তকে বলা যায় শেষ জনকবি, তিনি লিখেছিলেন ইতিহাসের ঘোর বিশৃঙ্খলার যুগে, অনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে অতীতের ব্যবস্থার দিকে বারে-বারে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে। এক হিসাবে বিদ্যাসাগর আমাদের সবচেয়ে শুদ্ধ ও মহৎ য়ুরোপীয়, তাই তাঁর দরদী মানবিকতায় দেশি সংস্কৃতি দানা বেঁধেছিল। বিদ্যাসাগর নিজের সমগ্রতার জগৎ থেকে খুঁজলেন সাধারণ ভারসাম্য, এক নূতন ও রীতিমতো সংস্কৃতঘেঁষা ভাষায়। তার কারণ বোধহয় প্রথমত সংস্কৃতের দীর্ঘ ইতিহাস এবং দ্বিতীয়ত তখনকার উচ্ছৃঙ্খল নিকট প্রাদেশিকতা থেকে সংস্কৃত ঐতিহ্যের দূরত্বের আকর্ষণ। মধুসূদনের বিলম্বিত এবং বিষয়হীন রোমান্টিক ভাবাবেগই তাঁকে আবার বাংলায় ফিরিয়ে আনল। তাঁর প্রচণ্ড প্রতিভায় দীপ্ত ভাষা অবশ্য বাংলার লৌকিক ঐতিহ্যে তাঁর য়ুরোপার্জিত দান। কিন্তু মধুসূদনের বিদ্রোহী রাগে দেব-দেবীরা সাবেক বাংলার নরকল্পতাই পেয়েছেন, তাঁদের পোষাকি জাঁক-জমক সত্ত্বেও। য়ুরোপীয় ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ মধুসূদনের মানসে বাংলার জনজীবনের দৃষ্টির আভাস আশ্চর্য ব্যাপার। নূতন সভ্যতাকে সে-দৃষ্টি নিজের ভাষ্য দেয়, সমালোচনার বাস্তবে মিলিয়ে নেয়। তাই মধুসূদনের নাটকদুটিতে ভাষার যে সরস স্বাস্থ্য, যে দেশজ পেশীর সচ্ছলতা পুলকিত করে, তা আমরা বঙ্কিমের হিন্দুত্বের সঙ্গে ইংরেজ শাসনের মিশ্রণকৃতিত্বে পাই না।

বরং পাই কয়েকজন দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকে, কালীসিংহে, টেকচাঁদে, এমনকি হেমচন্দ্রের কিছু-কিছু সাময়িক পদ্যরচনায়। এঁদের দেখে কল্পনা করা যায়, সে-সময়কার দুই জগতের মধ্যে একটা সাময়িক ভারসাম্য। তাই দীনবন্ধু মিত্রকে প্রথম শ্রেণীর লেখক বলেই সম্ভাষণ করতে হয়, বিশেষ করে 'সধবার একাদশী'র সুস্থ বাস্তবিকতা ও ব্যঙ্গের জন্য। তাঁর পলায়নবিমুখ দুর্মর সাধারণ্য কারণ ও কার্য, উৎস ও গতিকে এক করতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে অতীতে ছোটেনি। তাঁর মানবিকতার করুণা ও হাস্যজাগ্রত শুভবুদ্ধিতে তিনি আমাদের নাট্যসাহিত্যের শীর্ষে।

তবে স্থিতিটা যে অসম্পূর্ণ ও নেহাৎ সাময়িক ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। না-হলে আমাদের উপন্যাসের পুরোধা বঙ্কিম কেন তাঁর গম্ভীর আত্মমর্যাদা সত্ত্বেও উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিলেন? অবশ্যই য়ুরোপীয় সভ্যতা, ব্রহ্মণ্য ও মধ্যবিত্ত স্থূলতার প্রেসকৃপশন্ কেবল তাঁর স্বকীয় দায়িত্ব ছিল না। বঙ্কিম তাঁর প্রতিভার দ্বারা দ্বন্দ্ব নিরাকরণের চেষ্টাই করেছিলেন, আজকে সাহিত্যে ও রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়াবাদীরা যদি তাঁকে নিয়ে টানাটানি করে, সে দেশের দুর্ভাগ্য।

৩

বাংলার ছোটো ঐতিহ্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথের বিরাট আবির্ভাব একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। এ প্রচণ্ড আবিষ্কারে আমরা যদি গালিলিওর মতো উত্তেজিত হই তো সে মার্জনীয়। আমার এই সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে তাঁর মতো প্রতিভার পরিচয় দেওয়া অসাধ্য। অথচ তাঁর তুলনা অন্য সাহিত্যেও ঠিক পাওয়া যায় না। একদিকে ইংরেজিতে চসর, অন্যদিকে জর্মানে গয়েট মিলিয়ে হয়তো খানিকটা ঐতিহাসিক তুল্যাভাস দিতে পারেন। তাঁর

প্রভাবে বাংলা সংস্কৃতির সুরে এল অনেক বিন্যাস, তাঁর প্রতিটি বই টেক্‌নিকের প্রগতিতে পদক্ষেপ ও বিষয়বস্তুর বাহুবিস্তার। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ আমাদের শেখালেন শালীনতা। মার্জিতরুচির এ-উত্তরাধিকার অস্বীকার করা কোনো গোঁড়ামিতেই আর সম্ভব নয়। প্রাদেশিকতাদুষ্ট বাংলায় তিনি আনলেন বিশ্বের মানদণ্ড। রোমান্টিকের পরিবর্তন-অভীপ্সা, হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম সৌকুমার্য, পেলবতা তাঁর দান। বড়ো কথা, সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রথম পরীক্ষাতেই প্রয়োজন যে নিছক সৌন্দর্যের চেতনা, সে-ও আমরা রবীন্দ্রনাথেই দেখেছি। ভিক্টোরীয় চরিত্রের বলিষ্ঠ সততা, কর্মের দায়িত্ববোধও বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা।

ব্যক্তির যে-স্বকীয়তাবোধ, sense of privacy তা-ও রবীন্দ্রোত্তর সমাজেই বাংলার মানসে কিছু দেখা যায়। তাছাড়া শুধু শ্রেষ্ঠ নন, তিনিই আমাদের সাহিত্যিক পেশার দায়িত্বের প্রথম ও চরম উদাহরণ। তাঁর দান আমাদের নানামুখ আত্মসচেতনায় মানুষ করে তুলবে, যদিও তাঁর সম্পূর্ণতা তাঁর একান্ত স্বকীয় ব্যক্তিস্বরূপেই সম্ভব। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যই তাঁর ব্যাপক কর্মক্ষেত্র ছিল, তবু তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ নদীর মুখর স্রোত নয়, সংহতসত্তা হিমালয় নামে নগাধিরাজ যেন। যান্ত্রিক বামপন্থী ব্যাখ্যায় এই মহত্ত্বের মর্যাদা হয় না। বনেদি পরিবার, সামন্ততন্ত্রসমাজের অবশেষ ও বুর্জোয়া সভ্যতার উত্থানশক্তির সন্ধিক্ষণে তাঁর আর্বিভাব, এ-সব কথায় তাঁর দুর্নিবার প্রতিভার নিঃসঙ্গ সৃষ্টির আবেগের আংশিক ব্যাখ্যামাত্র। মহর্ষির প্রভাব, ব্রাহ্মসমাজের মানসও নিশ্চয়ই তাঁর প্রবল বিশ্বাসের মূলে ছিল। যার বলে সুন্দর ও মঙ্গল তাঁর কাছে পরোক্ষ তত্ত্বমাত্র ছিল না, ছিল জীবনের সত্য। তবু তাঁর প্রাণময় রহস্য শেষ হয়ে যায় না।

তবু শূন্য শূন্য নয়
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
একা একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

আশ্চর্য এই তৃপ্তিহীন প্রাণময়তার আশীবছরব্যাপী সমগ্রতা। এতেই টেক্‌নিকের নব-নব বিকাশে বিষয়ের প্রসার, এতেই শেষটা তিনি তাঁর পটভূমি প্রায় পিছনে ফেলে আধুনিক জীবনের মহত্তম কবি হয়ে উঠেছিলেন। তবু মোটামুটি বলতে হবে যে তাঁর নক্ষত্রবিহারী প্রতিভা বাংলার রসালো মাটিতে মানুষ আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতায় বিরাজমান থেকেও বহু উর্ধ্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেখানে মধুসূদন বা দীনবন্ধু বরং আমাদের চেনা অগ্রজ।

৪

সুখের কথা যে, আমাদের লেখকরা যে ইতিহাসের এক বড়ো মোড়ে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধিতে চিন্তিত। সে-স্বরূপসন্ধানে ইয়েট্‌সের সেই Great Mother-এর প্রভাব আজ স্পষ্ট — সেই বিশ্বজননী; মৃত্তিকার মানুষের মনের দীর্ঘ স্মৃতি; ফ্রয়েডের অবচেতন;

যিনি বিরহী দ্বন্দ্বে ক্ষেপিয়ে বেড়ান, জনসমষ্টির মিলনে যদি একবার তাল কাটে। তাই তো আজ মানবচৈতন্যের বিকাশের বর্তমান অবস্থায় আমরা বুঝেছি যে টেক্‌নিক ও জীবনোৎসারিত বিষয়বস্তু একটি ক্রিয়ার দুটি দিক, আর লেখক শুধুমাত্র কারুশিল্পী নয়, শুধু অনুপ্রেরণায় মত্তও নয়, সমগ্র মানুষ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয়ভাবেই। অধিকন্তু শিল্পেতিহাসে প্রাথমিক গোষ্ঠীজীবনের কাল থেকে আমরা দেখেছি যে বস্তুরূপ ও বস্তুসত্তা অঙ্গাঙ্গী ধারায় চলে। রূপজ্ঞানের চর্চায় বহু শতাব্দীর সঞ্চয়ের পরে আজ তাই দেখি নিছক রূপায়ণে আসে প্রতীকের দ্রুতবোধ্যতা — যদি অবশ্য সমাজে থাকে সম। সুতরাং সজীব সমাজে উঁচ্‌কপালে রূপচর্চা ও কন্‌ভেন্‌শন্সের সাক্ষাৎ আবেদন, সেকালের সাহিত্যিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বস্তুচর্চার বুর্জোয়া ঐশ্বর্যের অনুকরণে নয়। সাম্যবাদের প্রাকৃতধর্মে নিশ্চয়ই পণ্যবিপ্লবের প্রথম যুগে ফিরে চলার আহ্বান নেই।

☐ *রুচি ও প্রগতি*, ১৯৪৬

ভেগোলজি

পরিমল রায়

সম্প্রতি একটি নতুন বিদ্যা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই বিদ্যার ইংরিজি নাম ভেগোলজি। বাংলা ভাষায় ইহার অভিধা নির্দেশ করা মুশকিল। তবে, সন্ধ্যাবিদ্যা কথাটি হয়তো মন্দ হয় না। কারণ, বস্তুত এই বিদ্যা আলো-আঁধারি বিদ্যা। মনের কিম্বা জ্ঞানের রাজ্যে দিগদিগন্ত যেখানে তেমন প্রকট নয়, অথচ একটি অনির্বচনীয় বিশালতার স্পষ্ট ইঙ্গিত অনস্বীকার্য, সেখানেই ভেগোলজির প্রভাব মানিয়া লইতে হয়।

ভেগোলজি কথাটি 'ভেগাস' এবং 'লোগোস' এই দুইটি প্রাচীন শব্দের সমন্বয়ে উৎপন্ন। প্রথমটির অর্থ পথ বিলাস। নিছক কতকগুলি জিজ্ঞাসার সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ পরিবেশে যথেচ্ছ বিচরণেব যে আনন্দ, ভেগোলজি তাহারই পরিবেশক। যেখানে গন্তব্য নাই অথচ গমন আছে, ক্ষুধা নাই অথচ ভুঞ্জন আছে, বক্তব্য নাই কিন্তু বাক্য আছে, — অর্থাৎ যেখানে যাবতীয় সন্ধান-বিকৃত মনোবৃত্তির উর্ধ্বে লক্ষ্যনিরপেক্ষ নভোচারী চিলের মতো কেবলমাত্র ভাসিয়া বেড়াইবার উৎসাহ আছে, সেখানেই ভেগোলজির প্রকৃষ্টতম প্রকাশ। কোনো-কোনো মনুষ্যের মননশক্তি একটি নির্দিষ্ট জিজ্ঞাসা কিংবা সমস্যা অবলম্বন না করিয়া বিকশিত হইতে পারে না। তাহারা পথে বাহির হইলে কোথাও পৌঁছিতে চায়, বলিতে আরম্ভ করিলে কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করে। এই দুর্বল পরাশ্রয়ী চৈতন্যে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে ভেগোলজির সাহায্য লইতে হয়। সন্ধ্যাবিদ্যা যাহার আয়ত্ত, তাহার শক্তির স্বাধীনতা অসাধারণ। তাহার বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, দ্বন্দ্ব নাই, দ্বিধা নাই, স্বচ্ছন্দ বিহারী যাযাবরের ন্যায় তাহার গতি অকুণ্ঠ, সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া তাহার সংসার।

এদেশে কিছুকাল পূর্বেও ভেগোলজির তেমন প্রচার কিংবা প্রচলন ছিল না। অতি সম্প্রতি ইহার আদর হইয়াছে, এবং সুখের বিষয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বহুব্যক্তি এই বিদ্যায় ক্রমশ আকৃষ্ট হইতেছেন। ভেগোলজি সম্বন্ধে আমার উৎসাহের ইতিহাসও সাম্প্রতিক।

কিছুদিন পূর্বে একটি বিদ্বৎসভায় জনৈক পণ্ডিতের মুখে 'রবীন্দ্রদর্শন' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। শুনিয়া মনে হইয়াছিল, এমন অপূর্ব ভাষণ পূর্বে আর কোথাও শুনি নাই। সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছিলাম, ইনি বাংলাদেশের একটি সিদ্ধ পুরুষ ও প্রখ্যাতনামা ভেগোলজিস্ট। তাঁহার বক্তৃতার ভাব ও ভাষা আমার কানে যেন আজও লাগিয়া আছে। তিনি বলিতেছিলেন :

'এই যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, এই যে তাঁর সাহিত্য, তাঁর কবিতা এবং সঙ্গীত, এ সকলের মধ্যেই কবি তাঁর জীবন দেবতাকে খুঁজে ফিরেছেন। তিনি সত্যের পূজারি কেবল নয়,

সুন্দরের আরাধনাও তাঁর চরম লক্ষ্য নয়, তিনি শিবের সন্ধানী তিনি অ-শিবের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই রূপ রস গন্ধময় বিশ্বপ্রকৃতির লীলা নিকেতনে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার, এবং ঠিক এই কারণেই কবি তাঁর সাহিত্যটির ভেতর দিয়ে ভূমার জয়গান গেয়েছেন, অরূপকে রূপ দিয়েছেন, রূপহীন মরণকে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে সজ্জিত করতে পেরেছেন।'

ভেগালজির প্রতি আমার কৃত্রিম অনুরাগের উৎপত্তিস্থল এই অভিভাষণ। সামান্য কয়েকটি কথায় এমন অসামান্য আলোকপাত আমি পূর্বে আর কখনও দেখি নাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আমার নিকট কিছু অপরিচিত নয়, কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত মর্ম এমন করিয়া যেন কোনোদিন উপলব্ধি করি নাই। বক্তৃতাটি শুনিয়া হৃদয় এবং মস্তিষ্ক বিভাগে বিশেষ সম্পন্ন বোধ করিয়া সেদিন বাড়ি ফিরিয়াছিলাম। এই পরম বিদ্যার সন্ধান পাইয়া অবধি যেখানেই কোনো ভেগোলজিস্টের সন্ধান নাই, একেবারে ছুটিয়া গিয়া হাজির হই। দু'দণ্ড কাছে বসিয়া কত কথা শিখিয়া আসি।

একদিন খবর পাইলাম, জনৈক বিখ্যাত শিল্পরসিক মহানগরীতে পদার্পণ করিয়াছেন। শুনিলাম, প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার আসরে বহু বিদগ্ধজনের সমাগম হইতেছে এবং বহু উচ্চাঙ্গের আলোচনায় তিনি সমবেত সকলকে মুগ্ধ করিতেছেন। শুনিয়া প্রথমটায় তেমন গরজ বোধ করি নাই। কিন্তু একদিন জানিতে পাইলাম, ইনি কেবল বিখ্যাত শিল্পরসিক নন, অতি উচ্চ শ্রেণীর ভেগোলজিস্টও বটেন। এই সংবাদ পাইবার পর আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। এক সন্ধ্যায় গুটি গুটি আমাকেও গিয়া জুটিতে হইল। ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া দেখি সভা সরগরম। জ্ঞান পিপাসুর সংখ্যা কম নয়। ফরাশের উপর কুড়ি পঁচিশটি জিজ্ঞাসু বিনীত উৎসাহে উপবিষ্ট। ক্ষণে-ক্ষণে নানা দিক হইতে নানাবিধ প্রশ্ন আসিতেছে, আর ভদ্রলোকটি অতি শান্ত ও ধীরকণ্ঠে প্রতিটি প্রশ্নের অতি সুচিন্তিত ও সুসংবদ্ধ মীমাংসা জোগাইয়া যাইতেছেন। প্রশ্নটি যত জটিলই হোক না কেন, ভেগোলজির যাদুস্পর্শে উহার যাবতীয় গ্রন্থি মুহূর্তমধ্যে মুক্ত হইয়া যাইতেছে। অতি বিস্ময়কর শক্তিই বলিতে হইবে। ফরাসের একপ্রান্তে উপবেশন করিয়া বহুক্ষণ দুই কান পাতিয়া বিদগ্ধ রচনার মধুবর্ষণ সংগ্রহ করিলাম। পরে এক সময়ে কেন যেন মনে হইল, আমারও কিছু একটা প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত, বোকার মতো কেবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে এ সভায় মান থাকিবে না। কিন্তু আমার কী সাধ্য, এই আসরের উপযুক্ত প্রশ্ন উদ্‌ভাবন করি? এতগুলি পরমহংসের মধ্যে আমার মতো বকপক্ষীর বকবকানি কে শুনিবে? তাছাড়া, স্বভাবজিজ্ঞাসু না হইলে জিজ্ঞাসাই বা কোথা হইতে আসিবে? নিজের বিপদ যেন নিজেই ডাকিয়া আনিলাম, এবং নিতান্ত মূর্খ বলিয়াই বিষম বেগতিকে পড়িয়া গেলাম। ভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত একটা সুরাহা হইল। বহু ভাবিয়া চিন্তিয়া, মাথার ঘাম কোলে ফেলিয়া একটি প্রশ্ন মনে মনে খাড়া করা গেল। ভাবিলাম, জিজ্ঞাসা করি; গ্রিক ভাস্কর্য ও ভারতীয় ভাস্কর্য এ দু'য়ের মধ্যে তফাৎ কোথায়? প্রশ্নটি বেশ ভালোই মনে হইল। ভাস্কর্যের কোনো একটি প্রচেষ্টা যদি গ্রিসে হইয়া থাকে এবং অপর কোনো একটি প্রচেষ্টা যদি এদেশে হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে অবশ্যই একটি পার্থক্য আছে, অন্তত থাকা উচিত — এবং সে-বিষয়ের উপর একটি জিজ্ঞাসা হয়তো খুব মূঢ়তার পরিচায়ক হইবে না।

সুযোগের অপেক্ষা করিতে করিতে এক সময়ে কপাল ঠুকিয়া প্রশ্নটি নিবেদন করিয়া বসিলাম। অপরিসীম ভাগ্য বলিতে হইবে, প্রশ্নটি শুনিয়া ভদ্রলোকের পণ্ডিতমন অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া

উঠিল। আমার প্রতি প্রশ্রয়পূর্ণ সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলে: খাসা প্রশ্ন, অনেককিছু বলবার আছে। বলিয়া সুস্মিত বদনে মৃদু মৃদু মাথা নাড়িতে লাগিলেন। এতখানি সমাদরের জন্য অবশ্য প্রস্তুত ছিলাম না। প্রশ্নটির আশাতীত অভ্যর্থনায় খানিকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। তদুপরি সভার দৃষ্টি সশ্রদ্ধ কৌতূহলে আমার প্রতি সহসা নিবদ্ধ হওয়াতে অস্বস্তি আরও বাড়িয়া গেল। ভদ্রলোক বলিলেন:

'গ্রিক ভাস্কর্য এবং ভারতীয় ভাস্কর্য এই দুইটির ভেতর তফাত কোথায়? এই আপনার প্রশ্ন?'

বলিলাম: 'আজ্ঞে হ্যাঁ'....।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণের জন্য নীরব হইলেন। যতক্ষণ তিনি তূষ্ণীভাবে রহিলেন ততক্ষণ সমবেত সভ্যমণ্ডলী উৎকণ্ঠিত আগ্রহে তাঁহার বাক্স্ফূর্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনতিকাল মধ্যে মৌনভঙ্গ হইল। ভদ্রলোক বলিলেন:

'আচ্ছা ধরা যাক, এই হল গ্রিক স্কাল্পচার' বলিয়া ফরাসের উপর তর্জনীর টানে একটি লম্বা দাগ কাটিলেন। তন্মুহূর্তে সভাসুদ্ধ সকলে রেখাটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। আমিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উহার উপর নজর রাখিতে লাগিলাম।

'আর এই ধরা যাক ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার।'

এবারে আরেকটি রেখাপাত হইল, উহার স্থান গ্রিক রেখার কিঞ্চিৎ নিম্নে। পর পর দুইটি রেখা সৃষ্টির পর আমাদের দৃষ্টি অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ হইল। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উহাদের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। মনে করিলাম হয়তো জ্যামিতিক নিয়মে প্রশ্নটির সমাধান করিবেন।

অতঃপর ভদ্রলোক এক টিপ নস্য লইয়া ফরাসে একটি কিল মারিয়া বলিলেন:

'আচ্ছা এই যে গ্রিক স্কাল্পচার (গ্রিক রেখায় তর্জনী নির্দেশ), আর এই যে ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার (দ্বিতীয় রেখায় তর্জনী বিহার) এদের মধ্যে তফাতটা কী? এই আপনার প্রশ্ন?'

সোৎসাহে বলিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, এই দু'য়ের মধ্যে তফাতটা কী?'

প্রশ্নটি যথাযথ ভাবে বুঝিয়া লইয়া ভদ্রলোক একবার চক্ষু বন্ধ করিয়া ঊর্ধ্বমুখী হইলেন। কিছুক্ষণ পর চক্ষুরুন্মীলন ঘটিল, এবং তিনি বলিলেন:

'বেশ। এখন কথা হচ্ছে কি জানেন? গ্রিক স্কাল্পচারে অর্থাৎ এইটেতে (ঊর্ধ্বরেখায় অঙ্গুলীস্পর্শ) এমন একটি বস্তু আছে যা ইন্ডিয়ান স্কাল্পচারে অর্থাৎ এইটেতে (নিম্ন রেখায় তর্জনী নির্দেশ) নেই। বুঝলেন কিনা। আবার, ইন্ডিয়ান স্কাল্পচারে অর্থাৎ এইটাতে (অধোরেখায় অঙ্গুষ্ঠ পাত) এমন একটি জিনিস আছে যা গ্রিক স্কাল্পচারে অর্থাৎ এইটেতে (ঊর্ধ্বরেখায় অঙ্গুষ্ঠাঘাত) নেই।'

শুনিয়া মুহূর্তমধ্যে আমাদের চোখের সম্মুখ হইতে যেন একটি ঘোরতর অন্ধকার পর্দা সরিয়া গেল। দিব্যদৃষ্টি লাভ করিবামাত্র ভাস্কর্যের নানা দেশীয় কারুকলার বিভিন্ন মূর্তি বিবিধ অর্থ ও মর্ম পরিগ্রহ করিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেল। অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলাম।

অনেকে বলেন, ভেগোলজি বিদ্যা তেমন উচ্চ শ্রেণীয় নয়। তাঁহাদের কুসংস্কারবদ্ধ ধারণা, বিদ্যামাত্রেরই একটা জমকালো সাজ-সরঞ্জাম থাকা চাই। অর্থাৎ গ্রাফ চার্ট টেস্টটিউব টেলিস্কোপ ইত্যাদি লইয়া ভড়ং সহকারে খানিকটা আঁতিপাঁতি না করিলে বিদ্যা হয় না। ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। বিদ্যা কতখানি সরল সহজ ও নিরলঙ্কার হইতে পারে, তাহার উদাহরণ

ভেগোলজি। আসলে, ভেগোলজি সঙ্কেতময়ী বিদ্যা। ইহাকে বুঝিতে হইলে আস্তিন গুটাইয়া কুস্তি করিলে চলে না। ইহার সাধনা পালোয়ানির ঊর্ধ্বে।

একদা জনৈক বিখ্যাত ভেগোলজিস্ট আমার গৃহে পদধূলি দিয়াছিলেন। কথায় বার্তায় বোধ হইল, তিনি বাংলাদেশের বর্তমান দুর্যোগের কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আছেন। এবং ইহার প্রতিকার কল্পে কিছু একটা অবিলম্বে আমাদের করণীয় বলিয়া তিনি মনে করেন। ভয়ানক কর্মব্যস্ত লোক, মুহূর্তের অবসর নাই, নানা কাজে সর্বদা আবদ্ধ। আমার সহিত পরিচয় মাত্র এই মহৎ কার্যে সহযোগ প্রার্থনা করিলেন, এবং দ্রুতবেগে অনেকগুলি কাজের নির্দেশ জানাইয়া চলিয়া গেলেন। বলিলেন :

মানে, আপনারা এদিক থেকে এই করতে থাকুন। আর আমরা ওদিক থেকে ওই করতে থাকি। আপনারা যদি এটুকু করেন, তাহলে আপনাদের কাছ থেকে আমাদের এ-তে একটা সত্যিকারের সাহায্য হবে। মানে, বাংলাদেশের যে অবস্থা বুঝতে পেরেছেন, এখন যদি আমরা এটা না করি তাহলে — মানে, এদের ব্যাপারটিতো বুঝতে পারছেন? **এরা দেবে না**। কিন্তু দেবে না বললেই তো আর আমরা এ করতে পারি না। আমাদের কেড়ে নিতে হবে। আর, তা'হলে বুঝতে পেরেছেন, ওটা বিশেষ করে দরকার। তাই বলছিলাম, আপনারা এদিক থেকে এই করতে থাকুন, আর আমরা ওদিক থেকে —। মশাই, **ছেপে বার করবো**। হাজার দু'হাজার, দশহাজার, দু'লাখ, দশলাখ — যত লাগে।

ইহা ভেগোলজির সঙ্কেতময়ী ভাষা। বুঝিতে হইলে বহুকালের কৃচ্ছ্রসাধন প্রয়োজন।

ভেগোলজিস্ট সম্প্রদায়ের একটি সর্বসম্মত রীতি আছে। ইহাদের মধ্যে একত্র দল বাঁধিয়া বসবাসের প্রবৃত্তি সাধারণত দেখা যায় না। ইহারা ধর্ম প্রচারকের ন্যায় পৃথক যাত্রায় নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। প্রত্যেকের এলাকা আলাদা। কেহ কাহারও রাজ্যে পদক্ষেপ করেন না। কিন্তু ঘটনাক্রমে কদাচিৎ দুইটি ভেগোলজিস্টের মধ্যে সাক্ষাৎ হইলে অপূর্ব উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়। সন্ধ্যাবিদ্যার সাঙ্কেতিক সমারোহ দেখিয়া তখন মুগ্ধ না হইয়া উপায় থাকে না। এরূপ সৌভাগ্য আমার এযাবৎ দুইবার মাত্র ঘটিয়াছে।

প্রথম বারের কুশীলব দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ী অধ্যাপক। একজন সাহিত্যের, অপরটি অর্থনীতির। কিন্তু সাহিত্য কিংবা অর্থনীতি তাঁহাদের জীবিকার অবলম্বন মাত্র। জ্ঞানের পরিধি অবশ্যই বহু বিস্তৃত। সাহিত্যের অধ্যাপক ক্লাশে বক্তৃতা করিয়া ঘামিয়া ফিরিয়াছেন। বক্তৃতার মধ্যপথে বিজলী পাখা বন্ধ হইয়া যাওয়াতে বড়ো বিপত্তি হইয়াছিল। গরমে অস্থির। বিজ্ঞানের বাহাদুরি কম নয়। কিন্তু উহার বাঁদরামিও অসহ্য। এই অসহ দিকটার মূল অনুসন্ধানের অভিপ্রায়ে 'সাহিত্য' জিজ্ঞাসার সুরে উক্তি করিলেন :

'পাখাগুলো রোজই দেখছি মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাপারটা কী?'

প্রশ্নটি বিশেষ কাহাকেও লক্ষ করিয়া নয়। কিন্তু অর্থনীতির কানে উহা ঢেউ তুলিল। তিনি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলিলেন :

'হঠাৎ প্রেশারটা বেশি হয়ে পড়লেই সার্কিটটা বন্ধ হয়ে যায়।'

সাহিত্য অত সহজে ভজিবার পাত্র নন। তিনি তৎক্ষণাৎ পাল্টা প্রশ্ন করিলেন। তদুত্তরে অর্থনীতি আবার জবাব হাঁকিলেন। প্রশ্নোত্তরের নমুনায় বোঝা গেল ভেগোলজির

সঙ্কেতসিদ্ধি উভয়েরই অসামান্য। ফলে, অতি অপূর্ব কথামালা গলায় ঝুলাইয়া বাড়ি ফিরিলাম। কথোপকথনটি আপনারাও শুনুন।

সা। তা, প্রেশারটা রেগুলেট করলেই হয়।

অ। সে কী করে হবে? একটা ইলেকট্রো মোটিভ ফোর্স আছে তো?

সা। সেটা কে অস্বীকার করছে? আমি বলছিলাম রেজিস্-টেন্সটা যদি —

অ। বাড়ানো যায়? তাহলে আবার লাইন জখম হয়ে যাবে।

সা। কিন্তু লাইন তো দুটো। পজিটিভটা গেলে নিগেটিভটা থাকবে।

অ। সে হয় না। শর্টসার্কিট্ হয়ে যাবে।

সা। শর্টসার্কিট হয়ে গেলেও লং সার্কিটটা থাকবে।

অ। কিন্তু এ যে এ.সি. কারেন্ট।

সা। এ.সি. কারেন্ট? ডি.সি. নয়? ওটাও থাকা উচিত ছিল।

অ। তা কি সম্ভব?

সা। কেন, একটা ডি.সি. কয়েল ফিট করিয়ে নিলেই —

অ। তাতে হয় বটে। কিন্তু খরচাটা আপনি দেবেন? (হাসি)

সা। (হাসি)

আমরা উপস্থিত মূর্খের দল এই সঙ্কেতের ভাষা কিছুই বুঝিলাম না। কিন্তু এটুকু বুঝিলাম, উভয়েই দুর্ধর্ষ ভেগোলজিস্ট।

দ্বিতীয় ভেগোলজিক্যাল সংঘর্ষটির মল্লবীর দুইটি তরুণ উচ্চশিক্ষিত যুবক। ইহারা অতি অল্প বয়সেই ভেগোলজি চর্চায় নিযুক্ত হইয়াছে। আশা করা যায়, পরিণত কালে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। একদা এই যুবকদ্বয়ের মধ্যে একাদিক্রমে দুইটি প্রসঙ্গের আলোচনা শুনিয়াছিলাম। প্রথম বিষয়টি আগামী রুষ মার্কিন যুদ্ধ, দ্বিতীয়টি উত্তর ভারতীয় পরিচ্ছদ চূড়িদার পাজামা ও আচকানের উৎপত্তি। দুইটি বিষয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নাই। আড্ডায় বসিয়া এলোমেলো কত কথাই তো হয়।

ধরা যাক যুবক দুইটির নাম অরুণ বাবু ও তরুণ বাবু। অরুণ বাবু বলিতেছিলেন, আগামী রুষ মার্কিন যুদ্ধে রুষের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এই উক্তির পিছনে অরুণ বাবুর কোনো রাজনৈতিক পক্ষপাত ছিল না। তিনি বলিতেছিলেন, যুদ্ধের আধুনিক কলাকৌশলের মর্ম যাহার আয়ত্ত, তিনিই জানেন এ যুদ্ধে মার্কিনের জয় সুনিশ্চিত। তরুণ বাবুর সে সকল কলা কৌশলের মর্ম সম্যক আয়ত্ত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা গেল এই উক্তি মানিয়া লইতে তাঁহার বিশেষ আপত্তি। অতএব অচিরে অরুণে ও তরুণে মহা তর্ক বাধিয়া গেল। সেই ঘোরতর বাক্য সংঘর্ষে বহু বোমা বারুদ ফাটিল, অতীতের বহু রক্তাক্ত ইতিবৃত্ত আলোচিত হইল, নানাবিধ সৈন্য সমাবেশ, ব্যূহ রচনা, ব্যূহ ভেদ, নৌযুদ্ধের কৌশল, আকাশ যুদ্ধের নৈপুণ্য, পাতাল যুদ্ধের কীর্তি, উড়োজাহাজ, ডুবো জাহাজ, য়্যান্টি-এয়ার, য়্যান্টি-য়্যাটম, ট্যাঙ্ক, টমিগান, বনযুদ্ধ, মরুযুদ্ধ, যাবতীয় সামরিক তত্ত্ব দুই রসনা হইতে বেপরোয়া উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অর্থাৎ, এককথায় দুইজনের মধ্যে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়া গেল। অরুণের বাণ তরুণ কাটিয়া ফেলে, তরুণের বাণ অরুণ মুঠায় ধরিয়া দুমড়াইয়া শেষ করে।

কেহ কাহাকেও আঁটিয়া উঠিতে পারে না। আমরা বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উহাদের আলোচনা শুনি, এবং আশ্চর্য হই, এত বিদ্যা ইহারা কবে সংগ্রহ করিল?

বহুক্ষণ ধরিয়া যখন এই শুম্ভ-নিশুম্ভ কাণ্ড চলিতেছে তখন এক সময়ে তর্কের এক তুমুল মুহূর্তে তরুণ একটি মহা ভুল করিয়া বসিল। মার্কিন সাফল্যের বিপক্ষে বহুবিধ বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখাইবার পর, তরুণ বাবু রুষের আয়তন সম্পর্কিত মামুলি যুক্তিটা উত্থাপন করিয়া বসিলেন। যদি নেপোলিয়ন ব্যর্থ হইয়া থাকে, যদি হিটলারকে ফিরিয়া আসিতে হইয়া থাকে, তবে মার্কিনকেও একই ফাঁদে পড়িতে হইবে। এই কথা শুনিবা মাত্র অরুণ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হইল। উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল :

'আপনি তাহলে এতক্ষণ এই কথাটাই ভাবছিলেন? কিন্তু আপনি কি শুনলে আশ্চর্য হবেন যে আগামী যুদ্ধে আমেরিকাকে রুষ দেশে একটি পা-ও ফেলেত হবে না?' শুনিয়া তরুণ হাসিয়া অস্থির। ব্যঙ্গ সুরে বলিলেন :

'যুদ্ধটা তাহলে ওরা নিউইয়র্কে বসেই জিতবে?' এইবার অরুণচন্দ্রের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ :

'আরে মশাই, ওরা ভি-টু ছাড়বে। জাপান থেকে ওরা অনবরত ভি-টু ছাড়তে থাকবে। কী কববে রাশিয়া?'

অরুণের ব্রহ্মাস্ত্র তরুণের ব্রহ্মতালু ভেদ করিল। তরুণ দারুণ লজ্জায় অধোবদন। একথাটি তাহার মনে হয় নাই। ভি-টু ছাড়িলে আর উপায় কী? তর্কযুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিয়া তরুণ বলিল :

'ভি-টু ছাড়বে! তা বটে। হ্যাঁ, তাহলে আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েট পারবে না।'

একটা মীমাংসা হইয়া যাওয়াতে আমারও নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

দ্বিতীয় আলোচনাটি উত্তর ভারতীয় পরিচ্ছদ চুড়িদার পায়জামা ও আচকানের উৎপত্তি লইয়া। এই পোশাকটি মূলে হিন্দুদের, না মুসলমানদের? তরুণের মতে ইহা হিন্দু পরিচ্ছদ। অরুণের বিশ্বাস, ইহা মুসলমানি পোশাক। মহা তর্ক। ইতিহাস উপড়াইয়া ফেলিবার জোগাড়। ভারতের যত কৃষ্টি, যত সংস্কৃতি, যত ঐতিহ্য, এবং উহাদের যত পার্থক্য এবং সমন্বয়, অন্তর্ভুক্তি ও সমাবেশ মিশ্রণ ও বিবর্তন, যুগ্ম রসনার আস্ফালনে টগ্‌বগ্ করিয়া উঠিল। একেবারে কুরুক্ষেত্র না হইলেও অন্তত বস্ত্রহরণ। স্বযুক্তির নজির স্বরূপ একপক্ষ যে বস্ত্রটিই তুলিয়া ধরে, প্রতিপক্ষ তাহা নিমেষে হরণ করিয়া অপর একটি বস্ত্র আনিয়া হাজির করে। ভেগোলজিক্যাল কার্পাস উভয়েরই অফুরন্ত, টানিয়া আর শেষ হয় না। কাহারও যুক্তি কোথাও একটা চরম মীমাংসায় আসিয়া পৌঁছাইতেছে না। অভিষ্ট পর্বতের চূড়া যেন ক্রমশই তুঙ্গপথে উর্ধ্বগামী, কোনো পক্ষেরই আরোহণের শেষ নাই। আমরা পুনরায় রুদ্ধ নিশ্বাস, কখন কী হয় বলা যায় না।

কিন্তু এক সময়ে সব কিছুরই অবসান ঘটে। এই অরুণ তরুণ সংঘর্ষও শেষকালে এক সময়ে ফুরাইয়া গেল। কিন্তু ফুরাইল বড়ো অদ্ভুতভাবে। দম্‌কা হাওয়ায় আলো নিভিবার মতো তরুণের কী এক ফুৎকারে অরুণ যেন অকস্মাৎ বেমালুম উবিয়া গেল। হঠাৎ আচম্‌কা পরশ পাথরের সন্ধান পাইবার মতো আবিষ্কারের বিজয় উল্লাসে তরুণ একবার হাঁকিয়া উঠিল :

'অরুণ বাবু, কণিষ্ক?' বলিবামাত্র কী যেন ঘটিল, অরুণের মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, যত তর্ক, যত গলাবাজি ও আস্ফালন মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গিয়া নিঃশেষিত তুবড়ির মতো অরুণ যেন কালো মুখে কাৎ হইয়া পড়িল। আমরা বুঝিলাম, এবারে তরুণ প্রতিশোধ নিয়াছে, কিস্তিমাৎ হইয়া কুরুসভার পাশা খেলা শেষ হইয়া গিয়াছে। অরুণ বীরের ন্যায় পরাজয় শিরোধার্য করিয়া স্বকার করিল।

'কনিষ্ক! হ্যাঁ, তাহলে ওটা হিন্দুদেরই পোশাক।'

ভেগোলজির কী অপূর্ব মহিমা! সামান্য একটি শব্দ 'ভি-টু', সামান্য একটি আওয়াজ 'কণিষ্ক', কিংবা ফরাশের উপর সামান্য দুইটি রেখার আবছায়া! সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ঝটিকাবর্ত একেবারে শান্ত, দুর্দান্ত সিংহ ল্যাজ গুটাইয়া যেন পায়ের তলায় নিস্তব্ধ! এই মহাবিদ্যাকে অবহেলা করিয়া লাভ নাই। আমি ইহার সংস্পর্শে যত আসিতেছি, তত মুগ্ধ হইতেছি। পূর্বে এক কলম লিখিতে লিখিবার বস্তু খুঁজিয়া পাইতাম না, কোনো বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতাম, সভায় মুখ খুলিতে ভয় হইত। ইদানীং এই জড়তা অনেকটা কাটিয়াছে। ধীরে ধীরে আত্মপ্রত্যয় জন্মিতেছে, এবং আশা করিতেছি, শীঘ্রই দেশের পরম শ্রদ্ধেয়দের মধ্যে আসন গ্রহণ করিতে পারিব।

আরেকটি কথা আমার মনে ক্রমশই বদ্ধমূল হইতেছে। শিশুদের বর্ণ পরিচয়ের পর কথামালা-ই যথেষ্ট। বোধোদয়ের প্রয়োজন নাই।

☐ *ইদানীং*, ১৩৬৭

কবিতার পৃথিবী

অরুণ মিত্র

কবিতা যে মানুষের এক অস্বাভাবিক ভাষা, এ-কথা বলবার জন্যে কারো এক মুহূর্তও ভাবতে হয় না। বলেছেনও অনেকে। কবিতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে এমন ধারণা হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। বাস্তবিকই তো, কবিতায় আমরা কেউ কথা বলি না, আমাদের জীবনযাত্রার সমস্ত কাজকর্ম চালানো, অন্যকে কোনো কিছু বোঝানো, মত বিনিময়, আদেশ-নির্দেশ, অনুনয়-বিনয় ইত্যাদি ব্যাপারে যে মাধ্যম আমরা অবলম্বন করি তা কবিতা নয়, তা হল অন্যের বোধ্য গদ্য, যার গড়ন তৈরি হয় কোনো বিশেষ ভাষাভাষী জনসমষ্টির প্রচলিত অভ্যাস অনুযায়ী বিভিন্ন শব্দের যোজনায়। এই বিস্তৃত কর্মকাণ্ডে কোথাও কবিতা ব্যবহার্য নয়। অতএব তা যে এক অস্বাভাবিক ভাষা, এ সিদ্ধান্তে খুব সহজেই আসা যায়।

কিন্তু সত্যিই কি এ সিদ্ধান্তে অত সহজে আসা যায়, যদি আর একটু ভেবে দেখি? যখন কোনো বিশেষ কারণে বা বিশেষ অবস্থায় আমাদের অন্তর আবেগে উদ্বেল হয়, কোনো মানবিক বা প্রাকৃতিক সংস্পর্শে আমাদের উচ্ছলতা বা বিহ্বলতা আসে, তখন আমরা ধরাবাঁধা গদ্যে আটকে থাকি না, আমাদের মন গদ্যের সীমানা পার হয়ে যেতে চায়, তখন আমাদের ভেতরে কবিতা গুঞ্জন করে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো উঠে আসে ঠোঁটে। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে বলি, প্রেমের উচ্ছ্বাস যদি কাউকে আপ্লুত করে তাহলে তার মনের মধ্যে কবিতা জাগে এবং প্রায়ই মুখে তা আবৃত্তিও করে সে। যদি কারো অন্তর পর্বত সমুদ্র নদী উপত্যকা অরণ্যের পরিবেশে অথবা কোনো শোভা বা উচ্ছন্নতার দৃশ্যে আলোড়িত হয়, তাহলে অনেক সময়ই তার স্মরণে আসে কবিতা, সে বলেও তা কখনো কখনো মুখে অথবা মনে মনে। আবার মানুষের কোনো সুখের ছবি বা দুঃখের দশা কাউকে যদি গভীরভাবে নাড়ায়, তাহলে তার সেই মানসিক অবস্থার প্রকাশ সাধারণ গদ্যের অন্বয় ছেড়ে ভর দেয়া হয় ভাঙা ভাঙা শব্দে, যা কবিতারই এক অঙ্গ-লক্ষণ নয় কবিতার নির্মিত ছন্দে।

এসব স্বাভাবিকভাবেই ঘটে। সুতরাং এ ভাষাকে অস্বাভাবিক বলা যুক্তিসঙ্গত হয় কী? কাজের ভাষা থেকে তা পৃথক নিশ্চয়ই, কিন্তু মানুষের এ এক স্বাভাবিক ভাষাই। একে আমি বলব হৃদয়ের ভাষা।

এবং কবিতার উৎস সেইখানেই যার নাম হৃদয়। মস্তিষ্কের কাজ যদি কিছু থাকে, তা পরে।

আমাদের এই মাটির পৃথিবীই কবিতার পৃথিবী। এই পৃথিবী, যেখানে আমরা বাঁচি সব মানুষের মধ্যে চরাচরের পরিমণ্ডলে। এর যেকোনো অভিঘাত যখন আমাদের সংবেদনে

ছোঁয়া লাগায়, আমাদের হৃদয় কথা বলতে চায়। এই প্রত্যক্ষের অভিঘাতের সামনে কবি এক রক্তমাংস-অস্থিমজ্জা-স্নায়ুশিরার মানুষ, অনুভবের মানুষ। সে তখন বইপড়া বিদ্যার, বইপড়া জ্ঞানের মানুষ নয়। তখন ঐ বিদ্যা ও জ্ঞান অবান্তর। কিন্তু কোনো জ্ঞান কি তার মনের মধ্যে থাকে না? থাকে। তাকে আমি বলব মানব-সামাজিক জ্ঞান। জনসমষ্টির মধ্যে বাস করার ফলে একটা জ্ঞান আমাদের ভেতরে সঞ্চিত হয়। প্রায় অজ্ঞাতসারেই। সেখানে থাকে পূর্বগামীদের অভিজ্ঞতা, যা একরকম উত্তরাধিকারই বলা চলে, তার সঙ্গে যুক্ত হয় কবির নিজের অভিজ্ঞতা। যা কিছু সে দেখে, শোনে, অনুভব করে, যা কিছু তাকে সরাসরি ধাক্কা দেয় বা তার ইন্দ্রিয়ের পথে অনুভূতিতে সঞ্চারিত হয় সে সমস্তের ফসল তার অভিজ্ঞতা। এই অন্তর্গত কেন্দ্র থেকেই কবিতা উৎসারিত হয়। আগে থেকে ভেবেচিন্তে ঠিক করে নেওয়ার কোনো প্রশ্ন এখানে নেই।

কবিতার উন্মেষ এই রকমই স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রণোদিত। নির্মাণের পর্যায়ে অবশ্য কিছু ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন হতে পারে। বক্তব্যকে আরও অমোঘ করার জন্যে শব্দবদলের কিংবা ধ্বনিতরঙ্গবাহক ছন্দকে আরও ইন্দ্রিয়সঞ্চারী করার জন্যে মাজাঘষার একটা পর্ব আসতে পারে। তবে তা সবক্ষেত্রে যে অপরিহার্য তা নয়। প্রথম রচনাই চূড়ান্ত রচনা হয়ে থেকে যায় অনেক সময়। কিন্তু বিশেষ কোনো তথ্য সংগ্রহ এবং কোনো তত্ত্ব সম্বন্ধে পরিচয় কবির স্বভাবজ কবিতা রচনায় প্রয়োজন হয় না। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে, যেমন উপন্যাসে বা নাটকে বা কাহিনি কাব্যে তার আবশ্যকতা থাকে নির্বাচিত বিষয়বস্তুর কারণে, কিন্তু কবিতায় তা থাকে না, যেহেতু কবিহৃদয় এবং রচিত কবিতার মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না। দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত পরিস্থিতির আহ্বানেই এ-কবিতা জন্ম নেয়। এবং তাকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত করার জন্যে কোনো পরিকল্পনারও আশ্রয় নিতে হয় না। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে অবশ্য বিশেষ বিষয় ও বিশেষ গঠনের জন্যে পরিকল্পনা এড়ানো যায় না। একটা ছক করতে হয় এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য ও তত্ত্ব জানতে হয়। তবু আমি বিশ্বাস করি যে, এই সব বিভাগেও সৃজনের প্রাথমিক ইঙ্গিত কবিতার মতোই আসে, অন্তত মহৎ স্রষ্টার ক্ষেত্রে। আর শুধু সাহিত্যেই বা কেন, যেকোনো শিল্পেই সৃজনের জন্মক্ষণ এইভাবেই দেখা দেয়।

যে আমি কবিতা লেখে, সে পৃথিবীর অধিবাসী একক মানুষ নয়। সে মানব সমাজের অন্তর্ভুক্ত একজন, এই তার অস্তিত্বের বাস্তব পরিচয়। মানুষ হিসেবে তার অভিজ্ঞতা, যা সমষ্টির সঙ্গে জড়িত, তার চেতনা ও চিন্তাকে গড়ে তোলে। কবি হৃদয়ের ক্রিয়াশীলতা এই মানবিক অবস্থান থেকেই। মানুষকে বাদ দিলে আর যা থাকে, পৃথিবীতে, তা তো অনন্তকাল এক নিয়ম বাঁধা স্থির ও অস্থির দৃশ্যাবলি। মানুষ কবির সংবেদন কতভাবেই বা সাড়া দিতে পারে তাতে? তার চলন সে ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এবং একরৈখিক হতে বাধ্য। কবির প্রতিক্রিয়ায় সীমাহীন বৈচিত্র্য এবং তাৎপর্য আসা সম্ভব শুধু তার মানুষিক অভিজ্ঞতার পৃষ্ঠপটে। কবিতার সৃজন তার মানব সত্তারই বিচ্ছুরণ, যে সত্তায় জাগ্রত থাকে তার সংবেদন এবং সঞ্চিত থাকে তার অন্তরের ও বাইরের অভিজ্ঞতা। মানুষকে বাদ দিলে তার সৃজনের কোনো ভিত্তি থাকে বলে আমি মনে করি না। কবির হৃদয় প্রত্যক্ষের অভিঘাতেই কথা বলে। প্রত্যক্ষ মানে এই পৃথিবী, তার পরিমণ্ডল, তার প্রকৃতি ও প্রাণী, গাছপালা, পাহাড়, জল, মরু,

পশুপাখি, সব এবং মানুষ। সবই তার কবিতাকে উৎসারিত করতে পারে। তবে কেন্দ্রে মানুষ। এবং মানব পরিস্থিতির বিকিরণ সব কিছুকেই ছোঁয়। আমি মনে করি, আনন্দ বিষাদ, বিক্ষোভ উল্লাস, প্রশান্তি যন্ত্রণা, অবসাদ উচ্ছলতা, মনের এত রঙে কবিতা যে ফোটে, তা ঐ পরিস্থিতিরই গূঢ় প্রতিক্রিয়ায় সুতরাং 'শিল্পের জন্যে শিল্প' তত্ত্ব আমার শূন্যগর্ভ মনে হয়। সেজন্যেই বোধ হয় এক এক সময় তার খুব জোর আওয়াজ ওঠে।

এখানে একটু ভুল বোঝার সম্ভাবনা হয়তো আছে। আমি মোটেই এমন কথা বলছি না যে, প্রতি পদে মানুষকে বা মানব দশাকে কবিতার বিষয় করতে হবে, নইলে রচনা ব্যর্থ। সত্যিকার কবির কাছে ব্যাপারটা হাস্যকর। মহাপৃথিবীর যে কোনো জিনিস তার সংবেদনে নাড়া লাগিয়ে তাকে কথা বলাতে পারে। কোনো ফর্মুলার নিয়ন্ত্রণ সেখানে চলে না। এ প্রসঙ্গে এক সতর্কবাণী আমার মুখে এসে যায়। প্রগতিশীলতার একটা ধারণা বেশ প্রচলিত যে, মানুষের বাস্তব অবস্থার উল্লেখই হল কবিতার প্রগতি চরিত্রের, অতএব তার যোগ্যতার অভ্রান্ত চিহ্ন। এ ধারণা বিপদ ঘটাতে পারে। কেননা এর ফলে আমরা এক ফর্মুলার কবলেই পড়ে যাই। অথচ কবির সংবেদন তার অধীন নয়। সে অধীনতা স্বীকার করলে সে কবিত্ব কৃত্রিমতারই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। আমি মনে করি, প্রগতিশীল কবিতার বৈধ জন্ম কবির অনুভূত অস্তিত্বে। কোনো পরিকল্পিত উদ্দেশ্য সেখানে থাকে না। যদি থাকে, তাহলে কবিতা কখনোই অন্যের মনে সার্থক সাড়া জাগাতে সমর্থ হয় না। আমার ধারণা এই যে, মানবিক পরিস্থিতির সঙ্গে কবির নাড়ীর যোগ আছে বলে তার মনোভূমি থেকে তা কখনো বিলুপ্ত হয় না। সেই অনুভব তার তন্তুতে তন্তুতে জড়ানো। সে নানা মুহূর্তে নানা বিষয়ে নানারকম কবিতা লিখতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে তার প্রকাশকে ঘিরে থাকে এক মানবিক আবহাওয়া, মানুষের কথা স্পষ্ট করে না বললেও তার মানসিকতার প্রতিফলনে টের পাওয়া যায় সেই ভাবনা। এই সঙ্গে এখানেও আবার আর এক ভুল বোঝার অবকাশ আছে। সেজন্যে এও আমি বলতে চাই যে, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কবিতা লেখা আমার আদৌ নিন্দনীয় মনে হয় না, বরং তার প্রয়োজনে আমি বিশ্বাসী। কিন্তু সে কবিতার ক্ষেত্র পৃথক। তা সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

কবিতার পৃথিবী কোনো কারণেই লোপ পাবে না যতদিন মাটির পৃথিবীতে মানুষ আছে। এবং তাকে নিয়ে বলারও শেষ নেই। আমার কথাও তো দেখি থামতে চায় না। প্রসঙ্গ যদি বা একটু ছোঁয়া গেল, বাকি থেকে গেল রূপায়ণ। তার আবার কত সমস্যা। কিন্তু এই জায়গাটা পৃথিবী নয়, সভাঘর। এখানে সময় মানতে হয়, শৃঙ্খলা মানতে হয়। এখানে আরম্ভ করলে শেষও করতে হয়। অতএব এই পর্যন্ত আমার বলা।

☐ *অনুষ্টুপ*, শারদীয়, ১৯৯০

আলপনা

সুবোধ ঘোষ

আলপনা চিত্রশিল্পের উদ্ভব কবে হয়েছিল তা আজকের দিনে গুণে বলা সম্ভব নয়, তবে এ রীতি যে প্রাচীনতম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আলপনা চিত্রশিল্প একান্তভাবে বাংলারই লোকশিল্প, এ কথা সত্য নয়। ভারতের নানা প্রদেশে, নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে এর প্রচলন আছে। এ শিল্প বিশেষ করে ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ, তাও সত্য নয়। ভারতের বাইরে সভ্য-অসভ্য জাতির মধ্যে এই শিল্পরীতির প্রচুর নিদর্শন রয়েছে।

উত্তর ভারতে গ্রামবাসীদের মধ্যে গৃহভিত্তি ও দেয়ালগাত্র চিত্রশোভিত করার রীতি বহুদিন থেকে চলে এসেছে। ছোটনাগপুরের আদিবাসী যারা, ওঁরাও ও মুণ্ডা — এদের মধ্যে আলপনার চর্চা খুবই প্রচলিত। ঘরের মেঝেতে গিরিমাটি দুধেমাটি ও আরও নানা রঙিন মাটির রঞ্জক তৈরি করে এরা যেসব চিত্র রচনা করে তা দেখতে যেমন নয়নাভিরাম, শিল্পোৎকর্ষের দিক দিয়েও তা প্রথম শ্রেণীর। এই শিল্পরীতির উৎস খুঁজতে গেলে প্রাক্ ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়ে এসে ঠেকতে হয়।

বাংলার যে আলপনা শিল্প, তার মধ্যেও আদিম শিল্পরীতির নমুনা সুস্পষ্টভাবে বর্তমান। যুগে যুগে এর মধ্যে নানা নতুন প্রথা ও বিষয়বস্তু যোজিত হয়েছে; কিন্তু আদিম মানুষের শিল্পপ্রাণতার প্রমাণস্বরূপ একটা অতি প্রাচীন রীতি এর মধ্যে আজও জড়িয়ে আছে। আলপনা চিত্রশিল্পকে লোকশিল্প বলা হয়। একে আটপৌরে শিল্প বলা উচিত। অজন্তা, ইলোরা, কোনারক, কাংড়া উপত্যকা বা আবু পাহাড়ের রীতি ও সার্থকতা ভিন্ন রকমের। এরা অনেকটা কীর্তিস্তম্ভের মতো। প্রতিভাবান শিল্পী তাঁর কীর্তি পাথরের স্তূপে ও গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ করে রেখে গেছেন। দশজনে তাই উপভোগ করেছে শুধু দর্শক হিসাবে। আলপনার চিত্ররীতি এ ধরনের নয়। এর সঙ্গে সংগীতের শিল্পধর্মের তুলনা হতে পারে। একজন গুণীর একটি গান শুধু পাঁচজনে শুনে উপভোগ করে না; পাঁচজনে সে গান গেয়েও উপভোগ করে। আলপনাও তেমনি। শুধু কটি দিনের জন্য, কয়েকটি প্রহরের জন্য মানুষ টেনে আনে তার মনের সুগুপ্ত শিল্পীকে। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকে কয়েকটি ছবি; তার পরেই তাকে মুছে ফেলা হল। সুতরাং আটপৌরে চিত্রশিল্প বলে যদি কিছু থাকে, যাকে অন্নপান বা পরিচ্ছদের মতো আমরা অহরহ প্রয়োজন বোধে ব্যবহার করি, তা এই আলপনাশিল্প।

কেউ কেউ বলে থাকেন, প্রাচীন চিত্রাক্ষরের (heiroglyph) ক্রমবিবর্তন হয়ে নাকি আলপনার সৃষ্টি হয়। ভাষার লিখন রীতিতে যেদিন বর্ণের উদ্ভব হল সেদিন আর চিত্রাক্ষরের বোঝা বইবার কারণ রইল না। কিন্তু পুরাতন কালের সাধনালব্ধ চিত্রাক্ষরকে মানুষ

আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে পারল না। চিত্রাক্ষরকে টেনে আনা হল চিত্রের ক্ষেত্রে। তারই রূপের খানিকটা অদলবদল করে যে সরল ও লোকগ্রাহী চিত্রসৃষ্টির প্রথা উদ্ভূত হল তাই নাকি আলপনাশিল্পের আদিপুরুষ।

এ অনুমানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কারণ রয়েছে। চিত্রাক্ষর থেকে আলপনাচিত্রের জন্ম, এটা কষ্ট-কল্পনা মাত্র। কেননা চিত্র আগে, অক্ষর পরে। অক্ষর থেকে চিত্রে আসবার কোনো কারণ থাকতে পারে না। প্রাকইতিহাসের মানুষও ছবি আঁকত। আলপনারও সৃষ্টিকর্তা তারাই। চিত্র থেকে অক্ষরের জন্ম হয়েছে, তারপর অক্ষর তার ভিন্নপথে উৎকর্ষ অর্জন করে এসেছে।

সুদূর অতীতে আলপনাচিত্রের যে রীতি ছিল আজ তা নেই। কিন্তু নিকট অতীতে যে রীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল আজও তার ব্যতিক্রম হয় নি। অর্থাৎ অনেকদিন শুধু একটা convention-এর অধীনে গতানুগতিকতা করে আসা হয়েছে। এও অনেকটা হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের প্রতিমালক্ষণ অনুসারে মাছিমারা ভাস্কর্যচর্চার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আজকের আলপনাশিল্প সুপ্রচলিত বটে, কিন্তু এর রীতি প্রাণহীন হয়ে গেছে। রীতির উৎকর্ষ অনেকদিন আগেই মন্দীভূত হয়েছে। বাংলার এই রীতিগত আলপনার কতকগুলি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, এর উপকরণ। এত রং থাকতে পিটুলি গুলে একটা অতি দুর্বল সাদা রং-এর ব্যবহার। এর মধ্যে অতি দূর ইতিহাসের স্মৃতি প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে সুপ্রাচীন কালের অতি ক্ষীণবুদ্ধি বর্বর মানুষের হাত দেখতে পাওয়া যায়। আঙিনায় গোময় লেপন যেমন বুদ্ধিহীন বর্বর মানুষের রীতি ছিল — যখন মাটি আর জল মিশিয়ে একটা কাদার তাল প্রস্তুত করার মতো বুদ্ধি ও প্রতিভা মানুষের ছিল না।

যদিও সাদা রং-এর ব্যবহারই আলপনাশিল্পে সব চেয়ে বেশি প্রচলিত, অন্যান্য রং-এর ব্যবহার একেবারে নির্বাসিত নয়। মাঘমণ্ডলের ব্রতে রং-এর বিচিত্রতা আছে। কিন্তু রং-এর নাম শুনলে হাসি পায়; সেগুলো আবার আমাদের সেই অতিবৃদ্ধ পিতৃপুরুষদের দরিদ্র সংসারের নিকট-স্মৃতি জাগিয়ে তোলে — প্রাক ইতিহাসের মানুষের নগণ্য শিল্পোপকরণ। সবুজ রং-এর জন্য বেলপাতা গুঁড়ো, হলদে রং-এর জন্য হলুদ, কালো রং-এর জন্য ভুসা, আর লাল রং-এর জন্য ইঁট।

আলপনাচিত্রের টেকনিকের বৈশিষ্ট্য এর রেখাঙ্কনের পদ্ধতিতে। কোথাও রেখার ঋজুতার বালাই নেই। প্রত্যেকটি টান সুবলয়িত — প্রত্যেকটি বর্তুল। এর মধ্যে জ্যামিতিক সৌকর্য কোথাও নেই। শুধু রেখার হিল্লোল — কোথাও ঋজু রুক্ষ আঁচড় বা কোণের চিহ্ন নেই। নদীপ্রবাহের মতো রেখাগুলির ছন্দই আলপনা চিত্রের টেকনিকের প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

বাংলার ব্রত পার্বণের সঙ্গে আলপনাচিত্র একাত্মভাবে সংযুক্ত। এও আলপনাচিত্রের প্রাচীনতার আর একটি প্রমাণ। বাংলার ব্রতধর্ম বেদ বেদান্ত পুরাণ বা তন্ত্র থেকে আসে নি। আদিম বাঙালির ধর্মোৎসব এই ব্রত। এর আখ্যায়িকাগুলিও প্রাচীন ইতিহাসের টুকরো টুকরো এক একটি বিস্মৃত অধ্যায়।

কিন্তু আলপনা যতদিন প্রতিভার আওতায় ছিল ততদিন এর ক্রমোৎকর্ষ হয়ে এসেছে।

তাই দেখতে পাই বাংলার আলপনায় নানা পৌরাণিক দেবদেবীর ভিড়। আবার মনসা রক্ষাকালীও আছে। এমনকী, বনদেবীর পূজার কথাও চিত্রে আছে। বনদেবীর ছবি। এ নিকট অতীতেরও ইতিহাস নয়। আলপনা ও ব্রত কত পুরাতন তার প্রমাণ এই। এমন দিন ছিল যখন অরণ্যের মধ্যেই মানুষকে সংসার পাততে হয়েছিল, সেদিন সে পুজো করত বনদেবীকে।

'তারা-ব্রত'র আলপনার মধ্যে আদিম মানুষের কল্পনা কুশলতার নিদর্শন পাওয়া যায়। পৃথিবীর গাছপালা পশুপাখি ছাড়াও এতে আছে চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্র। আকাশমণ্ডলে যে জ্যোতিষ্করাজ্য প্রতি রাত্রে ফুটে ওঠে তা মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনাকে চিরকাল উদীপ্ত করে এসেছে। তারা ব্রতের আলপনাচিত্রে সৌরজগতের কল্পনাবদ্ধ একটি প্রতিচ্ছবি দেবার প্রয়াস রয়েছে। আলপনা বৃত্তের শীর্ষে স্ফুরিতরশ্মি সূর্যদেব — মধ্যে ষোড়শ নক্ষত্র সমন্বিত বিশ্বজগৎ আর নিম্নে পূর্ণচন্দ্র।

আলপনার টেকনিকে বৃত্তের স্থান খুব বেশি। প্রত্যেক আলেখ্যতে দেখা যায় একটি বড়ো বৃত্ত। এই বড়ো বৃত্তের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ছোটো ছোটো কয়েকটি বৃত্ত। বৃত্তের পরিধিগুলির মাঝামাঝি যে স্থান তা নানা সূক্ষ্মতর চিত্রকার্যে অলংকৃত।

আলপনাশিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এ শিল্পের শিল্পী প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নারী। বর্তমানে অবশ্য কোনো পুরুষকে আলপনাশিল্পে দেখা যায় না। কিন্তু এককালে এ সাধনার বিস্তর পুরুষ সাধক ছিল, এমন অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। যেদিন থেকে পরিবারবন্ধন ও গৃহকর্মের একটা রীতি প্রচলিত হল সেইদিন থেকেই এই শিল্প সাধনার কর্তব্য মেয়েদের উপরই ন্যস্ত হল; যে কারণে রন্ধন প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকটি কর্তব্য মেয়েদেরই উপর বিশেষ করে অর্পিত হয়েছে।

ময়মনসিংহ গীতিকায় আমরা কাজলরেখার কাহিনি পড়ি। এককালে মেয়েদের ব্রতনিষ্ঠা ও তার সঙ্গে আলপনানিষ্ঠা কতখানি ছিল, কাজলরেখার-এ কাহিনিতে তার বর্ণনা আছে। — শালি ধান্যের চাল একরাত্রি আগে ভিজিয়ে রেখে পরদিন পিটুলি করে কাজলরেখা আলপনা আঁকতে বসল। কত ছবি সে আঁকল তার একটা ফিরিস্তিও আছে। মনসা, বনদেবী, শিব-পার্বতী, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, রক্ষাকালী, কার্তিক, গণেশ, রাম-সীতা, পুষ্পক-রথ, সমুদ্র, সূর্য, চন্দ্র; আরও আঁকল, গভীর বনের মধ্যে জীর্ণ মন্দিরের ভিতর মৃত রাজকুমারের মূর্তি। বলা বাহুল্য, এতগুলি বিষয়বস্তু যে চিত্রণে ফুটে উঠেছিল তার টেকনিকে নিশ্চয়ই বিচিত্রতাও অজস্র পরিমাণে ছিল। নইলে পিটুলির মতো মামুলি একটা উপকরণে এত রসাঢ্য চিত্রাঙ্কন সম্ভব হত না।

এখন প্রশ্ন, আলপনা চিত্রশিল্পের কোনো সার্থকতা আজকের দিনে আছে কি না। আলপনা চিত্রশিল্পের সার্থকতা তো আছেই। এর প্রয়োজন আজকের দিনে আরও বেশি করে উপলব্ধি করবার সময় এসেছে। আজকের দিনের প্রতিভাবান শিল্পীর মহৎ একটি কর্তব্য রয়েছে এই দিকে। আলপনাকে তার প্রাচীন রীতিবন্ধন থেকে মুক্তি দিতে হবে, এর (archaid) দুর্বলতা ঘুচিয়ে নতুন রূপ দিতে হবে। কারণ এতটা লোকময় শিল্প বাংলায় দ্বিতীয় আর নেই। আলপনাকে যদি নতুনভাবে শিল্পপ্রাণ করে তুলতে পারা যায়, তবে তা জাতিকে মনে প্রাণে শিল্পপ্রবণ করে তুলবে। তাতে জাতির সমষ্টিগত প্রতিভাকে উত্তরোত্তর

নব নব সৃষ্টির প্রেরণায় টেনে নিয়ে যাবে। পিটুলিশ্রদ্ধা ছেড়ে দিয়ে, পেঁচা-পেঁচির প্রতি অতি ভক্তি না দেখিয়ে আজ শিল্পীকে গ্রহণ করতে হবে নানা রং-এর তুলিকা। তাকে নতুন দৃশ্য বস্তুর অবতারণা করতে হবে, আধুনিক মানুষের কল্পনাকে রূপায়িত করতে হবে।

ব্যবহারিক শিল্পের দিক দিয়ে আলপনার সার্থকতা খুব বেশি। শাল আলোয়ানের শাড়ির পাড়, কার্পেট, জাজিম ও গালিচা, চা-এর ট্রে, মৃন্ময় বা দারুময় গৃহোপকরণ এ সব সামগ্রীকে আলপনারীতিতে সুশোভিত করা চলতে পারে। এতে সামাজিকভাবে জাতির রুচির উৎকর্ষ সাধিত হবে।

আলপনা চিত্রশিল্পের কথা প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্বতই মনে আসে। ভারতীয় অথবা বঙ্গীয়, কোনো সুপ্রাচীন শিল্পরীতি আজ বেঁচে নেই। অজন্তার চিত্রকর যেদিন তার তুলি নামিয়ে রেখে গেছে সেই দিন থেকে সে চিত্ররীতিরও আয়ু ফুরিয়ে গেছে। কোনারক ভুবনেশ্বর গড়েছিল যে ভাস্কর তারা আজ নেই, তাদের শিল্পরীতিও আজ নেই। নৃত্য এবং নাট্যেরও এই একই পরিণতি। এ থেকেই মনে সংশয় হয় যে ওইসব শিল্পরীতি দশের মধ্যে কখনও প্রসার লাভ করেনি, অথবা প্রসারের চেষ্টা হয় নি। জাতি ও শিল্পীর মধ্যে একটা আভিজাত্যের দূরত্ব ছিল। তাই এ শিল্পরীতির পরিণতি যা হওয়া উচিত ছিল তাই হয়েছে। অন্যদিকে দেখতে পাই, আলপনা চিত্রশিল্প আজও বেঁচে আছে। এর এই প্রাণবত্তার মূলে হল তার লোকময়তা। একটা বিশ্ববিদ্যালয় যা করতে পারে না, আলপনা প্রথা তাই করেছে। শিল্পকে সমাজের রক্তমাংসের ভিতর এমনভাবে আত্মস্থ করে নেবার উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যায়।

কাজেই আলপনার উৎকর্ষ সাধনের যে কথা বলা হয়েছে, সমস্ত জাতিকে নবতর শিল্পসাধনায় দীক্ষিত করার তাই একটা পন্থা। কারণ আমরা বিশ্বাস করি না যে, শিল্পের সার্থকতা শুধু গুটিকয়েক শিল্পীর ব্যক্তিগত কল্পনা স্ফূর্তি বা কয়েকটি রসিকের তৃপ্তি সাধনের জন্য। শুধু রাজরাজড়া, ধনী ও গুণীর স্টুডিয়ো বা বৈঠকখানা, অথবা সরকারি গ্যালারি বা মিউজিয়ম সুশোভিত করার জন্য শিল্প — এ ধারণাকে আমরা আমল দিই না। আলো বাতাসের মতো শিল্পকেও আমরা জাতির গার্হস্থ্য জীবনের সম্পদরূপে দেখতে চাই।

আলপনা একদিন এই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অখ্যাতির আড়ালে তাকে অনেকদিন চাপা পড়ে থাকতে হয়েছে। কিন্তু তার সজীবতা আজও লুপ্ত হয় নি। আজকের দিনে চারদিকে লোকশিক্ষার বুলি শুনতে পাই। লোককে অ আ ক খ শেখাবার জন্য এই বুলি। এতেই গলদ্‌ঘর্ম হবার উপক্রম। কিন্তু লোক শিল্পশিক্ষার যদি প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করা হয় তবে তাতে এই গলদ্‌ঘর্ম অবস্থার আশঙ্কা নেই। শিল্পশিক্ষার জন্য সত্যিকারের বিদ্যাব্যবস্থা আমাদের এই আলপনা প্রথার মধ্যেই রয়েছে।

□ *শিল্পভাবনা*, ১৯৯৬

রবীন্দ্রনাথ ও সাম্যচিন্তা

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বাইরের পৃথিবীর থেকে সাম্যচিন্তা যখন আমাদের দেশে এসেছে, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে ধীরে ধীরে তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তখনো যেহেতু রবীন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন এবং যেহেতু তাঁর চিত্ত ছিল নিরতিশয় সংবেদনশীল, যুগ ও জীবনের সকল ব্যাপারেই কম-বেশি সজাগ, তাই এ চিন্তা তাঁকেও স্পর্শ করেছে। তাঁর শেষ জীবনের রচনায় ফুটেছে তার স্বাক্ষর। সেই আলোকেই তাঁর জীবন ও মননের এই পর্বটি বিচার্য। কিন্তু মূল প্রসঙ্গে আসার আগে রবীন্দ্র জীবনের ইতিহাস পূর্বাপর পর্যালোচনা করে দেখা দরকার যে তাঁর মনন ও চিন্তনের গতি প্রকৃতি শুরুতে কি ছিল, কোন দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন আশ্রয় করে তিনি যাত্রারম্ভ করেছিলেন, তারপর ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে কত রূপান্তরের স্রোত অতিক্রম করে তিনি সমাপ্তির সোপানে পৌঁছেছিলেন। আলোচনার মাধ্যমে এই চালচিত্রটি সামনে তুলে ধরা না হলে, বক্তব্য বিষয়টি যথাযথভাবে পরিস্ফুট বা প্রতিষ্ঠিত হবে না। যে কোনো মহান স্রষ্টা বা শিল্পীর জীবনেই সূচনা, বিকাশ, ব্যাপ্তি ও পরিণতির কতকগুলি স্তর থাকে, যা একের পর এক অতিক্রম করে তবে তিনি পূর্ণ প্রকাশে উপনীত হন। রবীন্দ্রনাথও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নন।

রবীন্দ্র-জীবন ও মননের সামগ্রিক ইতিহাসের উপর চোখ বোলালে, আমরা তাঁর ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে পরের পর চারটি অধ্যায়ের দেখা পাই। প্রথম অধ্যায়ে তিনি বাংলা ও বাঙালির কবি। সেখান থেকে পরের ধাপে তিনি উন্নীত হন ভারতের কবিতে। এর পরবর্তী ধাপে তাঁকে বিবর্তিত হতে দেখি বিশ্বকবিতে এবং সর্বশেষ অধ্যায়ে তিনি রূপান্তরিত হন দেশকালের গণ্ডী বিমুক্ত নির্বিশেষ মানবতার কবিতে। দেশ ও দুনিয়ার সামাজিক আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক বিচিত্র কারণ-পরম্পরায় এই বিবর্তন অনিবার্যভাবেই ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু নানা সাংসারিক সংকট সমস্যা এবং আঘাত সংঘাতও সমান্তরালভাবে তাঁর মনন চিন্তনের রাজ্যে তরঙ্গিত হয়ে বার বার তাঁর সৃজনী প্রতিভাকে নূতন সাজে সাজিয়েছে। তাঁর এই নিত্য চলমান মানসিকতার স্বরূপটি উপলব্ধি করতে না পারলে, যথার্থভাবে রবীন্দ্র সৃষ্টির অন্তর্লোকে পৌঁছান সম্ভব হবে না কোনোদিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হয় না বলে তাঁকে কেউ বলেন জাতীয়তাবাদের মুখ্য প্রবক্তা। কেউ দেখেন শাশ্বত ভারত সংস্কৃতির মূর্ত বিগ্রহরূপে। কেউ বোঝান আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও বিশ্বশান্তির প্রতিভূ, কেউ বা সত্যদ্রষ্টা ঋষি বলে। কোনোটাই বলাবাহুল্য ভুল নয়, কিন্তু প্রত্যেকটাই আংশিক বা একদেশদর্শী অভিধা। তিনি ছিলেন সবগুলির সমন্বয়িত প্রতীক অর্থাৎ ছিলেন সব কিছুই,

আবার সব কিছুর উর্ধ্বেও এবং সেখানে তিনি সমসাময়িকদের সীমানা ছাড়িয়ে একক গৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন বিশ্ববাসীর সামনে।

গোড়াতেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ যাত্রা শুরু করেন বঙ্গভূমি ও বাঙালির কবিরূপে। তার মানে এই নয় যে সমগ্র মনুষ্যজাতি ও বিশ্বপৃথিবীর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি সীমাবদ্ধ বাঙালিয়ানার অনুশীলন করেছিলেন শুধু। বিশাল এই পৃথিবীর মানুষ ও তার বিচিত্র সুখ-দুঃখের কথা তাঁর চিত্তে নানা উপলব্ধির তরঙ্গ তুলেছে। কবিতায় ও প্রবন্ধে তার অভিব্যক্তিও হয়েছে ইতস্তত। আসলে তাঁর দৃষ্টি চিন্তা ও ভাবাবেগ উৎসারিত হয়েছে প্রধানত বাংলা ও বাঙালিকে কেন্দ্র করে। যৌবনে তিনি শিলাইদহে বাসা বাঁধেন ঠাকুর পরিবারের জমিদারি তদারকির ভার নিয়ে। সে সূত্রেই হয় তাঁর পল্লিবাংলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ। কখনো তিনি স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের নিয়ে কুঠিবাড়িতে বাস করতেন। কখনো পদ্মায় ভাসানো নৌকোয় থাকতেন। কখনো বা পাল্কি চেপে গ্রামে গ্রামান্তরে যেতেন। এইভাবেই যেমন তিনি চাষি, মাঝি, দোকানি, হাটুরে, ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে মেলামেশার অবকাশ পান, তেমনি পান গ্রামের পোস্ট মাস্টার, স্কুল শিক্ষক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ও আলাপ আলোচনার সুযোগ। কলকাতার অভিজাত গৃহে জন্মে ও অভিজাত পরিবারের মধ্যে বর্ধিত হয়ে এই সুযোগ তাঁর হয় নি। এদিক থেকে পাতিসর ও শিলাইদহে আনাগোনা ও বসবাস তাঁর জীবনে যথার্থই একটি মূল্যবান অধ্যায়রূপে গণ্য হতে পারে। এই সময়ের অভিজ্ঞতা তাঁর ব্যক্ত হয়েছে ছিন্নপত্রের চিঠিগুলিতে এবং গল্পগুচ্ছের বিচিত্র গল্পমালায়। আর ছবি ও গান, মানসী, সোনার তরী এবং খেয়ার কবিতাগুলি ত বঙ্গভূমির গাছপালা, নদীনালা, ফুল, পাখি ও বহু বিচিত্র পালপার্বণের ছন্দোময় আলেখ্য বললেই হয়। বাংলার প্রকৃতি ও প্রাণকে ছত্রে ছত্রে রূপ দিয়েছেন তিনি অপরূপ ভাষার ইন্দ্রজালে। বহু বিচিত্র লোকসঙ্গীতের ঐশ্বর্য, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি তাঁর চিত্তকে স্পর্শ করেছে। একের পর এক গানের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়েছে এই মনোরম সুরগুলি।

বাংলাদেশের অন্তর্লোক থেকে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে উঠেছে যে স্বদেশি আন্দোলন, তাতে তাঁকে আমরা দেখি একটি মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। তাঁর জাতীয়তামূলক গানগুলির জন্ম এই সময়। পল্লি বাংলার জলকষ্ট, অজন্মা মহামারী প্রভৃতির প্রসঙ্গ তিনি আলোচনা করেছেন সাধনা পত্রিকার প্রবন্ধগুলিতে। সমবায়নীতি শিক্ষার বাহন লোকহিত কণ্ঠরোধ রাজা প্রজা প্রবন্ধগুলি সবই উৎসারিত হয় স্বদেশি আন্দোলনের উত্তাপে। বাংলা ও বাঙালির অখণ্ডতার প্রতীকরূপে রাখীবন্ধন উৎসব তিনি নূতন করে প্রবর্তন করেন। এই উপলক্ষেই তাঁর প্রসিদ্ধ গান : 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'। অনেকে এই সময় মনে করেছিলেন, বুঝি বিপিনচন্দ্র পাল ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মতো তিনিও আপাদমস্তক রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়বেন। কিন্তু ইতিহাসের গতি হল অন্যরকম। স্বদেশি আন্দোলন তার উদ্দিষ্ট ফললাভ করল, বঙ্গভঙ্গ রহিত হল। কিন্তু শান্তিপূর্ণ বয়কট বা বিদেশি পণ্য বর্জন আন্দোলন থেকে ক্রমে সন্ত্রাসের আগুন শিখা বিস্তার করল। বোমা পিস্তলে হল তার অভিব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিপ্রবণ কবিমন ঘা খেয়ে পিছু হটে এল। এদিকে ঠাকুরদের জমিদারিতে হল গণ্ডগোলের ছায়াপাত। নূতন একটা কোনো কর্মপন্থা খুঁজতে লাগলেন

তিনি। কিছুকাল আগেই বীরভূমের বোলপুর গ্রামে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন তিনি। তিনি চেয়েছিলেন দেশের নবীন প্রজন্মকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ সম্পদে নূতন করে গড়ে তুলতে। তাঁব কল্পনায় ছিল তথাকথিত তপোবন সংস্কৃতিব একটি কাঠামো। তারই সংগঠনে এবার তিনি একান্তভাবে সস্ত্রীক মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু অল্পদিনেই পত্নীরও হল জীবনান্ত। এই শোক তাঁকে সাংসারিক জীবনের মৃত্তিকা থেকে প্রায় উন্মূলিত করে ফেলল। অভিভূত মন নিয়ে তিনি খুঁজতে লাগলেন আঁকড়ে ধরার মতো কোনো ধ্রুব আশ্রয়। প্রাচীন ভারতের বেদ উপনিষদ বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র কালিদাস ভবভূতি বাণভট্টের রচনা সন্ত-সাধু ও বৈষ্ণবদের পদাবলী তাঁকে দিল এক নূতন ভুবনের সন্ধান। তিনি বিবর্তিত হলেন ভারতের কবিতে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আসার আগে একটা প্রশ্ন উঠে। স্বদেশি আন্দোলন জাতীয় জাগরণের গণনীয় একটি অধ্যায় হলেও তার সবটুকুই কি শ্রেয় বস্তু বলে গণ্য হতে পারে? একক ভাবে রবীন্দ্রনাথ হয়ত দায়ী নন, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব বীরাষ্টমী, রাখীবন্ধন, গঙ্গাস্নান ও বন্দেমাতরমের রসায়নে সমগ্র আন্দোলনকে নিজেদের অজ্ঞাতেই কিছুটা পরিমাণে হিন্দু আন্দোলনে রূপান্তরিত করে ফেলেন। তার প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম সমাজ ক্রমশ পিছু হঠা শুরু করেন এবং তাঁদের সংহত মনোভাব প্রকাশমান হয় আলিগড় আন্দোলনে। তখনই কথা ওঠে যে ভারতীয় মুসলমানরা একটি পৃথক জাতি এবং তাঁদের সংস্কৃতি আলাদা। এই মনোভাবকে পুষ্ট ও সঞ্জীবিত করতে থাকেন বিদেশি শাসকবর্গ এবং ঢাকার নবাব সলিমুল্লা সাহেবের অর্থবলে ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হল মুসলিম লিগ। আর তখন থেকে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ ধূমায়িত হতে আরম্ভ করে। ১৯৪৭ সালে যে দ্বিজাতিতত্ত্বের খড়্গে ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হল এবং পূর্ব ও পশ্চিমে বৃহৎ দুই ভূখণ্ড মূল মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তান নামে স্বতন্ত্র একটি দেশরূপে প্রকাশমান হল, তা স্বদেশি আন্দোলনের এই অবিমৃষ্যকারিতা-সম্ভূত কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে। তাছাড়া ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ রহিত হলেও ১৯১২-তে যখন বৃহত্তর বিভাগ বঙ্গভূমির ওপর খড়্গ নেমে আসে, শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, কাছাড়, মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চলগুলি বাংলার ভৌগলিক আয়তনের বাইরে চলে যায়, তখনো স্বদেশি যুগের নেতারা সবাই জীবিত। তাঁরা কেউ প্রতিবাদে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। সেই জন্যে স্বদেশি আন্দোলনের সাহস, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমকে স্বীকার করেও তার মহিমান্বিত ব্যাখ্যায় অনেকে বিরত থাকেন। তবে এই আন্দোলন যে রবীন্দ্রনাথের লেখনীকে অনেকগুলি অমূল্য গান ও প্রবন্ধের ফসল বিতরণে উৎসাহিত করেছে, এ কথা সানন্দে স্বীকার করতে হবে।

যাই হোক বাংলার কবি থেকে কিভাবে ও কোন্ কারণ পরম্পরায় রবীন্দ্রনাথ ভারতের কবিতে বিবর্তিত হন, তাঁর আভাস ইতিপূর্বে দিয়েছি। পরের এই অধ্যায়ে দেখি তিনি নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি প্রভৃতির গানগুলি রচনা করেন। লেখেন ভারতবর্ষের ইতিহাস নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ। রামায়ণ এবং কালিদাস ও বাণভট্টের রচনাগুলির প্রকৃতি পর্যালোচনা করেন। বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের আচরণ বিশুদ্ধি ও সন্ত সাধকদের প্রেমধর্মের অন্তরঙ্গ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর এই সময়কার বিচারে ভারতীয় জীবন ও মননের প্রকৃতি চিরদিনই সমন্বয়মুখী। সুপ্রাচীনকাল

থেকে নানা জাতি ও সংস্কৃতির প্রবাহ এসে স্পর্শ করেছে ভারতবর্ষের মৃত্তিকাকে। ভারতবর্ষ কারোকেই দূর বা পর করে রাখে নি। তাঁর ভাষায় ভারতীয় জাতীয়তার উদ্বোধন হয়েছে, সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে। এই অধ্যায়ে তাঁর সবচেয়ে গণনীয় রচনা হল গোরা উপন্যাস। তাতে তিনি ভারতীয় সমন্বয় দর্শনের মর্মবাণী ব্যক্ত করেছেন গোরার জীবনদ্বন্দ্ব ও তার সার্থক পরিণতির মাধ্যমে। গোরা ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী, নৈষ্ঠিক হিন্দু আচরণের অন্ধ সমর্থক। সে কপালে গঙ্গা মৃত্তিকায় তিলক কাটত। আহারে আচরণে পোশাকে পরিচ্ছদে সে এতটুকু ব্যতিক্রম বরদাস্ত করত না। বিদেশিদের, বিশেষ করে ইংরেজদের নামোল্লেখে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। এহেন সাগ্নিক হিন্দু গোরা হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল যে সে হিন্দু নয়, ভারতীয়ও নয়, সিপাহী বিদ্রোহের আমলে হিন্দু গৃহে আশ্রয় গ্রহণকারিণী জনৈকা আইরিশ মহিলার সন্তান। আনন্দময়ী তাকে মায়ের স্নেহে লালন করেছিলেন। তখনই চোখের সামনে থেকে মোহাবরণ সরে গেল তার শাশ্বত সমন্বয়ের তীর্থরূপে সে আবিষ্কার করল ভারতবর্ষকে। সে আনন্দময়ীকে প্রণাম করে বললো, মা তুমিই আমার

ভারত ইতিহাসের এই সমন্বয়মুখী ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের অনেক প্রবন্ধেও স্থান পেয়েছে। রিলিজিয়ন অব ম্যান নামক ইংরেজি বইয়ে এই ব্যাখ্যা পেশ করেছেন তিনি পরবর্তীকালে বিদেশি পাঠকদের কাছেও। বস্তুত এই ব্যাখ্যা নিরপেক্ষ বিচারে একপেশে, সেই কারণেই অনৈতিহাসিক। সমন্বয় যদি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সহজাত প্রবণতা হয়, তাহলে ভারতবর্ষে কোটি কোটি অস্পৃশ্য অন্ত্যজ শূদ্র দাসেরা এলেন কোথা থেকে? ভারতবর্ষে যে প্রাগার্য জাতি গোষ্ঠীরা আর্য অভিযানে পরাস্ত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, তাঁরাই কি, এই সর্বাধিকার বঞ্চিত শূদ্র দাসেরা নন? তাঁদের শিক্ষার অধিকার সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হয়েছে। তাঁদের কানে বেদমন্ত্র ঢুকলে গরম সীসা ঢালার আদেশ দেওয়া হয়েছে শাস্ত্রে। তাঁরা তপস্যা করলে শিরচ্ছেদ করা হয়েছে, যার প্রমাণ রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনিতে পাওয়া যাবে। অথচ এই শূদ্র জাতির পুরুষের মেহনৎ ও নারীর সম্ভ্রম দু-হাতে ভাঙ্গান হয়েছে উপরতলার স্বার্থে। বারো আনা মানুষকে একান্তরিত করে রেখে মুষ্টিমেয় মানুষের কল্যাণ সাধন কি যথার্থ সমন্বয় বলে অভিহিত হতে পারে? অথচ এই মহিমান্বিত ব্যাখ্যাই শোনানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথও করেছেন তারই পুনরানুবৃত্তি। ভারত ইতিহাসের দীর্ঘ যাত্রাপথে দেখি একমাত্র বৌদ্ধেরাই উন্মুক্ত করেছিলেন শূদ্রদের সামনে বিচিত্র সুযোগের দরজা। নালন্দা তক্ষশীলা ও উদ্দণ্ডপুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথ অবারিত করে দিয়েছিলেন তাঁরা সকলের জন্যে এবং স্বীকৃতি দিয়েছিলেন পালি ও প্রাকৃত লোকভাষাকে শিক্ষার ও শাস্ত্ররচনার মাধ্যমরূপে। বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয়ের পর আবার যখন বর্ণহিন্দুদের অভ্যুদয় হল কুমারিল ভট্ট ও শংকরাচার্যের নেতৃত্বে, তখন বৌদ্ধরা আবার অস্পৃশ্য হলেন, অথবা আউল বাউল কর্তাভজা ইত্যাদি নানা নামে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়লেন সমাজচ্যুত সম্প্রদায়রূপে। বল্লালী কৌলীন্য এই শেষোক্তদের কপালে অচ্ছুতের ছাপ এঁকে দেয়। চৈতন্যের আদেশে নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র এঁদের ঘরে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন, যার পরিণামে সনাতনীরা

চৈতন্যকেই দেশছাড়া করে দেন, ভক্ত জীবনীকাররা যা তাঁর সন্ন্যাস ও প্রব্রজ্যা নামে অভিহিত করেছেন সত্যকে আবৃত করে।

লক্ষণীয় যে এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখি অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন নৈষ্ঠিক হিন্দু রূপে। ব্রাহ্মণ্য ভারতের ও তপোবন সংস্কৃতির শ্রদ্ধাবান ব্যাখ্যাতারূপে তিনি নবভাবে আবির্ভূত হন দেশের সামনে। প্রথম অধ্যায়ে যাঁরা তাঁর কবিতা ও গানের বিরোধী ছিলেন, নিন্দা করতেন তাঁর নূতন অলংকার বিন্যাসের, তাঁরা আস্তে আস্তে তাঁর অনুরাগী হতে শুরু করেন এর পর। বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হলেও এবং উপনিষদভিত্তিক অধ্যাত্ম ব্যাখ্যাতারূপে শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালায় বার বার আত্মপ্রকাশ করলেও কোনোদিন কট্টর ব্রাহ্ম ছিলেন না। সনাতন হিন্দুধর্মের দেব প্রতীকগুলি, বিশেষ করে রুদ্ররূপী শিব, কল্যাণরূপিণী লক্ষ্মী ও প্রজ্ঞারূপিণী বাণীকে তিনি বার বার রূপায়িত করেছেন তাঁর রচনায়। যদিও কালী করাল রূপিণীরূপে দেখা দিয়েছেন মাত্র বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্যে ও বিসর্জন নাটকে। আর কোথাও তাঁর বিশেষ দেখা মেলে না। তবে রাধাকৃষ্ণের উপস্থিতির অভাব নেই। যেখানে সরাসরি রাধাকৃষ্ণ নেই, সেখানেও রতি - ভাবাবিষ্ট যুগল আরাধনার সুরটি প্রচ্ছন্ন নয়। তবে লক্ষণীয় যে ব্রহ্ম ব্যাখ্যানে যেমন তিনি অদ্বৈত বেদান্তের অনুগামিতা করেন নি কোথাও, তেমনি কান্তারসের অবতারণায় চৈতন্য প্রচারিত অচিন্ত্য ভেদাভেদের তত্ত্ববস্তুও স্পর্শ করেন নি। ও পথের পথিকই ছিলেন না তিনি। অর্থাৎ তাঁর ধর্মবোধ নৈষ্ঠিক শাস্ত্রভিত্তিক ছিল না। ছিল সৌন্দর্যবোধ ও মানবপ্রেমভিত্তিক। যৌবনে তিনি ভানুসিংহের পদাবলী লিখেছিলেন বিদ্যাপতির ভাষাভঙ্গি অনুসরণ করে। সুললিত পদবিন্যাসের গুণে তা মনোরমও হয়েছে। কিন্তু চক্ষুষ্মান পাঠকের কাছে ওগুলি মোটেই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব রসের কবিতা নয়, আধুনিক কবিতাই ব্রজবুলির ছাঁচে ঢালাই করা। অনুরূপভাবে যাঁরা গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যের গানগুলিতে বৈষ্ণবীয় অতীন্দ্রিয় রসের সন্ধান পান, কিম্বা পান বেদান্ত দর্শনের মর্মবাণী, তাঁদের বক্তব্যও সঠিক বুঝতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদ থেকে গীতাঞ্জলি কবিতা ইংরেজ শ্রোতাদের কাছে আবৃত্তি করে এগুরুজ বহুজনের কাছে শুনেছেন, ওগুলি বাইবেলীয় মহাসঙ্গীতের কোনো না কোনো গানের সমধর্মী। এইভাবে হাফেজ সাদী রুমী জামী প্রমুখ সূফী কবিদের পদাবলীর সমধর্মী বলেও হয়ত কেউ ব্যাখ্যা করবেন। প্রকৃতপক্ষে এই সমধর্মিতাগুলি সবই আকস্মিক ও স্বয়মাগত। খ্রিস্টিয় তত্ত্ব ও সূফী তত্ত্বের গভীরে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রবেশ ছিল বলে মনে হয় না। বরং দাদু কবীর মীরা ও রজ্জব লালন প্রমুখ সন্ত কবিদের ও বাউলদের রচনা তিনি গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন। মোটের উপর আদি উৎস যাই হোক, ধর্মের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যথেষ্ট উদার ও সর্বংসহ, যা আদি ব্রাহ্ম সমাজের আর কেউ ছিলেন না।

কিন্তু ওকথা থাক। এই অধ্যায়ে দেখি তিনি শুধু অতীত ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতিই ব্যাখ্যা করেন নি, মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস থেকে রাজপুত শিখ মারাঠা ও পাঠান মোগলের নানা প্রসঙ্গও কবিতায় রূপ দিয়েছেন। সার্বিক ভারতবোধের স্বাক্ষর রূপে এসব কবিতা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থাবলীর মতই স্মরণীয়। এই অধ্যায়ে যদি জীবনান্ত হত রবীন্দ্রনাথের তা হলে কবি গীতিকার গল্পলেখক ঔপন্যাসিক নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক রূপে বাংলা সাহিত্যের

অন্যতম প্রধান লেখক হিসেবেই ইতিহাসে সুখ্যাত হতেন। কিন্তু তিনি আরো বড় হবার জন্যে তৈরি হয়েছিলেন। প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করে তিনি চিকিৎসার জন্যে বিদেশে যান। বিদেশ গিয়ে বিদেশি লেখকদের সঙ্গে পরিচয়ের সহায়ক হবে মনে করে স্বরচিত কবিতা ও গানের একগুচ্ছ সরল ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেন। গীতাঞ্জলি বা সং অফারিংস নামে তা লন্ডন থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং এই বই তাঁকে এনে দেয় নোবেল প্রাইজ। বাংলার কবি ও ভারতের কবি এই ভাবে বিবর্তিত হন বিশ্বকবিতে। ইয়েটস-এর ভূমিকা সম্বলিত হয়ে গীতাঞ্জলির নূতন সংস্করণ ছাপা হয়। ফরাসিতে আঁদ্রে জিদ করেন তার অনুবাদ। আন্তর্জাতিক সাহিত্যের আকাশে ব্যক্ত হলেন রবীন্দ্রনাথ নূতন এক জ্যোতিষ্করূপে। কিন্তু সে প্রসঙ্গে আসার আগে আর একটি প্রসঙ্গ যা এখনও অনুক্ত রয়েছে, তার কথা এখানে তুলতে হবে।

সে প্রসঙ্গটি হল জীবনদেবতাবাদ সম্পর্কিত। অজিতকুমার চক্রবর্তী একদা রবীন্দ্রনাথের মধ্য বয়সের 'তুমি' মূলক কবিতা ও গানগুলির মধ্যে তাঁর উদ্দিষ্ট তুমিকে জীবনদেবতা বলে চিহ্নিত করেন, তাঁরই একটি বিখ্যাত কবিতার নামানুসারে এবং বলেন, এই জীবনদেবতাবাদই হল রবীন্দ্র কবিতার মূল সুর। দিনে দিনে নব নব রূপে রসে তিনি অভিব্যক্ত হয়েছেন। এই ব্যাখ্যা থেকেই রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মবাদী সত্যদ্রষ্টা ঋষি রূপে পরিচিত হয়ে যান। প্রতীচ্যে ওরিয়েন্টাল মিস্টিক বা প্রাচ্যদেশীয় মরমীয়া কবিরূপে তাঁর যে খ্যাতি, তা প্রতিষ্ঠিত এই ভিত্তির উপরেই। বলা বাহুল্য এই রকম একটি বাঁধাধরা কাঠামোর মধ্যে ফেলে কবি ও তাঁর কাব্যকে বোঝার বা বোঝানর চেষ্টা যতই উৎসাহ সহকারে করা হোক, তা ঠিক সার্থক বলে স্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই কোনো না কোনো জীবন দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন জীবনের কোনো না কোনো অধ্যায়ে। কিন্তু তাই বলে তাঁকে আগাগোড়া ব্রহ্মবেত্তা যাজক সাজানোর কোনো প্রয়োজন নেই। জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর রচনার ভিত্তি হল শ্রেয়বাদ মানবতাবাদ ও হিতবাদ। তাঁর তুমি মূলক কবিতার তুমি পরমাত্মা হতেও পারেন, নাও পারেন। এই তুমি তাঁর মানসসুন্দরী, আকাঙ্ক্ষিত। হতে পারেন; হতে পারেন শেলীকথিত সেই ইনটেলেকচুয়াল বিউটি, বা চৈতন্যাশ্রিত সৌন্দর্যলক্ষ্মী। কিন্তু শান্তিনিকেতন পর্যায়ের বক্তৃতামালায় ব্যাখ্যাত অনির্বচনীয় ব্রহ্মের ছকে ফেলে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার মতো যুক্তিতথ্য সত্যই কি আছে?

অতঃপর নোবেল প্রাইজ পেয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবি পদবীতে উন্নীত হওয়ার প্রসঙ্গ টি আলোচনীয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে সুইডিশ একাডেমি এই প্রাইজ তাঁকে দেন। এর ঠিক এক বছর বাদেই বাধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ সুইডেন যেতে পারেন নি প্রাইজ আনতে। যুদ্ধাবসানের পর তিনি আবার পাশ্চাত্য ভ্রমণে বেরন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপে তখন রোমাঁ রলাঁ রুডলফ অয়কেন বার্গসঁ, আঁরি বারবুস প্রমুখ অগ্রণী সাহিত্যিকরা শান্তি আন্দোলনে সংহত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা নিজেদেরই অন্যতম রূপে গণ্য করলেন। বিশ্বশান্তি ও মানবকল্যাণের বাণী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হলেন এক অনন্য পুরুষ রূপে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য আশ্রম এর পরেই রূপান্তরিত হল বিশ্বভারতীতে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র রূপে তা নানা দিকে দেশের পণ্ডিতকে আকর্ষণ করল। অর্থাৎ বাংলার কবি ও

ভারতের কবি এখান থেকেই হলেন সারা পৃথিবীর কবি। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি প্রসঙ্গে একটা কথা মাঝে মাঝে উঠেছে, এখনো ওঠে, তা হল এই যে সুইডেনের রাজা গুস্তাভের উপর প্রভাব বিস্তার করে এই পুরস্কার তাঁকে দেওয়ানো হয়েছিল। প্রভাবটা কে বিস্তার করেছিলেন, কিভাবে করেছিলেন, সেকথা অনুক্ত থাকলেও কথাটা হাওয়ায় ফিরেছে। প্রকৃতপক্ষে রাজা গুস্তাভ ভারতবর্ষে এলে কলকাতায় যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম সন্দেহ নেই। হয়ত তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্বদেশে নিমন্ত্রণও করে থাকতে পারেন। কিন্তু তার সঙ্গে তদ্বিরেব কোনো সম্পর্ক আছে ভাবলে ভুল হবে। শুধু তাই নয়, তা হবে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে প্রকাণ্ড অমর্যাদাসূচক চিন্তা। রবীন্দ্রনাথের আগে পরে যাঁরা নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে প্রতিভার পরিমাণে রবীন্দ্রনাথকে কোনো প্রকৃতিস্থ মানুষই অপকৃষ্ট বা অনুপযুক্ত ভাবতে পারেন কি? আমরা জানি চিকিৎসার জন্যে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বিদেশে যান। যাবার পথে তিনি গীতিমাল্য গীতাঞ্জলি নৈবেদ্য প্রভৃতি থেকে কিছু নির্বাচিত কবিতা ও গান ইংরাজিতে অনুবাদ করেন।

লন্ডনে অবস্থানকালে শিল্পী রোদেনস্টাইনের বাড়িতে এক বৈঠকে এই কবিতাগুলি পড়া হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ইয়েটস্। তিনি কি অভিমত পোষণ করেছিলেন এই কবিতাগুলি প্রসঙ্গে, তার তো পরিচয় আছে ইংরাজি গীতাঞ্জলির ভূমিকায়। আমরা জানি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিশ শতকের শুরুতেই মানুষের হাতে এনে দিয়েছিল প্রচুর ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা। সাম্রাজ্য ও ঔপনিবেশিক প্রভুত্বে ইওরোপের জাতিগুলি একে অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মত্ত হয়, তারই পরিণতি হল বিশ্বযুদ্ধ। স্বভাবতই মানুষের জীবনে শুধু বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য যে যথেষ্ট নয়, তার স্থিতি ও কল্যাণের জন্যে যে চাই অব্যাহত শান্তি ও প্রেম, বস্তুগর্বী ইউরোপ তা ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করছিল। এই পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার শান্তি ও সর্বমানবিক কল্যাণের বার্তা সকলকেই গভীরভাবে স্পর্শ করে। এবং শুধু রবীন্দ্রনাথই নয়, তাঁকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষ ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধেও তাঁদের মনে গভীর উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। সবাই জানেন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এ-সময় গান্ধীর আবির্ভাব হয়। ইংরেজি শিক্ষিত শহুরেদের মঞ্চ থেকে রাজনীতিকে তিনি গ্রামের মাটিতে নামিয়ে আনেন এবং অহিংস অসহযোগের আদর্শে লক্ষ লক্ষ কৃষক ও দেহশ্রমী সাধারণ মানুষদের সংহত করেন। গান্ধীও মৈত্রী দর্শনের প্রবক্তা। তিনি বলেন, শুধু ফল শুভ হলেই কোনো কাজ কল্যাণকর হয় না, সেই ফলে উপনীত হবার উপায়টিও সমান শুভ হওয়া উচিত। হত্যা ও সন্ত্রাসের দ্বারা যে জয়লাভ হয়, তা শ্রেয় জয় নয়। শান্তি ও প্রেমের পথে অর্জিত জয়ই যথার্থ জয়। অর্থাৎ অহিংস অসহযোগই সত্যকার অস্ত্র, যা নিয়ে একটি নিরস্ত্র জাত প্রবলতর প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে। বস্তুবাদীর বিচারে এ মতের তাৎপর্য যাই হোক, তখনকার প্রতীচ্যের কাছে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের সমুজ্জ্বল অভ্যুদয় হয় এই ভাবেই এবং তা হয় কম বেশি একই সময়ে।

এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে গণনীয় রচনা হল বলাকা পূরবী মহুয়া প্রভৃতি কবিতার বই এবং ডাকঘর মুক্তধারা রক্তকরবী প্রভৃতি সাংকেতিক নাটক। দেশ জাতি ও জগতের বিচিত্র সংকট সমস্যা ও দুঃখ দৈন্যের ঊর্ধ্বে একটি শাশ্বত মঙ্গলের প্রবাহ দিকে

দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, এই তিনি দেখান এই পর্বের রচনায়। বঞ্চনা থেকে, দৈন্য থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ মানুষের গৌরবে উঠে দাঁড়াক, এই পর্যায়ের রচনাগুলিতে তিনি সেই বার্তাই নানাভাবে প্রচার করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন, বার্গসীয় গতিবাদ তাঁর এই পর্যায়ের রচনাগুলির মর্মলোকে প্রভাব বিস্তার করেছে। এক পরম প্রাণ, ইলানভিতাল, এই জগৎ ও জীবন রহস্যের অন্তরালে গুহায়িত থেকে সবকিছুকে বিবর্তিত করছে। ফুল থেকে ফল, ফল থেকে বীজ, বীজ থেকে গাছ, আবার গাছ থেকে ফুল, ফল, এই সৃষ্টিমূলক অভিব্যক্তির ক্রিয়েটিভ ইভলিউশনের ধারায় কখনো ছেদ পড়ে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও সজাগভাবে এই মতের অনুশীলন করেছিলেন, তার কোনো স্বীকৃতি নেই। যদিও কোনো কোনো লেখায়, যেমন বলাকার প্রথম কবিতায় এবং নদী কবিতায় একটি প্রাণদায়ী গতিশীলতার তত্ত্ব নিহিত আছে। সে তত্ত্ব আছে রবীন্দ্রনাথের আগের বহু রচনাতেও। কাজেই বার্গসীয় দর্শনের প্রভাব এক্ষেত্রে আবিষ্কার না করলেও চলে। উপনিষদেও চরাচর বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে এক প্রাণময় পরম শান্তির লীলা তরঙ্গিত হচ্ছে এ কথা আছে। এই মতবাদটি তাই ধার করা নাও হতে পারে। যদিও বার্গসঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল এবং সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ। উপনিষদে অবশ্য এই প্রাণময় পরম শক্তিকে সরাসরি ব্রহ্ম বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। বার্গসঁ তাঁর ইলানভিতালকে ঈশ্বররূপেও দাঁড় করান নি, আবার মূঢ় প্রাকৃতিক শক্তিরূপেও অভিহিত করেন নি। তাই বিজ্ঞানবাদীরা একে জড়শক্তি রূপেই গ্রহণ করেছেন, আর নৈষ্ঠিকরা একে অভিহিত করেছেন অনির্বচনীয় পরমাত্মারূপে। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কথাটা বিজ্ঞ পণ্ডিতের দ্বারা উচ্চারিত হয়েছে বলেই, এখানে তার উল্লেখ করা হল। তা না হলে এ প্রসঙ্গও জীবনদেবতাদের মতই অবান্তর।

তৃতীয় ধাপে উৎসারিত এই বিশ্বমানবতার সার্বভৌম মৈত্রী দর্শন বাইরের পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথকে অশেষ সম্মানে ভূষিত করলেও, দেশের একাংশ তাঁর এই নূতন রূপকে সানন্দে স্বাগত করেন নি। তাঁরা বলেছেন, নিজের জন্মভূমি যেখানে বিদেশি শাসকের দ্বারা কবলিত, দেশের বেশির ভাগ মানুষ যেখানে দৈন্য অশিক্ষা কুসংস্কার ও অস্বাস্থ্যে জীর্ণ-জর্জরিত, সেখানে আপন দেশ ও জাতির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বিশ্বের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হওয়া, অন্যদের সংকট সমস্যাকে নিজের বলে গ্রহণ করার মধ্যে ঔদার্য থাকতে পারে, কিন্তু সত্য নেই এক বিন্দুও। প্রতীচ্য তাঁকে মরমীয়া কবি ও সত্যদ্রষ্টা ঋষিরূপে গ্রহণ করেছে যেহেতু, সেই হেতু বিদেশে ত বটেই, দেশেও তিনি সেই খ্যাতি অব্যাহত রাখবার চেষ্টা করে চলেছেন। কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ বা সার্থকতম সৃষ্টির অন্তর্লোকে পৌঁছতেই পারে নি বস্তুগর্বী ইওরোপের মন। রাজনৈতিক চাল হিসাবে ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্য দুনিয়াকে ধাঁধা লাগাবার জন্যে এই ঠাকুরমত্ততা, টেগোর ক্রেজ, সৃষ্টি করা হয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের সামনে যখন ধরে দাঁড়াবার মতো কোনো দৃঢ় অবলম্বন ছিল না, তখন এই হুজুগটা তাঁদের তাতিয়ে মাতিয়ে তুলেছিল। তারপর যখন এক দশকের মধ্যে ইউরোপের মন কতকটা আত্মস্থ হল, ভেঙেচুরে যাওয়া আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো যখন আবার আস্তে আস্তে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে শুরু করল, তখন পরিবর্তিত প্রজ্ঞার আলোকে রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বপ্রেম তাঁদের চোখে আর খুব বেশি তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়

নি। তাঁরা অনেকেই রবীন্দ্রানুরাগের পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করলেন। একজন ত তাঁর বাণীকে ভয়েস ফ্রম দ্য টুম্ব স্টোন বা মৃত সমাধিলিপির স্বস্তিবাচন বলে অভিহিতই করলেন। লক্ষণীয় যে তিনের দশকে একদিনের একান্ত গুণগ্রাহী বন্ধু ইয়েটস ও স্টার্জ মুর প্রমুখ প্রকাশ্যেই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। অর্থাৎ তথাকথিত ঠাকুরমত্ততার স্রোতে ভাঁটা পড়তে শুরু করল। বিচিত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই ইউরোপের সাংস্কৃতিক মঞ্চে দ্রুত পরিবর্তন হতে লাগল। তার ফলে একদিনের স্বীকৃত অনেক ধ্রুবমূল্য ক্রমশ বাতিলও হতে থাকল। রবীন্দ্রনাথের প্রতীচ্যে খ্যাতির অবক্ষয়ও এই সাধারণ অবস্থার প্রকারভেদ মাত্র। কিন্তু এই প্রসঙ্গেব আলোচনায় পরে আসব।

বিদেশে প্রতিকূল বা বিরুদ্ধ আলোচনা যা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তার দিকে ফিরে তাকান নি। কিন্তু দেশের বিপথ-প্রস্থিত আলোচনার প্রত্যুত্তর তিনি দেন দু-একবার। তিনি বলেন ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য সত্ত্বেও মনুষ্য জাতি যে এক অখণ্ড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, একথা ভারতবর্ষই প্রথম প্রচার করেছে। এ বিদেশ থেকে আহরণ করা কোনো পণ্য নয়। সঙ্কুচিত বিচারশক্তি ও দৃষ্টিবিভ্রমের ফলে একে যখন অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হই, তখন নিজের সত্তাকেই আমরা করি খণ্ডিত। সত্যই সেখানে সকলের আগে মার খায়। যুগে যুগে ধর্মকর্ম আচারসংস্কার ও জ্ঞান বিজ্ঞানের পথে যত অগ্রণী পুরুষের উদ্ভব হয়েছে, সকলেই তাঁরা প্রচার করেছেন প্রেমের বার্তা। অখণ্ড মনুষ্যজাতির দিকে লক্ষ রেখেই উৎসারিত হয়েছে তাঁদের কর্ম ও চিন্তার প্রবাহ। দেশের একজন নিবড় চাষির দুঃখ, তারই সমগোত্রীয় একজন চীনা চাষির দুঃখ থেকে যে পৃথক নয়, এ সত্য যার অনুভূতির তন্ত্রীতে একই সুরে বাজে, সে মানুষের মন ভূগোলের গণ্ডী অতিক্রম করে যে বিশ্বপৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয়। বুঝতে পারি, সমষ্টিগতভাবে মানুষের সাধনার ব্যর্থতাই প্রকট হয়েছে এখানে। যাঁদের উদ্দেশে কবি এই কথাগুলি বলেছিলেন, তাঁরা এর নির্গলিতার্থ কতটা পর্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন জানি না। তবে রবীন্দ্রনাথের শিষ্ট লেখনী এর চেয়ে বেশি কঠোর সচরাচর হত না। তাছাড়া তাঁর মানসিকতাতেও ইতিমধ্যে এসে গেল পরিবর্তনের হাওয়া। তৃতীয় স্তর থেকে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে আরম্ভ করলেন চতুর্থ স্তরে, যেখানে সার্বভৌম মানবপ্রেম ক্রমশ সার্বভৌম সাম্যের মৃত্তিকা স্পর্শ করল। এই চতুর্থ বা চরম অধ্যায়ই হল রবীন্দ্রমানসিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ। একদিনের দেশপ্রেমিক ভারত পথিক হলেন পরমার্থবাদী বিশ্ব মৈত্রীর প্রবক্তা। রবীন্দ্রনাথের এই রূপান্তরিত পরিচিতি অনেকেই ধরতে পারেন নি। তাঁরা তাই তাঁর আদি ও মধ্যপর্বের ক্রমানুবৃত্তির আলোতেই তাঁর শেষ অধ্যায়ের বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়ে গোঁজামিলের আশ্রয় নিয়েছেন। পরবর্তী অংশে আমরা এই দিকের মুখ্য কথাগুলি আলোচনা করে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে মূল প্রসঙ্গের অবতারণা করব।

শুধু একটা কথা বলে রাখা দরকার যে দেশ ও জাতি বাস্তব সংকট সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই উদাসীন ছিলেন না। যৌবনে স্বদেশি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া থেকে শুরু করে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে সর্বদাই তাঁকে আমরা অগ্রসর হতে দেখেছি। আমাদের রাজনীতির মঞ্চে গান্ধীজীর আবির্ভাব হলে তাঁকে তিনিই সর্ব প্রথম শান্তিনিকেতনে

আমন্ত্রণ করেছিলেন এবং অনেকে বলেন তাঁরা মহাত্মা আখ্যাটি রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া, যদিও গান্ধীজীর চরকাভিত্তিক রাজনীতির তিনি সমর্থক ছিলেন না। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মাইকেল ও 'ডায়ার নামক ইংরেজ অফিসারের পৈশাচিক ভূমিকায় বিচলিত হয়ে তিনি ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি চেমসফোর্ডকে স্যার উপাধি প্রত্যাখ্যান করে সেই দুঃসাহসিক চিঠিখানি লেখেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নায়করা তাঁর শুভেচ্ছা প্রার্থনা করে পান সেই স্মরণীয় কবিতাটি। কারাগারে অত্যাচারে নিগৃহীত রাজবন্দীদের যন্ত্রণা বরণের প্রতি অসীম সহানুভূতি ব্যক্ত হয় তাঁর আর একটি স্মরণীয় কবিতায়। এবং 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' কবিতায় তিনি অভিনন্দন জানান সেই তেজস্বী অগ্নিযুগের নায়ককে, যিনি পরবর্তী জীবনে সমষ্টিযোগের তত্ত্বেই দত্তপ্রত্যয় হয়ে বাস্তব কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে সরে যান। রাজনৈতিক কারণে কারাদণ্ডিত নজরুল ইসলামকে তিনি আশীর্বাদ জানান 'বসন্ত' গীতিনাট্য তাঁর নামে উৎসর্গ করে এবং নজরুল কারাগারে অনশন শুরু করলে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত হবার অনুরোধ জানিয়ে বার্তা পাঠান। জারবেদা জেলে গান্ধীজী অনশন শুরু করলে তাঁকেও তিনি প্রতিনিবৃত্ত করতে সেখানে যান এবং তাঁর উপস্থিতিতেই অনশন ভঙ্গ করেন গান্ধীজী। হিজলি বন্দীনিবাসে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন পুলিশের গুলিতে নিহত হলে, কলকাতা মনুমেণ্টের, অধুনা শহীদ মিনারের পাদদেশে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি এসে দাঁড়ান বক্তৃতা করতে। এমন কি অন্তিম শয্যা থেকেও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যা মিস রাথবোন কর্তৃক উচ্চারিত ভারত বিরোধী কুৎসার জবাবে সেই তেজোদ্দীপ্ত পত্রখানি লিখেছিলেন, যা আজও স্মরণীয় দলিল হয়ে আছে। এই সব সুবিদিত ঘটনার উল্লেখ না করলেও চলত। করা হল শুধু আমাদের বিস্মৃতিপ্রবণ চিত্তের অসাড়তার ভাণ্ডারে একটু নাড়া দেবার জন্য। প্রত্যক্ষ রাজনীতির মধ্যে দু-একবারের বেশি ঝাঁপিয়ে না পড়লেও প্রাত্যহিক ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত থেকে দূরেও থাকেন নি তিনি কখনো।

আন্তর্জাতিক দুনিয়ার বিচিত্র ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি ও মানসিকতার ক্রমবিকাশ 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' বইয়ে নেপাল মজুমদার বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এখানে তার আর সবিস্তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শুধু সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ইউরোপ গিয়ে তিনি যে বাস্তব পরিস্থিতি লক্ষ করেছিলেন, তাতে একটি বিরাট বিপর্যয় যে আসন্ন তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে শিল্প বাণিজ্যে অগ্রাধিকার দখলের জন্যে পশ্চিমের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি অস্ত্রদৌড় শুরু করেছে। বিজ্ঞানকে করেছে তারা আর্থনীতিক ও রাজনীতিক স্বার্থ সাধনার হাতিয়ার। এর পরিণাম যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। কার্যত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধল ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে এবং চার বৎসরকাল একাদিক্রমে পর্যাপ্ত ধনপ্রাণহানির পর যখন তা ক্ষান্ত হল, তখন সকলেরই ক্ষমতার মেরুদণ্ড ভেঙেছে। আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই মানুষ হয়েছে শান্তির জন্যে ব্যাকুল। অনুষ্ঠিত হয়েছে একের পর এক নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক, ও বিশ্বশান্তি বৈঠক। বিজয়ী রাষ্ট্র কর্ণধাররাই অবশ্য হন এই সব বৈঠকের উদ্যোক্তা। স্বভাবতই তাঁরা এমন সমস্ত কঠোর শর্ত আরোপ করেন, যুদ্ধ বাঁধানর জন্য দায়ী জার্মানির উপর, যাতে

অনেকেই মনে করেছিলেন যে, তার আর কোনোদিন উত্থান হবে না। কিন্তু ভার্সাই সন্ধি ও কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তিকে নস্যাৎ করেই জার্মানিতে সামরিক একনায়কতার অভ্যুদয় হয়। ওদিকে মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকেই মাথা তুললো সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া এবং যাবতীয় কায়েমী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট স্থিতমূল্যের প্রতিপত্তি উচ্ছিন্ন করে, নূতন এক সমাজের ও রাষ্ট্রের ছাঁচ তুলে ধরলো মানুষের সামনে। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আতঙ্কিত হয়েই আর একটি যুদ্ধকে নিঃশব্দে স্বাগত করতে লাগলো, তার উদ্দেশ্য এই সুযোগে নিজেদের সম্প্রসারণ কামনা যথাশক্তি চরিতার্থ করা এবং তাদের সকলেরই সাধারণ শত্রু রাশিয়াকে যুদ্ধে জড়িত করে বিপর্যস্ত কবা। অর্থাৎ আব একটি মহাযুদ্ধের আগুন তলায় তলায় ধূমায়িত হতে লাগলো। ইতিমধ্যে হিংস্র জাতীয়তাবাদের আবাদ যেমন রাজনীতির পাখায় ভর করে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, তেমনি তার সঙ্গে তাল রেখে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী প্রতিভাও প্রবলতর সামরিক অস্ত্রে শান দিতে লাগলো পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে। অর্থাৎ আর একটি যুদ্ধের প্রস্তুতি চলল।

কিন্তু সে একটু পরের কথা। যুদ্ধাবসানের ঠিক পরেই রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ আমেরিকা সফরে যান এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্বৎসভায় তিনি যে সব বক্তৃতা দেন, তাতে উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং তার উদ্দীপনায় পারস্পরিক সংঘর্ষে মাতবার মনোভাবকে তিনি কঠোর ভাষায় ধিক্কার দেন। রেস কনফ্লিক্ট বা পাবস্পবিক সংঘর্ষ নয়, রেস ইউনিটি বা সর্বজাতির ঐক্যই যে বাঁচার উপায়, একথা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেন। তাঁর ন্যাশনালিজম বইয়ে এইসব বক্তৃতা সংগৃহীত হয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, শান্তিকামী সাধারণ নরনারী লাখে লাখে ঝুঁকে পড়েছেন এই বক্তৃতাগুলির দিকে, যদিও ধনিক বণিক ও রাষ্ট্র কর্ণধাররা অনেকেই খুব প্রীত হন নি। কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, ইংরেজ শাসনের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে সেই শাসনের বিরুদ্ধাচরণ যেমন হাস্যকর, তেমনি হাস্যকর বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও উপনিবেশকে যাঁরা শিক্ষা দীক্ষায় করেছেন উন্নত, সেই শাসকদের বিরুদ্ধাচরণও। এ বলার কারণ দিগন্তে তখন জার্মানি নাৎসী আন্দোলনের পতাকা ওড়াতে আরম্ভ করেছে, ইতালি সংহত হচ্ছে ফ্যাসিস্ত আন্দোলনের নামে। এই সামরিক অভ্যুত্থান যে কোন্ সর্বনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে পৃথিবীতে তা অনেকে বুঝতে পারেন নি। স্বাজাত্য গরিমার নামে তাঁরা একে মহিমান্বিত করেই দেখেছেন। আমাদের দেশেও বহু শিক্ষক ও সাংবাদিক একই ভুল করেন। সাহসীর জয়যাত্রা শ্রেণী বই লিখে তাঁরা নাৎসি আন্দোলনের নায়ক হিটলারকে জয়ধ্বনি দিয়েছেন, সম্বর্ধিত করেছেন ফ্যাসিস্ত নায়ক মুসোলিনিকে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এ ভুল করেন নি। সন্ত্রাস ও নরহত্যার পথে যাঁরা স্বদেশের মুক্তিসাধনে মেতে ছিলেন, তাঁদের তিনি ঠিকই চিনেছিলেন। তাঁদের নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট নিন্দা আছে তাঁর বহু বক্তৃতা ও চিঠিপত্রে। দুর্ভাগ্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের ইতালি ভ্রমণ উপলক্ষে ফ্যাসিস্ত প্রেস তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ রূপে যে সংবাদ পরিবেশন করে, তাতে রবীন্দ্রনাথের মুখে এমন সমস্ত প্রশংসোবাক্য বসানো হয় মুসোলিনি সম্পর্কে, যা তিনি আদৌ বলেন নি। ইতালীয় ভাষা না জানায় কবি এই চতুরতার খেলা ধরতে পারেন নি। সুইজারল্যান্ডে এলে রোমাঁ রলাঁ তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তীব্র

প্রতিবাদ করেন ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি চিঠির মাধ্যমে। এর পরিণতিতে চব্বিশ ঘণ্টার পরোয়ানায় রবীন্দ্রনাথকে লটবহরসহ ইতালি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। কেউ কেউ বলেন, লোকশিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে ইতালি যেসব গঠনাত্মক কাজ করেছিল, কবি তাঁর প্রশংসা করেন। ফ্যাসিস্ত স্বৈরশাসনের প্রসঙ্গ তিনি আদৌ তোলেন নি। এই একবার ছাড়া বারবার ইউরোপ সফরে রবীন্দ্রনাথ সম্মান ও স্বীকৃতিই পেয়েছেন। কোথাও তাঁকে লোকত্রাতা ও প্রেরিত-পুরুষ বলে অভিনন্দিত করেন গীর্জাধিপতিরা, কোথাও রাজা স্বয়ং মশাল শোভাযাত্রায় স্বাগত করে নিয়ে যান, কোথাও মধ্য সমুদ্রে তাঁর জাহাজ থামিয়ে নিজেদের জাহাজ থেকে জাপানি নাবিকেরা তাঁকে বানজাই করেন, অর্থাৎ জয়ধ্বনি দেন। কোনোকালে কোনো কবি, শিল্পী, নায়ক, শাসক এমন সার্বভৌম মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন, তার কোনো লিখিত নজির নেই। সত্যই সেদিন তিনি কবি সার্বভৌমরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন বিশ্বমানবের সামনে।

১৮৬১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত এই দীর্ঘ আশি বৎসরব্যাপী জীবনের প্রথম সত্তর বৎসরে তিনি পরের পর অতিক্রম করেন প্রথম তিনটি ধাপ এবং তিন ধাপেই তাঁর প্রকাশ উজ্জ্বল অনবদ্য ও মহান। এর যে-কোনো এক অধ্যায়ে তাঁর জীবনান্ত হলেও তিনি ইতিহাস পুরুষরূপে স্মরণীয় হতেন চিরদিনের জন্য। কিন্তু জীবন তাঁকে আরও এক অধ্যায়ের জন্যে তৈরি করেছিল এবং মনে করবার কারণ আছে তাঁর পরমতম ও মহত্তম প্রকাশ হয়েছে এই অধ্যায়েই। ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ এই শেষ দশকে তাঁকে আমরা এক পৃথক রবীন্দ্রনাথরূপে দেখি।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১-তে এবং ১৯৪১-তে আশি বছরে তাঁর মৃত্যু। তারপর আরও অনেক বছর পার হয়ে গেছে। বিশ শতক আর পুরো দু দশকও নেই। ইতিমধ্যে বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে যেমন বহু অভাবনীয় ওলট পালট হয়ে গেছে, রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে তেমনি হয়েছে প্রচুর ভাঙাগড়ার খেলা। বোধ বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের যে ধ্রুব মূল্যগুলি আঁকড়ে ধরে মানুষ মধ্যযুগ থেকে অব্যাহত গতিতে এযুগ পর্যন্ত চলে এসেছে, তার কোনটা কতখানি ধ্রুব, তা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়ান্বিত সহস্র প্রশ্ন। ঈশ্বর আত্মা অদৃষ্ট ও মোক্ষ এই চার স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে যে পূজা প্রার্থনা ও আচার অনুষ্ঠানভিত্তিক ধর্ম চেতনা কোনো না কোনো আকারে পৃথিবীর সমস্ত দেশ ও জাতির মধ্যে, তা কতদূর সত্য বা স্বীকার্য? প্রেম ভক্তি বিনয় বৈরাগ্য ত্যাগ প্রভৃতি যে মূল্যবোধগুলি মানুষের পারিবারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করেছে, সভ্যতার সূচনা কাল থেকে, শাসক ও শাসিতের, হুজুর ও মজুরের, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর, পিতামাতা ও সন্তানের, স্বামী ও স্ত্রীর যে সম্পর্কধারা প্রেয়োতম বলে স্বীকৃতি পেয়েছে, তার সবটাই রক্ষণীয় বা পালনীয় কিনা, সে প্রশ্ন আজ মাথা তুলেছে মননশীল মানুষদের চিন্তায়। সেখান থেকে তা ব্যাপ্ত হয়েছে সাধারণ মানুষের স্তর পর্যন্ত এবং তাব ফলে সর্বত্র একটা অস্থিরতা, একটা ভাঙনের মনস্তত্ত্ব দানা বাঁধছে। সংঘাত সংঘর্ষ বিরোধিতা যত্রতত্র যখন তখন প্রকাশমান হচ্ছে এবং তার মধ্যে দিয়ে নূতনতর জীবন দর্শন বা ভিন্নতর মূল্যবোধের সম্ভাব্যতা থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছে। এই সর্বতোমুখী ভাঙনের আবহাওয়ায় রবীন্দ্রবাণীর কতখানি সার্থকতা বা তাৎপর্য আজও স্বীকার্য, এ জিজ্ঞাসা বুদ্ধিজীবীদের মনে

উঠতে শুরু করেছে। তাঁরা বলছেন আজকের জীবন জিজ্ঞাসার কি পরিমাণ সদুত্তর আমরা পাই রবীন্দ্রনাথে? সংঘাত সংকটে বিপর্যস্ত মানুষের যাত্রাপথে আলোকসম্পাত করতে পারেন কি রবীন্দ্রনাথ?

প্রশ্নটি জটিল এবং দু-কথায় তার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। সমাধানের জন্যে তাই আমাদের সন্ধান নিতে হবে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মের সুদীর্ঘ পটভূমিটির। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে জীবনের প্রথম অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জাতীয়তাবাদী এবং উনিশ শতকে যেহেতু আমাদের জাতীয়তাবোধ আনন্দমঠীয় হিন্দু অভ্যুত্থানের রঙে অনুরঞ্জিত হয়ে দেখা দিয়েছিল তাই রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখি হিন্দু জাতীয়তার প্রবক্তা রূপেই। বীরাষ্টমী রাখীবন্ধন ভবানীমন্দির শিবাজী উৎসব, তৎকালীন আন্দোলনগুলির প্রত্যেকটাতেই তিনি শুধু যোগ দেন নি, কতকগুলিতে নায়কতাও করেছেন। বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলনের অন্তরাল থেকে তারপর যখন সন্ত্রাসের অগ্নিশিখা দেখা দিল, তিনি তখন বর্তমানের পটভূমি থেকে পিছনের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। উপনিষদের ভারত, রামায়ণ মহাভারতের ভারত, বৌদ্ধদের ভারত, মারাঠা রাজপুত শিখ ও মুঘলদের ভারত তাঁর চিন্তার রাজ্য অধিকার করল। এক দিকে তিনি শ্রেণীগোষ্ঠী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব মানুষের মিলনতীর্থ রূপে ভারতবর্ষকে মহিমান্বিত মূর্তিতে তুলে ধরলেন; অন্যদিকে তার আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণে মেলে ধরলেন দেশবাসীর সামনে। এর পরের ধাপে তাঁকে আমরা দেখি আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়ে জাতিধর্ম ও সংস্কৃতির সীমানা অতিক্রম করে যেতে। বাংলা থেকে ভারতে, ভারত থেকে জগতে ব্যাপ্ত হলেন তিনি। রলাঁ বার্গসঁ অয়কেন বার্নার্ডশ।দের সঙ্গে একাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। বস্তুগর্বী প্রতীচ্য সভ্যতার এবং পরদেশগ্রাসী সাম্রাজ্য লিপ্সার বিরুদ্ধে মুখর হল তাঁর কণ্ঠ। বিজ্ঞানকে পাইকারী হত্যার হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ধিক্কার জানাতে লাগলেন তিনি দেশে দেশে। এখানেই কিন্তু পরিক্রমা শেষ হল না তাঁর। পরের অধ্যায়ে রাশিয়া পর্যটনান্তে দেশে ফিরলে নূতন এক রবীন্দ্রনাথকে পেলাম আমরা। নিরীশ্বর বস্তুবাদের সমর্থক শ্রমকারী মানুষের দোসর, মানব মনের গুহায়িত কামনা বাসনার নির্ভীক ভাষ্যকার এই রবীন্দ্রনাথ।

এই অধ্যায়ের রচিত কবিতা গল্প ও প্রবন্ধ নিবন্ধ এবং অংকিত ছবির মধ্যে দিয়ে যে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত হন, তিনি গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালায় গোরা ও প্রাচীন সাহিত্য রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ থেকে কত দূরবর্তী, তা নিশ্চয় মননশীল মানুষদের বোঝাতে হবে না। সত্তর থেকে আশি এই শেষ দশ বৎসরের রবীন্দ্র সৃষ্টি নিয়ে যদি অনুধ্যান করি, অথবা আরো, যদি আরো পাঁচ ছয় বছর পিছু হঠে যাই, তাহলে দেখতে পাই বিশ শতকের জীবন ও যুগ চেতনার প্রধান শাখাগুলি সবই তাঁর মনের মৃত্তিকা স্পর্শ করেছে। মার্ক্স এঙ্গেলস ফ্রয়েড আইনস্টাইনের যে পৃথিবীতে আমরা যৌবনারম্ভে চোখ মেলেছিলাম। এবং তাঁদের মিলিত প্রভাবে নূতন দিগন্ত খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, তার কোনোটাই রবীন্দ্রনাথের কাছে অচেনা বা অনাবিষ্কৃত বা অন্ত্যজ ছিল না। রিরংসা জিঘাংসা ও নগ্নতার প্রতীক তাঁর ছবিগুলিতে ল্যাবরেটরি ও রবিবার নামক যৌন কূটৈষণাত্মক গল্পে, বিশ্বপরিচয় রাশিয়ার চিঠি কালান্তর ও সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে এবং আরোগ্য প্রান্তিক এবং রোগশয্যায়

প্রভৃতির মানবমুখী কবিতায় যে স্রষ্টা মানুষটি প্রতিভাত হন, তিনি একালের এত কাছাকাছি, তা নিশ্চয় ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। সংসকোচে নিবেদন করি যে রবীন্দ্রজীবনের এই অধ্যায়ে সাহিত্য সহকারী রূপে বর্তমান লেখক তাঁর সান্নিধ্যে এসেও এই ধারণাটি যাচাই করে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু গতানুগতিকতায় অভ্যস্ত দেশের মন এই নূতন রবীন্দ্রনাথকে চিনতে চায় নি, চাইছে না আজও। তাঁকে সেই সাবেকী ভাববাদী শিবিরে আটক রেখে সৌন্দর্য আধ্যাত্মিকতা মানবপ্রেম ও জাতীয়তার অগ্রপুরোহিত রূপে বোঝা এবং বোঝানোরই প্রয়াস চলছে। ফলে একটি নিত্য সম্প্রসারণশীল জাগ্রত ও জীবন্ত প্রতিভাকে আমরা কতকগুলি তথাকথিত ধ্রুব মূল্যবোধের আওতায় আবদ্ধ করে রেখে, নিজেরাও তার প্রাণদায়ী প্রভাব থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, দেশের সমষ্টি মানুষকেও বঞ্চিত করছি। সায়াহ্নের এই চিত্রভানু রবীন্দ্রনাথকে উন্মুক্ত করে ধরার প্রয়োজন হয়েছে আজ।

এখানে কেউ হয়ত কূটতর্ক তুলে বললেন, তাহলে আগের অধ্যায়ের রবীন্দ্রসৃষ্টিগুলি সবই কি বকেয়া ও বাতিলযোগ্য বলে গণ্য হবে? বলা বাহুল্য উপরোক্ত বিশেষণ দুটির কোনোটাই আমি প্রয়োগ করিনি। উঁচু পদবীর সৃষ্টিকর্ম যা, সে সাহিত্য চিত্রকলা সংগীত যাই হোক, তার একটা দেশকালাতীত সার্বিক ও সর্বজনীন আবেদন থাকে, কেন না, তা এক দেশকে আর এক দেশের ও এক যুগকে আর এক যুগের সংগে যুক্ত করে। এই কারণেই দান্তে শেক্সপীয়ার মলেয়ার গ্যয়টে তলস্তয় চিরদিনের সাহিত্যিক। কালিদাস বাণভট্ট চণ্ডীদাস মধুসূদন বঙ্কিম চিরদিনের সাহিত্যিক। কিন্তু একথাও একই সংগে স্বীকার্য যে চিরায়ত বলে চিহ্নিত সৃষ্টিতেও কালচেতনার অনতিক্রমণীয় ছাপ কিছু না কিছু পড়েই। সে ছাপ আছে শেক্সপীয়ারে মলেয়ারে, আছে বঙ্কিমে, রবীন্দ্রনাথেও। কিন্তু আনন্দের কথা যে সেই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেই রবীন্দ্রনাথ সার্থক সর্বজনীন আবেদনের আকাশকে উন্মুক্ত করে রেখেছেন। শুধু তাই নয়, অনাগত দিনের মর্মবাণীও ভাষা পেয়েছে তাঁর লেখনীতে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা এবং এ জায়গায় তাঁর সহযাত্রী হবার সামর্থ্য সেদিনও কারো ছিল না, আজও হয় নি। চেতনা নির্ভর নির্ণায়ক কাহিনি, মুক্তাঙ্গন নাটক, গদ্য কবিতা, বিমূর্ত চিত্র, সব দিকে হাত লাগিয়ে গেছেন তিনি এই শেষ দশ বৎসরে। মুখের কথাকে সুরে বেঁধে পপ্ গানেরও কিছুটা সূচনা করে গেছেন, নৃত্যনাট্যগুলির কোনো কোনোটাতে। এসবের মধ্যে তাঁর অসীম প্রাণশক্তির পরিচয় যেমন পরিস্ফুট হয়, তেমনি নূতনকে স্বীকার ও স্বাগত করার নমনীয়তাও প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ তাই অংকের হিসাবে বৃদ্ধ হলেও জীর্ণ হন নি, যা হতে দেখেছি আমরা তাঁর চেয়ে কনিষ্ঠতর প্রমথ চৌধুরী এবং শরৎচন্দ্রকে, যদিও অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিভায় আদৌ তুলনীয় নন তাঁরা।

শুধু ভঙ্গির নূতনত্ব বা অভিনবতাই তাঁর এই অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য নয়, প্রাণধর্মেও তিনি রীতিমতো আধুনিক। পরমাণুতত্ত্বের আলোয় তিনি বস্তুবিশ্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন, মনোবিকলনের আলোয় প্রেম ভক্তি ও কামনা বাসনার স্বরূপ নির্ণয় করেছেন, ধর্ম ও ঈশ্বরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পথ ধরে শাসক ও শাসিতের, মালিক ও শ্রমিকের, পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক এবং অধিকারের সীমা নির্দেশ করেছেন। সব জায়গায় সব সমাধান তাঁর হয়ত অভিপ্রেত মনে হবে না আমাদের। কারুই বা কোন সিদ্ধান্তে তা হয়?

কিন্তু তিনি যে আমাদের কালকে ধরতে বা চিনতে পারেন নি, একথা বলার উপায় নেই। অর্থাৎ প্রবহমান কালের সঙ্গে তাল রেখেই চলতে পেরেছেন তিনি। তাই ব্রহ্মচর্য, ধ্যান ধারণা ও উপাসনা নির্ভর আদি যুগ, ধর্ম ও দেশপ্রেমের নামে ব্যক্তি মর্যাদা অপহারক মধ্যযুগ এবং শোষণ ও সর্বগ্রাস কলুষিত যন্ত্রযুগ, সব কিছুকে অতিক্রম করে সাম্যাশ্রিত এক নূতন যুগকে আহ্বান জানিয়ে গেছেন তিনি। এই জন্যেই একান্তভাবে আজকের যে কোনো জিজ্ঞাসার উৎস দেখতে পাই তাঁর জীবন ও সন্ধ্যার সমস্ত সৃষ্টিমূলক কাজে। এই জন্যেই তাঁকে বলেছি চিত্রভানু, যার একটি অর্থ অস্তগামী সূর্য। সাতটি রঙের এককালীন সমাহারে অপরূপ রূপের মহিমা প্রকট করে সূর্য যেমন পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায়, তিনিও ঠিক সেইভাবেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, সব দিকের দ্যুতি ও জ্যোতি অল্প কয়েকটি বৎসরের মধ্যে সংহত করে। এই জন্যেই রবীন্দ্রবাণীর যথার্থতা বা তাৎপর্য কালভ্রষ্ট হয় নি, তা আজকের লেখক নায়ক শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীকেও পর্যাপ্ত অনুপ্রেরণা দিতে পারে, যদি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর অন্তর্লোকে প্রবেশ করা হয়।

□ *'রবীন্দ্রনাথ ও সাম্যচিন্তা'* গ্রন্থ থেকে আহৃত, প্রকাশক : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৮৪

বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মহাশূন্যের জ্যোতিষ্কের মতো আমরা প্রচণ্ডবেগে অবস্থানকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে যাচ্ছি। পুরানো মূল্যবোধ ভেঙে পড়ছে। নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠছে না। স্ববিরোধী কার্যকলাপ ও অস্বাভাবিক চিন্তাভাবনা মানুষকে অস্থির করে তুলেছে। ধর্ম, কর্ম, মন্ত্রতন্ত্রের রক্ষাকবচ যন্ত্রযুগের ভূতপ্রেতকে তাড়াতে পারছে না। মন্দির, মসজিদ, গির্জার চত্বরে ভিড় বাড়ছে বটে, কিন্তু আশ্রয় মিলছে না। অজস্র প্রশ্ন জাগছে, উত্তর দেবার গুরুদেবের অভাব। সমস্যা অনেক, সমাধানের ইঙ্গিত নগণ্য।

এ অভিযোগ আজকের নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই ইয়োরোপের বুদ্ধিজীবীদের মনে এ অভিযোগ জমে উঠছিল; আজকে এর প্রাবল্য ও বিস্তৃতি — দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিকদের লেখায় প্রায়শই দেখতে পাচ্ছি একই ধরনের বিলাপ। সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনে নিদারুণ সংকট দেখা দিয়েছে, বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতাবোধ ব্যক্তিকে জীবনবিমুখ করে তুলেছে, মানবিক সম্পর্ক দূষিত হয়েছে, পারিবারিক সম্পর্কে ভাঙন ধরেছে, সামাজিক ও নৈতিক মান নেমে এসেছে, মানবিকতার মর্যাদা ছেড়ে দ্রব্য ও অর্থের মর্যাদাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

শিল্প সাহিত্যে এরই অনুরণন। টি. এস. এলিয়ট লিখেছেন, "And now you live dispersed ..... And no man knows or cares who is his neighbour!" আর এক জায়গায়, "Do you know — it no longer seems worthwhile to speak to anyone. No, it is not that I want to be alone. But that everyone's alone — or it seems to me." সম্প্রতি গল্প উপন্যাসের নায়কদের মধ্যে তাই বারবার 'আউটসাইডার'-এর দেখা মেলে। কলিন উইলসন বলেছেন, এই 'আউটসাইডার' জীবনের ফাঁকি ধরে ফেলেছে। সামঞ্জস্যহীন জীবন। শৃঙ্খলা নেই জীবনে!

বারবুসের 'লা এনফার'-এর নায়ক তাই একটা হোটেলের ঘরে, জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, একটা ছোট্ট ফোকরে চোখ রেখে চলমান জগতের দিকে তাকিয়ে আছে। এইভাবেই নাকি সে জীবনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছে। সে দেখছে বিশৃঙ্খলা আর ছন্দপাত! আনন্দ নেই, নেই ভবিষ্যৎ। এইচ. জি. ওয়েলস্-এর "Mind At The End of Its Tether"-এ-ও সেই একই সুর ধ্বনিত হয়েছে .... "The end of everything we call life is close at hand and can not be evaded." আলবার্ট কামুর 'লা এসট্রেনজারে', হেমিংওয়ের প্রথমদিকের লেখাতেও সেই একই কথা; শূন্যতা,

বিচ্ছিন্নতা, ... আর মনের বিক্ষিপ্ততা! জাঁ পল সার্ত্রর একটি গল্পের নায়ক রোকোয়েনটিন-এর ভাষায় বলা চলে — "The nausea is not inside me : I feel it out there, in the wall, in the suspenders, every where around me. It makes itself one with cafe; I am the one who is within it". পচন ধরেছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ..... দুর্গন্ধে বমনোদ্রেক হওয়াই তো স্বাভাবিক। আমাদের দেশের সাহিত্যেও হালে এই ধরনের চরিত্র আমদানির চেষ্টা চলেছে এবং সে চেষ্টাটা চলছে প্রগতিবাদের নামে, নতুনত্বের অজুহাতে।

ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ যে ঘটেছে ও সমাজমানস থেকে ব্যক্তিমানস ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে — এ নিয়ে দ্বিমত নেই। খণ্ডিত সত্তার প্রতিফলন দেখছি শুধু সাহিত্যিকদের লেখায় নয়, মানুষেব জীবনেও। দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতা জীবনকে অস্থির করে তুলেছে।

একদিকে সমাজজীবনে বিরাট সম্ভাবনা ও সাফল্যের ইঙ্গিত সূচিত হচ্ছে, অন্যদিকে অসাফল্য ও নৈরাশ্যবোধ ব্যক্তিমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। নিউরোটিক ও সুইসাইডের সংখ্যা দ্রুত বর্ধমান। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা অঙ্গীকৃত হলেও, থাকছে অলভ্য রাজ্যে। তাই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ব্যক্তি সমাজজীবন থেকে। সব কিছু ভেঙে ফেলতে চাইছে অন্ধ বিদ্রোহের নেশায় অথবা সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। আর না হয় উন্মাদ আশ্রমের অতিথি হয়ে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস করছে।

দার্শনিক মহলে সাড়া জেগেছে! অস্ত্রে শান দিয়ে নতুন লড়াই-এর জন্য সবাই প্রস্তুত। পজিটিভিস্টরা ম্যাক্-এর দেউলিয়া তত্ত্ব নবকলেবরে হাজির করেছেন। একশো বছরের পুরানো কিয়েরকেগার্ড-এর অস্তিত্ববাদতত্ত্ব জেসপার, সার্ত্র, মারসেল, কামু প্রমুখের দৌলতে নতুন জৌলুস নিয়ে জ্বলে উঠেছে। এঁরাই বোধ হয় বর্তমানে সব থেকে বেশি সক্রিয়।

"আমি আছি" — শুধু এইটুকুই সত্য, আর সব ধোঁয়া। বিচার বিবেচনা, কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় — এঁরা বলেছেন, অর্থহীন। জাগতিক সবকিছু বর্তমান সমাজবুদ্ধির অগম্য, রহস্যময়। মানবিক সম্পর্কের উন্নতি এঁরা চান না, কেননা সেটা অসম্ভব;মানুষ তো বিচ্ছিন্ন হয়েই আছে, বলতে গেলে শত্রুপুরীতেই বাস করছে। সমাজ আর রাষ্ট্রের দাপটে ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত হচ্ছে, ব্যাহত হচ্ছে। এ বিচ্ছিন্নতার তরঙ্গ রোধিবে কে? পারমাণবিক যুদ্ধরোধের প্রয়োজনই বা কি? মরতে শেখাই এই অস্তিত্ববাদীদের জীবনদর্শন। কামুর ভাষায়, "Death and the absurd are here the principles of the only reasonable freedom."

ধর্মধ্বজীদের মধ্যেও চাঞ্চল্য জেগেছে। ধর্মরাজ্য পুনঃস্থাপনের আশায় এঁরা মেতে উঠেছেন। নতুন ধর্ম, নতুন দুর্গ গড়বার আশায় পশ্চিমি পণ্ডিতগণ ইস্টার্ন মিস্টিকদের জীবনী লেখায় মনোনিবেশ করেছেন। বিজ্ঞানযুগের মিথ্যা অভিমান ছাড়বার জন্যে মানুষকে পরামর্শ দিচ্ছেন। যন্ত্র ছেড়ে আবার তন্ত্রমন্ত্রের যুগে ফিরে যাওয়া কি সম্ভব? গেল কয়েক বছর ওদেশে ক্যাথলিক পার্টিগুলির প্রভাব বেড়েছে। এদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পানাকাঙ্ক্ষীর ভিড়ও বাড়তির দিকে। জগন্নাথের স্নানযাত্রায় বা কুম্ভমেলায় পুণ্যলোভাতুর তীর্থযাত্রীর সংখ্যাও কমেছে বলে মনে হয় না। গুরুদেব, গুরুদেবীদের ভক্তসংখ্যা যে বর্ধমান, একথা পরিসংখ্যানের সাহায্য না নিয়েও বলা চলে। কিন্তু তবুও তো কমছে না নিউরোটিক

সুইসাইডের সংখ্যা। মনের ভাঙন ও বিচ্ছিন্নতা রোধ করা যাচ্ছে না। জীবনতৃষ্ণা মিটছে না। নীতিবোধ ও মানবিকতাবোধের উন্নতি হচ্ছে কোথায়? কালোবাজারি ও ঘুষখোরের আধিপত্য সমানে বেড়ে চলেছে, আর তেমনি বেড়ে চলেছে একচ্ছত্র পুঁজিবাদের ব্যাদানবিস্তার। সেই বিস্তার সঙ্কুচিত করার ব্যবস্থা অনেক রাষ্ট্রের সংবিধানে থাকলেও তাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে, যে সব বিধিবিধান ও প্রতিষ্ঠান অন্য এক যুগের জনকর্ম ও অভ্যাসকর্মের ওপর গড়ে উঠেছিল, এ যুগের সমস্যা সমাধানে তারা অপারগ। এ যুগের মানবিক সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা রোধ করতে তারা অক্ষম।

হাহাকার ছেড়ে এবার প্রতিকারের কথায় আসা যাক্; রোগের কারণ নির্ণয় তার আগে দরকার। উনিশ শতকে, এমনকি বিশ শতকের গোড়ার দিকেও, বুদ্ধিজীবীরা (যখন অস্তিত্ববাদ ও নির্জ্ঞানতত্ত্ব দ্বারা পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয় নি) এই বিচ্ছিন্নতাবোধকে ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা অসুস্থতা বলে মনে করতেন। শীলার, কোলরিজ বা শেলীকে ব্যতিক্রম বলেই ধরা হত। ভ্যানগগ একটা বৈচিত্র্য। সাধারণ মানুষ এমন হয় না। কিন্তু ক্রমশ এই রোগের বিস্তার ঘটতে লাগল। বিশেষ করে, প্রথম মহাযুদ্ধ মানুষের নীতিবোধকে দিল বেশ বড়ো রকমের নাড়া। ঠিক এমনি সময়ে ফ্রয়েডীয় 'নির্জ্ঞান মনের' তত্ত্ব ইউরোপ থেকে আমেরিকায় আমদানি হয়েছে। সেখানকার মনস্তাত্ত্বিকেরা জেমস-এর 'মানসিক অন্দরমহলের' আধুনিকতম সংস্করণ হিসেবে 'নির্জ্ঞান-তত্ত্ব'কে বরণ করে নিলেন। ডলারপুষ্ট ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ইউরোপে পুনঃরপ্তানি হয়ে ভালো বাজারই পেল। নৃশংসতার, জিঘাংসার, ঈর্ষা-দ্বেষের কারণ তাঁরা খুঁজে পেলেন মানুষেরই মনের গভীরে। দয়া, মায়া, প্রেম ইত্যাদি মানবিক সম্পর্কবোধ আসলে সমাজসভ্যতার একটা বাহ্যিক আবরণ মাত্র। আত্মকেন্দ্রিক প্রবৃত্তিসর্বস্ব মানুষকে কতটুকুই বা সামাজিক করা যায়? সামাজিকীকরণের মূল্য আবার নিউরোসিস। অসম্ভব এই নির্জ্ঞান মনের দুর্বার প্রবৃত্তিকে বাঁধ দিয়ে আটকাবার চেষ্টা। ক্যানিউট-এর সাগরতরঙ্গ রোধের চেষ্টার মতোই হাস্যকর। নিউরোটিক, সুইসাইড ও সমাজদ্রোহীর দল নতুন করে নিজেদের বুঝতে শিখল ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের দৌলতে। "It is human nature that is wrong, not me!" — ভাবল তারা। বেশ একটা আত্মপ্রসাদ এল। এ ছাড়া ফ্রয়েডের রতিসর্বস্ব তত্ত্বের একটা আলাদা মাদকতাও ছিল। বুদ্ধিজীবীরা এতদিনে যেন হদিস পেলেন সমাজবিন্যাসের। ফ্রয়েডের মতে "Man constructs his world out of appearances and science is the description and organisation of these appearances"! এই সাবজেকটিভ ধ্যানধারণার প্রসারে বিচ্ছিন্নতা ও নির্জনতাবোধ প্রশ্রয় পেল। নিউরোসিস ব্যতিক্রম নয়, নিয়ম;এই ধারণা জন্মাল মানুষের মনে। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর ইয়োরোপে ফ্রয়েডীয় প্রভাবে ভাঁটা পড়লেও আমেরিকায় এখনও চলছে পূর্ণ জোয়ার।

কিন্তু প্রতিকারের কোনো উপায় ফ্রয়েডের তত্ত্বে নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যে মানবতাবোধের পুনর্জন্মের জন্য হাহাকার তুলেছিলেন সমাজপ্রেমিকের দল, ফ্রয়েডতত্ত্ব সেই মানবতাবোধকে দিল প্রচণ্ড আঘাত। তিনি বললেন, "Society was now based on complicity in the common crime (of patricide); religion was based on the sense of guilt and morality was based partly on the exigencies of

this society and partly on the penance demanded by the sense of guilt." নীতিবোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আশা ফ্রয়েডবাদে নেই — অত্যন্ত নির্লজ্জ প্রতিক্রিয়াশীল ছাড়া আর সকলেই সেটা বুঝলেন। তাছাড়া ১৯৩২ সালে আইনস্টাইনের কাছে তিনি লিখলেন — যুদ্ধ এড়ানো যায় না। "It seems quite a natural thing, no doubt it has a good biological basis, and in practice it is scarcely avoidable." এর পর ফ্রয়েডবাদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা আর কিছুই রইল না।

তবু কিন্তু অনেকে আজও ইয়ুং, এ্যাডলার, ফ্রমকে নিয়ে মাতামাতি করেন। ফ্রয়েডের সঙ্গে অতি সামান্য পার্থক্য এঁদের। বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানীদের লেখায় প্রায়ই এঁদের উদ্ধৃতি দেখা যায। তাই এঁদের কথা তুলতে হচ্ছে।

ইয়ুং সম্বন্ধে একজন আমেরিকার লেখক বলেছেন, "Freud actually walked this path for a long distance himself. He went to the length of postulating unconscious fears of incests and castration that we supposedly inherited from our barbarous ancestors, Jung carried this theory of a 'racial unconscious' even further to the point of imagining superior and inferior peoples. He carried his theories to their logical conclusion and accepted an official position from the Nazis [Furst, J, 1954 : p.65] অলমিতি বিস্তারেণ। আর এ্যাডলার আমদানি করেছেন ক্ষমতাসর্বস্বতা, ফ্রয়েডের কামসর্বস্বতার বদলে। নীৎসে এ বিষয়ে তাঁর পূর্বসূরী। ব্যক্তিমাত্রেই ক্ষমতালোলুপ। সমাজে অমানবিক যত কিছু ক্রিয়াকলাপ — এই ক্ষমতালোলুপতাই তার মূলে। তিনি বলেন, বিচ্ছিন্নতাবোধের মূলে রয়েছে ক্ষমতা না পাওয়ার দরুণ বিষণ্ণতা ও হীনম্মন্যতা। এ্যাডলারের এই বাণী সমাজের আসল সমস্যা থেকে মানুষের নজর সরিয়ে আনার একটা অপকৌশল মাত্র। যে সমাজের প্রতি তিন জনে একজন উপবাসী, যে সমাজে শতকরা তিরিশ জনের মাথার ওপর আবরণ নেই; সেখানকার সকলে ক্ষমতার লড়াইয়ে মেতে আছে বলা মানুষকে অপমান করা। সমাজের ওপরতলার লোভের লড়াইকে সকলের লড়াই বলে চালাবার চেষ্টা আর পশুজগতের 'স্ট্রাগল ফল একজিসটেন্স' তত্ত্বকে মানুষের সমাজে প্রয়োগ করার ধৃষ্টতা — একই ধরনের অজ্ঞানতা অথবা ভণ্ডামি।

এরিক ফ্রম গেল শতকের পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামো ও বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করে দেখাতে চেয়েছেন, ধনতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের চেয়ে উন্নততর সভ্যতা। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হবার পর থেকে তার ভিতর যে সব গলদ দেখা দিয়েছে, ধীরে ধীরে যে সব গলদ আজ দূষিত ঘায়ের মতো দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, সে সব গলদের দিকে ফ্রমের নজর পড়ে নি তা নয়; তিনি "Escape From Freedom"-এ এই তত্ত্ব খাড়া করেছেন যে ধনতন্ত্র মানুষকে দিয়েছিল মুক্তি, দিয়েছিল স্বাধীনতা; কিন্তু সে মুক্তি মানুষের সইল না, তাই সে স্বেচ্ছায় ফ্যাসিবাদের একনায়কত্ব বরণ করে নিয়েছে! ফ্যাসিজমের উদ্ভবের এই উৎকট তত্ত্ব অধিকাংশ মানুষ মেনে নেবেন না, আমি বিশ্বাস করি। এখানেও দেখতে পাই সেই পুরানো ফ্রয়েডীর ধারণার প্রভাব। সেই সনাতন সহজাত প্রবৃত্তির নয়া জয় জয়কার, অবশ্য একটু

প্রচ্ছন্নভাবে। 'সমাজতন্ত্রকে' বিকল্প সমাজব্যবস্থা হিসেবে ফ্রম অভিনন্দিত করলেও সে ব্যবস্থা গড়ে উঠবার যে পন্থা নির্দেশ করেছেন তাকে ইউটোপিয়ান ছাড়া কিছুই বলা চলে না। নতুন সমাজ গড়ার আগে এই "Sick society"র প্রতিটি ব্যক্তিকে মনসমীক্ষা দ্বারা সুস্থ করতে হবে — এ পরিকল্পনা উদ্ভট।

ফ্রয়েডপন্থী সমাজতাত্ত্বিকরা অনেক সময় বর্তমান সমাজবিন্যাস ও সংস্কৃতির কথা তুলেছেন, একথা সত্যি। তবে তাঁরা সাধারণভাবে শিশু মাতা সম্পর্কের বিকৃতি ও শৈশবকালীন বঞ্চনা হতাশাকেই নিউরোসিস তথা বিচ্ছিন্নতার একমাত্র বা প্রধান কারণ বলে উপস্থাপিত করেছেন। মীড বলেছেন, মানুষের চরিত্র গঠনের মূলে আছে — "nursing, weaning, toilet training and infant feeding"। শৈশবে এর যে কোনো একটির বিশৃঙ্খলা ঘটলে মানুষ অসামাজিক ও মনোবিকারগ্রস্ত হতে বাধ্য।

মনে হয় মীড বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শ্রেণী সংঘাত, ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে এড়িয়ে যাবার জন্য শিশুর জৈব প্রয়োজনবোধকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন।

এ্যাডলারের কথা আগেই বলেছি — শ্রেণীবিশেষের ক্ষমতালোলুপতাকে তিনি সর্বমানবিক সহজাত প্রবৃত্তি বলে মনে করেছেন। আমাদের সামাজিক প্রবৃত্তির চেয়ে একে অনেক বেশি শক্তিশালী মনে করে হতাশা প্রকাশ করেছেন।

এ্যাডলার বলেছেন, "The social feeling exists within us and endeavours to carry out its purpose, it does not seem strong enough to hold its own against all opposing forces"।

বিচ্ছিন্নতার কারণ নির্ণয়ে বা প্রতিকার পরিকল্পনায় ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই আসছে না। বরং মনে হয়, ফ্রয়েডীয় ধ্যানধারণা মানুষের বিচ্ছিন্নতাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করছে।

বিচ্ছিন্নতার মূল কারণের হদিস কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানই দিতে পারে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান পাভলভের মস্তিষ্কবিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞান প্রকৃতিবিজ্ঞানের সমগোত্র — বিষয়গত (objective) পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে পুষ্ট।

সমাজকে বুঝতে গিয়ে পাভলভের পূর্বসূরীরা দ্বান্দ্বিক বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। প্রাকৃতিক বিবর্তন আর সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে একটা মস্ত বড়ো গুণগত পার্থক্য এঁদের চোখে পড়েছে। প্রকৃতি আপনা থেকে বিবর্তিত হচ্ছে — আর সমাজ পরিবর্তনে মানুষ সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। মানুষ এখানে নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র নয়। "Everything that sets men acting must find its way through their brain" (এঙ্গেলস)। মানুষ কাজ করে সজ্ঞানে, পূর্বপরিকল্পনানুযায়ী, নির্জ্ঞান মনের অন্ধ জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায় নয়। বাবুই পাখির বাসা বাঁধা, মৌমাছির চাক গড়া — এগুলো পাভলভের ভাষায়, আনকনডিশন্‌ড রিফ্লেক্স বা ইন্‌স্‌টিংটিভ অ্যাকটিভিটি।

"What distinguishes the worst of architect from the best of bees is in this that the architect raises his structure in imagination before he erects it in reality" (মার্কস)। সে তার শ্রম দিয়ে নিরন্তন সজ্ঞানে প্রকৃতিকে

পরিবর্তিত করার চেষ্টা করছে। শুধু পরিবর্তন ঘটাচ্ছে বললে ঠিক হবে না। "He not only effects a change of form in the material on which he works, but he also realises a purpose of his own that gives the law to his modus operandi" (মার্কস)। মানুষ কাজ করে তার জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে, মানুষ কাজ করে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে। ব্যক্তিগতভাবে মানুষ চিরদিন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করে আসছে। সমাজতান্ত্রিক দেশের পাঁচ বা সাতসালা পরিকল্পনা সেই উপলব্ধির সম্প্রসারণ। মানুষের আচার ব্যবহারের সব সময় একটা উদ্দেশ্য ও অর্থ আছে। আর সেই উদ্দেশ্য ও অর্থ বোঝবার জন্য অবচেতন মনে অবগাহন করার প্রয়োজন নেই। উদ্দেশ্য ও অর্থ সময় সময় অনুমান সাপেক্ষ হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানবুদ্ধির বোধগম্য। সামাজিক স্থিতি ও পরিবর্তন মানুষের উদ্দেশ্য প্রণোদিত কার্যকলাপ লব্ধ ফল। এদিক দিয়ে বিচার করলে বলা চলে, সামাজিক পরিবর্তন অনেকাংশে বিষয়ীগত (subjective)। মোট কথা সমাজে যা ঘটছে — তার জন্য ব্যক্তিই দায়ী; "Man must be made to understand that he is both creator and master of the world, that on him rests the responsibility of all that is evil in the world, and that to him belongs also the glory for all that is good in life" (গোর্কি)। তবে এটাও মনে রাখা দরকার খেয়ালখুশি মতো এই উদ্দেশ্য আরোপ করা চলে না, খেয়ালখুশি মতো পরিবর্তন ঘটানো যায় না।

সব অবস্থায় সব কিছু করা সম্ভব নয়। পরিকল্পনা বহির্বাস্তবের ওপর নির্ভর না করে যদি শুধু কল্পনার ওপর নির্ভরশীল হয়, আমরা তাকে বলি — ইউটোপিয়ান। অতীতের শ্রমলব্ধ ফল বর্তমানকে সমৃদ্ধ করে। মানুষ সেই বর্তমানকে পূর্বলব্ধ জ্ঞানবুদ্ধির খাতে প্রবাহিত করে নিয়ে চলে ভবিষ্যতের ফল সমুদ্রের দিকে, লাভ করে নতুন জ্ঞান। নতুনতর, মহত্তর উদ্দেশ্য আরোপিত হয় তার পরিকল্পনায়, তার ক্রিয়াকলাপে। সামগ্রিক আচরণের রূপান্তর ঘটে, নতুন মানবিক সম্পর্ক স্ফুরিত হয়। পুরানো দিনের নীতিবোধ, মূল্যবোধ, অভ্যাসকর্ম, যদি চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়; তাকে ভেঙে-চুরেই মানুষ এগিয়ে চলে। গড়ে ওঠে নতুন অভ্যাসকর্ম, নীতিবোধ ও মূল্যবোধ। এই ভাবেই সমাজে রূপান্তর ঘটছে কখনও দ্রুত জেট প্লেনের গতিতে, আবার কখনও ঠিক উল্টো, দুলকি চালে, পাল্কি চলার ছন্দে, — মৃদু গতিতে। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকে যদি বিভ্রান্ত করা না হয় অথবা সজ্ঞানে পরিকল্পিত পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের পথে যদি স্বার্থান্বেষীর উদ্দেশ্য প্রণোদিত বাধা না আসে, তবে সামাজিক রূপান্তর ও ব্যক্তিমানসের তদনুযায়ী পরিবর্তন (যথা নতুন কার্যক্রম ও ধ্যানধারণার উপলব্ধি) অনেকটা সহজভাবে ঘটতে পারে ও ঘটেও থাকে।

কিন্তু বাধা আসছে। পরিকল্পনামাফিক উৎপাদন ও তদনুযায়ী সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তনের প্রধান বাধা পুরানো ব্যবস্থায় লাভবান ব্যক্তি মালিকানার প্রবক্তাদের তরফ থেকে আসছে। ফলে সামাজিক দ্বন্দ্বসংঘাত তীব্রতর হচ্ছে, মানসিক দ্বন্দ্ববিরোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংগঠিত যৌথশ্রমের মিলিত প্রচেষ্টায় উৎপাদন হচ্ছে, অথচ উৎপন্ন পণ্যের ভোগ বণ্টনে বা উৎপাদনের পরিকল্পনায় শ্রমিকদের কোনো অধিকার থাকছে না। মালিক ও শ্রমিকদের

মধ্যেকার সম্পর্ক ক্রমশ নৈর্ব্যক্তিক ও তিক্ততর হয়ে উঠছে। পরস্পরের মধ্যে বোঝাবুঝির ও সহৃদয়তার অভাব ঘটছে। নতুন পরিস্থিতিতে উৎপাদনে ব্যক্তি মালিকানা ও পণ্যের বণ্টনবৈষম্য — ক্রমশ অচল বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে।

বিচ্ছিন্নতা কি উৎপাদন বণ্টন ব্যবস্থার বৈষম্য ও বৈপরীত্যের ফল? গত কয়েক বছরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করেছে। আণবিক বিস্ফোরণকে আয়ত্তে আনতে পারার ফলে অমিত শক্তির অধিকারী আজ মানুষ। ইলেকট্রনিক্সের দ্রুত উন্নতির ফলে যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়তা আজ সহজ, সুলভ। সামনে নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত — যার আভাসে আজ মানুষ মাত্রই চঞ্চল। বিজ্ঞানের এই নববিপ্লবলব্ধ তথ্য কৌশল প্রয়োগে সব রাষ্ট্রই তৎপর। কারিগরি ও বিজ্ঞানশিক্ষার নতুন পাঠক্রম তৈরি হচ্ছে দেশে দেশে। রাষ্ট্রনায়করা বাধ্য হচ্ছেন শিক্ষার বিস্তারে সহায়তা করতে। ফলে মানুষের পুরানো শিক্ষা যে মানসিকতা ও হৃদয়বৃত্তি গড়ে তুলছিল, সেগুলো নতুন শিক্ষার সংঘাতে ভেঙে পড়ছে। মানুষের বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট নির্দেশ আজ কোনো কৌশলেই গোপন রাখা যাচ্ছে না। বিজ্ঞানের নাট্যশালায় পটপরিবর্তন ঘটছে অতি দ্রুত — এত দ্রুত যে তার সঙ্গে তাল রেখে দর্শকদের মেজাজ পরিবর্তন হচ্ছে না, কারণ মেজাজ পরিবর্তনের জন্য সক্রিয় কোনো চেষ্টাই নেই। নতুন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ আজ স্তম্ভিত। অতীত বর্তমানের চিন্তাভারপিষ্ট, নিরাপত্তাহীন জীবনের উপযোগী মানসিকতা ও হৃদয়বৃত্তি ভেঙে পড়ছে; কিন্তু কল্যাণময় ভবিষ্যৎ সৃষ্টির উপযোগী মানসিকতা ও হৃদয়বৃত্তি গড়ে উঠছে না। বাধা দিচ্ছে অতীতের প্রেত — মালিকানার স্বার্থ আর সেই স্বার্থপুষ্ট কৌশলী অপপ্রচার।

পরিবর্তনের দ্রুততা বা যন্ত্রদানবের স্বাধিকার প্রমত্ততা এ বিচ্ছিন্নতার কারণ নয়; যতই বলুন না কেন রক্ষণশীল সমাজতান্ত্রিক মনস্তাত্ত্বিকদল। কারণ নিহিত রয়েছে অন্যত্র। এই প্রসঙ্গে রবার্ট কারাওয়ে বলেছেন "The primary source of 'alienation' is the development of social production accompanied by a growing division of labour .... private ownership and the break-up of society into hostile classes led to a situation in which the social division of labour 'alienates' from the workers some of the vital functions inherent in man's intellectual activity, the freedom to dispose of the product of his own labour, to have a say in the management of production etc ......" (World Marxist Review, October 1960)। কায়িকশ্রম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন বুদ্ধিজীবীরা আবার শ্রমিকদের নেই বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করবার সুযোগ সুবিধা। কারাওয়ে এই প্রবন্ধে যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে মানুষ (বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী সকলেই) পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় তার শ্রমলব্ধ ফলের ওপর অধিকার হারিয়ে ক্রমশ অসহায় হয়ে পড়ছে। সে শ্রম করে যান্ত্রিকভাবে। যন্ত্রেরই একটা ছোটো দাঁতে আটকে গিয়ে যন্ত্রের গতির সঙ্গে ঘুরপাক খাচ্ছে। অর্থ ও উদ্দেশ্য আরোপিত হচ্ছে না তার কাজে, কাজেই তার আচারব্যবহারেও দেখা দিয়েছে অর্থহীন বিশৃঙ্খলা। বিচ্ছিন্নতার কারণ যন্ত্র নয়, যন্ত্রকে উদ্দেশ্যপরিপূরক হিসাবে

ব্যবহার করার স্বাধীনতার অভাব। অন্যত্র ঐ প্রবন্ধেই আছে, "Capitalism signifies the domination of things over man : under capitalism the social and personal relations between people are dominated by these things not only in their minds, but also in reality, all the way to every day life ..... In a milieu where everything is bought and sold, the bourgeoisie marries not the woman but her dowry, friends are made for what can be got out of them, the thought of the legacy ousts love of parents; man is not respected for his personal qualities but for his wealth or for the position he occupies....." এই সমাজব্যবস্থায় মানুষের জন্য শ্রম নয়; শ্রমের জন্য মানুষ, মুনাফা বাড়াবার জন্য মানুষ। সৃষ্টির তাগিদে মানুষ এখানে কাজ করে না, কাজ করে তার জৈব প্রয়োজন মেটাতে। ঘানিগাছে জুড়ে দিয়ে তাকে অবিরত পাক দেওয়া হচ্ছে। যন্ত্রদানব পাক দিচ্ছে না — পাক দিচ্ছে যন্ত্রদানবের মালিকের দল। তাই মার্কস বলেছিলেন — "estranged labour makes man's species life a means to his physical existence"। শুধু শ্রমজীবী নয়, বুদ্ধিজীবীকেও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বাজারদরে বুদ্ধিশ্রমকে বেচতে হয়। চাহিদা তৈরির কর্তা সেই মুনাফা সন্ধানী মালিকগোষ্ঠী। সাহিত্য শিল্পও তাই এই সমাজের উৎপাদন নীতি মেনে চলতে বাধ্য। বিচ্ছিন্নতার বিলাপ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি যত হয় — এ রোগের সমাধানের ইঙ্গিত নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। কেননা সেটা মালিকগোষ্ঠীর অভিপ্রেত নয়, তাই তার চাহিদাও নেই। উদ্দেশ্যহীন নোঙরছেঁড়া ভাবে শুধু জৈব প্রয়োজন মেটাতে কাজ করে চলেছে মানুষ।

এই পারপাস বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাভলভ কি বলেছেন দেখা যাক : "Human life consists in the attainment of every possible sort of purpose to which is applied every degree of human energy ...... An analysis of the activity of animals and of human beings leads me to the conclusion that among the reflexes there must exist a special one – the reflex of purpose – an aspiration to the attainment of a definite exciting object, using attainment and object in the broad sense of the term." (আই. পি. পাভলভ — 'লেকচার্স অন কনডিশন্‌ড রিফ্লেক্সেস')। পাভলভ এই রিফ্লেক্সটির ওপর যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তার প্রমাণ মেলে এই উদ্ধৃতি থেকে : "The reflex of purpose is of great and vital importance; it is fundamental form of life energy to us all .... All life, all its improvement and progress, all its culture are effected through the reflex of purpose .....". উদ্দেশ্য পরিপূরণের পথে বারবার বাধা পড়লে এই 'রিফ্লেক্স অফ পারপাস' ক্রমশ দুর্বল হয়ে একেবারে নিভে যেতে পারে। উপবাস করতে বাধ্য হলে, আমরা জানি, কয়েকদিন পরেই খিদে চলে যায়। ফুড রিফ্লেক্স আর সক্রিয় থাকে না। জীবনের স্বাভাবিক ক্ষুধা যদি বারবার বাধা পায়, প্রধান পরাবর্ত (reflex) যদি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে, তাহলে জীবনের প্রতি আকর্ষণ নিঃশেষ হয়ে

যাবার সম্ভাবনা। আর তাই ঘটেও থাকে। বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ হয়। মাত্র কয়েক বছর আগেও — পাভলভ লিখেছেন, — চীনদেশে নাকি টাকা দিয়ে ফাঁসি কাঠে ঝোলবার জন্য মূল আসামির পরিবর্তে ভাড়া করা আসামি পাওয়া যেত।

বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারাতেও বিকৃতি ঘটছে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজের অভাবে ও উৎপন্ন দ্রব্যের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে তাদের চিন্তাধারাও হয়ে উঠেছে অর্থহীন। তাই সত্যকে মনে করছে মায়া, মায়াকে মনে করছে সত্য। 'প্যারানইয়া'র প্রসার ঘটছে।

পৃথিবীটাই আজ বিচ্ছিন্ন। ভেঙে যেন দুটো আলাদা টুকরো হয়ে নতুন কেন্দ্রে ঘুরপাক খাচ্ছে। চিন্তাবিদদের দুই ভিন্নমুখী চিন্তায় সাধারণ মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত ও উৎকেন্দ্রিক। একদল, পুরানো সমাজব্যবস্থা ও তদানুষঙ্গিক ধ্যানধারণা, নীতিবোধ, মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ বজায় রেখে নতুন সম্ভাবনাকে ধীরে সুস্থে পুরানোর সঙ্গে জোড়াতালি দিয়ে মানিয়ে নেবার পক্ষপাতী — আর একদল অতীতের শবকে অগ্রগতির পথ থেকে সরিয়ে ফেলে, নতুন শক্তি ও পদ্ধতিকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে সমাজব্যবস্থার আমূল ও দ্রুত পরিবর্তন প্রয়াসী।

এই সমস্যা ও দ্বন্দ্ব চিরকালের নিঃসন্দেহ, কিন্তু আজকের তীব্রতা ও জটিলতা অভূতপূর্ব। কারণ আগেই বলেছি, মানুষের বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের বাস্তব রূপায়ণ যতই সুনিশ্চিত হচ্ছে, পুরানো স্বার্থের হতাশাজনিত আর্ত চিৎকার ও বাধাদান ততই বাড়ছে। তাই পারমাণবিক মারণাস্ত্রের ভারে বসুন্ধরা কম্পমান, মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত। তার সম্মুখে জীবজগতের সর্বাত্মক ধ্বংসের ছবি।

ভয় পাচ্ছে অনেকেই। ভয় থেকে জড়তা, অদৃষ্টবাদীর নিষ্ক্রিয়তা, — ফলে মানবিক সম্পর্কে অবনতি আর বিচ্ছিন্নতা। বিচ্ছিন্নতা আজ ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী। সমাজ থেকে গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠী থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে ব্যক্তিমানসে অনুপ্রবিষ্ট। এর প্রকোপ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতেও যে একেবারে অনুভূত হচ্ছে না এমন নয়। সোভিয়েত সাহিত্যেও এক আধটা আধা আউটসাইডারের দেখা মিলছে। অবশ্য দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। তা হলেও অন্য দেশের কাগজপত্রে শোরগোল উঠেছে। মাঝে মাঝে Tedyboys-দেরও দেখা মিলছে সমাজতান্ত্রিক দেশের রাজপথে। ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় সংখ্যা অতি নগণ্য হলেও, এদের উপস্থিতি বিচ্ছিন্নতার বিস্তারের নিদর্শন।

বিচ্ছিন্নতা আর তার ফল স্বরূপ নিওরোটিক, সুইসাইডের ক্রমবৃদ্ধির মূল কারণগুলোর হদিস দিতে পারা গেছে মনে হয়। এইবার দেখা যাক, প্রতিকারের উপায় আছে কি না? এবং থাকলে, তার প্রয়োগ সম্ভাবনা কতদূর? পাভলভ বলেছেন, 'রিফ্লেক্স অফ পারপাস' একেবারে মরে না — হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে। জীবন যখন শুকিয়ে যায় তখন করুণাধারাকে আবাহন করা চলে। জীবনকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রসসিঞ্চিত করে সতেজ করে তোলা চলতে পারে। ফুড রিফ্লেক্সের বেলায় বলেছেন;— 'with regular dietetic regime, a proper amount of food and a periodicity in taking it' — মরে যাওয়া ক্ষুধাকে জীইয়ে তোলা যায়। নিউরোটিক রোগীর চিকিৎসায় পাভলভিয়ানরা এই রকম ব্যবস্থাই করে থাকেন। ফলও পাওয়া যায় দেখা গেছে। কাজেই হতাশ রোদনের প্রয়োজন নেই। এ অবস্থা শাশ্বত সনাতন নয়। বিচ্ছিন্নতা ব্যাধিরও চিকিৎসা আছে। ব্যক্তিগত চিকিৎসার কথা

থাক। সমষ্টিগতভাবে এই পুঁজিবাদী সমাজেই এই ব্যাধির প্রতিরোধের কিছু কিছু ব্যবস্থা কারাওয়ের মতো মার্কসবাদীরা লক্ষ করেছেন।

বিচ্ছিন্নতা আজ শুধু শ্রমজীবী শ্রেণীতে নিবদ্ধ নয়। একচ্ছত্র পুঁজিব দাপটে ও প্রয়োজনে ক্ষুদ্রশিল্পে, ব্যবসায়েও সঙ্কট দেখা দিয়েছে। পুঁজিবাদের নিজস্ব নিয়মে ছোটোখাটো মালিকরা ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। একচ্ছত্র পুঁজিতে আবার পরিচালকের ক্ষমতাও ক্রমশ গৌণ হয়ে পড়ছে। অনেক যৌথ কোম্পানি যুক্ত হয়ে করপোরেশন, কারটেল, তৈরি হয়েছে। হোল্ডিং কোম্পানির রেওয়াজ বেড়ে চলেছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের দৌলতে পরিচালনাও ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। অনেক পবিচালক তাই কাববারের শুধু অংশীদাব হয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। মুনাফার পাহাড় জমছে বটে, কিন্তু সৃজনমূলক ও উদ্দেশ্যমূলক কাজের অভাবে এঁদের মধ্যেও বুদ্ধিবৃত্তি চালনার সুযোগ সীমিত, কাজেই এঁরা বাইবের জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে মনোজগতে সুড়ঙ্গ খুঁড়ছেন অথবা উদ্দেশ্যবিহীন বন্য জীবনের নেশায় মেতে নিজেদের ধ্বংস করছেন।

'অটোমেশন' গেল দশ বছরের শিল্প-সমাজে খানিকটা প্রভাব বিস্তার করেছে। আগামী কয়েক বছর এ-প্রভাব শিল্প-অগ্রসর দেশে হয়ে উঠবে বিস্তৃত। গ্রাম ও নগরীর ব্যবধান ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাবে। কায়িক শ্রম ও বৌদ্ধিক শ্রমের সীমারেখাও সঙ্কুচিত হয়ে আসার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়তা বেকারের সংখ্যাও বাড়াচ্ছে নিঃসন্দেহ।

একচ্ছত্র পুঁজিবাদের যুগে বিচ্ছিন্নতা হয়ে উঠছে ব্যাপক ও গভীর। শুধু শ্রমিকশ্রেণীকে নিঃস্ব করেই আজ একচ্ছত্র পুঁজির ক্ষুধা মিটছে না। প্রায় সর্বস্তরের অধিকাংশ মানুষের স্বার্থে সে আঘাত দিতে বাধ্য হচ্ছে। নিঃস্বতা, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ও তদ্দরুণ বিচ্ছিন্নতা জনসাধারণের প্রায় প্রতিটি স্তরেই আজ চোখে পড়ছে।

এই বিচ্ছিন্নতা বর্তমান সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বৈপরীত্যের ফল। পুরানো মূল্যবোধের জিগির তুলে একে দূর করা যাবে না। নিজের নিয়মে সামাজিক ভাঙন দ্রুত এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। এর অর্থ, বিচ্ছিন্নতা-প্রসূত এই সমাজব্যবস্থাব নেতিকরণের (negation) সর্বাত্মকপ্রস্তুতি তার নিজের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে। ভাঙনের পাশে পাশেই নতুন নীতিবোধ, নতুন মূল্যবোধের বনিয়াদ গড়ার কাজ চলেছে। নতুন ভাবাদর্শের, নতুন প্রতিষ্ঠানের ইমারত দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু তার ভিত্তিপ্রস্তরের আভাস সুস্পষ্ট। তার অস্তিত্ব বিচারসাপেক্ষ, কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। আগেকার দিনের সহযোগিতা ও মানবিক সম্পর্ক আজ চোখে পড়ছে না বটে, কিন্তু ধনতন্ত্রের প্রবক্তাদের বাধা ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও নতুন ধরনের সহযোগিতাভিত্তিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুনতর মানবিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে চলেছে।

প্রথম জাতিসংঘ গঠন নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। সংঘের সনদ দুনিয়ার মানুষের শান্তি সহযোগিতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব কামনার নিদর্শন। অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও জাতিসংঘ বিশ্বের রাজনীতিতে এক নতুন পরিমণ্ডল স্রষ্টা। অনস্বীকার্য যে, ইউনেস্কো ও জাতিসংঘের অন্যান্য সম্পূরক প্রতিষ্ঠান অন্তত আংশিকভাবে বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত। বলতে পারি, মানব ইতিহাসে এ এক উল্লেখ্য পদক্ষেপ।

দ্বিতীয়, সব দেশেই আজ শুনছি শান্তিকামী মানুষের বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সোচ্চার

অঙ্গীকার। এ এক নতুন নীতিবোধ ও মূল্যবোধের সূচনা। সর্বধ্বংসী পারমাণবিক যুদ্ধের ভীতি মানুষের সঙ্গে মানুষের একাত্মবোধকে এক নতুন স্তরে উন্নীত করেছে, যার কল্পনাও আমরা কয়েক বছর আগে করতে পারতাম না। এর মধ্যে ধনিকশ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী, বুদ্ধিজীবী, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক সকলেই রয়েছেন। এ আন্দোলনে আছেন ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া, ভারতবর্ষ, আফ্রিকার বহু মনীষী ও চিন্তাবিদ — যাঁদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক স্বার্থসম্পর্ক বা শ্রেণীগত ঐক্য নেই। এঁদের আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে মানবিক সম্পর্কের নতুন মূল্যায়নের চেষ্টা চলছে। মানুষ এই আন্দোলনের মধ্যে সন্ধান পেয়েছে অস্তিবাচক উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানীদের একটি বিশ্বসংস্থাও পারমাণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ চালাচ্ছেন। এইসব সংস্থার বক্তব্য ও প্রস্তাব গ্রহণে আমরা বারবার বিশ্বমৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের উল্লেখ দেখতে পাই। অবশ্য ঐ কথাগুলো অভিধানে ছিল, ব্যবহৃতও হত। কিন্তু আমরা এদের বিমূর্ত পরিকল্পনার সঙ্গেই পরিচিত ছিলাম। সন্দেহাতীতভাবে এ কথাগুলো আজ মূর্ত ও বিশেষ অর্থব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে।

তৃতীয়, এই ধরনের আন্দোলন ছাড়াও, কিছু কিছু গঠনমূলক আন্তর্জাতিক সংস্থার খবর আমরা জানি, যার মূল প্রেরণা আসছে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সহকর্মিতার সদিচ্ছা থেকে। উদাহরণস্বরূপ আমি ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান বৎসরের ক্রিয়াকলাপের ও দক্ষিণমেরু উন্নয়ন সংস্থার নাম করব। গাগারিনের মহাশূন্য পরিক্রমায় ইয়োরোপের অনেক মানুষ এমন আন্তরিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন — যা থেকে মনে হবে এ সাফল্য ব্যক্তি বা দেশ বিশেষের নয়, একে মানুষ জাতির সাফল্য বলেই তাঁরা মনে করেছেন। ইয়োরোপের টেলিভিশনের পর্দায় গাগারিন-এর সংবর্ধনা উপলক্ষে মস্কোর অনুষ্ঠান সরাসরি এই প্রথম প্রদর্শিত ও প্রচারিত হয়েছে। এ ঘটনার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

চতুর্থ, আজ জেটের যুগে পৃথিবীর পরিধি সংকীর্ণ। সংবাদ আদান-প্রদানই পরস্পরকে জানবার একমাত্র উপায় নয় আজ। টুরিস্টদের দল আজ হাজারে হাজারে এক দেশের খবর অন্য দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন; অন্য দেশের মানুষদের দেখছেন, জানছেন। এই দেখা ও জানার কিছুটা হয়তো গোয়েন্দাচক্রের জঘন্য উদ্দেশ্যে, কিন্তু বেশির ভাগই আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রবোধকে বাড়াচ্ছে ও বিচ্ছিন্নতারোধে সহায়ক হচ্ছে নিঃসন্দেহে। গত এক দশকে পৃথিবীর মানুষ পরস্পরকে জানবার ও বোঝবার অজস্র সুযোগ পেয়েছেন। তাই বলছি, বিশ্বমানবতা আজ আর আভিধানিক শব্দমাত্র নয় — তা স্পষ্ট ও মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিউবা ও কঙ্গো, এঙ্গোলা ও লাওসের রাজনৈতিক আবহাওয়া শুধু নয়, যে কোনো দেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও আজ দুনিয়ার প্রতি মানুষের মানসিক আবহাওয়াকে প্রভাবিত করছে। লুমুম্বার নামে আজ দেখছি মস্কোতে বিশ্ববিদ্যালয়, টেগোরের নামে ন্যু-ইয়র্কে পার্ক। লুমুম্বার হত্যাকাণ্ডে শুধু কঙ্গোলীদের মন নয়, বাংলা দেশের কবি হৃদয়ও আজ পীড়িত, বিচলিত।

পঞ্চম, অনুন্নত দেশকে সাহায্য দান নীতির মধ্যে হয়তো দাতা রাষ্ট্র বা তার মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থ থাকতে পারে, কিন্তু এই লেনদেন, দাতা গ্রহীতা দুই দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে নিশ্চয়ই সম্প্রীতি ও বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র ছেড়ে এবার জাতীয় ক্ষেত্রে আসা যাক। অগ্রগামী দেশগুলিতে

জনসাধারণের এক বিরাট অংশের মধ্যে একচ্ছত্র পুঁজির বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে — কোথাও মৃদু কোথাও তীব্র। আন্দোলনের কারণ রাষ্ট্রবিশেষে বিভিন্ন। অস্ট্রেলিয়া বা কানাডার আন্দোলনের কারণ আর বেলজিয়ামের কারণ এক নয়। বিভিন্ন স্থানের আন্দোলনের গুণ ও গতি আলাদা। পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে লর্ড রাসেল পরিচালিত ইংলন্ডের আধুনিক আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই আন্দোলনগুলো মূলত যুদ্ধ ও একচ্ছত্র পুঁজিবাদবিরোধী কিন্তু আগের মতো কেবল শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন নয়। বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই আন্দোলনের পুরোধা। এঁরা বাইরের চাপে বা শুধু অর্থনৈতিক কারণেই এ আন্দোলনে নেমেছেন ভাবলে ভুল হবে। এর মধ্যে আছেন বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী, ছোটো ও মাঝারি কারবারি ও আরও অনেকে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয় — জীবনবোধের তাগিদে তাঁরা একত্র হয়েছেন। সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতা মানবজাতির মুক্তি আন্দোলনে পরিণত হতে চলেছে। অনগ্রসর দেশগুলোতে ভারী শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণের পরিকল্পনা মাফিক পুঁজি বিনিয়োগের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। হয়তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একচ্ছত্র পুঁজির ষড়যন্ত্রে বা প্রভাবে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হচ্ছে না, কিন্তু মোটামুটিভাবে এই ব্যবস্থাকে আমরা একচ্ছত্র বিরোধী ব্যবস্থা বলতে পারি। রাষ্ট্রনায়কদের অসাফল্যে হয়তো জনসাধারণের মনে আপাতত নৈরাজ্যবোধ ও বিচ্ছিন্নতাবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিলীয়মান মরীচিকা স্বপ্ন জনসাধারণের মনে নতুন দিগন্তের স্বর্ণছবি তুলে ধরে নতুন আদর্শ ও মূল্য নিরূপণে, নতুন উদ্দেশ্য আরোপণে উৎসাহিত করছে না কি? পরিচয় স্বল্পতার জন্য আমরা তাকে স্বাগত জানাতে পারছি না। কারাওয়ের এইসব পর্যবেক্ষণ মোটামুটি বাস্তবসম্মত।

নতুন সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্যে যে মানসিকতা ও মূল্যমানের প্রয়োজন, মানব-চরিত্রে ধীরে ধীরে তারই উন্মেষ ঘটছে। জীবনের নতুন উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন আবিষ্কৃত হচ্ছে ও সেই উদ্দেশ্য-সম্পূরক পরাবর্ত সংগঠিত হচ্ছে। "If everyone of us will cherish within himself this reflex as the most precious part of his being and if parents and instructors of all ranks will make their chief problem the strengthening and developing of this reflex in the plastic masses .... then we shall become that which we should and can be". (Pavlov)

উপসংহারে বক্তব্য, পরমাণুযুগে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার অস্তিবাচক দিকের কয়েকটি ইঙ্গিতমাত্র এখানে দেবার চেষ্টা করেছি, তবে নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক দিকের শক্তি অবহেলার নয়। বিচ্ছিন্নতার নেতিকরণ স্বয়ংসিদ্ধ স্বয়ংক্রিয় ঘটনা নয়, মানুষের ভূমিকা এখানে মুখ্য। দৃষ্টি সদজাগ্রত রেখে, সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে অস্তিবাচক ধারাস্রোতকে প্রশস্ত ও বেগবান করে তোলার দায়িত্ব আমাদের। তবে সুস্থ মানবিকতাবোধ ও বিশ্বসৌভ্রাত্র বিকাশের পরিবেশ প্রস্তুত;আর মানবমস্তিষ্কে নতুন গুণসঞ্চারও সম্ভব। সুতরাং বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশার বিলাপ ক্লীবধর্ম, অনুচিত।

□ *বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ*, ১৩৮১

প্রগতি এবং দারিদ্র্য

ভবতোষ দত্ত

আজ থেকে একশ ছয় বছর আগে, ১৮৭৯ সালে, আমেরিকান সমাজবাদী হেনরি জর্জ (১৮৩৯-১৮৯৭) একখানি বই লিখে অল্প দিনের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে যান। বইটির নাম ছিল 'প্রোগ্রেস অ্যান্ড পভার্টি'। তাঁর প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল শিল্প এবং নগরায়ণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির দাম অভূতপূর্বভাবে বেড়ে যায়, এবং জমির মালিকের হাতে বিরাট অঙ্কের 'অনর্জিত উদ্বৃত্ত' (আন্-আরনড় ইনক্রিমেন্ট) আসে। এর ফলে, প্রগতির সঙ্গে দারিদ্র্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। হেনরি জর্জের প্রস্তাব ছিল : অন্যান্য সমস্ত কর তুলে দিয়ে শুধু জমির উপর কর বসানো হোক। তাতে সরকারের হাতে প্রয়োজনীয় টাকা আসবে, এবং অসাম্য দূর হবে।

তখনকার দিনের প্রতিষ্ঠিত অর্থশাস্ত্রীরা হেনরি জর্জকে আমল দেন নি, কিন্তু ব্রিটেনের ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী, এবং পরে শ্রমিক দল আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে দারিদ্র্যের সহাবস্থান নিয়ে অনেক আলোচনা করেন। ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের শতাধিক বছর তখন অতিক্রান্ত। একদিকে শিল্পপতিদের উত্থান, এবং অন্যদিকে শহরাঞ্চলে নূতন জমিদারশ্রেণীর অভ্যুদয় — এই দুইয়ে মিলে সমাজের একটা স্তরকে সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে নিয়ে যায়, এবং অন্যদিকে, শ্রম-নিয়োগ আর মজুরি বাড়া সত্ত্বেও, বেকারি আর দারিদ্র্যের প্রসার হতে থাকে। এই বিবর্তন তখন আমেরিকা আর জার্মানিতেও হতে আরম্ভ হয়েছে। জার্মানির বিসমার্ক প্রবর্তিত নানা ধরনের সামাজিক বীমা নিম্নস্তরে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যেরই প্রতিফলন। ব্রিটেনের 'পুয়োর ল' উনিশ শতকে কয়েক বার সংশোধন করা হয়, এবং শতকের শেষের দিকে শ্রমিককল্যাণের জন্য আইন রচনা করা হয়। ১৯০১ সালে রাউনট্রী-র সমীক্ষায় দারিদ্র্যের এক ভয়াবহ চিত্র প্রকাশ পায়।

তার পরে আর এক শতাব্দী প্রায় শেষ হয়ে আসছে। এই সময়ের মধ্যে সারা পৃথিবীতে দুটি মহাযুদ্ধ, একটি গভীর এবং দূরপ্রসারী বিশ্বব্যাপী মন্দা (১৯৩০) যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন, অনুন্নত দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা, উন্নত দেশের বিপুল সমৃদ্ধি — এই সবকিছুর মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে দারিদ্র্যের সমস্যা।

এ সমস্যা ভারতের মতো দেশে প্রকাশ্যে চোখে পড়ে, কিন্তু অন্য দেশেও দারিদ্র্যের অবলুপ্তি এখনও সম্ভব হয় নি। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কথা আলাদা। কিন্তু তাদের আয় এবং সম্পদ বণ্টনের পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ওইসব দেশে উচ্চতম আয় এবং নিম্নতম আয়ের মধ্যে এবং বিশেষত উচ্চতম সম্পদাধিকার আর নিম্নতম সম্পদাধিকারের মধ্যে পার্থক্য অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম।

বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় দিয়ে বিশ্ব ব্যাঙ্ক যে বার্ষিক সমীক্ষা বার করেন তাতে একটা উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ জনসংখ্যাকে আয় অনুসারে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে নিলে দেখা যায় — নিম্নতম (দরিদ্রতম) পঞ্চমাংশ অধিকাংশ দেশেই সকলের মোট আয়ের মাত্র পাঁচ থেকে সাত শতাংশের অধিকারী। হিসাবগুলি ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হলেও তথ্য সত্তরের দশকের শেষভাগের।

জনসংখ্যার নিম্নতম পঞ্চমাংশের ভাগে ভারতে পড়ছে আয়ের ৭·০ শতাংশ, বাংলাদেশে ৬·৯ শতাংশ, শ্রীলঙ্কাতে ৭·৫ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়াতে ৬·৬ শতাংশ, তাইল্যান্ডে ৫·৬ শতাংশ। কিন্তু এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কয়েকটি উন্নত দেশেও নিম্নতম স্তরে আয়ের অনুপাত প্রায় এইরকমই — যেমন, ব্রিটেনে ৭·০ শতাংশ, জাপানে ৮·৭ শতাংশ, পশ্চিম জার্মানিতে ৭·৯ শতাংশ, ডেনমার্কে ৭·৪ শতাংশ, সুইডেনে ৭·২ শতাংশ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৪·৬ শতাংশ। অর্থাৎ নিম্নতম আয়-স্তরে দারিদ্র্য প্রায় সব দেশেই এখনও একটা বড়ো সমস্যা।

অবশ্য এই পরিসংখ্যান একটা আপেক্ষিক চিত্র দেয়। আমেরিকার দরিদ্র আর ভারতের দরিদ্রের মধ্যে জীবনযাত্রার মানে আকাশ-পাতাল তফাত। আমেরিকাতে যে পরিবারকে দরিদ্র বলা হয় তাদের বাসগৃহ আছে, আসবাবপত্র আছে, হয়তো একটা দূরদর্শনযন্ত্র আর পুরানো গাড়িও আছে। ভারতের দরিদ্র অনাহারে বা অর্ধাহারে দিন কাটায়। ব্রিটেনে সরকারি সাহায্যের পরিমাণ এত বেশি যে, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কাজ করলে যা মজুরি পাওয়া যায়, কাজ না করে বেকারভাতা আর অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায় তার চেয়ে বেশি। দারিদ্র্যের সমস্যা সব দেশেই আছে; কিন্তু চরম দারিদ্র্য আছে শুধু ভারতে এবং তার সমতুল্য অন্যান্য অনুন্নত দেশে।

তাছাড়া, নিম্নতম পঞ্চমাংশের পরে তার উপরের স্তরগুলির দিকে তাকালে দেখা যায়, সমৃদ্ধ দেশগুলিতে নীচের দিক থেকে বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ পঞ্চমাংশ দেশের মোট পারিবারিক আয়ের একটা খুব বড়ো অংশ ভোগ করে। একত্র করে দেখা যায় যে, দেশের ৮০ শতাংশ লোক মোট পারিবারিক আয়ের ৫১ শতাংশ পায় ভারতে। এই অনুপাত বাংলাদেশে ৫৮ শতাংশ, শ্রীলঙ্কাতে ৫৭ শতাংশ। অন্যদিকে, ব্রিটেনে দেশের মোট পারিবারিক আয়ের ৬০ শতাংশ আসে জনসংখ্যার ৮০ শতাংশের হাতে। এই অনুপাত জাপান আর পশ্চিম জার্মানিতেও প্রায় ৬০ শতাংশ, সুইডেন আর নরওয়েতে প্রায় ৬৩ শতাংশ, কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ শতাংশ। অর্থাৎ আর্থিক অসাম্য ভারতে আর আমেরিকাতে আপেক্ষিকভাবে প্রায় একই রকমের।

যদি দেখা যায়, জনসংখ্যার উচ্চতম ১০ শতাংশ মোট আয়ের কতটা ভোগ করে, এই অসাম্যের চিত্র তাহলে আরও প্রকট হয়।

ভারতে এই এক-দশমাংশ লোকের ভাগে আসে ৩৩·৬ শতাংশ, বাংলাদেশে ২৭·৪ শতাংশ, শ্রীলঙ্কাতে ২৮·২ শতাংশ, ব্রিটেনে ২৩·৪ শতাংশ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৩৩·৪ শতাংশ, নরওয়ে আর ডেনমার্কে ২২ শতাংশ, সুইডেনে ২১ শতাংশ।

সর্বাপেক্ষা ধনী দশ শতাংশের ভাগ সমাজতান্ত্রিক দেশে নিশ্চয় অনেক কম, কিন্তু

স্ক্যানডিনেভিয়ার দেশগুলিতেও অসাম্য লক্ষণীয়ভাবে কমিয়ে আনা হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না; পাওয়া গেলে হয়তো দেখা যেত, উচ্চতম স্তরে অল্পসংখ্যক পরিবার দেশের সম্পদ তথা আয়ের বেশ বড়ো একটা অংশের মালিক।

হেনরি জর্জ তাঁর বইয়ের যে নাম দিয়েছিলেন সেই নাম এক শতাব্দী পরেও ভারতে তথা আরও অনেক দেশের অসাম্যের আলোচনাতে সঙ্গতভাবেই ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্রিটিশ ভারতে আর্থিক অসাম্যের নিরাকরণ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো চেষ্টা হয় নি — যদিও বলা যায়, সেচপ্রকল্প, কৃষিঋণ, প্রজাস্বত্ব আইন ইত্যাদির মূল লক্ষ্য ছিল দরিদ্র কৃষকের অবস্থার উন্নতিসাধন। কিন্তু কোন দিকে কতটা কী হল, তার কোনো হিসাব নেবার চেষ্টা কেউ কখনও করে নি।

এ সম্বন্ধে স্পষ্ট স্বীকৃতি প্রথম পাওয়া গেল স্বাধীন ভারতে ১৯৫০ সালে গৃহীত সংবিধানের মুখবন্ধে আর নির্দেশক নীতিগুলির অধ্যায়ে। নির্দেশক নীতিগুলির রূপায়ণ আদালতে গিয়ে দাবি করা চলে না, কিন্তু এগুলি আমাদের প্রতিশ্রুতি। সতেরো বছর প্রধানমন্ত্রিত্বের কাজ করার পর যখন পণ্ডিত নেহরুর মৃত্যু হয় তখন তাঁর শয্যাপার্শ্বে পাওয়া গিয়েছিল রবার্ট ফ্রস্টের সেই বিখ্যাত লাইনগুলি — আমাকে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে এবং তারজন্য বহু যোজন পথ অতিক্রম করতে হবে। নেহরুর মৃত্যুর পর আরও প্রায় একুশ বছর কেটে গিয়েছে, সংবিধানের প্রতিশ্রুতিগুলি এখনও সম্পূর্ণভাবে বক্ষা করা হয় নি।

এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে প্রথমেই ছিল সংবিধানের মুখবন্ধ। তার তিনটি লক্ষ্যের প্রথমটিই ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা। তারপরে ছিল মৌলিক অধিকারের তালিকা। সেখানেও ন্যায়বিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত সমাজের কথা বলা হয়েছিল। এরও পরে ছিল নির্দেশক নীতিসমূহ : তার মধ্যে অর্থনৈতিক নীতির উপর খুব বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। এই নীতিগুলির প্রধান লক্ষ্যের মধ্যে ছিল প্রয়োজনীয় জীবিকার সংস্থান, সম্পদের মালিকানার পুনর্বণ্টন, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরি, বেকারি বার্ধক্য অসুস্থতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য, পূর্ণ কর্মসংস্থান ইত্যাদি।

সংবিধান গৃহীত হবার সাড়ে তিন দশক পরেও দেখা যাচ্ছে, অনেক দিকে আর্থিক উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও এখনও দারিদ্র্যসমস্যা আমাদের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। এখনও "গরিবি হঠাও" থেকে শুরু করে দারিদ্র্য কমাবার জন্য নানা পন্থা অবলম্বনের কথা প্রত্যেক পরিকল্পনার সূচনাতে, প্রত্যেক নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির ইস্তাহারে জোর দিয়ে বলতে হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা ভারতের দারিদ্র্যের চিত্রের জের টেনে সম্পূর্ণ ছবিটি এবারে দেখা যায়। এই ছবিটি পাওয়া যায় ১৯৭৫-৭৬ সালের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে।

আমাদের জনসংখ্যার নিম্নতম পঞ্চমাংশ দেশের মোট পারিবারিক আয়ের মাত্র ৭·০ শতাংশ পায়। এর পরে পরপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং শেষ পঞ্চমাংশ পায় যথাক্রমে ৯·২, ১৩·৯, ২০·৫ এবং ৪৯·৪ শতাংশ। ক্রমিকভাবে যোগ দিয়ে বলা যায়, কুড়ি শতাংশ লোকের ভাগে আসে মোট আয়ের ৭·০ শতাংশ, চল্লিশ শতাংশের ভাগে ১৬·২ শতাংশ, ষাট শতাংশের ভাগে ৩০·১ শতাংশ এবং আশি শতাংশের ভাগে পড়ে ৫০·৬ শতাংশ। বাকি

৪৯·৪ শতাংশ ভোগ করে উচ্চতম স্তরের কুড়ি শতাংশ পরিবার। এর মধ্যে আবার সর্বোচ্চ স্তরের দশ শতাংশ পরিবার (বা জনসংখ্যা) পায় মোট পারিবারিক আয়ের ৩৩·৬ শতাংশে। গত দশ বছরে অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা এটা জোর করে বলা যায় না, কিন্তু অন্যভাবে বিচারের যে চেষ্টা হয়েছে তাতে আশাব্যঞ্জক কিছু পাওয়া যায় না।

আয়বণ্টনের বা সম্পদবণ্টনের পরিপূর্ণ হিসাব না পাওয়াতে আমরা দারিদ্র্যসীমা'র একটা সংজ্ঞার্থ ঠিক করে নিয়ে দেখবার চেষ্টা করি যে, এই সীমার নীচে কত লোক আছে।

দারিদ্র্যসীমার সংজ্ঞার্থ দেবার চেষ্টা প্রথম করেন পুনের অধ্যাপক দাণ্ডেকর আর নীলকণ্ঠ রথ। ন্যূনতম অন্ন-বস্ত্র ইত্যাদির প্রয়োজনের একটা হিসাব নিয়ে তাঁরা দেখান যে, ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমান অনুসারে মাথা পিছু অন্তত মাসিক কুড়ি টাকা প্রয়োজন। এর উপর ভিত্তি করে তাঁরা বলেন, ১৯৬৮-৬৯ সালে দেশের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ ছিল দারিদ্র্যসীমার নীচে। তখন লোকসংখ্যা ছিল ৫০ কোটি, তার মধ্যে ২০ কোটি মানুষ ছিল দারিদ্র্যসীমার নীচে। ১৯৬০-৬১ সালের পরে ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচি বেড়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে সাড়ে পাঁচ থেকে ছ গুণ। অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালে যদি ন্যূনতম প্রয়োজন থেকে থাকে মাসিক কুড়ি টাকা, তাহলে এখন সেটা ১০০ থেকে ১২০ টাকার মধ্যে। চারজনের একটি পরিবারের জন্য তাহলে দরকার হয় ৪০০ টাকার কিছু বেশি।

এর পরে পরিকল্পনা কমিশন তাঁদের সমীক্ষাতে বলেন, ১৯৭৯-৮০ সালে দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল জনসংখ্যার ৪৮·৪৪ শতাংশ — ৬৫·৪ কোটি মানুষের মধ্যে ৩১·৭ কোটি। অনুপাতটা শহরাঞ্চলে ছিল কম — ৪০·৩ শতাংশ; গ্রামাঞ্চলে অনেক বেশি — ৫০·৭ শতাংশ। সাধারণভাবে, সারা ভারতে এবং অধিকাংশ রাজ্যে দারিদ্র্যের প্রকোপ গ্রামে বেশি এবং শহরে কম। কিন্তু এর বিপরীত চিত্র দেখতে পাওয়া যায় কৃষিতে উন্নত রাজ্যগুলিতে — যেমন, পাঞ্জাবে আর হরিয়ানাতে। এই দুই রাজ্যে দারিদ্র্যের অনুপাত গ্রাম কম, শহরে বেশি।

পরিকল্পনা কমিশন তাঁদের ষষ্ঠ পঞ্চ-বর্ষ যোজনাতে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, ১৯৮৪-৮৫ সালে এই অনুপাতগুলিকে অনেকটা নামানো হবে — গ্রামাঞ্চলে ৪০·৪৭ শতাংশে আর শহরে ৩৩·৭১ শতাংশে — যাতে সারা দেশে দরিদ্রের অনুপাত গিয়ে দাঁড়ায় ৩৮·৯৩ শতাংশ। এই উন্নতির কিছুটা আসবে সাধারণভাবে পরিকল্পনায় গৃহীত প্রকল্পগুলির রূপায়ণ থেকে, আর বাকিটা আসবে জাতীয় সুসংহত কর্মসংস্থান প্রকল্প ইত্যাদি বিশেষ কর্মসূচি অবলম্বনের ফলে।

পরিকল্পনা কমিশন দাবি করেছেন যে, গত পাঁচ বছরে অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। কিছুকিছু পরিসংখ্যানও তাঁরা দিচ্ছেন; কিন্তু সেগুলির ভিত্তি খুব দুর্বল। ধরা হয়েছে যে, গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প ইত্যাদিতে যে টাকাটা খরচ করা হয়েছে, তার সবটাই দরিদ্রের উপকারে এসেছে।

একটা কথা সকলেই জানেন: আমাদের দেশে কোনো প্রকল্পে মোট যা খরচ হয় অনেকটাই চলে যায় প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করতে, আর সেটাকে চালু রাখতে। দ্বিতীয়ত, যেসব মানুষ বা পরিবার আছেন দারিদ্র্যসীমার সামান্য নীচে, তাঁদের এই সীমার

সামান্য উপরে তুলতে পারলেই পরিসংখ্যানগত উন্নতি দেখানো যায়। কিন্তু এতে মোট অবস্থার খুব ইতরবিশেষ হয় না। আরও বড়ো কথা — দারিদ্র্যসীমার নীচেও অনেক আয়স্তর আছে। এমনও হতে পারে যে, এদের মধ্যে যাঁরা উপরের দিকে (অর্থাৎ সবচেয়ে কম দরিদ্র) তাঁদের আয় কিছুটা বাড়ল, কিন্তু যাঁরা দরিদ্রতম তাঁদের অবস্থা আরও খারাপ হল।

এসব আলোচনাতে সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানের অভাব। ষষ্ঠ পরিকল্পনা ১৯৮৫-র ৩১ মার্চ শেষ হল। সপ্তম পরিকল্পনার খসড়া এখনও তৈরি করা হয় নি — জুলাই মাসের আগে হবার সম্ভাবনা কম। এ পর্যন্ত, পরিকল্পনা কমিশন সপ্তম পরিকল্পনার জন্য একটি উপক্রমণিকাপত্র বা অ্যাপ্রোচ পেপার প্রকাশ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ১৯৯৪-৯৫ সালে দারিদ্র্যসীমার নীচের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশের নীচে নামানো হবে।

এই প্রস্তাবের সংখ্যাগত দিকটা একটু দেখা দরকার। ১৯৮৪ সালে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ৭৫ কোটি। যদি বর্তমানে দারিদ্র্যসীমার নীচের সংখ্যার অনুপাত হয় ৪০ শতাংশ, তাহলে মোট দরিদ্রের সংখ্যা ৩০ কোটি, আর এই সীমার উপরের মানুষের সংখ্যা ৪৫ কোটি। দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বর্তমানের বার্ষিক ২·২৫ শতাংশ থেকে যদি ২·০ শতাংশ নামানো যায়, তাহলেও ১৯৯৪-৯৫ সালে মোট সংখ্যাটা দাঁড়াবে ৯২ কোটি। এর মধ্যে যদি মাত্র শতকরা দশজন দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকে, তাহলে এই সীমার উপরে থাকবে ৮৩ কোটি। অর্থাৎ আগামী দশ বছরে প্রায় ৩৮ কোটি লোককে দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলতে হবে। সুপরিকল্পিত পথে চললে এটা যে অসম্ভব, তা নয়। কিন্তু এর জন্য যে দৃঢ় একনিষ্ঠ সংকল্প প্রয়োজন তার কোনো পরিচয় এখনও পাওয়া যাচ্ছে না।

দারিদ্র্য আর কর্মসংস্থান অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। কাজের ব্যবস্থা না করে, শুধু আর্থিক সাহায্য দিয়ে দরিদ্রের উপকার করা যায়। কিন্তু সেটা সমৃদ্ধ দেশে সম্ভব, আমাদের মতো গরিব দেশে নয়। আমাদের মতো দেশে দারিদ্র্যনিরসনের সঙ্গত পন্থা হল কাজের সুযোগ বাড়ানো।

দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মান্বেষী লোকের সংখ্যাও বাড়ছে। আমাদের কর্মক্ষম (১৫-৫৯ বছর বয়সের) জনসংখ্যা ছিল ১৯৮০ সালে ২৩·৭০ কোটি; ১৯৮৫ সালে সেটা হবে ২৭·৫০ কোটি। এর মধ্যে বেকারের সংখ্যা ১৯৮০-তে ছিল প্রায় ১·৯২ কোটি : কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ। ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে (মার্চ ১৯৮৫) বেকারের সংখ্যার নীট বৃদ্ধি হবে — কারণ নূতন নিয়োগের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়বে না। পরিকল্পনা কমিশন আশা করেছিলেন যে, এই ষষ্ঠ পরিকল্পনার পাঁচ বছরে সংগঠিত শিল্পে নূতন নিয়োগ হবে প্রায় ৪০ লক্ষ, এবং কৃষি ইত্যাদিতে দুই থেকে তিন কোটি।

এই আশার কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি ছিল না, এবং এখন দেখা যাচ্ছে যে, ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে বাস্তবে বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা ২০ শতাংশ কম হওয়ার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ লক্ষ্যানুযায়ী বাড়তে পারে নি। একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, ১৯৮৫ সালে মোট বেকারের সংখ্যা ছ কোটির কাছাকাছি হবে।

১৯৮০ সালে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মক্ষম লোকেদের মধ্যে শতকরা ১৫ জন ছিল

বেকার। স্নাতকস্তর উত্তীর্ণ কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে বেকারের অনুপাত ছিল ১৬ শতাংশ। এর থেকে ডাক্তার আর ইঞ্জিনিয়রদের বাদ দিলে বাকি যারা থাকে (বি-এ, বি-এস সি, বি-কম পাস), তাদের মধ্যে বেকারির হার ছিল প্রায় ২১ শতাংশ। এদের হিসাব অনেকটা পাওয়া যায় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলি থেকে।

১৯৮১ সালে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো কর্মপ্রার্থীর মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ১·৫০ কোটি। ১৯৮৪ সালের শেষে এই সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২·৫০ কোটিতে। অবশ্য এক্সচেঞ্জে যারা নাম লেখায় তারা সবাই বেকার নয় — হয়তো যে কাজে আছে তার চেয়ে ভালো কাজের খোঁজে নাম লেখানো হয়। অন্যদিকে, দেশের বিরাট গ্রামাঞ্চলের বেকার লোকেরা এই অফিসে নাম লেখাতে আসে না, বা আসবার সুযোগই পায় না। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের পরিসংখ্যান মোটামুটি শহরাঞ্চলের বেকারির একটা পরিচয় দেয়। গ্রামে ঋতুভিত্তিক কাজে নিযুক্ত, বা অত্যন্ত অল্প মজুরিতে কাজ নিতে বাধ্য হয়েছে এমন লোকের সংখ্যাও অনেক। সাধারণত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার সময়ে যারা দৈনিক আট ঘণ্টা করে বছরে অন্তত ২৭৩ দিন কাজে নিযুক্ত থাকে, তাদের পুরোপুরি কর্মরত বলে ধরে নেওয়া হয়। যারা আংশিক বেকার তাদেরও তুলনীয় হিসাবে আনা যায়।

দারিদ্র্য আর কর্মহীনতার এই শোচনীয় অবস্থা আমরা এত বছরে অতিক্রম করে আসতে পারলাম না কেন? সেটা অন্য প্রশ্ন — তার উত্তর দিতে অন্য একটি ব্যাপক আলোচনা করতে হয়। এ বিষয়ে রচনার অভাব নেই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার গত সাড়ে তিন দশকের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রবন্ধ আর বই অনেক পাবেন। এখানে শুধু এই কথা বলা প্রয়োজন যে, আমাদের মিশ্র অর্থনীতির গত ৩৫ বছরের ইতিহাস একই সঙ্গে সাফল্য আর অসাফল্যের মিশ্র ইতিহাস। এই সময়ে মোট জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় নি — প্রস্তাবিত ৫ শতাংশের জায়গায় মাত্র ৩·৫ শতাংশ — কিন্তু অনেকগুলি শিল্পে হয়েছে অভূতপূর্ব উন্নতি। ছয়টি পরিকল্পনাতে ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়ম, রাসায়নিক সার, কলকব্জা, মোটরযান আর রেল ইঞ্জিন, খনিজ তেল, কয়লা ইত্যাদি নানা জিনিসের উৎপাদন ১৫ থেকে ২০ গুণ বেড়েছে — কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও বেশি। কিন্তু চাহিদা বেড়েছে অধিকতর হারে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বিদ্যুৎ — উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ১৫ গুণ, কিন্তু চাহিদা বাড়ার ফলে অভাব থেকে যাচ্ছে। কৃষির বেলায় সেচব্যবস্থার প্রসার হয়েছে ব্যাপকভাবে, সারের উৎপাদন বিশেষভাবে বেড়েছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদনও এখন তিন দশক আগের তুলনায় প্রায় তিন গুণ।

এটা একদিকের চিত্র। অন্যদিকের চিত্রে দেখতে পাই — প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারে নি। এর ব্যতিক্রম শুধু পাওয়া যাবে বিলাসদ্রব্যের উৎপাদনে — ধনীজনব্যবহার্য রেফরিজারেটর, টেলিভিসন ইত্যাদির উৎপাদনে, প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণে।

অর্থাৎ যে কথা বলে আমরা আরম্ভ করেছিলাম তাতেই ফিরে আসছি : আর্থিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য আর কর্মহীনতাও বেড়েছে। আর্থিক উন্নতি যা হয়েছে তার ফল ভোগ করছে একটা শ্রেণী, আর অন্য একটা শ্রেণী — যার মধ্যে আছে অগণিত জনসাধারণ —

অন্ধকার পথে এখনও আলো দেখতে পায় নি। একই শহরে পাঁচতারা হোটেল, আর তার কাছেই দরিদ্রতম বস্তি; নানা রকমের আকর্ষণীয় নূতন যুগের বস্ত্রসম্ভারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের একান্ত বস্ত্রাভাব; খাদ্যের অমার্জনীয় অপচয়ের পাশাপাশি হাজার হাজার মানুষের অনাহার।

এই অবস্থা আমরা প্রায় মেনে নিয়েছি। এই মেনে নেওয়াটাই ভবিষ্যতের পক্ষে আশঙ্কাজনক। কারণ, একবার যদি আত্মসন্তুষ্টির ভাব মনে দৃঢ়মূল হয়ে যায়, প্রয়োজনীয় দৃঢ়হস্ত কর্মসূচি নেবার আর কোনো আগ্রহ থাকে না।

অথচ, স্থির সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হলে আগামী দশ বছরের মধ্যে দরিদ্র্যমোচনের লক্ষ্যে পৌঁছানো অসাধ্য নয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ অনেকেই করেছেন।

এই নির্দেশগুলি একত্রিত করে প্রথমেই বলা যায় : আমাদের সব প্রকল্প গৃহীত হবার আগে বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখা উচিত হবে — এর ফলে বন্টনের অসাম্য কমবে কিনা, কর্মসংস্থান বাড়বে কিনা। দ্বিতীয়ত, দেখতে হবে — ঠিক কী ধরনের সামগ্রীর উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ করা হচ্ছে। সেই জিনিসগুলি হবে সাধারণ মানুষের আবশ্যক ভোগ্যপণ্য, কিংবা সেইসব পণ্য তৈরি করতে যেসব যন্ত্রপাতি দরকর হয় সেগুলি, কিংবা রপ্তানিযোগ্য জিনিস। বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন আগামী দশ বছরে বাড়তে দেওয়া হবে না। তৃতীয়ত, কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন হবে সরকারি বিনিয়োগে, আর কোথায় বেসরকারি বিনিয়োগে — সে সম্বন্ধে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যেসব অত্যাবশ্যক সামগ্রীর উৎপাদনে বহু মূলধনের প্রয়োজন, অথচ লাভের আশা কম, এবং যেসব ক্ষেত্রে কারখানা স্থাপন করে উৎপাদন আরম্ভ করতে অনেক বছর লেগে যায়, সেসব ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ আসবে না। যেখানে উৎপাদনব্যয় কমাবার জন্য এবং ক্রেতাকে সুষ্ঠুভাবে সেবা করবার জন্য একচেটিয়া উৎপাদন দরকার হয়, সেখানেও সে উৎপাদন হবে সরকারি মালিকানায়। এর পরেও বেসরকারি উৎপাদনের জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়ে থাকবে। চতুর্থত, আমাদের পরিকল্পনাতে বেসরকারি ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু বলা হয় না। অবশ্য শিল্প লাইসেন্স, মূলধন নিয়ন্ত্রণ, আমদানি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে বেসরকারি শিল্পের উপরে একটা সার্বিক নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়, কিন্তু যেটা বিশেষ প্রয়োজন সেটা হল আমাদের সম্পূর্ণ যোজনার মধ্যেই বেসরকারি উৎপাদনের জন্য একটা পরিকল্পনা।

সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে, দেশে সঞ্চয়ের হার যেন বাড়তে পারে। আমাদের মোট সঞ্চয়ের হার এখন খুব কম নয় — মোট আয়ের প্রায় ২৩ শতাংশ — কিন্তু এর মধ্যে সরকারি বেসরকারি — দু ক্ষেত্রের উদ্যোগেরই অংশ আশাপ্রদ স্তরে পৌঁছয় নি। সরকারি অনেক উদ্যোগে লাভ তো দূরের কথা লোকসান হয় প্রচণ্ড। বেসরকারি উদ্যোগও তাদের মূলধনের জন্য প্রধানত নির্ভর করে মেয়াদী ঋণদানসংস্থা, ব্যাঙ্ক, কোম্পানি আমানত, ডিবেঞ্চার ইত্যাদির উপর। অন্যদিকে, যে সঞ্চয়টা আমরা পাই, তার বিনিয়োগে উৎপাদন আর কর্মসংস্থানের যথেষ্ট উন্নতি হয় নি। এর জন্য দায়ী প্রধানত আমাদের প্রযুক্তি — যা অনেক সময়ে বিদেশের অনুকরণে তৈরি হয়। আমাদের এমন প্রযুক্তি নেওয়া উচিত যাতে মূলধনের তুলনায় শ্রম লাগে বেশি — অর্থাৎ অল্প মূলধনে অনেকটা কর্মসংস্থান আর আয়

সৃষ্টি হয়। এইটাই দারিদ্র্যমোচনের সার্থক পথ। ছোটো কৃষিক্ষেত্র, কুটির শিল্প আর ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপক প্রসারের প্রধান যুক্তি এর থেকেই পাওয়া যায়।

এসব প্রয়াসের পাশাপাশি চলবে প্রয়োজনীয় উৎপাদন এবং মুদ্রা ও কর-ব্যবস্থার সাহায্যে মূল্যস্ফীতিকে রোধ করা। একদিকে যদি আমরা কর্মসংস্থান আর আয়সৃষ্টির চেষ্টা করি, এবং অন্যদিকে যদি অনিয়ন্ত্রিত মূল্যবৃদ্ধি হতে থাকে — তাহলে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাছাড়া, মূল্যস্ফীতির ফলে কারো-কারো হয় সুবিধা এবং অনেকেরই হয় ক্ষতি — অর্থাৎ অসাম্য বাড়ে। মূল্যস্ফীতি থেকেই কালোবাজারের উদ্ভব, এবং কালো টাকা অসাম্য বাড়ায়।

এরকম আরও অনেক নির্দেশ বিশদভাবে দেওয়া যায়, কিন্তু তার সব কটির মূলই পাওয়া যাবে উপরে যা বলা হল তার মধ্যে। মূল্যস্ফীতির কুফল এবং অসাম্য দূরীকরণে বিশেষভাবে সাহায্য করবে ব্যাপক রেশন-ব্যবস্থা, যাতে দরিদ্রতম মানুষও তাঁর ন্যূনতম প্রয়োজনের জিনিসগুলি নিয়ন্ত্রিত দামে পাবেন। উৎপাদন আর তার বণ্টন দুই-ই যদি সাম্যমুখী হয়, এবং যদি ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থান আর আয়সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে নতুন কর্মসংস্থান আর উৎপাদন একত্রে সংযুক্ত করা যায়। কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে নবসৃষ্ট আয়ের ফলে যে চাহিদা তৈরি হবে, তার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির উৎপাদন একই সঙ্গে বাড়ে।

এর কোনো কাজই কঠিন নয়। আমাদের বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ আর প্রশাসকদের ব্যক্তিগত মান বেশ উঁচু। সারা পৃথিবী থেকে তাঁদের সাদরে ডেকে নিয়ে যায়। অথচ দেশের মধ্যে আমরা কেন সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারি না, এটা ভালো করে ভেবে দেখা দরকার। যে ভারতীয় রেল ইঞ্জিনিয়রদের দল আফ্রিকাতে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে রেলপথ তৈরি করে দেন, তাঁরাই দেশের মধ্যে একটা লাইন তৈরি করতে পাঁচ বছর লাগিয়ে দেন, একটি ব্রিজ তৈরি করতে লাগান দশ থেকে পনেরো বছর। একটা বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র দশ বছরেও চালু হয় না এবং চালু হবার পরেও নানারকম ব্যাধিতে ভোগে। দরকার হলে যে 'যুদ্ধকালীন ভিত্তি'-তে কাজ করে আমাদের কর্মীরা অসাধারণ সাফল্য দেখাতে পারে, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি এশীয় ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার সময় ক্রীড়াঙ্গন; বাসস্থান, রাস্তাঘাট ইত্যাদির নির্মাণে।

দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা এই দক্ষতা দেখাতে পারি না কেন?

আর পনেরো বছর পরে, শতাব্দীর প্রান্তে, ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ১০০ কোটিতে দাঁড়াবে। এই পনেরো বছর যদি আমরা প্রতিজ্ঞা করি — বিলাসসামগ্রীর উৎপাদন বাড়তে দেব না, এবং এমন কোনো প্রকল্প হাতে নেব না যাতে আমাদের দরিদ্র জনসাধারণের স্থায়ী উপকার না হয়, তাহলে আমরা কাম্য পথে অনেক দূরে অগ্রসর হতে পারব। তখন হয়তো আশা করতে পারব যে, সেদিনের অর্থশাস্ত্রী দেশের অবস্থা নিয়ে যখন লিখবেন তখন তাঁকে হেনরি জর্জের শতাধিক বছর আগে প্রকাশিত বইয়ের নাম থেকে তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম অপহরণ করতে হবে না।

□ *দৃষ্টিকোণ*, ১৯৮৬

ভারতীয় সংগীতের মূল আদর্শ

নারায়ণ চৌধুরী

ভারতীয় সংগীতের মূল আদর্শ কী — এই প্রশ্নের যদি এক কথায় উত্তর দিতে হয় তো বলতে হয়, সুরই হল ভারতীয় সংগীতের মূল ভিত্তি বা আদর্শ। 'সুর' কথাটার ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি 'মেলডি'। এই সুর বা মেলডিকে ঘিরেই ভারতীয় সংগীতের বিরাট-বিশাল আয়তন গড়ে উঠেছে। ওই আয়তন বা ইমারত বহুকক্ষবিশিষ্ট হতে পারে, থাকতে পারে তাতে নানা অলিন্দ বা বারান্দা বা পার্শ্বপথ, তার চূড়ায় বা শীর্ষদেশে তাবৎ বৈচিত্র্য ও বহুলতার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে সুর প্রায় ওঙ্কারধ্বনির মতো একটিমাত্র অক্ষরবিশিষ্ট ধ্বনিতে পর্যবসিত হতে পারে; কিন্তু তার ভিত্তিগাত্রে মূলাশ্রয় হিসাবে যে সুরসৌন্দর্য বা স্বরমাধুর্য থাকতেই হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কি যন্ত্রসংগীত কি কণ্ঠসংগীত — এই দ্বিবিধপ্রকার সংগীতেই যে সুরকে বুনিয়াদি অবলম্বন রূপে গ্রহণ করে, ভারতীয় সংগীতের প্রাকার খাড়া করে তুলতে হবে, সে-কথা আলোচনার সূত্রপাতেই সকল প্রকার বক্তব্যের প্রারম্ভ-বিন্দু রূপে দাঁড় করিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া ভালো।

যদি বলেন সুর তো সব সংগীতেরই মূল ভিত্তি; কি দেশি কি বিদেশি, কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচীন কি আধুনিক — সব ধরনের সংগীতেরই তো সুর ছাড়া এক পা এগোবার উপায় নেই; তবে আর বিশেষ করে ভারতীয় সংগীতের বেলায় 'সুর' কথাটার উপর এতটা জোর দেওয়ার কারণ কী? কারণ অবশ্যই আছে, আর সেই কারণটি বিশ্লেষণ করে বোঝাবার জন্যই এই নিবন্ধের অবতারণা।

ভারতীয় সংগীতের অনুষঙ্গে 'সুর' কথাটাকে একটা বিশেষ তাৎপর্যে অবধারণ করতে হবে। বলা যেতে পারে ভারতীয় সংগীতে সুর একটা বিশেষ গুণগত অর্থে ব্যবহৃত। ভারতীয় সংগীতের সুর উপকরণরিক্ত, আভরণবর্জিত, শান্তরসাস্পদ, বিশুদ্ধ। ওর ধারণার মধ্যে একটি ধ্যানগম্ভীর প্রশান্তির ভাব নিহিত আছে। স্থির-ধীর-অচঞ্চল তার মূর্তিরূপ। ভারতীয় সংগীতের ঐতিহাসিকরা বলেন, বৈদিক যুগের সাম গানের ত্রিস্বর থেকে ভারতীয় সংগীতের উৎপত্তি (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রমুখ)। একথা যদি সত্য হয় (সত্য না হওয়ার কোনো হেতু দেখা যায় না), তাহলে ভারতীয় সংগীতের মূলীভূত শান্তরসের একটা বস্তুগত ভিত্তি আপনা থেকেই মিলে যায়, কেননা প্রার্থনার স্তোত্রধ্বনি থেকে যে-সংগীতের উদ্ভব, তার রস আত্মসমাহিত, প্রশান্ত, গভীর-গম্ভীর হবে, সে তো একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধের মতোই ধরে নেওয়া যায়।

এই ত্রিস্বর বিশিষ্ট সংগীত পরে অবশ্য একাধিক বিবর্তনের ধাপ বেয়ে সপ্তস্বর ও বাইশ শ্রুতির বৈচিত্র্য সমন্বিত রাগসংগীতে পরিণত হয়, কিন্তু তার অভ্যুদয়কালীন যে-বৈশিষ্ট্যে তার গোত্র পরিচয় — শান্তরসাস্পদতা — তা কিন্তু তার বিকাশ ও বৃদ্ধির কালেও তাকে ছেড়ে যায় না, একটা অপরিবর্তনীয় কৌলিক জন্মচিহ্নের মতোই ভারতীয় সংগীতের দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকে। ভারতীয় নিবদ্ধ সংগীত, প্রবন্ধ সংগীত, ধ্রুপদ, খেয়াল — উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সংগীতের যতগুলি রূপের বিষয়ে আমরা জানি বা প্রত্যক্ষত পরিচিত আছি, দেখা যায় তার প্রত্যেকটিরই বুনিয়াদি রস হল শান্ত রস — অধীর বা অস্থির সুরচাঞ্চল্যে তার পরিচয় নয়। এই যে ভারতীয় সংগীতের প্রথাবদ্ধ আলোচকেরা সুরের স্থির গম্ভীর ভাব বোঝাবার জন্য 'নাদব্রহ্ম' নামক একটি শব্দের প্রায়শ প্রয়োগ করেন, সেটির ধর্মীয় পৃষ্ঠপট আমরা মানি বা না-মানি — এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতীয় সংগীতের মৌলিক প্রকৃতি পরিস্ফুট করে তোলবার জন্য 'নাদ' কথাটির চেয়ে সমধিক উপযুক্ত শব্দ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ভারতীয় সংগীতের সুর আসলে এই নাদ-এর প্রতিরূপক। যখন কোনো সংগীত-সভাগৃহে কোনো প্রসিদ্ধ কলাবিদ্ যন্ত্র বা কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেন, তখন একমাত্র সংগীতের অনুরণন ভিন্ন পরিপূর্ণ নিস্তব্ধ গৃহে আর কোনো শব্দধ্বনি শ্রুত হয় না। সেই অবস্থায় মন্ত্রমুগ্ধবৎ শ্রোতার সচরাচর যে-অনুভব হয়, তা হল পারিপার্শ্বিক আবহের সঙ্গে পরিবেশিত সুরের সম্পূর্ণ মিলে যাওয়া, লীন হয়ে যাওয়া। চতুষ্পার্শ্বস্থিত আবেষ্টনীর অন্তর্নিহিত স্তব্ধতার সঙ্গে সুরের এই যে একাত্মতা, একীভবন — এরই অন্য নাম 'নাদব্রহ্ম'।

নাদ দুই প্রকারের — অনাহত নাদ ও আহত নাদ। সুর যখন শূন্যমণ্ডলের বায়ুতরঙ্গে অস্পৃষ্ট ও অগোচর রূপে ভেসে বেড়ায়, তখন তাকে বলে অনাহত নাদ। অনন্ত 'ইথার' তরঙ্গে এই সুর সর্বদাই পরিব্যাপ্ত কিন্তু পরিব্যক্ত নয়। পরিব্যক্ত হয় তখন যখন বায়ুতরঙ্গে কোনো কিছুর আঘাত এসে লাগে। আর সেই আঘাতের দ্বারা উৎপন্ন নাদ বা ধ্বনিকেই বলে আহত নাদ। কিন্তু তখন-তখুনি তা সুরে রূপান্তরিত হয় না। সুরসৃষ্টির অপরিহার্য প্রাথমিক শর্ত হল স্বরসংগতি অর্থাৎ উৎপন্ন স্বরগুলির ভিতর সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যকে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে অনুভব করা যায় মাত্র। অনুভব করা যায় আরও সুষ্ঠুভাবে যখন বিপরীতের পিঠে তাকে স্থাপন করা যায়। স্বরের সমষ্টি মাত্রই সুর নয়, স্বরের সুমঞ্জস ঐক্যই হল সুর। যেমন, কণ্ঠ থেকে কোনো কিছু উদ্‌গত হলেই তা সুর হয় না, কণ্ঠোত্থিত স্বর বা স্বর সমষ্টির ভিতর যখন দুর্জ্ঞেয় এক ছন্দ বা পরিমিতি বোধ প্রবেশ করে, তখনই কেবল সুরের জন্ম হয়। সুরের কোলাহল আর স্বরের সংযমবদ্ধ রূপের ভিতর অনেক তফাত।

ভারতীয় সংগীতে স্বরসংগতি বা স্বরের ঐক্যের আদর্শ তার চূড়ান্ত উৎকর্ষের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুরকে কত বিশুদ্ধ বা পবিত্রতম রূপে প্রকাশ করা যায়, তার বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা এদেশে হয়েছে যুগ থেকে যুগে। সংগীততাত্ত্বিকরা শিল্পকলাসমূহের ভিতর সংগীতকে সবচেয়ে 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' বা বিমূর্ত শিল্পরূপে অভিহিত করেন। 'বিমূর্ত', কারণ সংগীতের রূপায়ণে সবচেয়ে স্বল্প উপকরণের প্রয়োজন হয়, কোনোরূপ আয়োজন বা আনুষঙ্গিকের সাহায্য ছাড়াই সুরকে মূর্ত করে তোলা যায়। অন্যান্য শিল্পগুলির ক্ষেত্রে

সংগীতের এই বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। সুর ফোটাবার জন্য একটা সাদামাঠা যন্ত্র কিংবা খোলা কণ্ঠই (কণ্ঠই একপ্রকার যন্ত্র) যথেষ্ট; আর কিছুর দরকার হয় না। এমনকি কণ্ঠসংগীতের বেলায় বাণী বা কথার প্রয়োজনও অতিশয় গৌণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারেই অবান্তর। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতে পদের গৌরব খুবই সীমিত, সুরই সেখানে স্বমহিমায় স্বরাট্।

ত্রিস্বর বিশিষ্ট বৈদিক সংগীত ধীরে ধীরে স্বরসংখ্যাবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে সপ্তস্বরে গিয়ে দাঁড়াল। প্রথমে চার স্বর, তার পরে পাঁচ স্বর, তার পর ছয় স্বর এই ভাবে বেড়ে সাতের কোঠায় উত্তীর্ণ হতে স্বরগ্রাম একটা পূর্ণ পরিণতি পেল এবং এক আদর্শস্থানীয় (স্ট্যান্ডার্ড) স্বরসপ্তকের (অক্টেভ) জন্ম হল। বিদেশি মতে সা থেকে আরেক সা পর্যন্ত স্বরের সংখ্যা আটটিই হয়, সুতরাং পাশ্চাত্য সংগীতে 'সেপ্টেট'-এর বদলে 'অক্টেভ' কথাটিরই সমধিক চলন; কিন্তু ভারতীয় সংগীতে এভাবে স্বর গণনা করা হয় না। এখানে তারার সা থেকে আরেকটি সপ্তকের আরম্ভ, অন্যপক্ষে খাদ বা উদারায় অন্য একটি সপ্তকের অবস্থিতি যার আরম্ভ সা-তে ও শেষ নি-তে। মধ্যবর্তী মুদারার সপ্তকটিই হল আসল গ্রাম বা স্কেল, যা সচরাচর ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পণ্ডিতদের মতে তিন স্বর থেকে ভারতীয় সংগীতের সপ্তস্বরে পরিণতি লাভ করতে কমপক্ষে এক হাজার বছর লেগেছিল। ডবল্যু. ডবল্যু. হান্টার মনে করেন পাণিনির আবির্ভাবের (খ্রি. পূ. ৩২০) আগেই ভারতীয় সংগীত সপ্তস্বরে সুগঠিত হয়ে গিয়েছিল ও তার বিচিত্র বিকাশ ঘটেছিল।

ইতোমধ্যে আর একটি ব্যাপার সংঘটিত হয়, যার ফল ভারতীয় সংগীতের কাঠামোর নিয়ন্ত্রণে ও রূপান্তরসাধনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেটি হল এই, সপ্তস্বরে পরিণত হবার কালে ভারতীয় সংগীত দুটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ হয়ে যায় — মার্গ সংগীত ও দেশি সংগীত। মার্গ সংগীত চিরায়ত সংগীতের স্বগোত্র, অন্যপক্ষে দেশি সংগীত আঞ্চলিক বা লৌকিক সংগীতের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। আজকের দিনের সাংগীতিক পরিভাষায় যদি এ-দুটি কথাকে প্রকাশ করতে হয় তবে বলতে হয় — রাগসংগীত ও লোকসংগীত। প্রকৃতপক্ষে এ দুটি ধারাই হল ভারতীয় সংগীতের মূল ধারা এবং তাদের ভিতর পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক, সেই খ্রিস্টপূর্ব প্রাচীন ইতিহাসের কালেও যেমন বিদ্যমান ছিল, আজও সমান অব্যাহত আছে। এই দুই ধারা একে অন্যের কাছ থেকে দু-হাতে উপকরণ আহরণ করেছে, করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। মার্গ সংগীতের একাধিক সুরের গঠনে যে আঞ্চলিক সংগীতের সুরের প্রভাব রয়েছে, তা সেগুলির নামকরণ থেকেই বোঝা যায় — গুর্জরী, মুলতানী, বৃন্দাবনী, সারং, পূরবী, বংগাল প্রভৃতি। পক্ষান্তরে লোকসংগীতের সুরের গঠনে পাই খাম্বাজ, কাফি, পিলু, তিলক-কামোদ, ভীমপলশ্রী, পটদীপ, মাঁঢ় প্রভৃতি রাগসংগীতের অন্তর্ভুক্ত অপেক্ষাকৃত হাল্কা রসের রাগিনীগুলির আমেজ। স্বর্গত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী শাস্ত্রীর মতে, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের কিছুটা করুণ-রসাত্মক, কিছুটা কান্নাপ্রবণ লোকসংগীতের সুরের গঠনের ভিতর আছে 'কসৌলী-ঝিঝিট' রাগের প্রভাব। আবার পুরুলিয়ার করম, টুসু প্রভৃতি গানের সুরে পাই খাম্বাজের সুস্পষ্ট আমেজ।

এইখানেই দেওয়া-নেওয়ার প্রক্রিয়া থেমে থাকেনি। শিল্প ঐতিহাসিক অর্ধেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে ভারতীয় মার্গ সংগীতের রাগের কাঠামো যে ক্রমান্বয়ে পাঁচ স্বর (ঔড়ব) থেকে ছয় স্বর (খাড়ব), ছয় স্বর থেকে সাত স্বরে (সম্পূরণ) রূপান্তর লাভ করেছে তার মূলে আছে দেশি সংগীতের ভূমিকা। আবার দেশি সংগীতেও মার্গ সংগীতের দৃষ্টান্ত থেকে আপন সমৃদ্ধি বিধানে কম মাল-মশলা রসদাদি সংগ্রহ করেনি। বিহারের কোনো কোনো লোকগীতি এখনও চার স্বরে গাওয়া হয় (হেমাঙ্গ বিশ্বাস-কৃত 'লোকসংগীত সমীক্ষা' দ্রষ্টব্য)। তার মানে ওই শ্রেণীর সংগীতের আর বিকাশ হয়নি, একই সীমিত স্বরসংখ্যার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আজও আবদ্ধ হয়ে আছে। এই চার স্বর বিশিষ্ট বিহারী লোকগীতিই পরে আসামের চা-বাগানের সেই সব শ্রমজীবী নরনারীর কণ্ঠে উদ্‌গীত হয়, যাদের বিহার থেকে 'সংগ্রহ' (রিক্রুট) করা হয়েছিল।

ভারতীয় মার্গসংগীতের কতকগুলি সুস্পষ্ট ধাপ বিদ্যমান — নিবদ্ধগান, প্রবন্ধ সংগীত, আক্ষিপ্তিকা, ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি। এগুলির ভিতর প্রথম তিন শ্রেণীর গানের প্রচলন আজকাল আর নেই, সেগুলি কী ধরনের গীতরীতি ছিল তাও আজ আর অনুমান করবার উপায় নেই, তবে শাস্ত্রগ্রন্থাদির লিখিত পাঠ থেকে এরূপ প্রতীত হয় যে, ওই গীতিরূপগুলির ক্রমবিবর্তনের ধাপ বেয়েই ধ্রুপদ গানের উৎপত্তি হয়েছিল এবং ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগের গোটা পরিধি জুড়ে ধ্রুপদের ব্যাপক চর্চা হয়েছিল উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে। পূর্ব ভারতের বিহার এবং বাংলায়ও ধ্রুপদ গানের কেন্দ্রীভূত চর্চার কয়েকটি পীঠ রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে বিহারের গয়া ও বেতিয়া প্রভৃতি স্থান এবং বাংলার বিষ্ণুপুরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধ্রুপদের কাঠামোর মধ্যে নিবদ্ধ ও প্রবন্ধ গানের একাধিক অঙ্গ গ্রথিত হয়েছিল বলে জানা যায়। যেমন নিবদ্ধ গানের উদ্‌গ্রাহ, মেল্যপক, ধ্রুব, অন্তর ও আভোগ এই পাঁচ পর্ববিভাগই পরে ধ্রুপদের আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এই চার 'তুক' বা কলিতে রূপান্তরিত হয়। প্রবন্ধগানের দৃঢ়সংবদ্ধ আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত সংহত গীতরূপ ধ্রুবপদের স্থির-ধীর-শান্ত ভাবপ্রতিমায় প্রতিফলিত হয়। আক্ষিপ্তিকাকে বলা হয় তাল, স্বর ও সুরের পূর্ণ রচনা। তাও ধ্রুপদের পরিকল্পনার ভিতর পূর্ণ-পরিণত রূপ লাভ করে। মধ্য যুগে ধ্রুপদ সংগীতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ প্রকাশক ছিলেন আমীর খসরু, গোপাল নায়ক, বৈজু বাওরা, রাজা মানসিং তোমর, স্বামী হরিদাস, তানসেন প্রমুখ।

খেয়াল ধ্রুপদ থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কে খেয়ালের স্রষ্টা এই নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন আলাউদ্দিন খিলজীর সভাগায়ক আমীর খসরু (ত্রয়োদশ শতক) খেয়াল গানের প্রবর্তক; আবার কারও মতে জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ্‌ শরকী (পঞ্চদশ শতক) এই গানের জনক। কিন্তু যিনিই এর স্রষ্টা হোন, এ-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে, খেয়াল গান অনেকদিন পর্যন্ত জনজীবনে অপাংক্তেয় ছিল। কেন অপাংক্তেয় ছিল? অপাংক্তেয় ছিল এই কারণে যে, খেয়াল গানের রূপ ধ্রুপদের তুলনায় চঞ্চল, তার গতি দ্রুততর এবং তার ভিতর যে-রঙরসের দ্যোতনা আছে, তার মধ্যে একটা চটুলতার ভাব নিহিত রয়েছে। আমরা একালের শ্রোতারা খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী ইত্যাদি

শ্রেণীর গানের যতই উৎসাহী পরিপোষক হই না কেন, মধ্যযুগের শ্রোতাদের কাছে খেয়ালের এই চটুল-চঞ্চল রূপ কমবেশি অগ্রহণীয় ছিল। পক্ষান্তরে ধ্রুপদের শান্ত-গম্ভীর বিশুদ্ধ সুররূপ তাঁদের মনকে সমধিক আকৃষ্ট করত। এক দিক থেকে দেখতে গেলে এটাকে রক্ষণশীলতার পরিচায়ক মনে করা যায়, কিন্তু অন্য আর একদিক থেকে এ জিনিস ভারতীয় সংগীতের মূলীভূত আদর্শের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধার নিদর্শন গণ্য করলে অন্যায় হয় না। নিবন্ধের সূচনায় ভারতীয় সংগীতের শান্ত-স্থির-আত্মসমাহিত-ধ্যানগম্ভীর রূপের যে প্রশস্তি করা হয়েছে, সেই আদর্শকে মান্য করতে হলে খেয়াল, ঠুংরী প্রভৃতি গীতরূপের তুলনায় ধ্রুপদকে সমধিক আদর করা আমাদের অবশ্যকৃত্য হয়ে পড়ে।

খেয়াল জনসমাজে গৃহীত হবার আগে পর্যন্ত অনেকদিন যাবৎ তা কাওয়ালি, গজল, গীত প্রভৃতি হাল্কা সুরের গানের সঙ্গে সমার্থক ছিল। প্রকৃতপক্ষে আমীর খসরুব উদ্ভাবিত বলে কথিত খেয়াল গানের মধ্যে নাকি পারসিক গজলের প্রভাব ছিল, অর্থাৎ হালকা সুরের উপাদান ছিল; তাই তদানীন্তন কালীন শ্রোতৃসমাজ ওই শ্রেণীর গানকে স্বীকার করে নিতে অন্তরের বাধা অনুভব করেছে। খেয়াল অনেক দিন পর্যন্ত তার এই আপেক্ষিক চটুল-চঞ্চলতার জন্য উত্তর ভারতের স্ট্রিট-সিঙ্গারদের গাওয়া কাওয়াল, গীত, গজল প্রভৃতির প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে অবজ্ঞার ধূলায় অবলিপ্ত ও অবলুণ্ঠিত হয়ে ছিল। জনসমাজে তা মোটেই কল্কে পায়নি। শোনা যায় অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে রাজত্বকারী শেষ মোগল বাদশাহদের অন্যতম মহম্মদ শাহ্ (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দ)-এর সভাগায়ক সদারঙ্গ ওরফে নিয়ামত খাঁ খেয়ালকে তার অবহেলার ধূলিশয্যা থেকে উদ্ধার করে তাকে বাদশাহের দরবারে পবিবেশনার যোগ্য সংগীতে রূপান্তরিত করেন। খেয়াল এই অর্থে সদারঙ্গেরই পাথিকৃত্যে আনীত এক নতুন শিল্পরূপ, যা পরে সবিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।

কিন্তু সদারঙ্গ এবং তাঁর ভাই (মতান্তরে পুত্র) অদারঙ্গের দ্বারা প্রবর্তিত, প্রচলিত খেয়াল গান কি আজকের খেয়াল গানের স্বগোত্র? মোটেই তা নয়। সদারঙ্গ যে-জাতীয় খেয়ালের জনপ্রিয়তা সাধন করেছিলেন তা সুরবিশুদ্ধিতে ধ্রুপদের তুলনায় ন্যূনতম কিন্তু শান্ত-ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে তা ধ্রুপদেরই স্বগোত্র। আমরা আজকের দিনে যাকে ঢিমা খেয়াল বলি সদারঙ্গ-অদারঙ্গের প্রবর্তিত খেয়াল ওই অঙ্গের গান ছিল, তার ভিতরে চটুল-চঞ্চল বর্ণালীর এতটুকু লেশ ছিল না। ধ্রুপদের 'আওচার' বা আলাপ অংশ তাঁরা বর্জন করেছিলেন কিন্তু তাকেই ভিন্ন পরিচ্ছেদে সজ্জিত করে ভিন্ন রূপে খেয়ালের ভিতর 'সুরবিস্তার' নামে গ্রথিত করে দিয়েছেন। 'সুরবিস্তার' বা 'সুরপ্রস্তার' আসলে ধ্রুপদের আলাপেরই একটি যুগোচিত পরিমার্জনা মাত্র। তা ধ্রুপদেরই ছদ্মবেশ বলা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই-জাতীয় ঢিমা বা বিলম্বিত লয়ের খেয়ালের আজ আর তেমন কদর নেই — সকলেই গতির নেশায়, চঞ্চলতার টানে, দ্রুত খেয়ালের তানসর্বস্ব ঊর্ধ্বশ্বাস আদর্শের পিছনে ছুটছে –– অন্তরের দুর্বার অস্থিরতায় এমনকি মধ্যলয়ের খেয়ালেও আর কারও মন ভরছে না। হয়তো এটা যুগের ধর্ম, তা বলে ভারতীয় সংগীতের মূলগত আদর্শকে বিস্মৃত হয়ে তো আর সততবিবর্তনশীল নিত্যনতুনের আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবনকারী ফ্যাসনধর্মী চপল-চঞ্চল যুগ-চাটুল্যকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

ভারতীয় সংগীতের শান্ত-স্থির ধ্যানগম্ভীর রূপের পাশে পাশ্চাত্য সংগীতের সুরাদর্শকে স্থাপন করে দেখলে দুইয়ের পার্থক্য প্রকট হয়ে চোখে লাগবে, কানে বাজবে। পাশ্চাত্য সংগীতে ভারতীয় সংঘাতের সুরপ্রশান্তি নেই, আছে সম ও বিরুদ্ধ স্বরের আঘাতে-সংঘাতে সৃষ্ট সুরের প্রাণচাঞ্চল্যপূর্ণ সচল রূপ। প্রথমটি মেলডিধর্মী; দ্বিতীয়টি হারমনিকস্-নির্ভর। প্রথমটিতে সুরের মাধুর্য ও লাবণ্য; দ্বিতীয়টিতে সুরের উত্তাল-অস্থির-সংক্ষুব্ধ রূপ। ইউরোপীয় শিল্প সাহিত্যে সমাজে যেমন সংঘাতের চেহারাটা অতি প্রবল তেমন তার সংগীতের পঞ্জরে পঞ্জরেও অস্থিরতার দ্যোতনা। সেখানে সমে ও বিষমে point ও counter-point-এ যোঝাযুঝি, লড়ালড়ি লেগেই আছে। এটা কি ইউরোপীয় যন্ত্রসংগীত, কি ইউরোপীয় কণ্ঠসংগীত দুইয়ের বেলাতেই সত্য; বোধহয় যন্ত্রসংগীতের বেলায় বেশি সত্য। বীট্‌হোফেনের শ্রেষ্ঠ 'সিম্ফোনি' সংগীতগুলি সংগ্রামের মুখরতায় ভরপুর।

কিন্তু ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির প্রকৃতি তেমন নয়। সংস্কৃত কাব্য নাটকাদির যেমন মূলরস শান্ত, তেমনি ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতেরও মূল ভাব অসীমের অভিসারী আত্মসমাহিত তদ্‌গতচিত্ততা। ভারতীয় সংগীত শিল্পী যন্ত্রে বা কণ্ঠে পারিপার্শ্বিক নিসর্গের সঙ্গে একাত্মরূপে লীন হয়ে যেতে পারলে আর কিছু চায় না। তাঁর শিল্প তো শিল্প নয়; সেটা একটা ধ্যান একটা প্রার্থনা। কখনও কখনও এই ধ্যান আর প্রার্থনা এতটাই সূক্ষ্মতা মণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পায় যে, তার তাবৎ সুরমাধুর্য ও সুরৈশ্বর্য একীভূত হয়ে একাক্ষর বিশিষ্ট 'ওঁ' ধ্বনিতে বিগলিত হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য সংগীতে এ জিনিস কখনই পাওয়া যাবে না।

পরিষ্কার বোঝা যায়, দুই দেশের বস্তুগত অবস্থার মৌলিক ভিন্নতায় দুই দেশের সংগীত শিল্পের এই ভিন্নতা। এর কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এই বিচারের প্রশ্ন আসে না, শুধু নিজ নিজ দেশের যুগ যুগ বাহিত শিল্প সংস্কারকে মান্য করার প্রশ্নটাই এক্ষেত্রে আসল। ভারতীয় সংগীত তার নিজ আদর্শে অবিচল থেকে উত্তরোত্তর বিকাশের পথে এগিয়ে চলবে, এইটেই কাম্য।

□ *সংগীত বিচিত্রা*, ১৯৮৬

কার জন্য লিখি?

চিন্মোহন সেহানবীশ

দু-চার জন এমন একান্ত আত্মকেন্দ্রিক লেখক হয়তো বাংলাদেশেও আছেন যাঁরা এ প্রশ্নের জবাব দেবেন — 'ও নিয়ে মাথা ঘামাই না, কেননা সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে ও কথা অবান্তর। লিখি ভরা মনে, আপন খেয়ালে।' আর কিছু লেখক আছেন যাঁদেব মাথাব্যথা অতি সংকীর্ণ এক রসিক সমজদার গোষ্ঠীর মন পাওয়া-না-পাওয়া নিয়েই। তার বাইরের বিপুল জনতাব নিন্দা প্রশংসায় তাঁদের কিছু এসে যায় না।

এ ধরনের চিন্তার মধ্যে কতটা আন্তরিকতা আছে, আপন অক্ষমতা গোপনের সাফাই কি না এগুলি — সেকথা না ভুলেও বলা চলে যে, এঁরা সমগ্র বাঙালি লেখক সমাজের মধ্যে মুষ্টিমেয়। অধিকাংশ লেখকই চান তাঁদের রচনা সবাই পড়ুক, সবাই তার তারিফ করুক। এই ইচ্ছা খুবই সুস্থ ও স্বাভাবিক। 'যশের কাঙালি হয়ে' 'করতালি' আদায়ের ফিকিরের বিরুদ্ধে আমাদের কবি বিদ্রোহ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু সে শুধু ফাঁকা 'কথা গাঁথার' নিষ্ফলতার জ্বালায় জ্বলেই। তাই জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তিনি তাঁর 'সুরের অপূর্ণতার', 'নিন্দার কথা' অত অনায়াসেই মানতে পেরেছিলেন।

অবস্থার বিপাকে বাঙালি সাহিত্যিকের এই ব্যাপকতম পাঠকলাভের অতি সুস্থ কামনা আজ কিভাবে বিড়ম্বিত আমরা সবাই জানি। বাঙলা সাহিত্যের সম্ভাব্য পাঠকসমাজ আজ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার কৃপায় নিরক্ষর, নিঃস্ব এবং দ্বিখণ্ডিত। দেশজোড়া নিরক্ষরতা সমুদ্রের বুকে সুশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিতদের যে ছোট্ট দ্বীপটি কোনোগতিকে ভেসে রয়েছে আমাদের লিখিত সাহিত্যের দৌড় বড়ো জোর তার সীমানার মধ্যেই। তার চারিদিকে ঘিরে আছে যে বিপুল নিরক্ষর ও নামমাত্র শিক্ষিতের সমুদ্র সেখানে পৌঁছতে সাহিত্যের প্রধান বাহন হল শ্রুতি। রামায়ণ, মহাভারত, পুথি, পাঁচালি পাঠ, কথকতা, কবিগান, যাত্রা, গম্ভীরা, তর্জা মারফতই একমাত্র সে গণ সম্রাটের দরবারে প্রবেশ মেলে। অথচ নির্মম ঔপনিবেশিক শোষণ ও গভীর কৃষি সংকটের দাপটে এগুলিও আজ বিবর্ণ, ম্রিয়মাণ। ভূমি ব্যবস্থার আমূল ওলটপালট না ঘটিয়ে কোনো হাতুড়ে প্রক্রিয়ায় এদের পুনরুজ্জীবনও শেষ পর্যন্ত সম্ভব নয়।

বাঙালি লেখকের কাছে তাই 'কার জন্য লিখি' — এই প্রশ্নের জবাব প্রায় বিধিনির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে বোধ হয়। অধিকাংশ কৃষক, মজুর (বাংলা দেশে এঁদের মধ্যে মস্ত একটা অংশ আবার হিন্দি বা অন্য ভাষাভাষী), এমন কি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্নমধ্যবিত্তেরও একটা বড়ো অংশ আজ লিখিত সাহিত্যের নাগালের বাইরে। অথচ এঁদের মেহনতেই গড়ে ওঠে দেশের সম্পদ। অর্থাৎ সমাজের সৃষ্টিধরেরাই আজ বঞ্চিত মানস সৃষ্টির প্রসাদ থেকে।

এই অমানুষিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্ষেপ জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ — বলেছেন দেশের সম্পদ যারা সৃষ্টি করে সেই 'সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। .... তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে — উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।'

কিন্তু শুধু মহত্তর মানবিকতার আদর্শের দিক দিয়েই নয় এই মারাত্মক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাহিত্যিকের সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর বৈষয়িক উন্নতির প্রশ্নও সরাসরি জড়িত। কারণ নিরক্ষর দেশে লিখিত সাহিত্যের বাজার যে কত সংকীর্ণ তা এ দেশের সঙ্গে পশ্চিমের দেশগুলির তুলনা করলেই ধরা পড়ে। সেই সংকীর্ণ বাজারের জন্য সাহিত্যিক পসরা সাজিয়ে জীবিকা সংস্থানের চেষ্টা যে কত দুর্ঘট, তাও বাঙালি সাহিত্যিকের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি প্রসঙ্গে স্থূল জীবিকাসংস্থানের প্রশ্নকে অবান্তর মনে করেন তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই — তাঁদের উপেক্ষা করাই ভালো। অন্য সব কথা বাদ দিয়ে শুধু টিকে থাকার তাগিদেই বাঙালি সাহিত্যিক চান ব্যাপকতর পাঠকসমাজ।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্যিকের দরদ সবচেয়ে যেখানে নিবিড় সেই সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষের প্রশ্নও এই পাঠকসমস্যার সঙ্গে জড়িত। কারণ সমাজের বৈষয়িক সম্পদের স্রষ্টারা মানসসৃষ্টির ন্যূনতম ভাগ থেকেও বঞ্চিত হন যে ব্যবস্থায় তা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিকতার উপর ভর করে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তার দৌড় সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য এবং বাস্তব সংকট যতই ঘনীভূত হবে ততই তা আরও সীমাবদ্ধ হতে থাকবে। ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম নিদর্শনগুলির দিকে আঙুল দেখিয়ে এ সত্যকে খণ্ডন করার চেষ্টাও ভুল হবে, কারণ সে উজ্জ্বলতায় একেবারে চোখ না ঝলসালে আমরা ধরতে পারব তাদেরও সীমাবদ্ধতা (অবশ্য সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সত্যই তা গৌরবোজ্জ্বলও)। তৃতীয়ত, ইতিমধ্যে ধনবাদের দুনিয়াজোড়া সংকট এবং এ দেশের কৃষিসংকট আরও গভীর হয়ে দাঁড়ানোয় একদিকে যেমন বাংলা সাহিত্যের মধ্যবিত্ত পাঠকভিত্তিতে চিড় ধরেছে তেমনই আবার সমগ্রভাবে সাহিত্যের মানও যে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। প্রগতিশীল বাঙালি লেখকদের অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও একথা সত্য কারণ আজও সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের একটি কোনামাত্র পূরণ করছে সে সাহিত্যপ্রয়াস।

অতএব মানবিক, বৈষয়িক এবং সাহিত্যিক কারণেই বাঙালি লেখক চাই। সমাজ অচলায়তন চুরমার করে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হলে দেশজোড়া নিরক্ষরতা, নিঃস্বতার মধ্যে সে ভরসা কোথায়?

একথা ঠিক যে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ ছিঁড়ে ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-অচলায়তন চুরমার করে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হলে দেশজোড়া নিরক্ষরতা হটানো যাবে না আর বাঙালি সাহিত্যিকের কল্পনার দৌড়কেও ছাপিয়ে আবির্ভূত হবে না কোটি কোটি নতুন পাঠক। কিন্তু আগামী দিনের সেই অফুরন্ত সাহিত্য-তৃষ্ণার খোরাক জোগাবেন যে লেখক এখন কি তিনি যেমন লিখছেন তেমনই লিখে চলবেন আর স্বপ্ন দেখবেন ভাবী ঐশ্বর্যের? না এখন থেকেই, এখনকার প্রচণ্ড সীমাবদ্ধতার মধ্যেই নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকবেন আগামী দিনের জন্য?

একথা অবশ্যই মানতে হবে যে আজকের বাস্তবের সঙ্গে আগামী দিনের বাস্তবের মৌলিক তফাত ঘটবে আর তাই বাস্তবের প্রতিফলন হিসাবে আজকের সঙ্গে ভাবীদিনের সাহিত্যেরও মস্ত গরমিল থাকবেই। তাছাড়া মজুর কিসান প্রভৃতি বর্তমান সমাজের নীচের তলার বাসিন্দাদের সঙ্গে সাহিত্যিকের পক্ষে সরাসরি যোগ স্থাপন করার সুযোগ সুবিধা আজকের দিনে যতটা আগামী দিনে তার থেকে অনেক বেশি জুটবে। কারণ মজুর বা কিসানের জীবনের শরিক হওয়ার পথে আজ রাষ্ট্রশক্তি থেকে আরম্ভ করে সামাজিক ও শ্রেণীগত আচার পর্যন্ত নানা দিককার প্রত্যক্ষ বাধা বর্তমান, বিপ্লবের পরে যার চিহ্নও থাকবে না। বরং তখন রাষ্ট্রের নায়কই হবে প্রধানত মজুর ও কিসানেরা।

বিপ্লবের আগে ও পরের অবস্থার এত গরমিল সত্ত্বেও কি পাঠকসাধারণের প্রতি কর্তব্যের দিক থেকে এই দুই যুগের মধ্যে কোনো মিল পাওয়া সম্ভব?

১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে সারা চীনের লেখক ও শিল্পীদের যে সম্মেলন হয় তার সামনে বিখ্যাত চীনা ঔপন্যাসিক মাও তুন এই প্রসঙ্গে বলেন, "১৯৪২ সালে প্রকাশিত কমরেড মাও সে-তুং-এর 'সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কিত আলোচনা' কুও মিন-টাং অধ্যুষিত এলাকার সাহিত্য ও শিল্পেরও পথনির্দেশকনীতি হওয়া উচিত ছিল। ঐ আলোচনায় কমরেড মাও সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি (standpoint) ও মনোভাবের (attitude) সমস্যা, লেখক ও শিল্পীদের যথাযথ শিক্ষার সমস্যা এবং প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীদের যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের সমস্যার কথা তুলেছিলেন। কুও মিন-টাং অধ্যুষিত এলাকার সাহিত্য জগতেও এ সব সমস্যাই বর্তমান ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে কার্যক্ষেত্রে আত্মপরীক্ষা ও আত্মসমালোচনার ব্যাপারে 'আলোচনার' সারতত্ত্ব কাজে লাগানো দূরে থাক ঐ সব এলাকার লেখক শিল্পীরা ঐ 'আলোচনার' বিশদ পর্যালোচনাও করেননি। কুও মিন-টাং অধ্যুষিত এলাকার অবস্থা মুক্ত এলাকার অবস্থা থেকে আলাদা — এই অজুহাতে তাঁদের কেউ কেউ ঐ দলিলটির দিকে এক পলক তাকিয়েই তার সঙ্গে তাঁদের 'নীতিগত মতৈক্য' ঘোষণা করেছিলেন। অন্যেরা মুক্ত এলাকার অভিজ্ঞতার অংশমাত্রের দোহাই পেড়ে শিল্প ও সাহিত্যের মতাদর্শ ও তত্ত্বগত সমস্যার সামগ্রিক সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কুও মিন-টাং অধ্যুষিত এলাকার সাহিত্য আন্দোলনের বাস্তব বিশ্লেষণ করেন নি বলে তাঁরা আসলে কোনো সমস্যারই সমাধান করতে পারেন নি।" (দি পিপ্‌ল্‌স নিউ লিটারেচার — ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা)

আমাদের প্রগতিশীল লেখকমহলেও এই দুই রকম ভুলই দেখা যায় (অবশ্য কুও মিন-টাং রাজত্বের সঙ্গে আমাদের অবস্থার পুরোপুরি মিল খোঁজা ভুল হবে। মূল আধা-ঔপনিবেশিক, সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক ভিত্তির দিকের মিলের কথাই এখানে ধরা হচ্ছে)। শেষের ঝোঁকটির কথা আগে ধরলে দেখা যাবে যে চীনের মুক্ত এলাকার অভিজ্ঞতা সরাসরি আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মনোভাব অনেকের মধ্যে আছে। ১৩৫৬ সালের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' নামক আমার প্রবন্ধে চীনের নজির এই যান্ত্রিকভাবে টেনে লেখকদের অবিলম্বে কিসান-কর্মী বা ট্রেড ইউনিয়নিস্ট হিসাবে গণ-আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানানো হয়েছিল — এমনকি তার ফলে যদি

সাহিত্যরচনা সাময়িকভাবে বন্ধ হয় তাতেও বিচলিত হবার কোনো কারণ নেই — এমন কথাও বলা হয়েছিল।

এখানে মাও তুনেব ভাষায় আমার ভুল হয়েছিল এই যে, 'মুক্ত এলাকার অভিজ্ঞতার অংশমাত্রের দোহাই পেড়ে শিল্প ও সাহিত্যের মতাদর্শ ও তত্ত্বগত সমস্যার সামগ্রিক সমাধানের চেষ্টা' হয়েছিল — বাঙলা দেশের 'সাহিত্য আন্দোলনের বাস্তব বিশ্লেষণ' না করায় হাতুড়ে সমাধানই হাজির করা হয়েছিল সমস্যা সমাধানের। চীনের মুক্ত এলাকার মতো অনুকূল অবস্থার নয় বাস্তবক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাঙালি প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে ক'জনের পক্ষে ওভাবে সরাসবি মজুর বা কিসান আন্দোলনে ঝাঁপ দেওয়া সম্ভব — প্রশ্ন শুধু তাই-ই নয়। ব্যাপক নিরক্ষরতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও তাঁদের প্রধান মানসসৃষ্টি হিসাবে বাংলা সাহিত্যের আপেক্ষিক গুরুত্বের কথাও মনে রাখা দরকার ছিল। উল্টোদিকে চীনে ৪ঠা মে আন্দোলনের পর থেকে মোটের উপর অন্যান্য শ্রেণীর মতো চীনা বুদ্ধিজীবীদেরও উপর মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাবের তুলনায় আমাদের দেশে তার অনেক কম প্রভাবের কথা ভুলে গিয়ে বুদ্ধিজীবীদের কাছে অমন ঢালাও আবেদনও ছিল অত্যন্ত অবাস্তব এবং কার্যক্ষেত্রে বিভেদসৃষ্টির প্ররোচক।

কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের কিছু কিছু প্রগতিশীল লেখক বা শিল্পী বন্ধু আমাদের অবস্থা চীনের "মুক্ত এলাকার অবস্থা থেকে আলাদা" — এই অজুহাতে মাও সে-তুং-এর দলিলটির দিকে এক পলক তাকিয়েই তার সঙ্গে তাঁদের 'নীতিগত মতৈক্য' ঘোষণা করেই ক্ষান্ত ছিলেন। আমাদের দেশের "সাহিত্য ও শিল্পেরও পথনির্দেশক নীতি" হিসাবে তাকে কার্যত মানেন নি। তা যদি মানতেন তা হলে মাও সে-তুং-এর 'আলোচনায়' "সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি (standpoint বা position) ও মনোভাবের (attitude) সমস্যা, লেখক ও শিল্পীদের যথাযথ শিক্ষার সমস্যা এবং প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীদের যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের সমস্যার" যে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা ছিল তাকে শুধু নমো নমো করেই মেনে নিতেন না — তাই নিয়ে আরও মাথা ঘামাতেন।

কারণ মাও সে-তুং যখন বলেন যে, নতুন সাহিত্যের পাঠক হবে মজুর, কিসান, সৈনিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণী — বিশেষ করেই প্রথম তিনটি দল — তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন যে এঁদের জন্য লিখতে হলে ভালো করে এঁদের জানতে হবে — অভ্যস্ত মধ্যবিত্তসুলভ ধ্যানধারণা এবং অনুভূতির রূপান্তর ঘটিয়ে মজুর-কিসান-সৈনিকের ধ্যানধারণা ও অনুভূতির জগতে প্রবেশ করতে হবে। এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তরকে আমরা অনেক সময়েই খুব হাল্কাভাবে দেখি। তত্ত্বের দিক থেকে যিনি মার্কসবাদকে স্বীকার করেন, তিনি মনে করেন ব্যাপারটা আপনা থেকেই হবে। কিন্তু লিউ শাও-চির লেখা পড়লে বোঝা যায় যে, তিনি এই মূল দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তরকে মার্কসবাদী তত্ত্ব আয়ত্ত করার সমস্যা থেকে স্বতন্ত্র করে দেখেছেন যদিও অবশ্যই দুই-এর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এমন কথাও লিউ শাও-চি বলেছেন যে মূল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন যাঁর ঘটেনি তিনি যত বড়ো তীক্ষ্ণধী সম্পন্নই হোন না কেন তত্ত্ব আয়ত্ত করার ব্যাপারে তাঁর গলতি থেকে যাবে — তত্ত্বকে তিনি বুঝবেন আপন ভ্রান্ত

দৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়েই। কাজেই এ আশঙ্কার কাটান হিসাবে তত্ত্বচর্চার সঙ্গে হাতেনাতে কাজ ধরা, 'জীবনে জীবন যোগ করার' প্রশ্ন ওঠে — প্রশ্ন ওঠে তত্ত্বের সঙ্গে কার্যক্রমের সমন্বয়ের। এইজন্যই মাও সে-তুং এই রূপান্তরের জন্য "দীর্ঘদিনের এমন কী কখনও কখনও যন্ত্রণাদায়ক অগ্নিপরীক্ষার প্রক্রিয়ার" কথা বলেছেন।

মাও সে-তুং তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত ধরে দেখিয়েছেন কীভাবে তাঁর চিন্তার রূপান্তর ঘটেছিল। ছাত্রজীবনে অন্য ছাত্রদের সামনে নিজের মালপত্র কাঁধে বইতে তাঁর লজ্জা হত ভারি। হাত লাগাতে অন্য ছাত্রদের মতোই তাঁরও কুণ্ঠা ছিল অপরিসীম। তাঁর মনে হত ভদ্রলোকেরাই বুঝি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, বাকি সবাই বুঝি নোংরা।

তারপর বিপ্লবের কাজে মাও সে-তুং মজুর, কিসান ও সাধারণ সৈনিকদের সাথি হয়ে দাঁড়ালেন — একদিকে মার্কসবাদের জ্ঞানার্জন ও অন্যদিকে বিপ্লবী কার্যক্রমের মধ্যে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে তিনি বুঝতে পারলেন যে ধুলোকাদা তাঁদের কাপড়জামায় লাগলেও আসলে তার তলায় রয়েছে দুনিয়ার সব থেকে সাচ্চা, পরিষ্কার মন আর ধবধবে জামার তলায় অধিকাংশ সময়েই লুকিয়ে থাকে নোংরা, কদর্য পশু।

দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তরকে তাই হাল্কাভাবে দেখা চলে না — শুধু কেতাবের মধ্যে দিয়ে বা বিদগ্ধ আলাপ আলোচনা মারফতও তা ঘটানো সম্ভব নয়। যে লেখক ব্যাপকসমাজ কামনা করেন তাঁকে এই রূপান্তরের জন্য প্রাণপাত করতে হবে। এই রূপান্তরিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তাঁকে দেখতে হবে সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে যে বিষয়বস্তু জীবনেরই মতো বিপুল, বিচিত্র, জটিল ও অভিনব। মজুর বা কিসানের জীবন নিয়েই যে শুধু সাহিত্য সৃষ্টি হবে তাই নয় — যদিও প্রগতিশীল লেখকের নজর ক্রমশই এই দিকে বেশি বেশি করে ঝুঁকলে তা অত্যন্ত সুস্থ ও স্বাভাবিকই হবে। কিন্তু বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন গোড়ার কথা হল এই রূপান্তরিত দৃষ্টি — যা একদিকে মার্কসবাদী তত্ত্ব অর্জন ও অন্যদিকে গণজীবনের সঙ্গে সংযোগেরই ফল। বলাবাহুল্য এই সংযোগ স্থাপনের কোনো ছককাটা বাঁধাধরা রূপ নেই — আপন শক্তি সামর্থ্য সুযোগ অনুসারে প্রত্যেককেই এদিকে নজর দিতে হবে। তবে ভাবের ঘরে চুরি করলে কোনো মহৎ কার্য সম্পন্ন হবে না।

এই দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তরের পরে লেখকের সামনে আরও একটি জটিল সমস্যা থাকে। সেটি হল প্রকাশভঙ্গির সমস্যা। যে লেখক মজুর ও কিসানদের জন্য লিখতে চান স্বভাবতই তাঁকে উপযুক্ত প্রকাশভঙ্গি আয়ত্ত করতে হবে। ব্যাপারটা শুধু ভাষার নয়। তা ছাড়া মজুরের ভাষা, কিসানের ভাষা, ধনিকের ভাষা বলে আলাদা আলাদা ভাষা নেই — ভাষা একটাই। তবে জীবনযাত্রা ধ্যানধারণার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রকাশভঙ্গির ব্যবধান গড়ে ওঠে। স্বাভাবিক কারণেই জটিল, প্যাঁচালো প্রকাশভঙ্গি (যা অত্যন্ত সহজ শব্দ ব্যবহার সত্ত্বেও হতে পারে) অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিতদের কাছে চলে না — তার জন্য দরকার সহজ অথচ গভীর ভাবব্যঞ্জক প্রকাশভঙ্গি। এটা একদিনে আয়ত্ত করার নয় — শুধু গ্রাম্য শব্দ বা উপভাষা ব্যবহারেও তা হয় না। হয়তো প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য কিছুটা আঞ্চলিক বা বৃত্তিগত। যাই হোক আসলে প্রয়োজন মানুষগুলির সঙ্গে গভীর পরিচয় — তাদের শুধু কাজের মধ্যে জানা নয়, তাদের সংসারের মধ্যে, দুঃখকষ্ট আনন্দের মধ্যে, সংগ্রামের মধ্যে জানা।

এ ক্ষেত্রে অবশ্যই অনুসন্ধান ও পরীক্ষানিরীক্ষার অনেক অবকাশ আছে। মনে রাখতে হবে টকি-সিনেমা, রেডিও, শখের থিয়েটার মারফত পল্লিবাসীর মধ্যেও শহুরে প্রকাশভঙ্গি অনেকখানিই ঢুকেছে। তাই পঞ্চাশ বছর আগে মানুষ যা ছিল আজ নিশ্চয়ই তা নেই। তবু জোর করে বলার মতো পরীক্ষালব্ধ ফল আমাদের হাতে নেই। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' বা 'ও আমার সোনার বাংলা' শহুরে বা গ্রাম্য মানুষ উভয়েই কান পেতে শোনেন, আপনার জিনিস মনে করেন যেমন তাঁরা মনে করেন 'একবার বিদায় দে মা'র গান। কিন্তু বন্ধুবর শ্রীশম্ভু মিত্র যখন জীবনে প্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোনার পর পল্লি কবি শ্রীনিবারণ পণ্ডিতের অভিভূত অবস্থার হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দেন তখন প্রশ্ন জাগে নিবারণবাবুর উপলব্ধির স্তর কি সাধারণ কৃষকের মতো? ঐ দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা কি নিরাপদ?

প্রকাশভঙ্গির জটিল সমস্যাকে অনেক সময় বিশেষ কোনো আঙ্গিক ব্যবহারের দ্বারা সমাধানের কথা ভাবা হয়। গ্রাম্য শব্দ বা উপভাষা ব্যবহারের ছড়াছড়ির কথা আগেই বলা হয়েছে। তেমনই পাঁচালি বা ছড়ার ছন্দ, পয়ারের মামুলি প্রয়োগ, কবিতায় সেকেলে শব্দ ব্যবহার প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। কেউ কেউ ব্যাপকতম আবেদনের দোহাই দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর বাংলাকে বরবাদ করে প্রাক্-রাবীন্দ্রিক ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী, কেউ বা আধুনিকতার নামে অতিরিক্ত বিদেশি শব্দ সংবলিত মোটের উপর কৃত্রিম এক ভাষা চালাতে চান।

চীনেও ১৯৪০ সালে এই রকম 'জাতীয় আঙ্গিক' নিয়ে এক বিতর্ক চলে। কেউ কেউ জনপ্রিয়তা অর্জনের সমস্যার সহজ সমাধান খুঁজেছিলেন "পুরানো লোককলার আঙ্গিক" গ্রহণের ভিতরে। তাঁরা ৪ঠা মে আন্দোলনের সময় থেকে যে-সব নতুন আঙ্গিকের উদ্ভব হয়েছিল তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। অন্যেরা নতুন আঙ্গিকের পৃষ্ঠপোষকতা করতে গিয়ে তাঁদের সংকীর্ণ পেতিবুর্জোয়া দৃষ্টিই অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁরা যা রক্ষা করবার জন্য কোমর বেঁধেছিলেন তা আসলে আঙ্গিক নয়, সেই আঙ্গিকের পিছনকার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিষয়বস্তু। ('দি পিপলস নিউ লিটারেচার', — ৫৯-৬০ পৃষ্ঠা)।

সাহিত্য বা শিল্পের জনপ্রিয়তা অর্জনের সমস্যাকে তাই এইভাবে আঙ্গিকের সমস্যার সঙ্গে এক করে দেখা ঠিক নয়। সেখানে প্রথম ও প্রধান কথা হচ্ছে লেখক বা শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর।

আমাদের মনে রাখা দরকার বাংলা দেশের মজুর বা কিসানেরা একটা মতাদর্শগত বা সাংস্কৃতিক শূন্যতার মধ্যে বাস করেন না। একদিকে যেমন তাঁদের উপর কবিগান, কথকতা, গম্ভীরা, ঝুমুরের ক্ষীয়মাণ লোককলার ধারাটি আজও কার্যকরী তেমনই আবার সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও-ও ক্রমশ তাঁদের জগতে প্রভাব বিস্তার করছে। দুই ক্ষেত্রেই সাহিত্য বা সংস্কৃতির প্রধান বাহন হচ্ছে শ্রুতি ও দর্শন, কারণ অক্ষরের সাংকেতিকতার রহস্য দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে আজও উদঘাটিত নয়।

এই হল একদিককার বাস্তব। অন্যদিকে আছে তুলনায় মুষ্টিমেয় কমবেশি শিক্ষিতের দল কার্যত যাঁদের জন্যই বাংলা দেশের লেখক এতাবতকাল সাহিত্যরচনা করে আসছেন। সেই

লিখিত সাহিত্য গত দেড়শ বছরে অসামান্য বৈশিষ্ট্য ও গৌরবের অধিকারী হয়েছে। কাজেই বাঙালি মধ্যবিত্ত লেখক যখন আপন দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর ঘটিয়ে অগণিত পাঠকসাধারণের সাদর স্বীকৃতির মধ্যে তাঁদের নবসৃষ্টির সার্থকতা খুঁজবেন তখন তারাও নিশ্চয়ই একটা সাংস্কৃতিক বা সাহিত্যিক শূন্যতা থেকে শুরু করবেন না। 'কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জন' করে 'কিসানের জীবনের শরিক' হওয়ার চ্যালেঞ্জ তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই দিয়ে গেছেন তাঁদের সামনে।

কিন্তু নিরক্ষরতার বাধা ভাঙা যাবে কী করে? পুরোপুরি ভাঙা এ ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে অসম্ভব। কিন্তু বাঙালি লেখকের মানবিক, বৈষয়িক ও সাহিত্যিক সার্থকতার একমাত্র ধ্রুব পথ যদি হয় বর্তমান সংকীর্ণ পাঠকমণ্ডলীকে ছাপিয়ে (তাঁদের বাদ দেওয়ার প্রশ্ন কোনোক্রমে উঠতেই পারে না) এ দেশের মজুর-কিসানের মধ্যে নতুন সমজদার (অনেক সময়েই 'পাঠক' নন) সন্ধানে তবে সে বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা করতে হবে নানা কৌশলে।

সিনেমা আজ জনশিক্ষা বা গণসংস্কৃতির বোধ করি সব থেকে শক্তিশালী বাহন হয়ে দাঁড়ানোর উপক্রম করছে। এর মারফত প্রগতিশীল লেখক ও গান রচয়িতা তাঁদের সৃষ্টিকে বর্তমানের থেকে অনেক ব্যাপকতর সমজদারমণ্ডলীর সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করতে পারেন আনুষঙ্গিক বিপদের ঝুঁকি নিয়েই। অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও হয়তো এদিকের পথ কিছুটা আজও খোলা আছে।

কংগ্রেসি সরকারের কৃপায় রেডিওর দরজা কিন্তু প্রগতিশীলদের কাছে প্রায় বন্ধ। এ অব্যবস্থা গা-সওয়া বলে মেনে না নিয়ে দেশে তুমুল আন্দোলন করা উচিত একে বাতিল করার জন্য।

রঙ্গমঞ্চ মারফত লেখক আজও তাঁর স্থানটিকে ব্যাপকতর সমজদারের সামনে আনতে পারেন। গণনাট্য সংঘ, বহুরূপী, লিট্‌ল থিয়েটার প্রভৃতি প্রগতিশীল নাট্যসম্প্রদায় মারফত এ কাজ ইতিমধ্যেই কিছুটা চলছে। গণনাট্য সংঘ লোককলার প্রচলিত রূপগুলির সাহায্যে নতুন চিন্তা পরিবেশনের যতটুকু চেষ্টা করছেন তাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। হয়তো যাত্রার দিকে আরও বেশি নজর দিলে ব্যাপকতর শ্রোতা দর্শক পাওয়া সম্ভব হবে।

উর্দু ও হিন্দি কবিতার জগতে 'মুশায়রা' ও কবি-সম্মেলনের রেওয়াজ আছে। বাংলাদেশে ঐ রকম কোনো রীতি চালু নেই যদিও রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি একদা জনসভায় প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করত। বন্ধুবর শ্রীশম্ভু মিত্র তো এখনও রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র পর্যন্ত অনেকের কবিতাই আবৃত্তি করে শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ করেন। অনেকে বিমল ঘোষ ও সুকান্তের কবিতা আবৃত্তি করেন জনসভায়। এই সম্ভাবনাকেই তাই পুরোপুরি কাজে লাগানো উচিত স্থায়ী রূপ দিয়ে। সুকণ্ঠ আবৃত্তিকারেরাই যে শুধু কবিতা আবৃত্তি করবেন তাই নয়, কবিরাও যাতে নিজেদের কবিতা নতুন নতুন শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করেন তার ব্যবস্থাও করা উচিত। কারণ সে ক্ষেত্রে ক্রমশ ঐ শ্রোতাদের মুখ কবিতারচনার সময়েও কবির চোখের সামনে ভাসবে — সম্ভব করবে নতুন ধরনের বলিষ্ঠ, প্রত্যক্ষ কবিতা। অবশ্য 'কবিতা পড়ুন' বলে সম্প্রতি কলকাতার রাস্তায় যে চমকপ্রদ পদ্ধতির কথা কাগজে দেখা গেল তার উদ্ভটত্বের কারণ হচ্ছে যাঁদের

কবিতা শোনানোর চেষ্টা হচ্ছে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথাও উদ্যোক্তাদের ছিল না। তাই আচমকা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা শুনিয়ে পথচারীকে শুধু হকচকিয়ে দেওয়াই গেল। দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর না ঘটলে, সাধারণ মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ না জাগলে এই রকমই ঘটে আর এ ধরনের প্রচেষ্টার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয় এই সিদ্ধান্ত — 'জনসাধারণ বেকুব ও বেরসিক।'

জেলখানায় আমরা একবার কিছু বাঙালি মজুর বন্দীদের সামনে সিমোনভের "রাশিয়ান কোশ্চেন" (বাংলা তর্জমার নামকরণ হয়েছে 'সাংবাদিক') পড়ে শুনিয়েছিলাম। অভিনয় নয়, কেবল চার পাঁচজন মিলে রেডিওতে যে ভাবে নাটক পড়ে সেই রকম এক একজন এক একটি চরিত্রের কথা বলেছিলেন। অবশ্য আমরা মাঝে মাঝে পড়া থামিয়ে ছোটোখাটো দু' একটা ব্যাপার ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম আর্ট ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা না করেই। অর্থাৎ নাট্যরসসৃষ্টির জন্য ন্যূনতম মায়াজালই (illusion) বোনা হয়েছিল। তবু প্রায় ৬০ জন মজুর কানখাড়া করে তিন ঘণ্টা শুনলেন অসীম আগ্রহ নিয়ে। একদিনে পড়া শেষ না হওয়ায় বারবার আমাদের কাছে জানতে চাইলেন কাহিনির কী পরিণতি হল — উত্তেজিত আলোচনা চালালেন নিজেদের মধ্যে এবং আমাদের কাছে প্রবল অনুযোগ জানালেন এমন ব্যবস্থা আরও না করার জন্য।

প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে অনেকেই আজকাল মজুর-কিসানের জীবন নিয়ে গল্প, উপন্যাস লিখে
মান্নার মতো শ
তার ব্যবস্থা কর
নতুন শ্রোতাদে
জন্য লেখা তাঁদের গ্রহণ বর্জনের নিরিখে যাচাই করা যাবে নতুন সাহিত্য প্রয়াসের সত্যকার মূল্য।

লেখক পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ৭ মে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মা সারদা দেবী। বিদ্যাশিক্ষার জন্য ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলেও শিক্ষা শেষ করেন নি। স্কুলের প্রথাগত শিক্ষা না হলেও বিভিন্ন গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নানামুখী জ্ঞানার্জনের কোনো ত্রুটি ঘটে নি। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য তাঁকে বিলাত পাঠানো হয় কিন্তু দেড় বছর পরে পিতার আদেশে দেশে ফিরে আসেন। ১৮ বছর বয়সের মধ্যে 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'শৈশব সংগীত' ও 'রুদ্রচণ্ড' রচনা করেন। জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' তাঁর প্রথম গদ্য প্রবন্ধ। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁব প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিণী' এবং প্রথম উপন্যাস 'করুণা' প্রকাশিত হয়। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে জয়মাল্য লাভ করেন। পরবর্তীকালে, গল্প, উপন্যাস, ব্যঙ্গকৌতুক, দিন-লিপি, ভ্রমণকাহিনী, শিক্ষা, রাজনীতি ও দেশপ্রেম বিষয়ক প্রবন্ধ, শব্দ-ছন্দ-ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, নাটক, গদ্য-কবিতা, রূপকনাট্য, প্রহসন এবং সর্বোপরি সংগীত রচনায় তাঁর দান অজস্র ও অপূর্ব। Song Offerings কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ খ্রি. নোবেল পুরস্কার পান। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন তাঁর অসামান্য কীর্তি। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, জাপান, ইতালি, ইংলন্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ভ্রমণ করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুরকার, নাট্যপ্রযোজক এবং স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের একক চেষ্টায় বাংলাভাষা সকল দিকে যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্বের দরবারে সগৌরবে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করেছে।

মৃত্যু ৭ আগস্ট ১৯৪১ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *কড়ি ও কোমল, মানসী, বাল্মীকি প্রতিভা, সোনার তরী, চিত্রা, চিত্রাঙ্গদা, চোখের বালি, আত্মশক্তি, গোরা, প্রাচীন সাহিত্য, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, খেয়া, রাজা, শেষের কবিতা, যোগাযোগ, গীতাঞ্জলি, ডাকঘর, বলাকা, স্বদেশ, সমাজ, শিক্ষাতত্ত্ব, পূরবী, মুক্তধারা, চার অধ্যায়, গল্পগুচ্ছ, শান্তিনিকেতন, মহুয়া, চিরকুমার সভা, জীবনস্মৃতি, শেষ সপ্তক, পুনশ্চ, শ্যামলী, বিশ্বপরিচয়, জন্মদিনে* প্রভৃতি।

দীনেশচন্দ্র সেন

জন্ম মাতুলালয় ঢাকার বগজুড়িতে ৩ নভেম্বর ১৮৬৬ সালে। আদি নিবাস ঢাকার সুয়াপুর। বাবা ঈশ্বরচন্দ্র সেন, মা রূপলতা দেবী। ১৮৮২-তে এনট্রান্স, ১৮৮৫-তে এফ. এ পাশ করেন। এরপর ছ'মাসের মধ্যে পিতামাতার মৃত্যুতে পড়াশোনায় ছেদ ঘটে। ১৮৮৯-তে প্রাইভেটে ইংরেজি

অনার্সসহ বি এ পাশ করেন। ১৮৯১-এ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ পান এবং সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। ১৮৮৯-৯০-এ তাঁর চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করার ইচ্ছে তৈরি হয় এবং বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা শুরু করেন বটতলার পুথি সংগ্রহ করে। পরবর্তী কালে পূর্ববঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখেন। এইভাবেই তৈরি হয়ে ওঠে তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটি। ১৯০০ সালে পাকাপাকিভাবে কলকাতাবাসী হলেন এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' ও সরলাদেবীর 'ভারতী' পত্রিকাদুটির পরিচালনা ও সম্পাদনা কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তী কালে তিনি 'বঙ্গবাণী' ও 'বৈদ্য-হিতৈষণী' পত্রিকাদুটির সম্পাদনা কাজেও যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯০৯ থেকে ১৯৯৩ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযের নতুন পদ রীডার ছিলেন তিনি এবং পরে 'রামতনু লাহিড়ী বিসার্চ ফেলোশিপ' পদে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন। তাঁর সাহায্য নিয়েই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষায় (বাংলা) এম এ পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন। গবেষণা কর্মের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট্ উপাধি পান ১৯২১-এ এবং জগত্তারিণী স্বর্ণপদক পান ১৯৩১-এ। ১৯২৯ -এ তিনি হাওড়া বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি এবং ১৯৩৬-এ রাঁচিতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মৃত্যু ২০ নভেম্বর ১৯৩৯ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *রেখা, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, সুকথা, ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, বৃহৎ বঙ্গ, আশুতোষ স্মৃতিকথা, পদাবলী মাধুর্য, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান*। এছাড়া বেশ কয়েকটি ইংরেজি ভাষায় লিখিত গবেষণা গ্রন্থ।

সম্পাদিত গ্রন্থ : *গোপীচন্দ্রের গান, মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, রামায়ণী কথা, বৈদিক ভারত*, ইত্যাদি।

প্রমথ চৌধুরী

জন্ম যশোহরে ১৮৬৮-এর ৭ আগস্ট। বাবা দুর্গাদাস চৌধুরী, মা মগ্নদেবী। কলকাতার হেয়ার স্কুল থেকে এনট্রান্স, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে বি এ এবং ১৮৯০-এ ইংরেজিতে এম এ পাশ করেছিলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। ১৮৯৩-এ বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। বেশিদিন ব্যারিস্টারি করেননি, ১৮৯৯-এ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরাদেবীকে বিবাহ করেন এবং আইন কলেজে অধ্যাপনা করেন। কিছুকালের জন্য ঠাকুর এস্টেটের ও দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে সুপণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী ১৯১৪-তে 'সবুজ পত্র' পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। বাংলা সাহিত্যজগতে এই বিশিষ্ট পত্রিকাটির সঙ্গে সেযুগের আধুনিক শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনায় পুষ্ট এই পত্রিকা, তিনিই ছিলেন এর প্রধান শুভানুধ্যায়ী। প্রমথ চৌধুরী চলিত বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেন এবং 'বীরবল' ছদ্মনামে বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ রচনা করে খ্যাতিমান হন। বিদগ্ধ প্রবন্ধসাহিত্য তো বটেই তার সঙ্গে নতুন ধারার গল্প ও সনেট রচনা তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। ১৯৩৭-এ কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন তিনি। ১৯৪১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক পেয়েছেন। শেষ বয়সে কিছুদিন 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' সম্পাদনা করেছেন।

মৃত্যু ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ খ্রি।

রচিতগ্রন্থ : *বীরবলের হালখাতা, নানাকথা, প্রবন্ধ সংগ্রহ*। তাছাড়া বেশ কয়েকটি গল্প ও কাব্যগ্রন্থ।

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী

জন্ম মুম্বই-এর কালাদঘি-তে ২৯ ডিসেম্বর ১৮৭৩-এ। পিতৃনিবাস জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। বাবা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মা জ্ঞানদানন্দিনীদেবী। ১৮৯২-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে পদ্মাবতী স্বর্ণপদক পেয়েছেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় রাস্কিনের রচনার অনুবাদ দিয়ে সাহিত্য রচনা শুরু। 'সাধনা', 'সবুজ পত্র', 'পরিচয়'-এ ফরাসি সাহিত্যের অনুবাদ ও সংকলন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু গল্প ও প্রবন্ধের অনুবাদক তিনি। ১৮৯৯-এ প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ। সংগীতে বিশেষ প্রতিভাশালিনী। 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা'র যুগ্ম সম্পাদিকা তিনি। দেশি-বিদেশি সুরে পিয়ানো-বেহালা-সেতার বাজাতেন। 'মায়ার খেলা', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'কালমৃগয়া' ছাড়াও দু'শর বেশি রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি তিনি তৈরি করেছেন। ১৯৪৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ভুবনমোহিনী পদক' প্রদান করেছে। ১৯৫৬ সালে তিনি বিশ্বভারতীর অস্থায়ী উপাচার্য ছিলেন। ১৯৫৭ -তে তাঁকে বিশ্বভারতী 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেয়। কলিকাতা সঙ্গীত সম্মিলনী, উইমেনস এডুকেশন লিগ, অল ইন্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্স-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি।

মৃত্যু ১২ অগস্ট ১৯৬০ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গম, নারীর উক্তি*।

সম্পাদিত গ্রন্থ : *বাংলার স্ত্রী-আচার, স্মৃতিকথা, পুরাতনী* ইত্যাদি।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

জন্ম ৯ ডিসেম্বর ১৮৮০ সালে রংপুরের পায়রাবন্দে। বাবা জহিরুদ্দিন মোহম্মদ আবু আলী সাবের, মা রাহাতুন্নেসা চৌধুরী। খুবই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি প্রতিপালিত কিন্তু পর্দাপ্রথার প্রবল অতিরেক ছিল। বাইরের পুরুষদের সামনে তো নয়ই, এমনকি প্রতিবেশী মহিলা বা অন্য বাড়ির পরিচারিকাদের সামনেও বেরোবার নিয়ম ছিল না। সে-যুগে মুসলিম সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারেও ছিল নানা নিষেধাজ্ঞা। কেবল কোরান পাঠের জন্য আরবি ভাষা শেখা চলতে পারে। রোকেয়ার দিদি অবশ্য লুকিয়ে লুকিয়ে বাংলা ভাষা শিখেছিলেন এবং তাতে বাবার মদতও ছিল, কিন্তু আত্মীয়স্বজনের চাপে তা বেশিদূর এগোয়নি। তবে বিয়ের পর স্বামীর উৎসাহে দিদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করেছেন। এই দিদির কাছেই রোকেয়া বাংলা শিখেছেন এবং দাদা চর্চা করাতেন ইংরেজি। ষোলো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হল সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে। অভিজাত বংশের মেধাবী অবাঙ্গালি স্বামীর ছিল বদলির চাকরি। তার দৌলতে রোকেয়ার জীবনে খোলা পৃথিবীর হাওয়া লেগেছিল। স্বামীর উৎসাহে ইংরেজির চর্চা এতোটাই এগিয়েছিল যে দুদিনের চেষ্টায় তিনি লিখে ফেললেন 'Sultana's Dream' নামে এক আখ্যান। পত্র-পত্রিকায় লেখালিখির চর্চা শুরু হল। বিবাহিত জীবনের দশ বছর পুরোতেই মৃত্যু ঘটল তাঁর বিদ্যোৎসাহী স্বামীর, শ্বশুরালয় ভাগলপুর ছেড়ে রোকেয়া চলে এলেন কলকাতায় ১৯১০ সালে। স্বামীর আদর্শের স্মৃতিতে মুসলিম মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিকিরণের ব্রত গ্রহণ করলেন তিনি।

১৯১১-তে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। নানান নির্যাতন, বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে রোকেয়া তাঁর বিদ্যালয়টিকে তিলে তিলে বড়ো করে তুলেছিলেন। ১৯১৬-তে তাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠল সামাজিক সংস্কারের জন্য 'আঞ্জুমান খাওয়াতীন ইসলাম' নামে মহিলা সমিতি। অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সারা জীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন।

মৃত্যু ৯ ডিসেম্বর ১৯৩২ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *মতিচুর* (দুই খণ্ড), *অবরোধবাসিনী*। একটি উপন্যাসও লিখেছেন।

রাজশেখর বসু

জন্ম ১৬ মার্চ ১৮৮০, বর্ধমানের বামুনপাড়ায় (মাতুলালয়)। পিতৃনিবাস নদীয়ার বীরনগর। বাবা চন্দ্রশেখর বসু, মা লক্ষ্মীমণি দেবী। বাবা দারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন, ফলে রাজশেখরের বিদ্যালয়-জীবন কেটেছে বিহারে। ১৮৯৯-এ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় তিনি বি এ এবং ১৯০০ সালে এম এ পাশ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯০২-তে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করে ঠিক তিনদিন আদালতে ওকালতি করেছেন। ১৯০৩ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালে কেমিস্ট হিসেবে যোগ দেন। তিন বছরের মধ্যেই তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন এবং ১৯৩২ পর্যন্ত এই স্বদেশি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন। অবশ্য পরামর্শদাতা হিসেবে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে আমৃত্যু জড়িত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের জগতে তাঁর প্রবেশ অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে। 'পরশুরাম' ছদ্মনামে তিনি গল্প লিখতেন। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'গড্ডলিকা' প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'পরশুরাম নামটা শুনিয়া পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে যে লেখক বুঝি জখম করিবার কাজে প্রবৃত্ত। কথাটা একেবারেই সত্য নহে। বইখানা চরিত্রচিত্রশালা। মূর্তিকারের ঘরে ঢুকিলে পাথর ভাঙার আওয়াজ শুনিয়া যদি মনে করি ভাঙাচোরাই তাঁর কাজ তবে সে ধারণাটা ছেলেমানুষের মত হয়,— ঠিকভাবে দেখিলে বুঝা যায় গড়িয়া তোলাই তার ব্যবসা।' রাজশেখর কেবল গল্পকার ছিলেন না, তিনি বেশকিছু কবিতা লিখেছিলেন আর বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ তো অজস্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার সমিতি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা কমিটির অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন তিনি। 'চলন্তিকা' অভিধান গ্রন্থটির নির্মাতাও তিনি। রবীন্দ্র পুরস্কার, অকাদেমি পুরস্কার, পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন তিনি।

মৃত্যু ২৭ এপ্রিল ১৯৬০ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *লঘুগুরু, বিচিন্তা, ভারতের খনিজ, কুটির শিল্প*। তাছাড়া আছে অনেকগুলি গল্পগ্রন্থ।

অনূদিত গ্রন্থ : *বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, মেঘদূত, হিতোপদেশের গল্প*।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮০ উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলে। বাবা বিশ্বনাথ দত্ত, মা ভুবনেশ্বরী দেবী। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভাই ভূপেন্দ্রনাথ কলকাতার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে এনট্রান্স পাশ করেছেন। ভগিনী নিবেদিতার পরামর্শে তিনি উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে যান। এর আগেই তিনি ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর সংস্পর্শে এসে হিন্দুসমাজের

জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সচেতন হন। ১৯০২ সালে তিনি ব্যারিস্টার পি মিত্রের বিপ্লবী সমিতিতে যোগ দেন এবং বাংলার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হন। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত এই বিপ্লবী জাতায়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। স্বদেশে ছাড়াও আমেরিকা ও জার্মানির প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯১৬ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত তিনি বার্লিন কমিটির সম্পাদক ছিলেন। মার্কিন দেশে থাকতেই তিনি ব্রনক্সপার্ক সোশালিস্ট ক্লাব-এর সদস্য হন এবং ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লবের পর তিনি মার্কসবাদী চিন্তাধারায় দীক্ষিত হয়ে ওঠেন। ১৯২০-২১ সালে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের আহ্বানে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মস্কো যান এবং ভিশিনস্কির মাধ্যমে ভারতেব স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে তাঁর মতামত লেনিনকে জানিয়েছিলেন। নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব ছিল তাঁর অধীত বিষয় এবং ১৯২৩ সালে হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে ব্যাপৃত হন, ১৯২৭-২৮ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির এবং ১৯২৯-এ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৬-এ তিনি বঙ্গীয় কৃষক সভার অন্যতম সভাপতি এবং সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি দুবার সভাপতিত্ব করেছেন। তিনি মার্কসবাদী দর্শন ও কর্মপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু কখনোই ভাবতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ নেননি। নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব ছাড়াও ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শনে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। এবং বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, জার্মান ভাষায় তিনি অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন।

মৃত্যু ২৫ ডিসেম্বর ১৯৬১ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস, যুগসমস্যা, তরুণের অভিযান, জাতিসংগঠন, যৌবনের সাধনা, সাহিত্যে প্রগতি, ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি* (তিন খণ্ড), *বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব, বাংলার ইতিহাস*। এছাড়া ইংরেজি ভাষায় লিখিত গবেষণা গ্রন্থ।

ক্ষিতিমোহন সেন

জন্ম ৩০ নভেম্বর ১৮৮০ কাশীতে। পৈতৃক নিবাস ঢাকার সোনারং। বাবা ভুবনমোহন সেন, মা দয়াময়ী দেবী। কাশী কুইন্স কলেজ থেকে তিনি সংস্কৃত বিষয়ে এম এ পাশ করেছেন এবং তারপর চম্বারাজ্যের শিক্ষাবিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯০৮-এ রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তিনি শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে যোগ দেন। পরে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর তিনি বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষরূপে কাজ করেছেন। কিছুদিন অস্থায়ী উপাচার্য ছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন ভ্রমণের সহযাত্রী ছিলেন। ভারতের মধ্যযুগের ধর্মসাধনা বিষয়ে তিনি সারাজীবন গবেষণা করেছেন এবং অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯৫২ সালে বিশ্বভারতী সর্বপ্রথম তাঁকেই দেশিকোত্তম উপাধি প্রদান করেছে। সর্বভারতীয় অন্যান্য সম্মাননাও তিনি পেয়েছেন।

মৃত্যু ১২ মার্চ ১৯৬০ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *কবীর* (চার খণ্ড), *ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা, দাদু, ভারতের সংস্কৃতি, বাংলার সাধনা, জাতিভেদ, হিন্দুমুসলমানের যুক্ত সাধনা, প্রাচীন ভারতে নারী, বলাকা কাব্য পরিক্রমা, বাংলার বাউল, চিন্ময় বঙ্গ* ইত্যাদি। কয়েকটি ইংরেজি গ্রন্থও আছে।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

জন্ম ৩ মে ১৮৮৩ মাতুলালয় বগুড়াতে। পৈতৃক নিবাস টাঙ্গাইল। বাবা মহেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ১৯০৬ সালে আইন পাশ করে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯১৭-তে তিনি ঢাকা আইন কলেজের উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯২৪ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার পর আবার তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৫০-এ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেগোর ল প্রফেসর হন। ১৯৫১-তে ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে তিনি মার্কিন দেশে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ভারতীয় আইন কমিশনেব সদস্য মনোনীত হন। প্রথন জীবনে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি বামপন্থী রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং ১৯২৫-২৬ সালে তিনি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩৪-এ লেবার পার্টি অব্ ইণ্ডিয়াব সভাপতি তিনিই ছিলেন। আইন সংক্রান্ত বহু তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। পাশাপাশি গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ রচনায় তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগের নতুন প্রগতিশীল সাহিত্যান্দোলনে তিনি একজন অগ্রণী চিন্তক। নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং ১৯৩৬-এ গোর্কির মৃত্যুর পব এই সঙ্ঘের উদ্‌যোগে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তার সভাপতি ছিলেন তিনি।

মৃত্যু ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *শুভা, পাপের ছায়া, তারপর, অভয়ের বিয়ে* ইত্যাদি যাটটি গ্রন্থ। ইংরেজিতে আইন বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

জন্ম ২৯ জুন ১৮৮৩ চব্বিশ পরগণার হরিনাভি। বাবা বসন্তকুমার ভট্টাচার্য। ১৯০৫-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম এ পাশ কবার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন এবং ১৯৪০ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তিনি একজন অগ্রণী চিন্তক। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে 'বিজ্ঞান প্রবেশ' ও 'পদার্থবিদ্যা' দুটি গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে তিনি বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা আন্দোলনের সূচনা করেন। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারকেও তিনি সাধারণ বাঙালির মধ্যে প্রচার করেছেন। তিনি কয়েকবছর 'ভাণ্ডার' সম্পাদনা করেছেন এবং 'বসুন্ধরা' পত্রিকাটির সম্পাদক আমৃত্যু তিনিই ছিলেন। তাঁর উৎসাহ ও দক্ষতায় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করে। রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশনার ক্ষেত্রেও (১৯৩৯) তাঁর কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত। দীর্ঘদিন তিনি কবির সান্নিধ্য ও স্নেহ পেয়েছেন। ছদ্মনামে তিনি বাংলার রঙ্গমঞ্চের বিবরণও লিখেছেন।

মৃত্যু ২৬ অগস্ট ১৯৬১ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী, নব্যবিজ্ঞান, বাঙ্গালীর খাদ্য, বিশ্বের উপাদান, তড়িতের অভ্যুত্থান, ব্যাধির পরাজয়, পদার্থবিদ্যার নবযুগ*। তাছাড়া লিখেছেন *কবি স্মরণে* এবং *অঘনটঘটিত*।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

জন্ম ১০ মে ১৮৮৪, আদি নিবাস ময়মনসিংহের ছোটো বিন্যাফৈর। বাবার নাম উমেশচন্দ্র গুপ্ত, মা মোক্ষদা দেবী। রংপুর জেলা স্কুল থেকে এনট্রান্স এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি ও দর্শনে অনার্স সহ বি এ পাশ করেন। ১৯০৬-এ দর্শনশাস্ত্রে এম এ এবং ১৯০৭-এ আইন পরীক্ষায় পাশ করে প্রথমে রংপুর ও পরে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেছেন। ১৯১৮ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। দশ বছর অধ্যাপনার পর আবার ওকালতিতে ফিরে আসেন এবং দেশের একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। সারাজীবন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ১৯০৫-এ কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং কিছুদিন জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেছেন। ১৯৪৭-এ র‍্যাডক্লিফ ট্রাইবুনালে পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য তৈরির কাজে তাঁকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনাথনাথ দেব পুরস্কার এবং ডি এল উপাধি পেয়েছেন এবং তাঁর উপার্জিত প্রচুর অর্থের এক বড়ো অংশ শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক কাজে দান করেছেন সারাজীবন ধরে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে তাঁর স্থান ছিল খুব উঁচুতে। বন্ধু প্রমথ চৌধুরী ও সবুজ পত্রের সান্নিধ্যে থেকে তিনি অসামান্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। লেখার পরিমাণ খুব বেশি না হলেও রচনাগুলির মান ছিল মর্যাদাসম্পন্ন।

মৃত্যু ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *কাব্যজিজ্ঞাসা, শিক্ষা ও সভ্যতা, নদীপথে, জমির মালিক, সমাজ ও বিবাহ, ইতিহাসের মুক্তি*। ইংরেজি ভাষায় লেখা কয়েকটি গ্রন্থ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

জন্ম ১০ জুলাই ১৮৮৫, আদি নিবাস চব্বিশ পরগণার পিয়ড়া। বাবা মুন্সি মফিজুদ্দিন আহমদ্, মা হুরুন্নেসা। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে ১৯১০-এ সংস্কৃত অনার্স সহ তিনি বি এ পাশ করেন এবং অনেক পরে ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে তিনি এম এ পাশ করেন। মাঝে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করে বসিরহাট কোর্টে কিছুকাল ওকালতি করেছেন। ১৯২১ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আমন্ত্রণে শহীদুল্লাহ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং তার আগে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন। ঢাকায় তিরিশ বছর অধ্যাপনার পর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দেন। চর্যাপদ নিয়ে গবেষণা করে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পান। চর্যাপদ যে বাংলা ভাষায় রচিত — এটা তাঁর গবেষণা থেকে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। লোকসাহিত্য নিয়ে তাঁর চর্চা উল্লেখযোগ্য। গবেষণা কর্মের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লিখেছেন এবং কয়েকটি সাময়িক পত্র নিয়মিত সম্পাদনা করেছেন — বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, বঙ্গভূমি, Peace। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে তিনি ছিলেন অন্যতম নেতা।

মৃত্যু ১৩ জুলাই ১৯৬৯ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা সাহিত্যের কথা* (দুই খণ্ড), *বাঙ্গালা ব্যাকরণ, শেষ নবীর সন্ধানে, ইকবাল, ওমর খৈয়াম, চরিত কথা, কথামঞ্জরী* ইত্যাদি। একটি গল্প সংকলনও আছে।

সম্পাদিত গ্রন্থ : *বিদ্যাপতি-শতক*।

বিনয়কুমার সরকার

জন্ম ২৬ ডিসেম্বর ১৮৮৭ (অন্য মতে ২২ অক্টোবর) মালদহের মুকদুমপুরে। আদি নিবাস ঢাকার সানিহাটি গ্রাম। বাবা সুধন্যকুমাব সরকার। ১৯০১ সালে মালদা জেলা স্কুল থেকে এনট্রান্স, ১৯০৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ঈশান স্কলারশিপ সহ বি এ এবং ১৯০৬-এ এম এ পাশ করেন। বহু ভাষাবিদ্ বিনয়কুমার ইতিহাস, দর্শন, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চা করেছেন। তবে অর্থশাস্ত্রী ও সমাজতত্ত্ববিদ্ হিসেবে তাঁর বিশেষ পরিচিতি। ছাত্র জীবনে তিনি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটির সদস্য ছিলেন এবং স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯০৭-১৯১১ সালে তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদে অধ্যাপনা করেছেন এবং মালদায় অনেকগুলি স্বদেশি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। ১৯১৪ থেকে ১৯২৫-এ তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন এবং অগণিত পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছেন। ১৯২৬ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি ধনবিজ্ঞান পরিষৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'আর্থিক উন্নতি' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। বহুমুখী প্রতিভাধর সমাজতাত্ত্বিক বিনয়কুমার ছিলেন তারুণ্যের প্রতীক। বাংলা গদ্যের এক নতুন ছাঁদ প্রবর্তন করেছেন তিনি। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক।

মৃত্যু ২৪ নভেম্বর ১৯৪৯ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *হিন্দু সমাজতত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি, যুবক এশিয়ার ভবিষ্যনিষ্ঠা, শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা, বর্তমান জগৎ (১৩ খণ্ড), ধনদৌলতের রূপান্তর, নয়া বাংলার গোড়াপত্তন, নিগ্রোজাতির কর্মবীর, বাড়তির পথে বাংলা* ইত্যাদি। ইংরেজি ভাষায় লিখিত অনেক গ্রন্থ।

সুকুমার রায়

জন্ম ৩০ অক্টোবর ১৮৮৭ কলকাতায়। আদি নিবাস ময়মনসিংহের মসূয়া। বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মা বিধুমুখী দেবী। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন শাস্ত্রে অনার্স সহ বি এস সি পাশ করেছেন। ১৯১১ সালে ফোটোগ্রাফি ও প্রিন্টিং টেকনোলজি পড়ার জন্য ইংল্যান্ডে যান এবং ১৯১৩-তে FRPS উপাধি অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে বাবার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ইউ রায় অ্যান্ড সন্‌স্‌-এ যোগ দেন। ছোটোদের জন্য হাসির নাটক, গল্প ও কবিতা রচনা করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টিকর্তা তিনি। বাংলা ভাষায় ননসেন্স ভার্স তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আবাল্য ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন এবং ব্রাহ্ম যুবসমাজের নেতা হিসেবে তিনি সমাজের আনুষ্ঠানিকতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তা এখন এক বিশেষ ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য অনুজ বন্ধু ছিলেন তিনি। কবিতা-নাটক-গল্প ছাড়াও দার্শনিক প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি কয়েকটি। খুবই অল্প বয়সে এই প্রতিভাশালী কবির মৃত্যু। তাঁর প্রায় সব গ্রন্থই মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে। চিত্রাঙ্কনেও তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর 'সন্দেশ'-এর পাতায় পাতায়।

মৃত্যু ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *বর্ণমালাতত্ত্ব* ও *অন্যান্য প্রবন্ধ*। কবিতা-গল্প-নাটক অনেক।

সম্পাদিত পত্রিকা : *সন্দেশ*।

মোহিতলাল মজুমদার

জন্ম ২৬ অক্টোবর ১৮৮৮ চব্বিশ পরগণার কাঁচড়াপাড়ায়। পৈতৃক নিবাস হুগলির বলাগড। বাবা নন্দলাল মজুমদার, মা হেমাঙ্গিনী দেবী। ১৯০৮ সালে বি এ পাশ করার পর দীর্ঘকাল স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯২৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ১৯৪৪ পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। কবি এবং সাহিত্য সমালোচক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা তৃতীয় পর্যায়ে তিনি সম্পাদনা করেছেন। কৃত্তিবাস ওঝা ও সত্যসুন্দর দাস ছদ্মনামেও তিনি লিখেছেন।

মৃত্যু ২৬ জুলাই ১৯৫২ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *সাহিত্যবিতান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বিবিধ প্রবন্ধ, শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র, বঙ্কিম বরণ, সাহিত্য বিচার, রবি-প্রদক্ষিণ, বাংলার নবযুগ, কবি শ্রীমধুসূদন, বাংলা কবিতার ছন্দ*। এছাড়া অনেক কাব্যগ্রন্থ।

নলিনীকান্ত গুপ্ত

জন্ম ১৩ জানুয়ারি ১৮৮৯ ফরিদপুরে। বাবা রজনীকান্ত গুপ্ত। বিদ্যালয়-শিক্ষা হয়েছে রংপুরে। ছাত্রজীবনেই বিপ্লবী স্বদেশি আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় ১৯০৫-এর আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং ১৯০৭-এ পুরোপুরি বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। মানিকতলার বোমার মামলায় (১৯০৮) অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তিনি কারাবরণ করেন। শ্রী অরবিন্দের কাছে গ্রিক, লাতিন, ফরাসি, ইতালীয় ভাষা শিখেছিলেন। শিল্প, সাহিত্য, সমাজ, ইতিহাস, বিজ্ঞান নানা বিষয়ে তিনি অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। অতীন্দ্রিয়বাদ নিয়েও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনা রয়েছে। অরবিন্দ আশ্রমের সম্পাদক ছিলেন তিনি এবং পণ্ডিচেরি আশ্রম ট্রাস্টের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি।

মৃত্যু ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *সাহিত্যিকা, রূপ ও রস, শিল্পকথা, বাংলার প্রাণ, স্বরাজ-এর পথ, ভারত রহস্য, রবীন্দ্রনাথ, কবির মনীষী, স্মৃতির পাতা* ইত্যাদি। ইংরেজি ভাষায় লিখিত বেশ কিছু গ্রন্থ।

অনূদিত গ্রন্থ : শ্রী অরবিন্দের *সাবিত্রী*।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ২১ নভেম্বর ১৮৯০ কলকাতায়। আদি নিবাস হাওড়ার শিবপুর। বাবা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, মা কাত্যায়নী দেবী। বরাবরের কৃতী ছাত্র সুনীতিকুমার ১৯১১-তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স সহ বি এ এবং ১৯১৩-তে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পাশ করেছেন। প্রথমে বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। এরপর পি আর এস বৃত্তি ও জুবিলি গবেষণা পুরস্কার পান। ১৯১৯-এ ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে তিনি ইউরোপে যান এবং দু-বছর পর ডি লিট ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর সর্বপ্রধান কাজ Origin and Development of Bengali Language দুই খণ্ডে প্রকাশিত হলে তাঁর খ্যাতি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। লন্ডন ও প্যারিসে থেকে তিনি বহু ভাষা চর্চা করেন এবং ভাষাতত্ত্বচর্চার জগতে বিশেষ পণ্ডিত হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান। ১৯২২-এ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খয়রা অধ্যাপক পদে যোগ

দেন এবং ১৯৫২-তে অবসর গ্রহণের পর এমিরিটাস প্রফেসর হন। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন, ১৯২৭-এ কবির সঙ্গে সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, শ্যামদেশে পরিভ্রমণ করেন। ১৯৩৬-এ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। ১৯৬৫-তে তিনি জাতীয় অধ্যাপকের মর্যাদা পান এবং ১৯৬৩-তে পদ্মবিভূষণ উপাধি প্রাপ্ত হন। অজস্র আন্তর্জাতিক পুরস্কার তিনি লাভ করেছেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। ১৯৬৯-এ সাহিত্য অকাদেমির সভাপতি নির্বাচিত হন।

মৃত্যু ২৯ মে ১৯৭৭ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, জাতি সংস্কৃতি সাহিত্য, পশ্চিমের যাত্রী, দ্বীপময় ভারত, বৈদেশিকী, ভারত সংস্কৃতি, ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা, সাংস্কৃতিকী* (৩ খণ্ড), *পথ-চলতি* (২ খণ্ড) ইত্যাদি। ইংরেজি ভাষায় লিখিত অনেক গবেষণা গ্রন্থ।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৯০ বহরমপুরে। বাবা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করার পর পি আর এস বৃত্তি লাভ করেছেন। তাঁর অধীত বিষয় ছিল অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব। অধ্যাপনা শুরু করেছেন বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সবশেষে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। বিশিষ্ট অর্থশাস্ত্রী ও সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে তিনি স্বদেশে ও বিদেশে খ্যাতিমান। ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। 'উপাসনা' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন তিনি। বিশ শতকের বিশ-তিরিশের দশকে বাংলার বিদগ্ধ পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন।

মৃত্যু ১৯৬৮।

রচিত গ্রন্থ : *বর্তমান বাংলা সাহিত্য, মনোময় ভারত, তরুণের ভারত, দরিদ্রের ক্রন্দন, শাশ্বত ভিখারী, শিক্ষাসেবক, পল্লী প্রচারক, বিশ্বভারত* (২ খণ্ড)। ইংরেজি ভাষায় লিখিত বেশ কিছু গবেষণা গ্রন্থ।

এস ওয়াজেদ আলি

জন্ম ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯০, আদি নিবাস হুগলি জেলার বড়োজাতপুর। বাবা শেখ বিলায়েৎ আলি। কেমব্রিজ থেকে বি এ পাশ করেছেন এবং ১৯১৫ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। কর্মজীবনে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে ছিলেন। ১৯৪৫-এ অবসর নিয়েছেন। সমকালীন বাংলা সাহিত্যজগতে এক বিশিষ্ট নাম। উদারচেতা মুক্তমনের সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর বিশেষ পরিচিতি। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি ছিলেন তিনি। গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ তো লিখেছেনই, ভ্রমণকাহিনী ও রম্যরচনাগুলিতেও বিশিষ্টতার স্বাক্ষর আছে।

মৃত্যু ১০ জুন ১৯৫১ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *মাশুকের দরবার, প্রেমের মুসাফির, ভারতবর্ষ, জীবনের শিল্প, খেয়ালের ফেরদৌস, ভবিষ্যতের বাঙালী* ইত্যাদি। ইংরেজি ভাষাতেও তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম জন্ম ২৩ মার্চ ১৮৯২ বীরভূমের হাতিয়া গ্রামে। বাবা মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়। স্কটিশ চার্চেস কলেজ থেকে ইংরেজিতে ঈশান স্কলার হয়ে বি এ পাশ করেন এবং ১৯১২ সালে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান পেয়েছেন। সারাজীবন অধ্যাপনা করেছেন — রিপন কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিছুদিন রাজশাহী কলেজে উপাধ্যক্ষ ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পদে বৃত ছিলেন ১৯৫৫ পর্যন্ত। স্বাধীনতার পর রাজনীতিতেও যোগ দিয়েছিলেন, কংগ্রেস দলের টিকিটে পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার সদস্য ছিলেন কিছুদিন। বাংলা সাহিত্যজগতে বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর বৈদগ্ধ্য অবিসম্বাদিত।

মৃত্যু ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, বাংলা সাহিত্যের কথা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সংগমে* ইত্যাদি।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

জন্ম ১৮৯৪ সালে ফরিদপুরেব আমতলি গ্রামে। বাবা চন্দ্রকিশোর বাচস্পতি, মা জানকী দেবী। ১৯২২-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম এ পাশ করেন এবং শাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন শুরু হলে তিনি বাংলাতে এম এ করেন। স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ে গবেষণা করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রিও অর্জন করেছিলেন। শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে, পরে ১৯২৮ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। এরপর ১৯৪৬-এ তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব নেন এবং ১৯৫১-তে অবসর গ্রহণ করেন। ভারতীয় দর্শনের বস্তুবাদের ওপর তাঁর গবেষণা কর্ম, বিশেষত চার্বাক বিষয়ে, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

মৃত্যু ৯ ডিসেম্বর ১৯৬১ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *স্মৃতি : আচার ও ধর্ম, চার্বাক দর্শন, প্রবন্ধ সংগ্রহ*।

জ্যোতির্ময়ী দেবী

জন্ম ২৩ জানুয়ারি ১৮৯৪ রাজস্থানের জয়পুরে। বাবা অবিনাশচন্দ্র সেন, মা সরলা দেবী। ঠাকুরদা সংসারচন্দ্র সেন ছিলেন জয়পুর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী এবং সেই সুবাদেই তাঁরা রাজস্থাননিবাসী। মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামের কিরণচন্দ্র সেনের সঙ্গে। অ্যাডভোকেট স্বামীর কর্মস্থল পাটনায় তাঁরা বিবাহিত জীবন কাটিয়েছেন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে জ্যোতির্ময়ীর অকাল বৈধব্য ঘটে এবং তিনি জয়পুরে ফিরে যান। তাঁর পিতৃ-পরিবারে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে রাজস্থানী সংস্কৃতির এক চমৎকার মিশ্রণ ঘটেছিল। ওই অভিজাত সাংস্কৃতিক পরিবেশে তিনি জন্মাবধি লালিত। পাটনা থেকে জয়পুরে ফিরে আসার পর তিনি লেখাপড়ার চর্চায় মগ্ন হলেন এবং কাকার বন্ধু কান্তিচন্দ্র ঘোষের সাহায্যে লেখালিখির জগতে

আসেন। ১৯২২ থেকে তাঁর রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেতে শুরু করে। প্রথমে তিনি মূলত কবিতাই লিখতেন, পরে 'সুমিত্রাদেবী' ছদ্মনামে গল্প লেখাও শুরু করেন। ক্রমে উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখেছেন বিস্তর। মেয়েদেব অসহাযতা, অববোধবাসিনী নারীর অধিকারহীনতা এবং তাঁদের মুক্তির কল্পে নানান চিন্তা তাঁর রচনার মুখ্য বিষয়বস্তু হযে ওঠে। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি তিনি গান্ধিজির আন্দোলনের সঙ্গেও নিজেকে জড়িয়ে ছিলেন। 'হরিজন উন্নয়ন কথা' নামে একটি বই লিখেছিলেন তিনি। ১৯৬৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' প্রদান করেছে, রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৭২-এ এবং সাহিত্য পরিষৎ ১৯৮২ তাঁকে হরনাথ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানিয়েছে।

মৃত্যু ১৭ নভেম্বর ১৯৮৮ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *চিরন্তন নারী জিজ্ঞাসা*। আছে বেশ কিছু কবিতা-উপন্যাস-গল্পগ্রন্থ।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

জন্ম ৫ অক্টোবর ১৮৯৪ শ্রীরামপুরের চাতরা পল্লিতে। পল্লিতে। আদি নিবাস ২৪ পরগণার ভাটপাড়া। বাবা ভূপতিনাথ মুখোপাধ্যায়, মা এলোকেশী দেবী। ১৯১২ সালে রিপন কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স সহ বি এ পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু পাসের বিষয় রসায়নে কৃতকার্য হতে পারেননি। ১৯১৬ সালে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯১৮-তে এম এ পাশ করেন। বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার আগে তিনি বিলেতে পড়াশোনার জন্য রওনা হয়েছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য কলম্বো থেকে ফিরে আসেন। ১৯২০-তে তিনি পুনরায় অর্থনীতিতে এম এ করেন এবং ১৯২১-এ বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনার জীবন শুরু করেন। ১৯২২-এ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। প্রায় ৩২ বছব এখানে অধ্যাপনা করেছেন। তবে মাঝে ১৯৩৮-এ দু-বছরের জন্য যুক্ত প্রদেশ সবকারের ডিরেক্টর অব্ ইনফরমেশন পদে কাজ করেছেন। ১৯৪৭ সালে যুক্তপ্রদেশ সরকারেব লেবার এনকোয়ারি কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং ১৯৫৯ পর্যন্ত কাজ করেন। ১৯৫২-তে ইকনমিক ডেলিগেট হয়ে সোভিয়েট রাশিয়া গিয়েছিলেন এবং ওই বছরেই হেগ শহরের ইনস্টিট্যুট অব্ সোশ্যাল স্টাডিসের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে আমন্ত্রণ পান। ১৯৫৫-তে বান্দুং সম্মেলনে যোগ দেন। এইসব গুরুত্বময় কাজগুলির পাশাপাশি তাঁর ছিল নিরন্তর সাহিত্যসাধনা ও সঙ্গীতচর্চা। বাংলা সাহিত্যে মোড়-ফেরানো গল্প-উপন্যাস যেমন লিখেছেন। লিখেছেন বিদগ্ধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ-সমালোচনা। বাবা-মা ও ঠাকুর্দার প্রেরণায় সঙ্গীত ছিল তাঁর প্রাণের সঙ্গী, গান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতা এক বিশেষ ঘটনা। বিশ শতকের তিরিশ-চল্লিশের যুগে বাঙালি চিন্তকমহলে মার্কসবাদ চর্চার প্রবল হাওয়া ছিল, ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন তার এক প্রধান ঋত্বিক। তবে মার্কসবাদে আস্থা থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে মার্কসবাদী বলতেন না, নিজের পরিচয় দিতেন 'মার্কসোলজিস্ট'।

মৃত্যু ৫ ডিসেম্বর ১৯৬১ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *আমরা ও তাঁহারা, চিন্তয়সি, মনে এলো, ঝিলিমিলি, সুর ও সঙ্গতি, কথা ও সুর, বক্তব্য*। তাছাড়া আছে গল্প-উপন্যাস ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত বেশকিছু গবেষণা গ্রন্থ।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

জন্ম ১ জানুয়ারি ১৮৯৪ কলকাতায়। আদি নিবাস নদীয়ার সুবর্ণপুর। বাবা সুরেন্দ্রনাথ বসু, মা আমোদিনী দেবী। বিদ্যালয়ন্তর থেকে কৃতী ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ ১৯১৫ সালে গণিতে এম এস সি পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে মিশ্র গণিত ও পদার্থ বিদ্যা পড়ানো ও গবেষণার কাজে লিপ্ত হন। ড. মেঘনাদ সাহার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর ১৯২১-এ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে রীডার পদে যোগ দেন। এখানে তিনি দীর্ঘ চব্বিশ বছর কাজ করেছেন। ১৯২৪ সালে তিনি 'প্লাঙ্কসূত্র ও কোয়ান্টাম প্রকল্প' নামে এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ কবেন, এই প্রবন্ধ আইনস্টাইনকে মুগ্ধ করে। আইনস্টাইন প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে একটি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এটি প্রকাশিত হওয়ার পর সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীমহলে সাড়া পড়ে যায় এবং সত্যেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি 'বোস-আইনস্টাইন সংজ্ঞা' নামে সমাদৃত হয়। ১৯২৯ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি হন, ১৯৪৪ সালে বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৫-এ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব পদার্থবিদ্যা বিভাগে প্রফেসর পদে যোগ দেন এবং ১৯৫৬ পর্যন্ত খয়রা অধ্যাপক পদে কাজ করেছেন। অবসর গ্রহণের পর ১৯৫৮-এ তিনি ভারত সরকাব কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপকের মর্যাদা পান। মাঝে দু-বছর তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন। বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' এবং ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৫৮-তে তিনি লন্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৫২ থেকে কিছুকাল তিনি রাজ্যসভাব মনোনীত সদস্য ছিলেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা প্রসারের জন্য তিনি 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বাদু বাংলায় অজস্র বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ নিজেও লিখেছেন। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা তিনি। সাহিত্য ও সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। নিজে বেহালা ও এস্রাজ বাজাতেন।

মৃত্যু ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *বিজ্ঞানের সংকট, রচনা সংকলন*। এছাড়া ইংরেজি ভাষায় অনেকগুলি গবেষণা গ্রন্থ।

কালিদাস রায়

জন্ম ২২ জুন ১৮৮৯। আদি নিবাস বর্ধমানের কড়ুই। বাবা যোগেন্দ্রনারায়ণ কাশিমবাজার এস্টেটের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯১০-এ তিনি বি এ পাশ করেন। কিছুদিন দর্শন শাস্ত্রে এম এ পড়েছিলেন। কর্মজীবন শুরু রংপুরের উলিপুরে — মহারাণী স্বর্ণময়ী স্কুলের প্রধানশিক্ষক পদে। দীনেশচন্দ্র সেনের আনুকূল্যে তাঁর কলকাতায় আসা, ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনের সহকারী প্রধানশিক্ষক পদে তিনি নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সালে এই বিদ্যালয় থেকে তিনি অবসর নেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি কাব্যরচনায় উৎসাহী। ১৮ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। কালিদাস রায়ের মাতৃকুল ছিল বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। বৈষ্ণব ভাবধারা তাঁর কাব্যবোধকে উদ্দীপ্ত করেছে। কেবল কবিতা নয়, সাহিত্যের নানা বিষয়ে তিনি অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। 'বেতালভট্ট' ছদ্মনামে তাঁর রসরচনাগুলিও পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। ১৯৬৩-তে আনন্দ পুরস্কার, ১৯৬৮-তে রবীন্দ্র পুরস্কার, এবং পরে বিশ্বভারতীর

'দেশিকোত্তম' উপাধিতে তিনি ভূষিত হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক ও 'সরোজিনী স্বর্ণপদক' প্রদান করেছে। ১৯৭২-এ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি লিট দিয়েছে।

মৃত্যু ২৫ অক্টোবর ১৯৭৫ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, পদাবলী-সাহিত্য, শরৎ-সাহিত্য* ও *সাহিত্য প্রসঙ্গ* ইত্যাদি। তাছাড়া অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ।

কাজি আবদুল ওদুদ

জন্ম ২৬ এপ্রিল ১৮৯৪ ফরিদপুর জেলার বাগমারা গ্রামে। বাবা সগীরুদ্দিন। এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে কলকাতায় আসেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম এ পাশ করেন। ১৯২০-তে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। প্রায় বিশ বছর শিক্ষকতার পর তিনি বাংলা সরকারের টেক্সট বুক কমিটির সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় পুনর্বার আসেন। দেশভাগের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গে থেকে যান। ১৯৫১ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। সত্যনিষ্ঠ মানবতাবাদী ওদুদ সারাজীবন সাম্প্রদায়িকতা ও ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ১৯২৬-এ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এব এক প্রধান স্তম্ভ ছিলেন তিনি। আবুল হোসেন, কাজি মোতাহাব হোসেন, আবুল ফজল প্রমুখ আরও অনেকের সঙ্গে মিলে এই সংগঠনকে ভর করেই গড়ে তোলেন 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন। ১৯২৭-এ 'শিখা' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর যুক্তিভিত্তিক রচনাগুলির জন্য তিনি ঢাকাব নবাব পরিবার কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছিলেন। রামমোহন রবীন্দ্রনাথ গ্যেটে সম্পর্কে তাঁব প্রীতিময় গবেষণা তাঁর চিন্তার ধরন বুঝতে সাহায্য করে। অগণ্য প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি সারাজীবন, পাশাপাশি গল্প-উপন্যাস-নাটকও রচনা করেছেন।

মৃত্যু ১৯ মে ১৯৭০ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *রবীন্দ্রকাব্য পাঠ, সমাজ ও সাহিত্য, কবিগুরু গ্যেটে, শাশ্বত বঙ্গ, বাংলার জাগরণ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, হজরত মহম্মদ ও ইসলাম, ব্যবহারিক শব্দকোষ* (অভিধান ২ খণ্ড) ইত্যাদি।

অনুবাদ : পবিত্র কোরআন (২ খণ্ড)

নীরেন্দ্রনাথ রায়

জন্ম ১৮৯৬, আদি নিবাস যশোহর। মা নিস্তারিণী দেবীর প্রভাবে আবাল্য স্বদেশি চেতনায় আন্দোলিত। ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পাশ করার পর স্কটিশ চার্চেস কলেজে চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু বিদেশি পোশাক পরা আবশ্যিক শর্ত ছিল বলে সে চাকরি নেননি। বঙ্গবাসী কলেজে যোগ দিয়েছিলেন এবং একাদিক্রমে প্রায় চল্লিশ বছর সেখানে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেছেন। অবসর নিয়েছেন ১৯৬৪-তে। শেক্সপীয়র পড়ানোর খ্যাতি ছিল দিগন্তজোড়া। শেক্সপীয়রের ওপর লেখা তাঁর ইংরেজি গ্রন্থটি বাংলাদেশের শেক্সপীয়র চর্চায় এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। প্রথম জীবনে তিনি গান্ধিবাদী ছিলেন, পরবর্তী পর্যায়ে সুভাষচন্দ্রের অনুরক্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু ১৯৪০-এর যুগে তিনি প্রবলভাবে মার্কসবাদী এবং ভারতের কমিউনিস্ট

পার্টির সদস্য। এই সময়েই পার্টি প্রভাবিত 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদনা কাজেও তিনি ব্যাপৃত। ফরাসি, জার্মান ও রুশ ভাষা জানতেন, মস্কোয় দু-বছর রুশ ভাষা থেকে বঙ্গানুবাদের কাজও করেছেন। ১৯৬৬-তে তিনি দিল্লির 'ইনস্টিটিউট অব্ রাশিয়ান কালচার' প্রতিষ্ঠানটিতে অধ্যাপনার কাজ নিয়েছিলেন, বেশিদিন এ-দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি। কারণ মাসকয়েক বাদেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

মৃত্যু ২৯ অক্টোবর ১৯৬৬ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *সাহিত্যবীক্ষা*। ইংরেজি ভাষায় শেক্সপিয়রের ওপর লিখিত গবেষণা গ্রন্থ।

অনূদিত গ্রন্থ : মার্চেন্ট অব্ ভেনিস, ম্যাকবেথ।

দিলীপকুমার রায়

জন্ম ২২ জানুয়ারি ১৮৯৭ কলকাতায়। আদি নিবাস নদীয়ার কৃষ্ণনগর। বাবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মা সুরবালা দেবী। বাল্যকালে মাতৃবিয়োগ ঘটেছে, বাবার কাছেই লালিত-পালিত। ষোলো বছর বয়সে বাবাকেও হারান, তারপর থেকে দাদামশাইয়ের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। ১৯১৮-তে গণিত অনার্স সহ বি এ পাশ করেন এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। ১৯২০-২১ সালে কেমব্রিজে গণিতে পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ট্রাইপস এবং মিউজিক পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কেমব্রিজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সঙ্গীতশিক্ষার জন্য এরপর তিনি জার্মানি ও ইতালিতে গিয়েছিলেন। ১৯২২-এ দেশে ফিরে ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য ও পরম্পরা বুঝবার জন্য ভারত ভ্রমণ করেন এবং আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রমুখের সান্নিধ্যে আসেন। ১৯২৭-এ সঙ্গীত বিষয়ে বক্তৃতার জন্য আবার ইউরোপে যান এবং ১৯২৮-এ পণ্ডিচেরিতে শ্রী অরবিন্দের আশ্রমে বসবাস শুরু করেন, তাঁর যোগীজীবনের সূচনা হয়। ১৯৩৮-এ সরকারের অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতের পাঠ্যসূচির জন্য তিনি দুখানি বই রচনা করেন। ১৯৫৩-তে ভারত সরকারের সঙ্গীত মিশন নিয়ে তিনি ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, মিশরে বক্তৃতা করেন। ১৯৬৫-তে সঙ্গীত নাটক একাডেমির সদস্য হন। 'সঙ্গীত রত্নাকর' উপাধিতে তিনি ভূষিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি ছাড়াও বিশ্বের বহু বরেণ্য মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল, রম্যাঁ রলাঁ প্রমুখের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। পণ্ডিত নেহরু তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

মৃত্যু ৬ জানুয়ারি ১৯৮০

রচিত গ্রন্থ : *গীতসাগর, সাঙ্গীতিকী, দুধারা, দোলা, বহুবল্লভ, তরঙ্গ রোধিবে কে, দ্বিচারিণী, তীর্থঙ্কর, সুরবিহার, মধুমুরলী, অঘটনের শোভাযাত্রা* প্রভৃতি।

কাজি মোতাহার হোসেন চৌধুরী

জন্ম ৩০ জুলাই ১৮৯৭ মাতুলালয় কুষ্টিয়ার লক্ষ্মীপুরে। পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর, পাংশা, বাগমারা গ্রাম। বাবা কাজি গওহরউদ্দীন। ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১৯-এ পদার্থবিজ্ঞান অনার্স সহ বি এ এবং ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওই বিষয়ে এম এ পাশ করেন। এম এ পড়তে

পড়াতেই ১৯২১-এ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেমনস্ট্রেটারের কাজ করেছেন। পাশ করার পর ১৯২৩-এ সহকারি প্রভাষকের পদ পান। ১৯৩৮-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিতে এম এ করেন। ১৯৪৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগে সহকারী প্রভাষক এবং ১৯৫০-এ রীডার ও বিভাগীয় প্রধান হন। ১৯৫০-এ তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি আহরণ করেন এবং ১৯৫৩-তে প্রফেসার পদ পান। ১৯৬৪-৬৬ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-এর পরিচালক ছিলেন। ১৯৬৯-তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমিরিটাস প্রফেসারের সম্মান পান। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তিনি সম্মাননীয় ব্যক্তি। কাজি আবদুল ওদুদ প্রমুখের সঙ্গে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম একজন এবং ১৯২৭-এ 'শিখা' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ধর্ম-সমাজ-শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অজস্র উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৯৬৬-তে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৭৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টরেট, ১৯৭৫-এ জাতীয় অধ্যাপক হয়েছেন।

মৃত্যু ৯ অক্টোবর ১৯৮১।

রচিত গ্রন্থ : *সঞ্চয়ন, নজরুল কাব্য পরিচিতি, সেই পথ লক্ষ্য করে, সিম্পোজিয়াম, গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস, আলোক বিজ্ঞান।*

প্রবোধচন্দ্র সেন

জন্ম ২৭ এপ্রিল, ১৮৯৭ মাতুলালয় কুমিল্লার মনিয়ন্দ গ্রামে। পৈতৃক নিবাস ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা হরদাস সেন, মা স্বর্ণময়ী সেন। সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে ইতিহাস অনার্স সহ বি এ পাশ করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। পাশ করার পর অধ্যাপনার জীবন শুরু খুলনা দৌলতপুর কলেজে ইতিহাস ও বাংলা পড়ানোর কাজে। ১৯৩২ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত ছিলেন এই কলেজে। ১৯৪২ সালে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন অধ্যাপক পদে। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ তিনি ছিলেন বিদ্যাভবনের রবীন্দ্র-অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ। ১৯৬৫-তে তিনি অবসর নেন। তবে বিশ্বভারতী ১৯৬৫ সালেই তাঁকে এমিরিটাস অধ্যাপকের সম্মান দেয়। বাংলা ছন্দের নিপুণ বিশ্লেষণই শুধু তিনি করেননি, ছন্দশাস্ত্র নিয়ে তাঁর বিপুল গবেষণা। রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থটি সম্পাদনা করে তিনি বিদ্বজ্জনমহলে প্রবলভাবে আদৃত হয়েছেন। তাছাড়া ইতিহাস, শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য, রবীন্দ্রসাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

মৃত্যু ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬।

রচিত গ্রন্থ : *বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান, ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, ছন্দ-পরিক্রমা, ছন্দ-জিজ্ঞাসা, বাংলা ছন্দ-সমীক্ষা, বাংলা ছন্দচিন্তার ক্রমবিকাশ, ছন্দ-সোপান, বাংলা ছন্দ-সাহিত্য, বাংলা ছন্দের রূপকার রবীন্দ্রনাথ, নতুন ছন্দ-পরিক্রমা, বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচিন্তার অগ্রগতি, ধর্মবিজয়ী অশোক, ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত, ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি, ভারতাত্মা কবি কালিদাস* ইত্যাদি।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

জন্ম ২৩ নভেম্বর ১৮৯৭ ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জে। বাবা উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, মা সুশীলাসুন্দরী। জীবনের প্রথম বারো বছর কিশোরগঞ্জে ছিলেন, তারপর কলকাতায় আসেন। বি এ পরীক্ষায় ইতিহাস অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন। এম এ-তে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু পড়া শেষ করেননি। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, গ্রিক, ল্যাটিন ভাষা রপ্ত করেছিলেন। প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা নিয়ে চর্চা করেছেন প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, পাশ্চাত্য সঙ্গীত, ভূগোল, ইতিহাস, প্রাণীতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, রণকৌশলের ইতিহাস। চাকরির কথা না ভেবে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা করেছেন সারাজীবন। সে কারণে কর্মজীবন বৈচিত্র্যময়। কোনো চাকরিতেই বেশিদিন স্থিত থাকতে পারেননি। কর্মজীবন শুরু মিলিটারি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে করণিকের পদে। ১৯২৮-এ মডার্ন রিভিউ-এর সহকারী সম্পাদক, তিরিশের দশকের শেষের দিকে শরৎচন্দ্র বসুর ব্যক্তিগত সচিব, ১৯৪২-এ অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে যান। ১৯৭০-এ ম্যাক্সমুলারের জীবনী রচনার কাজে ইংল্যান্ডে যান, আর দেশে ফেরেননি। ১৯৩৫-এ অবশ্য তাঁর প্রথম বিদেশ গমন। বিলেতবাসী ছিলেন বটে কিন্তু ভারতীয় নাগরিকত্ব ছাড়েননি। ইংরেজি ও বাংলায় আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। যতই বিতর্কিত হোক না কেন নিজের বিশ্বাসে স্থিত ছিলেন বরাবর, আপোস করেননি কখনও। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি লিট দিয়েছে, পেয়েছেন 'কমান্ডার অব অর্ডার অব্ ব্রিটিশ এম্পায়ার' সম্মান, বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দিয়েছে। পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি ও আনন্দ পুরস্কার।

মৃত্যু ১২ জুলাই ১৯৯৯ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *বাঙালী জীবনে রমণী, আত্মঘাতী বাঙালী, আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ, আমার দেশ আমার শতক, আজি হতে শতবর্ষ আগে*। ইংরেজি ভাষায় লিখিত বেশকিছু গ্রন্থ।

প্রবোধচন্দ্র বাগচি

জন্ম ১৮ নভেম্বর ১৮৯৮ যশোহর জেলার শ্রীকোলে। পৈতৃক নিবাস খুলনা। ১৯১৮ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে সংস্কৃত অনার্স সহ বি এ এবং ১৯২০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম এ পাশ করেন এবং এই বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯২১-এ অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভির সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁর আগ্রহে তিনি নেপালে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি-বিষয়ক পাণ্ডুলিপি নিয়ে কাজ করেন। ১৯২৩-এ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য যান এবং সেই গবেষণার ফল ফরাসি ভাষায় লিখিত তিনখণ্ডে 'চীনদেশে বৌদ্ধশাস্ত্র' এবং দুখণ্ডে 'সংস্কৃত-চীনা অভিধান'। এই গবেষণার জন্য তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি পান। দেশে ফেরার পর আবার নেপালে যান দোঁহাকোষ ও চর্যাপদ ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা করেছেন, ১৯৪৫-এ বিশ্বভারতীর চীনাভবনে গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষের পদে যোগ দেন। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার পর তিনি বিশ্বভারতীতে ইতিহাসের অধ্যাপক এবং স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যক্ষতার কাজে নিযুক্ত হন। ১৯৫২-তে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে ভারতীয় সংস্কৃতি সঙ্ঘের সদস্য হিসেবে আরও একবার চীনে গিয়েছিলেন। ১৯৫৪-তে বিশ্বভারতীর উপাচার্য মনোনীত হন এবং দীর্ঘকাল এই পদে কাজ করেছেন।

মৃত্যু ১৯ জানুয়ারি ১৯৬৫ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *দোঁহাকোষের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ*, *চর্যাপদের মূল পাঠ ও ব্যাখ্যা*। ইংরেজি ভাষায় লেখা গ্রন্থও আছে।

সম্পাদনা : *Sino-Indian Studies* (ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্র)

জীবনানন্দ দাশ

জন্ম ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ বরিশালে। বাবা সত্যানন্দ দাশ, মা কুসুমকুমারী দেবী। কুসুমকুমারী কবিতা লিখতেন। বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের ছাত্র ছিলেন। বি এ পাশ করেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেসিডেন্সির মাধ্যমে ইংরেজিতে এম এ করেছেন। অধ্যাপনা ছিল তাঁর জীবিকা, বিভিন্ন কলেজে তিনি ইংরেজি সাহিত্য পড়িয়েছেন। কিছুদিন 'স্বরাজ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকায় সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তিনি স্বীকৃত এবং বিষণ্ণতার কবি বলে তাঁকে অনেক সময় চিহ্নিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে জীবনানন্দ লিখেছিলেন, '...আমার মনে হয় বিভিন্ন রকমের বেষ্টনীর মধ্যে এসে মানুষের মনে নানাসময় নানারকম moods খেলা করে। সে mood-গুলোর প্রভাবে মানুষ কখনও মৃত্যুকেই বঁধু বলে সম্বোধন করে। অন্ধকারের ভেতরেই মায়ের চোখের ভালোবাসা খুঁজে পায়, অপচয়ের হতাশার ভেতরেই বীণার তার বাঁধবার ভরসা রাখে। যে জিনিষ তাকে প্রাণবন্ত করে তোলে অপরের চোখে হয়তো তা নিতান্ত অগণ্য। তবু তাতেই তার প্রাণের সুরের আগুন লাগে, — সে আগুন সবখানে ছেয়ে যায়। mood-এর প্রক্রিয়ায় রচনার ভেতর এই যে সুরের আগুন জ্ব'লে ওঠে তাতে Serenity অনেক সময়েই থাকে না — কিন্তু তাই বলেই তা সুন্দর ও স্থায়ী হ'য়ে উঠতে পারবে না কেন বুঝতে পারছি না।' শুধু কবিতা নয়, বেশকিছু গল্প ও উপন্যাস এবং প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। কলকাতা রাস্তায় এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

মৃত্যু ২২ অক্টোবর ১৯৫৪ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *কবিতার কথা*। অনেক কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ।

সুশোভন সরকার

জন্ম ১৯ অগস্ট ১৯০০ সাল। মেদিনীপুরের কাঁথি ছিল আদি নিবাস। বাবা সুরেশচন্দ্র সরকার ছিলেন বিহার উড়িষ্যার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মা সরোজিনী দেবী। সুশোভনের শৈশব কেটেছে বিহারে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ এবং এম এ পরীক্ষাদুটিতেই ইতিহাস বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন। ১৯২৩ থেকে ২৫ পর্যন্ত ছিলেন ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে, সেখান থেকে ডিগ্রি অর্জন করে ১৯২৫-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা জীবন শুরু করেন। ১৯২৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডারের পদে যোগ দেন এবং ১৯৩৩-এ প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রফেসর পদে যোগ দেন এবং দীর্ঘ তেইশ বছর এই কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯৫৬-তে অবসর নেন। ১৯৫৬-৬১ পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ছিলেন। ১৯৬২ থেকে ৬৭ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। ১৯২৬ থেকে ৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্বভারতী এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ইতিহাসের কিম্বদন্তী অধ্যাপক সুশোভন

সরকার মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং 'পরিচয়' পত্রিকায় বিজন রায় ছদ্মনামে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে লিখেছিলেন 'রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা'। অমিত সেন ছদ্মনামেও লিখেছেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বই। তবে মার্কসবাদী হলেও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ নেননি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'পরিচয়'-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এই প্রখর চিন্তাবিদ মার্কসবাদী পর্বের 'পরিচয়'-এর ছিলেন নিয়মিত লেখক এবং পরে উপদেশক মণ্ডলীর অন্যতম ব্যক্তিত্ব। বাংলার নবজাগরণ বিষয়ে তাঁর কালজয়ী গ্রন্থের জন্য ১৯৮১-তে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন।

মৃত্যু ২৬ অগস্ট ১৯৮২ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *বাংলার ইতিহাসের ধারা, প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ, ইতিহাসের কথা* ইত্যাদি। তাছাড়া ইংরেজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহ।

সুকুমার সেন

জন্ম ১৬ জানুয়ারি ১৯০০ (মতান্তরে ১৯০১) কলকাতায়। আদি নিবাস বর্ধমানের গোতন-এ। বাবা হরেন্দ্রনাথ সেন। ১৯২৩-এ এম এ পাশ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। ১৯২৪-এ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ, ১৯৩৭-এ পি এইচ ডি। ১৯৩০-এর জানুয়ারি থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের উপাধ্যক্ষ। দীর্ঘ আঠাশ বছর কলকাতা বিশ্ববিদালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর মাস্টারমশাই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করার পর তিনি ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপকের পদে বৃত হন। ১৯৬৬-৬৭-তে তিনি পুনের ডেকান কলেজে ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। ১৯৮২-তে এক বছরের জন্য ত্রিবান্দ্রমের ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব দ্রাভিডিয়ান লিঙ্গুইস্টিক সংস্থা তাঁকে 'সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক' পদে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ভাষাবিজ্ঞান, পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ, সংস্কৃত, প্রাচীন পার্শি আবেস্তার ভাষা, দক্ষিণ ইরাণের রাজবংশের কথ্যভাষা ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর গবেষণা পণ্ডিতমহলে মান্যতা পেয়েছে। এসব গবেষণার বাইরে তাঁর সাহিত্যচর্চা, বিশেষ করে গোয়েন্দা গল্প বিষয়ে তাঁর লেখালিখি সাধারণের কাছে বিশেষ আদৃত। বিভিন্ন গবেষণা কর্মের জন্য তিনি তিনবার গ্রিফিথ মেমোরিয়াল প্রাইজ ও দুবার আশুতোষ স্বর্ণপদক পেয়েছেন। ১৯৮৪-তে লন্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির স্বর্ণপদক পেয়েছেন। বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, এশিয়াটিক সোসাইটি, বর্ধমান সাহিত্য সভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু ৩ মার্চ, ১৯৯২ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *বটতলার ছাপা ও ছবি, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, দিনের পরে দিন যে গেল, গল্পের গাঁটছড়া, যিনি সকল কাজের কাজি, সত্যমিথ্যা কে করেছে ভাগ, কালিদাস তাঁর কালে, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, বাঙ্গলা ভাষার ইতিবৃত্ত, রামকথার প্রাক ইতিহাস* ইত্যাদি। এছাড়া বেশ কয়েকটি ইংরেজি ও হিন্দি গবেষণা গ্রন্থ।

নির্মলকুমার বসু

জন্ম ২২ জানুয়ারি ১৯০১ কলকাতায়। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯২১-এ তিনি ভূতত্ত্ব বিষয়ে বি এস সি এবং ১৯২৫-এ এম এস সি পাশ করেন। ১৯৩০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব শাখায় রিসার্চ ফেলো হিসেবে যখন কাজ করছেন তখন গান্ধিজির আহ্বানে লবণ সত্যাগ্রহ

আন্দোলনে তিনি যোগ দেন। এর অনেক আগেই ছাত্রজীবনে তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪২-এ ভারত-ছাড় আন্দোলনে যুক্ত হয়ে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৪৬-৪৭-এর বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কালো দিনগুলির সময় তিনি গান্ধিজির একান্ত সচিব ছিলেন এবং তাঁর নোয়াখালি সফরের সঙ্গী ছিলেন। গান্ধিজির রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন ও তাঁর ব্যবহারিক কাজকর্ম বিষয়ে তিনি প্রভূত গবেষণা করেছেন এবং গুরুত্বময় গ্রন্থাদি লিখেছেন। ১৯৫৯-৬৪ পর্যন্ত তিনি অ্যানথ্রোপলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টার ছিলেন। এর আগে ১৯৩৮-৪২ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন তিনি। শরৎচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া' পত্রিকাটির সম্পাদনা করে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সারাজীবন নানা ধরণের গবেষণায় তিনি নিমগ্ন ছিলেন। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের ধারা, ভারতের মন্দির-স্থাপত্য, লোকসংস্কৃতি, গ্রামজীবন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গবেষণা যুগান্তকারী। মানুষের জীবনধারাকে প্রত্যক্ষভাবে বুঝবার জন্য তিনি সমগ্র ভারত পদব্রজে পরিভ্রমণ করেছেন। শুধু গবেষণাই নয় সাহিত্যকর্মে তাঁর প্রবল উৎসাহ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠাভরে এবং পরিষৎ নির্মিত 'ভারতকোষ'-এর তিনি অন্যতম স্রষ্টা। ১৯৬৬-তে তিনি 'পদ্মশ্রী' উপাধি পান।

মৃত্যু ১৫ অক্টোবর ১৯৭২ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *পরিব্রাজকের ডায়েরি, বিদেশের চিঠি, নবীন ও প্রাচীন, হিন্দু সমাজের গড়ন* ইত্যাদি। তাছাড়া ইংরেজি ভাষায় লিখিত বেশ কয়েকটি গ্রন্থ।

অমিয় চক্রবর্তী

জন্ম ১০ এপ্রিল ১৯০১ হুগলির শ্রীরামপুরে। আদি নিবাস পাবনা। বাবা গৌরীপুর এস্টেটের দেওয়ান এবং কাব্য সমালোচক দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মা চিন্তাশীল লেখিকা অনিন্দিতা দেবী। ১৯২১-এ হাজারিবাগ সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে বি এ পাশ করে বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯২৬-এ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পাশ করেন। ১৯৩৭-এ অক্সফোর্ড থেকে ডি ফিল পেয়েছেন। ১৯২৪-৩৩ পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সচিব ছিলেন। ১৯৩০-এ তিনি কবির সহযাত্রীরূপে জার্মানি, ডেনমার্ক, সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা এবং ১৯৩২-এ পারস্য ও মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছিলেন। কবির জীবনের অন্তিম পর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত সহচর ও কবির স্নেহধন্য শিষ্য। ১৯৩৭-৪০ পর্যন্ত তিনি আধুনিক ভারতের আন্দোলন বিষয়ে অক্সফোর্ডে সিনিয়র রিসার্চ ফেলো রূপে গবেষণা কাজে লিপ্ত ছিলেন। ১৯৪৬-৪৭-এ তিনি দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালি, বিহার ইত্যাদি অঞ্চল গান্ধিজির সঙ্গী। ১৯৫০-এ তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের উপদেষ্টা। ১৯৪৮ থেকে তিনি মার্কিন প্রবাসী। আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে তিনি যশস্বী কবি। কাব্যকৃতির জন্য তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, ইউনেস্কো থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম' এবং ভারত সরকারের সম্মান 'পদ্মভূষণ' উপাধি তিনি পেয়েছেন।

মৃত্যু ১২ জুন ১৯৮৬ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *সাম্প্রতিক*। তাছাড়া বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম ৩০ অক্টোবর ১৯০১ কলকাতায়। বাবা দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মা ইন্দুমতি দেবী। কাশীর থিয়সফিস্ট হাইস্কুল এবং কলকাতার স্কটিশ চার্চেস কলেজের ছাত্র ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পাশ করেছেন। এরপর বাবার কাছে অ্যাটর্নিশিপ-এ শিক্ষা নিয়েছেন। ফরাসি ও জার্মান ভাষা জানতেন। ১৯২৯-এ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেছেন। প্রায় দু-বছর বিদেশে যাপন করার পর ১৯৩১-এ বিদগ্ধ মাসিকপত্র 'পরিচয়' পত্রিকা শুরু করেন। এর আগে 'সবুজ পত্র'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, যুক্ত ছিলেন 'ফরওয়ার্ডের' সঙ্গেও পরে। বাংলা ভাষা চর্চা করেছেন একটু বেশি বয়সে, কিন্তু বিদগ্ধ কবি ও প্রাবন্ধিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন অতি দ্রুত। পেশা মূলত সাংবাদিকতা, পরে অধ্যাপনা। ১৯৪২-৪৫ এ আর পি-তে, ১৯৪৫-৪৯-এ স্টেটসম্যান পত্রিকায় কাজ করেছেন। এর আগে শরৎচন্দ্র বসুর 'লিটারারি' কাগজে এবং দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের প্রচার-বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন। অধ্যাপনা শুরু করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে ১৯৬০ পর্যন্ত। প্রখ্যাত গায়িকা রাজেশ্বরী বাসুদেব তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী।

মৃত্যু ২৫ জুন ১৯৬০ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *স্বগত, কুলায় ও কালপুরুষ*। তাছাড়া বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ।

রেজাউল করীম

জন্ম ১৯০২ সালে বীরভূমের মাড়গ্রামে। বাবা হাজি আবদুল হামিদ, মা জারিয়া খাতন। লেখাপড়া শুরু মার কাছে, ১৯২০-তে কলকাতা মাদ্রাসা থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, তিনি আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ ছেড়ে দেন। আন্দোলন স্তিমিত হলে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার সালারে জাতীয় বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। কিছুদিন পরে মাড়গ্রামে একটি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করেছেন। এরপর তিনি বহরমপুরে চলে আসেন এবং কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩০-এ ইংরেজি অনার্স সহ বি এ পাশ করেন। ১৯৩৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ এবং ১৯৩৬-এ আইন পরীক্ষায় পাশ করেন। বহরমপুরে কলেজে পড়ার সময় তিনি সাহিত্যকর্মে লিপ্ত হন এবং মুক্তচিন্তার চর্চায় ব্রতী হন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতার বিভিন্ন কোর্ট ও বহরমপুর কোর্টে ওকালতি করেছেন। ১৯৪৮ থেকে তিনি বহরমপুর গার্লস কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন, অবসর নিয়েছেন ১৯৮২-তে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সারাজীবন তিনি আপসহীন সংগ্রাম করেছেন। ১৯৪৪-এ প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা, বহরমপুর শাখার তিনিই ছিলেন সভাপতি। নবযুগ, নয়া বাংলা, মোহম্মদি, কোহিনুর, নবনূর ইত্যাদি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন তিনি। জিন্নার রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য তৈরি করেছিল। মুসলিম সমাজে জাতীয়তাবাদ সঞ্চারের জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে দূরবীন, গণরাজ, মুর্শিদাবাদ পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। ১৯৭০ পর্যন্ত তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেছেন এবং দীর্ঘকাল কংগ্রেসের টিকিটে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। সংস্কৃতি সমন্বয়ের চিন্তার জন্য তিনি ১৯৮৪-তে কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি লিট পেয়েছেন এবং ১৯৯১-তে সাহিত্যসাধনার জন্য 'বিদ্যাসাগর' পুরস্কার পেয়েছেন।

মৃত্যু ৫ নভেম্বর ১৯৯৩ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, নয়া ভারতের ভিত্তি, জাতীয়তার পথে, তুর্কীবীর কামাল পাশা, সাধক দারা শিকোহ, মনীষী মওলানা আবুল কালাম আজাদ, পাকিস্তানের বিচার, জাগৃতি, কাব্যমালঞ্চ, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও গান্ধীজি, সংস্কৃতি সমন্বয়— কিছু ভাবনা* প্রভৃতি।

গোপাল হালদার

জন্ম ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯০২ ঢাকা বিক্রমপুরের বিদ্গাঁও-এর পৈতৃক ভদ্রাসনে। বাল্যকাল কেটেছে নোয়াখালিতে, পরিণত বয়সে কলকাতায়। বাবা সীতাকান্ত হালদার, মা বিধুমুখী দেবী। নোয়াখালিতে স্কুলশিক্ষা, কলকাতা স্কটিশ চার্চেস কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স সহ বি এ এবং ১৯২৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ এবং আইন পাশ করেছেন। অল্প কিছুদিন ওকালতি, তারপর ফেনি কলেজে অধ্যাপনা এবং তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগে গবেষণা সহকারী পদে কাজ করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করেছেন। সাংবাদিকতাও করেছেন একই সঙ্গে — কখনও 'ওয়েলফেয়ার', 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে, কখনও সুভাষচন্দ্রের 'ফরোয়ার্ড'-এ, কখনও হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড কাগজে। প্রথম জীবনে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে, পরে ১৯৩৯-৪০-এ সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সহ সম্পাদকের পদে কাজ করেছেন। এরই মধ্যে ১৯৩২ থেকে ৩৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ছ-বছর কারারুদ্ধ ছিলেন। এই বন্দীজীবনেই তাঁর ভাষাতত্ত্বের গবেষণা এবং গুরুত্বময় সাহিত্যসৃষ্টি। ১৯৪১-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং কৃষক আন্দোলনে ব্যাপৃত হন। পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের তিনি অন্যতম নেতা। বিভিন্ন দফায় 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন (১৯৪৪-৪৮, ১৯৫২-৬৭), 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে, পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে তিনি দীর্ঘদিন সদস্য ছিলেন। পঞ্চাশের দশকে বিধানচন্দ্র রায়ের বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবীদেব আন্দোলন এক বিশেষ ঘটনা। চল্লিশের দশকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে এবং পরবর্তী পর্যায়ের বামপন্থী সাহিত্যান্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব অবিসংবাদিত। গল্প-উপন্যাস-রসরচনা ছাড়া সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর বিপুল গবেষণা পথিকৃতের সম্মান পেয়েছে। তাঁর গবেষণাকর্ম ও সাহিত্যকৃতির জন্য রবীন্দ্রভারতী, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি লিট উপাধি দিয়েছে এবং ১৯৮০-তে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন।

মৃত্যু ৩ অক্টোবর ১৯৯৩ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *বাজে লেখা, আড্ডা, বনচাঁড়ালের কড়চা* ইত্যাদি রসরচনা গ্রন্থ। *সংস্কৃতির রূপান্তর, বাঙালি সংস্কৃতির রূপ, বাঙ্গালি সংস্কৃতি প্রসঙ্গ, বাংলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি, ভারতের ভাষা, সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা, প্রসঙ্গ : বিদ্যাসাগর* ইত্যাদি প্রবন্ধ গ্রন্থ। তাছাড়া আছে অনেকগুলি সাহিত্যের ইতিহাস ও সম্পাদিত গ্রন্থ এবং কয়েকটি উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ।

প্রমথনাথ বিশী

জন্ম ১১ জুন ১৯০১ রাজশাহী জেলার জোয়াড়ী গ্রামে। বাবা নলিনীনাথ বিশী, মা সরোজবাসিনী দেবী। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র, রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষক রূপে পেয়েছেন। ১৯২৯-এ বি এ এবং ১৯৩২-এ বাংলা সাহিত্যে এম এ পাশ করেছেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। ১৯৩৬-এ যোগদান করে দশ বছর রিপন কলেজে, মাঝে কিছুদিন সাংবাদিকতা, পরে ১৯৫০ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। রবীন্দ্র অধ্যাপক পদেও বৃত ছিলেন কয়েকবছর। কবিতা-নাটক-উপন্যাস-প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের সমস্ত শাখায় তাঁর অনায়াস বিচরণ। রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচক হিসেবে তিনি খ্যাতিমান। বসজ্ঞ প্রমথনাথ ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনাতেও পারদর্শী ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের নানা কাজে তিনি যুক্ত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য ও ১৯৭২-এ রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৬০-এ রবীন্দ্র পুরস্কার, ১৯৭১-এ পদ্মশ্রী, ১৯৮২-তে শরৎ পুরস্কার লাভ করেছেন তিনি।

মৃত্যু ১০ মে ১৯৮৫ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ, রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, নানারকম* ইত্যাদি। এছাড়া বেশ কয়েকটি উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ ও নাটক।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

জন্ম ২৫ মে ১৯০২ জলপাইগুড়ির পাটগ্রামে। বাবা দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, মা পান্নাময়ী দেবী। বি এ পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম স্থান পাওয়ার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক দিয়েছিল। এম এ পাশ করেছেন ইংরেজি সাহিত্যে। ১৯৩০-এ তিনি পি আর এস বৃত্তি এবং মোয়াট মেডেল পেয়েছেন। তাঁর চাকরিজীবন শুরু এ জি বেঙ্গলের অডিটর হিসেবে, বছর দুয়েক পর তিনি রংপুর কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯২৭-৩৮ পর্যন্ত তিনি রংপুর কলেজে, ১৯৩৮-৬৫ তিনি কলকাতার আশুতোষ কলেজে পড়িয়েছেন। অবসর গ্রহণের পর ১৯৬৫-৭০ তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৬৮-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মান জানিয়েছে। আজীবন ছন্দশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করেছেন, বাংলা ছন্দে পূর্ব-পূর্বাহ্নবাদের আবিষ্কর্তা তিনি। 'বেতালভট্ট' ছদ্মনামে তিনি ছোটোদের জন্য মজার গল্প লিখেছেন, তাছাড়া বেশ কিছু রম্যরচনা লিখেছেন।

মৃত্যু ২০ মার্চ ১৯৮৪ খ্রি ।

রচিত গ্রন্থ : *বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা, কবিগুরু* ইত্যাদি।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ইন্দ্রজিৎ)

জন্ম ২৪ অগস্ট ১৯০৩ কুমিল্লার বাবুরহাটে। বাবা বাবুরহাট হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক সারদাচরণ। কলকাতার স্কটিশ চার্চেস কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স সহ বি এ এবং ১৯২৭-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেছেন। কর্মজীবন শুরু জামশেদপুর টাটা স্কুলে শিক্ষকতার সূত্রে, ১৯৪৩-এ তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যোগ দেন, পরে বিদ্যাভবনের অধ্যাপক। ১৯৪২-

এ ভারত ছাড় আন্দোলনে তিনি মাসকয়েকের জন্য কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। স্বভাবরসিক হীরেন্দ্রনাথ খুবই স্বাধীনচেতা ও আড্ডাপ্রিয় মানুষ ছিলেন। সাহিত্য রসসমৃদ্ধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। প্রবন্ধ ছাড়া ইন্দ্রজিৎ ছদ্মনামে তিনি রসনিবন্ধ লিখেছেন প্রচুর। অনুবাদ কর্মেও তাঁর বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া গেছে। অবসর গ্রহণের বছর তিনেক আগেই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় তিনি পদত্যাগ করেছিলেন 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি' সম্পাদনা করেছেন কয়েক বছর।

মৃত্যু ৬ নভেম্বর ১৯৯৫ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *সাহিত্যের আড্ডা, আপন মনের মাধুরী মিশায়ে, মানসসুন্দরী, রবীন্দ্রসম্ভব কাব্য, অচেনা রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনের এক যুগ, সমাজে সাহিত্য* ইত্যাদি।

আবুল ফজল

জন্ম ১ জুলাই (মতান্তরে ১৭ জুলাই) ১৯০৩ চট্টগ্রামের কেঁওচিয়া গ্রামে। বাবা মৌলভী ফজলুর রহমান, মা গুলশান আরা। গ্রামের মক্তবে বাল্যশিক্ষা শুরু। ১৯২৮-এ বি এ পাশ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং অনেক পরে ১৯৪০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম এ করেছেন। ছাত্রজীবনে সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক অন্ধত্বের বিরুদ্ধে সমাজ সংস্কারের কাজেও ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯২৬-এ বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনে ব্রতী 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' গড়ে ওঠার পর্বে তিনিও ছিলেন এর শরিক। ঢাকা বিশ্বভারতী সম্মিলনীর তিনি ছিলেন সহসম্পাদক। ১৯৩১-এ 'শিখা' পত্রিকার সম্পাদনা কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার আগে 'মাসিক সওগাত' পত্রিকাতেও তিনি কাজ করেছেন। ১৯৩২-এ চট্টগ্রামের একটি স্কুলে তিনি শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন, এম এ পাশ করার পর ১৯৪১-এ তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে চট্টগ্রাম কলেজে বদলি হয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই ১৯৫৯-এ তিনি অবসর নেন। সারাজীবন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও প্রগতিবাদের পক্ষে লড়াই করেছেন। ১৯৬৮-তে পাক-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়, ১৯৭১-এ, তিনি শিল্পী-সাহিত্যিক-সমাজসেবীদের নিয়ে প্রতিরোধ সংঘ গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৭৩-এ শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, ১৯৭৫-এ রাষ্ট্রপতির শিক্ষা উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৬২-তে বাংলা একাডেমির সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৬৩-তে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার, ১৯৭৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি লিট, ১৯৮০-তে নাসিররুদ্দীন স্বর্ণপদক, ১৯৮১-তে মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮২-তে আবদুল হাই সাহিত্যপদক পেয়েছেন।

মৃত্যু ৪ মে ১৯৮৩ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *বিচিত্র কথা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা, সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন, সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র, সমকালীন চিন্তা, মানবতন্ত্র, শুভবুদ্ধি, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ* ইত্যাদি। এছাড়া গল্প-উপন্যাস-নাটক-ভ্রমণকাহিনী-জীবনী গ্রন্থ অজস্র।

নীহাররঞ্জন রায়

জন্ম ১৪ জানুয়ারি ১৯০৩ ময়মনসিংহের কাহেত গ্রামে। বাবা মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, মা জ্ঞানদা দেবী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৬-এ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম এ। এরপর বিভিন্ন গবেষণার জন্য পি আর এস বৃত্তি, মৌয়ট স্বর্ণপদক, গ্রিফিত পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৩৬-এ লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট, লন্ডন থেকে লাইব্রেরিয়ানশিপের জন্য ডিপ্লোমা অর্জন করেন। ১৯৩১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, ১৯৩৭-৪৬-এ প্রধান গ্রন্থাগারিক, ১৯৪৮-৬৫-তে বাগেশ্বরী প্রফেসর অব ইন্ডিয়ান আর্ট। ১৯৬৫-৭১-এ ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত সিমলার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভানসড স্টাডিজ-এর ডিরেক্টার, ১৯৮০-৮১-তে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ-এর চেয়ারম্যান। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে দেশে-বিদেশে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গবেষণা সংস্থায় অতিথি অধ্যাপক ছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগ দিয়ে দেড় বছরের জন্য কারারুদ্ধ ছিলেন। আর এস পি দলের সদস্য ছিলেন, 'ক্রান্তি' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৬৭-তে ইতিহাস কংগ্রেসের সভাপতি এবং ১৯৮০-তে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রাচীন ভারত বিষয়ে গবেষণা ছাড়াও তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্য বিশেষজ্ঞ এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক। বিভিন্ন কর্মকুশলতার জন্য তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধি পেয়েছেন, পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার সহ আরও বহুবিধ সম্মান।

মৃত্যু ৩০ অগস্ট ১৯৮১ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ . *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা* ইত্যাদি। ইংরেজি ভাষায় লিখিত বেশ কয়েকটি গবেষণা গ্রন্থ।

সৈয়দ মুজতবা আলি

জন্ম ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ শ্রীহট্টের করিমগঞ্জে। বাবা সৈয়দ সিকান্দর আলি। সতেরো বছর বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি মহাত্মা গান্ধির আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার আগেই অবশ্য তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯২৬ পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর তিনি কাবুলের শিক্ষাবিভাগে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৮-৩০ পর্যন্ত তিনি বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেন এবং পি এইচ ডি উপাধি অর্জন করেন। তারপর শুরু হয় তাঁর দেশভ্রমণ, ইউরোপের নানা স্থান, জেরুসালেম, দামাস্কাস ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। এরই মধ্যে কায়রোতে এক বছর তিনি গবেষণাও করেছেন। বিশ্বের পনেরোটি ভাষা তিনি রপ্ত করেছিলেন। ১৯৩৬-এ তিনি বরোদা রাজ্যে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক পদে বৃত হন এবং দেশভাগের পর তিনি বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষতা করেন। ১৯৫০-এ আকাশবাণীর কেন্দ্র পরিচালক পদে কাজ করেছেন, বিশ্বভারতীর ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান অধ্যাপক হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, রসনিবন্ধ রচনা করেছেন নিরন্তর। ১৯৪৯-এ তিনি নরসিংহদাস পুরস্কার পেয়েছেন।

মৃত্যু ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *দেশে বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, চাচাকাহিনী, ময়ূরকণ্ঠী, শবনম, ধূপছায়া, অবিশ্বাস্য* ইত্যাদি।

অতুল সুর

জন্ম ৫ অগস্ট ১৯০৪ কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে। ১৯২১-এ ম্যাট্রিক পাশ করেছেন, ইতিহাসে ১০০-র মধ্যে ৯৯ পেযেছিলেন। ১৯২৮-এ নৃতত্ত্ব বিষযে এম এ কবেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে, স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। জুরিখ থেকে ডক্টবেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, সংখ্যাতত্ত্ব — এইসব বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং ১৫০টি বই লিখেছেন এবং রচিত প্রবন্ধের সংখ্যা দশ হাজারের বেশি। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষার অধিকর্তা স্যার মার্শালের আমন্ত্রণে তিনি মহেঞ্জোদারো গিয়েছিলেন এবং নানান তথ্য সংগ্রহ কবেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয ও ইন্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট-এ তিনি ফলিত অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন, ইনস্টিট্যুট অব ম্যানেজমেন্ট-এও তিনি অতিথি অধ্যাপক ছিলেন। কমার্শিয়াল গেজেট পত্রিকার সহযোগী সম্পাদকের দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন অনেক বছর। আর প্রায় ৩৪ বছর তিনি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশনেব অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। কিছুদিন তিনি হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার বিজনেস এডিটারের দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। রয়াল ইকনমিক সোসাইটি ও রয়াল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটির তিনি নির্বাচিত ফেলো ছিলেন। 'যম' এবং 'চন্দ্রাবতী' ছদ্মনামে তিনি কখনও কখনও নিবন্ধ রচনা করেছেন।

মৃত্যু ২ জানুয়ারি ১৯৯৯ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *ভারতের মূলধনের বাজার, বাংলা মুদ্রণের দু'শ বছর, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, বাঙলা ও বাঙালি, হিন্দু সভ্যতার স্বরূপ ও অবদান, মহানগরীর মহাভাবত, বাঙলার সামাজিক ইতিহাস* ইত্যাদি। ইংরেজি ভাষায় লেখা অনেকগুলি বইও আছে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

জন্ম ১৫ মার্চ ১৯০৪ ওড়িষার ঢেঙ্কানলে। বাবা নিমাইচরণ রায়, মা হেমনলিনী দেবী। ১৯২১-এ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, ১৯২৫-এ এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ইংরেজি সাহিত্যে বি এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। এম এ পড়তে পড়তে আই সি এস পরীক্ষা দেন এবং কৃতকার্য হয়ে বিলেতে যান ১৯২৭-এ। ১৯৩৬-এ তিনি নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট পদে কাজে যোগ দেন, তিন বছর বিভিন্ন জেলায় একই পদে কাজ কবার পর কুমিল্লার জেলা-জজ হন। ১৯৫০-এ তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগের সেক্রেটারি হন। ১৯৫১-তে তিনি স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করেন। সাহিত্যসাধনা ছাত্রজীবন থেকেই, ছড়া-কবিতা-গল্প-উপন্যাস-ভ্রমণকথা-প্রবন্ধ লিখেছেন সারাজীবন। ১৯৪১-এ প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি, ১৯৫৪-৫৭ সাহিত্য অকাদেমির কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য, ১৯৫৭-তে তিনি আন্তর্জাতিক পি ই এন অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধি রূপে জাপানে যান। ১৯৮৬ থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত তিনি বাংলা আকাদেমির সভাপতি। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর বরাবর যোগ ছিল, গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পেয়েছেন। দেশভাগ তিনি আদপেই মেনে নিতে পারেন নি। বিয়ে করেছিলেন মার্কিন মহিলা অ্যালিস ভার্জিনিয়া অলফোর্ডকে, তাঁকে তিনি লীলা নামে সম্বোধন করতেন। আর লীলাময় রায় ছদ্মনামে তিনি বহু লেখা লিখেছেন। তিনি সাহিত্য অকাদেমি ও রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। পেয়েছেন 'পদ্মভূষণ' উপাধি এবং বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম' উপাধি সহ আরও অজস্র পুরস্কার।

মৃত্যু ২৮ অক্টোবর ২০০২ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *সাহিত্যে সংকট, আমরা, দেশ কাল পাত্র, রবীন্দ্রনাথ, জীবনশিল্পী* ইত্যাদি। তাছাড়া অজস্র উপন্যাস, ছড়া, কবিতা ও ভ্রমণকাহিনি।

সরোজ আচার্য

জন্ম ১১ মে ১৯০৬ কুষ্টিয়াতে। বাবা দক্ষিণারঞ্জন আচার্য, মা হেমাঙ্গিনী দেবী। ইংরেজি অনার্স সহ বি এ পাশ করেছেন এবং লিভিংস্টোন মেমোরিয়াল ও মোহিনীমোহন পুরস্কার পেয়েছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতিতে আকৃষ্ট এবং ১৯৩০-এর চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর তিনি জেলবন্দী হন — প্রথমে বক্সা, পরে দেউলিতে। এই কারাবাসের সময়েই তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। জেল থেকে বেরোবার পরে তিনি কিছুদিন অধ্যাপনা করেছেন, তারপর ১৯৪৩-এ *হিন্দুস্থান* স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সহ-সম্পাদক রূপে সাংবাদিকতার জীবন শুরু করেন। পরে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন। 'দেশ' পত্রিকার 'বৈদেশিকী' বিভাগের লেখাগুলি তিনি লিখতেন। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি অজস্র, বাংলা ও ইংরেজিতে। মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর যখন কুড়ি বছর বয়স তখনই তিনি লিখেছেন এক পুস্তিকা 'নব্য রুশিয়া'। ১৯৩০-৪০-এর যুগে তাঁর মার্কসবাদ বিষয়ে লেখালিখি এখন এক বিশেষ ইতিহাস। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতাদের মধ্যে অন্যতম এক ব্যক্তিত্ব তিনি।

মৃত্যু ১৯ অক্টোবর ১৯৬৯ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *মার্ক্সীয় দর্শন, মার্ক্সীয় যুক্তিবিজ্ঞান, বইপড়া* ইত্যাদি।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

জন্ম ১৯০৬ দ্বারভাঙ্গাতে। তবে তিন পুরুষ ধরে তাঁদের কলকাতায় বাস। বাবা আবুল মকারেদ আব্বাস। ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত আইয়ুব বাংলা জানতেন না, একটি উর্দু পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির গদ্যানুবাদ পড়ে তিনি এত অভিভূত হলেন যে বাংলা চর্চায় মনোনিবেশ করলেন। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে এম এস সি পড়েছেন কিন্তু অসুস্থতাবশত পরীক্ষা দিতে পারেননি। তবে এম এস সি পড়বার সময়েই সি ভি রমনের সঙ্গে গবেষণা করেছেন। ১৯৩৩-এ তিনি দর্শনশাস্ত্রে এম এ করেন এবং হোয়াইট হেড বিষয়ে গবেষণা করেন। তিনি দুবার অস্থায়ীভাবে কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৫০-এ অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন, কিন্তু অসুস্থতার জন্য একবছর পরেই সে কাজ ছাড়তে বাধ্য হন। ১৯৫৪-৫৬ রকফেলার ফাউণ্ডেশন ফেলো হিসেবে 'মার্কসিস্ট থিয়োরি অব ভ্যালু' নিয়ে গবেষণা করেছেন। ১৯৫৭-৬৭-এর পর্বে 'কোয়েস্ট' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৬১-তে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতচর্চা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টার তিনি, ১৯৬৯-৭১-এ সিমলার ইনস্টিট্যুট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ-এর ফেলো নির্বাচিত হন। অন্যান্য গবেষণার পাশাপাশি তন্নিষ্ঠ রবীন্দ্র-গবেষক তিনি। সাহিত্যকর্মে স্ত্রী গৌরী আইয়ুব রুগ্ন স্বামীকে বরাবর সহায়তা করেছেন। রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দিয়েছে।

মৃত্যু ২১ ডিসেম্বর ১৯৮২ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, পান্থজনের সখা, পথের শেষ কোথায়, গালিবের গজল* ইত্যাদি।

হুমায়ুন কবির

জন্ম ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ ফরিদপুর জেলার কোমারপুর গ্রামে। বাবা কবিরুদ্দিন আহ্‌মদ। বরাবর অত্যন্ত কৃতী ছাত্র হুমায়ুন কবির ১৯২৮-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম এ পাশ করেন। ১৯৩১-এ এশিয়াবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ছাত্র যিনি অক্সফোর্ডের মডার্ন গ্রেট্‌স্ (দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতি) পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন। দেশে ফিরে তিনি ১৯৩২-এ অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক হয়ে আসেন কিছু পরে। ১৯৪০ পর্যন্ত ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৩৭-এ কৃষক প্রজা পার্টির টিকিটে তিনি বাংলার প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য হন। পরে তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন এবং স্বাধীনতার পর তিনি শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের প্রধান সহকারী হিসেবে কাজ করতে থাকেন। ১৯৫২-৫৬ সালে তিনি ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এরপর তিনি ভারত সরকারের শিক্ষা, অসামরিক বিমান চলাচল, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি এবং পেট্রোলিয়ম ও রসায়ন দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৬৭-তে তিনি জাতীয় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন এবং কিছু পরে লোকদল গঠন করেন। রাজনৈতিক জীবনের বাইরে তাঁর পরিচিতি ছিল খ্যাতনামা অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, কবি-সাহিত্যিক-সমালোচক হিসেবে। তিনি ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেছেন। জীবনের শেষ পর্বে তিনি NOW নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেছিলেন, আর ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'চতুরঙ্গ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তিনিই।

মৃত্যু ১১ অগস্ট ১৯৬৯ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *বাঙলার কাব্য, ধারাবাহিক, মোসলেম রাজনীতি, মার্কসবাদ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, শরৎ-সাহিত্যের মূলতত্ত্ব, নয়া ভারতের শিক্ষা, কংগ্রেস মতবাদ, দিল্লী ওয়াশিংটন মস্কো*। এছাড়া কবিতা, উপন্যাস ও বেশ কিছু ইংরেজি গ্রন্থের লেখক তিনি।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জন্ম ২৩ নভেম্বর ১৯০৭ কলকাতায়। আদি নিবাস উত্তর চব্বিশ পরগণার হালিশহরে। বাবা শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মা প্রফুল্লনলিনী দেবী। মেধাবী ছাত্র হীরেন্দ্রনাথ ১৯২৬-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে ঈশান বৃত্তি নিয়ে বি এ পাশ করেন এবং ১৯২৮-এ এম এম এ পাশ করেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। এরপর বাংলা সরকারের স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে তিনি বিলেত যান এবং গবেষণা শেষে বিলিট ডিগ্রি অর্জন করেন। পাশাপাশি ব্যারিস্টারি পাশও করেছেন। দেশে ফিরে আসার পর রাধাকৃষ্ণান প্রতিষ্ঠিত অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন, ১৯৩৫-এর শেষের দিকে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং রিপন কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ১৯৫২ পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। অধ্যাপনা জীবনে তিনি দেশে ও বিদেশে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি বক্তার সম্মান পেয়েছেন। বিলেতে থাকার সময়েই তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন, ১৯৩৬-এ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যখন বে-আইনি তখন তিনি পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪৭-৫১ অবিভক্ত পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির সদস্য, ১৯৪১-এ ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রতিষ্ঠা পর্ব থেকে তিনি এর সঙ্গে যুক্ত, ১৯৪৩-এ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সভাপতি, সর্বভারতীয় সোভিয়েট সুহৎ সংঘের যুগ্ম সম্পাদক। শান্তি আন্দোলনের নিয়ত সহযোগী। ১৯৫২ থেকে ১৯৭৭ তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার বিশিষ্ট সদস্য, সংসদে বাগ্মী হিসেবে তিনি কিংবদন্তী। পার্টিভাগের পর তিনি সি পি আই-এর সদস্য এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা। তিরিশের দশক থেকে তিনি 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত, প্রগতিবাদী সাহিত্য মহলে তিনি একজন যশস্বী স্রষ্টা। ইংরেজি ও বাংলায় তাঁর লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধের পরিমাণ অপরিমেয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সাম্মানিক ডি লিট পেয়েছেন, পেয়েছেন 'পদ্মভূষণ' ও 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি এবং অন্য আরও বহু পুরস্কার।

মৃত্যু ৩০ জুলাই ২০০৪ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ, ভারতের জাতীয় আন্দোলন, হিন্দু ও মুসলিম, গ্রীসের পুরাকাহিনী, চক্ষুষা কাণঃ, অন্নে সুখ নেই, মার্কসবাদ ও মুক্তমতি, কালোত্তীর্ণ সম্পদ, বিপ্লবের পরাজয় নেই, চরৈবেতি চরৈবেতি, সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ, পরিবেশ প্রত্যক্ষ প্রত্যয়, তরী হতে তীর* ইত্যাদি। তাছাড়া বেশ কয়েকটি ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থ।

বুদ্ধদেব বসু

জন্ম ৩০ নভেম্বর ১৯০৮ কুমিল্লায়, আদি নিবাস ঢাকার মালখাঁনগর। বাবা ভূদেবচন্দ্র বসু, মা বিনয়কুমারী দেবী। শৈশবে মাতৃহীন হয়ে তিনি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হয়েছেন, বিশেষত দাদামশাই চিন্তাহরণ সিংহের সান্নিধ্যে। ১৯৩১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পাশ করেন। এরপর কলকাতায় চলে আসেন এবং রিপন কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। কয়েক বছর পর অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে তিনি সর্বক্ষণের জন্য সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। মাঝে অল্প কিছুদিন অবশ্য তিনি 'স্টেটসম্যান' কাগজে সাংবাদিকতা করেছেন। ১৯৫৬-তে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে আবার অধ্যাপনা শুরু করেন এবং সেখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আমন্ত্রিত অধ্যাপক হয়ে গেছেন। সাহিত্যচর্চা শুরু ঢাকায় ছাত্রজীবন থেকে— কবিতা-নাটক-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-ভ্রমণকাহিনি ইত্যাদি সাহিত্যের সমস্ত শাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার। শিশুসাহিত্যেও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতে রবীন্দ্রপ্রভাবকে অস্বীকার করার যে দুঃসাধ্য প্রয়াস তরুণ লেখকদের আন্দোলন হয়ে উঠেছিল, বুদ্ধদেব তাঁদের অন্যতম একজন। 'কল্লোল' পত্রিকাকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল সে আন্দোলন। তাঁকে বলা হয় তিরিশের দশকের বাংলা কবিতা আন্দোলনের অগ্রগণ্য কবি। তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকাটিও বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ ইতিহাস। সাহিত্য-সমালোচক হিসেবেও বুদ্ধদেব বসু এক বিরল ব্যক্তিত্ব। ১৯৬৭-তে তিনি অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন, ১৯৭০-এ তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দেওয়া হয়। মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কারও তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

মৃত্যু ১৮ মার্চ ১৯৭৪ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : অগণিত কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, নাটক ছাড়া কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থ হল *সাহিত্যচর্চা, স্বদেশ ও সংস্কৃতি, কালের পুতুল, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ* ইত্যাদি। ইংরেজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থও আছে।

বিষ্ণু দে

জন্ম ১৮ জুলাই ১৯০৯ উত্তর কলকাতায়। বাবা অবিনাশচন্দ্র দে, মা মনোহারিণী দেবী। ১৯৩২-এ সেন্ট পল্‌স কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি এ পাশ কবেন। ১৯৩৪-এ এম এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। স্কুলের গণ্ডি পেরোবার আগে থেকেই কবিতা লেখা শুরু। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর ১৯২৮ থেকে 'বিচিত্রা', 'প্রগতি', 'ধূপছায়া', 'কল্লোল' পত্রিকাগুলিতে তাঁর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ বেরোতে থাকে। ১৯৩১-এ 'পরিচয়' পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকেই এই পত্রিকার অন্যতম লেখক তিনি। কবি-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। ১৯৩৫-এ রিপন কলেজে তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন, ১৯৪৩-এ অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছেন। এর পরেই তিনি কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজ ও পরে ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমান মৌলানা আজাদ কলেজ) যোগ দেন এবং মৌলানা আজাদ কলেজ থেকে ১৯৬৯-এ অবসর নেন। সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের পর্বে বিষ্ণু দে প্রবলভাবে টি এস এলিয়টের অনুগামী, তিরিশের যুগের শেষ লগ্ন থেকে তিনি মার্কসবাদী হয়ে উঠতে থাকেন। ১৯৪২-এ ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সম্পাদক হন। ১৯৪৮-এ কমিউনিস্ট পার্টির 'অতিবাম মতান্ধতার' যুগে বিষ্ণু দের সঙ্গে প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদের অনেকের মতবিরোধ ঘটতে থাকে। ফরাসি লেখক রজার গারোদিকে অনুসরণ করে তিনি লড়াই করতে থাকেন এবং এই পর্বেই তাঁর অনুপ্রেরণায় প্রকাশিত হতে থাকে 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকা। মূলত কবি বিষ্ণু দে ছবি-ভাস্কর্য-সঙ্গীতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং সারাজীবন শিল্প-সাহিত্যের নানা বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। শিল্পী যামিনী রায় ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সাহিত্য অকাদেমি, জ্ঞানপীঠ এবং সোভিয়েত ল্যান্ড পুরস্কার পেয়েছেন।

মৃত্যু ৩ ডিসেম্বর ১৯৮২ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *রুচি ও প্রগতি, সাহিত্যের ভাবিষ্যৎ, এলেমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য, সাহিত্যের দেশবিদেশ, রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা, মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা, জনসাধারণের রুচি, যামিনী রায়* ইত্যাদি। তাছাড়া অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ।

সম্পাদিত গ্রন্থ : *একালের কবিতা*

পরিমল রায়

জন্ম ২ অক্টোবর ১৯০৯ ঢাকার সুয়াপুরে। বাবা পরমেশপ্রসন্ন রায়। স্কুলজীবন কেটেছে ময়মনসিংহ ও খুলনায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে এম এ পাশ করেন প্রথম স্থান অধিকার করে। ঢাকার ছাত্রজীবন থেকে কবি অজিত দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব এবং সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। অসাধারণ শিল্প ও সাহিত্যবোধের অধিকারী হলেও লিখেছেন যৎসামান্য। ১৯৩৩-৪৫ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্রে অধ্যাপনা করেছেন, ১৯৪৬-৪৮ দিল্লির রামজস কলেজে অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপক, দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্স-এ অ্যাসোসিয়েটেড স্টাফ, ১৯৪৮-৫১ আই এ এস ট্রেনিং স্কুলে রীডার, সবশেষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনীতি বিভাগে ফার্স্ট অফিসার পদে কর্মরত ছিলেন। এখানে কাজ করার পর্বেই তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে।

মৃত্যু ১৪ অক্টোবর ১৯৫১ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *ইদানীং*।

অরুণ মিত্র

জন্ম ২ নভেম্বর ১৯০৯ যশোর শহরে। বাবা হীরালাল মিত্র, মা যামিনীবালা। শিশুকাল কেটেছে যশোরে, পাঁচ বছর বয়সে কলকাতায় এসেছিলেন। ১৯২৬-এ ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯২৮-এ আই এস সি এবং ১৯৩০-এ ডিস্টিংশন সহ বি এ পাশ করেছেন রিপন কলেজ থেকে। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে এম এ-তে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু পারিবারিক অবস্থার চাপে পড়া শেষ করতে পারেননি। পনেরো-ষোলো বছর বয়স থেকে লেখা ও বন্ধুবান্ধব মিলে পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদিতে ঝোঁক তৈরি হয়েছিল। সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা মূলত মামাবাড়ির পরিবেশ থেকে তৈরি হয়েছিল। কর্মজীবন শুরু আনন্দবাজার পত্রিকায় — ১৯৩১ থেকে ১৯৪২, সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের স্নেহ-সাহচর্য পেয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ 'অরণি' পত্রিকা শুরু করলে তিনিও 'অরণি'-তে যোগ দেন এবং প্রায় সাত বছর সেখানে কাজ করেন। ১৯৪৮-এ ফরাসি সরকারের বৃত্তি নিয়ে তিনি সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য যান এবং ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি ১৯৫২ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হন এবং দীর্ঘ কুড়ি বছর অধ্যাপনার পর ১৯৭২-এ অবসর নেন। তরুণ বয়স থেকে মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয়, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ১৯৩৫-৩৮-এর বেআইনি পার্টির যুগে। প্রগতি লেখক আন্দোলন, ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন, গণনাট্য আন্দোলন, ভারত সোভিয়েত মৈত্রী আন্দোলন ইত্যাদিতে তিনি যুক্ত থেকেছেন। তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধে সাম্যবাদী চিন্তার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে, যদিও তিনি লিখেছেন, 'সম্মিলিতভাবে শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির অভিপ্রায় তাতে ছিল না। শিল্পসাহিত্য সৃজন যে যৌথ উদ্যমের বিষয় নয়, একক সাধনার বস্তু, সে ধারণা অধিকাংশের মতো আমারও ছিল। এ উদ্যম ছিল শিল্পী ও সাহিত্যিকের বিবেকের দায়, মানবমূল্যকে রক্ষা করার প্রয়াস।' রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি লিট দিয়েছে, ফরাসি সরকার থেকে লিজিয়ন অব অনার পেয়েছেন। পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার ও সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।

মৃত্যু ২২ অগস্ট ২০০০ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *ফরাসি সাহিত্য প্রসঙ্গে, সৃজন সাহিত্য ও অন্যান্য ভাবনা* ইত্যাদি। তাছাড়া অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ।

সুবোধ ঘোষ

জন্ম ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৯ হাজারিবাগে। আদি নিবাস বিক্রমপুরের বহরে। বাবা সতীশচন্দ্র ঘোষ, মা কনকলতা দেবী। পড়াশোনায় রীতিমত ভালো ছিলেন, ম্যাট্রিক পাশ করে হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু সাংসারিক অনটনের কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়েছিল। পনেরো বছর বয়সে জীবিকার সন্ধানে নেমে বিচিত্র রকমের কাজ করেছেন। কখনও বাসের কন্ডাক্টর, সার্কাস পার্টিতে লটবহর বহন করার কাজ, মুম্বই মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদারের চাকরি কিংবা পূর্ব আফ্রিকায় টিকাদারের কাজ। ১৯৩৯-এ তিনি গৌরাঙ্গ প্রেসে প্রুফ রিডারের চাকরি পান আর তার মাস ছয়েক পরে ১৯৪০-এর ১ জানুয়ারিতে যোগ দিলেন আনন্দবাজার পত্রিকায়। এই পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে সহকারী হিসেবে যোগ দিয়ে ক্রমে তিনি সিনিয়র এডিটর ও অন্যতম সম্পাদকীয় লেখক হয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে

যোগ দিয়ে তিনি কারাবরণ করেছেন, দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালি সফরে তিনি গান্ধিজির সঙ্গী ছিলেন। বামপন্থী প্রগতিবাদী লেখকদের সংস্পর্শেই তাঁর লেখকজীবন শুরু হয়েছিল, কিন্তু অচিরেই তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটে এবং চল্লিশের যুগে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের সদস্য হয়েছিলেন। গল্প-উপন্যাস লিখেছেন অজস্র ধারায়, পাশাপাশি প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন। আদিবাসী জীবনযাত্রা এবং ভারতীয় সামরিক ইতিহাস বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দিয়ে সম্মান জানিয়েছে, পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার।

মৃত্যু ১০ মার্চ ১৯৮০ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *রঙ্গবল্লী, কাগজের নৌকা, ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস, ভারতীয় আদিবাসী, কালপুরুষের কথা, বিচিন্তা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্পভাবনা* ইত্যাদি। অসংখ্য গল্প ও উপন্যাস গ্রন্থ।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

জন্ম ১০ সেপ্টেম্বর ১৯১০ নদীয়ার ভজনঘাটে। বাবা বসন্তকুমার সেনগুপ্ত, মা লাবণ্যপ্রভা দেবী। ছাত্রজীবন কেটেছে মেদিনীপুর ও বহরমপুরে। ১৯২৬-এ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর ৯৭ পেয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স পাশ করে এম এ পড়েছিলেন, কিন্তু পরীক্ষায় বসেননি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ার কারণে। ১৯৩৩-এ কলকাতার কালীঘাট হাইস্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। ১৯৩৬-৩৮ তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সচিব ছিলেন। যুগান্তর পত্রিকা বেরোতে শুরু করে ১৯৩৮-এ, তখন থেকেই তিনি এই পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক। অবসর নিয়েছেন ১৯৭৫-এ। এই পত্রিকার 'ছোটদের পাততাড়ি' তাঁর সম্পাদনাতে বেরোত। সমাজবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বচর্চাতে তিনি প্রবল আগ্রহী ছিলেন, যুক্ত ছিলেন দেশের প্রগতিবাদী সাহিত্যান্দোলনে। গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘের রাজ্য কমিটির প্রথম সভাপতি তিনি। কলকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্মারক-বক্তৃতা দিয়েছেন, ১৯৭০-এ ব্যাংককে থাম্মাসৎ ও মহীদল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভারততত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন। প্রাবন্ধিক হিসেবেই তাঁর মূল পরিচিতি। তবে পাশাপাশি গল্প-উপন্যাস-কবিতা লিখেছেন প্রচুর। শিশু সাহিত্যে তাঁর দান স্বীকৃত। রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৮৪-তে।

মৃত্যু ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, শতাব্দী ও সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্যের ভূমিকা, সমাজ সমীক্ষা : অপরাধ ও অনাচার, এ যুগের মন ও মনীষা, রবীন্দ্র-সংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথ ও সাম্যচিন্তা, বস্তুবাদীর ভারতজিজ্ঞাসা* ইত্যাদি। তাছাড়া আছে বেশকিছু গল্প-উপন্যাস গ্রন্থ।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

জন্ম ২৫ ডিসেম্বর ১৯১১ খুলনার মূলঘড়ে। বাবা শৈলেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, মা তরুবালা। ১৯৩৩-এ কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। কিন্তু কর্মজীবন শুরু করেন ব্যবসা দিয়ে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় তিনি গুঁড়ো দুধের কারখানা তৈরি করেছিলেন — ন্যাশনাল নিউট্রিমেন্টস লিমিটেড। গুঁড়ো দুধ তৈরির প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য তিনি অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন এবং নেসলস্ কোম্পানির কারখানায় শিক্ষানবিশী করেছেন। তবে বিদেশি কোম্পানিগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে তাঁর ব্যবসা বেশিদিন

টেকেনি। ১৯৫১-তে ধীরেন্দ্রনাথ তৈরি করেন পাভলভ ইনস্টিটিউট — পাভলভীয় পদ্ধতিতে মনোরোগের চিকিৎসা কেন্দ্র। সাইকিয়াট্রি এবং সাইকোথেরাপি দুই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি তিনি এখানে চালু করেন। ১৯৬১-তে এই কেন্দ্র থেকেই তিনি প্রকাশ করতে শুরু করেন 'মানবমন' পত্রিকা। কেবল মনস্তত্ত্ব নয়, সমাজতত্ত্ব ও সাহিত্যচর্চাও এই পত্রিকার উপজীব্য বিষয় হয়ে ওঠে। পাভলভীয় পদ্ধতিতে মনোরোগের চিকিৎসা ছাড়াও ড. গাঙ্গুলি অবিরাম প্রবন্ধ, নাটক ও বিজ্ঞান চর্চা করেছেন। কেবল নাটক লেখেননি, নাটকগুলি তিনি প্রযোজনাও করেছেন। ওয়ার্লড পিস কাউন্সিল, এশিয়াটিক সোসাইটি, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ও ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন তিনি। ইন্দো-সোভিয়েট কালচারাল সোসাইটির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক। মনস্তত্ত্বচর্চার জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার, নাট্যকার হিসেবে গিরিশ পুরস্কার এবং চিকিৎসক হিসেবে সোভিয়েট ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার পেয়েছেন।

মৃত্যু ২১ অক্টোবর ১৯৯৮ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ* (দুই খণ্ড), *পাভলভ পরিচিতি, শৈশব ও তার সমস্যা, কৈশোর ও তার সমস্যা, বিশ শতকের শেষ দশকের চিন্তাভাবনা* ইত্যাদি।

ভবতোষ দত্ত

জন্ম ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯১১ বিহারের বাঁকিপুরে, আদি নিবাস শ্রীহট্টের লখাই। বাবা দত্ত। মেধাবী ছাত্র ভবতোষ দত্ত ঢাকা থেকে ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছেন, অর্থনীতি অনার্স সহ বি এ পাশ করেছেন প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩২-এ তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম এ পাশ করেন। এরপর লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। অধ্যাপনা শুরু করেছেন ১৯৩২-এ চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে, পরে বর্ধমান রাজ কলেজ, রিপন কলেজ ও ইসলামিয়া কলেজে পড়াবার পর তিনি ১৯৫০-এ প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন। ১৯৫৩-৫৬ তিনি আই এম এফ-এর দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগের অধিকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৬২-তে অধ্যাপক জীবন শেষ করে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা অধিকর্তার পদে যোগ দেন এবং ১৯৬৯-এ অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি বিভিন্ন সরকারি কমিশনের সদস্য বা চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছেন — পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত কমিশন, অর্থ কমিশন, ব্যাঙ্কিং কমিশন, সংবাদপত্রের আর্থিক অবস্থা সমীক্ষা কমিশন ইত্যাদি। এ সবের পাশাপাশি তিনি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য, শিল্প পুনর্গঠন কর্পোরেশনের অধিকর্তা, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ-এর কর্মকর্তা ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর ১৯৬৯-এ তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি বিভাগে এমেরিটাস প্রফেসার-এর মর্যাদা পেয়েছেন। তাঁর রচিত বেশিরভাগ গবেষণা গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায়, স্বাদু বাংলায় তাঁর লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধের পরিমাণও কম নয়। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দিয়েছেন এবং তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থটি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে।

মৃত্যু ১১ জানুয়ারি ১৯৯৭ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *অর্থবিজ্ঞান, আর্থিক উন্নয়ন, অর্থনীতির পথে, দৃষ্টিকোণ, তামসী, আটদশক* ইত্যাদি।

নারায়ণ চৌধুরী

জন্ম ১৫ অক্টোবর ১৯১২ কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে। বাবা মুরারীমোহন চৌধুরী, মা সরোজিনী দেবী। মেধাবী ছাত্র নারায়ণ চৌধুরী ১৯৩৪-এ কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন, আর্থিক অসঙ্গতির কারণে এম এ পড়া হয়নি। সঙ্গীতে বিশেষ আগ্রহ ছিল বরাবর, কুমিল্লায় সঙ্গীতশিক্ষা শুরু, কলকাতায় এসে উচ্চতর শিক্ষা নিয়েছেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। নিজেও সঙ্গীত শিক্ষকতায় নিযুক্ত থেকেছেন। কর্মজীবন শুরু করেছেন স্কুল-শিক্ষক হিসেবে, এরপর ঢাকা অল ইন্ডিয়া রেডিওতে সঙ্গীত-শিল্পী, তারপর রেডিওতে প্রচার সহায়ক, ১৯৪২-এ দিল্লিতে ছাপাখানায় কাজ, কলকাতায় ফিরে এসে সিনেমা সাংবাদিকতা, তাবপর 'স্বরাজ' পত্রিকায় সহযোগী সম্পাদক, ১৯৫০-এ বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে প্রচাব সচিব, কিছু পরে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগে কলকাতায় বদলি। গ্রন্থন বিভাগের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর ঘটায় চাকরিতে ইস্তফা এবং 'শনিবারের চিঠি'-তে কার্যকরী সম্পাদকেব দায়িত্ব নেন। ১৯৬০-এ গান্ধি স্মারকনিধির প্রকাশন বিভাগে সম্পাদকের পদে যোগ দিয়ে ১৯৭০-এ অবসর গ্রহণ করেন। নিরন্তর প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন, শুধু সঙ্গীত বিষয়ে নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা শাখায়। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশটি। প্রগতিবাদী সাহিত্যান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৫-এ পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সভাপতি ছিলেন। ভারত-চীন মৈত্রী সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের উপদেশক ছিলেন। সাহিত্যকৃতির জন্য শিশিব পুরস্কার, নজরুল পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছেন।

মৃত্যু ১৩ নভেম্বর, ১৯৯১ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *সঙ্গীত ও সমাজ, সঙ্গীত পরিক্রমা, রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত, বাঙ্গালীর গীতচর্চা, সঙ্গীত বিচিত্রা, বাংলা গানের জগৎ, বাংলার সাহিত্য, বাংলার সংস্কৃতি, সাহিত্য ভাবনা, সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে* ইত্যাদি।

চিন্মোহন সেহানবিশ

জন্ম ৮ ডিসেম্বর ১৯১৩ লাহোরে। আদি নিবাস রংপুর। বাবা বিজয়মোহন সেহানবিশ। অধ্যাপনা করতেন লাহোরে। ছোটোবেলাতেই বাবার মৃত্যুর পর তিনি কাকার কাছে চলে আসেন রানিগঞ্জে। রানিগঞ্জ স্কুল থেকে বৃত্তিসহ ম্যাট্রিক, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে আই এস সি এবং ১৯৩৫-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম এ পাশ করেছেন। ছাত্রজীবনে অধ্যাপক আর্করয়েড এবং পিসতুতো দাদা অজয় ঘোষের প্রভাবে মার্কসীয় দর্শনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার আগে অবশ্য তিনি গান্ধির আদর্শে প্রাণিত ছিলেন। পড়াশোনা শেষ করার পর তাঁর চাকরি জীবন শুরু হয় হিন্দুস্থান কর্পোরেশনে। ১৯৪৬-এ বুকম্যান প্রকাশন সংস্থা স্থাপন করে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। পবে এই সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। পঞ্চাশের যুগে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের সঙ্গেও তাঁর যোগ ঘটেছিল কাজের সুবাদে। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করেছেন ১৯৪১ সালে, ১৯৪৯-এ পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হলে তিনি প্রেসিডেন্সি জেলে ও বক্সা বন্দিশিবিরে আটক থাকেন। ১৯৫১-তে মুক্তি পান। পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে তাঁর পরিচিতি। ১৯৩৮-এ প্রতিষ্ঠিত প্রগতি লেখক

সংঘের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন তিনি, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও তিনি ছিলেন প্রধান একজন। তিরিশ-চল্লিশের দশকে পরিচয়, অগ্রণী, নতুন সাহিত্য, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি প্রগতিবাদী পত্রিকাগুলিতে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী আন্দোলন ও বিশ্বশান্তি আন্দোলনে তিনি ছিলেন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। ভারতের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গবেষণা ক্ষেত্রেও তিনি বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। কলকাতার মহাজাতি সদনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে যে স্থায়ী প্রদর্শনীটি রয়েছে, তার নির্মাতা তিনি। আজীবন রবীন্দ্রভক্ত ও রবীন্দ্রানুসারী। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে পার্ক সার্কাসে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক রবীন্দ্রমেলার জন্য যে কমিটি, তার সম্পাদক ছিলেন তিনি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস রচনায় তিনি গঙ্গাধর অধিকারীকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। বই, সাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মহাফেজখানা গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর পুরস্কার ও সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার পেয়েছেন।

মৃত্যু ১৯ মে ১৯৮৭ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *লেনিন ও ভারতবর্ষ, রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী, রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা, রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ, মুক্তির সংগ্রামে ভারত, ৪৬নং—একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে* ইত্যাদি।